প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৭ম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩১৪। | ১ম সংখ্যা

ভারতের স্বরাষ্ট্র।

"It is liberty alone that fits man for liberty."—*Gladstone.*

"Good Government could never be a substitute for Government by the people themselves."—*Bannerman.*

যদি কোনও পক্ষিকুলসমাবৃত নির্জ্জন প্রদেশে হঠাৎ শব্দ করা যায় তবে যেমন চারিদিক হইতে কিচির মিচির ধ্বনি উত্থিত হইয়া কর্ণ বধির করিয়া তুলে, ত্রিশ কোটী জনসমাকীর্ণ ভারতের এই মনুষ্যহীন প্রদেশে নৌরোজী মহাশয়ের "স্বরাজ" শব্দও তেমনই একটী বিকট কোলাহল উৎপন্ন করিয়াছে। কেহবা ভয় পাইয়া কোলাহল করিতেছেন, কেহ বা অর্থ না বুঝিয়া চীৎকার করিতেছেন, কেহ বা অনর্থ ভাবিয়া গোল করিতেছেন, কেহ বা অর্থ বুঝাইতে যাইয়া "হত-ইতি-গজঃ" করিয়া সারিতেছেন। কিন্তু সকলেরই মুখে 'স্বরাজ'। স্বরাজ কথাটা বঙ্গদেশে নূতন হইলেও বিষয়টী বঙ্গদেশের কাছে নূতন নহে। বিগত পাঁচ বৎসর কাল আমরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী শুনিয়া আসিতেছি। ইংরাজ ইংলণ্ডে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আমরাও সেই স্বায়ত্তশাসন চাই, ইহার কমে আমরা কিছুতেই না এবং ইহার কমে আমাদের কল্যাণ নাই—অর্থাৎ ইংরাজ ইংলণ্ডে যেমন স্বাধীন আমরাও সেইরূপ স্বাধীনতা চাই, এই কথা ইতিপূর্ব্বে পুনঃপুনঃ শুনিয়াছি। কেউ বা গ্রাহ্য করিয়াছেন, কেউ বা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কেউ বা ইহাকে যুবজনসুলভ মাস্তিষ্কবিকারের ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যখন রাজনীতিক্ষেত্রে পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধ জাতীয় মহাসমিতির উচ্চ সিংহাসন হইতে ঘোষণা করিলেন "*Swaraj* like that of the United Kingdom" তখন আর উহা উপেক্ষণীয় রহিল না। তখন বজ্রপাণি লণ্ডন টাইম্‌স্ মরচে ধরা তরবারীখানি ঘসিয়া মাজিয়া বাহির করিয়া বলিলেন "তরবারী সাহায্যে ভারত জয় করা হইয়াছে, তরবারী যোগেই তাহা রক্ষিত হইবে।" কথাটা যে মিথ্যা তা টাইম্‌স্‌ও জানে, আমরাও জানি। এবং ত্রিশ কোটী লোক যদি স্বরাজ চায় তবে তাহাতে বাধা উৎপন্ন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহাও বজ্রপাণি মহাশয় জ্ঞাত আছেন, তাই জন্মের শোধ একবার তরবারীখানা ঘুরাইয়া লইলেন। যাহা হউক, স্বরাজ আর এখন স্বপ্নরাজ্যের কথা নয় বা মস্তিষ্কবিকারের ফল নয়। তবে আমাদের নরম (moderate) মহাশয়রা "Under

British Paramountcy," "Under British Suzerainty," "Within the Empire" "Under British Protectorate" প্রভৃতি ছাই চাপা দিয়া স্বরাজকে কিছু ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গেছেন যে আগুন কখনও ঠাণ্ডা হয় না। হয় নিবিয়া যায় না হয় চাপা ঠেলিয়া স্বীয় দীপ্তি প্রকাশ করে। এবার স্বরাজ কোন চাপাই মানিবে না। আমরা চাই *Swaraj* above all things; তাহা আর কিছুরই under এ থাকিবে না। দুঃখের বিষয় এখনও এমন ভ্রান্তজীব নাকি আছে যে স্বরাজ চায় না। বাস্তবিক, আর্য্য প্রপিতামহগণ যদি জানিতেন যে তাঁহাদের বংশে এমন কুলাঙ্গারও জন্ম গ্রহণ করিবে যাহারা জাতীয় জীবনের কোন এক অবস্থায় স্বরাজকে লোভনীয় মনে না করিয়া আর্য্যনামে কলঙ্ক আরোপ করিবে, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই দিগ্‌দিগন্ত অতিক্রম করিয়া স্ববীর্য্যে ভারতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেন না। যাক্ ইহাদের কথা। কিন্তু ইহারা ছাড়া স্বরাজ লইয়া আরও দুই দলে কিঞ্চিৎ লাঠালাঠি চলিতেছে। ইহারাই নরম (Moderate) ও গরমের (Extremist) দল। এক দলের অভীষ্ট, ইংরাজের কৃপালব্ধ ইংলণ্ডের লেজুড় স্বরূপ স্বরাজ; আর এক দলের আকাঙ্ক্ষা স্ববীর্য্যলব্ধ স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বরাজ অর্থাৎ "স্বরাজ"। উভয় দলেরই আকাঙ্খা স্বরাজ, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক দল চায় ছায়া, আর এক দল চায় বস্তু। যদিও নরম দলের একজন মুখপাত্র গরম দলের আদর্শকে "theoretically perfect" না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তবে গোখলে মহাশয় বলেন যে ও আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না! যুক্তির চূড়ান্ত বটে!! যে আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা "theoretically perfect" হয় কিরূপে ইহা বুঝাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হয় নাই। উহাকে খেয়াল বলিতে পারিতেন, কোন আপত্তি হইত না। উহা "ideal," শুধু তাই নয়, "theoretically perfect" ideal!! অথচ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমরা মূর্খ মানুষ, তথাপিও যুক্তি শুনিয়া আমাদের "ধন্ধ" লাগিয়া গিয়াছে। তবে এ যুক্তির একটী নিতান্ত অপরিহার্য্য কারণ রহিয়াছে। গোখলে মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সমগ্র জাতীয়জীবনকে গ্রাস করিয়াছে। সেটা আর এখন উপেক্ষার জিনিষ নয়, তাই আদর্শটার পিঠ্ চাপ্‌ড়াইয়া "হত-ইতি-গজ" করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কেন না, তিনি এখনও ভিক্ষার ঝুলি ছাড়িয়া স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই শ্যাম ও কুল দুই রাখিতে যাইয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে নরম ও গরম দলে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। আমরা তাহা স্বীকার করি না। পার্থক্য যথেষ্ট। এক দলের দৃষ্টি বাহিরে, আর এক দলের দৃষ্টি ভিতরে। টলেমি ও কোপারনিকাসে যে পার্থক্য, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে এই দুয়ে যে পার্থক্য এ উভয় দলের মধ্যে সেই পার্থক্য বর্ত্তমান। সুতরাং এ পার্থক্য অগ্রাহ্য করিলে দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবে না। বিষয়টী তলাইয়া দেখিলেই পার্থক্য কোথায় তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে এবং কোন্ পক্ষের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে এবং কোন্ আদর্শ যথার্থ যুক্তি-সঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং কথার কাটাকাটি ছাড়িয়া আসল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে "স্বরাজ" বস্তুটি কি? ইহার প্রকৃতিও স্বরূপ নির্ণয় করিলেই আসল কথাটা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যে স্বরাজ ইংলণ্ডে, যে স্বরাজ উপনিবেশে সে স্বরাজ কি? গোখ্‌লে মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন, "I want our people to be in their own country what other people are in theirs" স্বরাজ এতদতিরিক্ত আর কিছুই নহে। গরম দলের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গরম তিনিও নরম দলের এই সর্ব্বাপেক্ষা নরম মহাশয়ের সঙ্গে একেবারে এক মত। তবে পার্থক্য কোথায়? নরম মহাশয়েরা বাক্যে যাহা বলেন কার্য্যে ঠিক তাহার উল্টা সুর ধরেন অথবা কার্য্যক্ষেত্রে বাক্যের অন্য অর্থ করেন, এইখানেই বিষম গোল। অন্যেরা তাদের দেশে যা, আমাদিগকে যদি আমাদের দেশে তাই হইতে হয়, তবে হাঁটু গাড়িয়া পশ্চিম মুখো বসিয়া থাকলে তা হইতে পারে না, এই কথাটা না বুঝিয়াই যত গোল বাধিতেছে এবং

দুই দলে ভীষণ পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, এক পক্ষের যাহা ব্যবস্থা অন্য পক্ষের তাহা বিষ।

অন্যেরা আপনাদের দেশে কি? তাহারা নিজেরা কর স্থাপন করে এবং নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহা ব্যয় করে, এক পয়সাও বেশী ব্যয় করে না; তাহারা নিজেদের বিধি ব্যবস্থা নিজেরা প্রণয়ন করে এবং নিজেদের মনোনীত লোক দ্বারা তাহা নিজেদের উপর প্রয়োগ করে; নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করে এবং অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে, নিজেদের সৈন্য নিজেরা পরিচালন করে এবং নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা করে; নিজেদের শিল্প বাণিজ্য নিজেরা সংরক্ষণ করে এবং অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে; ইচ্ছানুসারে বিদেশীকে গ্রহণ করে বা বহিষ্কার করে। এ সব বিষয়ে তাহারা নিজেদের সুখ সুবিধা দ্বারা পরিচালিত হয়, কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, অন্য কাহারও সুখ সুবিধার দ্বারা আপনাদের সুখ সুবিধাকে নিয়মিত হইতে দেয় না। ইহারই নাম স্বরাজ এবং ইহা পাইলে নরম গরম উভয় দলই সন্তুষ্ট। কিন্তু ইহা কি Under British Paramountcy সম্ভব? একেবারেই না, কাহারও অধীনে স্বরাজ সম্ভব নয়। ভারতে এই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ কি থাকিবে? আমরা আমাদের রাজকার্য্য পরিচালনা করিব, ইংলণ্ড সাক্ষী-গোপাল হইয়া বসিয়া থাকিবেন। ইহা ছাড়া আর কিছু হইলেই স্বরাজ ব্যাহত হইল, আর যা কিছু থাকুক স্বরাজ থাকিল না। যদি বলা যায় ভিতরের ব্যাপার সব আমরা পরিচালন করিব কিন্তু ভারতের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ইংলণ্ড নির্দ্ধারণ করিবেন, ফ্রান্স বা জার্ম্মাণীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ থাকিবে তাহা ইংলণ্ড বিচার করিবেন। ভাল কথা, কিন্তু যদি যুদ্ধ বাধে, সৈন্য যোগাবে কে? ইংলণ্ড না ভারত? যদি ইংলণ্ড সৈন্য যোগায়, খরচ দেবে কে? যদি ইংলণ্ড দেন, যদি ইংলণ্ড ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান, তবে কাহারও আপত্তি থাকিবে না, সেটা প্রকৃত পক্ষে ভারতের যুদ্ধ নয় ইংলণ্ডেরই যুদ্ধ। আর যদি যুদ্ধব্যয় ভারতকে বহন করিতে হয় তবে যুদ্ধ বাধিবে কি না তাহা ভারতই নির্ণয় করিবে, সুতরাং Paramountcy থাকিবে না। অপর পক্ষে যদি ইংলণ্ড বলেন আন্তর্জ্জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমার নির্দ্ধারণ অনুসারে তোমাকে ব্যয় যোগাইতে হইবে, সে বিষয়ে তোমার মতামত শুনা যাইবে না, যেমন এখন হয়, যথা, তিব্বত অভিযান, পারস্য মিশন—তাহা হইলে Paramountcy রহিল বটে, স্বরাজ রহিল না। আমার টাকা ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিবার বা না করিবার অধিকার যদি আমার না রহিল তবে স্বরাজের মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল। স্বরাজ ও অন্যের Paramountcy এই দুই কখনও একত্র হইতে পারে না। সুতরাং নরম মহাশয়দের *Swaraj* under British Paramountcy একটা যুক্তিবিরুদ্ধ কথার কথা মাত্র। এবং কতদূর "practicable" তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় কথা এই, কিরূপে স্বরাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। নরম মহাশয়রা বলেন, ইংরাজের অনুকম্পায়। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ইংরাজ দায়ে পড়িয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই সকল দলীলের জোরে আমরা ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ লাভ করিব। আমাদের দলীল আছে বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাসে নজীর নাই। শক্তিমান বিদেশী কেহ প্রজাকে স্বাধীনতা দিয়াছে ইহা ইতিহাসে বলে না। গুঁতো ছাড়া স্বরাষ্ট্র লাভের অন্য কোনও উপায় আছে ইহা ইতিহাসে লেখে নাই। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইলে কি হইবে জানি না, কিন্তু এখনও মানবজাতির এতটা উন্নতি হয় নাই এবং দুই এক হাজার বছরের মধ্যে এতটা হইবে ইহাও আশা করা যায় না যে সোনার খনি ভারত ব্যবসাদার ইংরাজের নিকট হইতে দান স্বরূপ স্বরাজ লাভ করিবে। বন্ধ্যা বন্ধ্যা থাকিয়াই সন্তান প্রসব করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড ভারতের জন্য স্বরাজ প্রসব করিবে ইহা একেবারেই অসম্ভব। ভারতে কখনও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহা বরং স্বীকার করা যায়, কিন্তু ইংলণ্ড ভারতকে স্বরাজ দিবে ইহা কল্পনাও করা যায় না, বিশেষতঃ বিগত দেড় বৎসরের অভিজ্ঞতার পরে। ইংরাজও তাহা কল্পনা করিতেছে না। যখন ইংরাজ-রাজত্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যখন দেশীয়দিগের চক্ষে ধূলি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তখন তর্কের খাতিরে ইংরাজ এমন তেমন দু' একটা কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু

এখন যে মর্লীর ভারতসচিবত্বলাভে ভারতমাতার পরম শ্রেয়-কল্পনা করিয়াছিলান সেই সাধু মল। বলিতেছেন "যতদূর পর্য্যন্ত কল্পনার আঁখি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যে স্বায়ত্ত-শাসন দেখা যাইতেছে না।" ইহার পরও যাঁহারা ভারতের স্বরাজসৌধ ফিরিঙ্গীর কৃপাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা দেশের শত্রু, হয় তো অজ্ঞাত সারেই দেশের শত্রুতা করিতেছেন। ইংরাজ কি কখনও রাজী হইবে ভারতের রাজস্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে? আমরা যদি স্বরাজ পাই তবে আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিদেশী নুন ও কাপড়ের উপর কি গুরুতর শুল্ক বাধ্য হইয়াই বসাইব না? যে দেশে গুর্খা ও রাজপুত, বা শিখ ও মারহাট্টার অধিবাস সেই দেশ রক্ষার জন্য কি গায়ের রক্ত দিয়া একপাল ফিরিঙ্গী পোষণ করিতে রাজী হইব? ভারতের রাজকার্য্যে বিদেশী নিযুক্ত হইয়া তখন কি কোটী কোটী টাকা বিদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে? আমাদিগকে জীবন রক্ষার জন্যই এরূপ করিতে হইবে। ইংরাজ কি এই সত্তে আমাদিগকে স্বরাজ দিবে? তাহা যে দিবে না, স্বদেশী আন্দোলনে ফিরিঙ্গীর অপব্যবহার তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহা যে দেখিয়াও দেখিবে না, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তির অতীত। ইংরাজ রাজ্য ছাড়িতে পারে, বাণিজ্য ছাড়িতে পারে না। আমাদিগকে স্বরাজ দিলে তাহার যদি বাণিজ্যের ক্ষতি না হইত তবে না হয় এই একটা উৎকট কল্পনাই করিয়া ফেলিতাম। স্বরাজ পেলে তো কথাই নাই, স্বরাজ না পেলেও যখন প্রাণপণ করিয়া ভারতে ইংরাজের বাণিজ্য বিনাশ ব্যতীত আমাদের জীবন রক্ষাই অসম্ভব, আমাদের যখন এইরূপ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, তখন ইংরাজের কাছে স্বরাজ চাওয়ার মত একটা বিকট বিড়ম্বনা আর কিছুই হইতে পারে না। ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ ছিনাইয়া লইতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভ অসম্ভব। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে ইংলণ্ড ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র (Colonial form of Government) প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, যেমন ক্যানাডা, আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়াতে আছে। প্রথম কথা, ইংরাজ দয়া করিয়া ঔপনিবেশিকদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেয় নাই, মার্কিন স্বাধীনতা-সমর (American War of Independence) তাহার প্রমাণ। ক্যানাডায় আছে, কেন না, না থাকিলে এক মুহূর্ত্তে ক্যানাডা মার্কিন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়। বুয়রেরা যে পাইল তাহা গুঁতোর বলে, ইংরাজের অনুকম্পায় নয়। সিপাহীবিদ্রোহের পরের বছর দাবী করিতে পারিলে আমরাও পাইতাম। এখন আমাদের দাবীর পেছনে সে গুঁতোর ভয় নাই, সুতরাং অরণ্যে রোদন মাত্র সার। অষ্ট্রেলিয়ায় বাস্তবিকই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংলণ্ডের সহায়তা ব্যতীত সে আজ জাপানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের সন্তান। আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের সে সম্বন্ধ নাই, হইতেও পারে না। আসল কথা এই, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক তাহা এই সকল ক্ষুদ্র অর্ব্বাচীন উপনিবেশগুলিতে বর্ত্তমান নাই। ইংলণ্ড যে আজ জগতে প্রবল শক্তিরূপে বর্ত্তমান, তাহা কেবল সে ভারতের প্রভু বলিয়া, কেবল ভারতের অর্থ শোষণের দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত বলিয়া। সে দ্বার বন্ধ হউক, সে প্রভুত্ব চলিয়া যাক্, ইংলণ্ড এই মুহূর্ত্তেই জগতের কাছে অতি নগণ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং ভারতে ঔপ-নিবেশিক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহাকে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে কেবল দয়া প্রকাশ করিলে চলিবে না। Self Government within the Empire অর্থ যদি Legislative Councilএ দুজন সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি বা রাজকার্য্যে দুইজন বেশী ভারতবাসীর নিয়োগ না হইয়া প্রকৃত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন হয়, তবে ইংলণ্ড স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভারতকে তাহা দিতে পারে না। যে ভারতের অর্থ ও সম্বল (resources) শোষণ করিয়া ইংলণ্ড আজ এত বড় সেই ভারত যদি স্বীয় অর্থ সামর্থ্য ও সম্বল নিজের সুখস্বার্থে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, যদি সে ভূতের বেগার হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে জাপান জগৎকে যেরূপ চমৎকৃত করিয়াছে, ভারত তাহা অপেক্ষাও শতগুণ বেশী চমৎকৃত করিবে। তখন শক্তিসামর্থ্যে অসীম ধনবল ও জনবল সম্পন্ন ভারত ক্ষুদ্র ইংলণ্ড সমেত সাম্রাজ্যের আর সকল অংশকে একেবারে কোণঠেসা করিবে। এখন সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ডের যে স্থান, তখন ভারত সেই স্থান লাভ করিবে। তখন আর ভারত সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য থাকিবে

না; ভারত সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। ইংলণ্ড যে কখনও এ বন্দোবস্তে রাজি হইবে না, তাহা অতিবড় মূর্খেরও অধিগম্য। ইংলণ্ড তখন হাতীর চাপায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবার ভয়ে "ছেড়েদে মা কেন্দে বাঁচি" বলিয়া প্রত্যাহার মাগিবার পথ পাইবেন না। তিনি তখন বলিবেন, "না বাপু, Self Government within the Empire প্রয়োজন নাই, তার চেয়ে তোমাদের "স্বরাজ" আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়। তোমরা তাই নিয়ে থাক, আমি দেশে ফিরে যাই।" এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে আদর্শ theoretically perfect, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং নরম মহাশয়দের আদর্শের ন্যায় তাঁহাদের স্বরাজ স্থাপনের উপায়টিও যে নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা এখন আর না বলিলেও চলে।

তবুও না হয় নাক কান চোক মুখ বুজিয়া বুদ্ধিবিচারে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীকারই করিলাম যে ভিক্ষায় স্বরাজ মিলিবে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? স্বরাজ রক্ষা করিবার যে শক্তি আছে তাহার প্রমাণ পাইলাম কই? ইংরাজ যাহা দিলেন ফরাসীর হস্ত হইতে যে তাহা রক্ষা করিতে পারিব তাহার নিদর্শন কোথায়? যদি বলা হয় যে ইংরাজ রক্ষা করিবে, তবে তো পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি, ইংরাজের সঙ্গে সে সম্বন্ধ থাকিলে স্বরাজই হইল না, আর যে সম্বন্ধ থাকিলে স্বরাজ হয়, তাহাতে ইংরাজ কখনও রাজী হইতেই পারে না। যে বস্তু স্বোপার্জ্জিত নহে দান লব্ধ, তাহার প্রতি মমতা হইবে কেন? এক যুবক এক দিন ৫০০৲ টাকার শাল দিয়া ৫৲ টাকার জুতা পুঁছিতেছিল। ইহা দেখিয়া একজন কারণ জিজ্ঞাসা করায় যুবক উত্তর করিল, "জুতা আমার স্বোপার্জ্জিত, শাল পিতৃদত্ত, তাই এই বিভিন্নতা।" প্রকৃত স্বরাজ বাহুবলে অর্জ্জন করিতে হয়, আর যাহা কিছু তাহা স্বরাজ নাম বাচ্য হইতে পারে না। সেই জন্যই বলি স্বরাজ লাভ ইংরাজের তোষামদে নহে কিন্তু দেশের জাগরণে সিদ্ধ হইবে, ইহার অন্য পন্থা নাই, অন্য উপায় নাই। কিন্তু এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে "তোমরা কি স্বরাজের উপযুক্ত?" উত্তর দিবার আগে জিজ্ঞাস্য এই, প্রশ্নকর্ত্তা কে? যদি প্রশ্নকর্ত্তা ইংরাজ হন, তবে তাহাকে বলি, তোমার বাপু এ অনধিকারচর্চ্চায় প্রয়োজন কি? যদি তোমার দ্বারে ভিক্ষাপাত্রহাতে দাঁড়াইতাম, তবে না হয় উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দাবী করিতে পারিতে। সে ব্যবসা তো আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি। যাঁহারা এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, তাঁহারা আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কটন ওয়েডারবারণের testimonialsও হুজুরে পেশ করিতে কসুর করেন নাই। তাঁদের বিচার তুমি কর, কি ফল হইবে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছি। আমাদের পণ, "অর্জ্জিব স্বরাজ মোরা নিজ ভুজবলে।" সুতরাং তোমার সঙ্গে বিচার বিতর্ক একেবারে খতম। যে দিন সে ভুজবল আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজও আসিবে। যত দিন না আসে ততদিন অনুপযুক্ত, the proof of the pudding is in the eating, ইহার আবার কথা কি? স্ববীর্য্যবলে আজ স্বরাজ আদায় করিতে পারি, উপযুক্ত হইয়াছি, আয়োজন করিতে পাঁচ বছর লাগে, ততদিন স্বরাজ পাইব না। বৃক্ষ তোমার নাম কি? "ফলেন পরিচীয়তে"। কিন্তু তোমার কাছে চাহিব না। তোমার সঙ্গে ব্যাপার বাণিজ্য শেষ করিয়াছি।

কিন্তু প্রশ্নটা যদি ভিতর হইতে আসে, "নিজ ভুজবলে স্বরাজ উদ্ধার সম্ভব কি? ঐ যে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই বিবাদ করিতেছ?" তবে বলি সম্ভব, নির্ঘাত সম্ভব। দুই ভাই বিবাদ করিতে করিতেই (ও ভাইএ ভাইএ ঘরাও বিবাদ সর্ব্বদেশে সব্বকালেই ঘটে, তাহাতে স্বরাজ কাহারও আটকায় না) শত্রুর নিকট হইতে স্বরাজ উদ্ধার করিব; কেন না,—

> "আত্ম পক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করি যতক্ষণ,
> ওরা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন।
> সেই দ্বন্দ্ব হয় যবে পরপক্ষ গত,
> তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥"

যাঁহারা মনে করেন যে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা জাতিগত মৌলিক প্রাচীন বিবাদ বর্ত্তমান আছে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত, ফিরিঙ্গীর মিথ্যা ইতিহাসের গৎ মুখস্থ করিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। যদিও বা কিছু ছিল তাহা বাবর আকবর প্রভৃতি মনস্বী সম্রাটগণের রাজনীতিকৌশলে বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। যেথানে স্বার্থের বিরোধ নাই সেখানে বিবাদ থাকিতে পারে না। ভারতে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ যে এক তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন

না, উভয়েই সম্পদ বিপদের সমাংশভাগী। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকিতে পারে না। তবে যে এখন সময়ে সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিবাদের কথা শুনা যায় তাহার অধিকাংশই ফিরিঙ্গীর স্বার্থপ্রণোদিত। আমাদের মধ্যে কিসে বিবাদ বাধাইয়া সে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারে ইহাই হইল তাহার বর্ত্তমান রাজনীতি, অন্য উপায়ে সে ত্রিশ কোটী প্রজার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সেই জন্যই সে হিন্দুদেরও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু "তাহে মুগ্ধ প্রতারিত বোধহীন নরে"। বোধহীন নর সর্ব্বত্রই আছে, সুতরাং আমাদের মধ্যে সময়ে সময়ে বিবাদ বাধে। হিন্দুমুসলমানবিবাদের এই একমাত্র অর্থ, বাস্তবিক উভয়ের কোনও জাতিগত বিদ্বেষের হেতু নাই। বিবাদের কারণ বাহিরে, কারণ দূরীভূত হইলে বিবাদও দূরীভূত হইবে, কাজেই কারণ দূর করিবার জন্য পরস্পরের ঐক্য অসম্ভবও নহে, সুদূরপরাহতও নহে। যাহার চক্ষু আছে তিনি তাহা সহজেই দেখিতে পাইবেন। শত্রুপক্ষ আওরংজিবের "জিজিয়াকে" আপনাদের ইতিহাসে এমন রংএ চিত্রিত করিয়াছে, যাহাতে উহা হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের একটা স্মৃতিচিহ্নরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই মিথ্যা ভ্রান্তি অপনোদন নিতান্ত দরকার। আওরংজিবকেও যে বর্ণে চিত্রিত করা হয় তাহাও মিথ্যা। তিনি সন্দিগ্ধমনা ছিলেন। তাঁহার অবিশ্বাস হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপরই সমভাবে ছিল। হিন্দু বলিয়া তিনি প্রজাদের মধ্যে ইতরবিশেষ করিতেন তাহা নহে। হিন্দুগণ যে জিজিয়া দিত তাহার কারণ কি? ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমান প্রজা রাজার জন্য প্রাণ দিত, সে যুদ্ধে হিন্দু প্রজাকে আহ্বান করা চলিত না, সুতরাং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হিন্দু প্রজা 'জিজিয়া' দিত। ইহা একটী যুদ্ধকর। মুসলমান প্রজা যাহা দিত, হিন্দু প্রজার তাহা দিবার অধিকার ছিল না বলিয়া তাহারা তাহার পরিবর্ত্তে 'জিজিয়া' দিত। উহা কদাপি জাতিবিদ্বেষমূলক ছিল না। জাতিবিদ্বেষমূলক যুদ্ধকর বরং ইংরাজ রাজত্বে হিন্দু মুসলমান প্রজাকে দিতে হইতেছে। আমরা গায়ের রক্ত দিয়া ইংরাজসৈন্য পোষণ করিতেছি। অথচ ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগের যে অধিকার, যে সুখ সুবিধা, তাহা হইতে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ইহা অপেক্ষা জাতিবিদ্বেষমূলক অত্যাচার আর বেশী কি হইতে পারে? অথচ ফিরিঙ্গী নাকি সভ্য, আর ইতিপূর্ব্বে আমরা অসভ্য মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইতাম এবং তাহাই নাকি ফিরিঙ্গীর এদেশে রাজত্ব করিবার একটা প্রধান ওজুহাত। ইহা অপেক্ষা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন আর কি হইতে পারে? অর্দ্ধ সভ্য (!) মুসলমান অন্ধকারযুগে যে অন্যায় করিত বলিয়া ফিরিঙ্গী তাহার ইতিহাসে আজ কীর্ত্তন করিতেছে এই বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে ফিরিঙ্গীরাজ যে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অন্যায় করিতেছে, তাহার খবর কেহ পায় না! ফিরিঙ্গীর এমনই কৌশল! আগে যাহা কিছু অন্যায় হইত, তাহা সরল ভাবে হইত, লোকে বুঝিতে পারিত, ফিরিঙ্গী অন্যায় করে এমন কৌশলে যে কেহ তাহার সন্ধান পায় না। এই যে হিন্দু মুসলমান প্রজার গায়ের রক্ত দিয়া খৃষ্টীয় পাদ্রীসম্প্রদায় (Church) প্রতিপালন করা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় মানুষ আর দিবালোকে কি করিতে পারে? আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবাসী যেরূপ কুকুর বিড়ালের ন্যায় বিতাড়িত কোনও মুসলমান সম্রাটের (তাঁহাকে তোমাদের মিথ্যা ইতিহাস যতই অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করুক না,) অধীনস্থ হিন্দুপ্রজা কি ইহার শতাংশ অত্যাচারও কখন ভোগ করিয়াছে? বাস্তবিকই হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের কথা ফিরিঙ্গীর স্বার্থপ্রসূত রাজনীতির কল্পনা। বস্তুতঃ ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। যে সকল মুসলমান হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ দেখাইতেছেন তাঁহারা অশিক্ষিত এবং ফিরিঙ্গীর হাতের যন্ত্র। সুতরাং এ বিবাদ হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নহে, ফিরিঙ্গীর রাজনীতির চক্রে। হায়, ভাই মুসলমান, তুমিই না দিগ্বিজয়ীবেশে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলে, তবে আজ তোমার এ মতিচ্ছন্ন হইল কেন যাহাতে নিজের হিত বুঝিতে না পারিয়া শত্রুরই পদলেহন করিতেছ? তোমার প্রতি যে ফিরিঙ্গীর ভালবাসা তাহা রাজনৈতিক চা'ল তাহা কি এখনও বুঝিবে না ভাই? তোমার প্রতি যদি ফিরিঙ্গীর এতই সম্প্রীতি তবে কার্জ্জন-গবর্ণমেণ্ট অন্ধকূপহত্যারূপ তোমার মিথ্যা অপবাদটার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য এত আয়োজন করিলেন কেন?

মিণ্টো গবর্ণমেণ্ট আবার সম্রাট বাহাদুর শার সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিতে না দিয়া তোমার প্রতি আদর ও সম্মানের. পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! আবার ঐ দেখ যিনি কত আদর করিয়া তোমাকে প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফুলার সাহেব একটু দূরে সরিয়া গিয়াই বলিতেছেন তোমরা "descended mainly from men of the lower and the servile castes converted to Islam." ইহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণকে ফিরিঙ্গী কি চক্ষে দেখে তাহা অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আর কেন ভাই, সোজা পথে ঘরে এস, দুই ভাইয়ে মিলিয়া মায়ের কষ্ট দূর করি। ভাই শত্রুর প্ররোচনায় তুমি যদি তোমার ভাইএর উপর কোনও অন্যায় কর তবে হিন্দু ভাই তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। কেন না, তাহার শিক্ষা "মেরেছিস্ তুই কল্সীর কানা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না।" কিন্তু ভাই একটা কথা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি যদি আত্মহিত না বুঝিয়া দেশের অনিষ্ট করিতে ফিরিঙ্গীর হাতের যন্ত্রই থাক, তবে জানিও শত্রুর সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই। দেশে যে জাতীয় জীবনস্রোত বহিয়াছে, স্বর্গ হইতে জাতীয় জীবনগঙ্গার যে ধারা নামিয়াছে, তাহার গতি রোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। সে তাহার গন্তব্য পথে যাইবেই, সে সাগরে যাইয়া মিশিবেই, তুমি তাহার বাধা জন্মাইতে পারিবে না। গোমুখী হইতে গঙ্গা যখন ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কোন বাধা মানেন নাই, এক ঢেউ সাম্লাইতে যাইয়া ঐরাবতেরও প্রায় প্রাণান্ত হইয়াছিল। যদিও গোমুখীতে গঙ্গার মুখ খুলিয়া দিয়াছিল তবুও সে স্রোতমুখে দাঁড়াইতে পারে নাই, এখানেও কেউ পারিবে না, যে দাঁড়াইবে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হইবে। স্রোতের সঙ্গে যে গা ভাসাইবে সে সাগর সঙ্গমে যাইয়া পৌঁছিবে। এ স্রোত কোন সাহায্য যাচিবে না, কোন বাধা মানিবে না,—"সহায়তা কার লাগে বিশ্ব ডুবাইতে প্রলয়ের জলে।" তাই বলি ভাই আর বিড়ম্বিত হইও না।

আমার হিন্দুভ্রাতাদের নিকটও একটা নিবেদন আছে। আর রক্ত দেখিয়া মূর্চ্ছা গেলে চলিতেছে না। জননীর, ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্যও তোমাকে অস্ত্র ধরিতে শিখিতে হইতেছে। সরকার যখন তোমার রক্ষার ভার লইতে নারাজ তখন তোমাকেই আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে। তুমি এমন শুইয়াছিলে যে আর কিছুতেই তোমাকে উঠাইতে না পারিয়া ভগবান এবার তোমার এমন জায়গায় ঘা মারিয়াছেন, তুমি আর শুইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমাকেও উঠিতে হইয়াছে। কুমিল্লার হিন্দু মুসলমান বিবাদও তোমার জন্য স্বর্গের সম্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে, সে সংবাদ গ্রহণ কর এবং তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। আমি দেখিয়া শুনিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে কেবল ভাবিতেছি,—

"নিজে তুমি ভগবান, যোগাইছ উপাদান,
তব কার্য্য সকলই মঙ্গল।"

আর এক শ্রেণীর আপত্তি এই যে তোমাদের সমাজে নানারূপ বৈষম্য বর্ত্তমান সুতরাং তোমরা স্বরাজের উপযুক্ত নও। অর্থাৎ যে সব দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা চিরদিনই আছে সে সব দেশে বৈষম্য আদৌ নাই। স্বর্গরাজ্যে কি আছে জানি না, কিন্তু স্বরাজ্যের জন্য যে সাম্য নিতান্তই দরকার এ কথা আমরা স্বীকার করিতে এখনও প্রস্তুত হই নাই। এই পৃথিবীতে এমন অনেক দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে যাহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন। মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে আমরা বেশ বলিতে পারি—এবং সে সময়কার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা এখন অনেক বিষয়ে উন্নততর—যে, "এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপান লিখিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্মবিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন নাই"। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের করাল গ্রাস হইতে অপনাকে উদ্ধার করিয়া স্বরাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিল তখনও সেখানে দাস বিক্রয়ের জঘন্য প্রথা বর্ত্তমান ছিল, এবং স্বরাষ্ট্র স্থাপনের পরে আপনাদের মধ্যে মারামারি কাটা কাটি করিয়া সে প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বৈষম্য কি গিয়াছে? দাসত্ব প্রথা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া কি 'দাস' নাই? সে দিনও একজন শ্বেতকায় রমণী অন্য বর্ণের স্বামী গ্রহণের মহা অপরাধে (!) কারাগারে

নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কে না জানে, অতি বর্ব্বর Lynching প্রথা এখনও আমেরিকায় বর্ত্তমান? অথচ আমেরিকার স্বরাজ পৃথিবীর গৌরবের বস্তু। সুতরাং সামাজিক দোষ, দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মানুষ স্বরাজের উপযুক্ত হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য স্বরাজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। অনেক বিশিষ্ট সামাজিক উন্নতি স্বরাজ ছাড়া অসম্ভব। আমরা এখন সামাজিক উন্নতির যে স্তরে অবস্থিত সেখানে স্বরাজ ছাড়া উন্নতি সম্ভবই নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা স্বরাষ্ট্র লাভের অন্তরায় নহে কিন্তু প্রেরণক (incentive)। মনুষ্যসমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে কখনও বৈষম্য সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে না। এক আকারে তাহা দূরীভূত হইলে অন্য আকারে তাহা আবির্ভূত হইবেই। আমি বৈষম্যের পক্ষপাতী নই বরং বৈষম্যের ঘোর বিরোধী, সাম্য আমার আদর্শ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই যে আজ যাহারা গোলামী করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিতেছে নব স্বরাষ্ট্রে কি ইহাদের বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী নহে? আজ যাহারা স্বদেশের শত্রুতাচরণ করিয়া সরকারের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিতেছে সময় উপস্থিত হইলে সেই সরকারই কি উহাদিগকে এক গালে চূণ আর এক গালে কালি দিয়া বিদায় করিয়া দেবে না? কেন না, যাহারা টাকার খাতিরে দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহারা যে সরকারের বিরুদ্ধে একদিন দাঁড়াইবে (betraying the Government) না তাহা কি সরকার বুঝে না! মানুষ কি কখনও এই রূপ গোলামদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে! ইহাদিগকে কি তখন "পারিয়া" অপেক্ষাও হেয় হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে না? তবে পারিয়া মোদের ছাড়ে কই! সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে না তাহা নহে, বরং প্রাণপণে করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব লাভ আমাদের লক্ষ্য, স্বরাজ তাহার উপায় মাত্র, কিন্তু অপরিহার্য্য উপায়। যাঁহারা বলেন আগে মনুষ্যত্ব লাভ কর পরে স্বরাজ চাহিও তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী স্থাপন করিতে চান। যদি মনুষ্যত্বই লাভ হইল তবে স্বরাজ পররাজের কচ্ কচিতে আমার প্রয়োজন কি? মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই স্বরাষ্ট্র চাই অতএব স্বরাজ আমার অবশ্য প্রাপ্তব্য, আমাকে স্বরাষ্ট্র লাভ করিতেই হইবে, ইতি। বন্দেমাতরম্।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

আসুরী ভাষা।

পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেবোপাসক ও অসুরোপাসকগণ এক সময়ে একই জাতির অন্তর্ভূত ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হইতে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তাহার আলোচনা করা যাউক।

অবস্তা।

অসুরদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'অবস্তা' এবং অবস্তার মধ্যে 'গাথা' নামক অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পহেলবী ভাষায় ইহার অনুবাদ ও ভাষ্য লিখিত আছে। অনেকের বিশ্বাস পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাভেস্তা এবং ইহা জেন্দ ভাষায় লিখিত। কিন্তু প্রকৃত কথা ইহা নহে। ইউরোপে একজন পণ্ডিত এক সময়ে একটা ভুল করিয়াছিলেন। সেই ভ্রান্ত মত যে কেবল ইউরোপেই প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে—ইহা ভারতবর্ষে আসিয়াও লোকের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে 'জেন্দ' বলিয়া কোন ভাষা নাই। 'পহেলবী' ভাষায় অবস্তা গ্রন্থের যে অনুবাদ ও ভাষ্যাদি লিখিত আছে তাহারই নাম 'জেন্দ'। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অবস্তার ভাষা লইয়াই আলোচনা করিব।

আবস্তিক ও সংস্কৃত ভাষা।

গাথার ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিন্তু আসুরী-ভাষার বিষয়ে এপ্রকার কোন সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। বরং ইহাই সত্য যে এই ভাষা দেবভাষা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত। পালি ভাষার সহিত আসুরী ভাষার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় ভাষাই এক সময়ে জনসাধারণের ভাষা ছিল। বুদ্ধদেব যেমন এক সময়ে প্রচলিত ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি অতি প্রাচীন কালেও একবার জনসাধারণের ভাষাতে ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং উভয় ধর্ম্মের উপদেশই জন-

সাধারণের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জনসাধারণ কথনই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে নাই এবং বলিতে পারেও না। ইহা কেবল শিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শিষ্টগণ শাস্ত্রাদি রচনায় এই ভাষা প্রয়োগ করিতেন এবং সাধুসমাজে আলোচনার সময়েও ইহা ব্যবহৃত হইত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি উভয় ভাষাই একজাতির ভাষা হইবে তবে ইহাদের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে ইহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা যতটা পার্থক্য দেখিতেছি, বৈদিক যুগে ততটা পার্থক্য ছিল না। পারসীকগণের পূর্ব্বপুরুষ ও ভারতীয় আর্য্যগণ যত দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন নিশ্চয়ই ইঁহারা একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। ঘটনা চক্রে অসুরোপাসকগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন ইঁহাদিগকে ইরান প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। একদল লোক যদি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী কোন বিজন প্রদেশে বাস করে, তাহা হইলে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাহাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার ও ভাষা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আর তাহারা যদি বিদেশীয়দিগের সংশ্রবে আসে তাহা হইলে ত কথাই নাই। অসুরোপাসকদিগের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যে ভাষা লইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা 'অবস্তা'তে যে সেই ভাষাই পাইতেছি তাহা নহে। সেই প্রাচীন ভাষাই বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া 'অবস্তার' ভাষাতে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের ভাষা চিরকালই পৃথক। অশিক্ষিত লোকেও বাঙ্গলা বলিয়া থাকে এবং শিষ্টসম্প্রদায়ও বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলেন। উভয় ভাষাই বাঙ্গলা; কিন্তু এক হইলেও এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। আবার শিষ্টগণ বাঙ্গলাভাষায় কথাও বলেন এবং পুস্তকাদিও লিখিয়া থাকেন। কথিত ভাষাও বাঙ্গলা এবং লিখিত ভাষাও বাঙ্গলা কিন্তু এই উভয় ভাষা এক হইলেও এক নহে। এখন ভাবিয়া দেখ অশিক্ষিতদিগের কথিত ভাষা এবং শিষ্টগণের লিখিত ভাষা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত! বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কি প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা অবগত হইলেই সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। নিম্নে গৃয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১। কলিকাতার ভাষাঃ—

একজনের দুই ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে যে ছোট, সে তার বাপ্‌কে বলিল, বাবা! ইত্যাদি

২। মানভূমঃ—য়্যাহক নকের দুইটা ছাওগা রহি না। তাহারদের মাঝে ছট্‌কা বাব্বাকে কহিনাক বাব্বা!

৩। মেদিনীপুরঃ এক লোক্কার দুট্টা পো থাইল। তান্নেকার মাঝু কোচ্যা পো ভিজের বাফুকে বল্ল বাফুহে!—

৪। মালদহঃ—য়্যাকজন মানুষের দুটা ব্যাটা আছলো। তারঘোর বিচে (তাহাদের মধ্যে) ছোট্‌কা আপনার বাবাক্ কহ্‌লে বাবধন্!—

৫। বগুড়াঃ একঝনের দুই ব্যাটাছেল আছিল। তারকেরে মধ্যে ছোটঝন্ কৈল বা।—

৬। দিনাজপুরঃ—একজন মানুষের দুই ছাওয়া ছিল। তায়দের মধ্যে ছোট ছাওয়া আপন বাপ্‌কে কহিল্ বাপ্!—

৭। রাঁচিঃ—এক লোকের দু বেটা রাহে। উহার মাঝে ছোট বেটা বাপ্‌কে কৈলেক্, এ বাপ্!—

৮। ঢাকা মাণিকগঞ্জঃ—য়্যাকজনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগে মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো বাবা!—

৯। চট্টগ্রামঃ—এগুআ মান্‌স্তের দুয়া পোয়া আছিল্। ছোড়ুয়া তার বায়্‌রে কইল, বায়াজি!—

১০। নোয়াখালি হাতিয়াঃ একজন মাইনসের দুগা ছোলা আছিল্। হিয়ার মধ্যে ছুড়্‌গায় হেইতার বাফেরে কইল্ বায়াজি!—

১১। নোয়াখালি (রামগঞ্জ)ঃ—এক জনের দুই হুত আছিল! ছোট-গায় বাপেরে কৈল্ বাউ।—

১২। ময়মনসিংহ (হইজং)ঃ—একজন মানলগ্ দুইগা পলা থাকিবার্। তানি অলাক্ হুটু পলারা বাপ্‌রাগে কয় যে বাবা।—

১৩। ত্রিপুরাঃ—এক জেডার দুই পুং আচিল্। তারার মাইজে হুরুলা তার বাপেরে কইল্ বাবুও!—

১৪। বাখরগঞ্জঃ—একজন মান্‌ষের দুগ্‌গা পোলা আছিল। তারগে মধ্যে ছোটুগ্‌গা হের বাপরে কইল বাবা!—

১৫। যশোহরঃ একজনের দুট পুল ছিল। তারগে মোদ্দি ছোট জোন তার বাপেরে কলে বাবা!—

কিন্তু পুস্তকে লিখিতে হইলে অনেকে এইরূপ লিখিবেনঃ—

কোন এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল পিতঃ!—

এই বাঙ্গলার সহিত কথিত বাঙ্গলার পার্থক্য কত। অথচ এ সমুদয়ই বাঙ্গলা। সমসাময়িক বঙ্গভাষাতেই যখন এত তফাৎ আবস্তিক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশুদ্ধ বাঙ্গলা যেমন কোন স্থানেই কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না তেমনি সংস্কৃত ভাষাও কখন জনসাধারণের ভাষা ছিল না। সভাসমিতি ও সাহিত্যেই কেবল এই ভাষা আবদ্ধ ছিল। বৈদিক সময়ে প্রাকৃতজনের যে ভাষা ছিল তাহাই কালক্রমে

পরিবর্ত্তিত হইয়া আসুরীভাষায় পরিণত হইয়াছে। আর সেই প্রাকৃতভাষাই সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃতভাষার আকার ধারণ করিয়াছে। লোকের একটা সংস্কার আছে যে সংস্কৃত হইতেই পালি, বাঙ্গলা, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুইটী কথা হইতেই বুঝা উচিত যে প্রাকৃত ভাষাই পূর্ব্বে ও সংস্কৃত পরে। প্রাকৃত=প্রকৃতি+ষ্ণ। প্রকৃতি=মূল, স্বভাব; এবং প্রাকৃতিক=মৌলিক বা স্বাভাবিক। আর যাহা বিশুদ্ধ করা হয় তাহাই সংস্কৃত। জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে তাহাই 'প্রাকৃত' আর এই 'প্রাকৃত' ভাষা সংমার্জ্জিত করিলেই সংস্কৃতভাষা হয়। অবস্তার ভাষা আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিব যে ইহা একসময়ে জনসাধারণের ভাষা ছিল। শিক্ষিত লোকের বাঙ্গলা যেমন অশিক্ষিত লোকের বাঙ্গলা হইতে পৃথক, তেমনি সংস্কৃত ও আবস্তিক ভাষাতেও পার্থক্য রহিয়াছে।

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, আসুরীভাষা সংস্কৃতভাষা হইতে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃৎ, তদ্ধিত, অব্যয় ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েই উভয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। একটুকু আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

১। বর্ণ ও উচ্চারণ।

যে সমুদয় বর্ণ উচ্চারণ করা কঠিন অবস্তাভাষাতে সে সমুদয় বর্ণ নাই বলিলেই চলে।

সংস্কৃতভাষায় স্বরবর্ণ ১৩টি কিন্তু আসুরীভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ঐ, ঔ নাই। হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে 'এ' তিনটী এবং 'ও' দুইটী।

সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টি। ইহার মধ্যে যে কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণ কঠিন, অবস্তাভাষায় সে কয়েকটী বর্ণ নাই। ছ, ঝ, ট বর্গ, ভ, ল এই কয়েকটী বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায় না। 'ঙ' এবং 'ঞ'এর পরিবর্ত্তে 'ং' ব্যবহৃত হয়। অবস্তাতে 'চ' এবং 'জ'এর অনুরূপ কয়েকটী বর্ণ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে যে ভাবে 'চাচা' উচ্চারণ করে, অবস্তার 'চ'এর উচ্চারণও ঠিক সেই প্রকার। অবস্তাতে 'জ'এর অনুরূপ তিনটী বর্ণ। একটী সংস্কৃত 'জ'এর মত। দ্বিতীয় 'জ'এর উচ্চারণ 'জবরদস্ত' কথার 'জ' এর ন্যায়। তৃতীয় 'জ' azure শব্দের 'z' এর ন্যায়।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে সংস্কৃত ও আবস্তিকভাষার সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই বুঝা যাইবে। বন্ধনীর মধ্যে অবস্তাশব্দের উচ্চারণ দেওয়া গেল।

১। সংস্কৃত 'অ' স্থলে অবস্তাতে প্রায়ই 'এ' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই 'এ'কারের উচ্চারণ অতি হ্রস্ব।

নরম্=নরেম্;
রথম্=রথেম্;
অয়ম্=অয়েম্।

২। 'অ' স্থানে 'অই', 'আ' স্থানে 'আই' বা 'আউ' হয়। কোথায় 'ই' হইবে এবং কোথায় 'উ' হইবে তাহা পরবর্ত্তী স্বরের উপর নির্ভর করে। এই 'ই' এবং 'উ'এর উচ্চারণ অতি হ্রস্ব।

পতিম্=পইতিম (প'তিম্);
কন্যা=কইন্যা (ক'ন্যা);
দারু=দাউরু (দা'রু)।

'আতপ চাল' উচ্চারণ করিবার সময় যে ভাবে 'চাল' উচ্চারণ করিতে হয়, 'পইতিম' এবং "কইন্যা" ইত্যাদিও সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে।

৩। 'এ' স্থানে 'অএ' এবং 'ও' স্থানে 'অও' ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় 'অ' কারের উচ্চারণ অতি হ্রস্ব।

দেব=দএব (যেন দ্ এব);
গো=গও (যেন গ্ ও)।

৪। রেফ্ স্থলে 'অরে' এবং 'ঋ' স্থলে 'অরে' বা 'এরে' ব্যবহৃত হয়। 'র'তে যে 'এ'কার যুক্ত হয় তাহার উচ্চারণ অতি হ্রস্ব।

কর্ণ=করেন;
বৃত্র=বেরেত্র;
অমৃত=অমেরেত।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 'ঘৃত'কে 'ঘেরৃত' 'ঘেরত' বা 'ঘেরেত' উচ্চারণ করা হয়। অনেক অশিক্ষিত লোকে 'বৃক্ষ'কে 'বেরেক্ষ' বলিয়া থাকে। বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

৫। সংস্কৃত হ্রস্ব স্বর কখন অবস্তাতে দীর্ঘ হয়, কখন বা দীর্ঘস্বরও হ্রস্ব হইয়া যায়।

বায়ু = বয়ু ;
পিতা = পিত ;
কতর = কতার ;
গব্য = গাব্য ;
বিতস্তিম্ = বীতস্তীম্ ;
দ্রুত = দ্রূত ;
স্তুত = স্তূত।

৬। 'ক' স্থানে 'খ' হইয়া থাকে।

চক্র = চখ্র
ক্রতু = খ্রতু

ক্+ষ্ স্থলে কখন খ্+ষ্ হয় ; কখন বা 'ক' এর লোপ হয়।

ক্ষুদ্র = খ্ষুদ্র ;
ক্ষত্র = খ্ষত্র ;
ক্ষুধা = ষুধ ;
তক্ষ = তষ ;
দক্ষিণ = দষিন।

৭। 'গ' স্থানে 'ঘ' এবং 'ঘ' স্থানে 'গ'।

নগ্ন = নঘ্ন ;
উগ্র = উঘ্র ;
ঘর্ম = গরেম ;
দীর্ঘ = দরেগ।

পূর্ব্ববঙ্গে 'ঘর' স্থানে 'গর' বলিয়া থাকে।

৮। 'ত' স্থানে 'থ'।

কুত্র = কুথ্র ;
পুত্র = পুথ্র ;
মূত্র = মূথ্র।

৯। 'ধ' স্থানে 'দ'।

ধাতা = দাতা ;
ধারা = দারা।
ধন = দন।

পূর্ব্ববঙ্গেও এই প্রকার উচ্চারণ।

১০। 'শ' স্থানে 'স' এবং কখন কখন 'হ' হইয়া থাকে।

শত = সত
পশু = পসু
শূর = সূর
শুষ্ক = হুশ্ক।

১১। 'ষ' স্থানে 'শ'।

উষ্ট্র = উশ্ত্র ;
দৃষ্টি = দর্শ্তি ;
যষ্টী = যশ্তা।

১২। 'স' স্থানে 'হ' এবং কখন কখন 'থ' হইয়া থাকে।

সখি = হখি ;
শস্য, সস্য = হহ্য ;
সপ্ত = হপ্ত ;
এবং স্রোত = হ্রওথ।

শিশুগণ 'স' স্থানে 'থ' উচ্চারণ করে এবং পূর্ব্ববঙ্গে অনেকেই 'স' স্থানে 'হ' বলিয়া থাকে।

১৩। 'প' স্থানে 'ফ'।

প্রশ্ন = ফ্রশ্ন ;
প্রীতি = ফ্রিতি ;
প্রোক্ত = ফ্রওখ্থ।

১৪। 'ব' স্থানে 'প্'।

অশ্ব = অস্প ;
বিশ্ব = বীস্প ;
শ্বেত = স্পএত।

১৫। 'ভ' স্থানে 'ব'।

ভূমিম্ = বূমীম্ ;
ভ্রাতা = ব্রাতা ;
ভানু = বানু।

পূর্ব্ববঙ্গের লোক 'ভাই'কে 'বাই' 'ভাল'কে 'বাল' বলিয়া থাকে।

১৬। 'হ' স্থানে 'জ'।

হিম = জিম।
অহি = অজি।
বাহু = বাজু।

১৭। 'ল' স্থানে 'র'।

শূল = সূর ;

শ্রীল = শ্রীর।

লুপ = রুপ।

সংস্কৃতেও অনেক স্থলে 'ল' স্থানে 'র' হইয়া থাকে।

১৮। সংস্কৃত 'অস্' স্থানে অবস্তাতে 'অংহ্' হইয়া থাকে।

বসনং = বংহনেম্

বচস্ = বচংহ্

পয়স্ = পয়ংহ্

নমসা = নমংহা।

উভয় ভাষার মধ্যে যে এত বিভিন্নতা দেখান গেল, ইহার মধ্যেও কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! আবার এমন অনেক কথা আছে যাহা উভয় ভাষাতেই সাধারণ। নিম্নে দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

অস্ত, অন্য, অপ, আয়ু, ইহ, ইষু, উপর, ঊষা, কাম, গাথা, জয়, জ্যা, তনু, তায়ু, দূত, দূর, নর, নব, পদ, মধু, যব, যদা, বস্ত্র, বাত, বিষ, বীর, স্ত্রী ইত্যাদি।

২। সন্ধি।

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ"—ইহা অবস্তা ভাষারও নিয়ম, যেমন

বর + আম = বরাম।

হু + উখ্ত = হূখ্ত (= সূক্ত)

অপরাপর সন্ধির নিয়মেও সাদৃশ্য রহিয়াছে।

			সংস্কৃত	অবস্তা
অ + ই কিম্বা	ঈ	=	এ;	অএ
অ + উ „	ঊ	=	ও;	অও
অ + ঋ (অবস্তার 'অরে')		=	অর্;	অর্।

এ সমুদয় স্থলে সংস্কৃত সন্ধি অপেক্ষা অবস্তার সন্ধিই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভাষা কতকগুলি কল্পিত শব্দের সমষ্টি নহে; ইহা একটী জীবন্ত বস্তু। 'ভাষ্' ধাতুর অর্থ 'বলা'। যাহা স্বভাবতঃ বলা হয় তাহাই ভাষা। এখন দেখা যাউক ভাষায় সন্ধির অর্থ কি। মনে কর দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে হইবে, পরম এবং ঈশ্বর। এই দুইটী কথা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে গেলেই ইহাদের সন্ধি অর্থাৎ মিলন হইবে। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে উক্ত দুইটী কথা তাড়াতাড়ি বলিতে গেলে উচ্চারণ 'পরমেশ্বর' না হইয়া 'পরমএশ্বর'ই হয় এবং এই উচ্চারণই সাধারণ লোকের ভাষা। অবস্তার এই উচ্চারণ (পরমএশ্বর) মার্জ্জিত করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ (পরমেশ্বর) হইয়া থাকে।

		সংস্কৃত,		অবস্তা।
অ + এ	=	ঐ	;	আই
অ + ও	=	ঔ	;	আউ

প্রকৃতপক্ষে ঐ এবং আই, ঔ এবং আউ প্রায় সমতুল্য উচ্চারণ।

৩। শব্দরূপ।

সংস্কৃতের ন্যায় অবস্তাতেও সাত প্রকার বিভক্তি এবং প্রত্যেক বিভক্তিতেই তিন প্রকার বচন। সংস্কৃত শব্দরূপের সহিতও অবস্তা শব্দরূপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১মা।	পুত্রঃ = পুথ্রো।
২য়া।	পুত্রম্ = পুথ্রেম্।
	গিরিম্ = গইরীম্।
	তনূম্ = তনুম।
	পুত্রান্ = পুথ্রাঁন্।
৩য়া।	সেনয়া = হএনয়।
	দেব্যা = দএব্য।
(চিকিতু শব্দ)	চিকিত্বা = চিকিথ্বা।
	পুত্রাভ্যাম্ = পুথ্রএইব্য
	পুত্রৈঃ = পুথ্রাইশ্।
	তনুভিঃ = তনুবিশ্।
	ধামেভিঃ = দামেবীশ্
৪র্থী।	পুত্রায় = পুথ্রাই।
	মন্যবে = মইন্যবে।
	দাত্রে = দাথ্রে।
	বিশে = বীসে।
	বিদুষে = বীদুসে।
	গিরিভ্যাম্ = গইরিব্য।
	গিরিভ্যঃ = গইরিব্যো।
	তনুভ্যঃ = তনুব্যো।
৫মী।	পুত্রাৎ = পুথ্রাৎ।
	পুত্রেভ্যঃ = পুথ্রইব্যো।

৬ষ্ঠী। পুত্রস্য = { পুথ্রহে। পুথ্রাহ্যা।

পুত্রয়োঃ = পুথ্রয়োঃ।

দাত্রোঃ = দাথ্রাও

বিদুষঃ = বীদুষোঃ।

পুত্রাণাম = পুথ্রনঁম্।

তনূনাম্ = তন্নুনঁম।

৭মী। পুত্রে = পুথ্রে।

দাতরি = দাতরি।

বচসি = বচহি।

পুত্রেষু = পুথ্রএষু।

বচস্সু বচহু।

তন্নুষু = তন্নুষু।

সংস্কৃত ইকারান্ত, উকারান্ত, কিম্বা ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় নহে। ইহাদের রূপে যে বিভক্তিতে যেখানে যে প্রকার বিশেষত্ব আছে, অবস্তাতেও সেই স্থানে সেই প্রকার বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত 'শ্বন' শব্দের রূপ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির সহিত অবস্তার স্পন্ (= শ্বন্ অর্থাৎ কুকুর) শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যেমন—

শ্বা = স্পা।

শ্বানম্ = স্পানেম্।

শুনে = স্থনে।

শুনঃ = স্থনো ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম।

সংস্কৃত সর্ব্বনামের সহিত অবস্তার সর্ব্বনামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

অস্মদ্ শব্দ

অহম্ = আজেম্ ('হ' স্থানে 'জ')

বয়ম্ = বয়েম্।

মাম্, মা = মঁম, মা

নঃ = নো।

মে = মে

মৎ = মৎ

অস্মৎ = অহ্মৎ

মম, = মম

অস্মাকম্ = অহ্মাকেম্।

অপরাপর সর্ব্বনামেরও দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

যুষ্মদ্ শব্দ—

ত্বম্ = ত্বম্ তু তূ, তীম্।

তে, তব = তে, তব।

যুষ্মাকম্, বঃ = যূষ্মাকেম্, বোঁ।

তদ্ শব্দ।

সঃ = হো

তৎ = তৎ

সা = হা

এতদ্ শব্দ।

এষঃ — অএহো

এতেষু = অএতএষু

এতয়া = অএয়ো

ইদম্ শব্দ।

অয়ম্ = অয়েম্

ইমে = ইমে

এভ্যঃ = অএইব্যো

যৎ শব্দ।

যঃ = যো

যম্ = যেম্

যস্মাৎ = যহ্মাৎ

যা = যা

কিম্ শব্দ।

কঃ = কো

কেন কন

কাঃ = কা ইত্যাদি।

৪। লিঙ্গবিধান।

অবস্তার লিঙ্গবিধানও সংস্কৃতের অনুরূপ। যেমন—

দএব (দেব) হইতে দএবী (দেবী)

মএষ (মেষ) „ মএষী (মেষী)

পইতি (পতি) „ পথ্নী (পত্নী)

অস্প (অশ্ব) „ অস্পা ও (অস্পী)

বীদ্বহ্ (বিদ্বান),, বিথুষী (বিদুষী)

৫। সংখ্যাবাচক শব্দ।

অবস্তার কয়েকটী সংখ্যাবাচক শব্দ নিম্নে দেওয়া গেল:—

এক = অএব (= এব)
দ্বি = দ্ব
ত্রি = থ্রি।
চতুর্ = চতুর্
পঞ্চন্ = পঞ্চ
ষষ্ = খ্স্বশ্
সপ্তন্ = হপ্তন্
অষ্টন্ = অশ্তন
নবন্ = নবন্
দশন্ = দশন্
দ্বাদশন্ = দ্বাদশন্
সপ্ততি = হপ্ততাইতি
শত = সত ইত্যাদি।

আবার, প্রথম = ফ্রতেম
তৃতীয় = থ্রিত্য
অষ্টম = অষ্টেম
নবম = নাউম
দশম = দসেম
শততম = সততেম ইত্যাদি।

৬। ধাতুরূপ।

সংস্কৃতের ন্যায় অবস্তাতেও ধাতু সকলকে দশগণে বিভাগ করা যাইতে পারে এবং উভয় ভাষাতেই আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতু রহিয়াছে।

(১) ভ্বাদিগণীয় ধাতু

এই গণীয় ধাতুর উত্তর 'অ' আগম হয়।

ভরতি = বরইতি (বর'তি)
ভরসি = বরহি।
ভরামি = বরামি।

সংস্কৃতে যেমন 'সদ' স্থানে 'সীদ' আদেশ হয়, তেমনি অবস্তাতে 'হদ্' স্থনে 'হিদ্' হইয়া থাকে।

(২) অদাদি।

অস্তি = অস্তি।
অসি = অহি।
অস্মি = অহ্মি।

'লট' বিভক্তিতে যেমন বিদ্ ধাতুর একটী বিশেষ রূপ আছে, অবস্তাতেও সেই প্রকার রূপ দেখা যায়।

বেদ = বএদা (আমি জানি)
বেদ = বএদা, বএধ (সে জানে)।

(৩) হ্বাদি।

উভয় ভাষাতেই এই শ্রেণীর ধাতু অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

দধাতি = দধাইতি (দধা'তি)
দধাসি = দধাহি।
দধামি = দধামি।
দধ্যাৎ = দইথ্যাৎ (দ'থ্যাৎ)

(৪) দিবাদি।

দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'য' আগম হয়।

নশ্যতি = নস্যেইতি।
ত্রায়স্তে = থায়েইস্তে।
শ্লিষ্যতি = স্রএষ্যেইতি।

(৫) স্বাদি।

স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'নু' আগম হয়।

কৃণোতি = কেরেনওইতি।
কৃণোমি = কেরেনুমি।
কৃণোমি = কেরেনওমি।

বেদে 'কৃ' ধাতু 'করা' অর্থে স্বাদিগণীয়। এখানেও উভয় ভাষার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

(৬) তুদাদি।

পৃচ্ছতু = পেরেসতু।
পৃচ্ছ = পেরেস।
পৃচ্ছানি = পেরেসানি।

সংস্কৃতে যে স্থলে বিশেষ নিয়ম, অবস্তাতেও সেই নিয়ম; যেমন 'বিদ্' স্থানে 'বিন্দ্,' 'কেরেৎ' (= কৃৎ) স্থলে 'কেরেন্ত' (= কৃন্ত) আদেশ।

(৭) রুধাদি।

রুধাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বরের পর 'ন্' আগম হয়।

অবস্তাতেও এই নিয়ম। বিভক্তি সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃতে যেমন 'ছিদ্' স্থানে কখন 'ছিন্দ' কখন বা 'ছিনদ্' আদেশ করিয়া লইতে হয়, অবস্তাতেও তেমনি 'চিৎ' স্থানে কখন "চিন্দ" কখন বা 'চিনৎ' আদেশ হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ছিনত্তি = অবস্তার চিনস্তি।
ছিনদ্মি = „ চিন্হমী।

(৮) তনাদি।

উভয় ভাষাতেই তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'উ' আগম হয়।

তনোমি = তনওমি।
তন্বে = তন্ধে।
তন্বীত = তন্বীত।

(৯) ক্র্যাদি।

বৃণে = বেরেনে
প্রীনামি ক্রীনামি।

উভয় ভাষাতেই এই শ্রেণীর ধাতুর উত্তর 'না' আগম হইল।

(১০) চুরাদি।

এই শ্রেণীর ধাতুর উত্তর উভয় ভাষাতেই 'অয়' সংযুক্ত হয়।

নাশয়ামি = নাসয়েমি
তপয়তি = তাপয়েইতি।
অপাতয়ন্ = অপতয়েন্

লিট।

উভয় ভাষাতেই লিট বিভক্তিতে ধাতু অভ্যস্ত হইয়া থাকে এবং ধাতুরূপেও সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

শুশ্রুম = সুস্রুম
দদাথ = দদাথ
দধার = দধার
বিবেদ = বিবএদ
উচে = বওচে
দদ্রে = দাদ্রে।
আসরে = অএংহাইরে।
দিদ্বিষম = দিদ্বীষ্ম।

লুঙ।

সংস্কৃতভাষার লঙ, লুঙ ইত্যাদি বিভক্তিতে ধাতুর আদিতে 'অ' আগম হয় কিন্তু বৈদিকভাষায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় (পাণিনি ৬।৪।৭৫)। অবস্তাতে সাধারণতঃ 'অ' আগম হয় না; তবে দুই এক-স্থানে 'অ' কিম্বা 'আ' আগম হইয়া থাকে যেমন—

অদাৎ = আদাৎ

সংস্কৃতের ন্যায় অবস্তাভাষাতেও লুঙ বিভক্তিকে ৭ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কোন কোন ধাতুর অব্যবহিত পরেই বিভক্তি যোগ করা হয়। কোন কোন স্থলে বিভক্তি যোগ করিবার পূর্ব্বে ধাতু অভ্যস্ত হইয়া থাকে। অপর পাঁচ শ্রেণীর ধাতুতে সাধারণতঃ সংস্কৃতে অ, স্, স, ইষ্, শিষ্ এবং অবস্তাতে অ, হ্, হ, ইষ্ ও হিষ্ আগম হয়, যেমন—

অধাৎ = অদাৎ, আদাৎ
অবিদৎ বীদৎ
অমংস্ত = মঁস্ত
অনৈষীৎ = নএষৎ ইত্যাদি।

লুট ও লৃঙ।

সংস্কৃত	পাতা =	অবস্তার	পাত।
„	পাতারঃ =	„	পাতারো।
„	পাতাস্মি =	„	পাতাহ্মি।
„	বক্ষ্যতে =	„	বখ্স্যেইতে।

আশীলিঙ্।

সংস্কৃত ভূয়াৎ = অবস্তার বুয়াৎ
ভূয়াস্ম = „ বুয়াম।

নাম ধাতু।

প্রশ্নয়তি = পরেসন্যেইতি
পতয়তি = পইথ্যেইতি
এনস্যতি = অএনং হইতি।

প্রশ্ন, পতি এবং এনস্ শব্দ হইতে পূর্ব্বোক্ত তিনটী ক্রিয়াপদ সাধন করা হইয়াছে।

যঙন্তধাতু।

পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে উভয় ভাষাতেই ধাতুর

উভয় 'যঙ্' হইতে পারে। কখন কখন 'যঙ্'এর লোপও হইয়া থাকে। বিভক্তি সংযুক্ত করিবার সময় যঙন্ত ধাতুকে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়।

অবস্তাতে দিস্ স্থানে দএদিস্
বিদ্ „ বোইবিদ্
পর্ত্ „ পাপেরৎ
দর্ „ দর্দর্

সনন্ত ধাতু।

উভয় ভাষাতেই 'ইচ্ছা' অর্থে ধাতু অভ্যস্ত হয় এবং ইহাতে 'স' যুক্ত হইয়া থাকে।

যেমন 'জি' স্থানে জীজিষ
থ্রু „ চিথ্রুষ
জ্ঞা „ জিথ্নাওংহ (=জিজ্ঞাস)
বর্জ্ „ বীবরেষ
দব „ দিব জ (=দিপ্স)

কর্ম্মবাচ্য।

কর্ম্মবাচ্যে সংস্কৃত ধাতুর যে বিশেষত্ব, অবস্তাতেও সেই প্রকার দেখা যায়।

মন্যতে = মন্যেতে
ক্রিয়তে = কির্যেতে
শুয়ে = স্রুয়ে
শুশ্রুবে = সুস্রুয়ে।

শেষোক্ত ধাতুতে লিট বিভক্তিতেও অবস্তা ভাষায় কর্ম্ম-বাচ্যে 'য' আগম হইল।

সংস্কৃতে লুঙ বিভক্তিতে প্রথমার একবচনে 'ই' হয়। ইহা একটী বিশেষ নিয়ম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অবস্তাতেও ঠিক এই প্রকার ব্যতিক্রমই দেখা যায়।

সংস্কৃত অবাচি = অবস্তার অবাচী
অশ্রাবি = „ স্রাবী।

(৭) বৈদিকভাষা।

বৈদিকভাষা সাধারণ সংস্কৃত হইতে কিছু স্বতন্ত্র। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতের সহিত অবস্তাভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে।

সাধারণ সংস্কৃত।	বৈদিক।	অবস্তা।
দাতারৌ	দাতারা	দাতর
পিতরৌ	পিতরা	পিতর
তনূম্	তন্বম্	তন্বেম্
দেব্যঃ	দেবী	দএবী
বস্ত্রানি	বস্ত্রা	বস্ত্র
গিরিণা,	গিরী	গইরি
যৌ	যা	যা
যানি	যা	যা
তানি	তা	তা
অনয়া	অয়া	অয়
ইমে	ইমা	ইম
আসীৎ	আস	আস
স্মঃ	স্মসি	মহি
ভরামঃ	ভরামসি,	ভরামহি
দধামঃ	দধ্মসি,	দদেমহি
উশ্মঃ	উশ্মসি,	উশ্মহি

বৈদিক লোটের অনুরূপ বিভক্তিও অবস্তাতে পাওয়া যায়

বৈদিক ভরাৎ = অবস্তার বরাৎ
„ ভরাসি = „ বরাহি
„ কৃণবানি = „ কেরেন বানি
„ তনবা = „ তনব
„ প্রীণাৎ = „ ফ্রীনাৎ

(৮) কৃৎ ও তদ্ধিত।

কৃত ও তদ্ধিতেও উভয় ভাষার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। নিম্নলিখিত প্রত্যয় যে কেবল অবস্তাতেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, এ সমুদয়ের প্রয়োগ সংস্কৃতেও রহিয়াছে।

অ, অন, অন, অইনি (সংস্কৃত আনি) অন্ত্, অর্, অহ্ (সংস্কৃত অস্) আ, আন, ই, ইন্, ইন, ইশ (ইস্), ইষী, ঈ, উ, উন, উষ, ঊ, ক, ত, ইত, তর তেম (=তম), তাৎ, তি, তু, থ, থ্য (=ত্য), থ্র (=ত্র), ন্থ, থ্ব (=ত্ব) থ, থি, থ্বান (=ত্বান), থু, ন, নহ্ (=নস্), নি, ম্ন, ম, মন্, মি, ম্ন, মন, মন্ত্ য, যহ (=ঈয়স) য়ু, র, রি, রু, ব, বন্, বন্ত্ বহ্ (=বস্) বর্ ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দিলে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দীর্ঘতর হইয়া যাইবে—এই জন্য কেবল মাত্র কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

গৃ	ধাতু হইতে	গীর্য্য = গইর্য্য
ধা	„	দধান = দথান
ভৃ	„	ভরন্তী = বরেন্তী (স্ত্রীলিঙ্গে)
বিদ্	„	বিদ্বস্ = বিধ্বহ্
বৃ	„	বরণ = বরেন
গম	„	গত = গত
স্না	„	স্নাত = স্নাত
স্তু	„	স্তুতি = স্তুইতি
অস্	„	সত্য = হইথ্য
পৃচ্ছ	„	প্রশ্ন = ফ্রশ্ন
অসুর	হইতে	আসুরি = আহুইরি
সপ্ত	„	সপ্তথ = হপ্তথ
গো	„	গব্য = গাব্য
„	„	গোমন্ত্ = গওমন্ত্
মধু	„	মধুমন্ত্ = মধুমন্ত্
বসু	„	বসিষ্ঠ = বহিশ্ত
ভেষজ	„	ভেষজ্যতর = বএষজ্যোতর
„	„	ভেষজ্যতম = বএষজ্যোতম্
অস্মদ্	„	অস্মাক = অহ্মাক
„	„	মাবৎ = মাবন্ত্
যুষ্মদ্	„	ত্বাবৎ = থ্বাবন্ত্

শেষোক্ত দুইটী দৃষ্টান্ত (মাবৎ এবং ত্বাবৎ) কেবল বেদেই পাওয়া যায় এবং এই দুইটীই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অবস্তাতেও ইহার অনুরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে।

উভয় ভাষাতেই অপত্যার্থে 'ষণ্' প্রত্যয় হয় যেমন :—

সংস্কৃতে রঘু + ষণ্ = রাঘব।

অবস্তাতে নরু + ষণ্ = নরব।

সংস্কৃতে অপত্যার্থে 'আয়ণ' প্রত্যয় হয় যেমন :—

বদরি + আয়ন = বাদরায়ন।

অবস্তাতে উক্ত অর্থে 'অন' এবং 'অয়ন' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

জমস্প + অন = জামাস্পন।

গওরি + অয়ন = গওরয়ন।

(৯) অব্যয়।

অবস্তার অব্যয়ও সংস্কৃতের অনুরূপ।

সংস্কৃত 'তস্' প্রত্যয়	=	অবস্তার 'তো'		
ত্র	„	=	„	থ্র
হ	„	=	„	ধ
দা	„	=	„	দা

যেমন অভিতঃ = অইবিতো

কুত্র = কুথ্র।

ইহ = ইধ

কদা = কদা।

ক, হ চ (= সচ), নৃ, মক্ষু (= মক্ষু) অএব (= এব), ন না (নানা), মা, চ, উত, তু, বা, হি (= হি) ইত্যাদি অব্যয় উভয় ভাষাতেই সাধারণ। অবস্তার উপসর্গাদি এই :—

অইতি (= অতি), অইপি (= অপি), অইবি (= অভি), অনু, অন্তরে (= অন্তর) অপ, অব, আ, উপ, উস্ ও উজ্ (= উৎ), নী (= নি), নিশ্ (= নিঃ), পর (= পরা), পইরি (= পরি) ফ্র (= প্র), পইতি (= প্রতি), বী (= বি) হম্ (= সম্) ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও উভয় ভাষার মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

(১০) ছন্দ।

অবস্তার ছন্দও বৈদিক ছন্দের অনুরূপ।

গাথা নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। গায়ত্রী এবং অনুষ্টুভাদির অনুরূপ ছন্দও অবস্তাতে পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদে গায়ত্রী আসুরী, পংক্তি আসুরী, উষ্ণিহ্ আসুরী, ইত্যাদি সাত প্রকার আসুরী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ও উষ্ণিহ্ ছন্দ যে দেবতাদিগের প্রিয় তাহা ঋগ্বেদেও বর্ণিত আছে (১০।১৩০।৪)। এ সমুদয় ছন্দই নিশ্চয়ই অসুরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। নতুবা এ সমুদয়ের নাম 'আসুরী' হইবে কেন? কেবল নামেই যে ইহারা 'আসুরী' তাহা নহে অসুরদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেই এই সমুদয় ছন্দ রহিয়াছে। 'গাথা' ইহাদিগের প্রধান গ্রন্থ; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় গায়ত্রী, পংক্তি ও উষ্ণিহ্, ইত্যাদি ছন্দে রচিত।

(১১) উপসংহার।

উপসংহার করিবার পূর্ব্বে অবস্তা হইতে একটী মন্ত্র উদ্ধার করা যাইতেছে।

তেম অমবন্তেম্ যজতেম্
স্থরেম্ দামোহু সেবিশ্‌তেম্
মিথ্রেম্ যজাই জওথ্রাব্যো।
যশ্‌ত ১০।৬

কথায় কথায় সংস্কৃত করিলে এইরূপ হইবে:—

তম্ অমবন্তম্ যজতম্
স্থরম্ ধামস্থ শবিষ্ঠম্
মিত্রম্ যজৈ হোত্রাভ্যঃ।

এই একটী মাত্র মন্ত্র হইতেই প্রমাণিত হয় যে এক সময়ে এই উভয় সম্প্রদায়ই একজাতির অন্তর্ভূত ছিল এবং একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ।

ইংরাজিতে একটা প্রচলিত কথা আছে যে কল্পনা অপেক্ষাও সত্য অদ্ভুত। আমাদের দেশে রীতিমত আধুনিক ধরণের ইতিহাস কখন ছিল না; কাব্যপুরাণাদির উপাখ্যান হইতে সত্য সংগ্রহ ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। কিন্তু কাব্যপুরাণ—কল্পনার স্বাধীন ক্রীড়াক্ষেত্র—রূঢ়-সত্যের গণ্ডীবদ্ধ ইতিহাস নহে। এই হেতু তাহার সকল উপাখ্যান খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কোন সত্য প্রমাণিত হইয়া যায়, তখন ইংরাজি প্রবাদের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই।

কাব্যপুরাণের সকল উপাখ্যানের মধ্যে প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের বড়ই হীন ধারণা আছে। কিন্তু অন্ততপক্ষে কবি শ্রীহর্ষের সময় যে বন্দুক ছিল, তাহার প্রমাণ কবি দিয়াছেন। তিনি দময়ন্তীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দময়ন্তীর নাসিকা যুবজনের হৃদয়বিদ্ধ করিবার নালিকাস্ত্র অর্থাৎ দোনালা বন্দুক।

"ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্ভ্রুবৌ
নলিকে ন তদুচ্চ নাসিকে ত্বয়ি নালীক-বিমুক্তি কাময়োঃ"॥

তদপেক্ষা প্রাচীনকালেও বন্দুক ছিল কি না জানি না। একজন লেখক ভারতী পত্রিকায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ বন্দুক কামান লইয়া হইয়াছিল। ইহা সত্য বা মিথ্যা হউক, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে অতি প্রাচীন সময়ে ভারতে ধনুর্ব্বিদ্যা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল এবং ধনুর্ব্বেদ রীতিমত অধীত ও অধ্যাপিত হইত। তৎকালে বলচর্চ্চা ও শস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত; আত্মরক্ষা ও সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা ধর্ম্ম ছিল। বলশালী ও শস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি সমাজে পূজার্হ বিবেচিত হইতেন। প্রাচীন কাব্যপুরাণবর্ণিত শস্ত্রপ্রয়োগকৌশল এক্ষণে আমাদের অবিশ্বসনীয় মনে হয়। কিন্তু চর্চ্চা, অভ্যাস ও অধ্যবসায়ে জগতে অসম্ভাব্য অনুৎপাদ্য যে কিছু আছে তাহা ত' বোধ হয় না।

প্রাচীন ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণের মধ্যে পরশুরাম অন্যতম। তিনি বাণ দ্বারা সমুদ্রাপসরণ করিয়া কেরল দেশ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। দশরথ শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া ঋষিকুমার বধ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন। রামায়ণবর্ণিত অনলাস্ত্র, পবনাস্ত্র, পর্জ্জন্যাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, শব্দবেধ প্রভৃতি বাণের অদ্ভুত শক্তি যে শুধুই কবিকল্পনা তাহা বলা দুঃসাহস বিবেচিত হইতে পারে।

মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন ইষিকাস্ত্র প্রয়োগদ্বারা কূপপতিত বস্তু উত্তোলন করিতেন বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ সর্ব্বজনবিদিত। শরশয্যাগত ভীষ্মের পিপাসা শান্তির জন্য অর্জ্জুন ধরণীপৃষ্ঠ বাণবিদ্ধ করিয়া জল উৎসারিত করিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের অসাধারণ শব্দবেধ ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিপথের যুদ্ধে সাহাব উদ্দিন ঘোরী কৃতঘ্নতা ও কপটাচার দ্বারা পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া যান ও পরে পরম দেশহিতৈষী মহাত্মা পৃথ্বীরাজের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেন। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের পরম অনুগত বন্ধু ছিলেন; তিনি তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঘোর রাজ্যে গমন করেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজের শব্দবেধ ক্ষমতার প্রশংসা শুনিয়া ঘোরী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়েন। সপ্ত-

লৌহচক্র দোদুল্যমান করা হইল। অন্ধ পৃথ্বীরাজকে শব্দ মাত্র লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটিকে সাতটির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্ধ করিতে হইবে। চাঁদের এ কৌশল বিশ্বাসঘাতকের প্রতিহিংসা লইবার জন্য। চাঁদ ঘোরীকে বলিলেন পৃথ্বীরাজের লক্ষ্যবেধ সময়ে তিনি যেন উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। পৃথ্বীরাজ মুক্তবন্ধন হইলেন, হাতে ধনুর্ব্বাণ পাইলেন। এমন সময় ঘোরীর উৎসাহবাক্য শুনিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণমোচন করিলেন এবং ঘোরীকে বিদ্ধ করিয়া আপনার শব্দবেধ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন।

য়ুরোপীয় সাহিত্যেও অপূর্ব্ব লক্ষ্যবেধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্কটের আইভানহো উপন্যাসে লক্স্লি ছদ্মনামধারী সিংহসাহস রিচার্ডের অদ্ভুত লক্ষ্যবেধের বর্ণনা, উইলিয়ম টেলের বর্ণনা, ফরাশী ঔপন্যাসিক ডুমার মণ্টিক্রিষ্টোর বন্দুকের গুলি চালাইয়া শক্তকাগজে সমান্তরালে ছিদ্র করার বর্ণনা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। অঙ্গুলি অনাহত রাখিয়া হস্তধৃত চুয়ানিতে লক্ষ্যবেধের বড়াই বাংলা উপন্যাসেও আছে। কোচিনের এক মাসিক পত্রিকায় স্থিরলক্ষ্য ভ্রাতৃযুগলের এক বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরাভিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া বন্দুক ছুঁড়িতেন, মধ্যপথে দুই বন্দুকের গুলি পরস্পরাহত হইয়া দক্ষিণবামে সরিয়া যাইত। আমি গল্প শুনিয়াছি যে সাঁওতালেরা সূক্ষ্মস্থূল নানাবিধ বাণ সাহায্যে একটা সমগ্র বাঁশ একেবারে চিরিয়া দ্বিধা করিয়া ফেলিতে পারে।

অধুনা এইরূপ অপূর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ দুইটী পুরুষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একজন রাণা সরতান সিংহ ও অপরজন শ্রীযুক্ত লল্লুভাই কল্যাণজী শাহ। বহু আনন্দ ও গৌরবের কথা যে ইহাঁরা উভয়েই ভারতীয়।

রাণা সরতান সিংহ গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় গিয়া পার্সী কোরিন্থিয়ন থিয়েটারে বহুদিবস ধরিয়া তাঁহার অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ কৌশল দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় কংগ্রেস, প্রদর্শনী ও থার্ষ্টনের ম্যাজিক সাধারণকে এমন নিযুক্ত রাখিয়াছিল যে এমন কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারও বহুলোকের অদৃষ্ট ও অশ্রুত রহিয়া গিয়াছে।

রাণা সরতান সিংহ লীম্বড়ী রাজবংশ সম্ভূত। উদয়পুরের রাণার সহিত মোগল সম্রাটের যুদ্ধ সময়ে ইহাঁর এক পূর্ব্বপুরুষ সরতান সিংহ রাণাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইহাদের বংশ রাণা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাণা সরতান সিংহের পিতার নাম ভূপতি সিংহ। ইহাঁর জন্ম ১৯২০ সংবৎ। অতএব তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৪৪ বৎসর। ইহার কাকা কেশরী সিংহ ইহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং দশ বৎসর বয়স হইতে ইহাকে বন্দুক চালনায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিতে আরম্ভ করেন। শস্ত্রচালনায় পারদর্শিতা লাভে উদ্যুক্ত করিবার জন্য রামায়ণ মহাভারতের বীরত্ব-কথা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া বালকের সম্মুখে অতি উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়াছিলেন।

অভ্যাস বড় জিনিষ। অধ্যবসায়, অভ্যাস ও ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা রাণা সরতান সিংহ অর্জ্জুনকল্প শস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রভেদমাত্র ধনুর্ব্বাণ স্থলে বন্দুক ব্যবহার; কালমাহাত্ম্যানুসারে তাহা উপযুক্তই হইয়াছে।

তিনি অর্জ্জুন তুল্য সব্যসাচী এবং ভয়ানক-বেধ, ইষিকাস্ত্র প্রয়োগ, অদৃশ্যবেধ, চলল্লক্ষ্যবেধ, মৎস্যবেধ, শব্দবেধ করিতে সক্ষম। তিনি ৩০।৩৫ প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়া থাকেন। এখানে অত্যদ্ভুত কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সব্যসাচী—ইনি বন্দুকের কুঁদা দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে বা মধ্য বক্ষে রাখিয়া, দক্ষিণ বা বাম হস্তে বা পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শুইয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া শ্লোক পাঠ করিতে করিতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সক্ষম। অর্জ্জুন দক্ষিণ ও বাম হাতে তুল্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সহজভাবে বাণ চালনা করিতে পারিতেন, এ জন্য তাঁহার নাম সব্যসাচী হইয়াছিল। ইনি তদপেক্ষাও উচ্চতর ও নূতনতর আখ্যা পাইবার উপযুক্ত।

ভয়ানক বেধ—রাণাজী আপন পুত্রের মস্তকের উপর নারিকেল রাখিয়া বিদ্ধ করেন। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় লক্ষ্য সন্ধান করিতেও তিনি কিছু মাত্র সময়ক্ষেপ করেন না; বন্দুক তুলিয়াই আওয়াজ করেন ও নারিকেল গুলিবিদ্ধ হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিকই ভয়ানক।

ইষিকাস্ত্র প্রয়োগ—কূপের মধ্যে ভাসমান শুষ্ক লেবুর পার্শ্বে জলে এমন কৌশলে তির্য্যকভাবে গুলি মারেন যে গুলির বেগজনিত ধাকায় সেই শুষ্ক লেবু উৎক্ষিপ্ত হইয়া

কুপের উপরে আসিয়া পড়ে। ইঁহার ক্ষমতা বাস্তবিকই অর্জ্জুন তুল্য।

অদৃশ্য-বেধ—একটি বড় জালার মধ্যে চারিটি বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত মৃৎভাণ্ড রক্ষা করিয়া সেই জালাটিকে দড়ির সাহায্যে টাঙাইয়া দেওয়া হয়। দড়িতে পাক দিয়া ছাড়িয়া দিলে জালা দ্রুত ঘুরিতে থাকে। তদবস্থায় জালা মধ্যস্থ যে কোন বর্ণের ভাণ্ড রাণাকে বলিবামাত্র তিনি গুলি চালাইয়া ভাঙিয়া দিতে পারেন, অন্য গুলি অভগ্ন থাকিয়া যাইবে। ইহা অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!

চলল্লক্ষ্য-বেধ—একটা কাঠের ঢেরার চারি মুখে চারি বর্ণের চারিটি মৃৎপিণ্ড সংলগ্ন করিয়া সেই ঢেরা আবর্ত্তিত করা হয়; তখন যে বর্ণের মৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিতে বলা যাইবে, রাণা তাহাই বিদ্ধ করিতে সক্ষম।

মৎস্য-বেধ—৮।১০ গজ উচ্চে ঘূর্ণ্যমান কাগজের মৎস্যের প্রতিচ্ছায়া জলে দেখিয়া মৎস্যের চক্ষুবিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহাই দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের মৎস্য বেধ। রাণা অধিকতর বাহাদুরী দেখাইবার জন্য দোদুল্যমান বড় একটা তরাজুর দুই পাল্লায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া জলের প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া ভ্রাম্যমান মৎস্যের চক্ষুবিদ্ধ করিয়া থাকেন। নিজে দোদুল্যমান এবং লক্ষ্য চঞ্চল; এরূপ অবস্থায় সফলতা বড়ই আশ্চর্য্যজনক!

শব্দ-বেধ—বস্ত্রাবৃত করিয়া চক্ষু দৃষ্টিহীন করিয়া চারিটি বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত মৃৎকলসের শব্দ প্রথমে রাণাকে শ্রবণ করান হয় এবং প্রত্যেক শব্দ কোন বর্ণের কলসের তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কলস সকলের স্থান অদল বদল করিয়া রাখিয়া আবার শব্দ শুনান হয়। তখন যে বর্ণের কলসকে বিদ্ধ করিতে বলা যাইবে, রাণা তাহাই বিদ্ধ করিয়া দিবেন।

জ্বলন্ত মোমবাতি গুলি মারিয়া নিভাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু বাতি গুলির আঘাতে একটু নড়িবেও না।

এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় তিনি বহুস্থানে প্রদান করিয়াছেন।

ইঁহার পুত্র শূরসিংহ পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনিও এই সকল প্রকার লক্ষ্যবেধে পিতৃতুল্য পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহাদের উদ্দেশ্য ভারতের প্রনষ্টবিদ্যা পুনরুজ্জীবিত করিয়া সাধারণকে সেই বিদ্যায় শিক্ষিত করা। অর্থাভাবে কোথাও শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশে ধনকুবেরের অসদ্ভাব নাই। যদি অর্থাভাবে এমন বিদ্যা অধিগত হইবার উপায় থাকিতেও জনসাধারণের আয়ত্ত না হয় তবে ক্ষোভ ও পরিতাপেও এই ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে আধুনিক যুদ্ধপ্রণালীতে স্থির লক্ষ্য না হইলেও চলে; কিন্তু বোয়ার ও জাপানীরা সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

ইঁহার বৃত্তান্ত মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে আলোচিত হয়; বঙ্গ এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন; ইহা বাংলার পূর্ব্বস্বভাবানুরূপ হইলেও বর্ত্তমানে লজ্জার বিষয়। কলিকাতায় তাঁহার লক্ষ্যবেধ সংবাদ কোন পত্রিকাতেই যথোচিত ভাবে আলোচিত হয় নাই বোধ হয়।

রাণা সরতান সিংহের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী অপর লক্ষ্যবেধনিপুণ শ্রীযুক্ত লল্লুভাই কল্যাণজী শাহ ১৯৩২ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তাহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। ইনি কাঠিয়াবাড়ের ভাবনগরের অধিবাসী, ইঁহার বংশ তদ্দেশ প্রসিদ্ধ বৈশ্যবংশ। ধর্ম্মে ইনি শ্বেতাম্বরী জৈন। ভাবনগর এংলো-ভার্ণাক্যুলার গুজরাতী বিদ্যালয়ে ইনি বিদ্যাভ্যাস করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার শস্ত্রবিদ্যা, কলা, শিল্প-কৌশল প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। ইনিও রাণা সরতান সিংহের মত রামায়ণ, মহাভারত ও চারণ কবি বর্ণিত বীরত্ব কথায় উৎসাহিত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে রাণা সরতান সিংহের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তিনি সেই আদর্শে উপনীত হইতে সচেষ্ট হয়েন এবং তিনি সফলকাম হইয়াছেন। কায় মনে সাধনা করিলে অসাধ্য কিছুই থাকে না। ইনিও মৎস্যবেধ, ভয়ানক বেধ, অদৃশ্যবেধ, শব্দবেধ প্রভৃতি প্রয়োগে তুল্য নিপুণ। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্সের সমক্ষে লক্ষ্যবেধ কৌশল দেখাইয়া তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। বহু ইংরাজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমাদের দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক অন্যতম।

রাণা সরতান সিংহের প্রয়োগকৌশল হইতে যে যে বিষয়ে ইঁহার পার্থক্য আছে, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত



শ্রীযুক্ত লল্লুভাই কল্যাণজী শাহ।

হইল। তিনি মনুষ্যের হস্তধৃত নারিকেল বা পদমধ্যবর্ত্তী লম্বিত মৃৎভাণ্ড গুলি চালাইয়া বিদ্ধ করিয়া থাকেন। লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য ইনি এক চক্ষু মুদ্রিত করেন না। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, আরাম চেয়ারে শুইয়া, হাতে পায়ে বন্দুক ছুঁড়িয়া, সম্মুখ পশ্চাতের লক্ষ্য বেধ করিতে সক্ষম। মৎস্যবেধ করিতে আধ ইঞ্চি মাত্র চৌড়া দর্পণপ্রতিফলিত ছায়া দেখিয়া মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইনি বলেন যে এই সকল প্রয়োগ ধনুর্ব্বাণেও হইতে পারে; এবং তিনি এক্ষণে ভাবনগরের বন্য গাঁড়, ভীল প্রভৃতির নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া অতি অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করিতে হইবে, ভারতে ছিল সব, আছে সব; কেবল প্রকাশে প্রবর্ত্তনা দিবার মত উৎসাহ ও উত্তেজনার শুধু অভাব! ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের জড়তা অবসাদ ঘুচাইয়া উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিউক; আমরা প্রণষ্টগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ধন্য হই!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পেকিন রাজ-পুরী।

(২)

বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী।

এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে চীনের বৃদ্ধা মহারাণী নীচ বংশোদ্ভবা দাসীকন্যা, কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইনি মাঞ্চু-সৈন্যগণের একজন লেপ্টেনাণ্ট-জেনারেলের কন্যা। কোন উচ্চবংশীয় মাঞ্চুভিন্ন এই জেনেরালের পদ পাইতে পারেন না। ইনি মাঞ্চুসৈন্যের "শ্বেত পতাকা" (White banner) বংশসম্ভূত। এই "শ্বেত পতাকা" বংশের মর্য্যাদা কেবল "পীত পতাকা" (Yellow banner) বংশের নিম্নে মাত্র। চীন সম্রাট এই "পীত পতাকা" বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মাঞ্চুগণ যখন চীন দেশ জয় করে, তখন এই "শ্বেত পতাকা" ও "পীত পতাকা" বংশদ্বয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ উপস্থিত হয়, কিন্তু—অবশেষে পীত পতাকারই জয় হয় এবং সেই হইতে এই পীত পতাকা বংশের লোকই রাজত্ব করিতে-ছেন। বর্ত্তমান বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী শৈশবকালে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক সযত্নে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

উচ্চ বংশীয় কুমারী মাঞ্চুরমণীগণ তাঁহাদের সমসাময়িক সম্রাট ও সম্রাটমাতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়া থাকেন। এবং সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর বাছনিমত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাটের নিম্নশ্রেণীস্থা পত্নী* স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় বর্ত্তমান বৃদ্ধা মহারাণী তৎকালীন সম্রাটমাতা ও সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং মনোমোহন ভাব সকল, উচ্চবংশের সঙ্গে একত্রযোগে সোনায় সোহাগারূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল গুণের একত্র সমবায়ে তাঁহাকে তৎকালীন সম্রাটের মহিষীরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। তৎকালীন বৃদ্ধারাণী প্রথমত ইহাঁকে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন, সম্রাটও তাঁহাকে মনোনীত করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজপুরীতে বাসের আদেশ করিলেন। ইনি সম্রাটের পঞ্চমা মহিষী হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে সম্রাট আরো চারিটী মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতি অল্পকালমধ্যেই ইনি নিজগুণে সম্রাটমাতার সম্রাটের ও পাটরাণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। শীঘ্রই ইনি সম্রাটের পত্নীগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন। কেন না এই পত্নীগণ নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে ক্রমে নিম্ন হইতে উচ্চপদে উন্নীত হইতে পারেন। কেবল পাটরাণীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না। প্রথমা পত্নী বা পাটরাণীর মৃত্যু হইলে তন্নিম্নস্থ রাণী পাটরাণীর স্থান অধিকার করিতে পারেন।

সম্রাট শিয়েন কেং সিংহাসনে আরোহণ করিবার দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে শোক চিহ্নস্বরূপ পাটরাণীর পদে কেহই উন্নীত না হইয়া ঐ পদ কিছুদিন শূন্য রহিল। অতঃপর তাঁহার শেষ বিবাহের প্রথমা পত্নী যখন পাটরাণীর পদে উন্নীত হইলেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান বৃদ্ধা মহারাণী সম্রাট শিয়েন কেংএর পঞ্চমা পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

ইঁহার বিবাহের দুই বৎসর পর ইহাঁর এক পুত্র জন্মে এবং এই পুত্রের জন্মের পাঁচ বৎসর পর সম্রাট শিয়েন কেংএর মৃত্যু হয়। সম্রাটের মৃত্যু হইলে পর এই বৃদ্ধা মহারাণীর পুত্র টুংচি সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শিশুসম্রাট টুংচির তরুণবয়স্কা জননী এবং তাঁহার পিতার প্রথমা পত্নী বা পাটরাণী একত্র যোগে সম্রাটমাতা (Empress Dowager) নামে অভিহিত হইয়া তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। বালকসম্রাটের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইয়া একজন পূর্ব্ব প্রাসাদের (East Palace) এবং আর একজন পশ্চিম প্রাসাদের (West Palace) সম্রাটমাতা আখ্যা গ্রহণ করিলেন। এবং উভয়েই তুল্য ক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া তুল্যভাবে একযোগে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী সম্রাট শিয়েন কেংএর পাটরাণী ছিলেন। এবং পশ্চিম প্রাসাদের সম্রাজ্ঞীই বর্ত্তমান বৃদ্ধা মহারাণী যিনি এখনও সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের ভাগ্য-পরিচালক। ইঁহার নাম "জে-শি" (Fze-Hsi)। পূর্ব্ব প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী সাহিত্যে অতি সুপণ্ডিতা ছিলেন কিন্তু পশ্চিম প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী বা বর্ত্তমান মহারাণী শাসনকার্য্যে

* ইহারাও একপ্রকার বিবাহিতা স্ত্রী, Secondary wife। পাট-রাণীর নিম্নে ইহাঁদের স্থান।

অতি দক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। এই দুই মহারাণীর পরস্পরের গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সম্রাট শিয়েন কেংএর জীবিত কালেই হউক, বা তাহার মৃত্যুর পর বালকসম্রাট টুংছির অভিভাবক রূপেই হউক, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অতি সদ্ভাব ছিল। সেই সদ্ভাবের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৮৮১ খৃঃ, পূর্ব্ব প্রাসাদের মহারাণীর মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান মহারাণী তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বালক সম্রাট টুংছি সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে চীন সাম্রাজ্যে নানা বিপদ ও অশান্তি চলিতেছে। টা পেইং বিদ্রোহের সময় ইউরোপীয় সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া সম্রাট শিয়েন কেং পেকিং হইতে জেলে নামক স্থানে গমন করেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে চীনের বড় বিপদের সময় গিয়াছে। বিদেশী রাজগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল কেবল সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করিত। রাজধানী পেকিন হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, বিদেশীকে ঘৃণাকারী কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী ঘোষণা করিল যে "আমরাই বালক সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছি।" যদি এই উভয় রাণী বালক সম্রাটের পক্ষ হইয়া এই রাজকর্ম্মচারীর দলে যোগ দিতেন, তাহা হইলে রাজ্যে ভয়ানক বিপদ ও অরাজকতা উপস্থিত হইত। কারণ এই বিদেশী-দ্বেষিগণ কখনই পেকিনস্থ বিদেশী রাজদূতগণের সঙ্গে এক মত হইয়া কার্য্য চালাইতে পারিত না। রাজ্যশাসনের ভার যাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এই পবিত্র আসনে উপবিষ্ট বালকসম্রাট ও তাঁহার অভিভাবক দুই মহারাণীর পক্ষ হইয়া যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। উভয় দলের প্রধান দলপতিগণ আসিয়া রাজদরবারে আপনাপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তখন বর্ত্তমান মহারাণী অল্পবয়স্কা ছিলেন, রাজ্য সংক্রান্ত কিছুই জানিতেন না বা বুঝিতেন না। রাজপুরীর বাহিরে কি কি ঘটনা ঘটিত তাহার সংবাদও রাখিতেন না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা, ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি কিংকর্ত্তব্য, কোন্ দলের মত গ্রহণীয়, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদেশী-দ্রোহীদিগকে ভৎর্সনা করিলেন এবং প্রিন্স ফুংএর পক্ষ সমর্থন করিলেন। তখন প্রিন্স ফুং চীনদেশে শাসন ও সমাজ সংস্কারের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ইনি বিদেশীদ্রোহী ছিলেন না। প্রিন্স ফুং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

এই অল্পবয়স্কা মহারাণীর সর্ব্বপ্রথম এই রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার যশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতাগণ প্রকৃত পন্থা বুঝিতে পারিলেন। গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মেম্বরগণ এবং রাজপরিবারের প্রিন্স বা কুমারগণ এই নবীনা রাণীর বুদ্ধির ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সুখে ও দুঃখে আজীবন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অমাত্যবর্গ ও পারিষদগণের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিলে সাম্রাজ্যের কি শুভ ফল হয় ও কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়।

এই দুই মহারাণী অসামান্য রাজনৈতিক বুদ্ধি ও শাসন কার্য্যে দক্ষতা দ্বারা বালক টুংছিকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া যখন টুংছি অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার হস্তে রাজ্যের ভার দিয়া নিজেরা অবসর গ্রহণ করিলেন। এই কাল মধ্যে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া রাজ্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল।

কিন্তু এই দুই রাণীর ভাগ্যে অধিক দিন অবসর ঘটিল না। সম্রাট টুংছি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাহার দুই বৎসর পরেই অর্থাৎ বিংশ বৎসর বয়সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এই সাংঘাতিক পুত্রশোকে পশ্চিম প্রাসাদের বর্ত্তমান বৃদ্ধা-রাণী প্রাণে বজ্রসম আঘাত পাইলেন এবং শোকে ম্রিয়মানা হইলেন; কিন্তু অল্পকাল শোকদুঃখে মগ্ন থাকিয়া পুনরায় রাজ্যশাসনের ভার নিজহস্তে লইলেন। রাজমাতাদ্বয় বর্ত্তমান সম্রাট কোয়াংশিকে পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে সিংহাসনে বসাইয়া পুনরায় এই বালক সম্রাটকে রাজ্যশাসনের উপযোগী করিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান সম্রাট বর্ত্তমান মহারাণীর দেবর ও ভগ্নীপুত্র।

বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী রাজ্যশাসনের ভার লওয়া অবধি

চীন সাম্রাজ্য সংক্রান্ত ঘটনা সকল বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার শাসনক্ষমতা ও দুরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহস্রোত প্রবল-বেগে বহিতে লাগিল, তখন তিনি চীন-তরণীর কর্ণধার হইয়া দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্য দিয়া তাহা চালাইতে লাগি-লেন। যেমন একদিকে জলমগ্ন পাহাড় এবং অপরদিকে ভয়ানক জলাবর্ত্ত থাকিলে এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তরণী চালাইতে হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের আশঙ্কা করিতে হয়, সেই সময়ে এই মহারাণীর পক্ষে চীন-রাজ্য-তরণী চালানও তাদৃশ ভয়াবহ কার্য্য হইয়াছিল। যদিও তিনি সময় সময় তাঁহার তরণীকে পাহাড়সংঘর্ষে লইয়া গিয়া-ছিলেন, সে কেবল জলাবর্ত্ত পরিহার করিবার জন্য। তথাপি তাঁহার রাজনৈতিক গতি "মিতভাবে" (moderate) ছিল। চীন সাম্রাজ্য বহু শতাব্দী হইতে বিদেশী রাজগণের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজ-নৈতিকগণ বিদেশিগণের সঙ্গে কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয়, বর্ত্তমান কালে অপর রাজ্য সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে কি প্রকার রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, সময় সময় ভয়ানক ভ্রম করিয়াছিলেন। বিদেশিগণের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক সময়ে আহম্মকীর পরিচয় দিলেও কেবল কপটতাচরণ দ্বারা (duplicity) চীন এ যাবৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছেন। মহারাণী নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে এই উপায় ভিন্ন ইউরোপীয়গণের হস্ত হইতে রক্ষার অন্য উপায় নাই।

১৮৮৯ খৃঃ অষ্টবিংশ বর্ষ রাজ্যশাসন করার পর সম্রাজ্ঞী রাজ্যশাসনদণ্ড বর্ত্তমান সম্রাট কোয়াংশের হস্তে অর্পণ করেন। এই সময় এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শান্তি ও সুখভোগ করিতেছিল। বিদেশিগণের জন্য বাণিজ্যবন্দর মুক্ত হইল এবং রাজ্যে কাষ্টম হাউস বা বাণিজ্য শুল্ক-আদায়-বিভাগ স্থাপিত হইল।

সম্রাট কোয়াংশুর রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শানুযায়ী এবং বৃদ্ধারাণীর "সাম্য" নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এ যাবৎ বোধ হইয়াছিল যে তাঁহার নিজের বিশেষ কোন একটা মত নাই এবং রাজ্যের উন্নতি-কল্পে তাঁহার কোন চেষ্টা নাই। ১৮৯৪ খৃঃ কোরিয়ার উপর প্রভুত্ব লইয়া জাপানের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হয়, তাহাতেও তিনি বিশেষ কোন খেয়াল করেন নাই। কিন্তু জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল। কারণ এ যাবৎ চীনারা জাপানীদিগকে কোন একটা বিশেষ জাতির মধ্যেই গণ্য করিত না। চীনারা মনে করিত যে জাপানীগণ চীন হইতে সাহিত্য, শিল্প ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রণালী ধার করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা কেবল একটা অনুকরণশীল জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানের জয়ে চীন আপন দুর্গতি বুঝিতে পারিল এবং সেই হইতে নিজেরা জাগ্রত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সম্রাট কোয়াংশি জাপানের বিজয়ে নিজেদের দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিয়া ঘৃণায় অধীর হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে জাপানীরা যে চীনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে, তাহা কেবল বিদেশী সভ্যতা ও যুদ্ধবিদ্যা অনুকরণ করিয়া। তিনি সেই জন্য যত শীঘ্র সম্ভব আপন সাম্রাজ্যের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে তিনি উন্নতির পথে ধাবিত করিতে পারিবেন। এই আশায় রাজ্যের সমস্ত বিভাগের আমূল সংস্কারকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বৃদ্ধারাণীর কর্ত্তৃত্ব না মানিয়া কতকগুলি পারিষদ পরি-বেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার নূতন বিষয় প্রচলনের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার সংস্কারকার্য্য এত দ্রুতগতিতে আরম্ভ করিলেন যে, মনে করিলেন যে অতি সত্বরই এই রক্ষণশীল জাতি উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। রক্ষণশীল দলের কতকগুলি লোক উন্নতিশীলগণের ন্যায় আরো কতকগুলি নূতন বিষয়ের সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংস্কার কার্য্যের প্রস্তাব করিলেন। ইঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি সম্রাজ্ঞীর "সাম্য" নীতির পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন। মূল কথা যাহার যাহা ইচ্ছা সেই সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এক গোলযোগ উপস্থিত করিল। ক্রমে রাজ্যে প্রধান দুই দলের সৃষ্টি হইয়া উন্নতিশীল দল বৃদ্ধারাণীর "সাম্য" নীতি পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়া সম্রাটকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে "ঐ নীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল উহাদ্বারা কোন



জামনগরের জামসাহেব

(কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহজী)

উন্নতির আশা নাই।" অপর পক্ষ অর্থাৎ রক্ষণশীলদল সম্রাটকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে "সাম্য" নীতি রাজ্যের প্রকৃত মঙ্গলের পন্থা, তাহা পরিত্যাগ করিলে রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে। কারণ উন্নতিশীলগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা উন্নতির পক্ষে অতি দ্রুত গতি। এই দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মতের সংঘর্ষে সম্রাটের শাসননীতি যেন চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তখন রাজ্যের আর একদল লোক ভবিষ্যদ্বিপদ গণিয়া বৃদ্ধা রাণীর শরণাপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার নিজ হস্তে শাসনদণ্ড চালনা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি পুনর্ব্বার শাসন কার্য্যের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলে রাজ্যের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি পাইবে এরূপ ভাবও প্রকাশ করা হইল। সম্রাজ্ঞী এই তৃতীয় পক্ষের প্রস্তাব স্বহস্তে পাইয়া নিজে পুনরায় রাজকার্য্য চালাইতে সম্মত হইলেন এবং সম্রাট বাধ্য হইয়া বৃদ্ধারাণীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। অতঃপর সম্রাট এক ঘোষণাপত্রদ্বারা প্রচার করিলেন যে "রাজমাতা বৃদ্ধারাণী পূর্ব্বে মহা বিপদের সময় দুইবার নিজ হস্তে অতি দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এখন পুনরায় নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলেন তাহা রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই। আমি তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলাম এবং আমি এ বিষয়ে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়াছি।" সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার হস্ত হইতে ক্ষমতা অপসরণ করা হইল। তিনি বৃদ্ধারাণীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী যে বিষয়ে অনুমতি দিবেন না তিনি তাহা করিতে পারিবেন না। এই ঘটনাকে সাহেবরা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Coupe detat বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সম্রাজ্ঞী উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় দলের কর্ম্মচারিগণকে স্বার্থান্বেষী মনে করিয়া কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিলেন।

যে সকল সংস্কারপ্রার্থী উন্নতিশীলগণ ধৃত হইল তাহাদিগকে সরাসরি বিচার করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে তাহারো প্রাণদণ্ড করিলেন, কাহাকেও বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইলেন এবং কাহারো কাহারো বা অতি নিষ্ঠুরতার সহিত শাস্তি বিধান করা হইল। সম্রাটের শিক্ষক একজন উন্নতিশীল দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া, তাঁহার প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন। কারণ শিক্ষক পিতৃস্থানীয়। সেইজন্য সম্রাটের শিক্ষক কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় না। সম্রাজ্ঞী ও "সাম্য"বাদিগণের এই ভাব উন্নতির বিরুদ্ধ পথ; বিদেশীগণ উন্নতিশিলগণেব প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন বৃদ্ধারাণীর এই ভাব বিদেশীবিদ্বেষসূচক।

কেহ কেহ মনে করেন "কোয়াং-ইউ-ওয়েই" প্রমুখ স্বার্থান্বেষী সংস্কারকগণের মতে চলিয়া রাজ্যসংস্কারকার্য্য দ্রুতগতিতে চলিলে রক্ষণশীল চীনজাতির মধ্যে অন্তর্ব্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইবে। কিন্তু আমার নিকট একথা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরবর্ত্তী ঘটনা সকল দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। সেই সময়ে যদি সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইত তাহা হইলে হয়তঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ সংঘটিত হইত না। কেন না এই সময় টুকুর মাঝে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা উন্নত হইতে পারিত।

তখন যে যে প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্য রাজ্যে বিপদ আশঙ্কা করা হইতেছিল, সেই সেই সংস্কার রুশ জাপান যুদ্ধের পর অতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী নিজেও যে ভ্রম বুঝিতে না পারিয়াছেন এমন নহে। তাই তিনি এখন বিদেশীদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশিগণের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামলাল সরকার।

মণিমঞ্জীর।

(প্রবেশক।)

পঞ্চনদের কেকয় রাজ্যে বসন্তোৎসবের মহা ঘটা লাগিয়াগিয়াছে বিপাশার তটাবস্থিত পুরোপকণ্ঠোপবন মকরন্দোদ্যানে উদ্যোগ আয়োজনের সীমা নাই। পুষ্পপল্লবশোভিত উদ্যানতোরণে বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত চীনাংশুক-কেতু মন্দবাতান্দোলিত

হইয়া কুঙ্কুমানুলিপ্ত রমণীহস্তসঙ্কেতের মত সবিলাস লীলা-সহকারে নাগরিকদিগকে উৎসবমেলায় আহ্বান করিতেছে। ধারাযন্ত্রে শীতল সলিল উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে; শৃঙ্গারক যন্ত্রে ধরাতল সুগন্ধি সলিলাবসিক্ত করা হইয়াছে।

রাজ্যের যাবতীয় অভিজাতা মহিলা মদনমহোৎসবে আনন্দ করিতে একত্র হইয়াছে। কুসুম্ভকুসুমরঞ্জিত, কালাগুরুগন্ধামোদিতবসনপরিহিতা হইয়া, মুখে শুভ্রলোধ্র-রেণু মাখিয়া, গণ্ডে, বক্ষে কুঙ্কুমচন্দনের বিচিত্র কারুচিত্রিত পত্রলেখা রচনা করিয়া, পুষ্পপ্রসাধনভূয়িষ্ঠা মহিলারা ভূষণ-শিঞ্জনে পুষ্পৎপদ্মপরাগরঞ্জিতবপু ভ্রমরদলের মত কাননটিকে মধুর নিক্বণ-নন্দিত করিয়া দলে দলে ছায়াশীতল নদীতটে বা ধারাযন্ত্রের সান্নিধ্যে শীকরশীতল বায়ু সেবন করিয়া ফিরিতেছে। ক্রীড়া-শৈলের পাদমূলে কেহ নাচিতেছে, কেহ বা দ্বিপদীখণ্ড বা চর্চ্চরী রাগিণীতে মদনমনোহরের স্তুতি গান করিতেছে। বেণুবীণার মধুর সঙ্গীতে কেহ বা সমগ্র কানন পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

স্বয়ং রাণী ত্রপিষ্ঠা শুকপক্ষচ্ছবি বসন ও পুষ্পকাঞ্চি, পুষ্পমেখলা, পুষ্পহার, কেয়ূর, বলয়, নুপুর পরিয়া, বর্ণে, গন্ধে বিচিত্র হইয়া ফুলরাণীর মত অশোকবকুলের দোহদ সংস্কার করিতে আসিয়াছেন। শত-সখী-সঙ্গে আজ তিনি উৎসবমত্তা। সখীদের কাহারো কর্ণে কর্ণিকার, কাহারো শিরীষ, কাহারো চূতমঞ্জরী; সকলের হস্তে লীলাকমল; বিবিধ বর্ণরঞ্জিত গন্ধানুলিপ্ত চলচেলাঞ্চলে হংসমিথুন অঙ্কিত।

বর্ণগন্ধগানে আনন্দোৎফুল্ল মকরন্দোদ্যানে প্রসক্তভৃঙ্গাবলি, অলিশ্যামলিতোদরশ্রী, পল্লবরাগচ্ছুরিত ঘনচ্ছায়, কৃতদোহদ অশোকতরুমূলে তিনটি মহিলা বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহাদের অশোকের দীপ্ত লালিমা ও বকুলের মৃদু গন্ধ জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতেছিল। ইহারা মাধবিকা মালবিকা ও বাসন্তিকা;—সকলেই ধনীর পত্নী।

মাধবিকা বুদ্ধিজীবী মণিভদ্রের, মালবিকা ভ্রষ্টচরিত্র নন্দকের এবং বাসন্তিকা তরুণীভার্য্যার চারিত্রসন্দিগ্ধ বৃদ্ধ নৃসোমের পত্নী। ইহারা উৎসবশ্রান্ত হইয়া অশোককুঞ্জে নবোদ্গত-শ্যামশষ্পশয্যায় বসিয়া আপনাদের সুখদুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া চিত্তভার লঘু করিতেছিল। কথা-বার্ত্তার মধ্যে তির্য্যগাবর্ত্তিত-কন্ধরা বাসন্তিকা সহসা বলিয়া উঠিল 'দেখ সখি, দেখ, কৃতদোহদ অশোকমূলে কি একটা জ্বলিতেছে।' অপরা সখীদ্বয় তাহার নির্দ্দেশানুসারে সেই দিকে দেখিল। মালবিকা বলিল, 'হলা, ওটা বোধ হয় কাহারো স্খলিত রত্নাভরণ। হলা সখি মাধবিকা, তুই কি বলিস?' মাধবিকা কিছু বলিল না, উঠিয়া গিয়া বক্ষ্যমাণ বস্তু উঠাইয়া লইল। শষ্পসংচ্ছাদিত বস্তু প্রকাশিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল উহা একখানি মণিমঞ্জীর। মঞ্জীরমাণিক্যময়ূখমঞ্জরীসৌন্দর্য্যমুগ্ধা মহিলাত্রয় উহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। ভূষণপ্রিয়তা রমণীর সাধারণ স্বভাব। বাসন্তিকা বলিল 'আমি উহা প্রথম দেখিয়াছি, উহা আমার, আমায় দেও।' মালবিকা বলিল, 'বাঃ, তা কেন? আমিই প্রথম উহা রত্নাভরণ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি; উহা আমার প্রাপ্য, আমায় দেও।' মাধবিকা কহিল, 'ইহা কাহারো নহে, আমার। আমি ইহা সর্ব্বপ্রথম হস্তগত করিয়াছি; আমি ইহা কাহাকেও দিব না।' ক্রমশ বিতণ্ডা উষ্ণতর হইতে লাগিল কিন্তু সমস্যা মীমাংসিত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মাধবিকা কহিল, 'বিবাদে মীমাংসা অসম্ভব। নিঃস্বার্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা ভিন্ন এ বিবাদ মীমাংসিত হইবে না। ঐ রাণী ত্রপিষ্ঠা এ দিকে আসিতে-ছেন। এস, তাঁহারই উপর বিচারের ভার দেওয়া যাক।' এই সাধু প্রস্তাবে সকলে সন্তুষ্ট ও সম্মত হইল। তাহারা রাণীর নিকটে গিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া ঘটনা বিবৃত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল।

ঈষৎ-স্মিত-ক্ষালিত-সৃক্কভাগা রাণী উদ্গতপ্রবালকান্তি-করপল্লবে মণিমঞ্জীর খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'বর্ত্তমান অবস্থায় মীমাংসা অসম্ভব। এই পণ নির্দ্দিষ্ট হৌক,—যে আপনার স্বামীকে যথেষ্ট পরিহাস করিয়া তাঁহার চরিত্রগত বিশেষ দোষ সংশোধন করিতে পারিবে, এই মণিমঞ্জীর তাহারই হইবে'। সকলে সম্মত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। এবং কি উপায়ে স্বামীকে পরিহাস করা যাইতে পারে, ইহার চিন্তায় তাহাদের মস্তিষ্ক সঙ্কুক্ষিত হইয়া উঠিল।

মাধবিকার চেষ্টা।

কেকয় রাজ্যের প্রধান জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট মাধবিকার প্রতিবেশী ছিল। মাধবিকা তাহার সাহায্য-গ্রহণ উপযুক্ত মনে করিয়া, তাহাকে সকল কথা জানাইয়া বুদ্ধি ও পরামর্শ

প্রার্থনা করিল। পরামর্শ স্থির হইয়া গেল; গুপ্ত পরামর্শ মাধবিকার সখী ও নিতান্ত আত্মীয় কয়েকব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ জানিল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে কুসীদিক মণিভদ্র গৃহে আসিতেছে, পথে তাহার সহিত কঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎ হইল। কঙ্কটভট্ট মণিভদ্রকে যেন না চিনিয়াই চলিয়া যাইতেছিল; মণিভদ্র নমস্কার করিয়া কহিল, 'ভট্টজী, তাড়াতাড়ি কোথায়?'

কঙ্কটভট্ট মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া চমকিত হইয়া বলিল, 'কে মণিভদ্র না কি? আমি তোমাকে চিনিতেই পারি নাই। তোমার মুখ এমন মলিন ও ক্লিষ্ট বোধ হইতেছে কেন? কোন পীড়া হইয়াছে কি?'

মণিভদ্র উত্তর করিল "কৈ না, কোন পীড়া ত' হয় নাই। আজ প্রাতঃকাল হইতেই তহবিল মিলাইতেছিলাম; অর্দ্ধ পয়সার গরমিল কিছুতেই মিলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। অধিকন্তু 'গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকোসম্ভাতঃ',—একজন অধমর্ণ —সেটা বাস্তবিকই নিতান্ত অধম—এক শত টাকার বাৎসরিক সুদ চতুর্বিংশতি মুদ্রার অধিক কিছুতেই দিল না; চক্রবৃদ্ধি হারে কুসীদ না দেওয়াতে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, আমাকে মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিতেছ।"

জ্যোতিষী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ক্লিষ্ট হওয়ার ঐ কারণ হইলে সুখী হইতাম; কিন্তু আমি দেখিতেছি, শনি, রাহু, কেতু ও মঙ্গল এই পাপ গ্রহচতুষ্টয় একযোগে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ঐ গ্রহচতুষ্টয়ের শান্তি না করিলে, কালই বৈকাল বেলা তোমার মৃত্যু হইবে ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস তোমার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।'

প্রসিদ্ধ অব্যর্থগণকের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মণিভদ্রের মুখ শুষ্ক, জিহ্বা রসশূন্য, পদ প্রকম্পিত ও হৃদয় গুরুস্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থনাশ দ্বারা প্রাণরক্ষার জন্য গ্রহচতুষ্টয়ের শান্তি করা সে ভাল মনে করিল না। জ্যোতিষীকে বলিল 'ভাল, বিবেচনা করিয়া দেখি।' গৃহে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সে দশবার আপনার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল। একবার মনে হইতেছে, নাড়ী দ্রুতগতিতে প্রবাহিত; পরবার মনে হইল, ঠিক কিঞ্চিলিক-গতি; আর বার মনে হইতে লাগিল, নাড়ী অপ্রাপ্য। নাড়ী-বিজ্ঞানের যাবতীয় মৃত্যুলক্ষণ সে আপনার নাড়ীতে প্রকাশমান দেখিতে লাগিল।

সংশয়াকুল দোলায়মান চিত্তে গৃহে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'একি! তোমার কি পীড়া হইয়াছে! এ কি তুমি এমন পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছ কেন?' মণিভদ্র অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া বলিল, 'নাঃ কিছু না। বোধ হয় শ্রমক্লান্তবিপাণ্ডুগণ্ড হইয়াছি।' মাধবিকা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বলিল, 'না গো না, তোমার নিশ্চয় অসুখ করেছে। চিকিৎসক ডাকা উচিত।' চিকিৎসকের নাম শুনিয়া অর্থনাশভীত মণিভদ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'না, না, না, চিকিৎসক ডাকার আবশ্যক নাই। আমার কিছু হয় নাই গো ভয় নাই।' মাধবিকা উচ্ছ্বসিত-ক্রন্দনরোধহেতুক অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'না গো না; তুমি হয় ত' বুঝিতে পারিতেছ না; তোমার নিশ্চয় বিষম ব্যাধি হইয়াছে। তাই মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে। তোমার মুখখানা দর্পণে দেখ দেখি।' এই বলিয়া সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিল; তাহাতে আপনার ভয়বিহ্বল ম্লান মূর্ত্তি দেখিয়া মণিভদ্র চমকিত হইয়া অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তখন মাধবিকা দর্পণখানাকে আছড়াইয়া ফেলিয়া শত খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং উরঃশিরস্তাড়না করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পত্নীর এই প্রণয়পরিচয় পাইয়া মণিভদ্র বোধ হয় কিছু হৃষ্ট হইয়া তাহার নষ্ট প্রফুল্লতা উদ্ধার করিতেছিল, এমন সময় মাধবিকা তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল, 'মঞ্জুলিকে, যা ত' বৈদ্যরাজ চক্রদত্তকে ডাকিয়া শীঘ্র লইয়া আয়।'

নগরের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য চক্রদত্তকে ডাকিবার প্রস্তাব শুনিয়া অর্থনাশশঙ্কী মণিভদ্র একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মঞ্জুলিকাকে বাধা দিবার অগ্রেই সেই সর্ব্বশুভহন্ত্রী, দগ্ধাননা দাসীপুত্রী উধাও হইয়া চলিয়া গেল। মণিভদ্রের নিকট এই সর্ব্বনাশ অপেক্ষা নির্বিরোধে মৃত্যুও শ্লাঘ্য, শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বোধ হইতেছিল।

বৈদ্যশ্রেষ্ঠ চক্রদত্ত আসিলেন, গম্ভীরভাবে তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে কিঞ্চিত্তিরশ্চীনবিলোলমৌলি বৈদ্যরাজ বলিলেন—

"'স্থিতা নাড়ীমুখে যস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য, দ্বিতীয়ে মরণং ধ্রুবম্ ॥'
কল্য ইঁহার মৃত্যু নিশ্চিত ; অতএব ঔষধ প্রয়োগ বিফল।"

বৈদ্যরাজ চক্রদত্ত নিষ্ক্রয়নিষ্কচতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে, অর্থনাশশোককাতর হতাশজীবিত মণিভদ্র একেবারে শুইয়া পড়িল। মাধবিকা মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ;—সে লুণ্ঠন ক্রন্দন-জন্য বা হাস্যহেতুক তাহা সে এবং অন্তর্য্যামী ভিন্ন সঠিক কেহ জানে না।

কথঞ্চিৎ সংবৃতশোকা মাধবিকা স্বামীর শেষ আহারের জন্য নানাবিধ পিষ্টক পায়স প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে খাইতে দিল, পুনরায় অনর্থক অর্থ নাশ দেখিয়া মণিভদ্র খেদে, ক্ষোভে খাদ্য স্পর্শ করিল না।

দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মণিভদ্র শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি শুধু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা-বেশ হইতেই স্বপ্ন দেখিল—যেন সে নরকের ভয়াকুল প্রকোষ্ঠে বসিয়া পরপীড়নসঞ্চিত দীপ্তানলসংপ্রেক্ষ্য মুদ্রা গণিতেছে,—সেই মুদ্রাগুলি স্বর্ণকান্তি অগ্নিখণ্ড ; হাতে লইতেই জ্বালায় অস্থির হইয়া ফেলিয়া দিতেছে ; আর অমনি এক বিকটদংষ্ট্র যমদূত বহ্নিশিখার কশা লইয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে ; এবং সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক চীৎকারে তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। পার্শ্বশয়ানা পত্নী আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মণিভদ্র বলিল, 'কিছু নহে স্বপ্ন'। মাধবিকা কপালে করা-ঘাত করিয়া কহিল, 'হায় হায়, স্বপ্ন নহে গো স্বপ্ন নহে ; এ যে দেখিতেছি ঘোর বিকার—সান্নিপাতিক'।

মণিভদ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনার নাড়ী দেখিল, কিছু ঠিক করিতে পারিল না। ভোরের শীতল বাতাসে তাহার কিন্তু বেশ স্বস্থ বোধ হইতেছিল। সমস্ত দিন এইরূপ সন্দেহে, ভয়ে কাটিয়া গেল। যখন বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল তখন জ্যোতিষীর ও বৈদ্যরাজের ভবিষ্যবাণী তাহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সে তাড়াতাড়ি আপনার বাণিজ্য স্থানে চলিয়া গেল।

সে মনে করিল মুদ্রার মনোহররূপে সকল যন্ত্রণা নিমজ্জিত করিয়া দিবে ; কিন্তু সমস্ত দিনের অনাহারে উদ্বেগে উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। অতি কষ্টে আপনাকে টানিতে টানিতে কর্ম্মস্থলে সন্ধ্যার সময় উপনীত হইল। সন্ধ্যা হইল তবু মরিল না দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইতেছিল, কিন্তু হায়, বিধিবিড়ম্বনা! সে আপন বিপণিতে উপস্থিত হইবা মাত্র দ্বারবান দ্বার ছাড়িয়া, ভৃত্য গৃহমার্জ্জন অসমাপ্ত রাখিয়া, লেখক কর্ম্মচারী তাহাদের লেখ্য-লেখনী ফেলিয়া, মহা চীৎকার করিতে করিতে অতি ভীতভাবে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে যত তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য ডাকে, তাহারা তত ভীত হইয়া দৌড়ায়। অবশেষে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন বিস্ময় ও বিরক্তিতে মুহ্যমান মণিভদ্র লৌহ মঞ্জুষা-গুলির তালককুঞ্চিকা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সকল গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া উদ্ঘাটিনী কুঞ্চিকা সকল কটিবন্ধে সন্নদ্ধ করিয়া অনিশ্চিত ব্যাকুলচিত্তে আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে দেখিল বৈদ্য চক্রদত্ত এবং জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট কথোপকথন করিতেছে। কোপপ্রজ্বলিত মণিভদ্র তাহাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া যেমন পাশ কাটাইয়া যাইবে, অমনি শুনিল, বৈদ্য চক্রদত্ত বলিতেছে—

"অহো 'লিপির্-ললাটন্তপ-নিষ্ঠুরাক্ষরা'—এমন সহসা মণিভদ্র মৃত্যুকবলিত হইল? কাল আমি যখন আহূত হইয়াছিলাম, তখন একেবারে শেষাবস্থা ; ধন্বন্তরির অসাধ্য রোগ! আহা, লোকটি অর্থকামুকতার জন্যই মারা গেল ; পূর্ব্বাহ্নে চেষ্টা করিলে কি হইত বলা যায় না।"

মণিভদ্র ইহা শুনিয়া প্রথমত স্তম্ভিত হইল। কিন্তু পরে মনে করিল, এই প্রসঙ্গপাত্র সমাননামা আর কেহ। কিন্তু আবার শুনিল যে, জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট বলিতেছে—"কবি বলিয়াছেন, 'লিপির্-ন দৈবী সুপঠা ভুবীতি'। কিন্তু দেবগুরুপ্রসাদে বৈধসীলিপি পাঠ করিবার ক্ষমতা আমার আছে। অর্থকামুকতা ত্যাগ করিয়া যদি বিরুদ্ধ গ্রহচতুষ্টয়ের শান্তি করিত, তবে বেচারা হয়ত' বাঁচিতে পারিত"।

এখন মণিভদ্রের আর সন্দেহ রহিল না যে প্রসঙ্গপাত্র সে স্বয়ং। সে তবু বিমূঢ়ভাবে তাহাদের নিকটে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইতেই, তাহারা সঙ্কটা ও রাম-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে পলায়ন করিল।

অগত্যা গৃহাভিমুখেই চলিল। পথে নৈশবিহার প্রস্থিত নন্দকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পথে মৃতশ্রুতি মণিভদ্রকে দেখিয়া 'দোহাই মণিভদ্র, ভূত হইয়া আমায় দেখা দিও না; আমায় ক্ষমা কর; তোমার ঋণ আমি হয় তোমার স্ত্রীকে দিয়া, না হয় গয়াক্ষেত্রে তোমার পিণ্ড দিয়া পরিশোধ করিব'—বলিতে বলিতে দৌড়িয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অশুভদর্শী নন্দক সে রজনীতে রভসোৎসবে যাইতে বাধা পাইয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইল।

মণিভদ্র অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া আপনার গৃহাভিমুখে চলিল। তাহার মস্তিষ্ক সূত্রহারা চিন্তাবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—

'হায়, কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া কোন অত্যহিত আসিয়া উপস্থিত হইল? আমি কি সত্যই মৃত? একজন না হয় দু'জন মিথ্যা বলিতে পারে; কিন্তু আমার পরিচিত সকলে এবং অপরিচিত অনেকে আমাকে দেখিয়া পলায়নপর হইতেছে কেন? তবে কি আমি ভূত হইয়াছি? যাহারা পলাইতেছে তাহাদের নিকট আমি সপ্রকাশ, এবং যাহারা পলাইতেছে না তাহাদের নিকট আমি বোধহয় অদৃশ্য থাকিতেছি। তবে আমি নিশ্চয় মৃত, নিশ্চয় ভূত! কাল সেই নরকের জ্বালাময়, পূতিগন্ধময়, ঘরে ছিলাম; আজ কি বেড়াইবার ছুটি পাইয়াছি, না, আমি পাঠশালা-পালান ছেলের মত পলাইয়া আসিয়াছি। ওঃ সেই বহ্নিকশা! মনে করিতে গা শিহরিয়া উঠিতেছে। যাক সে চিন্তা। যে রকমেই হোক যখন পৃথিবীতে আসিয়াছি, একবার বাড়ীটা দেখিয়া যাইতে হইবে।'

বুদ্ধিভ্রষ্ট মণিভদ্র আপনার গৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহদ্বারে জলপূর্ণ মৃৎকলস, অগ্নি, গোময়, নিম্বপত্র প্রভৃতি সদ্য মৃত্যুচিহ্ন সকল রহিয়াছে। তখন সে ভাবিতে লাগিল,—'কে আমি? কোথায় আমি? কি অবস্থায় আছি? জীবিত না মৃত? এই ত' আমার স্থূল দেহ স্পর্শ করিতেছি, এই ত শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতেছি, এই ত' নখপীড়নে ব্যথা বোধ করিতেছি। প্রেতাবস্থায়ও কি এই সব অনুভূতি থাকে? আমি ত' আপনাতে আপনি কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু বাহিরে ত' যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এই ত' আমার ময়ূরশুকচিহ্নিত গৃহ। কিন্তু এ গৃহে মরিল কে? আমি? কবে? কখন? আমি কি আমার প্রেতাত্মা? আমি এই পৃথিবীর জন সমাজের কেহ নহি? আমি যদি কায়া নহি, ছায়া; আমি যদি মানুষ নহি, প্রেত; তবে আবার আমি ভয়রূপে, অকল্যাণরূপে মানুষের মধ্যে কেন? মৃত্যুর কৃষ্ণকঠিন প্রাচীর যদি আমাকে জীবিতলোকের সহিত সম্পর্কবিরহিত করিয়াছে, তবে বুঝিতে পারি না কোন্ পাপে যমদূতগুলা আমাকে সংসারের মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া গেল? প্রেতলোক কোথায়, কোন পথে? আমাকে সেখানে কে লইয়া যাইবে, সেখানে আমায় একটু স্থান দিয়া কে নিশ্চিন্ত করিবে? জীবরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত, প্রেতলোক হইতেও বিতাড়িত, ত্রিশঙ্কুর মত আমার একটুকু স্থান কি কোথাও নাই?'

এইরূপ অনন্ত প্রশ্নে, অবিশ্রাম চিন্তায় মণিভদ্র ক্লান্ত হইয়া যন্ত্রচালিতের মত রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। গৃহমধ্যে মঞ্জুলিকার কাংস্যকণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'আ মর, কেরে মিন্‌সে, চোখের মাথা খেয়ে সন্ধ্যেবেলা বিরক্ত কর্‌তে এলি? দেখ্‌ছিস্ না গৃহে অশৌচচিহ্ন; আমার প্রভু বুদ্ধিজীবী মণিভদ্র সদ্য প্রাণত্যাগ করেছেন, কর্ত্রী ঠাকুরাণী, শোকে মূর্চ্ছিতা; বেরো বেরো, দূর হ', বিরক্ত করিস নে।'

এই বাক্যে অধিকতর অস্থির হইয়া ভয়প্রকম্পহস্তে দ্বারে আর বার আঘাত করিয়া বলিল 'মঞ্জুলিকে—একবার দ্বার খোল, একবার তোমাদের দেখিয়া যাই। এবার প্রেতলোকে গেলে পুনরায় পৃথিবী পর্য্যটনের ছুটি নাও পাইতে পারি।'

'তুই কে রে [illegible]ানন, দাঁড়া ত' সম্মার্জ্জনী সম্বর্দ্ধনা করি।' বলিয়া মঞ্জুলিকা দ্বার খুলিয়াই মণিভদ্রকে দেখিয়াই বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

সেই চীৎকার ও পতন শব্দে আকৃষ্টা হইয়া সদ্য বিধবাবেশা শরীরিনী শোকমূর্ত্তির মত মাধবিকা উপস্থিত হইল। সেও মণিভদ্রকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ক্লান্ত মণিভদ্রের মনে আর দ্বিধা সংশয় রহিল না। 'তবে আমি নিশ্চয় মৃত, আমি আমার প্রেতাত্মা, আমি ভয়ঙ্কর, আমি অমঙ্গল!' বলিয়া ক্ষুধাউদ্বেগ-ক্লান্তি-ভয়োদ্বেজিত মণিভদ্রও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তাহাকে পড়িতে দেখিয়াই মাধবিকা ও মঞ্জুলিকা ঝটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরিচারিকাগণ সাহায্যে তাহাকে উঠাইয়া, তাহার উত্তরীয় ও অঙ্গরক্ষা উন্মোচন করিয়া শয্যায় শায়িত করিয়া দিল। বৈদ্য চক্রদত্ত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে, সে এক্ষণে নিদ্রাগত।

মাধবিকা বিধবাবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রসাধনসজ্জিতা হইয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ানা হইল। গৃহের অশৌচচিহ্ন সকল মঞ্জুলিকা অপসৃত করিল।

মণিভদ্র সেই শ্রান্তিগাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও কতবিধ স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্নে সে কতবার মরিল, বাঁচিল, আবার মরিল। কতবার নরকে গেল, কতবার স্বর্গের আলো দেখিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে মাধবিকা স্বামীকে বেশ একটু নাড়া দিয়া বলিল 'উঠ উঠ হৃৎপিণ্ডেশ্বর, উঠ। আর কত ঘুমাইবে।'

চকিত তন্দ্রাবিজড়িতচক্ষু মণিভদ্র ভূষণভূয়িষ্ঠা প্রসাধন-সজ্জিতা মাধবিকার দিকে চাহিয়া বলিল, 'একি প্রিয়তমে, তুমি এখানে? আমি কাল যখন পৃথিবী পর্য্যটনের ছুটি পাইয়াছিলাম তখন তোমাকে একবার দেখিবার বড় সাধ হইয়াছিল। আমি যেই তোমাকে দেখা দিলাম অমনি তুমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে। প্রেত ও মনুষ্যের মধ্যে সকল প্রীতি-সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া এতখানি ভয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পৃথিবীতে জীবিত কালে আমিই তোমাকে ভয় করিতাম, আর আমি যেই মৃত্যুর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রেত হইলাম অমনি তুমি আমার ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে! সেই মূর্চ্ছাতেই কি তোমার মৃত্যু হইয়াছিল? এবং আমি প্রেতলোকে আসিতে না আসিতে তুমিও আসিয়া হাজির! এমন বিবিধ ভোগ্যবিষয়ভূয়িষ্ঠগৃহে তুমি এমন প্রসাধনসজ্জিতা। কাল কি প্রেতলোকে আমাদের 'বাসর রাত্রি' গিয়াছে? এখানেও কি ঘরকরণা করা যায়? এ কি নরক না স্বর্গ? আচ্ছা, আমি কবে কখন কি রোগে মরিয়াছিলাম?'

মাধবিকা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 'এত নাগরালি, রসিকতা কোথায় শিখিলে? এখন রঙ্গ রাখ; বেলা হইল; কার্য্যে যাইবে না?'

আশ্চর্য্যান্বিত মণিভদ্র চক্ষুমার্জ্জন করিয়া আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠ চিনিল, এবং বলিল, 'একি? তবে কি আমি মৃত নই? সশরীরে জীবিত? কাল যে আমি মরিয়া গিয়াছিলাম?'

মাধবিকা কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "এ আবার কি অমঙ্গল কথা এই প্রভাত কালে? রাম নাম করিয়া উঠ, যাও কার্য্যে যাও। বালাই, তুমি মরিবে কেন? শত্রু মরুক।"

মণিভদ্র মাধবিকার মুখে রাম নাম শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'তুমি যাই বল প্রেয়সি, আমি অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে মৃতই ছিলাম। কঙ্কটভট্টের গণনা এবং চক্রদত্তের নাড়ীজ্ঞান কখন ব্যর্থ হইবার নহে। হয় তুমি সাবিত্রীর মত আমাকে যমরাজার কাছ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছ, নয় তুমিও মৃত, কিন্তু টাটকা পরিবর্ত্তন বলিয়া চিরাভ্যস্ত জীবিত জ্ঞান তুমি এখনো ত্যাগ করিতে পার নাই। একটু পরেই প্রেত জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে; আমারো প্রথম প্রথম অমনি বাধো বাধো ঠেকিয়াছিল। জীবলোক ও প্রেতলোকের মধ্যে মরণ মাত্র ব্যবধান বৈত' নয়!'

মাধবিকা কোপস্ফুরিতাধর প্রদর্শন করিয়া বলিল, 'কথা শুনিলে অঙ্গ জলিয়া যায়! পাগল বা মদ্যপ হইয়াছ? এখন উঠ গো উঠ, অধমর্ণেরা ঋণ পরিশোধ ও গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।'

মণিভদ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, 'প্রেত-লোকেও ঋণের কারবার আছে না কি? কিন্তু সে ব্যবসায় আমি আর করিতেছি না; এখানকার মুদ্রা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড!'

মাধবিকা অতিমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া ডাকিল, 'মঞ্জুলিকে, তুই কায়স্থকে এখানে পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতিষী ও বৈদ্য-রাজকে ডাকিয়া লইয়া আয়; আমার স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে।'

বেচারা মণিভদ্র অনেক কষ্টে মরিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইতেছিল; কিন্তু আবার জীবনের ক্রীড়া আরম্ভ দেখিয়া সে স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, কোন অবস্থাটা প্রকৃত। বহুকাল জীবন্ত থাকিয়া থাকিয়া জীবনটাই তাহার অভ্যাস ও সহ্য হইয়া গিয়াছিল; মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহার চিরাভ্যাস-টাকে কিছু বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেও, সে ক্রমে আবার মরণেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া

জীবনোপক্রম তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। জীবন মৃত্যুর মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে যে কোন অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। নদীতে নিরালম্ব ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের জোয়ার ভাঁটার টানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ অপেক্ষা সমুদ্র সমাধি বোধ হয় অধিক বাঞ্ছনীয়।

মণিভদ্রের কায়স্থ কর্ম্মচারী দ্বারমঞ্জুষার কুঞ্চিকাগুচ্ছ-ঝনৎকারে মণিভদ্রের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিয়া আসিয়া নমস্কার করিল এবং কর্ম্মস্থানে প্রভুর ঝটিতি উপস্থিতি প্রার্থনা করিল।

বৈদ্য ও জ্যোতিষী উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে মাধবিকা বলিল, 'নিদ্রাভঙ্গের পর ইহাঁর কেমন ধারণা হইয়াছে যে উনি মৃত, প্রেতাত্মা, জীবিত ব্যক্তি নহেন।'

বৈদ্য গম্ভীরভাবে নাড়ী টিপিয়া বলিল, 'অতিরিক্ত অর্থ চিন্তায় মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। নাড়ীতে বায়ুর বিষম প্রকোপ অনুভূত হইতেছে। প্রথমত শৈত্যক্রিয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে উপকার না হইলে মধ্যমনারায়ণ (উত্তম মধ্যমও চলিতে পারে) ব্যবস্থা।'

জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলিল, 'বুদ্ধিস্থানে চন্দ্র নীচস্থ হওয়াতে এরূপ ভ্রম ঘটিতেছে। শান্তি (শাস্তিও বটে) কর্ত্তব্য।'

প্রাপ্ত-পুনর্জীবন মণিভদ্র উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'তোমাদের মুখে স্রক্‌চন্দন বর্ষিত হোক; আমি মানিয়া লইতেছি যে আমি জীবিত। কাল তোমরা গণনা ও নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা আমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং পরে আমার মৃত্যু ও আমাকে প্রেতাত্মা বলিয়া রটনা করিয়া তোমরা কেন আমাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলে?'

'আশ্চর্য্য করিলে মণিভদ্র, ওহে অবাক করিলে! আমরা তোমার মৃত্যু রটনা করিলাম! কবে? কখন? শিব শিব শিব! সুস্থ হও মণিভদ্র সুস্থ হও, ওহে আত্মস্থ হও। বোধ হয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিয়াছে। তোমার উত্তম-মধ্যম নারায়ণ আবশ্যক? তোমার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্ত্তব্য।'

বৈদ্য ও জ্যোতিষীর এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মণিভদ্র বলিল, 'যদি সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন হয়, তবে ইহা নিশ্চিতই নিতান্ত দুঃস্বপ্ন! দেখি বাহির হইয়া জননী ধরণীর মুখখানা চিরপরিচিত আশ্বাসশান্তিদায়ক কি না!'

বাহির হইয়া সে দ্বারে কোন মৃত্যুলক্ষণ দেখিল না। পথে নন্দকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দক বলিল, 'ভদ্র, কাল সমস্ত রাত্রি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। নানা অঘটনের মধ্যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া, ভ্রাতঃ, বড় ব্যথিত ও ভীত হইয়াছিলাম। তোমাকে অদ্য প্রভাতে সুস্থ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম।'

মণিভদ্র হাসিয়া বলিল, 'আমিও কাল সমস্ত রাত্রি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছি। 'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দম্।' স্বপ্নপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই।'

অবশেষে মণিভদ্র নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তি করাইল, এবং তাহার অর্থকামুকতার শাস্তিস্বরূপ ভগবানের এই দুঃস্বপ্ন দেখান মনে করিয়া সে কুসীদ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল। কেহ কখন তাহার নিকট প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করে নাই; সে আমরণ ইহা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল।

মাধবিকা আপনার কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া মণিমঞ্জীর লাভ অতিনিশ্চিত স্থির করিয়া অপর সখিদ্বয়ের পরিহাস পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল।

মালবিকার অনুবন্ধ।

যখন মাধবিকা জ্যোতিষী ও বৈদ্যের সাহায্যে তাহার স্বামীকে মৃত্যুপরিহাস করিতেছিল, তখন মালবিকা স্বামীর চরিত্র শোধন ও মণিমঞ্জীর লাভের উপায়স্বরূপ পরিহাস আয়োজন করিতে নিশ্চিন্ত ছিল না। এক লোষ্ট্র নিক্ষেপে দুই পক্ষী বধ করিবার ব্যবস্থা তিন সখীরই উদ্দেশ্য ছিল।

মালবিকা তাহার ভ্রাতা শক্রস্তপের সাহায্যে, স্থপতি, চিত্রকর, ভাস্কর ও সূত্রধরের সাহায্যে একটি অপসরণীয় বহির্দ্বার প্রস্তুত করাইয়া তাহার খণ্ডাংশগুলি লুকায়িত করিয়া রাখিয়া দিল।

একদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে নন্দক বাসকসজ্জায় মনোযোগ করিল। চন্দন-কুঙ্কুমানুলিপ্ত দেহ, ধূপধূম্রশোধিত কুঞ্চিতকেশে সন্নদ্ধ সুবর্ণ-কঙ্কতিকা, শিরোললাটবেষ্টিত-মল্লী-কদম্ব, কর্ণস্থ কুণ্ডল, গ্রীবাশোভনা কাঞ্চনবিদ্রুমমালা, বলয় ও কেয়ূর, পুষ্পসারসুগন্ধিত উত্তরীয় ও বসন, কাঞ্চন-

মুক্তামণ্ডিত উপানহ, এবং করধৃত বকুলমাল তাহাকে শরীরী পুষ্পধন্বার মত প্রকাশিত করিল।

প্রসাধনপ্রফুল্ল চক্ষু দর্পণে যখন দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন পত্নী মালবিকার যাতনাজাত বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণে গেল। সে পত্নীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে? এ আবার কিসের ছলনা? শীঘ্র বল, আমার বিলম্ব করিবার অবসর নাই"।

মালবিকা কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল, "ওহে দগ্ধানন, নির্বংশের পুত্র, আমার নিতান্ত দগ্ধাদৃষ্ট যে আমি তোমার হাতে পড়িয়াছিলাম, নতুবা তুমি আমার আসন্নমৃত্যুসময়েও এমন রূঢ় অমানুষ ব্যবহার করিবে কেন? আর আমি কখনো তোমার নৈশবিহারে বাধা দিতে আসিব না; আজ আর একটু অপেক্ষা কর। আমার মৃত্যু আগন্তুক, আমি মরিলে তুমি ত' বাঁচই, আমিও বাঁচি।"

নন্দক মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি তোমার অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য শুনিতে চাহি না। শুধু জানিতে চাহি তোমার কি হইয়াছে।"

মালবিকা ক্ষীণস্বরে অতিকষ্টে থামিয়া থামিয়া কোনমতে বলিল, "ওগো বক্ষে বিষম বেদনা; শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে, হৃৎস্পন্দন মন্দ হইয়াছে, জীবনীক্রিয়া স্থগিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি এখনি মরিব। ওগো আমার মত অভাগ্যের মরণ মঙ্গল; কিন্তু বড় যন্ত্রণা; জীবনে ত' কখন সুখ পাই নাই; এখন একজন বৈদ্য ডাকিয়া দেও গো, যে শুধু যন্ত্রণার উপশম করিয়া মরণকে শান্ত ও বরণীয় করিয়া দিবে"।

নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "থাম থাম; মরিতে হয় অমনি মর, বৈদ্য ডাকিয়া মৃত্যুকালে বিলাসিতার কি প্রয়োজন? তোমার মরিতে হয় মর, আমার বিলম্ব হইতেছে, আমি চলিলাম; কাল প্রাতে আসিয়া তোমায় মৃত দেখিলে সৎকারের ব্যবস্থা যথাবিধিই করিব।"

মালবিকার দাসী বরোরুহা এই কঠিন বাক্য শুনিয়া তীব্র শোকে লুণ্ঠিত হইতে হইতে স্বামিনীর গুণ ও প্রভুর নিষ্ঠুরতা, নিপুণতার সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

নন্দক বিশেষ দুঃখিত হইল, স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুতে নহে, এমন সাধের প্রসাধন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া। অবশেষে পত্নীর তদবস্থা দেখিয়া এবং দাসীর ভর্ৎসনায় বাধ্য হইয়া সে বৈদ্যের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

সে চক্ষুর অন্তরাল হইতে না হইতে মৃতকল্পা মালবিকা লম্ফ দিয়া উঠিল; তীব্র শোকলুণ্ঠিতা দাসী বরোরুহা হাসিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; এবং খট্টাতলগুপ্ত শক্রন্তপ বাহির হইয়া পরিহাস পরিসমাপ্তির আয়োজনে মনোনিবেশ করিল।

বহির্দ্বারের জীর্ণ পুরাতন কবাট অপসৃত করিয়া তৎস্থানে নূতন সুন্দর কারুময় বিচিত্র রজতহিরণ্ময়মণ্ডিত কপাট সন্নদ্ধ হইল। দ্বারের উভয় পার্শ্বে বিচিত্র কারুশোভিত মর্ম্মরস্তম্ভ চতুষ্টয় স্থাপিত হইল। প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রাবলী লম্বিত হইল। নন্দকের অবহেলাসন্তপ্ত জীর্ণগৃহখানি একরাত্রির জন্য নাট্যশালার কদর্য্য অভিনেতার ছদ্মসজ্জার মত বিচিত্র বাসকসজ্জায় মনোহর হইয়া উঠিল। দ্বারশীর্ষে রজতসুবর্ণময় অক্ষরে লিখিত হইল 'প্রমোদ-ভবন'!

গৃহমধ্যে মালবিকা ও শক্রন্তপের আত্মীয়গণের ভোজ উপলক্ষে সেই চিরম্লান নিরানন্দ শোকমূর্ত্তি গৃহখানি আজ নৃত্যগীতবাদ্য-আলোকহাস্য-মহোৎসবে প্রফুল্লপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এ দিকে বিরক্ত বিরস নন্দক বৈদ্যকগৃহোদ্দেশে যাইতেছে। পথে বৃদ্ধিজীবী মণিভদ্রের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার বিরস মনে তাহার স্ত্রীর আসন্নমৃত্যুশঙ্কা জাগ্রত হইয়া তাহার মনকে আরো কটুতিক্ত করিয়া তুলিল।

চিন্তাকুল চিত্তে যাইতে যাইতে পথে মণিভদ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে তাহার প্রেতাত্মা ভ্রমে আতঙ্কিত হইয়া নন্দক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিল। বৈদ্যকসন্ধানে বা অভিসারগমনে তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না; বিপদের সময় তাহার পদ তাহাকে সেই অনির্ব্বচনীয় স্নেহনিরাপদ নির্ভরসহ গৃহখানির দ্বারেই বহন করিয়া আনিল।

সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে দেখিল, না জানি কোন যাদুস্পর্শে তাহার শোকম্লান বিলাপধ্বনিমুখরিত জীর্ণ গৃহখানি লুপ্ত হইয়া তৎস্থলে বিচিত্র সৌন্দর্য্যশোভিত প্রমোদভবন মহামহোৎসবে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। সে চক্ষুমার্জ্জন করিয়াও তাহাই দেখিল। সেই চিরপরিচিত পথ, প্রতিবেশীদের সেই সব গৃহ যথাযথ



রামের হরধনুর্ভঙ্গ

আছে; কেবল তাহারই আবাল্যস্মৃতিজড়িত জীর্ণ গৃহখানি তাহার অনাদৃত, অবহেলা-অপমানব্যথিত শত-অত্যাচার-সহিষ্ণু পত্নীকে বক্ষে করিয়া উহ্য হইয়া গিয়াছে। সে নিদ্রিত না জাগ্রত? 'প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষ—বিসর্প কিমু মদঃ' তাহার পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণ কি সাক্ষ্য দিতেছে?

হতবুদ্ধি নন্দক আপনাকে ধরিয়া খুব কয়েকটা নাড়া দিল, প্রাচীরগাত্রে মস্তক কুট্টিত করিয়া রক্তপাত করিল, তবু বুঝিতে পারিল না ইহা স্বপ্ন, সুরাবিকার, ইন্দ্রজাল, না সত্য।

অবশেষে সে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্বারে ভীষণ আঘাত করিল। তাহাতে প্রতিবেশী সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মদ্যপ নন্দকের ব্যবহারে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিল না।

তাহার আঘাতশব্দে গৃহমধ্যে রুক্ষকর্কশকণ্ঠে কে একজন বলিয়া উঠিল, 'কে রে, উৎসবভঙ্গপ্রয়াসী, শীঘ চলিয়া যা, নয়ত' উচিতমত শিক্ষা দিয়া দিব।'

ইহাতে নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'তোরা কে রে পাপিষ্ঠ? ইহা আমার গৃহ। এই দণ্ড দুই পূর্ব্বে আমার মৃতকল্পা স্ত্রীকে রাখিয়া বৈদ্য ডাকিতে গেলাম, ইহার মধ্যে এ কি ব্যাপার! একেবারে আমার স-পত্নীক বাড়ীকে বাড়ী চুরি! আর এখানে সমস্ত কেকয়রাজ্য যেন উন্মত্ত হইয়া আসিয়া যুটিয়াছে। দূর হ' তোরা হতভাগ্য পামর!'

'এই দূর করিতেছি' বলিয়া একজন ভীমকান্ত পুরুষ দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া নন্দককে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বলিল 'ইহা তোমার বাড়ী বটে অমুদ্রদারিদ্রসমুদ্রপতিত উন্মত্ত প্রলাপী! জান না মূর্খ, ইহা প্রখ্যাতা মঞ্জুলিকার প্রমোদভবন!'

নন্দক আপনার গৃহ ও স্ত্রী প্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া ভ্রাম্যমানচিত্তে মন্থরগমনে তাহার প্রণয়িনীর ভবনোদ্দেশে চলিয়া গেল।

সে রাত্রে তাহার রভসোল্লাস ভাল লাগিল না। সুরাভাণ্ড নিঃশেষ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি সে এই অভাব্য অবোধ্য অভব্য কাণ্ড চিন্তা করিতে লাগিল। সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া স্বপ্রণয়িনীকে বলিল, কিন্তু সে ইহা মদ্যপের খেয়াল স্থির করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

যখন উষার প্রথম জ্যোতিরুন্মেষ হইল তখন নন্দক ভাবিয়া আকুল যে, সে এখন কোথায় অন্ন ও আশ্রয় পাইবে? এতদিনে সে প্রথম বুঝিল যে বারবধূর আদর-আপ্যায়ন অর্থসাপেক্ষ, স্নেহমূল নহে। আজ প্রথম সেই তাহার সঙ্গবাঞ্ছিতা, অনাদৃতা, উপেক্ষাউৎপীড়নলাঞ্ছিতা পত্নীকে মনে পড়িল; মনে পড়িল যে কেমন অত্যাচারের পরিবর্ত্তে প্রত্যহ সেবা ও শুশ্রূষা লইয়া তাহারই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত। যে গৃহে এই স্নেহাশ্রয় ছিল তাহা আজ কোথায় উহ্য হইয়া গিয়াছে। তৎস্থানে যে ভবন প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছে, তাহাতে সে যে প্রচণ্ড অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল, তাহা পুনরায় উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি তাহার মোটেই হইতেছিল না। তথাপি তাহার প্রণয়িনীর অবিশ্বাস ও অনুরোধ তাহাকে আর একবার গৃহসন্ধানে প্রবৃত্ত করিল।

সে স্পন্দিতহৃদয়ে শঙ্কাকাতরচিত্তে পল্লীপ্রবেশ করিল। সে যখন আপন ভবনের নিস্তব্ধতা অনুভব করিল, তখন বিস্ময় ও আশ্বাস তাহার চিত্ত অধিকার করিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিল, সেই প্রাসাদ যেমন মায়াতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তেমনি কোন মায়াবশে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই তাহার প্রাণারাম নয়নানন্দকর, স্নেহপ্রাণ জীর্ণ গৃহের জীর্ণদ্বারে লিখিত বিলুপ্তবর্ণিক, শঙ্খপদ্ম ম্লানমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

সে হর্ষোৎক্রান্তদ্রুতগতিতে দ্বারস্থ হইয়া আঘাত করিল। জাগরণক্লান্তা গৃহবাসিনীগণ শীঘ্র উত্তর দিল না। আঘাতের পর প্রবুদ্ধ হইয়া দাসী বরোরুহা দ্বার খুলিয়া দিবালোকছিন্ন দৃষ্টি মার্জ্জনা করিয়া কহিল, "ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য! ধন্য তোমার প্রাণ! ওগো ধন্য তোমার মায়া মমতা! আর ধন্য তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি! এখন তোমার না ফিরিলেও স্বামিনীর স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। তুমি কি মনে কর আমার স্বামিনীর 'প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিলে দিন যাবে ভালে ভাল!' তোমার রভসচিহ্নিত, সুরাবাসিত মুখ প্রাতঃকালে তাঁহাকে না দেখাইলেও তাঁহার প্রভাত সুপ্রভাতই হইত।"

তাহার কথা শুনিয়া নন্দক আশ্বস্ত হইল যে স্ত্রী তাহার মরে নাই — সশরীরে সেই গৃহে বিদ্যমান আছে। নন্দক বরোরুহার তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া দ্রুত স্ত্রীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। এবং তাহার স্ত্রীর তীব্রকটু ভর্ৎসনাগুলি পরিপাক করিয়া বলিল, 'কোপনে, আগে আমার কথা শুন, পরে ক্রোধ করিতে হয় করিও।' এই বলিয়া গতরাত্রের অভিজ্ঞতাবিবৃত করিয়া বলিতেই তাহার স্ত্রী অতিমাত্র ক্রুদ্ধ

হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল 'দেখ দেখ, মত্তপের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে। আমার শোকম্লানজীর্ণ গৃহ প্রমোদভবন! আমার রোগযন্ত্রণা মহা মহোৎসব! আমার কাতরোক্তি তৌর্য্যত্রিক! ওগো নিষ্ঠুর, অত্যাচারের উপর অপমান করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না, ওহে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না?'

অভিভূত নন্দক প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। কেহ ব্যাপার স্বীকার করিল; পূর্ব্বাহ্নে সতর্কীকৃত কেহ বা স্বীকার করিল না। তখন স্থির হইল যে ইহা নিশ্চয় ভৌতিক কাণ্ড। তাহার পাপের দণ্ডের পূর্ব্বাভাস। অধিকন্তু মালবিকা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে সে যদি শুদ্ধচরিত্র না হয়, তবে সে সত্যসত্যই এই গৃহ প্রমোদভবনে পরিবর্ত্তিত করিবে।

ভীত নন্দক সংযতশুদ্ধ হইল। মালবিকা আপনার সফলতায় ও নিশ্চিতলব্ধব্য মণিমঞ্জীরের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাসন্তিকার প্রযত্ন।

যখন মাধবিকা ও মালবিকা স্বামীবেচারিদের লাঞ্ছনায় আপনাদের আশা ও আনন্দ অর্জ্জন করিতেছিল, তখন বাসন্তিকাও স্বামীর অকারণ সন্দেহ দূর করিতে ও মণিমঞ্জীর লাভ করিতে যত্নবতী হইয়াছিল।

কেকয় রাজ্যে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল, রেবত নামে বাসন্তিকার এক আত্মীয় সেই বিহারে ভিক্ষু ছিল। বাসন্তিকা তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

রেবত ভিক্ষু বিহারকর্ত্তা ধর্ম্মপালের পরামর্শ ও অনুমতি প্রার্থনা করিল। ধর্ম্মপাল রেবত ভিক্ষুর আত্মীয়া বাসন্তিকার উপকারের জন্য রেবত ভিক্ষুকে নির্দ্দোষ আমোদ করিবার অনুমতি দিলেন।

এতদনুসারে রেবত ভিক্ষু দুইজন শ্রমণের সহিত বাসন্তিকার গৃহে গিয়া লুকায়িত রহিল। নৃসোমের নৈশভোজ্যের সহিত মাদক মিশ্রিত করা হইল। নৃসোম আহারান্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

নিদ্রিত হইবা মাত্র রেবত ভিক্ষু শ্রমণদ্বয়ের সাহায্যে নৃসোমের কেশগুম্ফাদি মুণ্ডিত করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণোপযুক্ত পীতবাস ও পীতোত্তরীয় পরিধান করাইয়া শকটবাহিত তাহাকে বিহারে আনিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তৃণশয্যায় শয়ান করিয়া দিল।

সমস্ত রজনী নৃসোমের নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভোর রাত্রে একজন শ্রমণ বিকট ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে সকল কক্ষদ্বারে ধীরোদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছিল—

"অসজ্ঝায় মলা মন্তা, অনুট্ঠানমলা ঘরা
মলং বণ্ণস্স কোসজ্জং, পামাদো রক্খতোমলং ॥
'উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠানো যুবা বলী আলসিয়ং উপেতো।
সংসন্নসঙ্কপ্পমনো কুসীতো পঞ্ঞায় মগগং অলসো ন বিন্দতি ॥
'সুপপবুদ্ধং পবুজ্ঝন্তি সদা গোতম সাবকা।
যেসং দিবা চ রত্তো চ নিচ্চং বুদ্ধগতা সহি ॥
নিচ্চং ধম্মগতা সতি।
নিচ্চং সঙ্ঘগতা সতি ॥
নিচ্চং কায়গতা সতি ॥
যেসং দিবা চ রত্তো চ অহিংসায় রতো মনো ॥
* * * ভাবনায রতো মনো ॥"

এই বিকট ঘণ্টারবের সহিত এই ধীরোদাত্ত গম্ভীর সূত্রাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া নৃসোমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিকট শব্দে ভীত হইয়া ডাকিল, 'বাসন্তিকে, বাসন্তি, ব্যাপার কি? এত রাত্রে এ কাহারা উৎপাত করিতে আসিল? বাসন্তি, হলা বাসন্তিকে, তোমার ভাল ঘুম যা হোক।'

বাসন্তিকার কোন সাড়া না পাইয়া সে মাদকালসমুদ্রিত চোখেই শয্যাপার্শ্বে হাত দিল। হায় হায়, সেখানে বাসন্তিকা নাই। সকল সন্দেহ ও ঈর্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল; মনে হইল বাসন্তিকা নিশ্চয়ই কোথায় অভিসারে গিয়াছে। তন্দ্রা ছুটিয়া চক্ষু পরিষ্কার হইয়া গেল। মনে সন্দেহ, বাহিরে বিকট অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ তাহাকে ভীত চকিত করিয়া তুলিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এ কি? সে কোথায়? তাহার সেই উত্তম-তল্প কোথায় গেল? তৎপরিবর্ত্তে এই তৃণশয্যা বা কোথা হইতে আসিল? সে কোথায় ওগো সে কোথায়? এ কোন নরক, ওগো কোন্ দৈত্য তাহাকে এখানে লইয়া আসিল? এ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ওগো কে বলিয়া দিবে এ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বাহির হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'মিথ্যা সন্দেহে নিরপরাধিনী পত্নীকে কষ্ট দেওয়ার ফল।' এই বাক্যস্বর

নৃসোমের কর্ণে দানবকণ্ঠের মত ভীষণ বোধ হইল। সে শিহরিয়া উঠিল।

'আমি কি সন্দেহ ঈর্ষায় উন্মত্ত হইয়াছি? মনে হইতেছে, আমি কালই যেন নিজের গৃহে স্বাধীন ছিলাম। কিন্তু সেইটাই হয় ত' মস্ত একটা ভ্রম; প্রকৃতপক্ষে আমি হয় ত' কতকাল এই বাতুলালয়ে বদ্ধ রহিয়াছি। এই কি বাতুলালয়? আজ কি তবে আমার প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইল? আমি কি সদ্য এই প্রকৃতিস্থ হইলাম? আমি কি প্রকৃতই এতদিন বাতুল ছিলাম? এই ত' আমার বাতুলের চিহ্ন মুণ্ডিত মস্তক। অথচ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের এতদিন ধারণা ছিল, যে আমার মস্তকে একরাশ কেশ ছিল; এবং তরুণী ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য তাহার উপচীয়মান শুভ্রত্ব গোপন করিতে কতই না যত্নবান ছিলাম। আমার তরুণী ভার্য্যা বাসন্তিকা সেও কি আমার বিকৃত মস্তিষ্কের একটা উৎকট কল্পনা মাত্র! আমি তবে প্রকৃত কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, আমার কে ছিল, হায় আমার কোথায় কে আছে? তাহাদের কাছে ফিরিয়া গেলে হয় ত' নূতন করিয়া আলাপ করিতে হইবে, নূতন করিয়া প্রীতিবন্ধন গ্রথিত করিতে হইবে, হায় হায় আমার এ কি দুর্দ্দশা হইল!'

চিন্তা শেষ হইতে না হইতে একজন শ্রমণ কক্ষপ্রবেশ করিয়া বলিল, 'শ্রমণাচার্য্য ধম্মবংশ, আপনি এখনো প্রস্তুত হয়েন নাই? স্থবিরপুত্রক, শ্রমণদিগের উপসম্পদা গ্রহণ সময়ে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক, মহাস্থবির ধর্ম্মপাল আপনার অপেক্ষা করিতেছেন।'

নৃসোম চিন্তাসাগরে পতিত হইল। 'আমি শ্রমণ! পাষণ্ডীদের পরিচ্ছদও দেখিতেছি আমার অঙ্গে রহিয়াছে। পরম বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমি, আমি পাষণ্ডী, অথবা ইহাও বিকৃত মস্তিষ্কের নিষ্ঠুর পরিহাস এবং ইনিও একজন আমারই মত বাতুলাগারের অধিবাসী। পাগলের মেলা!'

নৃসোমকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্রমণ বলিল, 'ভিক্ষু ধম্মবংশ মহা ভিক্ষু ধর্ম্মপালকে কি বলিব?'

নৃসোম বলিল, 'বন্ধু, তুমি যদি প্রকৃতিস্থ থাক, তবে বৈদ্যকে গিয়া সংবাদ দেও যে, আমি সুস্থ হইয়াছি; আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে; আমি আর বাতুল নহি। বন্ধু, আমার আর একটি অনুরোধ যে, আমাকে বারবার পাষণ্ডী বলিয়া পরিহাস করিবেন না, আমি তাহা হইলে পুনরায় উন্মত্ত হইব।'

শ্রমণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'আপনি কি পরিহাস করিতেছেন? পরিহাসের সময় নাই। ঐ শুনুন উপসম্পদা গ্রহণের ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। শীঘ্র করুন নতুবা মহাস্থবির ধর্ম্মপাল রুষ্ট হইবেন।'

নৃসোম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'পাষণ্ডী, আমি তোর ধম্মপালের কি ধার ধারি? আমি শ্রমণ, আমি ভিক্ষু ধম্মবংশ! এই কাল আমি আমার স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে শায়িত ছিলাম, আর আজ আমি একেবারে সংসারত্যাগী ভিক্ষু ধম্মবংশ! বৈরাগ্যধর্ম্মের প্রতি এই নিষ্ঠুরবিদ্রূপ কেন! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি স্বপ্নাভিভূত, না উন্মত্ত, ঠিক করিয়া আমায় কেহ বলিয়া দেও গো বলিয়া দেও।'

চিন্তাসূত্র হারা হইয়া নৃসোম যখন নিবাক, তখন আর একজন শ্রমণ আসিয়া বলিল, 'স্থবিরপুত্রক ধম্মবংশ, উপসম্পদা সমাপ্ত প্রায়; শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল আপনার উপস্থিতি আদেশ করিতেছেন।'

নৃসোম হতাশ হইয়া বলিল, 'তবে নিশ্চিতই আমাকে মহাভিক্ষু ধম্মবংশই হইতে হইতেছে! আমি আর বাসন্তিকাবল্লভ নৃসোম নহি, আমি শ্রমণ ধম্মবংশই! কিন্তু কেমন করিয়া, কখন আমি শ্রমণ হইলাম? ইহারা কি সকলেই বাতুল না আমি বাতুল হইয়াছি? আমার গৃহ, পত্নী, কেশ, বেশ কাহার ফুৎকারে লুপ্ত হইয়া গেল? বল বল, কোনটা সত্য, কোনটা কল্পনা? আমার যে সমস্তই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতেছে।'

এই বলিয়া প্রেতানুসৃত ভীরুর মত সে দৌড়িয়া গৃহত্যাগ করিল। যে সকল শ্রমণ তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা উচ্ছ্বসিত হাস্যে সকল রহস্য প্রায় ব্যক্ত করিয়া দিত, যদি ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মপাল কয়েকজন শ্রমণ সঙ্গে ধর্ম্মচক্র আবর্ত্তন করিতে করিতে সে স্থানে উপস্থিত না হইতেন।

নৃসোমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন, 'ভিক্ষু ধম্মবংশ, আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন, না, মার ও নির্ঋতির আক্রমণে ক্লিষ্ট হইয়াছেন? আপনি বিহারের নিয়ম ও আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন। আপনি

সপ্তাহকাল নির্জ্জনে উপবাসসংযমে অনুধ্যান ও অনুতাপ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করুন।'

সপ্তাহকাল নির্জ্জনবাস ও উপবাসের পর হতবুদ্ধি নৃসোম ধর্ম্মপালের নিকট আনীত হইলে ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'ভ্রাতঃ ধম্মবংশ, আপনি আপনার বিগত ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন ত'? আর কখন বিহারের নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না ত'?'

নৃসোম বলিল, 'প্রভু, আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছি। সপ্তাহকালের নির্জ্জন কারাবাস এবং অর্দ্ধাশন, অনশন মূর্ত্তিমান অনুতাপ হইয়া আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছে। আপনার আদেশ আর কখন অবহেলা করিবার মত সাহস বা সামর্থ্য আমার অবশিষ্ট নাই।'

'অতঃপর সকল উৎসবে উপস্থিত হইবেন?'

'আজ্ঞা, উৎসব কেন, আপনার আদেশে নরকে উপস্থিত হইব। নরকযন্ত্রণা আপনার প্রদত্ত শাস্তি অপেক্ষা কঠোর নহে।'

'আপনার স্মরণ থাকে যেন যে আপনি ভিক্ষু ধম্মবংশ।'

'ভিক্ষু শ্রমণ বা যাহা কিছু আদেশ করিবেন, আমি তাহাই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইব"।

'মারের প্রশ্রয়ে আপনি আর কখন আপনার সমধর্ম্মী-দের পাষণ্ডী বলিয়া অবহেলা করিবেন না।'

'আজ্ঞা, যতদিন উদরে ক্ষুধা এবং বাহিরে উপবাসের ভয় থাকিবে, ততদিন করিব না।'

শ্রমণদিগের কণ্ঠগুপ্ত হাস্যোচ্ছ্বাস এই কথায় নিরুদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। শ্রমণদিগের রুদ্ধ-হাস্যবেগক্লিষ্ট ভাব দেখিয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মভ্রাতার প্রতি মারের আক্রমণ দেখিয়া হাস্য করা উচিত নহে। বরং আপনারাও প্রার্থনা করুন যে, যে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ গোতম-সেবক ধম্মবংশ এই যুগাধিককাল শ্রামণ্যধর্ম্মের আদর্শীভূত ছিলেন, তাঁহার এই মার প্রভাব ভগবান তথাগতের আশীর্ব্বাদে বিদূরিত হউক। এরূপ নির্ধ্যাতির অবস্থা আমাদের সকলেরই আসিতে পারে। অতএব আত্মবিচার দ্বারা সাবধান হইয়া দুঃখ প্রকাশ করুন।'

এই কথা শুনিয়া সকল শ্রমণ শান্ত হইল। নৃসোম কিন্তু অধিকতর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। 'আমি যুগাধিক-কাল এখানে শ্রমণ-ধম্মবংশ, আমি পাষণ্ডী, আমি বেদনিষ্ঠ নৃসোম নহি? ঘটনার একটা সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কেন? যে হয় একটা ভাব মস্তিষ্কে মুদ্রিত হইয়া গেলেই ত' আমি বাঁচি। হায়, ইহারা ভ্রান্ত, না, আমারই বুদ্ধি বিকৃত—ইহার মীমাংসা কে করিবে, ওগো কবে হইবে?'

নৃসোমকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ধর্ম্মপাল বলিলেন, 'শ্রমণ ধম্মবংশ, আপনি যখন বিশিষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন আজ ভিক্ষা সংগ্রহ দ্বারা শ্রমণসেবা করিয়া আপনি তাহার পরিচয় প্রদান করিবেন। ভিক্ষা সংগ্রহে রেবত ভিক্ষু ইহাঁর সঙ্গে যাইবেন।'

নৃসোম এই কারাগৃহের বাহিরে গিয়া ধরণীর মুখভাবের সহিত আপনার মনোভাবগুলিকে মিলাইয়া গুছাইয়া লইবার অবকাশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। সে প্রফুল্লচিত্তে রেবত ভিক্ষুর সঙ্গে ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নির্গত হইল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ধরণীর সেই পূর্ব্বপরিচিত আলোকদীপ্ত শ্যামশোভা। দেখিল সবই তাহার ধারণার অনুযায়ী আছে, কেবল কে জানে কেমন করিয়া সেই সকল পরিচিতের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে এক একটা পরিচিত পথ, পরিচিত বিপণি, পরিচিত গৃহ দেখে, আর নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুসাক্ষাতের মত আনন্দবিহ্বল হইয়া তাহার চিত্ত সেইদিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে। কিন্তু কেবল রেবত ভিক্ষুর প্রজ্জ্বলিত চক্ষু এবং দৃঢ় আজ্ঞাব্যঞ্জক মুখভাব তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেছিল। সেও মুণ্ডিতকেশ ও পরিবর্ত্তিতবেশে পরিচিত সকলের নিকট গুপ্ত থাকিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন তাহারই গৃহপথে চলিতে লাগিল, তখন তাহার হৃদয় স্পন্দিত, শ্বাস সঘন হইল। অবশেষে যখন আপনারই গৃহদ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিতে আদিষ্ট হইল, তখন আনন্দ, সংশয়, কৌতূহল, আশ্বাস, মুক্তির আশা, বিফলতার ভয় প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসংঘাতে চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল, সকল ধমনীর রক্ত ঠেলিয়া গিয়া হৃদয়দ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল; পর্য্যাকুল মস্তিষ্কে সংজ্ঞাহীন হইবার মত হইল।

রেবত ভিক্ষুর কোপজ্বলিত চক্ষু দেখিয়া ও গম্ভীরনাদী আদেশে ভীত হইয়া সে দ্বারে করাঘাত করিয়া ভিক্ষা চাহিল—'কে আছ গো, ওগো দ্বারে ভিক্ষার্থী আসিয়াছে, কিছু ভিক্ষা দেও।'

ইহা শুনিয়া তাহারই দাসী চঞ্চরী ভিক্ষাপাত্রে গোধূম ও বরাটিকা লইয়া যখন দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন অচিরে সে দাসীর দ্বারা জানিত হইবে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহাতে চঞ্চরী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'পাষণ্ডী শ্রমণ, আমার মুখমধ্যে তোমার ধর্ম্মকথা লিখিত নাই ; শীঘ্র ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান কর।'

নৃসোম দাসীর কথায় কিছুমাত্র ক্রোধ না করিয়া করুণ-স্বরে বলিল, 'চঞ্চরী, তোমার প্রভুকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমি বাসন্তিকাবল্লভ নৃসোম। ওগো বাসন্তিকা মদ্-বিরহে দুঃখিত না হর্ষিত ? হায় হায়, আমি আজ কতদিন গৃহছাড়া, স্বাধীনতালব্ধা বাসন্তিকা না জানি কি অনর্থ সংঘটন করিতেছে। চঞ্চরী, ওগো চঞ্চরী, তুমি দ্বার ছাড়, আমি একবার বাসন্তিকাকে দেখিব।'

ইহা শুনিয়া মহাবিস্ময়ভাণকৃতা চঞ্চরী বলিল, 'আ মর দশানন, যম তোমাকে ভুলিয়া আছে কেন ? বেশ ত' দেখিতেছি শ্রমণের, ইচ্ছা কিন্তু অন্তঃপুর ভ্রমণের। বা রে রসিক, শীঘ্র অপসৃত হও, পাষণ্ডী, নতুবা সম্মার্জ্জনীসাহায্যে রসিকতা-রোগ ঝাড়িয়া দিব।'

দ্বারে গণ্ডগোল শুনিয়া 'হলা চঞ্চরী, কিসের গোল' বলিতে বলিতে বাসন্তিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

নৃসোম স্ত্রীকে দেখিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া রুদৎ-প্রকম্পকণ্ঠে 'বাসন্তিকা, বাসন্তি, প্রেয়সি, আমায় রক্ষা কর ওগো রক্ষা কর' বলিতে বলিতে চঞ্চরীকে ঠেলিয়া গিয়া চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত স্ত্রীর কণ্ঠলগ্ন হইল।

বাসন্তিকা ও চঞ্চরী মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের চীৎকার শব্দ, নৃসোমের করুণ বিলাপ এবং রেবত ভিক্ষুর তর্জ্জনশ্রুত বহুলোক সেই স্থলে আকৃষ্ট হইল এবং একজন শ্রমণকে একজন পুরস্ত্রীর কণ্ঠলগ্ন দেখিয়া তাহারা শ্রমণবেশী নৃসোমকে উত্তম মধ্যম মুষ্টিযোগ দিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল।

রেবত ভিক্ষু যুক্তপাণি হইয়া বাসন্তিকা ও সমবেত জন-মণ্ডলীকে বলিল, 'আমার এই ধর্ম্মভ্রাতাটি উন্মাদরোগগ্রস্ত। ইহার ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইতেছে, সুন্দরীমাত্রকেই পত্নী-বোধে আলিঙ্গন করা। ইহাকে ব্যাধিমুক্ত মনে করিয়া আজ ভিক্ষায় আনিয়া অপরাধী হইয়াছি। ক্ষমা করিবেন। দয়া করিয়া বাতুলের আচার অতিক্রমে কিছু মনে করিবেন না।'

মুষ্ট্যাঘাতজর্জ্জরিত নৃসোম অবাক স্তব্ধ হইল ; সমবেত-জনগণ নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল এবং বাসন্তিকা তাহার কাতর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া মহা বিরক্তিভরে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কি বিষম উন্মাদ। দেশ কাল পাত্র এই তিন বিষয়েরই ভ্রান্ত ধারণা এমন আশ্চর্য্যরূপে মস্তিষ্কে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আমি কিছু-তেই তাহা নিরাকৃত করিতে পারিতেছি না। আমি আর ভুল করিব না। আমি আর ভুল করিব না। মস্তিষ্কে যেমন চিন্তাই আসুক না কেন, অতঃপর আমি দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখিব যে আমি শ্রমণ ধম্মবংশ।'

বিহারে প্রত্যাগত হইয়া রেবত ভিক্ষু ধর্ম্মপালের নিকটে অভিযোগ করিল, 'শ্রমণাচার্য্য ধম্মবংশ স্ত্রী স্পর্শ করিয়াছেন।'

ধর্ম্মপালের কোপজ্বলিত চক্ষু, বজ্রনির্ঘোষবৎ কণ্ঠস্বর দেখিয়া শুনিয়া সভাগৃহ স্তব্ধ হইল। নৃসোম মৃতকল্প হইল।

ধর্ম্মপাল বলিলেন, "স্থবিরপুত্রক ধম্মবংশ, আপনার প্রতি মার যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছে :—

'অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্সতি।
অপেতো দম্মসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥
কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোজেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন জিতঞ্চ রক্খে আনিবেসনো সিয়া॥
নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুণা।
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্স জন্তুনো॥
চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো আপজ্জতী পরদারূপ সেবী।
অপুঞ্ঞলাভং ন নিকামসেয্যং নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্থং॥
চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো।
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো।'

আজ হইতে মাসাবধিকাল তুমি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসংযম ও অনুতাপ কর। নির্জ্জনে উপবাসব্রত অবলম্বন করিয়া মারকে নির্জ্জিত কর।"

এই আদেশ শুনিয়া নৃসোম ধর্ম্মপালের পদধারণ করিয়া

ক্ষমা ভিক্ষা করিল। কিন্তু অটল উদ্যতব্রহ্মদণ্ডসংপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মপাল তাহাকে অনুতপনীয় গুহা মধ্যে প্রক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ প্রাপ্তি মাত্র পরিহাসব্যগ্র কয়েকজন শ্রমণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অন্ধকার গুহামধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিল।

সেই অন্ধকার গুহামধ্যে একাকী অর্দ্ধাহার অনাহারে চিন্তাকুল নৃসোমের দিনগুলি অবিচ্ছেদ দুঃখপ্রবাহের মত কাটিতে লাগিল।

সেই আলোকরেখামাত্রশূন্য অন্ধকার গুহামধ্যে সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এক মাসের মধ্যে কতগুলি দিন অতীত হইয়া তাহাকে মুক্তির দিকে কতখানি অগ্রসর করিতেছে। দিবারাত্রির মধ্যে পার্থক্য সূচনা করিতে সেই গুহায় কোনই উপায় ছিল না।

একদা সে শুনিল কোথায় কে যেন বলিতেছে, 'নৃসোম, ইহা তোমার কৃতকর্ম্মের ফল। নিরপরাধিনীর প্রতি সন্দেহ ও অত্যাচার নিবারণের জন্য তোমার এই শাস্তি। বাসন্তিকার প্রতি আর কখন কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তুমি মুক্তি লাভ করিতে পার।'

এই বাক্য তাহার প্রাণে আশা, উৎসাহ, আনন্দ ঢালিয়া দিল। বহুকাল পরে আপনাকে প্রকৃত বাসন্তিকাবল্লভ নৃসোম বলিয়া অভিহিত হইতে শুনিয়া সে মহা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'হে তাত অদৃষ্ট, কণ্ঠমাত্রশ্রুত মধুরভাষিন্, তুমি দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নর, যে হও হে মহাভাগ, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর, মুক্ত কর, আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতঃপর আমি অত্যাচার করিব না। হে তাত, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ওহে মুক্ত কর।'

ক্ষণেক পরে গুহাদ্বার মুক্ত হইল, ধর্ম্মপাল প্রবেশ করিয়া নৃসোমকে যখন ধম্মবংশ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন হতভাগ্যের অচিরোদ্গত আশামুকুল করকাঘাতে যেন শুষ্ক হইয়া উঠিল।

'হায় হায় আমি বাসন্তিকাবল্লভ নৃসোম এ বিকৃত ভাবটা মস্তিষ্ক হইতে কিছুতেই নিরাকৃত করিতে পারিতেছি না। 'জাগ্রত্তো স্বপতো বাপি তিষ্ঠতশ্চলিতোঽপি বা' সে চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মন, তুমি দৃঢ় নিশ্চয় কর তুমি ধম্মবংশ।'

ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রমণাচার্য্য ধম্মবংশ, অনুতপ্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছ?'

নৃসোম যুক্তকরে বলিলেন, 'আজ্ঞা, এই কঠিন শাস্তির পরেও যদি অনুতপ্ত ও প্রকৃতিস্থ না হই, তবে কিসে হইব? বিশিষ্টই অনুতপ্ত হইয়াছি। তৎপরে মনে মনে বলিল, 'হায় যদি সেই সঙ্গে প্রকৃতিস্থও হইতে পারিতাম।'

ধর্ম্মপাল বলিলেন, 'সাধু, ধম্মবংশ সাধু। যাও এক্ষণে নিজ কক্ষে। স্নানশুদ্ধ হইয়া ভোজনাদি কর।'

নৃসোম কৃতার্থ হইয়া নির্গত হইল। স্নান করিয়া আরাম বোধ করিল। তৎপরে মাদক মিশ্রিত খাদ্য আহার করিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

তখন তাহাকে পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া রেবত ভিক্ষু পুনরায় তাহাকে তাহার গৃহে শয্যায় রাখিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে গাঢ় নিদ্রান্তে সুস্থ হইয়া নৃসোমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আপনাকে সুসজ্জিত কক্ষে কোমলতল্পশায়ী দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। হায় হায়, এ আবার কোন মোহিনী তাহার প্রায়াভ্যস্ত শষ্পশয্যা ও বিহারগৃহের নগ্নতা ঢাকিয়া এই কোমলতা, বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিয়া গেল? এ কোন দৈত্যলীলা, কি প্রেতকীর্ত্তি!

সে মহাভীত হইয়া উঠিয়া বসিতেই পার্শ্বশায়িনী স্ত্রীকে দেখিবামাত্র প্রেতিনী বোধে মহা চীৎকার করিয়া এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইল।

মিথ্যা নিদ্রাগতা বাসন্তিকা সেই চীৎকারে সহসা প্রবুদ্ধবৎ ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'কি কি, কি হইয়াছে?'

নৃসোম আপনার স্ত্রীর পরিচিত মধুর কণ্ঠ ও সুন্দরশ্রীতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'তুমি, তুমি কে? তুমি এখানে কেন? এখানে কেমন করিয়া আসিলে? আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইও না। দূর হও, দূর হও। ধর্ম্মপাল জানিতে পারিলে এখনি হয় ত' বৎসরকালের জন্য গুহারুদ্ধ করিবে। কত কষ্টে, কত অনুতাপ করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছি। তুমি আর বিপদ ঘটাইও না, তুমি যাও, ওগো যাও, রক্ষা কর, ওগো ক্ষমা কর।'

বাসন্তিকা বিস্ময়দুঃখের ভাণ করিয়া বলিল, 'এ তুমি

কি অযৌক্তিক বাক্য বলিতেছ? আমি তোমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমি তোমার নিজের গৃহে কাহারই বা ভয় করিতেছ? বোধ হয় দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়াছ, সুস্থ হও, ওহে সুস্থ হও।' এই বলিয়া স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে পুরঃসর দেখিয়া নৃসোম একেবারে গৃহপ্রান্তে সরিয়া গিয়া বলিল, 'দাঁড়াও সুন্দরি দাঁড়াও। তোমার কথাগুলি যদিও আমার যথেষ্ট চিত্তরঞ্জিনী, তথাপি সুন্দরি, একটু দূরেই থাক; অবস্থাটা আগে বেশ করিয়া বুঝিতে দেও। আমি ত' আজ যুগাধিকাল হইতে মুণ্ডিতকেশ পীত বসনপরিধায়ী ভিক্ষু ধম্মবংশ; স্ত্রীস্পর্শ অপরাধে মাসাবধি গুহাসংরুদ্ধ থাকিয়া অধুনা বিষম অনুতপ্ত এবং সদ্যমুক্ত। যদিও মধ্যে মধ্যে আমি আপনাকে বাসন্তিকাবল্লভ নৃসোম মনে করিতাম কিন্তু সেটা ভ্রম, বিকৃতমস্তিষ্কের বিরাট প্রতারণা, এবং আমি শ্রমণ ধম্মবংশ ইহাই রূঢ় সত্য!'

বাসন্তিকা মধুরহাস্যনিক্কণধারায় কক্ষটিকে ঝঙ্কৃত নন্দিত করিয়া কহিল, 'প্রিয়তম, তুমি কুঞ্চিতকেশ, ক্ষৌমপরিহিত, বেদনিষ্ঠ নৃসোম; যুগাধিককাল বাসন্তিকার হৃদয়গগনবিহারী। এই সত্য ওগো সত্য! তুমি মুণ্ডিতকেশ কাষায়পরিহিত পাষণ্ডী শ্রমণ নহ—সে মিথ্যা, সে ভ্রান্তি, সে তোমার সন্দেহাকুলচিত্তের বিরাট বিকার।'

চিন্তাসাগরে কূলহারা নৃসোম আপনার ইন্দ্রিয়সাক্ষ্য প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। মাসাধিককাল গুহানিবদ্ধ থাকিয়া তাহার দিব্য কেশোদ্গম হইয়াছিল। এক্ষণে মুকুর প্রতিফলিত আপনার মূর্ত্তিকে সুকেশ সুবেশ দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন মুক্তির দিনে গুহাদ্বারের দৈববাণী স্মরণ হইল, এবং ক্রমশঃ সে আপনাকে অবস্থার সহিত সমঞ্জস করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বাসন্তিকার সনির্ব্বন্ধ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সমস্ত ব্যাপার একটি রজনীর স্বপ্নলীলা ও আপনার ক্ষুণ্ণ ধর্ম্মবুদ্ধির ক্রীড়া স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সে পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতার জন্য স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিল, পরিহাসলঘুচিত্তা বাসন্তিকা আপনার সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া স্বামীকে সোহাগ আদর-চুম্বনালিঙ্গনে তৃপ্ত করিয়া আপনার অপেক্ষমানা সখিসন্ধানে চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি নৃসোম আপনাকে সম্যক প্রবুদ্ধ করিবার জন্য গৃহের প্রত্যেক সামগ্রী আগ্রহভরে বহু পরিচিত বন্ধুর মত দেখিতে লাগিল। সন্তোষোজ্জ্বল আনন্দসংমূঢ়দৃষ্টিতে আপনার মুকুরস্থ মূর্ত্তি বার বার আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল। বহুকাল পরে হারানো আপনাকে ফিরিয়া পাইয়া সে আপনাকে যথেষ্টভাবে আদর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। একটি রজনীর দুঃস্বপ্ন তাহাকে কিরূপ না বিপর্য্যস্ত ও পর্য্যাকুল করিয়া দিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া লজ্জায় সে আপনা আপনি হাস্যরোধ করিতে পারিতেছিল না।

উপসংহার।

অপেক্ষমানা মাধবিকা ও মালবিকার সহিত বাসন্তিকার মিলন হইল। কিন্তু মণিমঞ্জরী প্রাপ্তিসময়ে অধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া তাহাদের যেরূপ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল, এক্ষণে পরিহাসসমাপ্তাকৃতা তাহারা আবার জয়াধিকারী নির্ণয়ে মহা অন্তরায় দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকেই একবার মনে করে যে, আপনার পরিহাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বুদ্ধিচাতুর্য্যসম্পন্ন, নূতন; আবার মনে হয়, সঙ্গিনীদের পরিহাসও তুল্যরহস্যময়।

অবশেষে রাণী ত্রপিষ্ঠার বিচারনির্ভরশীলা সখিত্রয় রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একে একে আপনাদের পরিহাসকাহিনী বিবৃত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল।

শ্রুতকাহিনী রাণী ত্রপিষ্ঠা হৃষ্টা হইয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, আপনারা যে মণিমঞ্জীর পাইয়াছিলেন, তাহা আমারই চরণভ্রষ্ট। অশোকের দোহদসম্পাদন সময়ে অশোকগাত্রে চরণাঘাত করিতে ইহা স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মূল্য দ্বিলক্ষনিষ্ক হইবে। আমি মূল্যপরিমাণ মুদ্রার উপর আপনাদের চাতুরীমুগ্ধা হইয়া লক্ষনিষ্ক উপহার দিতে বাসনা করি। আপনারা প্রত্যেকে তুল্যচতুরা; রহস্যপটুতা ও পরিহাসপ্রয়োগক্ষমতাও তুল্য, এমন তিনজন বুদ্ধিমতীর মধ্যে ইতরবিশেষ স্থির করা দুষ্কর এবং অযৌক্তিক। আমি তারতম্য বিচার করিয়া আপনাদের সখিপ্রীতিতে আঘাত করিতে ইচ্ছা করি না। আমার অনুরোধ, এই লক্ষত্রিতয় আপনারা সমান অংশে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হউন।'

সখিত্রয় এই প্রস্তাবে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গেল। তাহাদের প্রাপ্তনিগ্রহ স্বামীবেচারারা জীবনে কখন প্রকৃত ঘটনা জানিল না। তাহারা এক রজনীর দুঃস্বপ্নকাহিনী স্মরণ করিয়া উত্তরজীবনে কখন কৌতুক, কখন বিস্ময়, কখন ভীতি প্রাপ্ত হইত মাত্র। *

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈকুণ্ঠারোহণ। +

"হের হের সখা, হের ঋষিবর! স্বর্ণদ্যুতি ঝলে অঙ্গে।"
কহিলা শ্রীহরি, ডাকিয়া নারদে, মধুর ভারতী ভঙ্গে,
"আসিয়াছে কন্যা, রূপে গুণে ধন্যা, এসেছে কনক ওই;
ক্রোড়ে করি আজি এ সুধাময়ীরে—আয় মা আনন্দময়ি।
কুমারী-নিকুঞ্জে লয়ে যাও এরে; যত কুমারীর দল
সাজাক্ ইহারে, হাসাক্ ইহারে, মুছাক্ নয়ন জল!
কুমারী-নিকুঞ্জ, এ গোলোক ধামে সদা যাহা সুধাভরা,
লয়ে যাও এরে সে আনন্দপুরে, যাও যাও লয়ে ত্বরা!
মায়ের উৎসঙ্গ তপ্তনীড় ছাড়ি, বিহগীর ক্ষুব্ধ প্রাণ!
আদর-ঝঙ্কারে অভিমানিনীর লুপ্ত কর অভিমান!"
শ্রীহরির কোল হইতে বালারে দেবর্ষি লইলা কোলে;
হাসিল কনক, দুলিল অলক, ভৃঙ্গ যেন পুষ্পদোলে!
কুমারী-মণ্ডলী নারদের কাছে আসিয়া ঘিরিল তারে;
লইয়া চলিল কুমারী-নিকুঞ্জে, সাজাইয়া পুষ্পহারে!
পথে যেতে যেতে, হেসে হেসে বলে যত কুমারীর দল—
"এস এস সখি, রত্ন-উদ্যানের এস গো কনক ফল!
আদর-তরুর, সোহাগ-শাখীর, এস হীরামন্ পাখী,
সাধ যায় তোরে হার করি গলে, সতত বুকেতে রাখি।
আঁখির মাঝারে আঁখি-তারা করি, রাখি তোরে নিশি দিন,
বাঁশী করি তোরে অধরে বাজাই, গাই তোরে করি বীণ!"
কুমারী-নিকুঞ্জে আসিয়া কনক হেরিল অবাক্-প্রায়,
সহস্র কুমারী দিয়ে করতালি রঙ্গে হরিগুণ গায়!
ঘন হরিধ্বনি! এ ধ্বনির কাছে বীণার সঙ্গীত হারে!
কোকিলের কণ্ঠে, শ্যামার অধরে, এ সুধা ঝরিতে নারে!
ভক্তি দেবী ওই বিহ্বলা বিবশা, আলু থালু এলো-চুলে
"হরি মোর জ্ঞান, হরি মোর ধ্যান" গাহে বসি তরুমূলে!
শান্তি দেবী ওই নির্ঝরের তীরে, করে লয়ে জপমালা,
ধীরে বলে "হরি"—সেই ছবি হেরি, মোহিল কনক বালা!
মাতিয়া উৎসবে, কুমারীরা সবে, "হরি, হরি", বলি নাচে;
হরি নাম বিনা,—আমরি সাধনা!—তিলেক রে নাহি বাঁচে!
কুমারী-নিকুঞ্জ!—হেন সুধা-কুঞ্জ ভুবনে নাহি রে আর!
চারিধারে মরি বীণার ঝঙ্কার, কলকণ্ঠ অপ্সরার!
চারিধারে মরি রসালে রসালে কোকিলের কুহরণ,
চারিধারে মরি তমালে তমালে ময়ূরের নরতন।
চারিধারে মরি ডাগর-নয়ন হরিণের ছুটাছুটি,
চারিধারে মরি লাল নীল পীত কপোতের লুটাপুটি!
চারিধারে মরি লাল নীল পীত ফুল্ল কুসুমের হাস;
নবীন বসন্ত, নবীন আনন্দ, ঘিরে আছে বার মাস!
"হরিনামামৃত" কল্পতরু দোলে!—নেত্র মুদি, তার তলে,
যা কর কামনা, নিমেষ না যেতে, অমনি তখনি ফলে!
জানি গো কনক, পেয়েছিস্ পিতা, যে জনক সমতুল
নাহি এই ভবে! পেয়েছিস্ মাতা, যাঁর স্নেহে নাহি ভুল!
ভাই, ভগ্নী, সখা, সকলি শ্রীহরি! এমন নাহি রে আর।
আজন্ম কুমারী পেয়েছিস্ পতি বিশ্বপতি প্রেমাধার!
তবু মা সুধাই, দয়া মায়া ভুলি, কেমনে চলিয়া গেলি?
হায় অকাতরে শোকানল-কুণ্ডে সোনার সংসার ফেলি!
উষার আলোকে হেরি অন্ধকার না হেরিয়া তোর মুখ!
অপরের স্বরে তোর কণ্ঠ ভাবি দুরু দুরু কাঁপে বুক!
হাসি হাসি তোর কোথা মুখখানি? কোথা সেই মৃদুস্বর?
হায় মা কনক, কোথায় পলালি শ্মশান করিয়া ঘর?
পিতার দুলালি, মাতার দুলালি, সোদরার সদা প্রিয়া,
সোদরের প্রিয়, সবার অমিয়, বাঁচি মোরা কি গো নিয়া?
দুটি দিন সুধু, রে কনক পাখী, সোনার পিঞ্জরে ছিলি,
গাহি দুটি গান, বনের বিহগী বনপানে পলাইলি!
ক্ষণেক জ্বলিয়া, ক্ষণেক হাসিয়া, ওরে মোর মোমবাতি!
নিবে গেলি হায়,—বল্ মা বল্ মা কেমনে পোহাই রাতি?
আহা মা কনক, চাঁদমুখে তোর ঝরিত রে জ্যোৎস্না হাস;

---

* স্পেনদেশীয় ঔপন্যাসিক ইসিড্রো দি রোবল্‌সের গল্পাবলম্বনে লিখিত।

+ আমার মাননীয় বন্ধু বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... ... মহাশয়ের পরম গুণবতী কুমারী কন্যা কনককুমারীর অকাল-মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

অকস্মাৎ হায়, কাল-রাহু আসি, করিল রে পূর্ণগ্রাস!
বল্ রে কৃতান্ত, চিরকাল তোর কেন এ কলঙ্ক হায়?
যারে সবে বাসে, সকলে সম্ভাষে, সেই আগে চলি যায়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পার্শি সমাধি-মঞ্চ।

বর্ত্তমান সময়ে পার্শিজাতি অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। পার্শিগণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উদীয়মান মুসলমান ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষা হেতু পারশ্য দেশ হইতে গুজরাত প্রদেশে আগমন করে। তাহাদের একদল বম্বে নগরীতে বাস করিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান সময়ে বম্বের যাবতীয় উন্নতির মূলে পার্শিজাতি। তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার অতি বিচিত্র। তন্মধ্যে মৃত দেহ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবস্থা অন্যতম। কিম্বা জলসৎকার করা কিম্বা কবর দেওয়া উচিত মনে করে না। তাহারা কোন পর্ব্বত শিখরে কিম্বা অপর কোন উচ্চ স্থানে এরূপ প্রণালীতে সমাধি-মঞ্চ নির্ম্মাণ করে যে, গলিত শবদ্বারা পৃথিবী কলুষিত কিম্বা কোন প্রাণীর অনিষ্ট হইতে না পারে। বহুব্যয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি দ্বারা সমাধি-মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। যে স্থানে পার্শিদের সংখ্যা কিছু বেশী, সে স্থানেই তাহারা একটী সমাধি-মঞ্চ নির্ম্মাণ করে।*

গুজরাতী ভাষায় সমাধি-মঞ্চের নাম "ডোক্‌মা।" যাবতীয় সমাধি-মঞ্চের নির্ম্মাণপ্রণালী একই প্রকার। মঞ্চটী ন্যূনাধিক ৫০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল বৃত্তাকার। কিন্তু ঠিক মধ্যস্থলে একটী কূপ থাকাতে উহা বলয়াকার দেখা যায়।

মঞ্চ ও কূপ প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধান। কিন্তু মঞ্চ প্রায় ১০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরগাত্রে উপর্য্যুপরি দুইটী ছোট জানালা মাত্র আছে। নিম্নেরটী কিছু



ডোক্‌মা বা পার্শি সমাধি-মঞ্চ।

পার্শিদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের নাম আবেস্তা। তাহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের মতে অগ্নি ও পৃথিবী অতি পবিত্র। উহাদিগকে কোন প্রকারে কলুষিত করা পার্শিগণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে। সুতরাং গলিত কিম্বা দগ্ধ শব দ্বারা উহারা অপবিত্র হইবে, এই ভয়ে পার্শিগণ মৃত দেহ অগ্নিসৎকার বড়, উহা দ্বারা শববাহকগণ মঞ্চের অভ্যন্তরে যাতায়াত করে। এই জানালাটী প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে। সুতরাং উপরকার জানালা দ্বারা উঁকিমারিয়া বাহকগণ মঞ্চের অভ্যন্তর পরিদর্শন করে। ঐককেন্দ্রিক (concentric) দুইটী রাস্তা দ্বারা মঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত। ঐ রাস্তা দ্বারা

শববাহকগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করে। পার্শিদের শাস্ত্রে সৎকার্য্য, সৎবাক্য ও সচ্চিন্তা নামক তিনটী নৈতিক উপদেশ আছে; মঞ্চের ভাগতিনটী উহাদের সংখ্যা জ্ঞাপক। প্রথমভাগে পুরুষের, দ্বিতীয়ভাগে স্ত্রীলোকের এবং অপর ভাগে শিশুদের শব রক্ষিত হয়। মঞ্চে শব স্থাপন করিবার সময় আবরণ ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করা হয়। শাস্ত্রের আদেশ "নগ্ন অবস্থায় আমরা আসিয়াছি, নগ্ন অবস্থায়ই আমাদের যাওয়া উচিত।" এই সময় আত্মীয় স্বজনগণ মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক শেষ বিদায় গ্রহণ করে।

শব মঞ্চে স্থাপন করিবা মাত্র বহুসংখ্যক শকুনি আসিয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যে মাংসাদি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। কিছু দিন পরে অস্থি পঞ্জর সূর্য্যোত্তাপে ও বায়ু সংস্পর্শে শুষ্ক হইলে শববাহকগণ উহা পূর্ব্বোক্ত কূপে নিক্ষেপ করে। তথায় কালক্রমে অস্থিগুলি চুণ ওফস্‌ফোরাস্‌ময় চূর্ণে পরিণত হয়। কালের প্রভাবে শত্রু মিত্র ধনী মানী দরিদ্র ব্যক্তি একই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর মিশিয়া যায়।

যে শিখরে মঞ্চ নির্ম্মিত হয়, উহার তলদেশে ভূগর্ভে চারিটী অন্তঃকূপ (underground well) থাকে। এই কূপগুলি পূর্ব্বোক্ত মঞ্চমধ্যস্থিত কূপের অনেক নীচে অবস্থিত। মঞ্চমধ্যস্থিত কূপের তলদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। এই হেতু এই কূপে সঞ্চিত বৃষ্টির জল পৃথিবীতে শুষিয়া না গিয়া চারিটী প্রস্তরনির্ম্মিত অন্তঃপ্রণালী দিয়া (underground drain) পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকূপ চারিটীতে আসে এবং তথা হইতে পৃথিবীতে শুষিয়া যায়। বৃষ্টিজল গলিতশবনিঃসৃত রসরক্ত ধৌত করিয়া মঞ্চের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র নালা বাহিয়া কূপে পতিত হয়, এবং কূপে স্তূপীকৃত অস্থিচূর্ণের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত কলুষিত হয়। এই কলুষিত জল দ্বারা পৃথিবী অপবিত্র হইবে, এই ভয়ে জল শোধন না করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিতে দেওয়া হয় না। কূপ-সঞ্চিত জল শোধন করিবার জন্য জলপ্রণালীগুলিতে বৎসর বৎসর নূতন অঙ্গার ও বালি প্রস্তর রাখা হয়। এবং অন্তঃ-কূপগুলিতে কয়েক স্তর বালি ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কবরস্থিত শব দ্বারা ভূমি ও বায়ু উভয়ই অস্বাস্থ্যকর হয়। অসংখ্য কীটে ভক্ষণ করিলেও বহুসময় পর্য্যন্ত উহা পচিতে থাকে। এবং তজ্জন্য দুর্গন্ধে অন্যান্যের স্বাস্থ্য নাশ হয়। কিন্তু পার্শিদের সমাধি-মঞ্চে নরদেহ দুইঘণ্টার মধ্যে অস্থিতে পরিণত হয়। অস্থিগুলি পচিয়াও সামান্য দুর্গন্ধ হয় বটে, কিন্তু সমাধি-মঞ্চ অতি উচ্চস্থানে নির্ম্মিত হওয়ায় কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না।

ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলে একই রীতিতে সমাধি-মঞ্চে নীত হয়। নিযুক্ত শববাহকগণ লৌহনির্ম্মিত খট্টায় মৃতদেহ গৃহ হইতে সমাধি-মঞ্চে আনয়ন করে। মৃতব্যক্তির আবাস যতই দূরে হউক না কেন, শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনগণ পদব্রজে শবের অনুসরণ করে। কিন্তু তাহারা মৃতদেহ স্পর্শ করিতে পারে না। দীর্ঘ শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া পরস্পর দুইজন হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহারা অগ্রসর হয়। শোক ও সহানুভূতি প্রকাশার্থ সকলেই বদ্ধহস্তে একখানা রুমাল ধারণ করে।

শববাহকগণ "খাণ্ডিয়া" ও "নাশাছলার" নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। নাশাছলার নামক শববাহকগণ ধর্ম্মাচার্য্য। তাহারা কোন বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে, মৃতদেহ মঞ্চের ভিতরে বহন করিতে, এবং মঞ্চের ভিতর গমনাগমন করিতে একমাত্র অধিকারী। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন-গণ কেবল মাত্র মঞ্চদ্বার পর্য্যন্ত শবের অনুসরণ করে। খাণ্ডিয়াগণও মঞ্চদ্বার পর্য্যন্ত শব বহন করিয়া ক্ষান্ত হয়। মৃত ব্যক্তির গৃহে উপাসনা হয়। উদ্যানে কিম্বা মঞ্চে কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। বোম্বাই সহরের প্রত্যেক অংশে বহুসংখ্যক শববাহক নিযুক্ত আছে। সমাধি-মঞ্চে মৃত ব্যক্তির নামধামাদি "রেজেষ্টারী" করা হয়। মৃত্যু সংখ্যা মাসে গড়ে প্রায় এক শত।

পার্শিদের শাস্ত্রানুসারে আত্মা অবিনশ্বর ও স্বাধীন এবং স্বকীয় কর্ম্মের জন্য জগৎস্রষ্টার নিকট দায়ী। সদসৎ কর্ম্মানুসারে নরনারীগণ পরকালে পুরস্কার ও নিগ্রহ ভোগ করে। পুণ্যাত্মা বিমল আনন্দ সম্ভোগ করেন। এবং অসদাত্মা ক্লেশ ও শাস্তি সহ্য করে।

প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতীয় বহু দর্শক বম্বের সমাধি-মঞ্চ দর্শন করিতে আসে। মালাবার পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে চতুর্দ্দিকে দেওয়ালবেষ্টিত সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী মঞ্চ আছে।

কিন্তু সবগুলি আয়তনে সমান নহে। তিনটী বড় এবং দুইটী ছোট। তিনটী সর্ব্বসাধারণ পার্শিনরনারীর জন্য একটী আত্মহত্যাকারী কিম্বা যাহাদের অপঘাতমৃত্যু হয় তাহাদের জন্য এবং অপরটী "মুদী" নামক পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মুদী পরিবার সর্ব্ব প্রথমে বম্বে আগমন করায় তাহারা এই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। দর্শকগণ মঞ্চের অতি নিকটে যাইতে পারে না। অন্ততঃ ত্রিশগজ দূরে দাঁড়াইতে হয়। একজন পার্শি কর্ম্মচারী দর্শকদিগকে সব বিষয় বুঝাইয়া দেয়।

উদ্যানে একটী মন্দির আছে তথায় পার্শিদের বম্বে আগমন কাল হইতে অগ্নি রক্ষিত হইতেছে। ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়া হয় না। সর্ব্বদা চন্দন কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। দূর হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। উদ্যানের ভিতর ও বাহিরে অসংখ্য তালগাছ আছে। তালগাছ ও মঞ্চের দেওয়ালে শকুনিগুলি শবের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। সমাধি-মঞ্চের উদ্যানটী অতি মনোরম এবং বিবিধ সুন্দর পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত। দুইপার্শ্বে সমুদ্র এবং নিম্নে পটের মত নগরের সৌধরাশি বিরাজিত। এই স্থান হইতে বম্বের সুন্দর শোভা উত্তমরূপে নয়নগোচর হয়।

সমাধি-মঞ্চ দর্শন করিতে হইলে পার্শি পঞ্চায়তের তত্ত্বাবধায়কের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। তিনি ছাড়পত্র (free pass) প্রদান করেন। পাশ না থাকিলে পার্শি ব্যতীত অন্য কাহাকেও উদ্যানে প্রবেশ করিতে কিম্বা মঞ্চ দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। বম্বে ও কলিকাতার যাদুঘরে পার্শি সমাধি-মঞ্চের এক একটী প্রতিকৃতি (Model) ও বিবরণ আছে। ঐ বিবরণ ও পার্শিদের প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইয়াছি তাহা হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীবিলাসচন্দ্র দাস।

মনের কথা।

(১)

মনের কথা বল্লে খুলে, লোকে বল্‌বে পাগল!
অম্নিই কোন্ করে রেয়াৎ,
তবে কি না সাম্‌নে নেহাৎ
যা তা কথা বলতে নাহি খোলে মুখের আগল্।

(২)

যা হোক্, রাখি ঢাকা চাপা;
দেখাইনে যে ভিতর ফাঁপা।
কুমড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল।
বলি পটোল্, ভাজি ঝিঙ্গে;
বলি জাহাজ্, চালাই ডিঙ্গে;
ঝোলাই লম্বা কোঁচা, তবে ছুঁচো করে যা গোল্।

(৩)

"কাল কুর্ত্তি" লাগায় বেটন্
দেহের মাংস করি মাটন্;
ভ্যা ভ্যা চেপে হালুম্-ডাকে তবু ওঁছাই খাবোল্।
অম্নি মোদের খ্যাতি রটে;
হোলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে!
পীঠের দাগ্ ঢেকে পিটি আত্মযশের মাদল্।

(৪)

পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি
লাটিম্ সম "অটনমি"
হচ্চে বটে; কিন্তু ঘটে জাগ্‌ছে শক্তি আসল্।
খু জি বটে গর্ত্তে বাসা,
আত্ম-শক্তি আছে খাসা।
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল্।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিধবা।

সে কোথায় গেল চলি' তোমায় কিছু না বলি'
অজানিত দেশে।
ক্ষণেক বিলাপ করি', তার পরে শান্ত ভাবে
এলাইয়া কেশে,
তা'র সনে উপহৃত তা'রি রত্ন-আভরণ,
ত্যজি' অযতনে,
বারেক অনন্ত, নীল ঊর্দ্ধপানে আঁখি তুলি'
অতৃপ্ত নয়নে।
কি যেন হেরিয়া, শেষে, ধীরপদে গৃহে এসে
আত্ম-সম্বরিয়া,

সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব ইচ্ছা, সর্ব্ব মান-অভিমান
একান্তে ত্যজিয়া,
অনন্ত ধৈর্য্যের ভরে, আত্মহারা হ'য়ে তুমি
পরার্থ চিন্তায়
জীবন সঁপিয়া দেছ আপনারে ব্যাপ্ত করি'
অনন্তের গায়।
শতরূপে, চারিদিকে ঘূর্ণিত সংসার-মাঝে
বৃথা, অকারণে
তীব্র, তীক্ষ্ণ অপমান,—অজস্র উপেক্ষারাশি
অশ্রান্ত বর্ষণে
তোমা'পরে ঝরে নিত্য; তবু, তুমি দয়াময়ি,
কিছু নাহি গণি',
অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি' সে সকলি
—হে মোর জননি,
করুণা করিয়া সবে অসীম স্নেহেতে শুধু
সেবিতেছ সুখে।
এত যে দুঃসহ, ঘোর অবিচার; তবু, মাগো,
কথা নাহি মুখে!
আপনারে বিস্মরিয়া—রাখি' কোন্ অন্তরালে,—
পর-হিত-তরে
মৌন কর্ম্মে রত সদা,—পালিছ নিষ্কাম-ধর্ম্ম
অনন্য অন্তরে।
ওরে চির-উপেক্ষিত, অনাদৃত পারিজাত,
কল্যাণী প্রতিমা,
কলুষ-তিমিরাবৃত এ সংসার দীপ্ত করি'
স্বর্গীয় মহিমা
বিচ্ছুরিছ বিশ্বে তুমি—মহান্ চরিত্রে তব
স্নিগ্ধ মধুময়!
আজি তাই, ভক্তিভরে চরণে লুটায়ে মাগো,
গাহি তব জয়।
অতুল-সুন্দর এই চির-স্থির রূপরাশি
ভিতরে বাহিরে,—
হেন সৌম্য, হেন শুদ্ধ, এ হেন আদর্শ নাহি
বিশ্ব-চরাচরে!
প্রলোভন হ'তে দূরে—বিজনে, অরণ্য-কোণে
যোগী কি বৈরাগী
সংযমিতে আত্ম-মন—যে সাধন-সিদ্ধি লাগি'
নিত্য রহে জাগি';—
তুমি এ সংসারে থাকি,' শত প্রলোভন-মাঝে
সদা বিচরিয়া,
অচ্যুত ধৈর্য্যের বল, অসীম সংযম ভরে
আত্ম-সম্বরিয়া,
সেই মহা-সাধনায় মহীয়সী দেবীরূপে
সিদ্ধি লাভ করি',
পাপার্ত্ত এ লোকালয়ে পবিত্র আদর্শ রূপে,
আছ দেহ ধরি'।
ওগো পুণ্যময়ী দেবি, অয়ি মূর্ত্তিমতী প্রীতি,
দীপ্তি মনোহরা,
প্রণমি ও পদযুগে যাহার মঙ্গল-স্পর্শে
শুচিস্মিতা ধরা!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী সানুদেশে
দাঁড়ায়ে উন্নত শিরে, মহান্ গম্ভীর
চন্দ্রনাথ শ্রীমন্দির, সম্মুখে অসীম
অপার অনন্ত নীল নীরধি চঞ্চল,—
ফেনপুঞ্জ বক্ষে নিয়ে কল কল নাদে
বহিতেছে, গিরি বন করি মুখরিত।
উত্তাল তরঙ্গ তুলি কল্লোলি সাগর
আরাধিছে, গিরিসুতা সহ বিশ্বনাথে।
শীকর-স্নিগধ মৃদু মন্দ গন্ধবহ
বীজনিছে চন্দ্রনাথে, নিশি দিন সদা।
দুই পার্শ্বে গিরিমালা আছে দাঁড়াইয়া
উন্নত শিখরে, শোভা অপূর্ব্ব অতুল,
বিটপ বল্লরীকুল ঘন সমাবেশে,
পশ্চাতে বিস্তৃত শস্য-শ্যামল প্রান্তরে
অগণিত গ্রামাবলী, পাদপ নিচয়ে
সমাবৃত; সুশীতল শ্যাম ছায়াময়।

শুভ্র স্রোতস্বিনী বহে সুবঙ্কিম গতি ;—
যেন শ্যামা ধরণীর কটি তটে শোভে
রজত কিঙ্কিনী কাঞ্চী ; অথবা রামের
বিশাল শ্যামল বক্ষে রতন খচিত
হীরকের হার যথা দীপ্তি বিভাময়।
গিরি পার্শ্ব বাহী শুভ্র "সহস্রধারার"
প্রপাত-শীকর-সিক্ত উপল প্রদেশে
রয়েছে কুমারী কুণ্ড, কাননে বেষ্টিত।
উত্তরে "চম্পকারণ্য," "ব্যাস সরোবর"
তীরে বসি ব্যাসদেব মহান্ মূরতি,
যুগ যুগান্তর ব্যাপি ধ্যানে নিমগন।
দক্ষিণে বাড়বানল অপূর্ব্ব ভীষণ
গরজি সলিলোপরি, নিশি দিন সদা
জ্বলিতেছে অবিরাম, ধক্ ধক্ করি।
পুণ্য তীর্থ সীতা কুণ্ড পাবনী মূরতি
সতীত্বের চির স্মৃতি, অদ্যাপি ভুবনে
জাগায় মানব হৃদে করুণ কাহিনী।
বিরূপাক্ষ মন্দিরের নিম্নে স্নিগ্ধ স্থানে
রয়েছে "পাতালপুরী" নীরব নির্জ্জন
বল্লরী বিতানে ঢাকা, শান্ত সুশীতল।
সে নির্জ্জনে একাসনে শুভ্র শিলাসনে
উপবিষ্ট হরগৌরী, কি শোভা অতুল ;
একাধারে ভক্তি প্রেম সৌন্দর্য্যের খেলা।
গিরীশ গিরিজা রূপ অতুল অপার
যেন সে মাধুরী হেরি ভকতি বিস্ময়ে
নীরব প্রকৃতি হেথা, নিস্তব্ধতা যেন
উল্লাসে বিভোর হ'য়ে চাহে অনিমেষে
শঙ্কর শৈলজা পানে, বিস্ময়ে বিহ্বল।
দূরে নিরজনে শ্যাম উপত্যকা ভূমি,
নিসর্গের চারু শোভা অপূর্ব্ব মাধুরী।
আহা কি বর্ণনাতীত দৃশ্য মনোহর
অসীম অতুলনীয়, প্রকৃতির যেন
রমণীয় সুধাময় নিত্য লীলা ভূমি।
যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিকেই যেন
স্বভাবের প্রদর্শনী, মরি কি সুন্দর।
সুশোভিত ফলে ফুলে নবীন পল্লবে
নব দ্রুম লতা রাজি ; বন বিহগের
মধু কল কণ্ঠে গিরি বন মুখরিত।
ভকতির প্রস্রবণ, প্রেমের নিঝর,
আপনি উথলে হৃদে, তব দরশনে
চন্দ্রনাথ, চরিতার্থ হয় প্রাণ মন—
হেরিলে তোমার কোলে প্রকৃতির খেলা।
উল্লাস বিস্ময় ভয় প্রেম ভক্তি জ্ঞান
একাধারে সম্মিলন ; কি শোভা অতুল,
কি মহান্ কি উদার কি অসীম রূপ
তোমার হে চন্দ্রনাথ, চির শোভাময়,
হেরিলে ভকতি-রসে হৃদি দ্রব হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

মহারাজা গায়কবাড়।

আমাদের দেশে উন্নতির যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ ছিল অনৈক্য, উদাসীনতা, অদৃষ্টবাদ ও নিরাশ্বাস (ইংরাজীতে যাহাকে pessimism বলে)। এক রাজ্যতন্ত্রের অত্যাচার অবিচার পরস্পরবিরোধী জাতি সকলকে সমস্বার্থ ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, গমনাগমন-সুবিধা দূরত্বব্যবধান নিরাকৃত করিয়াছে, ইংরাজীভাষা পরস্পরকে একভাষী ও পরস্পরের মর্ম্মজ্ঞ করিয়াছে ; ইংরাজ-শাসনের মধ্যযুগে শিক্ষাদীক্ষার ফলে মধ্যবিত্ত অবস্থার কয়েকজন দেশহিতব্রত গ্রহণ করিলেও একদিকে অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায় অপরদিকে প্রজাসাধারণ নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, আজকাল অভিজাত সম্প্রদায় বিলাস ফেলিয়া, গর্ব্ব ভুলিয়া, ইংরাজের ভয়মোহ কাটাইয়া দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, উদাসীনতা ঘুচিয়াছে ; এখন উদ্যমের সহিত সফলতার নিত্য যোগ, কর্ম্মের সহিত পুরস্কারের কায়াছায়া সম্বন্ধ, ইহা বুঝিয়া ও উদর জালার বিষম প্রবর্ত্তনায় লোকে আর অদৃষ্টনির্ভর নহে, কর্ম্মের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে, জীবনসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে ; একদিকে আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের কাণে নিত্যকাল ধরিয়া গুঞ্জন করিতেছিল, 'ওরে মূঢ়

জীব, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—সুখসাচ্ছন্দ্যের যুগত্রিতয় কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে তামস কলি আসিয়াছে, চারিদিকে অবনতি অধঃপাত বিধাতার বিধান, তুই চেষ্টা করিয়া কি করিবি মূঢ়, দুদিন পরেই ত' পৃথিবী প্রলয়পয়োধিজলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তবে কিসের জন্য চেষ্টা, তুই নিশ্চিন্ত হইয়া 'ঘুমকর্ম্ম' (যোগ-সাধন) কর'! আর এক কাণে ইংরাজ নিরাশার অবসাদ-ভরা বাণী শুনাইতেছিল, 'তোরা ভীরু কাপুরুষ, কর্ম্মবিমুখ জড়জাতি, তোদের চেতনা নাই বেদনা নাই, কর্ম্ম নাই মর্ম্ম নাই, আমরা তোদের প্রহরা দিয়া জাগিয়া বসিয়া আছি, ওরে তোরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমা'। আমরাও দিব্য নিরাশ্বাস প্রাণে ভরিয়া ঘুমরত ছিলাম। আজিকার প্রবুদ্ধচেতনা যে সকল মনস্বীকে বাক্যকর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধানতৎপররূপে আমাদের সমক্ষে উপনীত দেখাইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ গায়কবাড় প্রধানতম। ভারতবর্ষ চিরকাল আভিজাত্যের পূজা করিয়াছে; তাই এখনো এই সাম্যস্বাধীনতার দিনেও জমিদার ভূস্বামীর দৃষ্টান্ত প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর প্রভূতভাবেই দৃষ্ট হয়। ইংরাজের ভয়মোহ এড়াইয়া যে সকল ভূস্বামী ও নৃপতি দেশব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে গায়কবাড় অগ্রণী। তিনি শিক্ষা দীক্ষা, সাহস উৎসাহ, অবস্থা মর্য্যাদা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই আজ তিনি দেশমান্য, বিদেশবন্দিত। এহেন দেশহিতরত মহারাজ গায়কবাড়ের সিকি শতাব্দী রাজ্যভোগের জন্য তাঁহার প্রজাবর্গ মহোৎসবের সূচনা করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারত দেশপাত্র নির্ব্বিচারে সেই মহোৎসবে হৃদয়ের আনন্দ ও শুভ-ইচ্ছা প্রেরণ করিতেছে।

মার্কুইস ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে হোলকার, সিন্ধিয়া, নাগপুরের রাজা, বড়োদার গায়কবাড় প্রভৃতি মহারাষ্ট্র জাতি এবং মহীশূরের হায়দর টিপু ও হায়দরাবাদের নিজাম প্রভৃতি মুসলমান যখন স্বাধীনতার জন্য শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন একতা ও সমবেত চেষ্টার অভাবে ধূর্ত্ত ইংরাজ একজনকে অপরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া কণ্টকে কণ্টক নষ্ট করিতেছিলেন। সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া বড়োদারাজ্য সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন, বড়োদারাজ্যের সহিত সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ (Subsidiary Alliance) স্থাপন করেন; তৎপরেই প্রতাপসিংহের যোধপুর রাজ্য এবং সর্ব্বশেষে মানসিংহের জয়পুর রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করেন। অদৃষ্টের পরিহাস!

বড়োদা নাচার অবস্থায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু মহারাষ্ট্ররক্ত অসন্তোষ-উত্তপ্ত ও সন্ধুক্ষিত হইতেছে চিরদিন। ১৮৭৫ সালে এই অসন্তোষ ব্যক্ত হইয়া পড়ে; তাৎকালিক মহারাজা ইংরাজদূতকে হীরকচূর্ণ-বিষ প্রয়োগে হত্যাকরার অপরাধে সিংহাসনচ্যুত হন। কূটনীতিবিশারদ ইংরাজ এরূপ অবস্থায় বংশের হীনাবস্থার কোন শিশুকে গদীতে বসাইয়া স্বয়ং প্রতিভূশাসক (Regency Government) হইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় যে যে ক্ষমতা ক্রমশ কবলিত হয়, তাহা প্রায়ই প্রত্যর্পিত হয় না; শিশু রাজা বয়স্ক হইয়া করিভুক্ত কপিত্থের মত শাঁসশূন্য রাজ্যের খোসাখানা পাইয়াই ইংরাজের বদান্যতাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যাঁহাদের অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন তাঁহারা গ্রস্তক্ষমতা কখন কখন মুক্ত পাইয়া থাকেন, বড়োদা রাজ্যের সেই বিপ্লবের সময় খান্দেশ প্রদেশের এক পল্লীতে পিলাজী রাও গায়কবাড়ের বংশশাখার এক দরিদ্র পরিবারের দ্বিতীয় পুত্রের উপর নজর পড়িল; ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সেই বালককে মহারাণী যমুনাবাঈ দ্বারা দত্তকপুত্র লওয়াইলেন, কারণ ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন যে এই দরিদ্র বালককে রাজৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা রাজার কৃতজ্ঞতা ও দাস্য সুখে স্বচ্ছন্দে বিনা ওজর আপত্তিতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এবং সেই রাজা বা রাজার স্থলাভিষিক্ত আর কেহ কোন ওজর আপত্তি করিবে না। কিন্তু ইংরাজ ভুল বুঝিয়াছিলেন, সেই বালকের স্বার্থ কৃতজ্ঞতার উপর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; মহারাষ্ট্রশোনিত স্বধর্ম্মপ্রতিপালনের মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। সেই দত্তকপুত্রগৃহীতবালকের নামকরণ হইল সয়াজী রাও (তৃতীয়) এবং ২৭ শে মে ১৮৭৫ সালে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ১১ বৎসর ৩ মাস মাত্র; তাঁহার জন্ম তারিখ ১৮৬৩ সালের ১৭ই মার্চ্চ। এই দত্তকপুত্রই আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় বর্ত্তমান সয়াজী রাও গায়কবাড়, বড়োদা-অধীশ্বর।

তাঁহার শিক্ষার জন্য এফ, এ, এইচ, ইলিয়ট, সি, আই, ই,

নামক সাহেব সিভিলিয়ন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েকটি অভিজাত বংশীয় বালক লইয়া একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা মতন করিয়া মহারাজাকে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রত্যহ ১০॥০ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পাঠ ও প্রাতঃ সন্ধ্যা ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছয় বৎসরের কঠিন সাধানা ও সংযমে মহারাজা দেহ মনে সুস্থ সবল বীর হইয়া উঠিলেন। রাজ্যভার গ্রহণের সময় সন্নিকট হইলে তাঁহাকে রাজ্য পরিচালন প্রণালী শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে হইল। এইরূপ ছয় বৎসরের সাধনা সংযমে গুরুভার কর্ত্তব্যবহনের উপযুক্ত হইয়া ১৮৮১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

একটা প্রবচন আছে 'উঠন্তি গাছের পত্তনে পরিচয়'; এবং ইংরাজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ ওয়ার্থ বলিয়াছেন The child is the father of the man. এই মহাপুরুষের বাল্য-জীবনেও ভবিষ্য মহত্ত্বপরিচয় প্রকট দেখা গিয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিয়মী ও মিতাচারী; এই গুণের সহিত অধ্যবসায় সংযুক্ত হইয়া শিক্ষাবস্থায় তাঁহার দেহ মনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তাঁহার পাঠনার দ্বিতীয় বর্ষেই তিনি ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনসক্ষম হইয়াছিলেন। বাল্যেই তাঁহার সকল কর্ম্মে সহজতা, মহত্ত্বব্যঞ্জিত নম্রতা, আত্মবশিত্ব, মেজাজের সমতা, চিন্তাশীলতা ও প্রকৃষ্ট ভব্যতার পরিচয় পাওয়া যাইত। সেই সকল গুণ এক্ষণে তাঁহার কর্ম্মে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে দেখা যায়—তাঁহার রাজ-কার্য্যের শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, অসুবিধার প্রতিকূলে ধৈর্য্যশীল অধ্যবসায়ে কর্ম্ম নির্ব্বাহ দ্বারা ও সামাজিকতা, ভব্যতা, নম্রতা, অনাড়ম্বরতা দ্বারা তিনি প্রকৃত প্রকৃতিরঞ্জন রাজা হইয়াছেন এবং দেশ বিদেশে গৌরব ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ২৫ বৎসর রাজকার্য্যের পরে তাঁহাকে আমরা যশোমাল্য বিভূষিত রাজারূপে শুধু দেখিতেছি না, তাঁহাকে আমরা দেশহিত-ব্রত কর্ম্মীরূপে আমাদেরই নেতারূপে পাইয়া ধন্য ও গৌরব বোধ করিতেছি। তিনি শিক্ষিত, সক্ষম, তৎপর ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের অগ্রণী; তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া আমরা আজ আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছি।

মহারাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮০ সালে তাঞ্জোর রাজবংশের রূপগুণসম্পন্না এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজকে রাজ্যাধিকারী পুত্র উপহার দিয়া স্বর্গপ্রস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারই পুত্র কুমার ফতেসিংহ রাও, যুবরাজ। পরলোকগতা মহিষীর স্মরণার্থ বড়োদার প্রধান বিচারালয়ের নামকরণ হইয়াছে 'চিমনাবাঈ ন্যায়-মন্দির'। এই মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিন (১৮৮৭ সালের ২৮শে মে) তিনি মহিষীর গুণোল্লেখ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, 'নম্রস্বভাবা, প্রিয়কারিণী, করুণাময়ী—যিনি স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী ছিলেন—সেই স্বর্গীয়া মহিষীর স্মরণার্থ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল'। মহারাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানা মহিষীও মহারাজের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী; তিনি লোকহিতে উৎসাহসম্পন্না, উন্নত-মনা শিক্ষিতা। ইনি কলিকাতা-মহিলাসমিতির নেত্রীরূপে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর সযত্নপ্রণিধানযোগ্য। মহারাণী দেওয়াসের মহারাষ্ট্র-রাজবংশসম্ভূতা। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। মহা-রাণীকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার দুইবার হইয়াছিল; বড়োদায় লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে দূর হইতে এবং কলিকাতায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে নিকটস্থ হইয়া; তাঁহার উন্মুক্ত স্বাধীনতারমধ্যে বিনম্রসরমের শালীনতা আমার মনে বৈদেশিক সঙ্কোচরহিত স্বাধীনতার মূর্ত্তির সহিত ভারতীয় স্বাধীনতার পার্থক্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। মহারাণী অনর্গল ইংরাজি বলিতেছিলেন য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন (অধুনা আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়া-ছেন), কিন্তু তথাপি তাঁহাকে শ্রীহীনা মেম সাহেবের পরিবর্ত্তে সতীসৌভাগ্যের সিন্দূরবিন্দুশোভিতললাটে আমাদেরই মাতৃমূর্ত্তিরূপে পরিচয় পাইয়া যে সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা সহমর্ম্মীর অনুভাব্য, আমার বর্ণনীয় নহে। তিনি আমাদের দেশের ঘোমটাটানা কনেবউদেরও যেমন আদর্শ, উগ্র সাহেবিয়ানাগ্রস্ত শালীনতাহীনা মহিলাদিগেরও তেমনি আদর্শস্থানীয়া। বিদেশী জিনিষ নিজস্ব করিয়া লইতে না পারিলে, তাহা চক্ষুশূল হইয়া থাকে। ইহা পারে নাই বলিয়াই ভারতী-ইঙ্গ এত হাস্যাস্পদ ও পারিয়াছে বলিয়াই জাপানী জগৎমান্য; মহারাণীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের সহিত শালীনতার সম্মিলন, সরলতার সহিত রাজ্ঞীজনোচিত গাম্ভীর্য্যদীপ্তির সম্মিলন হইয়া তাঁহাকে মহারাজার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও ভারত-মহিলার নেত্রীস্থানীয়া আদর্শ করি-য়াছে।

অল্পদিন হইল যুবরাজ ফতেসিংহের বিবাহ হইয়াছে। তিনি দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের ফলতান রাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছে। এক্ষণে তিনি বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। তিনি এখান হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ফতেসিংহ যুবরাজ খুব বীরধর্ম্মা; তিনি অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি কর্ম্মে যথেষ্ট সক্ষম ও উৎসাহসম্পন্ন। বড়োদায় গিয়া নর্ত্তনপর বেগবান অশ্বের উপর ফতেসিংহ যুবরাজের যে তেজস্বী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজো আমার অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে। যুবরাজের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল যে তিনি বিলাতে গিয়া সমরবিদ্যা শিক্ষা করেন; কিন্তু আমা-দের দেশে এখনো সমরশিক্ষার আবশ্যকতা আসে নাই, পরন্তু রাজ্যশাসন সক্ষমতার (administrative effi-

ciency) অভাব এখনো পূর্ণ হয় নাই; এই জন্য সকল সচিবের মতানুসারে যুবরাজ বৈষয়িক ব্যবহার (civil education) শিখিতে প্রেরিত হইয়াছেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে রাজকীয় কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সচিবের নিকট তিনি রাজকার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয় তাঁহাকে রাজস্বতত্ত্ব ও সম্পত্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। রাজকুমারদিগের শিক্ষাপ্রসঙ্গে মহারাজ গায়কবাড় বলিয়াছিলেন 'রাজ্যভার যখন ত্যাগ করিবার সময় আসিবে, তখন তাঁহার উত্তরাধিকারী যাহাতে শাসনপদ্ধতি অবিকৃত রাখিয়া আরো উন্নতি করিতে পারে তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা চিন্তিত ও যত্নশীল। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কুমারদিগকে এমন শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন যাহা তাঁহার নিজের ভাগ্যেও ঘটে নাই। ভারতের রাজন্য ও অভিজাত সম্প্রদায় প্রাচীনতা, বংশমর্য্যাদা ধন ও ঐতিহ্য পরম্পরা দ্বারা দেশের ও সমাজের প্রকৃত নেতা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সদ্গুণ চিত্ত ও চরিত্রে সেই গুরু কর্ত্তব্যপালনের অনুপযুক্ত হইবেন, জাতীয় দুর্দ্দশা সেই পরিমাণে অধিক হইবে। কুমারদিগের শিক্ষার জন্য একেবারে একটা আদর্শ রকমের শিক্ষার ফরমাস দেওয়া অসম্ভব, সাধারণ শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের বিশেষ কর্ম্মের উপযোগী করা আবশ্যক। এইরূপে সাধারণ শিক্ষার দ্বারাই রাজকুমারগণ দেশের জনসাধারণের সহিত সহমর্ম্মী, সমধর্ম্মী হইতে পারে। সেই শিক্ষার সঙ্গে য়ুরোপীয় শিক্ষা তাঁহাদিগকে বিশেষ কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া দিবে মাত্র। যুবরাজ ফতেসিংহ এই মতানুযায়ী এদেশে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কুমার জয়সিংহ রাও ইংলণ্ডের হ্যারো স্কুলে পড়িতেছেন। দুই ভাই একত্র বিলাত গিয়াছেন। তৃতীয় কুমার শিবাজীরাও গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছেন। রাজকুমারী ইন্দিরা বাজা বড়োদার রাজকুমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, ইংলণ্ড অবস্থান কালে ইষ্টবোর্ণ স্কুলে কিছু দিন পড়িয়াছেন; ইনি খুব বিদ্যানিপুণা। কনিষ্ঠ কুমার ধৈর্য্যশীল রাও বড়োদার রাজকুমার স্কুলে য়ুরোপীয় অধ্যাপকের নিকট শিক্ষিত হইতেছেন।

মহারাজা নিজ জীবনে শিক্ষার মূল্য বুঝিয়া, অপরাপর রাজন্যবর্গের জীবনে শিক্ষার অভাবে দুর্দ্দশা দেখিয়া শিক্ষাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। ২৫ বৎসর রাজ্য পরিচালনার মধ্যে দেশ হিতে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, শিক্ষা সংস্কার ও বিস্তার ব্যবস্থা তাহার সর্ব্বোত্তম। তিনি বলেন 'গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন কার্য্য প্রণালী হইতে তাহাকে বিচার করা অপেক্ষা বিচারের সহজ পন্থা হইতেছে শুধু দেখা যে সেই গভর্ণমেণ্ট মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা করা। যৎকালে সাধারণতন্ত্র প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তৎকালে অজ্ঞ প্রজা বড় ভয়ানক, সামান্য উত্তেজনায় তাহারা অনর্থের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। শিক্ষার দ্বারা প্রজাসাধারণের হিতাহিত বোধ জন্মে, এবং তাহারা বোধশক্ত হয়।' সিমলায় শিক্ষাসমিতিতে লর্ড কর্জ্জন ঠিক এই কথাই বলিয়া সাধারণ শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

গত শিল্প সমিতিতেও মহারাজ বলিয়াছেন, 'অভিজাতসম্প্রদায় ও সাধারণজনের স্বার্থ এক; যাহা একে উন্নত করে তাহা অপরকেও বাদ দেয় না; যাহা একে অধঃপাতের দিকে টানে তাহা অপরকেও ছাড়িয়া কথা কয় না।'

তাঁহার রাজ্যে বে-খরচা প্রাথমিক শিক্ষা ও জবরদস্তি শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। তিনি যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা এখনো কল্পনা জল্পনা করিতেছেন।

মহারাজ শুধু নিজ প্রজার শিক্ষার উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত নহেন; ভারতের সকল প্রদেশের গুণী লেখক, দুঃস্থ বিদ্বানের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রস্তুত আছে। ক্ষুদ্র বড়োদা রাজ্যটুকুই তাঁহার আপনার নহে, সমগ্র ভারত তাঁহার প্রিয়। সেই জন্যই সমগ্র ভারতের লোক তাঁহাকে এরূপ প্রীতিশ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিয়াছে, তাঁহাকে সম্মান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছে।

তিনি সমাজসংস্কারক ও নানা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পৃষ্ঠপোষক। যেখানে সংস্কারের চেষ্টা সেখানে উন্নতির শুভকামনা পরিদৃষ্ট, মহারাজের মুক্ত বদান্যতা সেখানেই পরিদৃশ্যমান।

মহারাজা রাজা রবিবর্ম্মাকে দিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপন প্রাসাদে রক্ষা করিয়াছেন। গুণজ্ঞ মহারাজা এইরূপে গুণের উৎসাহ দিয়া সকল দেশের গুণীর মর্য্যাদাবৃদ্ধির সতত প্রয়াসী।

যিনি প্রজাহিতেচ্ছু তাঁহার সতত চেষ্টা থাকে গুণী সংগ্রহ করিয়া প্রজাদিগকে উপকৃত করা। ইহারই ফলে আমরা তাহার রাজ্যে রাজা সার টি, মাধব রাওয়ের মতন মন্ত্রী, রমেশ দত্তের মতন মন্ত্রী, অধ্যাপক গজ্জরের মতন রাসায়নিক, অরবিন্দ ঘোষের মত সেক্রেটারী পর পর রত্নমালার মত দেখিতে পাইয়াছি। এই রত্নমালার মধ্যমণি ছিলেন মাধব রাও। তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বড়োদা রাজ্যের কয়েকটি গোলমাল নির্ব্বিবাদে মিটাইয়া আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহির্বিষয়ক বন্দোবস্তের ভার মন্ত্রিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজা অন্তর্বিষয়ের সংস্কার আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে যে, সংস্কার-পরম্পরা অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা বহু। ভূমিকর সম্বন্ধে জরিপ করিয়া রাজস্ব



সম্বন্ধে জটিলতত্ত্ব মীমাংসা ; রাজস্ব নিয়ম সংস্কার ; প্রজার কর লাঘব ; চুঙীমাশুল হ্রাস ; বড়োদায় কাপড়ের কল স্থাপন ; ন্যায়মন্দির প্রভৃতি স্থাপন ; সাধারণ উদ্যান সংস্কার ; জলের ব্যবস্থা ; রাজপথ সুপ্রশস্ত করিয়া পথে বৈদ্যুতা-লোকের ব্যবস্থা ; রেল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। সৈন্যসংস্কারে তিনি যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য ; সৈন্যদিগকে যথাসম্ভব আধুনিক সমরকৌশল শিক্ষা দিয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে দীক্ষিত করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অধিক রাখিবার ইংরাজের হুকুম নাই। মহারাজা প্রজাবর্গকে সমরদীক্ষিত বীর করিবার অভিপ্রায়ে একদলকে শিক্ষিত করিয়া পেন্সন দিয়া বিদায় দিতেন ও অপর দলকে শিক্ষিত করিতেন, এইরূপ তিন বারের পর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া ঐরূপে প্রজাসাধারণের অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে তাঁহার সৈন্যই কেবল আধুনিক সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত, অন্য সকল রাজ্যের সৈন্য কতকটা জাঁকজমকের সজ্জারূপে ও কতকটা রাজগর্ব্ব সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অনর্থক অপব্যয় জন্য রক্ষিত হইতেছে।

মহারাজা ক্রমে ক্রমে রাজকার্য্যের এমন শৃঙ্খলা নিয়ম করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে কার্য্য কলের মত নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। এখনো ব্যবস্থার বিরাম নাই। মহীশূর রাজ্যের আয়ব্যয় হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা উন্নত জানিয়া সেই রাজ্যের অনুষ্ঠিত প্রণালী শিক্ষার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন। মহীশূররাজ্যও খুব উন্নত এবং কোন কোন বিষয়ে বড়োদা হইতেও অগ্রগামী।

১৮৮৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যকাল আরব্ধ-কর্ম্মের পরিমার্জ্জনে ব্যয়িত হইয়াছে বলা যায়। এই সময়ে শিক্ষার জন্য আমেরালী তালুকে জবরদস্তি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় ; বড়োদা সহরের ড্রেন ব্যবস্থা ; রাজ্যের ফৌজদারী দেওয়ানী আইন প্রণয়ন ; মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা ; প্রভৃতি হয়। সহরে সহরে মুনিসিপালিটির ব্যবস্থা করিয়া প্রজাদিগকে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও এই সময়ে মহারাজ করেন।

এই সময়ে ফৌজদারী দেওয়ানী বিচার বিভাগের পৃথক করণের ইচ্ছা মহারাজের হয়। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার জন্য তিনি ইচ্ছা কর্ম্মে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ১৯০৩-৪ সালে আংশিকভাবে ও ১৯০৪-৫ সালে সম্পূর্ণ পৃথককরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা প্রতিবৎসর কংগ্রেসে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহার জন্য ব্যর্থ আবেদন করিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছি, মহারাজা গায়কবাড়ের প্রজাবৃন্দ সেই সুখ ভোগ করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রমেশ দত্তের দ্বারা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনিই এক্ষণে নামে না হইলেও কর্ত্তব্যে প্রধান সচিব। তিনি পেন্সন লইয়া ইংরাজের কার্য্য পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে গায়কবাড় তাঁহাকে রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত করেন। লর্ড কার্জ্জন স্বাধীনচেতা লোকের পরস্পর মিলন দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া মহারাজার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন যে কেন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের মত না লইয়া রমেশ দত্তকে সচিব নিযুক্ত করিয়াছেন। মহারাজ উত্তর দিলেন যে প্রধান সচিব নিযুক্ত করিতেই গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী দরকার, অন্য সচিবসম্বন্ধে নহে। লর্ড কার্জ্জন নিষ্ফল ক্রোধে স্ফীত হইয়া নূতন নিয়ম প্রণয়ণ করিলেন, অতঃপর কোন দেশীয় রাজা সিভিলিয়ান নিযুক্ত করিতে চাহিলে ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা করিবে। মহারাজের স্বাধীন চিত্ততা ও ইংরাজপূজাবিমুখতা দেখিয়া সাম্রাজ্যধর্ম্মী লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে কখন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই এবং তাঁহার রাজ্যে অধিকবার পদার্পণ করিয়া মহারাজাকে অনুগৃহীতও করেন নাই। লর্ড কার্জ্জনের মত ধূর্ত্তও মহারাজের বুদ্ধির নিকট একাধিকবার ব্যাহত হইয়াছিলেন।

রাজা সার টি মাধব রাওর সময় পুরাতন আইন সার্কুলার দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইত। ৮৮১ সালে মহারাজা শাসনভার গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ সালে এক ল কমিটি গঠন করেন ; ১৮৯৯ সালে তাহা ভাঙিয়া যায়। ১৮৯২ সালে মিঃ জে, আর নেলর, সি,আই,ই, বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব আইন উপদেশককে নূতন আইন প্রণয়ণে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে শেষ হুজুর-আপীলের জন্য ন্যায় সভার প্রতিষ্ঠা হয়। বরিষ্ঠ সভা হইতে আপীল হুজুরের ন্যায় সভায় হইতে পারে।

১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের মধ্যে ১২৬ প্রকার কর রহিত করেন। এই সকল কর হইতে ৭৫৮৩২৲ টাকা আয় হইত। তৎপর ১০ বৎসরে ১৯৫৫৭৲ টাকা আয়ের ৮০ প্রকার কর রহিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৭-৯৮ এক বৎসরে ৬৯টি কর রহিত করেন। এক্ষণে সর্ব্বত্র বিধিনিয়মিত আয়কর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই কর ধনীর দেয়, দরিদ্রের নহে।

১৯০০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজা স্বয়ং সমগ্র রাজ্য পরিদর্শন করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময় সাহায্যপ্রাপ্ত মজুরদিগের দ্বারা বড়োদারাজ্যের প্রসিদ্ধ বাঁধ নির্ম্মিত হয়। বড়োদা একপ্রকার মরুরাজ্য। এই বাঁধ নির্ম্মাণে জলসঞ্চয়ের সুবিধা হওয়ায় প্রজাসাধারণের স্থায়ী উপকার হইয়াছে। সেই সময় মহারাজা দুর্ভিক্ষ-সাহায্যপ্রণালীর যেরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তিনি বলিয়াছিলেন —'দুর্ভিক্ষের সাহায্যকার্য্য ত্রিবিধ। (১) যাহা সাময়িক

সাহায্য মাত্র; এরূপ সাহায্য শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, অশক্ত লোকদিগের পক্ষে; এবং সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার জন্য যাহারা কোন প্রকার কার্য্য করিয়া সাহায্য লইতে অক্ষম, যেমন পরদানসিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য। (২) যাহা পরোক্ষভাবে ভবিষ্য মঙ্গলপ্রসূ হয়, যেমন পথ ও রেল তৈয়ারি। এবং (৩) যাহা প্রত্যক্ষ কল্যাণকর, যেমন কূপ খনন, বাঁধ দ্বারা জল রক্ষা, ক্ষেত্র সেচন ব্যবস্থা, খাল তৈয়ারি, প্রভৃতি যাহা ভবিষ্য দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধক ও শস্যোৎপাদন কার্য্যে সহায়'। ১৯০০ সালে বড়োদার বাঁধ এই তৃতীয় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছিল।

সেই ১৯০০সালেই মহারাজা য়ুরোপভ্রমণে গমন করেন। সেই সময় হইতে তিনি লোকপরিচিত হইতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে আমাদের একটা উৎকট ধারণা আছে। একদল একেবারে জাতীয়তা বর্জ্জিত পৌনে ষোল আনা সাহেব; আর একদল অনুদার সঙ্কীর্ণচিত্ত গোঁড়া। মহারাজা গায়কবাড় যখন বিলাত গেলেন, তখনো তাঁহার প্রকৃতি কেহ জানিত না; একজন মহারাষ্ট্রীয় রাজাকে হঠাৎ সকল সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বিলাতযাত্রী দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়াছিল এবং জাতীয়তা নষ্ট করিয়া সাহেব সাজিতে দেখিবার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজা সকল আশঙ্কা মিথ্যা করিয়া দিয়াছেন; এমন জাতীয়তা রক্ষণশীল স্বদেশী মহারাজা আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অতি বিরল। এই সময়ে মহারাজা বক্তারূপে, দেশব্রতরূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ১৯০২ সালে আহম্মদাবাদের কংগ্রেস সংলগ্ন প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন; লোকের ধারণা ছিল কংগ্রেসের নামলিপ্ত বিষয় হইতে ভারতের ভূস্বামীগণ, কি নাম গোত্রহীন জমিদার আর কি করদ-ভূপতি, জলাতঙ্ক রোগীর মত চমকাইয়া পশ্চাৎপদ হইতে থাকেন। মহারাজ গায়কবাড়ের নির্ভীক সদ্দৃষ্টান্তে আমরা বাংলার প্রধান প্রধান জমিদার মহাশয়দিগকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সাহায্যকারী পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। সেই সময় হইতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্ক ভিন্ন (কারণ সেরূপ করিতে ভারতগভর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে) কংগ্রেসের অন্যান্য ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতেছেন।

মহারাজের বাক্যের সহিত কর্ম্মের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি স্বদেশের শিল্পপণ্যের উন্নতির জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা যেমন আমাদের প্রণিধান-যোগ্য, তিনি স্বীয় রাজ্যমধ্যে নানাপণ্যের কল স্থাপন করিয়া, নূতন শিল্প প্রচলনের চেষ্টা করিয়া, স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার দ্বারা স্বদেশীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, বাক্যে, কর্ম্মে আমাদের আদর্শ হইয়াছেন। স্বীয় রাজ্যে রেশমচাষের ব্যবস্থা করিবার জন্য ৮ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা দেশের অবস্থা পরীক্ষা করাইয়াছেন; এই নূতন শিল্প শীঘ্রই গৃহীত হইবে। বড়োদার স্বনামপ্রসিদ্ধ কলাভবন নানা বিষয়ে কারিগরী শিক্ষা দিয়া প্রজাপুঞ্জকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করিতেছে। মিউজিয়মে যে কত শিক্ষণীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যে দেখিবে সেই মহারাজের শিক্ষানুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। বড়োদার কলেজও অতি উৎকৃষ্ট।

১৯০৩ (?) সালে মহারাজা ও মহারাণী যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখনই বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত। শ্রীমতী সরলা দেবীর শক্তিসংঘ বীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলচর্চ্চা করিতেছে, শিবাজী উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব প্রভৃতিতে বীরপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে, মদনমোহন ত্রিভঙ্গিম-ঠাম বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণের (জ্ঞান ও বলের সমন্বিত মূর্ত্তির) পূজা হইতেছে, রঙ্গমঞ্চে ভীষণ জনতার সম্মুখে রাতের পর রাত প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অভিনীত হইয়া বাঙালীর পিতৃধনের পরিচয় দিতেছে, বাস্তবিক তখন "নবজীবনের পসরা বহিয়া এসেছে কালের তরণী", এবং তখন মহারাজ গায়কবাড় বঙ্গের বলকেন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই দেশহিতেচ্ছু স্বাধীন-প্রাণ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও মান্য দেখাইবার জন্য যে কিরূপ হুড়াহুড়ি লাগিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্য ক্রমে আমি তিন স্থানে উপস্থিত ছিলাম; বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সভায়, শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে ও সঙ্গীত সমাজে। প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তদগ্রগামী চাপরাসীকেই মহারাজা স্থির করিয়াছিলাম; কারণ তাহার পোষাক পরিচ্ছদের বাহারই বা কি এবং তাহার দেমাকভরা চলিবার কায়দাই বা কি, সকলই রাজোচিত ছিল; আর তাহার পশ্চাতে সাদা চুড়িদার পায়জামা ও সুনিদার চাপকান পরিয়া, লাল শালু কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিয়া বিনয়নম্র ছোট্ট মানুষটি ভিড়ের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া দিয়া আসিতেছেন যিনি, তিনি ত' ঠিক মাড়োয়ারি পটির চিরপরিচিত কাপড়ের দালালের মত। হায় নির্বোধ আমরা মহত্ত্বের আত্মবিলোপ দেখিয়া ভ্রান্ত হইব আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বত্রই তাঁহার চিত্তরঞ্জনার্থ তামাসার আয়োজন ছিল, কিন্তু তাঁহাকে সেদিকে মনোযোগী দেখি নাই, সর্ব্বদা কাজের কথা লইয়া ব্যস্ত, সর্ব্বদা বিনীত উপদেশ লইয়া প্রস্তুত। ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী ছোট ছোট বালকদের তরবারি ক্রীড়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের পেশী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যান্ত প্রসৃত; তাঁহার চিত্ত উপায় দেখিয়া সন্তুষ্ট নহে সিদ্ধির জন্য ব্যগ্র।

তিনি কিরূপ জাতীয়তাপূর্ণ স্বদেশী তাহা একটি দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা যায়। সেই সময় কলিকাতার কোন ধনীগৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। সদ্য বিলাতপ্রত্যাগত মহারাজের জন্য সেই ধনী বিলাতী খানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহারাজ তাঁহাকে ইহার জন্য লজ্জা দিয়া বলিয়াছিলেন 'আমি ভারতী, আপনি ভারতী; আপনার গৃহে এরূপ বিজাতীয় অভ্যর্থনা আমি আশা করি নাই।' এই শিক্ষায় সঙ্গীত সমাজ ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, সুক্ত ও মোচা ছেঁচকির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহারাণীও ষোল আনা স্বদেশী। মহিলাসমিতিতে কোন মহিলার অঙ্গে বিলাতী কাপড় দেখিয়া তিনি তীব্র ভৎসনা করিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিয়াছিলেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশী ও দেশহিতেচ্ছু।

মহারাজা সামাজিক সংস্কারের জন্য যথেষ্ট যত্নশীল। মহারাজা বিধবা-বিবাহ ন্যায্য বলিয়া ও বালবিবাহ দূষ্য বলিয়া দুইটি বিধি প্রচলিত করিয়াছেন; ছুত ও জাতিনাশের বাধা দূর করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দৃষ্টান্তে আয়ত্ত করিতেছেন। মহারাণী স্ত্রী-শিক্ষার জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া মহারাজের সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। তাঁহারা বলেন সকল প্রকার উন্নতি পরস্পরাপেক্ষী—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিল্পসম্বন্ধী, নৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয় সমান-ভাবে অগ্রসর না হইলে কখন কোন জাতির অভ্যুদয় হয় না। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা উভয়ে প্রাণমন দিয়া কর্ম্ম করিতেছেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মহারাজা বলেন যে 'আশান্বিত হইবার কারণ আছে কিন্তু আনন্দো-দ্বেলিত হইবার কোন কারণ নাই।'

স্বদেশী ব্রতের মধ্যে যে কষ্ট স্বীকার যে স্বার্থত্যাগ আছে তাহা স্বীকার করিয়া মহারাজা দেখাইয়াছেন যে আপনার সুখ খর্ব্ব না করিলে দেশের দশের কল্যাণ নাই। কিন্তু স্বদেশী হইলেই যে গোঁড়ামি করিতে হইবে তাহা নহে; যে গোঁড়ামী করিবে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত; ভারতের অধঃপাত এই গোঁড়ামির জন্য। জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাময়িক ব্যবস্থা করিতে হইবে; পরিবর্ত্তন জাগতিক ধর্ম্ম—যে না বুঝিয়া রক্ষণশীল হইবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, ব্যবহার প্রভৃতি সকল-ক্ষেত্রেই অগ্রসর নীতি অনুসরণীয়। ভারতের অধিকাংশ জাতিকে সমাজ অস্পৃশ্য হেয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া সমান সুবিধা দেওয়া দরকার। আমাদের সর্ব্বাঙ্গ—স্ত্রী ও দ্বিজভিন্ন জাতি, বিকল ও পঙ্গু, আমরা উঠিব কেমন করিয়া? সমগ্র জগতে যখন সাম্য মন্ত্র ঘোষিত হইতেছে, তখন জাতিবন্ধন, অবস্থার তারতম্য ঘুচাইতে না পারিলে আমরা জগতের প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামে কখনই জয়ী হইব না। আমাদের ধনসঞ্চয় করিতে হইলে বাণিজ্যব্যাপারী হইতে হইবে; বাণিজ্য করিতে হইলে বহুজাতি একত্র হইয়া দেশ বিদেশে ছুটিতে হইবে; অতএব সঙ্কোচ, দ্বিধা, ক্ষুদ্রতা, বিরোধের কাল আর নাই।

ভারত চিরদিন তাহার ধর্ম্ম ও নীতির জন্য, আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। পরাধীন জাতির আধ্যাত্মিকতাও স্ফূর্ত্তি পায় না। ইহা বুঝিয়া গায়কবাড় বলিয়াছেন 'শিল্প বাণিজ্যে যেমন একদিকে উন্নতি করিতে হইবে অপর দিকে আমাদের চিরন্তন কালের সরল মর্য্যাদাজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ভারত প্রতীচ্যের নিকট ঐহিক উন্নতির পন্থা শিখিয়া তাহাদের পারত্রিক সদ্গতির পন্থা নির্দ্দেশ করিবে।'

সম্প্রতি বড়োদায় আর একটি তুলার কল স্থাপিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে মহারাজা যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন 'আত্মপ্রত্যয়ী হও, আপনার শক্তি নির্ভর হও; সকল বিষয়ের জন্য পরের, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইও না। সমর্থ হও, আত্মনিষ্ঠ হও, আপনার শক্তি বুঝিতে শিখ, আপনাকে আপনি সাহায্য করিতে শিখ। যাহারা আপনার সাহায্যে রত হয়, গভর্ণমেণ্টও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। প্রজার সমবেত শক্তিই রাজশক্তি। প্রজাশক্তি যতক্ষণ দুর্ব্বল থাকে রাজশক্তি ততক্ষণই অমনোযোগী থাকে; প্রজাশক্তি আদায় করিতে উদ্বুদ্ধ হইলে রাজশক্তি সকল সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। অতএব সকলে কর্ম্মরত হইয়া আপনাদের উন্নতি ও মঙ্গলের পন্থা পরিষ্কার কর।'

মহারাজা স্বদেশীর পক্ষপাতী; কিন্তু একেবারে বিদেশ-বর্জ্জনের নহে। তাঁহার মত প্রেমমূলক, বিরোধপন্থী নহে। তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলেন যে, বিদেশের শিক্ষণীয় সকল গুণ আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব করিয়া লও, তাহাদের কল কারখানা আয়ত্ত করিয়া স্বদেশী কর এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতা শিখাও। এই আদান প্রদানের সংযোগ না থাকিলে সকল দেশ সমানভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, আমরা যেন আর সেরূপ ভ্রমে পতিত না হই।

সম্প্রতি এই রাজদম্পতি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া, দেশে ফিরিয়াছেন। আমেরিকার কর্ম্মোৎসাহ, ব্যবসায় শৃঙ্খলা, বিজ্ঞানোন্নতি দেখিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছেন; আমেরিকার নিকট আমাদিগকে ইহা শিখিতে উপদেশ দিতেছেন। মহারাণী মুগ্ধ হইয়াছেন আমেরিকার স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া; তিনি বলিয়াছেন 'পুরুষের পশ্চাতে রমণী যদি উৎসাহ সান্ত্বনা লইয়া দাঁড়ায় তবেই পুরুষ জীবন-সংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারে; মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িবেন শিশু তেমনি হইবে; সুমাতার গঠিত সন্তান যদি সুপত্নীর সাহায্য লাভ করেন, তবে তিনি কতদূর কর্ম্মক্ষম হয়েন, তাহার দৃষ্টান্ত আমেরিকা। স্ত্রীলোকেই সাম্রাজ্য গড়ে, পুরুষ উপলক্ষমাত্র'। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া এই সকল গুণ আমাদিগকে আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব

করিতে হইবে; অবশ্য আমরা হীন অনুকরণ করিব না; আমেরিক মহিলার সান্ধ্যপরিচ্ছদ কখন আমাদের দেশে আমদানি করিব না—যাহা ঘৃণাস্পদ তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া শুভকে সর্ব্বত্র হইতে সঞ্চয় করিয়া জীবনের ও দেশের সামগ্রী করিয়া লইব। জাপান বিদেশের সংশ্রব ত্যাগ করে নাই, আমরাও একেবারে ত্যাগ করিব না, করিতে পারি না; সম্পূর্ণ বিচ্ছেদেই আমাদের অবনতি, সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের মন্ত্রণা মরণেরই জন্য।

মহারাজার আমেরিকা পরিদর্শন পরিসমাপ্ত হইলে, তাঁহার মনের উপর আমেরিকার প্রভাব সম্বন্ধে সংবাদপত্রওয়ালারা বহু প্রশ্ন করিয়াছিল। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এক প্রশ্ন 'আমেরিক সুন্দরীদের কেমন দেখিলেন'? আমেরিক সুন্দরী পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী অপূর্ব্ব। মহারাজ কিন্তু তাঁহাদের রূপের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। খবরের কাগজওয়ালারা লিখিল 'মহারাজ গায়কবাড় অন্ধ'!

দেশীয় রাজন্যপ্রধান গায়কবাড় য়ুরোপ প্রভৃতি দেখিয়া যেরূপ প্রজাদিগকে নবজীবনে শিক্ষিত দীক্ষিত করিতেছেন, সকল রাজন্য যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্ধচালনার সুবিধা ও কৌতুক ঘুচিয়া যাইতে পারে—এই ভয়ে লর্ড কার্জ্জন আইন করিয়া গিয়াছেন যে, কোন করদ মিত্র রাজা ভারতের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে।

এই রাজ-দম্পতি সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে; জোর করিয়া আমরা লেখনী সংযত করিয়া চলিয়াছি, নতুবা প্রবন্ধকলেবর বিপুল হইয়া উঠিবে। গত ৫ই মার্চ্চ বড়োদার প্রজাবর্গ মহারাজের মঙ্গলময় রাজ্যকালের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহোৎসব করিয়াছেন এবং মহারাজের সকল শুভানুষ্ঠানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ প্রজাদিগকে যে সকল দান করিয়াছেন তাহার তালিকা মাত্র দিয়া ইহার উপসংহার করি।

(১) বাকি খাজানা মাপ (২) মাতৃভাষা শিক্ষা বেখরচা হইবার ব্যবস্থা (৩) দুইটি নূতন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা (৪) য়ুরোপে ছাত্র প্রেরণ জন্য পাঁচটি বৃত্তি প্রদান (৫) সহরে বাজার প্রতিষ্ঠা (৬) গরিবখানা প্রতিষ্ঠা (৭) আতুরাশ্রম স্থাপন (৮) অস্পৃশ্যজাতির জল ব্যবহারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কূপ নির্ম্মাণ (৯) সহরের ঘনবসতি স্থানে উদ্যান রচনা ইত্যাদি।

এই সকল দান হইতে বুঝা যাইবে যে, মহারাজের লক্ষ্য প্রজার বৈষয়িক, মানসিক, নৈতিক, দৈহিক প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতিরই প্রতি।

এই শুভ বৎসরে আমাদের শুধু বলিবার আছে—

'জীব বর্ষ শতং রাজন্, জীবত্বং শরদঃ শতম্'।

আর—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

ত্রিপুরার অন্তঃপুর।

বৈশাখ মাস।

আজ বৈশাখের পহিলা। ঊষার শালিখ ও কাকের আহ্বান-বাণীকে আজ কেহ অবহেলা করিতে পারিলেন না—সকলেই জাগরিত হইলেন।

অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একে একে পুষ্করিণীর ঘাট-সমূহকে নিজ নিজ উপস্থিতি দ্বারা সরসতা প্রদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে বিমর্ষতা বা রাগের আভাস নাই; সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কোনো অন্তঃপুরিকা দাঁড়াইয়া কেহ বা প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; এবং কোনো কোনো পরিচারিকা আপন পার্শ্বস্থিত পুঞ্জীকৃত বাসনের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতুপাত্রগুলির পরিষ্করণ-ব্যাপার শেষ করিয়া আপন কর্ত্তব্যভারের লঘুতা সম্পাদন করিতেছে।

অন্তঃপুরের বৃদ্ধা শ্রেণীর এক জন, এই মাত্র আপনার পিতলের ঘটীটি হাতে করিয়া ঘাটে পদার্পণ করিলেন। তিনি বাৎসল্যের স্বরে আজিকার দিবসের মহত্ত্ব ঘাটের সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, কহিলেন—আজ তোমরা কাহারো সহিত বিবাদ করিও না, আমোদে আহ্লাদে সময়ক্ষেপ কর—বিষণ্ণতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আজিকার দিবস যাহার নিকট যে ভাবে আবির্ভূত হইবে, তাহাকে সম্বৎসর সেই ভাবে কাটাইতে হইবে। অতএব সাবধান, সকলে প্রীতিতে সম্মিলিত থাক; যদি কেহ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে, তাহাকে মার্জ্জনা করিও—তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। বৃদ্ধার এই সদুপদেশ সেই সময় যে-সকল সরলা শিরোধার্য্য করিল, তাহারা বলিল—আজ এই শুভ বর্ষারম্ভে আমরা কাহারো সহিত ঝগড়া করিব না, কেহ আমাদের দুই কথা কটু বলিলেও তাহা গ্রাহ্য করিব না;—আজ একটি দিন অসহিষ্ণু হইয়া কেন সারা বৎসর উত্তেজনায় কাটাইব? আর এক দল, যাহারা মর্ত্ত্যভূমির অধিবাসিনী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যা তাহারা কহিল—আমরা কাহারো প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিব না, তবে মন্দবাণীকে পরিপাক করিবার সামর্থ্য বোধ হয় আমাদের থাকিবে না—সমস্ত বৎসর ভরিয়া শুধু অন্যের বাক্যবাণ সহ্য করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ইহার পর অমনি এক জন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া পরিচারিকা বলিয়া উঠিল যে, সে কাল বহু যত্নে একটি কুসুমগুচ্ছ রচনা করিয়াছিল; রাত্রে ঘুমাইবার আগে তাহাকে তাজা রাখিবার জন্য কুয়ার ধারের বেড়ার

কিনারে ঘাসের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল; তাহার এই কার্য্যটি কাল অবলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করে; আজ আর সেখানে কুসুমগুচ্ছটি পাওয়া যাইতেছে না; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চয়ই অবলা তাহা চুরি করিয়াছে। সে তাহার ঘরে যাইয়া যথাসম্ভব ঐ গুচ্ছের অনুসন্ধান করিবে এবং যদি তাহা অবলার নিকট অথবা তাহার সম্পর্কিত কোনো পদার্থের সহিত দেখিতে পায়, তবে সে সত্য সত্যই তাহার সহিত ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এক দল রমণীকর্তৃক আপনার স্নেহপূর্ণ উপদেশ অবজ্ঞাত হওয়ায়, বৃদ্ধা ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ত্রয়োদশীর এই উদ্ধত বাচালতা তাঁহার সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল;—তাঁহারই দ্বারা ঘাটে সর্ব্বপ্রথম রাগের অভিনয় হইয়া গেল। বৃদ্ধা এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে, রাগের মাত্রা আরো বাড়িয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া, আবক্ষ নিমজ্জিত অবস্থায় সূর্য্যদেবের উদ্দেশে কয়েক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিলেন।

বেলা প্রায় প্রহর অতিক্রম করিতেছে। সূর্য্যদেব বেশ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনেক লোক ঘাটে আসিয়া কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ত্রয়োদশী পরিচারিকা, যাহার মনে তৈজস পরিমার্জ্জন ব্যাপার অপেক্ষা কুসুমগুচ্ছই অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কাজ অল্পই অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর তলপ জানাইয়া গেল। ছোট কাকীমা মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন দানসংক্রান্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৈশাখ মাস প্রত্যহ এক একটি সবস্ত্র জলপূর্ণ কলসী দান করিবেন এই উপলক্ষ্যে আজ সেও যেন কাজ-কর্ম্মে অন্যান্য দাসীর সহায়তা করে। সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দভাবে ঘর্ষণকার্য্য চালাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে সময় তাহার মুখে পরাধীনতার দুঃখচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দাসী আবার আসিল, এবার কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে তাহাকে বলিল—"তোমাকে ডাকিতে কতবার আসিব! এখনও তোমার কাজ শেষ হয় নাই! মনে আছে, বাসন ঘষা ছাড়া তোমার আরো কাজ আছে।" পরিচারিকাটির রুক্ষ স্বরে ত্রয়োদশী অত্যন্ত পীড়া পাইল—তাহার চক্ষু কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইল, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া গেল। সে সামান্য বিকৃত কণ্ঠে কহিল—"আমি কি বসিয়া আছি? দেখিতেছ না আমি কাজ করিতেছি?" অপরাধীর এই শ্রুতি-বিরস রাগিণী আদেশবাহিকাকে বড় বিস্মিত করিল, সে তাহার ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া, আরো বড় করিয়া বলিল—"বাঃ তুমি বেশ লোক ত! বৎসরের প্রথম দিনে আমার সঙ্গে এমনি করিয়া বুঝি ঝগড়া বাধাইবে? কলহভীতা পরিচারিকা এ কথা বলিয়া তথায় আর দাঁড়াইল না।

যে সকল সরলমনাঃ অন্তঃপুরিকা বৃদ্ধার সদুপদেশ প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন এক্ষণে তরকারী সংগ্রহ করিতে বাগানে প্রবেশ করিলেন। এই বাগানটি তাঁহার প্রচুর উদ্যমশীলতার পরিচায়ক। ইহা তাঁহারই ঘরের সম্মুখে পনেরো বর্গহস্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাগানে প্রবেশ করিয়াই অন্তঃপুরিকাটি অত্যন্ত হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন—"কে আমার একটা বেগুন লইল! দেবতার জন্য কাল দু'টা বড় বড় বেগুন বাছিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার একটা কোথায় গেল!" অতিরিক্ত কোন কথা তাঁহার মুখে আসিল না। বিষণ্ণবদনে বারান্দায় ফিরিয়া তিনি হৃতাবশিষ্ট বার্ত্তাকুটিকে ভাজার উপযুক্ত করিয়া কুটিতে বসিলেন। এমন সময় অষ্টমবর্ষীয়া দাসী-কন্যা লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে কহিল—"মা, আপনার বাগানের একটা বেগুন আমার মা পাড়িয়াছে। আজ তাহার অনেক কাজ, শীঘ্র আহারের সময় পাইবে না; তাই বেগুনটির দ্বারা সে কোন প্রকারে চারিটা খাইয়া তাড়াতাড়ি কাজে চলিয়া গিয়াছে। এবং এই কথা আপনাকে জানাইতে বলিয়া গিয়াছে। আমার মা ঐ বেগুনটি পাড়িবার পূর্ব্বে অনেক বার আপনার খোঁজ করিয়াছিল। (প্রণাম করিয়া) মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" অন্তঃপুরিকাটি কিঞ্চিৎ করুণামিশ্রিত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আমাকে যে তোরা তালাস করিয়াছিলি বলিতেছিস্ তা' আমি কি প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম?" বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইল না;—সহসা নৈরাশ্যজনিত যে বিষণ্ণতা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রভুত্ব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

এদিকে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ স্নান-পবিত্র হইয়া তরকারী কুটিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের কেহ বা বারকোসে কেহ বা বৃহৎ থালায় কর্ত্তিত তরকারীগুলি পর্য্যায়ক্রমে স্তূপাকার করিতে লাগিলেন। বড় মাতৃদেবী তরকারী কুটিয়া শেষ করিয়াছেন। উঁহার নির্দ্দেশ মত একজন চাকর তরকারী বিন্যস্ত বারকোসখানি ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের মন্দিরে লইয়া চলিল।

এই অবসরে জ্যেষ্ঠ দৈবজ্ঞ নূতন পঞ্জিকা হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি এবার মাতৃদেবীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাকে পঞ্জিকা শুনাইবার ভার লইয়াছিলেন। ইঁহার আগমনে কতিপয় অন্তঃপুরিকা বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্য তথায় একত্রিত হইল। দৈবজ্ঞঠাকুর কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি পঞ্জিকা-পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

একজন প্রৌঢ়া অন্তঃপুরিকা দাঁড়াইয়া পঞ্জিকা শুনিতেছিল; "অথ সত্যযুগোৎপত্তি"র অর্দ্ধেক বিবরণ শুনিয়াই সে আপনা আপনি ছোট করিয়া মণিপুরী ভাষায় কহিল যে, এবার বৎসরের রাজসিংহাসন কাহার অধিকৃত হইল এবং না জানি তন্ত মন্ত্রীই বা কে হইলেন। ইহার নিকটবর্ত্তী একজন রমণী কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে থামাইয়া বলিল—"আহা! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ক্রমে সকল কথাই জানিতে পাইবে।" কিন্তু সে অপেক্ষা করিতে পারিল না—সকল কাজেই ইহাদের প্রয়োজনের সহিত গুরুতর সম্পর্ক, তাই পঞ্জিকার সত্য-ত্রেতার কথা যদিও তাহার শুনিবার ইচ্ছা ছিল তথাপি কর্ম্মের তাড়নায়, ঐ সকল যুগের কথায় কোন নূতনত্ব নাই, এই দোষারোপ করিয়া সে চলিয়া গেল।

ক্রমে দৈবজ্ঞ ঠাকুর "অথ রাজাত্মানয়নং" পাঠ করিয়া তাহাদের কার্য্যকারিতার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখ-মণ্ডলকে কখনো হর্ষোৎফুল্ল এবং কখনো ভীতিম্লান করিয়া তুলিল। তারপর, যাঁহাদের অদৃষ্ট বর্ষচক্রের চক্রে, সমুদ্রে অথবা গগনে পড়িল, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দ্বারা তাঁহাদের সেই সকল দোষ দূর করিবার নিমিত্ত বস্ত্র, ছত্র, কুম্ভ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা হইল। একজন প্রৌঢ়া রসাতলে ডুবিয়াছিল, তাহার এই দোষের শান্তির নিমিত্ত দৈবজ্ঞঠাকুর যেমন সোনার নাম করিলেন অমনি প্রৌঢ়া রমণীটি ঠাট্টা করিয়া বলিল—"ঠাকুর, তুমি বড় লোভী; তোমার লাভের জন্য সোনার নাম করিতেছ।" অনেকে হাসিয়া উঠিল। বস্তুতঃ এই সকল ব্যবস্থিত দান-ব্যাপার শেষ না হইলে তাঁহাদের কাহারো মনে আর শান্তিশ্রী বিরাজ করিতেছে না।

আজ অন্তঃপুরের অনেকেই কেহ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, কেহ বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া, দেবতাকে কিছু না কিছু প্রদান করিয়াছে। কোনো কোনো অন্তঃপুরিকা দেবতার পরমান্ন রাঁধিবার জন্য আট আনা পয়সা, তরকারীবাহী চাকরদের হাতে গচ্ছিত করিয়াছে। অন্তঃপুরের নিতান্ত দরিদ্রা দাসীও এক সাজি সমঞ্জরী তুলসীপত্র ও যথাসম্ভব দক্ষিণা প্রদান করিয়া পুলকিত হইতেছে। কেহ কেহ বা অক্ষমতা প্রযুক্ত আপনাদের মনের মতন উপহার দেবতাকে উৎসর্গ করিতে না পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিল। আর যাহারা তুলসীপত্রের সাজিখানি লোকের অভাবে বাহিরে পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা এবং ভক্তি-নিয়োজিতা অন্তঃপুরিকার দল, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছোট কাকীমার জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফুল ও সমঞ্জরী তুলসীপত্র ঠাকুরকে সমর্পণ করিল এবং তাঁহাকে চামর ব্যজন করিয়া প্রসন্নচিত্তে মন্দির পরিত্যাগ করিল। আর এক ছোট কাকীমার স্থাপিত পিত্তলের মহাদেবমূর্ত্তিও আজ গো-দুগ্ধে স্নাত হইয়া এইরূপে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিলেন,—ইহার সম্মুখে ভূমিসংলগ্ন কলিকা হইতে গঞ্জিকার ধূম্র উত্থিত হইতে লাগিল।

বারোটার পর অন্তঃপুরের প্রায় সকলেরই আহার শেষ হইয়া গেল। অতঃপর—পাকস্থলীর শীতলতা প্রাপ্তির পর, বিবাদ-বিসম্বাদের আর তেমন আশঙ্কাও রহিল না। এইরূপে বৎসরের প্রথম দিন অন্তঃপুরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিল।

বিকাল বেলা। পিতামহী মহোদয়া তাঁহার কয়জন বৃদ্ধা পারিষদ লইয়া নূতন পঞ্জিকা শুনিয়া শেষ করিয়াছেন; এখন তিনি বারান্দায় বসিয়া পান চিবাইতেছেন। এমন সময় পিতৃদেব বৈঠকখানা হইতে আসিয়া একখানি সুসজ্জিত ফুলের সাজি মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিলেন, এবং এই প্রণামের বিনিময়ে মস্তকে পৃষ্ঠে স্নেহের চুম্বন লাভ করিয়া স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। স্নিগ্ধ প্রদোষে মাতাপুত্রের এইরূপ মধুর মিলন অন্তঃপুরের মাধুর্য্য বাড়াইত।

যাহা হউক, পিতৃদেব বাহিরে চলিয়া গেলেন। পিতা-মহীদেবী হাত-পা ধুইয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ও তাঁহার স্বহস্ত রোপিত তুলসীদেবীর সমীপে বিবিধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তারপর পুনরায় বারান্দায় বসিয়া তিনি জয়দেবের রচিত "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং" ও "বেদানুদ্ধরতে" প্রভৃতি ভগবানের দশবিধ অবতারের স্তোত্র ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পিতামহদেব এদিকে শুভাগমন করিলেন। আমরা একদল পৌত্র-পৌত্রী তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম। মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। পিতামহ মহোদয় প্রদীপ ক্ষীণ করিয়া দিয়া আমাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকটি কথার পর, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মধুর স্বরকে মধুরতর করিয়া, আমাদের জ্যেষ্ঠ দুইজন খুল্লতাতপুত্রীকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া কৌতুকভরে তাঁহাদের কিশোর-হৃদয়ের নবীন প্রেম যে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এতৎ সম্বন্ধে দীর্ঘ গৌর-চন্দ্রিকা সমাপ্ত করিয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে প্রশ্ন করিলেন—"তোমরা কাহাকে ভালবাস?" বলা বাহুল্য হাস্যময়ী ভগ্নী-যুগল পিতামহ মহোদয়কেই বরমাল্য প্রদান করিলেন—তাঁহাদের বাক্‌চাতুর্য্যের অবধি থাকিল না। ইহাতে পিতামহী মহোদয়া যেন বৃদ্ধবয়সের দাম্পত্য উঁহাদের দ্বারা শিথিলীকৃত হইবার সম্ভাবনায় সপত্নীবিদ্বেষের ভাণ করিয়া উঁহাদিগকে কিছু কঠোর বচন শুনাইয়া দিলেন। পিতামহীদেবীর এই আপাত-দৃষ্টিতে কপট ক্রোধের অন্তরালে কোন প্রকৃত ক্রোধের ছায়া লুক্কায়িত ছিল কি না কে জানে? ইহার পর পিতামহ মহোদয় যেন বড়ই আমোদ পাইলেন—তিনি হাসিয়া অস্থির হইলেন।

আমাদের আর এক দল, যাহাদের বয়স ছয় হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের প্রতিধ্বনি করিল, এবং কেহ কেহ বা প্রকৃতির সরলতা-বশতঃ আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গীদিগকেই প্রণয়ের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। যদিও পিতামহ ও পিতামহী দেবীকে ভালবাসি বলিয়া প্রকাশ করিতেই উহারা অভিভাবিকাদের দ্বারা শিক্ষিত হইত, তথাপি পরীক্ষাস্থলে অনেক সময় উহাদের স্বাভাবিক মনের ভাবই ব্যক্ত হইয়া পড়িত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে "বেলভাতা"ব্রত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের অন্তঃপুরে এই ব্রত সন্তানের মঙ্গল কামনায় গৃহীত হইয়া থাকে, এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগের শনিবারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিন্তু ব্রতচারিণীগণ সমগ্র বৈশাখ মাস সূর্য্যদেবের অস্তাগমনের পর আর অন্ন গ্রহণ করেন না।

বৈশাখ মাসে আমাদের অন্তঃপুরে একটী বিশেষ খেলার নিয়ম আছে; তাহার নাম "ঘিলা খেলা"। এই খেলা মণিপুরী মহিলাদের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। খেলার উপকরণ গুলি যদিও আদিম নিবাসে কাষ্ঠময় ও শৃঙ্গজ ছিল, আমাদের অন্তঃপুরে আসিয়া তাহারা হস্তিদন্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আদিমত্বের মায়া যে অপরিত্যাজ্য তাহারই প্রমাণ স্বরূপ দুই চারিটা শৃঙ্গময় উপকরণের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

বাজী ধরিয়া এই খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পক্ষে মাতৃদেবীগণ ও অপর পক্ষে কাকীমাগণ। দুই চারিজন বৃদ্ধাও উভয় পক্ষে যোগদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরস্পরের মধ্যে প্রায় বিশহাত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া এক এক দিক অধিকার করিয়া লইলেন। খেলার সামগ্রীগুলি সহজে গড়াইবার নিমিত্ত তথায় পাতলা করিয়া বালুকা বিস্তারিত হইল। প্রথমে মাতৃদেবী পক্ষের একজন বৃদ্ধা বক্রভাবে দাঁড়াইয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত তিন ইঞ্চি ব্যাস ও অর্দ্ধ-ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট বৃত্ত উপকরণখানি গ্রহণ করিলেন; তার পর আপন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখস্থিত অর্দ্ধ ইঞ্চি উচ্চ ঘুঁটিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না, কাজেই তিনি পুনরায় উহাকে নিক্ষেপ করিবার অধিকারিনী হইলেন। এবারেও তাঁহার সফলতা লাভের পর, উপবিষ্ট হইয়া সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কুলার আকৃতি বিশিষ্ট খেলার উপকরণকে মধ্যমা অঙ্গুলীর সাহায্যে তিনি ঐ ঘুঁটির দিকে চালিত করিলেন। ইহার দ্বারা লক্ষীভূত ঘুঁঠিকে আঘাত করিতে পারিলেই একখানি চিক্কণ বংশ শলাকায় চিহ্ন পড়িয়া যাইবে নতুবা সপক্ষের অন্যান্য ক্রীড়ণশীলাদিগকে পর্য্যায় ক্রমে ঐরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথা ছিল, যে দল এরূপ একশত মার্ক পাইবে তাঁহাদেরই বাজী জিত হইবে। এক পক্ষের অপারগতায় (miss হইলে) অপর পক্ষ ঐরূপে একশত মার্ক লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দুই দিনের খেলায় দেখা গেল, কাকীমাদের জয়-লাভের আশা অত্যন্ত অল্প। ইহাতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল বিষম নিরুৎসাহের কালিমা মণ্ডিত হইল - তাঁহারা খুব গম্ভীর হইলেন। বস্তুতঃ পরদিন তাঁহাদিগকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু কাকিমাদের ইচ্ছায় সেই দিনই উভয় পক্ষের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া নিয়মমত আবার খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ, যাহাতে বিজয়গৌরব তাঁহাদের মুখমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করে, শান্তভাবে তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ বা পরাজয়জনিত রাগের সহিত অশান্তভাবে খেলার উপকরণগুলিকে চালনা করিয়া আপনাদের দুর্ব্বলতা সকলের গোচরীভূত করিলেন। এবং এই কারণে এবার একটি দুর্ঘটনাও ঘটিয়া গেল—কাকীমাদের পক্ষের একটি গোলাকার ক্রীড়া-সামগ্রী কুচালিত হওয়ায় একজন বৃদ্ধা দর্শিকার কপালে আঘাত করিল। বৃদ্ধা বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন; আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি কপালে হস্ত রক্ষা করিয়া, প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায় বৃদ্ধার সহসা উত্থিত উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথাকার সকলের হাসি উৎপাদন করিল। আবার তৎক্ষণাৎ অনেকেই বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন; কেহ কেহ বা ঈষৎ হাসিতে হাসিতে প্রাচীনার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি জন তরুণী যাহারা হাসি থামাইতে পারিতেছে না, তাহারা বেগে সেই স্থান ত্যাগ করিল। বৃদ্ধার আঘাতের স্থান ফুলিয়া কিছু উঁচু হইয়াছে দেখিয়া অনেকে আক্ষেপ করিলেন; ছোট কাকীমা তাঁহার নিকটবর্ত্তী এক গ্লাস জল আনিয়া দিয়া বৃদ্ধাকে উহাতে জলপট্টি দিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

তিন দিনের খেলার পর এই পালায় কাকীমাদের জয়-লাভ হইল। এবং উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীকৃত শাড়ীর অর্পণ-প্রত্যর্পণ হইয়া গেল। বৃদ্ধারা সাদা পাড়ের ধুতি পাইলেন। এই উপলক্ষ্যে কাকীমাদের পক্ষের একজন বৃদ্ধা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, উঁহাদের খেলার স্থান সুবিধাজনক ছিল না বলিয়াই প্রথম বার তাঁহারা হারিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বিপক্ষ অমনি উত্তর করিলেন—তোমাদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া আমাদের দয়া হইয়াছিল—খেলায় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমরা কখন উচিত মনে করি নাই, তাই অবহেলা করিয়াছি। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ছোট কাকীমা হাসিয়া বলিলেন—

আগের বাজী বাঘে খায়,
শেষের বাজী কৃষ্ণে পায়।

একজন চাকরের হাতে ঝুলায়মান খাঁচার ভিতর কয়েকটি

শুক-শিশু বিকালবেলায় সহসা অন্তঃপুরে দেখা দিল। ইহাদের বহুতর গাহিকাও জুটিয়া গেল। কিন্তু যে চারিজন অতিরিক্ত শুকপ্রিয় অন্তঃপুরিকা পূর্ব্বেই এই বৈশাখী ছানার জন্য চাকরকে মূল্য দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য সকলকেই শুক-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইল। তখন তাহারা এই শলাকাপক্ষ কচি ছানাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানা রূপ সমালোচনা করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিলেন না।

কিন্তু এই ছানাদিগকে দেখিয়া যাহাদের প্রকৃতই তোতা পালিবার ইচ্ছা বাড়িয়াছিল, তাহারা ঐ চাকরকে তোতার ছানা আনিবার জন্য ফরমাস দিল; কেহ কেহ বা এজন্য পুরস্কার ঘোষণাও করিল।

এই বৈশাখের কচি ছানার অধিকারিণীগণ খুব প্রফুল্লিত। তাহারা সুবিধামত প্রহরে প্রহরে জল-নিষিক্ত তণ্ডুল দ্বারা ছানার কোমল গলদেশ পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক জন যথেষ্ট শুক-ভক্ত অন্তঃপুরিকা ছানার জননীরূপে মুখে মুখে খাদ্য প্রদান করিয়া ছানাকে বড় করিবার উপায় অবলম্বন করিল। আর যাহারা এই শাবকগুলির নিকট দিয়া ইহাদিগকে অতিক্রম করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মুখনিঃসৃত "ভজ মন দিবা রাত্র শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্র" অথবা "চক্রধর কৃষ্ণ জগত করতা স্মরিত তরাও, কৃষ্ণ তুমি সে ভরসা" ইত্যাদি বাক্যে অন্তঃপুরের এক প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

কালপ্রবাহে "বেল ভাতা" ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসিয়া ফেলিল। দ্বিপ্রহরে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ এবং মাতার প্রতিনিধিগণ একটি ঘরে সমবেত হইলেন। একে একে তাঁহারা সকলে কদলী পত্রে স্থাপিত চিত্রিত ঘটকে ধান-দূর্ব্বা প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন, এবং ঘটের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীর সংলগ্ন শলাকায় ফুলের মালা ও নূতন কাপড় ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহারা কিছুক্ষণ বাহিরে আসিয়া যথা নিয়মে দেবতার ভোগ লাগাইলেন। শেষে মাতৃদেবী তাঁহার চিকুর প্রান্তসহ দক্ষিণহস্ত দ্বারা ঘটের নিম্নস্থ কদলী পত্র ও উৎসর্গিত অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্রকে ঈষৎ স্থানচ্যুত করিয়া, প্রসাদ গ্রহণের প্রস্তাবনা করিয়া রাখিলেন।

এদিকে পুরোহিত ঠাকুর চন্দ্রাতপছায়ায় দুর্গাপূজা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট শালগ্রাম শিলা ও জল মিশ্রিত দুগ্ধের কুণ্ড এবং তাহার পার্শ্বে একটি কামিনী বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছাগ বলির পর পুরোহিত ঠাকুর যজ্ঞ সমাপন করিয়া সিংহাসনটিকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে ব্রতচারিণীগণ এখানে আসিয়া ধান, কাজল, সিঁদুর ডব্বা ও ফুলের মালা কামিনী বৃক্ষকে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং এই রূপে "বেলভাতা" ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

আর পাঁচ প্রহর অতীত হইলেই জ্যৈষ্ঠ মাসের অরুণ পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত করিবে।

শ্রীনরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।

চিত্র সম্বন্ধে।

এবার আমরা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মূল তৈলচিত্র "রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গে"র একখানি প্রতিলিপি দিলাম। রাম ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ করিবা মাত্র উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুষ্পমাল্যশোভিত ঐ ধনু গাড়ী করিয়া অনেক লোকে আনয়ন করে। রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণ, প্রাসাদের সিংহদ্বারে দুহিতৃগণসহ রাজর্ষি জনক। চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বিশ্বামিত্র ঋষি।

অপর তিনখানি স্বতন্ত্র মুদ্রিত চিত্র,—শ্রীশ্রীমতী বড়োদার মহারাণী, শ্রীযুক্ত মহারাজা সয়াজী রাও গায়কবাড়, এবং নবনগরের নূতন জামসাহেব (যিনি কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহজী নামে ভুবনবিদিত ক্রিকেট খেলোয়াড়)। বড়োদার মহারাজা ও মহারাণীর বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহজী এখন হইতে জামসাহেব রণমল নামে পরিচিত হইবেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজপুত-বংশীয় ও রণজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখন বহুবৎসর হইতে ভারতবর্ষকে পৌরুষহীন করিবার বন্দোবস্ত চলিয়া আসিতেছে। এখন জামসাহেব রণমলের যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য দেখাইবার সুযোগ মিলিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য প্রকারে তিনি সাহস, মনুষ্যত্ব ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। ক্রিকেটের ক্রীড়াক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অধিক দক্ষতার প্রয়োজন। আমরা আশা করি রণমল ভাল খেলাই খেলিবেন। শ্বেতকায় রাজপুরুষদের অনুমোদনের হাসিই যেন তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা না হয়, প্রজার হিতসাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



লালা লাজপৎ রায়।

এই ধার্ম্মিক স্বদেশভক্ত বীর পুরুষ নিজ হৃদয়ের ভক্তি, শরীর মনের শক্তি, বর্ত্তমান সময়ের সমুদয় উপার্জ্জন এবং অতীতের অনেক সঞ্চিত অর্থ দিয়া নির্ভীক উৎসাহে, ধর্ম্মপ্রচার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, শিল্পোন্নতি, এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা দেশের সেবা করিতেছিলেন। ইহাঁকে গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters."
"to look on noble forms
Makes noble thro' the sensuous organism
That which is higher."—*Tennyson.*

৭ম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। ২য় সংখ্যা

মল-মাস ও পাঁজী।

এবার কোন্ মাসে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, তাহা লইয়া দেশের কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছে। পাঁজী দেখিলে বোধ হয়, ভারতের অধিকাংশ স্থানে দোলযাত্রা ফাল্গুন মাসে হইয়াছে। পুরীতে ফাল্গুন মাসে হয় নাই, চৈত্র মাসে হইল। কারণ যে পাঁজী অনুসারে জগন্নাথদেবের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, সে পাজীতে চৈত্র মাসে দোল, ফাল্গুনে নহে।

সকলেই দোলযাত্রা জানেন, এই হেতু ইহার উল্লেখ করা গেল। আসল কথা পুরীর পাঁজীর গণনায় চান্দ্র ফাল্গুন মাস অশুদ্ধ মাস, মল-মাস; অন্যান্য পাঁজীর গণনায় চান্দ্র চৈত্র মাস মল-মাস।

কেবল পুরীর পাঁজী স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে, এমন নহে। গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সমাচার পত্রে দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশে শ্রীকেতকর বেঙ্কটেশ চান্দ্র ফাল্গুন মাসকে মল-মাস করিয়াছেন, অন্য সকলে চৈত্রকে করিয়াছেন।

কেন এমন মতভেদ হইল? বাস্তবিক কোন্ মাস মল-মাস?

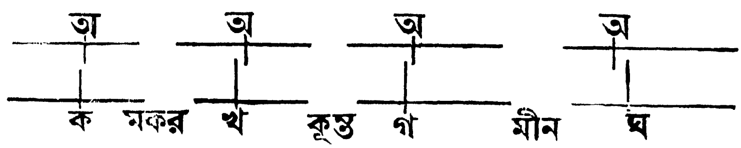
আমরা বাঙ্গালায় মল-মাস নামই শুনি। আসল নাম কিন্তু অধিক মাস বা অধিমাস। প্রাচীনকালের কর্মকুশল আর্যঋষিগণ এই অধিমাস গণনার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, কিংবা পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা চন্দ্রের এক মাস বা এক চান্দ্র মাস। প্রায় ২৯॥০ দিনে এক চান্দ্র মাস হয়। সুতরাং ৩৫৪ দিনে চন্দ্রের ১২ মাস হয়। সূর্যের ১২ মাসে ৩৬৫ কি ৩৬৬ দিন। এই হেতু সূর্যের ১২ মাসে চন্দ্র ১১।১২ দিন আগিয়া পড়েন। প্রতি তৃতীয় বৎসরে চন্দ্র এক মাস আগিয়া পড়েন। সে বৎসর সূর্যের ১২ মাসে চন্দ্রের ১৩ মাস হয়। এই যে ত্রয়োদশ মাস, ইহারই নাম অধিমাস। ঋষিগণ এই অধিক মাস ছাড়িয়া দিতেন। কাজেই সূর্যের ১২ মাসে চন্দ্রেরও ১২ মাস হইত। যে মাস গণ্য নহে, সে মাস দুষ্ট মাস, মল-মাস। যখন সে মাস গণ্য নহে, তখন তাহাতে ধর্মকর্ম কি? যে কর্ম এক মাস পরে করিলে চলে, সে কর্ম অধিমাসে নিষিদ্ধ হইল।

আরব দেশের পণ্ডিতেরা অধিমাস ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার ফলে, মুসলমানী পর্ব প্রতিবৎসর ১১ দিন করিয়া আগিয়া চলিতেছে। খ্রীষ্টান দেশে কেবল 'গুডফ্রাই ডে' নামক পর্ব-দিন স্থির করিতে চন্দ্রের মাস দেখিতে হয়।

আমরা চন্দ্রের মাস ও সূর্যের মাস বলিতেছি। বাস্তবিক, মাস বলিলে কেবল চন্দ্রের মাস বুঝায়। আমরা জোর করিয়া বলি, সূর্যের মাস, কতকটা যেমন কাঁঠালের আম-সত্ত্ব। প্রাচীন কালে চন্দ্রই মাসের কর্ত্তা ছিলেন, সূর্য ছিলেন বৎসরের কর্ত্তা। প্রাচীন কালই বা বলি কেন? কেবল বাঙ্গালায় ও ওড়িশায়* দুই রকম মাস, সূর্যের ও চন্দ্রের। অন্য প্রদেশের লোকেরা আমাদের মত সৌর মাস গণনা করেন না। তাঁহারা প্রাচীন রীতি এখনও মানিয়া আসিতেছেন। আজ (সৌর) ফাল্গুনের ১৭ দিন; তাঁহারা বলিবেন, আজ (চান্দ্র) ফাল্গুনের কৃষ্ণ প্রতিপদ্ বা প্রথম দিন। যদি সৌরমাসের দিন বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন আজ কুম্ভের ১৭ দিন। অর্থাৎ কুম্ভ রাশিতে সূর্য ১৭ দিন আসিয়াছেন। আমরা লৌকিক কাজে চান্দ্র মাস একবারে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কর্মে প্রথমে চান্দ্র মাস, মাসের দিন (তিথি) উল্লেখ করিয়া শেষে কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে ব'ল।+ লৌকিক কাজে সৌর-মাস গণনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চন্দ্রের দিনের ঠিক নাই; কখনও তিথি এক দিনের অপেক্ষা ছোট হয়, কখনও বড় হয়। মাসেরও ঠিক নাই। হিন্দুস্থানে ও ওড়িশায় পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গলায় অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা এক মাস। মুসলমানদেরও মাস অমান্ত।

আমরা চান্দ্রমাস ও চান্দ্র দিন (তিথি) গণনা ছাড়িয়া এবং সৌর মাস ও সৌরমাসের দিন ধরিয়া সুবিধা করিয়াছি। কিন্তু এখনও কিছু অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা সূর্যের এক বৎসরে ৩৬৫ দিন ও কএক ঘণ্টা মিনিট হয়। দিন সংখ্যা পূর্ণ না হওয়াতে ৩৬৫ দিন গত হইলেই আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হয় না। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, সৌরমাসের দিন-সংখ্যা সমান নহে। ৩৬৫ দিনকে ১২ ভাগ করিলে ৩০.৪৪ দিন পাওয়া যায়। আমাদের সৌরমাসের পরিমাণ সমান নহে। রবির পথকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে রাশি বলে। প্রথম ভাগ বা রাশি, দ্বিতীয় ভাগ বা রাশি ইত্যাদি না বলিয়া মেষ বৃষ মিথুন ইত্যাদি নাম হইয়াছে। যে রাশি যাইতে রবির যত দিন ঘণ্টা মিনিট লাগে, সেই সৌরমাসের তত পরিমাণ। রবি তাঁহার পথের কোন স্থানে দ্রুত চলেন, কোন স্থানে মন্দ মন্দ চলেন। কিন্তু চিরকালই যে সেই একই স্থানে দ্রুত কিংবা মন্দ চলেন, তাহাও নহে। পূর্বকালে যে সৌরমাসের যে পরিমাণ ছিল, এই কারণে এখন তাহার অন্যথা হইয়াছে। কত দিনে কোন্ সৌরমাস, তাহা পাঁজী না দেখিলে বলিতে পারা যায় না।

যদি কোন চান্দ্রমাসের মধ্যে সূর্য এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন না করেন, তবে সে চান্দ্রমাস অধিক। অর্থাৎ যদি এক সৌরমাসের মধ্যে দুইটি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে অধিমাস ঘটনা হয়। ১ম চিত্র দেখিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। অ অমাবস্যার শেষ। মকর, কুম্ভ, মীন, সৌর ফাল্গুন চৈত্র মাস চিত্রে মীন।



১ম চিত্র।

মাসে দুইটি অমাবস্যা হইয়াছে। সুতরাং চান্দ্র চৈত্র অধিমাস। যাঁহারা চান্দ্র ফাল্গুনকে অধিমাস বলিতেছেন, তাঁহারা বলিবেন, মীন মাসে নহে কুম্ভ মাসেই দুইটি অমাবস্যা হইয়াছে।

কিন্তু কোন্‌টা ঠিক?

কোন্‌টা ঠিক, তাহা জানিতে হইলে কুম্ভ ও মীন রাশিতে রবির প্রবেশ সময় এবং শেষের তিনটি অমাবস্যার স্থিতিকাল জানিতে হইবে।

ঐ দুই বিষয় নিরূপণ করিলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কিন্তু অমাবস্যা দেখা যায় না, রবিপথের রাশির সীমাচিহ্নও দেখা যায় না।

* ওড়িশার লৌকিক বৎসর চান্দ্র। ইহার আরম্ভ ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে। এই সন বিলায়তী নহে। বাঙ্গালা পাঁজীতে ভুল লেখা থাকে।

+ কত বৎসর হইতে বঙ্গদেশে সৌর মাস গণনা চলিতেছে? দুই তিন শত বৎসরের অধিক হইবে কি? যাঁহারা পুরাতন পুথী ও দলীল দস্তাবেজ নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর অনায়াসে দিতে পারেন। আশা করি, তাঁহারা এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, এবং জানাইয়া আমায় অনুগৃহীত করিবেন।

উপায়? পাঁজী দেখা। অর্থাৎ জ্যোতিষ আশ্রয় করা।

অনেকে পাঁজী দেখাইতেছেন, কিন্তু পাঁজীতে ভুল আছে কি না, কে জানে?

পাঁজীতে নানা কথা থাকে। তার মধ্যে বাঙ্গালা পাঁজীতে উদ্ধরেখার বাম পার্শ্বে গণিত জ্যোতিষ, দক্ষিণ পার্শ্বের অধিকাংশ স্মৃতি, তন্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ। গণিত ভাগই আমাদের আলোচ্য। ইহাকে ধরিয়াই স্মৃতির ব্যবস্থা ও ফল গণনা।

আমরা পাজীর গণিতের কোন কোন ফল মিলাইতে পারি। চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের উদয়াস্ত, চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ ও গ্রহগণের পরস্পর সমাগম, তারা ও গ্রহগণের সমাগমকাল একটা ঘড়ী থাকিলে অক্লেশে মিলাইতে পারা যায়। আমাদের অধিকাংশ পাজীকার এ সকল বিষয় গণিতে পারেন, কিন্তু গণেন না। সকলেই চন্দ্রসূর্যের গ্রহণকাল বলেন, কোন কোন পাজী সূর্যের উদয়াস্তকাল ঘণ্টা মিনিটে বলেন।

এখন পাঁজীর নাম করিতে হইবে। দেশের পঞ্জিকা-কারেরা ক্ষমা করিবেন। যদি পাজীর দোষ দিই, সে দোষের ভাগী আমরাই। পঞ্জিকাকার অন্য দেশের নহেন, আমাদেরই দেশের। আমাদের পাজীর ভুল বাহির করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। যদি ভুল বাহির হয়, আশা করি সে ভুল সংশোধিত হইবে।

আলোচনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত পাজীগুলি দেখা গেল। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই হেতু কএক খানি পাজী সংগ্রহ করিতে পারা গেল না:—

(১) বাঙ্গালা পাজী। কলি ১, কলিকাতার গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা; কলি ২, শ্রীরামপুরের পাজী (দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস পাজী); কলি ৩, বটকৃষ্ট পাল কোম্পানীর পাঁজী; কলি ৪ সরল ফলিত পঞ্জিকা; কলি ৫ পি এম্ বাক্‌চির পাঁজী (এ বৎসরের পাইলাম না, ১৩১২ দেখিয়েছি) ইত্যাদি। পূর্বে মাধব বাবুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা দেখিতাম। তাঁহার মৃত্যুর পর সে পাঁজী আর দেখিতে পাই নাই। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ও সরল ফলিত পঞ্জিকা কিছু নুতন ধরণের। বর্ত্তমান আলোচনায় এই দুই পাজী বাদ দেওয়া গেল।

(২) হিন্দী পাঁজী। বাপু কাশীর বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত পাজী; কাশী ১ কাশীর মহারাজের আজ্ঞায় গণেশ দত্ত জ্যোতিষীর পাজী; কাশী ২ কাশীর ভার্গব পুস্তকালয়ের পাঁজী। জয় জয়পুরের মহারাজের আজ্ঞায় বল্লভ মণীরামের পাজী। জোধ জোধপুরের মহারাজের আজ্ঞায় চণ্ডাংশু চণ্ডু পঞ্চাঙ্গ।

(৩) উর্দু পাঁজী। কান ভূপালের বেগমের আজ্ঞায় কানপুরের মহম্মদ রহমত উল্লা রাধের বড় যন্ত্রী।

(৪) তেলুগু পাজী। বিয়—বিজয় নগরম্ হইতে প্রকাশিত এবং দক্ষিণামূর্ত্তি শাস্ত্রী এবং বিশ্বেশ্বর সোমযাজী কৃত পরাভব নাম সম্বৎসর পঞ্চাঙ্গ; রাজ—মান্দ্রাজে মুদ্রিত কিন্তু রাজমহেন্দ্রবরমের বংক্যল বেংক্যা এণ্ড সন্‌স্ দ্বারা প্রকাশিত।

(৫) ওড়িয়া। পুরী ১ সদাশিব খড়ীরত্নের পাঁজী, পুরী ২ রাজ বল্লভ মিশ্রের পাজী। উভয় পাজীই পুরীর নিমিত্ত গণিত।

এই সকল পাঁজী সম্বন্ধে দুই এক কথা স্থূলভাবে বলা যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে গুপ্তপ্রেশ পাঁজী যত প্রচলিত, বোধ হয় অন্য কোন পাজী তত নহে। এই পাজী ও শ্রীরামপুরের পাজী হিন্দু পরিবারে আদৃত। বাঙ্গলার অনেক পাঁজীর মুখ্য উদ্দেশ্য ঔষধাদির বিজ্ঞাপন প্রচার করা। সমাজে যে সকল পাঁজীর দায়িত্ব নাই, সে সকল পাজীর দোষ গুণে সমাজের ইষ্টানিষ্টও নাই। বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙ্গালা পাজী দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু পাঁজীর কোন উন্নতি দেখি না। কোন কোন পাজী পত্র-সংখ্যায় বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হাঁচিটিকৃটিকির শব্দ, বারবেলা কালবেলা নির্ণয়, যোগিনীর আক্রমণ ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষ, তন্ত্র ও স্মৃতির 'বচনার্থে' বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ বাঙ্গলা পাজীতে এই 'বচনার্থের' যত বাড়াবাড়ি, উপরের লিখিত অন্য কোন পাজীতে তত দেখা যায় না। বাঙ্গলা পাজীর চেষ্টা যেন কোনও বিষয়ের নিমিত্ত কাহাকেও স্মার্তভট্টাচার্য ও ফলগণকের দ্বারে যাইতে না হয়। এই বৎসরের গুপ্তপ্রেশ পাজীর প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠের প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠ স্মৃতির ব্যাখ্যায় ও ফল গণনায় পূর্ণ।*

যে পাজীর পৃষ্ঠসংখ্যা ৫৫০, সে পাজীতে গণিত ভাগের কিছু-না-কিছু ব্যাখ্যা, অন্ততঃ পাঁজীর সাংকেতিক অক্ষরের ব্যাখ্যা আশা করা অন্যায় কি? দুঃখের বিষয়, পাজীকার

* এই পাজীর খর্ব আকার করিবার হেতু কি? পত্র-সংখ্যা বাড়িলে পাজী শত্র ছিঁড়িয়া যায়, বোধ হয় ছাপার খরচও বেশী পড়ে। যদি খর্ব আকার রাখিতেই হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের বোঝা কমান উচিত। আকার বড় করিয়া মূল বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইলে পত্র-সংখ্যা কম হয়, 'পাজী দেখায়' সুবিধা হয়। বাঙ্গলা ও ওড়িয়া পাজী ছাড়া অপর সকল পাজী বিষয় সাজাইবার গুণে অল্প পত্রেই সমাপ্ত হয়। বাঙ্গালা পাজার নামেও বিশেষত্ব আছে। যে পাজীতে সংস্কৃত শব্দের বিভক্তি প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি, সেই পাঁজীর নামের সঙ্গে পুরা ইংরাজী কখনই শোভা পায় না। অমুক প্রেশের (ছাপা খানার?) পঞ্জিকা, অমুক এণ্ড কোং পঞ্জিকা, বৃহৎ ফুল পঞ্জিকা, হাপ পঞ্জিকা, বৃহৎ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ইত্যাদি ইংরাজী নাম বঙ্গদেশ ছাড়া পাওয়া যায় না।

এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহার পাঠকের সকলেই কি সে সকল সংকেতের অর্থ জানেন? যদি পাঠকেরা পাঁজী বুঝিতেই না পারিল, তাহা হইলে লিখিয়া ও ছাপাইয়া ফল কি? কোন্ স্থানের নিমিত্ত পাঁজী গণিত হইয়াছে, তাহারই স্পষ্ট নিদেশ নাই।*

বাঙ্গালা পাঁজীগুলি প্রায় একই ছাঁচে ঢালা। বোধ হয়, সকলের আধার এক, এবং যত পাঁজী তত গণক নাই। ইহাতে দোষ নাই। বরং যখন সকল পাঁজীর আধার এক, তখন তাহা হইতে বহু ব্যক্তি গণনা করিলে লাভ কিছুই হইত না, কেবল শক্তির অপচয় হইত।

হিন্দী ও তেলুগু পাঁজীর দোষ অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততা। ইংরাজী বাঙ্গলা মাস, মাসের তারিখ দেওয়া থাকে, কিন্তু মাসের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। রাজমহেন্দ্রবরমের পাঁজীতে নূতনত্ব আছে। প্রাচীনকালের ন্যায় জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীর প্রশংসা, গণকের বংশপরিচয় আছে। ইন্দ্রধনু পরিবেষ উল্কা প্রভৃতির কারণ প্রাচীন মতে বর্ণিত আছে। উর্দু পাঁজীতে প্রাচীন ও সাময়িক ইতিহাস আছে। প্রতি মাসের প্রতি রাত্রির কত সময় অন্ধকার কত সময় জ্যোৎস্না তাহা চিত্র আঁকিয়া দেখান আছে। আর এক নূতনত্ব এই যে রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহের গতিপথের চিত্র আছে। এক পৃষ্ঠে চিত্রগুলি আছে। কাজেই সেই পৃষ্ঠ দেখিলেই সম্বৎসরের গ্রহচার বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই বিষয় ইংরাজী পাঁজী হইতে লওয়া হইয়াছে।‡

বাঙ্গলা পাঁজীতে প্রতিদিনের সকল গ্রহের স্ফুট স্থান দেওয়া হয়। অন্য কোন পাঁজী এই গুরু পরিশ্রমে যান না।

বাঙ্গলা পাঁজীগুলির আধার এক; কাজেই গণনাও এক। কাশীর ও জয়পুরের পাঁজীর, ওড়িয়া পাঁজীর, তেলুগু পাঁজীর আধার ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু একই স্থানের সকল পাঁজীর আধার এক। এইরূপ না হইলে আশ্চর্য্যের কথা হইত। কাশীর বাপূদেব শাস্ত্রীর পাঁজী, কলিকাতার মাধব বাবুর পাঁজী ও এই বৎসরের বাঙ্গলা ফলিত পাঁজীর মূল আধার ইংরাজী পাঁজী। বাঙ্গলা পাঁজীর মূল আধার সূর্য্যসিদ্ধান্তরহস্য, পুরীর পাঁজীর আধার সামন্ত চন্দ্রশেখরের সিদ্ধান্তদর্পণ। তেলুগু পাঁজীর আধার কি, তাহা পাওয়া গেল না। জোধপুরের পাঁজীতে লিখিত আছে যে তাহা ব্রহ্মপক্ষীয়। পঞ্জিকাকার সৌরপক্ষীয় পাঁজীও করেন। অন্যান্য পাঁজীর আধার সম্ভবতঃ গ্রহলাঘব।

এখন দেখা যাউক, কোন্ পাঁজীর গণনা ঠিক। যে পাঁজীর আধার ইংরাজী পাঁজী, তাহার গণনা দেখিয়া সম্প্রতি লাভ নাই। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক। এই সকল পাঁজী নিজেদের আধার বলেন না কেন? ইংরাজী জ্যোতিষ সাহায্যে পাঁজী করায় কোন পাপ আছে কি? বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদেশ এখন প্রধান। তাহা কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের বালক বালিকাদিগকে আমরা যে বিজ্ঞান ইস্কুল-কলেজে শিখিতে দিতেছি, তাহা কি মিথ্যা বুঝিয়া দিতেছি? বিজ্ঞান কি এ দেশের সে দেশের আছে? অন্য দিকে যাঁহারা ইংরাজী পাঁজী ধরিয়া দেশে পাঁজী করিতেছেন, গণনা ঠিক বলিয়া তাঁহারা যে আস্ফালন করেন, তাহারও হেতু পাওয়া যায় না।

চান্দ্র ফাল্গুন, না চান্দ্র চৈত্র অধিমাস, ইহাই আমাদের প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা দূরে

* গুপ্তপ্রেস পাঁজীর ২০ পৃষ্ঠে লগ্নমানের উপরে কলিকাতার উল্লেখ আছে। কিন্তু যে বিষুবচ্ছায়া ৫।১০ অঙ্গুলাদি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কলিকাতার নহে। যে দিনমান দেওয়া থাকে, তাহাও প্রায়ই কলিকাতার উত্তরের। হিন্দী পাঁজীগুলির এই ত্রুটি নাই। রাজমহেন্দ্রবরমের তেলুগু পাঁজীর দিনমান হইতে অক্ষাংশ নিরূপণ করিয়া তাহা যে সেই স্থানের তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছে। কোনও পাঁজীই উজ্জয়িনী কিংবা কোন প্রসিদ্ধ স্থান হইতে দেশান্তর দেন নাই। যেখানে স্থানের নাম দেওয়া আছে, অবশ্য সেখানে দেশান্তর না দিলেও চলে। তথাপি পাঁজী গণিবার সময় কত দেশান্তর ধরা হইল, তাহা জানাইলে এক প্রদেশের পাঁজীর সহিত অন্য প্রদেশের পাঁজী মিলাইবার সুবিধা হয়।

+ দুই খানি পাঁজীতে অয়নাংশ প্রকরণের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা প্রায় অবিকল এক, এবং অবিকল অদ্ভুত। একখানি পাঁজীতে আছে, বৈশাখমাসে সূর্য্যদেব বিশাখাদি নক্ষত্রে অবস্থান করেন। কোন কোন পাঁজীতে রবির উদয়লগ্ন প্রতিদিনের দেওয়া আছে, কিন্তু রাশির উদয়কালই দেওয়া হয় নাই। ইত্যাদি –

‡ বাঙ্গালা পাঁজীতে সূর্য্যের উদয়াস্তকাল ঘণ্টা মিনিটে দেওয়া থাকে। যদিও ঐ কাল সূক্ষ্ম নহে, তথাপি উহা বিলাতী ঘড়ীর কাল অর্থাৎ মধ্যমকাল। রাজমহেন্দ্রবরমের পাঁজীও মধ্যমকাল দেন, কিন্তু কালসমীকরণে প্রায়ই ২ মিনিট ভুল। বোধহয় কোন পুরাতন সারণী আধার হইয়াছে। কেবল একখানি পাঁজী দিনমান দণ্ডাদি দিয়া সারিয়াছেন। এ সকল পাঁজীর দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন পাঁজীতে সূর্য্যের উদয়াস্ত, তিথ্যাদির স্থিতি ঘণ্টামিনিটে অথচ স্ফুট সাবন কালে দেওয়া আছে। ইহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। ওড়িয়া পাঁজী, উর্দু পাঁজী, এমন কি বাপূদেব শাস্ত্রীর পাঁজীতেও এই। বিলাতী ঘড়িতে কেহ কি স্ফুট সাবনকাল পাইবার আশা করেন?

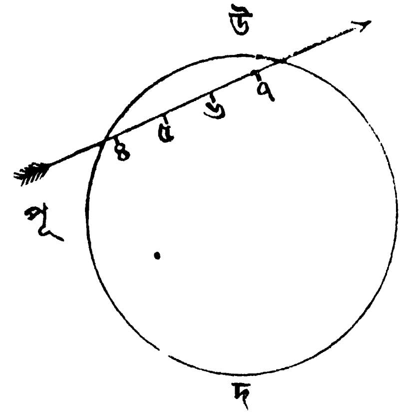
আসিয়া পড়িয়াছি। যে সকল জ্যোতির্ষিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া পাঁজীর সহিত মিলাইতে পারি, তাহাদের নাম করা গিয়াছে। যে পাঁজীর সঙ্গে এই সকল ঘটনা মিলিবে, তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি।

কিন্তু যে সকল ঘটনা,—যেমন অমাবস্যার স্থিতি, কিংবা রবির দৈনন্দিন গতি,—আমরা সহজে মিলাইতে পারি না, সে সকল ঘটনা সম্বন্ধে কি করা যাইবে? সকল বিচারেই এক একটা আদর্শ চাই। তর্কের মীমাংসা হয় না, যেখানে আদর্শ ঠিক নাই। উপস্থিত আলোচনায় আবশ্যক স্থলে আমরা ইংরাজী জ্যোতিষ ও পাঁজীকে আদর্শ মনে করিব। এই আদর্শ ঠিক হইয়াছে কি না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এখানে প্রমাণ-স্বরূপ কএকটি গ্রহসমাগমকাল (দুই গ্রহের পরস্পর নিকটস্থ হইবার কাল) দেওয়া যাইতেছে।

স্থানভেদে কালের প্রভেদ হয়। আমরা এই আলোচনায় রেলের ঘড়ীর কাল লইব। এই কালকে সরকারী অথবা ভারতের সাধারণ সময় বলা যাইবে। কলিকাতার সময় হইতে এই সাধারণ সময় ২৪ মিনিট অথবা ১ দণ্ড পশ্চাতে। সঃ সঃ সাঙ্কেতিক চিহ্নে এই সময় জ্ঞাপিত হইবে। মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা গণিত হইবে।

ইংরাজী পাঁজী হইতে কএকটি গ্রহসমাগমকাল [স্থূল] দেওয়া যাইতেছে। গুপ্তপ্রেস পাঁজীর গ্রহস্থান হইতে সে পাঁজীমতে যে সমাগমকাল [স্থূল] আসে, তাহা পাশে দেওয়া যাইতেছে। আমাদের পাঁজীর গ্রহগণনা ঠিক আছে কি না, তাহা ঘড়ী ধরিয়া মিলাইতে পারা যাইবে।

ইংরাজী পাঁজী	গুপ্তপ্রেস পাঁজী
১। ১৯ এপ্রেল (শুক্লষষ্ঠী) ॥০ টার সময় চন্দ্রের প্রায় ২ অংশ উত্তরে বৃহস্পতি।	১৮ এপ্রেল ২২ টা
২। ১৬ মে (শুক্ল পঞ্চমী) ১৭॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ১॥০ অংশ উত্তরে বৃহস্পতি।	১৪॥০ টা (অর্থাৎ সূর্যাস্ত সময়ে বৃহস্পতির পূর্বে চন্দ্র থাকিবে)।
৩। ২৩ ডিসেম্বর (কৃষ্ণ চতুর্থী) ১৯॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ অংশ দক্ষিণে বৃহস্পতি।	২০ টা
৪। ২ মে (কৃষ্ণ পঞ্চমী) ২৪॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ অংশ দক্ষিণে মঙ্গল।	২৩॥০ টা
৫। ২৬ জুন (কৃষ্ণ প্রতিপদ) ২৪॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ৫ অংশ দক্ষিণে মঙ্গল।	২১ টা
৬। ২৩ জুলাই (শুক্ল ত্রয়োদশী) ২৩॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে ৭ অংশ দক্ষিণে মঙ্গল।	১৮॥০ টা
৭। ১২ নভেম্বর (শুক্ল সপ্তমী) ২২॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ১ অংশ উত্তরে মঙ্গল।	২৩ টা
৮। ৮ মে (কৃষ্ণ ত্রয়োদশী) ২॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২॥০ অংশ উত্তরে শনি।	৪ টা
৯। ১ জুলাই (কৃষ্ণ ষষ্ঠী) ২০॥টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ৩ অংশ উত্তরে শনি।	২৫॥০ টা
১০। ২১ সেপ্টেম্বর (পূর্ণিমা) ১৮॥০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ অংশ উত্তরে শনি।	১৮ টা
১১। ২১ এপ্রেল ২০॥০ টার সময় শনি হইতে প্রায় ॥০ অংশ উত্তরে শুক্র (ভোর রাত্রে দেখিতে পারা যাইবে)।	১৯ এপ্রেল
১২। ১৪ নভেম্বর ১৬ টার সময় বুধ সূর্যবিম্ব ভেদ করিয়া যাইবেন। নীচে পরিলেখ দেখুন (২য় চিত্র)।	১০ নভেম্বর ২ টা (অর্থাৎ ৪ দিন ১৪ ঘঃ তফাত)



২য় চিত্র।

বৃত্ত…সূর্যবিম্ব
শররেখা…বুধের পথ

বুধের প্রবেশ	সঃ সঃ ১৫।৫৫
নির্গমন	১৯।১৭
কলিকাতায় সূর্যাস্ত	১৬।৫৩

সূর্যবিম্বের তুলনায় বুধবিম্ব প্রায় ২০০ গুণ ছোট। সুতরাং খালি চোখে বুধগ্রহ সূর্যবিম্বে দেখা যাইবে না। যৎসামান্য দূরবীনে, যেমন অপেরা গেলাসে, দেখা যাইবে।

উল্লিখিত গ্রহসমাগমকাল মিলাইলে আমাদের পাঁজীর গণনায় দোষ গুণ জানা যাইবে। আমাদের উপস্থিত আলোচনার নিমিত্ত চন্দ্র সূর্যের সমাগমকাল অর্থাৎ অমাবস্যার অন্তকাল জানা আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে গত জানুয়ারী মাসে সূর্যের ও চন্দ্রের গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। অনেকে গ্রহণ কাল ঘড়ীতে দেখিয়া থাকিবেন।

প্রথমে গুপ্তপ্রেস পাঁজী দেখা যাউক। তাহাতে দেখা যায়, ১৪ই জানুয়ারী সঃ সঃ ১২।২ সময়ে অমাবস্যার শেষ। ইহাকে সূর্যগ্রহণের প্রায় মাঝামাঝি সময় ধরা যাইতে পারে। (প্রকৃত পক্ষে উহার ৭।৮ মিনিট পরে গ্রহণমধ্য)।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, পাঁজীতে গ্রহণের যে আরম্ভ ও শেষ সময় দেওয়া আছে, তাহার মাঝামাঝি সময় সঃ সঃ ১১।৩৫! অতএব হয় গ্রহণ গণনা ভুল, না হয় অমাবস্যা গণনা ভুল। দুই-ই ভুল হইতেও পারে। কিন্তু ইংরাজী পাঁজী ধরিয়া কলিকাতায় গ্রহণ কাল গণিলে দেখা যায়, গুপ্তপ্রেস পাঁজীর গ্রহণ গণনা প্রায় ঠিক ছিল। অতএব অমাবস্যার স্থিতি গণনা ভুল। সে ভুল অল্প নহে, ৩৬ মিনিট বা ১।।০ দণ্ডের!

গুপ্তপ্রেস পাঁজীর গণনায় ২৯ জানুয়ারী সঃ সঃ ১৯।৬ সময়ে পূর্ণিমার শেষ। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের মাঝামাঝি সময় পাই সঃ সঃ ১৯।৭। বস্তুতঃ এই সময়ের প্রায় ৮ মিনিট পরে পূর্ণিমার শেষ হইয়াছিল।

গুপ্তপ্রেস পাঁজী, শ্রীরামপুরের পাঁজী ও বটকৃষ্ণ পালের পাঁজী—তিন খানি পাঁজীতেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার শেষ কাল প্রায় একই দেওয়া আছে। তিন খানিতেই গ্রহণ আরম্ভ ও শেষ কাল প্রায় এক। অতিরিক্তের মধ্যে গুপ্তপ্রেস পাঁজীতে 'স্ফুটচন্দ্রিকা মতে' লিখিত আছে। যদি স্ফুটচন্দ্রিকা ঠিক, তাহা হইলে দৈনিক তিথ্যাদি গণনায় সেই চন্দ্রিকা আশ্রয় করা উচিত।

আমরা 'স্ফুট-চন্দ্রিকা' দেখি নাই। সম্ভবতঃ উহা কোন সারণী (tables) হইবে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিয়া সারণী নির্মিত হইতে পারে না। আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত ধরিয়া সূর্যগ্রহণ গণনা করিয়া মিনিটে পর্যন্ত ঐক্য করা অসম্ভব।

পুরাতন সিদ্ধান্ত সংস্কার করিয়া সামন্ত চন্দ্রশেখর সিংহ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ কাল ঠিক আনিতে পারেন নাই।* প্রমাণ, তাঁহার গ্রন্থ ধরিয়া যে দুই ওড়িয়া পাঁজী গণিত হয়, তাহাদের প্রদত্ত গ্রহণ কাল দেখুন।* কিন্তু পূর্ণিমার কালগণনায় ভুল ১ মিনিট, অমাবস্যায় ৫ মিনিট। অন্যান্য পাঁজীতে কত আছে, তাহা শেষের ক পদকে দেখান গেল। দেখা যায়, সমস্ত পাঁজীতেই অল্লাধিক প্রভেদ আছে। ইংরাজী

* দুঃখের বিষয়, তিনি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই। কারণ, তাঁহার বিলাতী ঘড়ী ছিল না। তথাপি তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা সকল দেশেই অসাধারণ।

* খড়ীরত্নের পাঁজী		রাজবল্লভের পাঁজী—
অমাবস্যা সঃ সঃ	১১।৩২	১১।২৯
সূর্যগ্রহণ আরম্ভ	১০।৩৫	১০।৪০
শেষ	১২।২৩	১২।১০
পূর্ণিমা	১৯।৬	১৯।৫
চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ	১৭।৩৯	১৭।৪২
শেষ	২০।৪৭	২০।৪৪

প্রকৃত পক্ষে আমরা কটকে দেখিয়াছিলাম।

সূর্যগ্রহণ আরম্ভ	১০।৪	
শেষ	১২।৫৭	
চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ		ঠিক বোঝা যায় নাই। গণনায় ১৭।৩৬।
শেষ	২০।৯০	

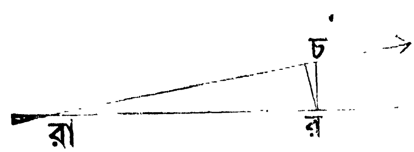
সূর্যগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ যেমন সহজে বুঝিতে পারা যায়, চন্দ্রগ্রহণের তেমন পারা যায় না। আমাদের ঘড়ীতে এক আধ মিনিটের ভুল ছিল। যাহা হউক দেখা যাইতেছে, চন্দ্রগ্রহণকালে ভুল ছিল না বলিলেও হয়। সূর্যগ্রহণকালে প্রায় আধঘণ্টা ছিল।

খড়ীরত্ন চন্দ্রগ্রহণ গণনার উপকরণগুলি দিয়াছেন।

অন্য প্রদেশের পাঁজীকারেরা মিলাইতে পারিবেন, এই আশায় এখানে উপকরণগুলি উদ্ধৃত করা গেল। "দিবামান ২৭।৪৪, পর্বদণ্ড ৩২।৪, তৎকালচন্দ্র ৩।১৭।৫৩।১৭, তৎকাল পাত ৩।৯।৩৪।১১, যাম্য বিক্ষেপ ৩২।২১, চন্দ্র স্পষ্টগতি ৭৯৩।১, গ্রহণকালহার ৬৭২।৩, স্ফুটপর্বদণ্ড ৩১।৪৮, পর্বান্ত চন্দ্র ৩।১৭।৫।১, পর্বান্তপাত ৩।৯।৩৪।২, সৌম্য স্ফুটশর ৩২।৩, স্ফুটচন্দ্রমান ২৯।১৯, স্ফুট তমোমান ৭৭।৬, মানযোগার্দ্ধ ৫৩।১২, গ্রাসমান ২১।৯, স্থিত্যর্দ্ধ ৩।৪৭।"

গুপ্তপ্রেস পাঁজা হইতে পাই—

দিবামান ২৭।১৩, পূর্ণিমা ৩১।৫১, তৎকাল চন্দ্র ৩।১৬।১।৫৩, তৎকাল পাত ৩।১১।৪২।১৩, গ্রহণকালহার ৬৮২।১২। সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে পাই, চন্দ্রশর ২০, চন্দ্রমান ৩০, তমোমান ৭৫, মান যোগার্দ্ধ ৫২।৩০, গ্রাসমান ৩২।৩০, অর্থাৎ পূর্ণ! বাস্তবিক শর ৩৩।১৮ ছিল। চন্দ্র হইতে রাহু গণনায় ভুল থাকাতে গুপ্তপ্রেস মতে গ্রহণ গণনা ঠিক হওয়া অসম্ভব। বোধ হয়, যিনি পাঁজীর তিথি ও স্ফুটগ্রহ গণনা করেন, তিনি গ্রহণ গণনা করেন নাই। নতুবা যে কথা সহজেই বোঝা যায়, তাহাতে গোলযোগ থাকিত না। ৩য় চিত্র দেখিলে বোঝা যায় যে, র চ পর্বান্ত স্থানে রবিচন্দ্র আসিবার আগে চন্দ্রগহণ মধ্য কাল।



৩য় চিত্র।

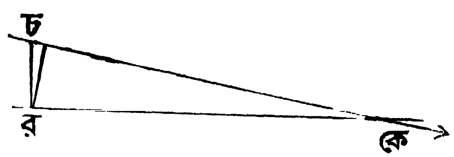
সূর্যগ্রহণ সময়ে তাৎকালিক সায়ন রবি ৯।২২।৫৫।৫৪, ত্রিভোনলগ্ন ৯।২৬।২০।৪২। সুতরাং লম্বন লিপ্তা অমাবস্যার কালে যোগ করিবার ছিল। ৪র্থ চিত্র দেখিলে বোঝা যায় যে, অমাবস্যা শেষ হইবার পরে

পাঁজীর সহিত মিলাইলে চান্দ্রমাসের পরিমাণেও অল্পাধিক প্রভেদ দেখা যায়। শেষের খ পদক দেখিলে জানা যায় যে, দেশের সকল পাঁজী এ বিষয়েও একমত নহেন। সুতরাং অধিমাস নিরূপণে কোন্ পাঁজীর গণনা মানিব? যাহা হউক, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই প্রভেদ তত বিঘ্নদায়ক হইবে না।

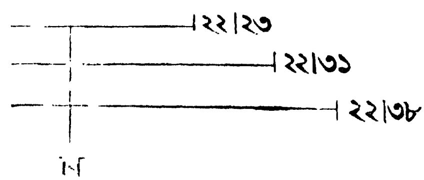
এখন সৌরমাসের পরিমাণ লইয়া কথা। প্রথমেই জানা আবশ্যক, রবি তাঁহার পথের কোন বিন্দুতে আসিলে বৎসর আরম্ভ হইল বলিব। অর্থাৎ রবি-পথের কোন্ স্থানে মেষের আরম্ভ। মেষাদি-বিন্দু জানিলে রবিপথকে ১২ রাশিতে ভাগ করিয়া এক এক রাশি যাইতে রবির কত দিন ঘণ্টা মিনিট লাগে, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সকলেই জানেন, ২১শে মার্চ তারিখে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। সে দিন রবি বিষুবপাতে আসেন। এই বিষুবপাত হইতে পাঁজীর মেষাদি-বিন্দু যত অংশ কলা দূরে (পূর্বদিকে) অবস্থিত, তত অংশ কলাকে অয়নাংশ বলা যায়। বলা বাহুল্য, রবিপথের যেখানে অয়নাংশের শেষ, সেই খানে সূর্য আসিলে সৌরবৎসর আরম্ভ হয়। অধিকাংশ পাঁজীতে অয়নাংশ লিখিত থাকে। কোন পাঁজী এই অত্যাবশ্যক উপকরণ দেন না। যাহা হউক দেখা যায়, আমাদের দেশের পাঁজীগুলি ২১ হইতে ২৩ অংশ পর্যন্ত বর্তমান অয়নাংশ দিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু দুই তিন খানি পাঁজী ব্যতীত অন্য পাঁজী যত অয়নাংশ দেন, বৎসরের সকল সময়ে তত অয়নাংশ মানেন না। উপরে অয়নাংশের যে অর্থ করা গিয়াছে, তদনুসারে দেখা যায় যে, অয়নাংশ ২১, ২২, ২৩ নহে। আমাদের দেশীয় পাঁজীগুলি প্রকৃতপক্ষে এ বৎসরের অয়নাংশ প্রায় ২২।২৩ দিয়াছেন। বোম্বাইর বেঙ্কটেশ কেতকর প্রায় ২২।৩২ দিয়াছেন, এবং পুরীর ওড়িয়া পাঁজী ২২।৩৮ দিয়াছেন। এখানে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাদের প্রমাণ-স্বরূপ শেষের গ পদক দেখুন।

কোন অয়নাংশ ঠিক? এই দুরূহ প্রশ্নে আমরা প্রবেশ করিব না। ইহা আমাদের বর্তমান জ্যোতিষের ও পাঁজীর জঞ্জাল-স্বরূপ। ৫ম চিত্র দেখিলে অয়নাংশের ব্যাপার সম্যক্ বোঝা যাইবে। যে পাঁজীই হউক, কবে কখন্ বিষুবপাতে রবি আসেন, তাহা পাঁজীকে গণনা করিতে হয়। ইহা প্রত্যক্ষযোগ্য, সুতরাং প্রকৃত সময় না মানিলে চলে না। বি এই বিষুবপাত। যাঁহারা অয়নাংশ ২২।২৩ বলেন, তাঁহারা যে স্থানে মেষের আদি স্বীকার করেন, অন্যেরা বলেন সে স্থান হইতে ৮ কলা, এবং তৃতীয় দল ১৫ কলা পূর্বে অবস্থিত। এই হেতু ঐ তিন মতাবলম্বীর রাশিগুলিও অত দূরে দূরে পড়ে, সৌরমাসের সংক্রমণ-কালে একটু একটু প্রভেদ ঘটে, অধিমাস নির্ণয়ও দুরূহ হইয়া উঠে।



৪র্থ চিত্র।



৫ম চিত্র।

আরও একটু কথা আছে। সকলের মতে সৌরবৎসরের পরিমাণ সমান। কারণ সকলেই সূর্যসিদ্ধান্তের বর্ষপরিমাণ স্বীকার করেন। যতদূর জানি, কেবল কেতকর বর্ষপরিমাণও কিছু ছোট ধরিয়াছেন। কারণ পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করিলে সূর্যসিদ্ধান্তের বর্ষপরিমাণ

গ্রহণ মধ্যকাল ছিল? গণকের অনবধানতায় গণনায় পূর্বাপর সামঞ্জস্যের হানি হয়। তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত আর দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

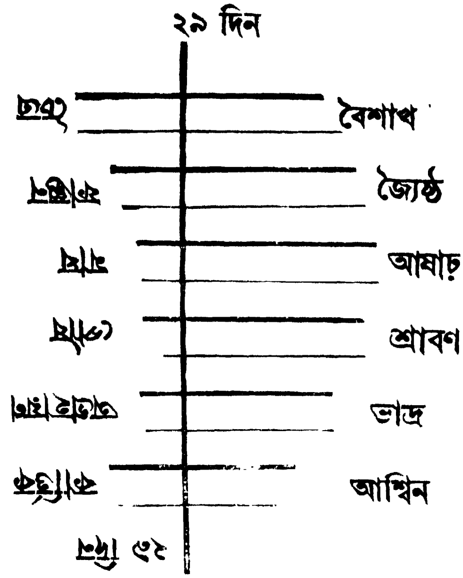
(১) রবি শশীর স্ফুটস্থান হইতে অমাবস্যার স্থিতি আসে, দং ১৪।১৩.৩৩। কিন্তু লেখা আছে, দং ১৪।৬।১১।

(২) রবিশশীর স্ফুটস্থান হইতে গত্যন্তর আসে ৭৯০।৮, তিথি হইতে আসে ৭৮৫।৭।

(৩) অমাবস্যান্তে রবিকেতুর অন্তর ০।১২।২।৩৬। সূর্যসিদ্ধান্তমতে চন্দ্রের পরম বিক্ষেপ ধরিলে শর আসে ৫৬।২৪। কিন্তু ছিল ৫২ কলা।

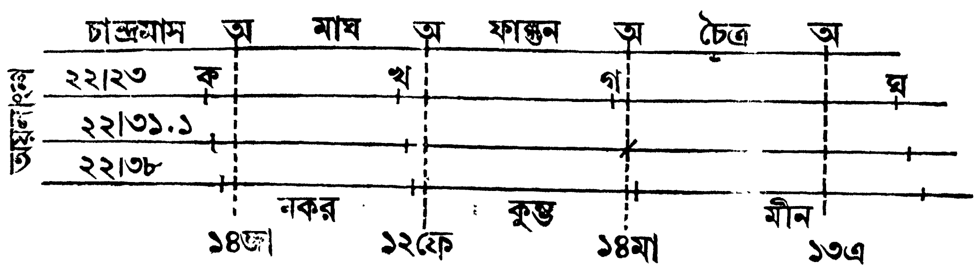
(৪) রবির যে উদয়লগ্ন পাঁজীতে দেওয়া আছে, তাহা ধরিলে অমাবস্যান্তে (দং ১২।৩৬) উদয়লগ্ন আসে ০।৩।৬; ইহার সহিত পাঁজীর অয়নাংশ ২১।৭ যোগ করিলে সায়নলগ্ন হয় ০।২৪।১৩; কিন্তু বাস্তবিক ছিল ০।২৬।২১।

কিছু বড়। ইহাকে অগ্রাহ্য করিলেও আর এক কথা থাকে। পূর্ব্বকালে রবির যে গতি এবং রবিপথের যে স্থানে যে গতি ধরা হইয়াছিল, এখন সে গতি নাই। এই হেতু সৌরমাসের পুরাতন পরিমাণের সঙ্গে বর্ত্তমান পরিমাণ ঠিক মিলে না। শেষের ঘ পদকে ইহা দেখান গেল। বাঙ্গলা পাঁজীতে যে মাস মান ধরা হইতেছে, এবং তাহা প্রকৃত পক্ষে যত, তাহা ৬ষ্ঠ চিত্রে সরু ও মোটা রেখা দ্বারা দেখান গেল। ইংরাজী জ্যোতিষাশ্রয়ী পাঁজী বর্ত্তমান সৌর মাস-মান মানেন, পুরাতন মানেন না। দেখা যাইবে, পুরীর ওড়িয়া পাঁজীর সহিত ইংরাজীর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এই পাঁজীর সৌরমাস-মান ঠিক আসিয়াছে। সামন্ত চন্দ্রশেখরের কৃতিত্বের ইহা আর এক প্রমাণ।



৬ষ্ঠ চিত্র।

যদি প্রকৃত অধিমাস নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রকৃত সৌর মাস-মান অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক, এই সৌরমাস মান, এবং চান্দ্রমাস-মান লইলে কোন্ মাস অধিমাস হয়। ৭ম চিত্রে অ অমাবস্যান্তকাল, সকলের পক্ষেই ঠিক। অয়নাংশ ২২।২৩



৭ম চিত্র

হইলে ক খ গ ঘ রবির মকর কুম্ভ মীন ও মেষে প্রবেশ কাল। তেমনই অয়নাংশ ২২।৩১·১ কিংবা ২২।৩৮ হইলে ঐ সকল রাশিসংক্রমণ কাল একটু একটু পরে পরে পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, ২২।২৩ মতে চান্দ্র চৈত্র অধিমাস, ২২।৩১·১ মতেও তাই। অয়নাংশ ২২।৩১·১ এর বেশী হইলেই চান্দ্র ফাল্গুন অধিমাস হইবে (ঙ পদক দেখুন)।

আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের শুদ্ধ পরিমাণ ধরিয়াছি। অনেক পাঁজী যে অশুদ্ধ মান দিতেছেন, তাঁহাদের গণনামতেও চান্দ্র চৈত্র অধিমাস। বোম্বাইর কেতকরের পাঁজী পাইলাম না। কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্গণিতে দেখিতেছি, তাঁহার মতে এ বৎসর অয়নাংশ ২২।৩২, অর্থাৎ ২২।৩১·১ অপেক্ষা অধিক। এই হেতু তাঁহার পাঁজীতে চান্দ্র ফাল্গুন অধিমাস হইয়া থাকিবে।

এখন আমাদের প্রশ্নের এই উত্তর পাইলাম। অয়নাংশ ২২।৩১·১ এর কম হইলে চান্দ্র চৈত্র অধিমাস, বেশী হইলে চান্দ্র ফাল্গুন অধিমাস। অথবা আগামী ১৩ এপ্রেল তারিখে রাত্রি ৮৷৷০টার পূর্ব্বে নববর্ষারম্ভ ধরিলে চৈত্র অধিমাস, পরে ধরিলে ফাল্গুন অধিমাস।

যদি এখনও কোন পাঠকের ধৈর্য থাকে, তাহা হইলে



রিক্‌টার কর্ত্তৃক অঙ্কিত প্রুশিয়ার রাণী লুই

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

তিনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ঐ দুই মতের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক। আমরা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ। আমাদের গৃহের জঞ্জালের ন্যায় পাঁজীর অয়নাংশ-জঞ্জালে নানা জিনিস মিশিয়াছে।

কি প্রকারে অয়নাংশ ২২।২৩, ২২।৩২, ২২।৩৮ আসিয়াছে, তাহা বোঝা কঠিন নহে। পরে পরে যথাক্রমে রবি সোম মঙ্গলাদি বার গণিয়া আসিয়া আজি (মনে করুন) সোমবার পাইতেছি। তেমনই সৌরবর্ষ পরিমাণ ৩৬৫·২৫৮৭ দিন পরে পরে যোগ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমান বর্ষের আদি ও শেষ দিন ঘণ্টা মিনিট পাইতেছি। এই গণনার আরম্ভে, কিংবা মধ্যে, কিংবা অন্য কোথাও কেহ ভুল করিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান বর্ষের আদি ও অন্তকাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

যদি এ কথা স্বীকার করি, তাহা হইলে কোন তর্ক উঠিতে পারে না। কারণ পরে পরে গণিয়া আসিয়া বর্ত্তমান বৎসরের শেষ সময় পাইতেছি। অর্থাৎ আজি সোমবার কি মঙ্গলবার, তাহা স্থির করিবার যে উপায়, এ বর্ষ কখন্ শেষ হইবে, তাহা নিরূপণ করিবারও সেই উপায়। এই নিমিত্ত বর্ষশেষে কত অয়নাংশ হইল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই হেতু এ দেশীয় অধিকাংশ পাঁজীর অয়নাংশে আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখা যায়। পাঁজী ঠিক কোন্ স্থানের নিমিত্ত গণিত, তাহা বুঝিতে আমাদের কিছু ভুল হইয়া থাকিবে। তথাপি দেখা যায়, অধিকাংশ পাঁজী বলিতেছেন আগামী ১৩ এপ্রেল তারিখে বেলা প্রায় ১৭ ঘণ্টার সময়ে নববর্ষ আরম্ভ হইবে; পুরীর পাঁজী বলিবেন, না, ২৩ ঘণ্টার সময়ে নববর্ষ আরম্ভ হইবে।

কেতকর ও তাঁহার মতাবলম্বী কেহ কেহ বলেন যে, জ্যোতিষে মেয়েলী হিসাবের কর্ম্ম নহে, রবি তাঁহার পথের কোন্ স্থানে আসিলে বৎসর আরম্ভ হইবে, তাহা কোন তারা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখ। কারণ কে জানে সেই তারার কাছে আসিতে রবির কোন্ বৎসর কত দিন ঘণ্টা ইত্যাদি লাগে। তারা ধরিয়া বৎসরের আদি নির্দ্দিষ্ট রাখিতে কেতকরকে দেশীয় প্রচলিত বর্ষপরিমাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কারণ আমাদের বর্ষমান প্রকৃত পক্ষে কিছু বড়।

সামন্ত চন্দ্রশেখরেরও প্রথমে ঐ উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত কেতকর চিত্রা তারা ধরিয়াছেন, চন্দ্রশেখর রেবতী তারা ধরিয়াছেন। যে তারাই ধরা যাউক, উদ্দেশ্য একই। কিন্তু একই তারা না লইলে ফল এক হইতে পারে না। তা ছাড়া, চন্দ্রশেখর প্রচলিত বর্ষমান শোধিত করিয়া লয়েন নাই। সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহাকে মেয়েলী হিসাবই রাখিতে হইয়াছে। অর্থাৎ কোন সময়ে তিনি বিষুব-পাত হইতে তাঁহার রেবতীর দূরত্ব পরিমাণ করিয়াছিলেন, এবং সেই দূরত্বে সূর্য্য আসিলে বৎসর আরম্ভ ধরিয়াছিলেন। তার পর ৩৬৫·২৫৮৭ দিন পরে পরে যোগ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমান বর্ষের আদি ও শেষ পাইয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষ-বাদী ছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বিশ্বাসে তাঁহার তুল্য অল্প লোকই পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র মানিব, অথচ প্রত্যক্ষবাদী হইব, দেশীয় পঞ্জিকাকারেরা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন নাই, চন্দ্রশেখর পারিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এখন তিনি ইহলোকে থাকিলে দেখিতেন যে, তাঁহার প্রয়াস বিফল হইয়াছে, তাঁহার রেবতী তারা ধরিলে বর্ষারম্ভ তিন দিন পরে পড়িবে!*

দুই বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে দ্বারকাধীশ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য স্বামীর আজ্ঞায় আমাদের দেশের জ্যোতিষিগণের এক মহাসভা হইয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান পাঁজীর শোধন করা সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভায় স্থির হইয়াছে যে, রবিবর্ষমান যেমন সূর্যসিদ্ধান্তের চলিত আছে, তেমনই থাকিবে।† দেশের সর্ব্বত্র এক পাঁজী প্রচলনের নিমিত্ত সভা নূতন করণ বা সারণী (tables) নিমাণের আদেশ করিয়াছেন। দেখিতেছি, কলিকাতার কএকজন জ্যোতিষী ও স্মার্তপণ্ডিত ঐ সভার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়াছেন। অতএব অচিরে আমরা শোধিত এবং সকল স্থানের পক্ষে একমাত্র পঞ্চাঙ্গ পাইব। ইহা দেশের পক্ষে কম কথা নহে।

* চন্দ্রশেখরের রেবতী পুরাতন সিদ্ধান্তের রেবতী নহে। তাঁহার রেবতী জিটা নহে, ইটা পিসিয়ম্। এ বৎসর এই তারার সায়ন ভোগ ২৫।৩১। সিদ্ধান্তদর্পণ গ্রন্থের ইংরাজি মুখবন্ধের ৫৫ ও ৫৭ পৃষ্ঠ দেখুন। ঐ মুখবন্ধে এবং Hindu Almanac Reform নামক পুস্তিকায় অয়নাংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা বলা গিয়াছে।

† কিন্তু তাহা থাকিলে পরে পাঁজী শুদ্ধ থাকিবে কি? ১,০০ বৎসরের সূর্যের স্থানে প্রায় ১৪ দণ্ডের প্রভেদ পড়িবে।

দেশের ভাষার অনৈক্যে আমাদের অনেককে ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিত হয়। পাঁজীর অনৈক্যে ইংরাজী সন তারিখ দিতে হয়। কিন্তু বোধ হয় না, ইংরাজী ভাষা কিংবা ইংরাজী সন তারিখ দেশে সর্ব্বসাধারণের সামগ্রী হইতে পারিবে। অতএব পাঁজী এক পাইবার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পাঁজী এক হইলে আমাদিগকে এই মলমাসের কথা পাড়িতে হইত না। পূর্ব্বকালে যখন প্রদেশসমূহ এক রাজার অধীনে ছিল না, যখন রেল ইষ্টীমার টেলিগ্রাফ ছিল না, যখন নিজের গ্রামখানিই পৃথিবী বোধ হইত, তখন যে ভাবে সমাজ চলিয়াছে এখন সে ভাবে চলিতে পারে না। সমাজের হিতের নিমিত্ত পাঁজীর সৃষ্টি; পাঁজী আমাদিগকে করে নাই, আমরা পাঁজী করিয়াছি। অতএব যে পাঁজী সমাজের অনিষ্ট করিবে, সমাজ বন্ধনের বিঘ্ন জন্মাইবে, তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসরগণনা, মাস গণনা, মাসের দিনগণনা, এমন কি দিনের ভাগ গণনা ভারতের সর্ব্বত্র এক হওয়া অত্যাবশ্যক।*

দেশাচারের মত স্মৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হইতে পারে। আজি একাদশীর উপবাস করিব, কি কালি করিব, তাহার মীমাংসায় দেশের সকলকে জড়াইতে হয় না। কিন্তু আজি বৎসরের প্রথম দিন গণিব, কি কালি গণিব, তাহার মীমাংসায় সকলেরই সম্বন্ধ আছে। খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরা নানাকারণে বুঝিয়াছেন যে ইংরাজী সনের প্রথম অব্দে খ্রীষ্টের জন্ম হয় নাই, উহার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু তা বলিয়া কেহ কি এই ১৯০৭ সনকে ১৯১১ গণিতে বসিবেন? সত্যের আদর করিলে ১৯১১ গণা উচিত। কিন্তু পাটীগণিতের সে সত্যে কি ফল, যদি তাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে?

অত কথায় কাজ কি? এই অধিমাস গণনাই দেখুন। বাঙ্গলা (ও প্রায় ওড়িশায়), আমরা সৌরমাস গণি বলিয়া অধিমাসের গুরুত্ব বুঝি না। কিন্তু বাঙ্গলা লইয়াই ভারতবর্ষ নহে। যদি পাঁজীতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বৎসর মাস দিন পৃথক্ পৃথক্ লিখিতে হয়, তাহা হইলে পাঁজী বড় করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবন সেই সকল গণনার বৃথা ভারে আক্রান্ত হইবে, সমাজে পাঁজীর উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে।

এই দোলযাত্রাই দেখুন। পুরীতে দোল উপলক্ষে বৎসর বৎসর ৪০।৫০ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে। সে সব যাত্রী কোন্ মাসে আসিবে? যদি পুরীর পাঁজীর মত যথা সময়ে শুনিয়া না থাকে, তাহা হইলে ফাল্গুন মাসে আসিবে, এবং আসিয়া বিফল মনে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কি বহুকষ্টে সঞ্চিত কত অর্থের অপব্যয় হইবে, কি শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিবে! ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ যাত্রীর কষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। যাহাদের অর্থ আছে, কিংবা যাহারা যথাসময়ে দোলযাত্রার দিন শুনিয়াছে, তাহারাই কি শুদ্ধমনে চৈত্রমাসে আসিতে পারিবে? তাহারা যে পাঁজী মানে, তাহাতে চৈত্রমাস অশুদ্ধ লেখা দেখিলে মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ নাই, জন্মিবে। সন্দেহ দূর করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যদি শাস্ত্র দ্বারা সন্দেহ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতিই লোকের অনাদর বাড়িবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সোজা কথাটা আমাদের দেশের পাঁজীকারেরা ভুলিয়া যান। আশা করি, তাঁহারা কালস্রোত উপেক্ষা করিবেন না। ফলিত জ্যোতিষের যাহা সন্দেহাত্মক, তাহার বাহুল্যে পাঁজী বড় করিবেন না। যাহাতে সন্দেহ নাই, সেই কথাই বলিতে পাঁজীর জন্ম। বারবেলা ও কালবেলা গণিতে গণিতে দেশের বেলা বহিয়া যায়।* বালক ও যুবকেরা দলে দলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে, অথচ ঘরের পাঁজীতে সে বিজ্ঞানের সায় পাইবে না? পৃথিবী স্থিরা বলিলে আর কি স্থির থাকিবে, না রাহু নামক অসুর আসিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে বলিলে কেহ শুনিবে? পঞ্জিকাকার নিশ্চিত জানেন এমন অসম্ভব কথা আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা বলেন নাই। বস্তুতঃ যখনই পঞ্জিকাকার গ্রহণ গণনা করিয়া গ্রহণের আদিঅন্ত বলিয়া দেন তখনই কি তিনি বলেন না, উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ?

* প্রাচীনকালে গ্রাম খানিই যে পৃথিবী ছিল, তাহার প্রমাণ সূর্য্যোদয় হইতে বেলা গণনা। আমার গ্রামে যখন সূর্য্যোদয় হইবে, তোমার গ্রামে তখন হইবে না। অবশ্য সূর্য্য দেখিয়া বেলা মাপায় সুবিধা আছে, সূর্য্যই সকলের পাকা ঘড়ী হইয়া থাকেন। অসুবিধা এই যে, আমার ঘড়ী ও তোমার ঘড়ী একই সময় দেখায় না।

* ফলব্যবসায়ীরা বলেন, মন্দ ফলই বেশী ঘটে। যদি তাই হয়, তাহা হইলে ফল গণনা না করাই ভাল। দেশে যে মন্দের দশা চলিতেছে, তাহা ত সকলেই জানে, গণিয়া লাভ কি?

বোধ হয়, এক বঙ্গদেশেই বর্ষে বর্ষে লক্ষাধিক পাঁজী বিক্রয় হয়। ইচ্ছা করিলে পাঁজীর দ্বারা কত হিত উপদেশ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, সত্য ইতিহাস, প্রাচীনকালের কাহিনী বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি কত কথা লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে শুনাইতে পারা যায়।

পরিশেষে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি 'অদ্বেষী নিত্যসন্তোষী গণিতাগমপারগঃ' পঞ্জিকাগণক মহোদয়গণ লেখকের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি

কটক, শক ১৮২৮ চৈত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ক পদক।

১৪ জানুয়ারী অমাবস্যা।

	ইং পাঁজী	বাপূ	পুরী ১	কলি ১	কাশী ১	জয়	রাজ	জোধ	কান
দেশান্তর মিনিট	০	—৩	—১৪	—২৪	—৩	+২৭	+৩	+৩৮	+৯
দিনার্দ্ধ দং		১৩।১২	১৩।৩৭	১৩।২২	১৩।৮	১৩।১	১৩।৫১	১৩।৭	১৩।৬
অমা দং		১১।৩৮	১২।৩৯	১৪।৬	১২।১৮	১১।৪৭	১৩।৫৭	৮।৪৮	১২।১৬
সঃ সঃ সময়									
ঘঃ মিঃ	১১।২৭	১১।২৮	১১।৩২	১২ ৩	১১।৪৬	১২।৬	১২।১৪	১১।৩	১১।৪৬

২৯ জানুয়ারী পূর্ণিমা।

	ইং পাঁজী	বাপূ	পুরী ১	কলি ১	কাশী ১	জয়	রাজ	জোধ	কান
দিনার্দ্ধ দং		১৩।৩০	১৩।৫২	১৩।৩৭	১৩।২৬	১৩।১৯	১৫।২৮	১৩।২২	১৩।২৫
পূর্ণিমা দং		৩১।২	৩২।৪	৩১।৫১	২৯।৫৯	৩০।৩১	৩০।৫৭	২৭।৫০	৩১।২
সঃ সঃ ঘঃ মিঃ	১৯।১৫	১৯।১১	১৯।১৬	১৯।৭	১৮।৪৭	১৯।৩৩	১৮।২৮	১৮।৩৮	১৯।২৫

(পাঁজী হইতে দিনার্দ্ধ ও অমাবস্যা ও পূর্ণিমান্ত কাল গৃহীত হইয়াছে। বোধ হয়, দেশান্তর সব স্থলে ঠিক ধরা হয় নাই।

খ পদক।

চান্দ্রমাস মান (অমান্ত)।

	ইং পাঁজী	বাপূ	পুরী ১	কলি ১	রাজ
মাঘ দিনদণ্ডাদি	২৯।২৯।১৩	২৯।২৯।৪৮	২৯।২৮।৫৯	২৯।২৮।৩৭	২৯।২৮।১৮
ফাল্গুন	।৩১।৫	।৩২।২	।৩১।৩৩	।৩০।৪১	।৩০।২৭
চৈত্র	।৩২।৫৫	।৩৩।৪৬	।৩৪।৭	।৩৩।৮	।৩২।২৫
১৪ জানু অমা দিনাংশ	·৪৮	·৪৮	·৪৮	·৪৯	·৫০
১২ ফেব	·৯৭	·৯৭	·৯৬	·৯৭	·৯৮
১৪ মার্চ	·৪৮	·৪৭	·৪৭	·৪৭	·৪৯
১৩ এপ্রেল	·০৩	·০২	·০২	·০০	—·০১

(দিনার্দ্ধ ও অমাবস্যান্ত দণ্ড পাঁজী হইতে গৃহীত। নীচের অমাবস্যান্ত দিনাংশ কাল সঃ সঃ।)

গ পদক।

অয়নাংশ।

	বাপূ	পুরী ১	কলি ১	কাশী ১	জয়	রাজ	জোধ	কান
দেশান্তর মিনিট	—৩	—১৪	—২৪	—৩	+২৭	+৩	+৩৮	+৯
১৩ জানুয়ারী মকরে রবির								
প্রবেশ দং	৩৮।৫২	৫৫।৩১	৪৯।৩৬	৪৭।১৪	৪৫।৪৬	৭৬।৩৬	৪১।৩৫	৪৮।৪১
দিনার্দ্ধ দং	১৩,১২	১৩।৩৮	১৩।২১	১৩।৭	১৩।১	১৩।৫০	১৩।৭	১৩।৬
প্রত্যক্ষ রবি হইতে গণিত								
রবির অন্তর অথবা অয়নাংশ	২২।২২˙৬	২২।৩৮˙৬	২২।৩২˙৫	২২।৩১˙১	২২।৩১˙০	২৩।০˙২	২২।২৭˙১	২২।৩২˙৭

আগামী বর্ষারম্ভে ১৩ এপ্রেল								
মেষ প্রবেশ দং	২৭।৪০	৪৪।২	২৯।৬	২৬।৪২*	২৫।৫৭*	২৬।৫০	১৮।৪০*	২৬।৫০
দিনার্দ্ধ দং	১৫।৪১	১৫।৩২	১৫।৩৬	১৫।৪২	১৫।৪৭	১৫।২৮	১৫।৪৫	১৫।৪২
বর্ষশেষ ঘঃ মিঃ সঃ সঃ	১৬।৪৬	২৩।১১	১৭।১	১৬।২২	১৬।৩২	১৬।৩৭	১৩।৪৯	১৬।৩৭
অয়নাংশ	২২।২২˙৭	২২।৩৮˙৪	২২।২৩˙৩	২২।২১˙৭	২২।২২˙১	২২।২২˙৩	২২।১৫˙৫	২২।২২˙৩

* আগামী বর্ষের পাঁজী না থাকাতে বর্ত্তমান বর্ষারম্ভ দণ্ড পলে দং ১৫।৩২ যোগ করিয়া আনা হইল।

ঘ পদক।

রবিমাস মান (সাবন দিন)।

		ইং পাঁজীমতে প্রায়	বাপূ	পুরী	কলি ১	কাশী ১	জয়	জোধ	রাজ	কান
বৈশাখ	...	৩০˙৮৮	˙৮৯	˙৮৯	˙৯৫	˙৯৫	˙৯৫	˙৯৫		
জ্যৈষ্ঠ	...	৩১˙২৮	˙২৮	˙২৮	˙৪৩	˙৪৩	˙৪৩	˙৪২		
আষাঢ়	..	৩১˙৪৫	˙৪৫	˙৪৭	˙৬৪	˙৬৩	˙৬৪	˙৬২		
শ্রাবণ	...	৩১˙৩৫	˙৩৪	˙৩৩	˙৪৭	˙৬৫	˙৩৩	˙৪৭		
ভাদ্র	...	৩১˙০০	৩০˙৯৯	˙৯৯	৩১˙০০	˙০০	˙১৬	˙০৬		
আশ্বিন	..	৩০˙৪৮	˙৪৯	˙৪৯	˙৪৩	˙৫৯	˙৪১	˙৪৫		
কার্ত্তিক	...	২৯˙৯৭	˙৯৮	˙৯৮	˙৮৮	˙৭১	˙৮৮	˙৮৮		
অগ্রহায়ণ	...	২৯˙৬১	˙৫৯	˙৫৭	˙৪৮	˙৪৮	˙৪৭	˙৪৮		
পৌষ	.	২৯.৪৫	˙৪৪	˙৪৩	˙৩২	˙৩১	˙৩০	˙৩৩		
মাঘ	..	২৯˙৫৫	˙৫৫	˙৫৩	˙৪৫	˙৪৫	˙৪৫	˙৪৫	˙৯৮	˙৪৪
ফাল্গুন	...	২৯˙৮৮	˙৮৯	˙৮৯	˙৮৫	˙৮৩	˙৮৪	˙৮৩	˙৮৩	˙৮২
চৈত্র	...	৩০˙৩৮	˙৩৮	˙৩৮	˙৩৭	˙২২*	˙৩৯*	˙৩১*	˙৩৬	˙৩৬

* আগামী বর্ষের পাঁজী না থাকাতে ৩৬৫˙২৫ হইতে আনা গেল।

৬ পদক।

অধিমাস।

অয়নাংশ	মকরে অমা	মকরে রবিপ্রং	অন্তর	কুম্ভে অমা	কুম্ভে রবি প্রং	অন্তর	মীনে অমা	মীনে রবি প্রং	অন্তর	মেষে অমা	মেষে রবি প্রং	অন্তর	অধিমাস
		১৪ জানু			১২ ফেব			১৪ মার্চ			১৩ এপ্রে		
২২।২৩	·৪৮	−·১১		·৯৭	·৪৪		·৪৮	·৩২		·০৩	·৭০		
			+·৫৯			+·৫৩			+·১৬			−·৬৭	চৈত্র
২২।৩১·১		·০৫			·৬০			·৪৮			·৮৬		
			+·৪৩			+·৩৭			+·০০			−·৮৩	চৈত্র
২২।৩৮		·১৫			·৭০			·৫৮			·৯৬		
			+·৩৩			+·২৭			−·১০			−·৯৩	ফাল্গুন

(অমান্তকাল ও রাশিতে রবি প্রবেশ কাল, এই দুইএর অন্তর আরম্ভে +, শেষে—হইলে অধিমাস হয়। ঐ দুই কাল দিনাংশে (সঃ সঃ) জ্ঞাপিত হইল।)

প্রাচীন ভারতের অনার্য্য নরপতি কনিষ্ক।

উপক্রম।

ভারতে আর্য্যজাতির উন্নত সভ্যতার দিনে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, অশোকবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি আর্য্য নরপতি-বৃন্দ রাজ্যোন্নতি ও সুশাসনগুণে যে অতুলনীয় কীর্ত্তি-কলাপ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ অনার্য্য-রাজ কনিষ্কও ভারতের সৌভাগ্যভাণ্ডারে যে পরিমাণে যশোরাশি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ভারতবাসীর চক্ষে কম গৌরবের পাত্র নহেন। প্রাচীন ভারতের আর্য্য ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, তাঁহার প্রতি অনার্য্য বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দূরে থাকুক, অনার্য্য ব্যবহারের কোন নিদর্শনই তাঁহাতে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ আর্য্য নরপতিনির্ব্বিশেষেই তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছেন ও যত দিন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ভারতবাসীর হৃদয়ফলক হইতে উৎখাত হইয়া বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত না হইবে, ততদিন তাঁহারা কৃতজ্ঞতাদ্রচিত্তে সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। প্রাচীনভারতে শক নামক অনার্য্যজাতিবিশেষ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে আগমন করিয়া, স্থানে স্থানে অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক এই দেশেই স্থায়ীভাবে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েও তাহারা অত্যন্ত প্রবল ছিল, পুরাবৃত্তই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই শকজাতিবিশেষকে পরাজিত করিয়া তিনি 'শকারি' এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পরও ভারতের নানা অংশে শকজাতির আধিপত্য অল্পবিস্তর বিদ্যমান ছিল। শকগণের কুশননামক শাখাবিশেষ এক সময়ে ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাটের পদবীলাভে সমর্থ হয়। এই কুশন-বংশীয়গণের মধ্যে যাঁহারা উত্তরভারতে বা হিন্দুস্থানে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক প্রতাপাতিশয্যে ও সুশাসনগুণে ভারতেতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ কনিষ্ক তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কুশনবংশীয় রাজা প্রথম ক্যাড্-কাইসিস্ (৭৮ খৃঃ অঃ) শকাব্দ বা শালিবাহন সম্বৎসরের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট চিরকাল সুপরিচিত থাকিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। তদীয় অব্যবহিত পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ক্যাড্কাইসিস্ (চীনীয়দিগের ইয়েন-কাও-চিং) কাশী হইতে কাবুল পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য-

বিস্তার করিয়া, বিজয়মানসে তিব্বতের উত্তরস্থিত চীনীয় অধিকার আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় চীনসম্রাট্‌কে কর দিতে বাধ্য হন। অবশেষে নানা ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের পর (১২০-২৫ খৃঃ অঃ মধ্যে) তাঁহার মৃত্যু হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক ইঁহার মরণকাল তাহার অনেক পূর্ব্বে (৫৭ খৃঃ অঃ) ও কেহ কেহ তাহার অনেক পরে (২৭৮ খৃঃ অঃ) নিরূপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকর্ত্তৃক রোমসম্রাট্‌ অগষ্টস্‌ সমীপে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহাতে তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কনিষ্ক রোমসম্রাট্‌ হেড্রিয়ন্‌ বা মার্কাস্‌ অরেলিয়সের সমকালবর্ত্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। সুতরাং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বপাদের অংশবিশেষকেই মহারাজ কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তির কালরূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

কনিষ্কের রাজ্যবিস্তার।

কনিষ্কের বহুবিধ প্রচলিত মুদ্রা পর্য্যালোচনায়, তাঁহার রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশের কতকটা অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হওয়া যায়। তদীয় রাজ্য দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব্বে গাজীপুর ও বারাণসী এই চতুঃসীমান্তরালে পরিব্যাপ্ত ছিল। ভাওয়ালপুরের নিকটস্থ সুইবিহারের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, উত্তরসিন্ধুর শকরাজাগণও 'মহারাজ অতিরাজ দেবপুত্র কনিষ্ক' কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হন। সুতরাং সিন্ধুনদের মুহানা পর্য্যন্ত যে তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের প্রাচীন বিবরণে লিখিত আছে, কনিষ্ক কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়া, কনিষ্কপুর নামক নগর সংস্থাপন করেন। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী আধুনিক কনিসপুর নামক গ্রাম অদ্যাপি লুপ্তনগরের প্রত্নতত্ত্ব ও মহারাজ কনিষ্কের বিজয়গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তকার তারনাথ বলেন, মহারাজ কনিষ্ক তাৎকালিক মগধরাজধানী পাটলীপুত্রনগর জয় করিয়া বুদ্ধ-চরিত নামক প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন। সংক্ষেপতঃ আধুনিক কাবুল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পঞ্জাব, কাশ্মীর, যুক্তরাজ্য ও বিহারের কিয়দংশ ক্রমশঃ কনিষ্কের করায়ত্ত হয়। তাঁহার রাজধানী পুরুষপুর বা আধুনিক পেশাওয়ার নগর ছিল। কথিত আছে পার্থীয় নামক বিদেশীয় অনার্য্যেরা ভারত আক্রমণ করায়, উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কনিষ্ক ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাতে অধিকার সংস্থাপন করেন। অনন্তর ভারতের প্রাচীন গৌরব উদ্ধারসাধনসংকল্পে উদ্দীপিত হইয়া পূর্ব্বজের মার্গানুসরণপুরঃসর চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান কাশগর, ইয়ারকন্দ ও খোটান অবরোধ পূর্ব্বক (১০৮-৩০ খৃঃ অঃ মধ্যে) চীনসম্রাট্‌কে এরূপ ভাবে পরাজিত করেন যে, অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করিয়া জামিনরূপে রাজকুমারকে কনিষ্কের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন স্থলে তিনটি দেবস্থলী পৃথক্‌ পৃথক্‌ ঋতুতে বন্দী রাজপুত্রের বাসার্থ নির্ণীত হয়। কাবুলের উত্তরস্থিত কপিশপ্রদেশে গ্রীষ্মাবাস নির্দ্দিষ্ট থাকায় সম্রাট্‌কুমারের বৌদ্ধধর্ম্মের আসক্তির ক্রমিক স্ফুরণবশতঃ তত্রত্য নবনির্ম্মিত বিহারের উন্নতিকামনায় তিনি প্রচুর অর্থাদি দান করেন। তাহাতে তাঁহার স্বদেশগমনের পরও বিহারস্থ জনসমূহ কৃতজ্ঞচিত্তে চীনীয় পরিচ্ছদপরিহিত যে চিত্রাবলী তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের ভারত পরিভ্রমণকালেও বিকৃত বা হীনপ্রভ হয় নাই *। তাহার বিশেষ বিবরণ হিউয়েন-সাংয়ের চরিতাখ্যায়ক হুই-লির গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়। এই দেবালয়ে চীনরাজকুমার কর্ত্তৃক যে ধনরাশি প্রোথিত হয়, হিউয়েন-সাংয়ের উক্ত বিহারে অবস্থান কালেই পাঁচহস্ত গভীর ভূমি খনন করিয়া তাম্রপাত্রে নিহিত রাশীকৃত স্বর্ণ ও মুক্তা উত্তোলিত হয়। শীতঋতুর অবস্থান জন্য পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত চীনাপটি নামক স্বনামপরিচিত স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

* অষ্টাদশশত বৎসরের পূর্ব্বেও ভারতীয় চারুশিল্পের এতাদৃশ উন্নতি ছিল। আজ সেই ভারতবাসীকে জর্ম্মানী ও চীনের নিকট হইতে রং লইয়া ইটালীকে গুরু কাড়িয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্যোগ করিতে হয়। চারুশিল্প কেন, আমাদিগের আর 'আমাদের' বলিতে কি অবশিষ্ট আছে? কবি মর্ম্মবেদনায় যথার্থই গাইয়াছেন,—'প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে, কিছুতেই মোরা নই স্বাধীন'। ভারতের উপস্থিত দুরবস্থা মুহুর্ম্মুহু দর্শন ও স্মরণ করিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই ক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে হয়, 'হায়, কি হ'ল দুর্দ্দিন'।

তত্রত্য বৌদ্ধেরা হীনায়ন বা নিম্নতর শাখাবলম্বী ছিলেন। সেই শ্রেণীকর্ত্তৃকই চীনকুমার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অবশেষে ইনিই স্বদেশপ্রত্যাগমনের পর চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপাদিত হয়, কারণ অশোকের সময়ে দক্ষিণ বা পশ্চিম ব্যতীত আর কোথাও বৌদ্ধযাজক বা প্রচারক প্রেরণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং কনিষ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী শকরাজের সহিত সামান্য সংঘর্ষের পূর্ব্বে চীনের সহিত ভারতের রাজনীতিক বা অপর কোন সংস্রব ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক গবেষণায় ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে চীনসম্রাটের পরাজয়ের পর ভারতসম্রাটের আনুগত্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই চীন ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের নিকটও মস্তক নমিত করে। স্বদেশ-প্রত্যাবৃত্ত সম্রাট্তনয়ের উৎসাহে ও উত্তেজনায় বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে অপরিমিতবেগে বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে; এমন কি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই চীন সমগ্র বৌদ্ধাধিকারের শীর্ষস্থান অধিকার করে। অনার্য্যরাজ কনিষ্কের প্রতাপেই মহাপরাক্রমশালী চীনসাম্রাজ্য ভারতের রাজনীতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। চীন ও জাপানের ধর্ম্মানুরাগ আজও মহারাজ কনিষ্কের মহিয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে এই চৈনিক সংঘর্ষ হইতেই নাশপাতি ও পিচ্ (আড়ুফল) ভারতে সর্ব্বপ্রথম আনীত হয়।

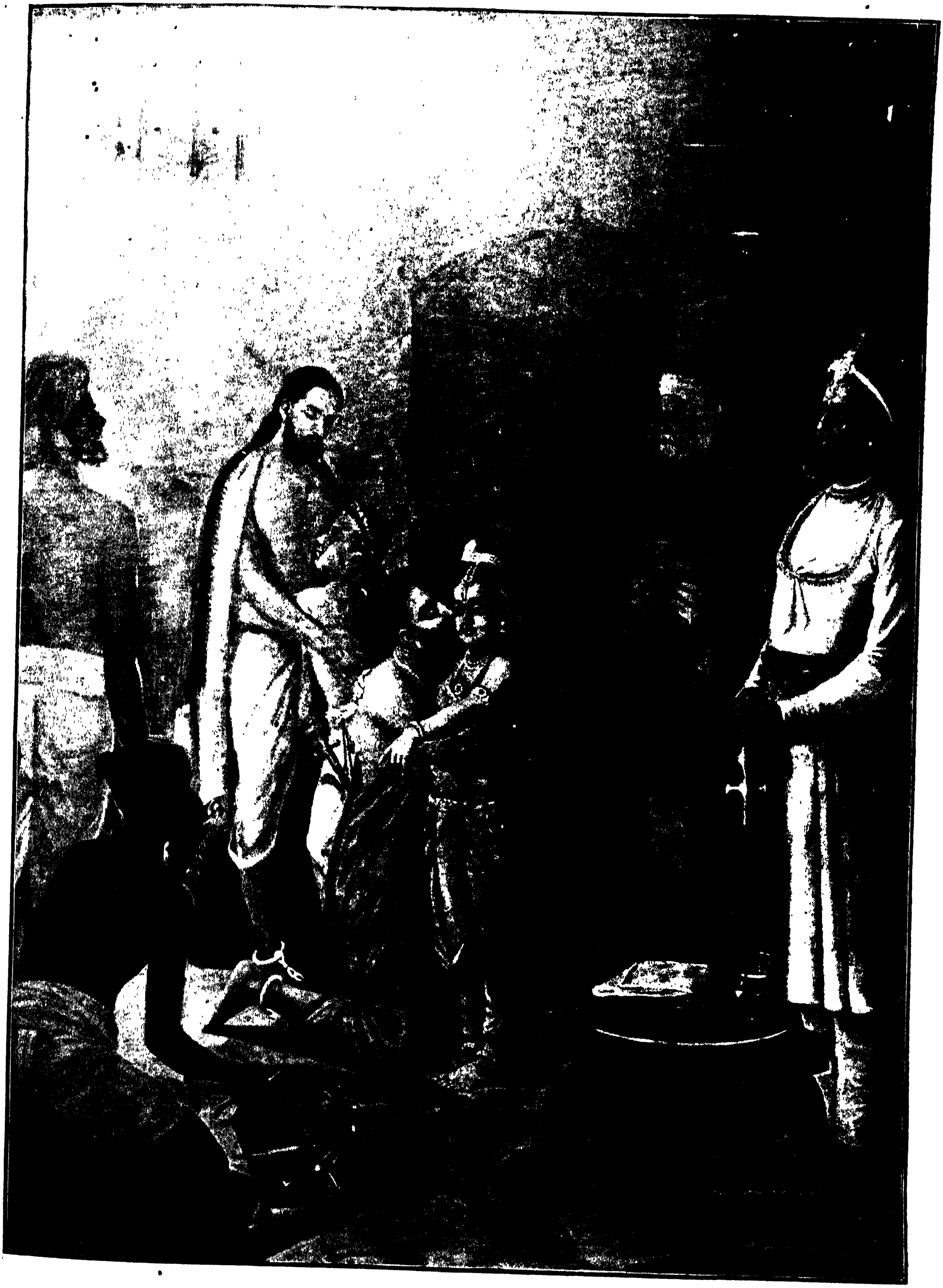
বৌদ্ধধর্ম্মে আনুরক্তি।

শুনা যায়, কনিষ্কের প্রথম বয়সে নীতিধর্ম্মের কোন একটা নির্দ্দিষ্টবন্ধন ছিল না—ন্যায্যান্যায্যের বিচার তাঁহার হৃদয়ে বড় একটা স্থান পাইত না। সে সময়ে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে তিনি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মুদ্রাগুলির পর্য্যালোচনায়, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তনের কতকটা স্পষ্ট আভাষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম জীবনের সিক্কাগুলি গ্রীকভাষায় ও অক্ষরেই লিখিত এবং তদুপরি চন্দ্রসূর্য্যের মূর্ত্তি খোদিত থাকিত। তৎপরবর্ত্তীগুলি গ্রীক বর্ণমালায় কিন্তু প্রাচীন পারস্যভাষাবিশেষে লিখিত এবং তদুপরি মুদ্রিত মূর্ত্তিগুলিও গ্রীক, পারশিক ও ভারতীয় দেবতাবৃন্দের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় মাত্র। আবার শেষ সময়কার সিক্কাগুলিতে বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের মূর্ত্তি অঙ্কিত ও গ্রীক অক্ষরে তাঁহার নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সময় ভগবান বুদ্ধকে দেবতারূপে গ্রহণের ভাব কাহারও মনোমধ্যে উদিত হইতে পায় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ নানাদেশীয়দিগের সহিত সংস্রবনিবন্ধন শিবাদির ন্যায় বুদ্ধও ভারতীয়দিগের জাতীয়-দেবতারূপে পরিগৃহীত হইতে থাকেন। পরিশেষে হর্ষ-বর্দ্ধনের রাজত্বকালে সমান পূজাগ্রহণেও অধিকারপ্রাপ্ত হন। ইহাতে হিন্দু বৌদ্ধের ধর্ম্মবিরোধ অনেকটা প্রশমিত হইয়া, সকলেই এক রাজার শাসনাধীন স্বদেশবৎসল প্রজা ক্রমে ক্রমে এই ধারণাটি পোষণ করিবার উপযোগিনী সমপ্রাণতার যে বিকাশ হয়, মহারাজ কনিষ্কের পক্ষপাতপরিশূন্য শান্তিপূর্ণ শাসনই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অভিহিতপূর্ব্ব সমন্বয়প্রাপ্ত মতের অনুবর্ত্তক, তাঁহাদিগের সম্প্রদায় মহায়ন শাখা নামে প্রখ্যাত। প্রাচীন মত সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট বোধে হীনায়ন নামেই পরিচিত রহিল। গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে, বৌদ্ধদেবতাবৃন্দের গঠনপ্রণালী ও তাৎকালিক গৃহনির্ম্মাণ-চাতুর্য্যপ্রভৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্তম্ভের শিরোভাগ প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা, সেগুলি গ্রীক-রোমক পদ্ধতির বিমিশ্রভাস্কর্য্যের আদর্শেই নির্ম্মিত এইরূপ বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ গ্রীক-দিগের সহিত ঘনিষ্ঠসংস্রবনিবন্ধন তাঁহাদিগের রীতি আংশিকভাবে ভারতীয় বিধির অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কনিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি উদ্রিক্ত হওয়ার পর তাঁহার ধর্ম্মাসক্তির নিদর্শনস্বরূপ ত্রয়োদশ তল-বিশিষ্ট ও অন্যূন ৬৬ হস্ত পরিমিত উচ্চ যে কারুকার্য্যময় কাষ্ঠমণ্ডিত উচ্চ সৌধ (গুম্বুজ বা Tower) নির্ম্মিত হয়, তাহা তাৎকালিক শিল্পজগতের মানবনৈপুণ্যের অসাধারণ ও মহদাশ্চর্য্যজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সং-যুন (খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে) ভারতপ্রদক্ষিণকালে সে স্থানে উপনীত হন, তাঁহার বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুনঃ পুনঃ ভস্মসাৎ হওয়ায় ক্রমে তিন বার তাহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও

হিউয়েন-সাং উভয়েই এই গুম্বজ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিধানে অশেষ শোভার আকর স্বরূপ একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। আধুনিক পেশাওয়ার নগরের 'লাহোর-তোরণের' সমীপবর্ত্তী 'শাহ্ জী কী ঢেরী' (রাজার স্তূপ) নামক ঈষদুন্নত ভূখণ্ড এই বিশাল বিহারের শেষ সমাধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্পেনদেশীয় পরিব্রাজক আল্‌বিরুণির (Alberuni) ভারতভ্রমণকালেও ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি 'কনি'ক চৈত্য' নামে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতেও এই বিহারটি বৌদ্ধশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, মগধরাজপুত্র বীরদেব বিদ্যালাভ ও ধর্ম্মশিক্ষার্থ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ ভারতের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য ও অতীতগৌরবলুণ্ঠনকারী মহমুদ বা তাহার অনুচরগণ কর্ত্তৃকই ইহার ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকিবে।

শেষ জীবন ও চতুর্থ বৌদ্ধসংঘ।

ভারতীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের জীবন প্রায়ই প্রিয়দর্শীর আদর্শেই গঠিত, সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপও মহারাজ অশোকের জীবনীরই কতকটা পুনরুক্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। তাহাতে আবার বৌদ্ধদিগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকাগুলি ঈদৃশ অতিশয়োক্তি ও অসাধারণ ঘটনাসমাবেশে পরিপূর্ণ যে তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, ইতিবৃত্তলেখককে অনেক সময়ে প্রতারিত হইতে হয়। সুতরাং কনিষ্কের ইতিবৃত্ত সংকলনের উপাদান নিতান্ত অল্প ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই তাঁহাকে অনেক প্রবাদ ও জনশ্রুতির আমূল পরিত্যাগ ও কাহারও বা সারসংকলন করিয়া লইতে হয়, যেহেতু ঐতিহাসিকের পক্ষে সত্য তথ্য নির্ব্বাচনের পথ নিতান্ত সরল ও নিরাপদ নহে। কাজেই তাঁহার পারিবারিক জীবনের ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিবার উপকরণাভাবে তাঁহার শেষ জীবনের আলোচনাতেই অগত্যা আস্থা স্থাপন করিতে হইল। কথিত আছে মহারাজ কনিষ্কও অতিরিক্ত শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিয়া অশোকের ন্যায় অনুতপ্ত চিত্তেই শান্তিকামনায় অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রেমময় উৎসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন। পরিশেষে নবধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধন মহারাজাতিরাজ কনিষ্কও শেষ জীবনে একটি বৌদ্ধসংঘ সমবেত করেন। এই উপলক্ষে কাশ্মীরে ও জলন্ধরে বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ববেত্তাগণের বিচারাদির পর যে সিদ্ধান্ত অবলম্বিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নতি সংসাধিত হয়। সর্ব্বাস্তিবাদী ও বৈভাষিক মতানুসারে শাস্ত্রপিটক সমূহের যে টীকা রচিত হয়, তাহার সমালোচনা ও সমর্থনই এই সম্মিলনের প্রথম ও প্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল। হিউয়েন-সাং বলেন, এই বৌদ্ধসংঘের অনুমোদন ক্রমে যে যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহার নাম তাম্র ফলকে খোদিত হইয়া স্তূপতলে সংস্থাপিত হয়। পার্শ্বিক নামক জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাত্মার উপদেশে ও বসুমিত্রের অধ্যক্ষতায় এই মহাসমিতি কুশনবংশীয় নরপতি কনিষ্ক কর্ত্তৃক সম্মিলিত হওয়ায় অপর চৌদ্দ সংঘত্রয়ের ন্যায় বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অন্ততঃ এজন্য কনিষ্কের নাম জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে অনন্তকাল পর্য্যন্ত লিখিত থাকিবে, বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীবক্ষ হইতে উৎখাত করিতে না পারিলে করাল কালের শত শাণিত কুঠারসম্পাতেও তাহা প্রমৃষ্ট হইবার নহে। সুতরাং ধরিতে গেলে অনার্য্যরাজ কনিষ্ক কেবল আর্য্য ভারতবাসীরই গৌরবের পাত্র নহেন; চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম সিংহলও তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ধর্ম্মঋণে আবদ্ধ। ধন্য কনিষ্ক, কুলপাবন তোমাকে পাইয়া শকজাতি ধন্য, আর ধন্য তদানীন্তন ভারতবাসিগণ যাঁহারা তোমার ন্যায় বিজাতীয় রাজার শাসনে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন! শ্রীধর্ম্মপিটক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, কনিষ্কের রাজ্যবিস্তারে নিরতিশয় লালসা প্রযুক্ত এবং এই বিজয়পিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে জানিয়া, তদীয় পরিজন ও পরিচারকবর্গ ক্রমে তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে; এবং অবশেষে তাঁহার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়া, তূলা নির্ম্মিত আবরণে অকস্মাৎ কয়েকজনে তাঁহার মস্তক আবৃত করায় ও একজন তাঁহার শরীরোপরি আরূঢ় হওয়ায়, রুদ্ধশ্বাস হইয়া কনিষ্ক অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৌদ্ধদিগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকাগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও, কোনও প্রতিযোগী প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত



কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতামাতার কারামোচন

নিঃসংশয়িতভাবে তাহার একেবারে অপলাপ করা যায় না বলিয়াই এস্থলে এই জনশ্রুতিমূলক প্রবাদই উপন্যস্ত হইল। কনিষ্কের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তোপযোগী উপকরণের সদ্ভাব না থাকিলেও তিনি যে ২৫ বা ৩০ বৎসরের বিজয়, ব্যবস্থা ও সুশাসনের পর (১৫০ খৃঃ অঃ) মানবলীলা সম্বরণ করেন ও হুবিষ্ক বা হুষ্ক তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হুবিষ্কের পর হইতেই ভারতীয় শকসাম্রাজ্যের গৌরবশিখা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, আর্য্যগণ পুনরায় স্বাধিকার পুনরুদ্ধারের সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন।

উপসংহার।

কনিষ্কপ্রমুখ নৃপতিগণ অনার্য্য হইয়াও কিরূপে ভারতীয় আর্য্যদিগের সহিত এরূপ প্রেমময় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হইয়া অস্থি-মজ্জাগত দ্বেষভাব চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া যাহাতে উভয় জাতিই সহৃদয়তা ও সমপ্রাণতায় একচিত্ত হইয়া অকুণ্ঠ হৃদয়ে 'দেশের ও দশের' কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে পারেন, সে পক্ষে সতত মনোযোগী থাকিতেন, তাহার আলোচনায় বাস্তবিকই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই নবীন কবির এই উক্তির যাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি হয়।—

'একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত,
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতিধর্ম্মের কারণে।'

কবিবর্ণিত মুসলমানগণের ন্যায় অনার্য্য শকেরাও

'অশ্বত্থ পাদপ জাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।*

* হিন্দু কাফের হননে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইয়া পরমপদ প্রাপ্তি হয় যাঁহারা এই বিশ্বাস লইয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলন, বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুদিগের সহিত একত্র অবস্থান হেতু, আজ সেই মুসলমানের সহিত হিন্দুর আচার ব্যবহারের কিরূপ আদান প্রদান হইতেছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। মুসলমানের ন্যায় 'সত্যপীরের শিরণী' দিলে ধর্ম্মহানি হয়, হিন্দু এখন আর এ বিশ্বাস পোষণ করেন না। অনেক হিন্দুকে মুসলমানের দরগার সম্মুখে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিতে দেখা যায়। আবার অনেক মুসলমান হিন্দুর নিয়ম ও অনুষ্ঠান গুলি এরূপ ভাবে মানিয়া চলেন যে, অম্বুবাচি দশহারা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হলকর্ষণ বা বীজবপন নিষিদ্ধ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন, এমন কি অমাবস্থার দিন 'চালপাতেন' না ও গ্রাম্য পূজাদিতেও যোগদান করিলে ইস্‌লাম ধর্ম্মভ্রংশের আশঙ্কা করেন না। কেহ কেহ হিন্দুর আদর্শে 'ভগবানে' বিশ্বাসী হইয়া মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন; অধিক কি, তাহা-দিগের শাস্ত্র বিহিত হইলেও অনেকে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। একজন বঙ্গীয় মুসলমান কৃষকের সহিত কথোপকথন কালে প্রসঙ্গতঃ গোহত্যা বিষয়ক কথা উত্থাপিত হওয়ায়, তিনি বলেন, গোখাদক মুসলমানের জল (মুচির ন্যায়) অপবিত্র জ্ঞানে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। লেখকের জন্মভূমি পরিদর্শন কালে, তিথি জানিবার জন্য সমাগত মুসলমান প্রজাদিগকে, তাঁহারা হিন্দুর এ জাতীয় নিয়মগুলি কত দিন হইতে প্রতিপালন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করায়, হিন্দুদিগের সহিত 'একত্রে বসতি হেতু' অতি প্রাচীন হইতেই তাঁহাদিগের পূর্ব্বজগণ হিন্দুর অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতে-ছিলেন, এরূপ উত্তর পাইয়া বুঝা গেল, বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা 'জেতাজিত বিষভাব' পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুকে ভাই বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ব্বানুশীলিত সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা প্রকর্ষ-লাভ করায়, এই স্বদেশী আন্দোলন সময়েও নানা সুফল প্রসব করিতেছে এবং পরিণামেও তাঁহাদিগের সহযোগিতায় অনেক কৃতকার্য্যতার আশা আছে। তাই যখন শুনিতে পাই সুদূর রেঙ্গুনবাসী মুসলমান বণিক্ বঙ্গের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিপন্ন বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য স্বকীয় ধনভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া রাখিয়াছেন, তখন হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

এই জন্যই ভারতবর্ষ সাধারণের জন্মভূমি বিবেচিত হইয়া সকলেই এক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একটি তন্ত্রীতে টান পড়িলেই সমবেদনা বশতঃ সবগুলিই সমস্বরে বাজিয়া উঠিত, সকলের একতানলয়বিশিষ্ট ভ্রাতৃসম্বোধনের মধুর নিনাদে জগৎ দ্রবীভূত হইত। এবং এই জন্যই মুসলমান নরপতিগণ বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী হইলেও ভারতবাসীদিগের সহিত সাধারণতঃ সমান সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন বলিয়াই ভারত বিদেশীয়ের করকবলিত ইহা ভারতবাসীদিগকে জানিবার ও বুঝিবার বড় একটা অবসর দেওয়া হইত না, কারণ ভারতে বাস নিবন্ধন তাঁহাদিগের স্বার্থ ও হিন্দুস্বার্থ এক হইয়া গিয়াছিল। কি শাসন বিভাগ, কি সেনা, কি রাজস্ব সমস্ত বিভাগেই ভারতবাসীর অব্যাহত প্রতিপত্তি ছিল,— এমন কি, আওরঙ্গজেবও জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহকে উচ্চপদে বরণ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। তাই আর্য্যানার্য্যের নির্ব্বিশেষ ব্যবহার বশতই শকবংশোদ্ভব কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালও হিন্দু রাজ্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সহৃদয়ব্যবহারের এমনই আশ্চর্য্য মহিমা! একই পাত্র ব্যবহারবিপর্য্যাসে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাই এক সময়কার দস্যু রত্নাকর জগৎপূজ্য মহর্ষি বাল্মীকি। সুতরাং বলিতে হয় যিনি যে জাতীয় শক্তি ও পদমর্য্যাদা লইয়া, জগতে আসিয়াছেন, তিনি

যদি তাহার যথোচিত ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে বহির্জগতে তিনি আপাতপ্রতীয়মান সেই শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্তর্জগৎ হইতে তাঁহার সে পদমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হওয়া নিতান্ত বিচিত্র বা অসম্ভব নহে। তাই বলি পিতা পুত্র, পতি পত্নী, প্রভু ভৃত্য, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পদস্থ দিনজীবী, সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, শুধু পিতার অধিকার গ্রহণের দাবি করিলেই চলিবে না, জনকোচিত আন্তরিক বৎসলস্বভাব ও সন্তান-হিতাভিলাষ থাকা চাই, কেবল রাজশক্তিবিশিষ্ট হইলেই যে সব সময়ে সকল প্রজার মাথার মণি হওয়া যায়, ইতিহাস এ কথার সমর্থন করে না। শুদ্ধ পণ্ডিত হইলেই জগতের পূজালাভে সমর্থ হওয়া যায় না। সুতরাং শাস্য শাসকে, সেব্য সেবকে, প্রতিপাল্য প্রতিপালকে সহৃদয়তা-মূলক সদ্ভাবই এ জাতীয়সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই; তাই যেখানেই তাহার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় সেই খানেই দেখা যায় বাহ্যসম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াও মনের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তারে পরাঙ্মুখ। অতএব নির্ম্মল ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন কনোজরাজ জয়চন্দ্র স্বদেশদ্রোহী এবং পাটলী-পুত্রের নন্দবংশীয় আর্য্যনরপতিগণ অত্যাচারী বিবেচনায় ঘৃণিত ও তিরস্কৃত। পক্ষান্তরে বিদ্বেষলেশপরিশূন্য সহৃদয় ব্যবহারে মহারাজাতিরাজ কনিষ্ক ভারতবক্ষস্থিত স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যেও এতাদৃশ অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সেই অনার্য্যরাজের প্রতি আন্তরিক রাজভক্তি প্রদর্শনে অনুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত না হইয়া বরং তাহাতে বিশেষ গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেন।

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বস্ত্রবয়নোপযোগী আঁশের মধ্যে রেশম অন্যতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য-উৎপাদন ও নানা কারণে মূল্যবান। রেশম সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে সকল আঁশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্ত্র-বয়নোপযোগী এই শ্রেষ্ঠ উপাদান সম্বন্ধে সংপ্রতি পরলোকগত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ সুন্দর প্রবন্ধটির সারসঙ্কলন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

রেশমচাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অধুনা রেশমচাষের প্রতি গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বহু ভদ্রলোক মনোযোগী হইয়া ইহার উন্নতিকামী হইয়াছেন।

বাংলায় প্রধানতঃ মালদহ, বীরভূমি, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরে (যদিও এখানকার ব্যবসায় মৃতপ্রায়) রেশমের চাষ হয়। রেশমচাষীরাও এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের পক্ষপাতী হইয়াছে। অনেক চাষী সুস্থ সুন্দর বীজ নির্ব্বাচনের জন্য অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

একরূপ মক্ষিকার উৎপাতে এক কারখানায় কোষকীটের দুপুরুষের অধিক ক্রমান্বয়ে জীবিত রাখা দুষ্কর। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের চাষীরা পরস্পরের মধ্যে বীজের আদান প্রদান আরম্ভ করিয়াছে। ইহা অভিজ্ঞতার শুভ লক্ষণ।

সংপ্রতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রেশমের চাষ কাশ্মীর, মহীশূর, বড়োদা প্রভৃতি রাজ্যে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে না। বিশুদ্ধ পদ্ধতি যথাসম্ভব নিম্নে লিখিত হইতেছে।

রেশমের শ্রেণীবিভাগ।

এক প্রকার কোষকীটের চাষ গৃহাভ্যন্তরে হয় এবং অপর প্রকারের খোলা জায়গায় গাছের উপরে হয়।

ইহাদের কোষ দ্বিবিধ। যাহার সুতা গুটাইয়া লওয়া যায় এবং যাহা হইতে শুধু তুলার মত আঁশ বাহির হয়, পরে তাহা পিঁজিয়া বাছিয়া সুতা তৈয়ারি করিতে হয়। তুঁত-ভোজী কীটের কোষ ও তসর কীটের কোষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের এবং এণ্ডি কীটের কোষ শেষোক্ত প্রকারের। একরূপ খুব বড় কোষ আছে, তাহার কীট অতি সুন্দর, কিন্তু রেশম ভাল হয় না।

তুঁত-ভোজী রেশমকীট।

এতদ্বিধ কীটের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। ইহারা বহু-শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) য়ুরোপ, চীন, জাপান, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের বাৎসরিক কোষ উৎপাদক এবং (২) বড় পলু বা বাংলার বাৎসরিক কোষ উৎপাদক। ইহার কোষ আঁশ-ওঠা, নরম এবং প্রথমোক্তের মত উৎপন্ন হইতে অধিক শৈত্যের অপেক্ষা রাখে না। (৩) বড়পাট বর্ম্মা ও আসামে জন্মে; প্রায় বড়পলুর মত। (৪) মহীশূরের কীট। ইহাদের কোষ বৎসরে সাত আট বার হয়। কোষ দেখিতে হরিতাভ শ্বেত, এবং বড়পলুর মতই ভাল। (৫) মান্দ্রাজী বা নিস্তারী। বাংলায় জন্মে। বৎসরে আট বার কোষ উৎপাদন করে। কোষ হরিদ্রাবর্ণ; রেশম সূক্ষ্ম ও নরম। (৬) দেশী বা ছোটপলু। উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ কোষ, প্রচুর শক্ত রেশম পাওয়া যায়। (৭) চীনা কোষ। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেদিনীপুরে চাষ হয়। ইহার কোষ দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ। শ্বেতবর্ণের কোষও হয়, তাহাকে মেদিনীপুরে বুলু বলে। (৮) হিমালয়ের তুঁতগাছে প্রাপ্তব্য বন্য কোষ।

তসর-কীট।

তসরের গুটিও বহুশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে জাপানের আন্থেরিয়া য়িমামাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার রেশম হরিতাভ শ্বেত, মোটা ও কর্কশ। চীনা তসর দ্বিতীয়। আসামের মুগা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাংলার তসর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। চীন জাপানের কীট ওক গাছে পালিত হয়। মুগা কীট সুম, সোলু, মেজাঙ্করী ও চম্পক গাছে; এবং বাংলা তসর-কীট আসন বা সাজ (?), শাল, অর্জ্জুন, সিধ, ধাউ, বৈর, বাদাম এবং অন্যান্য গাছে পালিত হয়।

তসরকোষ হইতে কীটের নিষ্ক্রমণ সময়ের স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ যখন কোষ বড় ও শক্ত হয়, তখন কেহ বা তিন সপ্তাহে নিষ্ক্রান্ত হয়, কেহ দুই বৎসরেও বাহির হইবার নামটি করেন না। এজন্য তসর ব্যবসায়ীরা বীজের জন্য পাতলা ও ছোট কোষ নির্ব্বাচন করে। প্রবন্ধকার পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে বড় ও শক্ত কোষের কীটকে কোষ হইতে কৃত্রিম উপায়ে বাহির করিয়া করাতের গুঁড়ার উপর বা মধ্যে রাখিয়া দিলে, সেই কীট বড় হইয়া উত্তম বীজ উৎপন্ন করে। বন্য কোষ হইতে বীজ সংগ্রহ মরণোন্মুখ তসর ব্যবসায় রক্ষা করার আর এক পন্থা।

বাংলা তসর।

বাংলা তসর ত্রিবিধ—নারিয়া, দাবা, এবং বুগুই। (১) বন্য ছোট আকারের কোষ নারিয়া। ইহার গ্রীষ্মকালের কোষের নাম ধুরিয়া; বর্ষাতি কোষ অক্টোবরে পাওয়া যায়; কেহ কেহ শীতকালেও কোষ সংগ্রহ করে, তাহার নাম জদ্দুই। (২) দাবা,—ঘরোয়া কীটের কোষ। বন্য অবস্থায় খুব শক্ত থাকে বলিয়া কীট নির্গত হইতে দেরি হয়; কিন্তু তথাপি বীজের জন্য বন্য কোষই গ্রহণ করা উচিত। ইহা বোধহয় মুদামুগা কোষের রূপান্তর। ইহাদের কীট নির্গত হইতে বৎসরকাল লাগে। অনেক বর্ষাতি কোষ বীজের জন্য বৎসরকাল রাখা চলে। কিন্তু বীজ পীড়িত হইলে বন্য বীজ সংগ্রহ করা উচিত। (৩) বুগুই সর্ব্ববৃহৎ তসরকোষ। ইহাকে বড়ও বলে। সেপ্টেম্বরে কীট কোষ কাটিয়া নির্গত হয়। বুগুই হইতে বৎসরে একবার, দাবা হইতে দুই বার, এবং নারিয়া হইতে তিন বার রেশম পাওয়া যায়। অক্টোবর হইতে জানুয়ারির মধ্যে যে কোষ সংগৃহীত হয় তাহা সর্ব্বোত্তম। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংগৃহীত নিকৃষ্টতম। এজন্য বর্ষাতি কোষের কাহন যখন ৮৲ টাকায় বিক্রীত হয় তখন নারিয়া বা দাবার কাহন (১২৮০ টা কোষে ১ কাহন) দুই তিন টাকা মাত্র।

তসর-কীট পালন।

ত্রিবিধ তসর কীটেরই পালন নিয়ম এক প্রকার। বেলা চারিটার সময় কীট কোষ কাটিয়া নির্গত হইতে আরম্ভ করে। রাত্রি নয়টা দশটার সময় পুং-কীটগুলি উড়িয়া যায়, কিন্তু ভোর তিনটার সময় ফিরিয়া স্ত্রী কীটের নিকট আসে। পলাতক পুং-কীটকে প্রলুব্ধ করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য পালনকারীরা স্ত্রী-কীটগুলিকে ঘরের বাহিরে ধনুরাকৃতি দাঁড়ে বসাইয়া রাখিয়া বাদুড়, পক্ষী, টিকটিকি প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ কল্পে রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়। কীটগণ রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত সংগত থাকে, পরে হয় আপনারা পৃথক হয়, নয় পালনকারীরা পরস্পরকে পৃথক করিয়া দেয়। তাহারা পুং-কীটগুলিকে গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগকে খাইতে দেয়, স্ত্রী-কীটগুলিকে পাতার ঠোঙায় পুরিয়া ধরিয়া রাখে। তিন দিন পরে কীটের ডিম সংগ্রহ করিয়া দুই তিনটার ডিম (প্রায় ৫০০) এক একটা পাতার ঠোঙায় রাখে। নবম দিবসে ডিম ফুটিয়া নূতন কীট যেমন বাহির হইতে থাকে অমনি সেগুলিকে লইয়া গাছে পাতার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কীট রাখিবার পূর্ব্বে গাছের গুঁড়ি ও ডাল হইতে যথাসম্ভব পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি ঝাড়িয়া দিতে হয় এবং রেশমকীটগুলিকে পাতার উপর রাখিয়া ভেলার তেলের গণ্ডী দিয়া দিতে হয়, যেন অন্য কোন কীট তাহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। প্রত্যেক গাছে ৬ হইতে ১২টা কীটপূর্ণ ঠোঙা ভিন্ন ভিন্ন অংশে গাঁথিয়া দেওয়া হয়, যেন সমগ্র বৃক্ষটিই কীটবীজে পূর্ণ হইয়া যায়। পিপীলিকা, বোলতা, পাখী, কাঠবিড়ালী, বিছা, শুঁয়া পোকা, এবং অন্যান্য শত্রুর আক্রমণ হইতে বীজ কীটগুলিকে রক্ষা করিবার সুবিধার জন্য গাছগুলিকে ছোট করা উচিত। কিন্তু মাটি হইতে ৪।৫ ফুট উচ্চ না হইলে রসভরা পাতা খাইয়া কীটের এক প্রকার পীড়া হয়, এই পীড়া তসর-কীট ও তুঁতভোজী কীট উভয়ের পক্ষে সাংঘাতিক ও মারাত্মক। গাছের নিম্নতন ডালের পাতা মাটি হইতে অধিক রস সংগ্রহ করে; বিশেষ বৃষ্টির পর; রসভরা পাতা কীটের রোগজনক। সুতরাং গাছের ডাল মাটি হইতে ৪।৫ ফুট পর্য্যন্ত কাটিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের ডাল ৫ হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত রাখিয়া বৎসর বৎসর উপর নীচের সমস্ত ডাল ছাঁটিয়া দিতে হইবে। বীজ কীটের মধ্যে মারাত্মক পীড়া প্রতিকারকল্পে প্রত্যহ বৃক্ষতল হইতে বৃন্তভ্রষ্ট বা মৃত কীট সকল অপসৃত করিতে হইবে। পিপুল গাছের আঠা গরম সরিষার তেলে মাখাইয়া একটা কাঠিতে লাগাইয়া গাছ পাহারা দিবার সময় সঙ্গে রাখা ভাল; ডেলা বা ধনুক দেখিয়া বড় প্রাণী ভয় পাইয়া পলাইবে, কিন্তু বোলতা বা পিপীলিকা জাতীয় কীট পতঙ্গ ধরিতে হইলে ঐরূপ আঠাকাঠির দরকার।

কীট সকল একটা গাছের সকল পাতা খাইয়া শেষ করিলে কীটসহ গাছের ডাল কাটিয়া এক বা ততোধিক নূতন গাছে কীটগুলিকে স্থাপন করিতে হয়; এবং যতদিন পর্য্যন্ত গুটি না বাঁধিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়ার অনুসরণ আবশ্যক হয়। কীট সকল গুটি বাঁধিলে ডাল কাটিয়া গুটি গাছ হইতে পাড়িয়া, ডাল হইতে ছাড়াইয়া হাটে বিক্রয়যোগ্য হয়।

যদি কোয়া বা গুটিগুলি শীঘ্র বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে কোষবদ্ধ কীটগুলিকে মারিয়া ফেলা দরকার, এজন্য কোয়াগুলি একটা মাটির কলসীতে পূরিয়া মুখের কাছে পাতালি করিয়া কয়েকটা কাঠি আটকাইয়া দিতে হয়, যেন কলসী উল্টাইয়া ধরিলে কোয়া পড়িয়া না যায়; তৎপরে একটা চুল্লীস্থিত ফুটন্ত জলপূর্ণ কলসীর মুখের উপর সেই কোয়াপূর্ণ কলসীর মুখটা বসাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গরম বাষ্পের ভাপ লাগিয়া সব কীট কোষমধ্যে মরিয়া যায়। তখন কোষগুলিকে রৌদ্রশুষ্ক করিয়া যতদিন ইচ্ছা ঘরে রাখা চলে।

তসর কীটের গৃহ-পালনে এই দোষ ঘটে যে (১) কোষ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হয় (২) রং ক্রমশঃ ফিকে হয় (৩) রেশম সূক্ষ্মতর হইতে থাকে (৪) কোষের বোঁটা, যাহা দ্বারা কোষ বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন থাকে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও লম্বা হয় এবং (৫) কীট অধিকতর পীড়াপ্রবণ হয়। কিন্তু গৃহপালিত কীটের কোষই তন্তুবায়গণ পছন্দ করে, কারণ সেই কোষজাত বস্ত্র খুব সাদা ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

তসরের সূতা বাহির করা।

বাংলার য়ুরোপীয় পরিচালিত কারখানায় পেটেণ্ট উপায়ে তসরের সূতা বাহির করা হইয়া থাকে। সোডা, পটাশ ও গ্লিসিরিন প্রধান মসলা ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপীয় কারখানায় একজন সমস্ত দিনে ২৫০ কোষের সূতা বাহির করিয়া জড়াইতে পারে। দেশীয় প্রথায় সূতা খুলিতে কোষগুলিকে তিসি প্রভৃতি গাছের ছাই বা সাজি মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। ৫০০ কোষের জন্য আধসের ছাই বা আধছটাক সাজি ব্যবহৃত হয়। একখানা কাপড়ের উপর ছাই রাখিয়া খানিকটা জল লইয়া ছাইয়ের উপর ঢালিয়া বার বার ছাঁকিয়া লইতে হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জলের উপর তৈল ভাসিতে দেখা যায়। এই জলে কোষ অর্দ্ধঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়, জলে ছাই মিশাইয়া সিদ্ধ করা অপেক্ষা, উপরোক্ত উপায়ে ছাইয়ের জল তৈয়ার করিয়া লইলে কার্য্য ভাল হয়। ইংরাজিতে এইরূপ জলকে Lye বলে।

সিদ্ধ হইয়া সকল কোষ হইতেই সহজে সূতা খুলে না। যেগুলি হইতে সূতা শীঘ্র খুলে না, সেগুলিকে পৃথক রাখিয়া পরদিন কোষ সিদ্ধ করিবার সময় সেগুলিকে পুনরায় সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বড় এবং শক্ত কোষের সূতা বাহির করিতে অধিক মসলা দিয়া অধিকক্ষণ সিদ্ধ করা আবশ্যক, কোষ সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে মুড়িয়া একটা ছাইভরা

পাত্রের উপর রাখিতে হয়, এবং সূতা খুলিতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রাতে কোয সিদ্ধ হইলে, দিনের মধ্যে ৫০ হইতে ১০০ কোয়ের সূতা বাহির করা যাইতে পারে। বাঁ হাতে তিন হইতে ৫টা কোয়ের সূতার খেই ধরিয়া উরুতে পাক দিতে হয়, এবং ডান হাতে লাটাই ঘুরাইয়া পাকান সূতা জড়াইয়া লইতে হয়। এই প্রচলিত উপায়ে ৫০ হইতে ১০০ কোয়ের সূতা একদিনে পাকান অবস্থায় সংগ্রহ হয়; অতএব এই উপায় নিন্দনীয় নহে। তসর কোয়ের সূতা পাকান তাঁতিদের পরিবারে হয়, কোয পালকেরা করে না; কিন্তু ইহাদেরই করা উচিত। এক কাহন (= ১২৮০) কোয়ে কোয়ের তারতম্যানুসারে তিন পোয়া হইতে দুই সের পর্য্যন্ত রেশম বাহির হয়।

তুঁত।

কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে তুঁত গাছ স্বভাবত জন্মে; এবং এক প্রকার (theophila) রেশম কীট সেই সকল গাছে প্রচুর জন্মে।

তুঁত গাছ বহুবিধ। তন্মধ্যে যাহার পাতা বড়, ঘননিবিষ্ট, মসৃণ, আঠালরসপূর্ণ বলিয়া পুরু, এবং যে গাছে ফল মোটেই হয় না বা খুব অল্প হয়, সেই গাছ রেশমকীটের জন্য গ্রহণযোগ্য। ফেটি বা ঘলতানি তুঁত বাংলার ব্যবহৃত তুঁতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার পাতা হাতের চেটোর মত; ইহাকে ঠিক অবস্থায় রাখিতে অধিক চাষ ও সারের প্রয়োজন। কাজলি বা চিনি তুঁতের পাতা পাতলা ও অধিক রসপূর্ণ, কিন্তু অধিক টেঁকসই। এই তুঁত কীটের শৈশবাবস্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু পোকাগুলি বড় হইলে প্রথমোক্ত তুঁতের পাতাই ব্যবস্থা করা উচিত। এই উভয়বিধ তুঁতের গাছই খুব বড় হয় না। বাংলার রেশমকোয়ের উন্নতির জন্য উত্তম জাতীয় (M. laevigata) তুঁতের প্রচলন করিতে পারিলে ভাল হয়। তুঁতের বড় বড় গাছ তৈয়ার করাও ভাল এবং লাভজনক। গাছ একবার বড় হইয়া উঠিলে তাহার রক্ষার জন্য শ্রম ও অর্থ অল্প ব্যয় করিলেই চলে; কিন্তু তুঁতের ছোট ছোট চারা দেড় বা দুই ফুট অন্তর লাগাইয়া রক্ষা করিতে একর প্রতি ৭৫৲ টাকা খরচ পড়ে।

তুঁতের বংশবৃদ্ধি।

বীজ হইতে বা ডাল কাটিয়া বা কলম করিয়া তুঁতের গাছের বংশবৃদ্ধি করা যাইতে পারে; বীজজাত গাছের পাতা রেশমকীটের পরিণতাবস্থায় উপকারী খাদ্য নহে। সদ্বংশীয় তুঁতের ডাল কাটিয়া লাগাইলেই ভাল গাছ হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাপানী তুঁতের ডাল লাগে না; তাহার কলম করিতে হয়। জাপানী তুঁত ভাল হইলেও ভারতপ্রাপ্য উৎকৃষ্ট জাতীয় তুঁতের অপেক্ষা ভাল নহে; সুতরাং তাহার প্রবর্ত্তন অনাবশ্যক।

বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপাদনে এই সতর্কতা আবশ্যক, -বীজ বপনের পূর্ব্বে কাঁচের ছিপি আঁটা বোতলে কর্পূরের জলে বীজগুলিকে ঘণ্টাখানেক ভিজাইয়া রাখিয়া পরে বপন করিতে হইবে। নতুবা সকল বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তুঁতের বীজ সরিষা অপেক্ষাও ছোট; অতএব ডাকে কোন স্থান হইতে ভাল বীজ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য। উৎকৃষ্ট জাতীয় তুঁত প্রথমে বীজ হইতে উৎপন্ন করিয়া পরে ডাল কাটিয়া চাষবৃদ্ধি করা চলিতে পারে। যখন কাটা ডাল সুপ্রাপ্য হয়, তখন ডাল হইতেই বৃক্ষোৎপাদন কর্ত্তব্য। তুঁতের পালন ক্ষেত্র উঁচু অথচ সহজসেচন স্থানে, উত্তমরূপে খনিত ও কর্ষিত, প্রদত্তপ্রচুরসার এবং পগার ও বেড়া দিয়া উত্তমরূপে ঘেরা হওয়া উচিত। কাটা ডাল বা বীজ সেই ক্ষেতে ৯ ইঞ্চি অন্তর অন্তর রোপন করিতে হইবে; তজ্জাত গাছ ৮ ১০ ফুট উচ্চ হইলে, উঠাইয়া লইয়া মাঠের ক্ষেতে ২০ ফুট অন্তর লাগাইয়া দিতে হয়। গাছ ক্ষেত্রান্তরিত করিবার সময় পূর্ণপরিণত সকল পাতা এবং জমি হইতে ৫ ফুট পর্য্যন্ত সকল ডাল ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। কীটের পরিণতাবস্থায় বীজজাত গাছের পাতা কখন দেওয়া উচিত নয়, কারণ ঐ পাতা প্রচুর রসপূর্ণ।

তুঁত চাষের খরচ।

প্রচলিত তুঁতের চারাজাতীয় গাছের চাষের প্রথম পত্তনে যে খরচ, বড় গাছ তৈয়ারির জন্য প্রথম পালন-ক্ষেত্র তৈয়ার করিতেও সেই খরচ। প্রথম নির্দ্দিষ্ট প্রথার সহিত দ্বিতীয় প্রথার এই প্রভেদ যে গাছগুলি ৯ ইঞ্চির স্থানে দেড় ফুট অন্তর রোপিত হয়, এবং একস্থানে ৪ ৫টা কাটা ডাল একসঙ্গে লাগান হয়, ইহাতে গাছ বড় না হইয়া ঝোপ হইয়া উঠে। এক একর (তিন বিঘা) জমিতে তুঁতের পালন ক্ষেত্র তৈয়ারি করিতে প্রথম দুই বৎসরের মোটামুটি খরচের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) শীতকালে ক্ষেত্র কোদাল দিয়া খুঁড়িবার ৯০ জনের মজুরী ৵০ আনা হিসাবে মোট … …	১৬৸৶০
(২) পগার ও বেড়া … … … …	৩০৲
(৩) ১২ বার লাঙ্গল দেওয়ার খরচ, ফি লাঙ্গলের ভাড়া, দৈনিক ০ আনা হিসাবে … … …	৯৲
(৪) সেপ্টেম্বরে ৩০ বোঝা | প্রায় ৩০ মণ | তুঁতের ডাল সংগ্রহের খরচ ।০ আনা হিসাবে … …	৭॥০
(৫) ডাল কাটিতে ১৫ জনের মজুরী ৵০ আনা হিসাবে …	২৸৵০
(৬) লাইনবন্দি করিয়া ক্ষেতে গর্ত্ত খুঁড়িতে ১৫ জনের মজুরী	২৸৵০
(৭) কাটা ডাল রোপণ করিতে ৪৫ জনের মজুরী …	৮৵০
(৮) অক্টোবরে হাত-আঁচড়া দেওয়ার খরচ … …	১॥০
(৯) ডিসেম্বরে প্রথম অঙ্কুর কাটিয়া দেওয়ার মজুরী …	১॥০
(১০) পরবর্ত্তী লাঙ্গল দেওয়ার খরচ … …	৩৲
(১১) এপ্রেলে পুকুরের পাঁক সার দেওয়ার খরচ …	১৫৲
(১২) মে মাসে লাঙ্গলের খরচ … …	২০
(১৩) মে মাসে (আবশ্যক হইলে) জল সেচনের খরচ …	১৫৲
(১৪) জুলাই মাসে ঘাস নিড়ান খরচ … …	৩৲
(১৫) আগষ্ট বা সেপ্টেম্বরে গাছের মাথা ছাঁটিয়া দেওয়ার খরচ … … … …	১॥০
(১৬) সেপ্টেম্বরে লাঙ্গলের খরচ … … …	১॥০
(১৭) নভেম্বরে বাঁধ দিয়া ক্ষেতে কোদলান খরচ …	৭॥০
(১৮) দুই বৎসরের জমির খাজানা … …	১২৲
মোট	১৪১ ৵০ মাত্র।

(১০) হইতে (১৮) পর্য্যন্ত বাবের খরচ প্রায় ৭৫৲ টাকা বাৎসরিক।

চাষের আয়।

প্রথম বারের পাতা সকল ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ তখনকার পাতা পাতলা ও রসপূর্ণ হয়, এরূপ পাতা রেশম কীটের অপকারী। সেপ্টেম্বরে গাছ রোপণ হইয়া থাকিলে প্রথম পাতার ফসল নভেম্বর ডিসেম্বরে পূর্ণ হয়; ফেব্রুয়ারিতে রোপণ হইয়া থাকিলে এপ্রেলে পূর্ণ হয়। পরবর্ত্তী পাতার ফসল নিম্নজায় মত পাওয়া যায়: -

জানুয়ারি	মাসে	বোঁটাশুদ্ধ	পাতা	২৪/০ মণ	২৪৲
মার্চ্চ	”	”	”	৩৬/০ ”	৩৬৲
জুন	”	”	”	৪৮/০ ”	২৪৲
আগষ্ট	”	”	”	৬০/০ ”	৩০৲
নভেম্বর	”	”	”	৪৫/০ ”	৯০৲
ডিসেম্বর	”	”	”	৪৫/০ ”	৪৫৲

মোট ৬টা ফসলে পাতা ২৫৮/০ মণ মূল্য ২৪৯৲ টাকা মাত্র।

রেশম ব্যবসায়ে লাভ ।

তৃতীয় বৎসর হইতে এক একর জমির তুঁত গাছ হইতে বোঁটাশুদ্ধ পাতা সাধারণতঃ ৩০০/০ মণ পাওয়া যায়। এই পাতা রক্ষিত-ফসলের মত ক্রমশ বিক্রয় করা যায়; রেশম ব্যবসায়ীরা আবশ্যক মত ক্রমশ লইয়া যায়। উপরি নির্দ্দিষ্ট মূল্য ধারে বিক্রয়ের; ক্রেতারা যখন রেশমকীটের পীড়া উপসর্গাদি জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন প্রায়ই বাকি মূল্য শোধ করিতে পারে না। এজন্য রেশমকীটের রোগশূন্য হওয়ায় তুঁতচাষী ও রেশম-কীটপালক উভয়ের স্বার্থ রহিয়াছে। ৩০০/০ মণ পাতা হইতে ৬০০ সের টাটকা কোষ পাওয়া যাইতে পারে--ইহাই সর্ব্বোচ্চ হার। এই পরিমাণ কোষের মূল্য ৬০০্ টাকা পর্য্যন্তও হইতে পারে। পীড়া ও অন্যান্য উপসর্গ উপদ্রবের ক্ষতি নিবারণ করিতে পারিলে, রেশম চাষে যে কতদূর লাভ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তুঁতের গাছ ।

যখন বড় তুঁত গাছ হইতে কীট পালন হইবে, তখন বীজ জাত বা শাখা-উদ্ভূত গাছ হইতে প্রথম ৫ বৎসর পাতা গ্রহণ অকর্ত্তব্য, কারণ গাছের পাতা গাছকে পালন ও রক্ষা করে। এই সকল গাছ প্রথম তিন বৎসর অন্ততপক্ষে ঘেরা বা কাটা দিয়া পশ্বাদির গাত্রঘর্ষণ প্রভৃতি উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হইবে, কুড়ি বৎসর অন্তর দুই সের গোটা হাড় যদি প্রতি গাছের নীচে প্রোথিত করা হয়, এবং প্রতি বৎসর নভেম্বরে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয়, তবে গাছ বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বড় গাছ হইতে বৎসরে দুইবার (ফেব্রুয়ারি বা মার্চ এবং অক্টোবর বা নভেম্বর) মাত্র পত্র গ্রহণ সম্ভব, কারণ বৃক্ষকে সুস্থ জীবিত রাখিবার জন্য গাছে পাতা থাকা আবশ্যক। পঞ্চম বৎসরে যখন প্রথম পাতা গ্রহণ করা হয়, তখন প্রতিবারে দশ সের অর্থাৎ বৎসরে আধ মণ পাতা পাওয়া যায়। দশ বৎসরে প্রাপ্ত পাতার পরিমাণ এক মণে দাঁড়ায়। কুড়ি বৎসর পরে দুই মণ পাতা বৃক্ষ প্রতি গড়পড়তা ধরা যাইতে পারে। যত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ হইবে, তাহা হইতে পাতাও তত অধিক পাওয়া যাইবে। (উৎকৃষ্ট গাছ Morus Levigata, Philippinensis, and the ordinary European Morus alba)। এক বৎসর অন্তর গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার; ইহাতে গাছে না উঠিয়াই আকর্ষী সাহায্যে নবোদ্গত ডাল নোয়াইয়া নীচে হইতে পাতা সংগ্রহ চলে।

রেশমকীটের পালন ।

গৃহাভ্যন্তরে বাঁশের ডালায় করিয়া তুঁতভোজী রেশমকীট ও এণ্ডি বা এড়ি রেশমকীট পালনের নিয়ম প্রায় একরূপ। ডিম্ব হইতে সদ্যনিষ্ক্রান্ত কীটের উপর তুঁত বা এড়ির পাতা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়; ৩।৪ ঘণ্টা পরে পাতাসহ কীটগুলিকে ডিম হইতে পৃথক করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে একটা মাচানের (পারিভাষিক শব্দ ঘরা) সর্ব্ব নিম্নতলে রাখিয়া দিতে হয়। তৎপর দিন ডিম ফুটিয়া যে কীট নির্গত হয় তাহাদিগের দ্বিতীয় তলে, তাহার পরের কীট তাহার উপরে রাখিতে হয়। বড় পলু যাহার ডিম ফুটিতে বিলম্ব হয় তাহা ভিন্ন অন্য ডিমে তিন দিনের বেশি মনোযোগ আবশ্যক হয় না। কীটের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিরূপিত সময় অন্তর অন্তর পাঁচবার খাবার দিতে হয়। শেষ দশায় ৩।৪ বার দিলেও চলে। ডিম হইতে বাহির হইয়া গুটি বাঁধা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কীটেরা চারিবার খোলস বদলায়; গুটির মধ্যেও তাহার দুই দশা, অর্থাৎ দুইবার খোলস বদলায়, একবার খোলস বদলাইয়া কীট ও পতঙ্গের মধ্য দশা-প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীবারে পতঙ্গ হয়। গুটির ভিতরে বা পতঙ্গদশায় ইহারা কিছুই খায় না। পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেই কোষ কাটিয়া বাহির হইয়াই সঙ্গত হয় এবং সঙ্গমান্তে ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। সুস্থ বলিষ্ঠ পতঙ্গ ডিম পাড়িবার পরও পনর ষোল দিন বাঁচিয়া থাকে।

ডালায় প্রত্যহ বহুবার কুচান পাতা খাদ্য রূপে দিতে হয়; সকল পাতাই নিঃশেষে ভক্ষিত হয় না; এজন্য প্রত্যহ ডালা পরিষ্কার করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশী ব্যবসায়ীরা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। কীটগুলিকে পাতলা করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে হাওয়াদার ঘরে (কীটগুলিকে হাওয়ার ঝাপটার মুখ হইতে রক্ষা করিয়া) না রাখিলে কীট শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মরিয়া যায়। অতএব এ বিষয়ে মনোযোগ নিতান্ত আবশ্যক। কীটগুলিকে পাতলা করিয়া পরিষ্কার অবস্থায় রাখিবার জন্য আধইঞ্চি ফুকর বিশিষ্ট সূতার জাল ময়লাপাতাভরা ডালার উপর বিছাইয়া তাহার উপর পাতা দিতে হয় (কীটের প্রথম দুই দশায় খুব মিহি কুচান পাতা দিতে হয় এবং পরে বোঁটাশুদ্ধ গোটাপাতা দিলেও চলে)। নূতন পাতা খাইবার জন্য কতক কীট জালের উপর উঠিয়া আসিলে জাল উঠাইয়া অন্য একটা পরিষ্কার ডালার উপর ঢালিয়া দিলেই হইল। এই উপায়ে বহুকীটপূর্ণ ডালা হইতে দুই তিন ডালায় কীট পাতলা করিয়া রাখা যাইতে পারে, এবং প্রত্যহ ডালাও পরিষ্কার করা যায়।

একডালা সদ্যজাত কীট প্রথম খোলস ছাড়ার পর তিন ডালায় করা উচিত, দ্বিতীয় বারে ৯, তৃতীয় বারে ২৭, চতুর্থ বারে ৮১, এবং অবশেষে গুটি বাঁধিবার সময় ১৬২ ডালায় রাখা দরকার। মাধ্যাহ্নিক আহার দিয়া জালে করিয়া কীট সকলকে ডালান্তরিত এবং পূর্ব্বব্যবহৃত ডালাসকল গৃহের বাহিরে লইয়া রীতিমত পরিষ্কার করা যাইতে পারে। যদি কোন কীট জালে উঠে নাই দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার খোলস ছাড়া বাকি আছে। তাহাদিগকে নাড়াচাড়া না করিয়া পৃথক মাচানে ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলেই হইবে, সে সময় আহার্য্যের আবশ্যক হয় না। খোলস ছাড়ার সময়ে খুব সতর্কতা আবশ্যক তৎকালে উপবাসী রাখা দরকার; খাদ্য তখন অপকারী। কীটসকলের স্ফূর্ত্তি ও ক্ষুধার্ত্তমূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে তাহাদের খোলস ছাড়া হইয়াছে। কীটের গায়ে ফুঁ দিলে যদি তাহারা সত্বর হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহারা খোলস ছাড়িয়াছে; আর যদি ম্যাদামারা ঢিমে রকমে নড়ে তবে তখনো তাহাদের সময় হয় নাই। অভিজ্ঞতাই ইহার প্রকৃত নিদর্শক।

মাচানের প্রত্যেক তলে বা ঘরে সম-বয়সী কীট থাকিবে; যাহারা সর্ব্বশেষের তাহারা উপরিতম তলে থাকিবে। প্রসব ও খোলস ছাড়া উভয় ঘটনার বয়সের তারতম্যেই শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। যদি অসম-বয়সী কীট একঘরে রাখা যায় বিলম্বধর্ম্মী কীটসকল পীড়িত হইয়া পড়ে।

কীট সকল যখন কোষনির্ম্মাণের উপযুক্ত হয়, তখন তাহাদের শরীর প্রায় স্বচ্ছ (translucent) হয় এবং মুখ হইতে ক্রমাগত রেশমী থুথু উদ্গার করিতে থাকে। এই সময় উহাদিগকে বাছিয়া শীঘ্র চন্দ্রকী ডালায় স্থানান্তরিত করা হয়; এই ডালার নির্ম্মাণ-কৌশল কোষ তৈয়ারির সাহায্য করে। Bombyx mori নামক য়ুরোপ, জাপান, চীন ও কাশ্মীর দেশপালিত কীট চন্দ্রকীতে কোষ নির্ম্মাণের সুবিধা পায় না। তাহাদের উপরে শুষ্ক বৃক্ষশাখা ঝুলাইয়া দিতে হয়, এবং তাহারা সেই ডালে গুটি করে। বাংলায় ডিম ফোটা হইতে কোষনিবদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকালে ২০ দিন এবং শীতকালে ৪০ দিন সময় লাগে। ৭৫° ডিগ্রি সমতা-প্রাপ্ত আবহ অবস্থায় গুটিপালন খুব ভাল হয়। এইজন্য নভেম্বর-বন্দ ফসল সর্ব্বোৎকৃষ্ট আর মার্চ্চ-বন্দ ফসল দ্বিতীয়। যদি বড় তুঁতগাছের পাতা ব্যবহার করা হয়, তবে এই দুইটি ফসলই পাওয়া যায়; ঝোপ তুঁতের ব্যবহারে এই দুইবারের ফসল ভিন্ন

অল্প সময়েও গুটি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধিক গরম বা অধিক শীতের সময়ের ফসল প্রায়ই ভাল হয় না। যখন ৪ বা ৮ বার ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তখন কোন বারের ফসলই ভাল হয় না। খারাপ ফসল আট বার পাওয়া অপেক্ষা দুই বারের ভাল ফসল স্পৃহনীয় হওয়া উচিত। মাছির আক্রমণের জন্য বৎসরে আটটা ফসল পাওয়া দুষ্কর; ব্যবসায়ীরা একটা ফসল লইয়া পরবর্ত্তী ফসল বাদ দেয় এবং সেই সময়ের মধ্যে দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কোষ উৎপন্ন করে; এইরূপে বৎসরে ৩।৪ টির বেশি ফসল পাওয়া যায় না।

গুটি তৈয়ার হইয়া গেলে চন্দ্রকী হইতে তৃতীয় দিবসে সংগৃহীত হয় এবং সত্বর বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, নতুবা তসর কীট সম্বন্ধে বলিবার সময় কোষস্থ কীট মারিয়া ফেলিবার যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ উপায়ে গরম বাষ্পের ভাপ দিয়া কীটগুলিকে কোষমধ্যে মারিয়া ফেলা হয়। কিংবা গরম ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মুখে ঝুড়িতে করিয়া কোষ রাখিয়া উপরে কম্বল ঢাকা দিয়াও মারা হয়। অতি গ্রীষ্মের সময় ২।৩ দিনের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপও তাহাদের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট হয়।

তুঁত গাছের গুটির সূতা বাহির করা।

বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সকল কালে সূতা বাহির করিবার পূর্ব্বে গুটিগুলিতে আর একবার বাষ্পের ভাপ দিয়া লওয়া আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার পর কোষগুলিকে রৌদ্রে না দিয়া ঘরের মধ্যে মাচানের উপর ছড়াইয়া শুকাইতে দিতে হয়, এবং যত শীঘ্র সম্ভব (৩।৪ দিনের বেশি বিলম্ব না হয়) সেগুলি হইতে সূতা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। বর্ষাকালে বাতাসে প্রচুর জলবাষ্প থাকে, তাহাতেই কাজ হয়। কিন্তু বর্ষাকালের গুটি হইতে সূতা শীঘ্র খুলিতে চাহে না; তাহাতে ছেঁড়া আঁশ জোড়া দিয়া রেশমের সূতা চিকণ ও সর্ব্বত্র সমস্থূল হয় না।

বাষ্পস্বেদ প্রাপ্ত কোষগুলিকে গরম জলের টবে ফেলিয়া নাড়িতে হয় এবং রেশম খুলিতে থাকে ও তাহা লাটাইয়ে জড়াইয়া তুলিতে হয়। একটা গুটি শেষ হইলেই অন্য আর একটা পূর্ব্বের খেইয়ের সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া ক্রমাগত জড়ান চলে। দক্ষলোক ভাল রেশম করিবার জন্য একদিনে ৪ কাহন এবং চলনসই খাংরু রেশম করিতে হইলে ১০ কাহন গুটির সূতা খুলিয়া লইতে পারে।

রেশমের আঁশ।

রেশমের আঁশের মত এত লম্বা, এত দৃঢ়, এত সরু, এত কোমল, এত মসৃণ, এত সুন্দর আর কোন আঁশ নহে। তুলার লম্বা আঁশ ১৮০ ইঞ্চি, পাটের লম্বা আঁশ ১২।১৩ ফুট, কিন্তু তসরগুটির আঁশ অবিচ্ছেদে ৮০০ গজ এবং গরদগুটির আশ ৯০০ গজ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। রেশম সমপরিমাণ সকল আঁশ অপেক্ষা লঘু। ইহা এত সূক্ষ্ম যে তসর-কোষের বেলা তিনটা সূতা এবং গরদকোষের বেলা ৪।৫ টা সূতা একত্র না করিলে গুটান সুবিধা হয় না (যদিও রেশম এত শক্ত যে একটা জড়াইলেও ছিঁড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না)। সূক্ষ্মতম রেশমী মসলিন বা হাওয়ার চাদর তৈয়ারি করিতেই ৪।৫ খেই সূতা একত্র ব্যবহৃত হয়। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণপ্রভাবের সময় 'কোয়ান ভেষ্ট' নামক অঙ্গাবরণী (?) এক খেই রেশমে বয়ন হইত। এক খেই রেশমের আঁশের মধ্যে দুই খেই সূতা স্বাভাবিকভাবে জড়িত থাকে, গুটি বাঁধিবার সময় দুই খেই সূতা কীটের মুখ হইতে নির্গত হইয়া এক প্রকার আঠাল রসের দ্বারা জড়িত হইয়া এক হইয়া যায়। সেই রসোদ্গারী দুইটী ঝিল্লি অনেক সময় কীট শরীর হইতে লইয়া সিরকায় ভিজাইয়া ছিপে বঁড়সি বাঁধিতে ব্যবহৃত হয়; উহার মত হাল্কা, শক্ত, নমনীয় পদার্থ দ্বিতীয় নাই।

সকল কোষের আঁশ সমান মূল্যের নহে। কাহারো এক সেরের মূল্য ১০ টাকা কাহারো বা ৩০ টাকাও হইতে পারে, দেশী খংরু বা ঘংরু রেশমের মূল্য সেরপ্রতি ১০।১২ টাকা মাত্র। য়ুরোপীয় কারখানাজাত রেশম ১৬।১৭ টাকা পর্য্যন্ত হয়। ফরাশী জাপানী, ইটালীয় রেশম ৩০ টাকা সের বিক্রয় হয়।

এই মূল্য তারতম্যের কারণ কোষের অবস্থার উপরও যেমন নির্ভর করে, প্রস্তুতপ্রণালীর উপরও তেমনি। দেশী কারখানায় দিনে ৯ ছটাক রেশম তৈয়ারি হয়, য়ুরোপীয় কারখানায় মোটে ৩½ ছটাক। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপীয়েরা উৎকর্ষের প্রতি এবং দেশীয়েরা পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর কয়েকটি কারণ আছে— (১) য়ুরোপীয় কারখানায় সকল সূত্র সমানসংখ্যক (৪।৫ টার বেশী নহে) আঁশে তৈয়ারি হয়; দেশী কারখানায় সংখ্যার স্থিরতা থাকে না, হাতের কাছে যতগুলা খেই আসে ধরিয়া পাকান হয়, কখন কখন ২০ টা পর্য্যন্ত একত্র লওয়া হয়। (২) যেখানে খেই ছিঁড়িয়া যায় য়ুরোপীয় কারখানায় গ্রন্থি দিয়া সংযোগ করা হয়, (দেশীয়গণ বোধ হয় পাক দিয়া জোড়া দিয়া থাকে)।

কিন্তু ভারতে ১২ টাকা মূল্যের রেশমের কাটতি অধিক; ২০।৩০ টাকার রেশম বিক্রয় হওয়া দুষ্কর। অতএব আমাদের প্রচলিত প্রথা পরিবর্ত্তনের বর্ত্তমানে কোন আবশ্যকতা নাই। বাংলা হইতে প্রতি বৎসর বেনারস, লাহোর, অমৃতসর, কারাচি, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কোটি টাকার রেশম রপ্তানি হয়। এবং ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ভাল দরের রেশম য়ুরোপ আমেরিকায় চালান হয়।

ভারতের য়ুরোপীয় কারখানার সযত্নপ্রস্তুত রেশমও বিদেশী রেশমের সমকক্ষ নহে কেন, প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার একমাত্র কারণ দেশী কোষের অপকৃষ্টতা। তন্মধ্যে বাংলার কোষ সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। বাংলা কোষের আঁশ ২০০।২৫০ গজ, কিন্তু বম্বিক্স মরির আঁশ ৮০০ গজ লম্বা। অতএব দেখা যাইতেছে একটা বম্বিক্স মরি চারিটা বাংলা গুটির সমান। চারিটা বাংলা গুটির সূতায় চারবার জোড় থাকিবে, কিন্তু বম্বিক্স মরির প্রতিটায় ৪টা করিয়া গ্রন্থি অল্প হইবে। মহীশূর, মান্দ্রাজের কোষ বাংলার গুটি অপেক্ষা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভাল, তাহার আঁশ ৩০০ গজ হয়।

বম্বিক্স মরি কোষের চাষ প্রবর্ত্তন।

কাশ্মীর ও আসামে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলায় ইহার পরীক্ষা করিয়াও সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার চাষের প্রধান অন্তরায় বীজরক্ষা, ইহারা অতি শৈত্য নহিলে এবং একটু গরম বাতাস লাগিলে বাঁচে না। খুব যত্ন করিলে ভারতের সর্ব্বত্র শীতকালে ইহার চাষ চলিতে পারে। কিন্তু বীজের রক্ষার জন্য কাশ্মীর ডালহৌসী প্রভৃতি কয়েকটি স্থান (যেখানে গ্রীষ্মকালেও খুব শীত, অথচ বায়ুমণ্ডল শুষ্ক থাকে) উপযোগী। ইহাদিগকে Pebrine (বাংলা নাম কাঁটা) ব্যাধি হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। যদি কাশ্মীরের সহিত ভারতের সকল প্রদেশের রেল সংযোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে কাশ্মীর ভাণ্ডার হইয়া সকলকে বীজ দিয়া সাহায্য করিতে পারে; এবং অন্যত্র ইহার একটা ফসল পাইলেও যথেষ্ট লাভ, একসের রেশম ৩০ টাকা।

রেশম কীটের ব্যাধি।

ইহার চাষের প্রধান অন্তরায় কীট সকলের ব্যাধিপ্রবণতা। একটাজেই

পীড়িত হইয়া মরিয়া যায়।* কতকগুলি ব্যাধির নাম ও স্বরূপ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) Pebrine (বাংলা নাম কাঁটা)। ইহা অতি ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির মত। ৩০ দিনে পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত হয়। হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। পীড়িতাবস্থায় নির্ম্মিত কোষ খারাপ হয়। কীট একবার এই রোগাক্রান্ত হইলে সেই সকল কীটের বংশের প্রায় সকলেরই এই রোগ দেখা যায়; কেহ কেহ অব্যাহতি পাইয়া যায়। পরবর্ত্তী ফসলের জন্য বীজ রক্ষার সময় অণু-বীক্ষণ পরীক্ষিত নির্ব্যাধি কীটের বীজই গ্রহণযোগ্য। অবশিষ্ট সকল একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত। রোগমুক্ত কীট সকলকেও তুঁতে ভিজান জলে স্নান করাইয়া ঠাণ্ডা হাওয়াদার স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে পালনগৃহে লইয়া যাওয়া উচিত। পালনগৃহেরও প্রত্যেক দ্রব্য ঐ উপায়ে শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পালনীয় উপাদানে অধিকন্তু গন্ধকের ধূম দেওয়া দরকার। মহীশূরের Bombyx mori কীট এই ব্যাধিহীন। এই ব্যাধিযুক্ত কীট যদি ইহাতে শীঘ্র না মরে, তবে এত দুর্ব্বল হইয়া থাকে যে শীঘ্রই অন্যবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই মরিয়া যায়। বাংলায় কয়েকটি বীজ পালনের কারখানা খোলা হইয়াছে; সেখানে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে।

(২) Muscardine। যখন এই ব্যাধি পূর্ণ পরিণত হয়, কীটের গায়ে খালি চোখেই সাদা আঁচিলের মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বাংলা নাম চূণাকাটি। কীটের বীজ ও ডিম্ব, পালন উপাদান, গৃহ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধন দ্বারা এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে। কীট রোগগ্রস্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জালের সাহায্যে সুস্থ কীট সকলকে পৃথক করিয়া সকল কীটকে কয়েক ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া দিতে হয়, এবং ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া খুব গন্ধকের ধূম দিয়া ঘর প্রভৃতি শোধন করিয়া লইতে হয়। গৃহাদি শোধন করিবার একরূপ যন্ত্র আছে, তাহাকে Eclair Vaporiser বলে।

(৩) Flacheri। তুঁতের পাতা কীটের পাকস্থলীতে গিয়া গাজিয়া উঠিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। ইহা নানাবিধ কীটাণুর অস্তিত্ব হেতু সংঘটিত হয়। এই পীড়ায় কীটের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ইহার বাংলা নাম 'কালশিরা' এই রোগে কীটের শরীরে পচন আরম্ভ হয়। দুর্ব্বল কীটেরই এই রোগ হয়। পালনগৃহরুদ্ধ বায়ু চলাচল-শূন্য হইলে এই রোগের সম্ভাবনা। ধূলিও ইহার কারণ। ইহার প্রতি-কার উপায় (১) তুঁতের জল দিয়া ডিম্ব, গৃহ ও সকল দ্রব্যাদি শোধন। (২) কীটের প্রথমাবস্থায় ৫ বার ও শেষ দশায় ৪ বার খাদ্য প্রদান। (৩) ধূলি, জল ও বীজাণুশূন্য টাটকা পাতা খাওয়ান। (৪) পালনগৃহে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা। (৫) কীটগুলিকে প্রত্যহ পরিষ্কার করা; ডালা, মাচা প্রভৃতি পরিষ্কার করা; লেপন করিয়া ধূলি নিবারণ ও গৃহ মার্জ্জন।

(৪) Gatine (বাংলা সলফা) এক প্রকার অজীর্ণরোগ, অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্মহেতু হয়। এ রোগ হইলে কীটের ক্ষুধা মান্দ্য ও আহারে অরুচি হয়, এবং তাহাদিগকে লম্বাটে ও ফ্যাকাশে দেখায়। অবশেষে পচিতে আরম্ভ করিয়া কালো হইয়া উঠে। ইহা তত মারাত্মক বা সংক্রামক নহে; গ্রীষ্মহেতু হইলে পাখার বাতাস করিলে এবং শৈত্যহেতু হইলে কোন উষ্ণতর স্থানে পরিবর্ত্তিত করিলে তাহাদিগকে সুস্থ হইতে দেখা যায়। এ রোগের প্রধান প্রতিষেধক অতি গ্রীষ্মে (এপ্রেল মে) বা অতি শীতে (ডিসেম্বর জানুয়ারী) বা খোলা স্থানে (যেখানে শীত গ্রীষ্ম সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল) কীটের পালন না করা।

(৫) Grasserie (বাংলা রসা) খাদ্যের অবস্থাভেদে হয়; অল্প রস পত্র খাইতে খাইতে যদি অধিক রসপূর্ণ পত্র খায় তবেই এই রোগ হয়; ইহা কোন প্রকার কীটাণুর দ্বারা সংঘটিত হয় না। কীট যত পুরাতন হয় খাদ্যপত্রও তত বড় ও পুরাতন হওয়া দরকার। অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ বৃষ্টি হইলে পত্র রসপূর্ণ হইয়া উঠে এবং এই রোগ জন্মে। ইহার নিবারণ কল্পে পাতা বড় গাছ হইতে লওয়া উচিত ছোট ঝোপের নহে। ফরাশী কৃষকেরা এই রোগোৎপত্তিতে পূর্ণ ফসল হইয়াছে স্থির করিয়া রোগকে শুভকরই মনে করে। যে যে স্থানে তুঁতের বড় গাছ হইতে পাতা লওয়া হয় (যেমন কাশ্মীর) সেখানে এ রোগ দেখা যায় না। বাংলায় (ঝোপ তুঁতের পাতা ব্যবহৃত হয় বলিয়া) এ রোগ খুব বেশি হয়।

(৬) Court (লালি, রাঙ্গি বা কুরকুট্টে) ইহা ঠিক রোগ নহে; অনেক সময় গুটি না বাঁধিয়া কীট পতঙ্গ হইয়া পড়ে; কখন কখন তাহাদের ডিম্বও হয়; কিন্তু সে ডিম্বসম্ভূত সন্ততি সকলে এই প্রকৃতি-বৈষম্য অধিক লক্ষিত হয়। ইহা অনেক সময় বংশক্রমানুসারী হয়। কীটের শেষ দশায় খাদ্যাল্পতা বা 'নৈচাপাতা' (নূতন ক্ষেত্রের বা ছায়াযুক্ত স্থানের পাতা) খাইতে দিলে এই অবস্থা ঘটে।

(৭) Double-cocoon (গেঁঠে-কোয়া) বা দুইটি কীটের একটি কোষ নির্ম্মাণ। এই প্রকৃতিবৈষম্য বাংলায় অধিক দেখা যায় না; য়ুরোপ, চীন জাপানে খুব হয়। এই বিষমতাও বংশগত হয়। এই কোষের সুতা বাহির করা যায় না; এজন্য অনেকে প্রতারণা করিয়া ইহা বীজরূপে বিক্রয় করিয়া থাকে।

(৮) Fly-pest (মক্ষিকার উৎপাত) বাংলায় রেশমের খুব ক্ষতি করে। রেশমকীট গুটি বাঁধিবার পূর্ব্বে বা পরে মক্ষিকার ডিম্বসম্ভূত কৃমি সকল রেশমকীট সকল মারিয়া ফেলে। যদি গুটি বাঁধার পর রেশমকীট মরিয়া যায়, তবে কোষ হইতে পতঙ্গের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মক্ষিকার বাচ্চা বাহির হয়। যদি পালনগৃহ আক্রান্ত হয়, তবে রেশম-কীটের বংশপালন অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহার প্রতিকার উপায় (১) এক বৎসর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বীজের জন্য কেবল ডিম্ব সংগ্রহ করা। (২) বৎসরে ৩।৪ ফসলের বেশি উৎপন্ন না করা। (৩) মক্ষিকা নিবারণের জন্য এই উপায়টি অনুসৃত হইতে পারে। গৃহের প্রবেশ দ্বার হইতে বিপরীত দিকে বা দূরে জানালা রাখিয়া তারের জালে আবৃত করিয়া তাহার নিম্নে ভূমি হইতে ৫।৬ ফুট উঁচুতে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল মিশ্রিত জলপূর্ণ গামলা রাখিয়া দিতে হয়, এবং গৃহদ্বারে ঘুঁটের ধোঁয়া করিয়া দ্বার দিনের বেলা যথাসম্ভব বন্ধ রাখিতে হয়। মাছি ধোঁয়ার দিকে না গিয়া জানালার পথে ঘরে যাইবার চেষ্টা করিবে এবং জলের গামলায় পড়িয়া ডুবিয়া মরিবে।

(৯) Dermestus Vulpinus এক প্রকার ঝিঁঝিঁ পোকা, রেশম-কীট খাইয়া ফেলে। ইহা মক্ষিকার মত কীটের গায়ে ডিম পাড়িয়া দেয়; ডিম্বোদ্গত ঝিঁঝিঁ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। অনেক সময় রেশমকীটের ডিম্বের সঙ্গে ইহাদের ডিম্বও আনীত হইয়া উপদ্রব ঘটায়।

সকল প্রকার রোগের প্রধান প্রতিকারের উপর সর্ব্ব বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া।

এড়ি রেশমকীট পালন ও সূত্র গ্রহণ।

ইহার পালন প্রণালী তুঁত রেশমকীটের মতনই। কেবল ইহার কোষ হইতে সূত্র খুলিয়া লওয়া যায় না। গরদ বা তসর কোষ হইতে

* আমাদের দেশের ব্যবসায়িদের বিশ্বাস রেশমকীট বড় সুখী প্রাণী, একটু অনাচার অশুচি অবস্থায় ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ইহারা মরিয়া যায়। এজন্য তাহারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া পবিত্রভাবে ইহার পালন করিতে চেষ্টা করে। লেখক।

পতঙ্গ নির্গত হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অকর্ত্তিত কোষ হইতে সূতা বাহির করিতে হয় কিন্তু ইহা হইতে পতঙ্গ নির্গত হইতে দিতে হয়। ইহাতে প্রাণীবধের আবশ্যক হয় না। ইহার আঁশ শক্ত ও স্থায়ী এজন্য বহুজন সমাদৃত। যদিও ইহার চাষে লাভ অপেক্ষাকৃত কম, তথাপি ইহাতে অনেক সুবিধা আছে। ইহার আঁশ গ্রহণ করিবার প্রণালী :—

পতঙ্গ কোষ কাটিয়া নির্গত হইলে কোষগুলিকে ছাইয়ের সঙ্গে জলে বা ছাইয়ের জলে (Lye) সিদ্ধ করিতে হয় ও খুব ঠাসিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার জলে ফেলিয়া ক্রমাগত ঠাসিতে হয়। তৎপরে উঠাইয়া জল নিংড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চরকা বা টাকুতে সূতা তৈয়ার করিতে হয়। ইহা হইতে সূতা তৈয়ারি করিবার পূর্ব্বে তুলা বা পশমের মত পিঁজিয়া ধুনিয়া আঁচড়াইয়া লইতে হয়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধিবৈচিত্র।

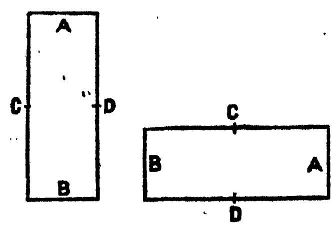
আমরা সাধারণ উদ্ভিদের যে আকারপ্রকার দেখিতে পাই, তাহার অনেকটা ভূমধ্যাকর্ষণের (Gravity) ফল বলিয়া ডারুইন্ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া গেছেন। কোন গাছের ডালকে মাটির সহিত শুয়াইয়া রাখ, দেখিবে ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিতেছে। যে কোন গাছের মূল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির ভিতর নামিয়া যাইতে দেখিবে। এই সকল ব্যাপার ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে হয় বলিয়া বহুকাল সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠিক কি প্রকারে সেই একই আকর্ষণ দ্বারা গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং অপরটি তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক কোন পণ্ডিতই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডারুইন্ সাহেব বিটিষ এসোসিয়েশনের এক বিশেষ অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—পৃথিবীর টানে যে গাছের শিকড় নীচের দিকে ও গুঁড়ি উপরে উঠে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু কোন্ কৌশলে যে, একই উত্তেজনায় ঐ বিপরীত কার্য্য দু'টা হয়, তাহা আজো আমাদের অজ্ঞাত।

ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছের বৃদ্ধির পূর্ব্বোক্ত বৈচিত্র্যগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর আকর্ষণ উদ্ভিদদেহকে কি প্রকারে উত্তেজিত করে দেখা আবশ্যক; এবং তাহার পর সেই উত্তেজনা দ্বারা কি প্রকার কার্য্য পাওয়া সম্ভাবনা, তাহা বিবেচ্য।

পাঠক অবশ্যই জানেন, যে জিনিষের সামগ্রী পরিমাণ (Mass) যত অধিক হয়, তাহার ভারও তত অধিক দেখা যায়। বহুসামগ্রীসম্পন্ন জিনিষকে ভারি বলিয়া অনুভব করানই, ভূমধ্যাকর্ষণের একমাত্র কার্য্য। সুতরাং গাছের বৃদ্ধির উপর পৃথিবীর আকর্ষণের কথা আলোচনা করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির (Cells) গুরুত্বের কার্য্য অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে উদ্ভিদদেহ কি প্রকার উত্তেজনাপ্রাপ্ত হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীতে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রথায় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারি ফলে এই প্রসঙ্গে দুইটি পৃথক মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, উদ্ভিদ-কোষে যে রস ও শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহার ভার উদ্ভিদদেহের উপরের ও নীচের অংশে বিভিন্ন পরিমাণে চাপ দেয়। কাজেই ইহাতে কতকগুলি কোষ, অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। ১ম চিত্রটি



১ম চিত্র।

দুইটি কোষের ছবি। যখন কোনও গাছের ডালকে জোর করিয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অংশের ন্যায় তাহার কোষগুলি শুইয়া পড়ে। ডাল স্বাভাবিক অবস্থায় খাড়া থাকিলে, কোষগুলিও বামপার্শ্বের ছবিটির ন্যায় খাড়া হইয়া থাকে। জিনিষের ভার, তাহার ভূসংলগ্ন অংশেই কার্য্যকারী হয়, কাজেই শায়িত কোষের "D" চিহ্নিত অংশের উপরকার চাপ, "C" চিহ্নিত অংশ অপেক্ষা অধিক হইবারই কথা। বামের কোষটিতেও "A" স্থান অপেক্ষা "B" স্থানে অধিক চাপ পড়িবার সম্ভাবনা। একই কোষের ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রাচীরের উপরকার এই প্রকার চাপের বৈচিত্র্য দেখিয়া, উক্ত পণ্ডিতগণ ইহাকেই ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তটি (The theory of hydrostatic or radial pressure) জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ ফেফার (Pfeffer.) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন; জ্যাপেক্ (Czapek) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

নোল ও হাবারলাঁ (Noll, Haberlandt) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ দ্বিতীয় মতবাদের (Theory of Statoliths) প্রবর্ত্তক। ইহারা কোষস্থ জলীয়ভাগের ভার গণনার মধ্যে আনেন নাই। কেবল মাত্র কোষস্থ শ্বেতসারকণা প্রভৃতি গুরুপদার্থের (Statoliths) ভার লইয়া হিসাব করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ ২য় চিত্র একটি ভূশায়িত ডালের চিত্র।



২য় চিত্র।

ভিতরকার ঘরগুলি এক একটি কোষ, এবং তাহাদের ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেতসার প্রভৃতির কণা। পৃথিবী কোন জিনিষকে পাশাপাশিভাবে টানে না, সুতরাং কোষসামগ্রীর ভার চিত্রস্থ উদ্ভিদদেহের "E E" এবং "E^1 E^1" এই দুই অংশের উপরেই পড়িবার কথা। "E E" রেখাক্রমে যে চারিটি কোষ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে কোষসামগ্রীর চাপ উহাদের অন্তঃপ্রাচীরের উপর পড়িতেছে, এবং "E^1 E^1" রেখার কোষগুলিতে তাহাদের চাপ ঐ গুলির বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উদ্ভিদ কোষের ভিতর ও বাহিরের প্রাচীরের উত্তেজনশীলতা সমান নয়। কাজেই ঐ প্রকারে চাপ পাইয়া উদ্ভিদদেহের এক পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, ভূমধ্যাকর্ষণজনিত চাপের যে এই বৈষম্য হয়, তাহাই ভূশায়িত ডালের মাথা উঁচু হওয়া ইত্যাদির কারণ। তা ছাড়া গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাঁহারা ভূমধ্যাকর্ষণের ঐ কার্য্যটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দু'টি যে বেশ সুযুক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এবং পৃথিবীর টান যে উদ্ভিদ দেহের উপর উত্তেজনা প্রয়োগ করে, এবং উদ্ভিদ মাত্রেরই যে সেই টানের দিক্ বোধ (Graviperception) আছে, তাহারো আভাস আমরা ঐ সিদ্ধান্তদ্বয়ে দেখিতে পাই। কিন্তু কি প্রকারে সেই টান্ নানা অঙ্গে নানাপ্রকার উত্তেজনায় পরিণত হয়, এবং কি কৌশলেই বা তাহারি দ্বারা গাছের বৃদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য আসে, তাহার কোন ব্যাখ্যানই ঐ সিদ্ধান্তদ্বয় হইতে পাওয়া যায় না।

ভূশায়িত ডাল কেন মাথা উঁচু করিয়া বাড়ে,—এই প্রশ্নটি লইয়া উক্ত সিদ্ধান্তিকগণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। ইহাতে স্থির হইয়াছিল, শাখার ঠিক্ ভূসংলগ্ন দিক্‌টা পৃথিবীর টানে অধিক চাপ পাইয়া, উপরের দিক্ অপেক্ষা দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে, তাই শাখার অগ্রভাগ ধনুকাকারে বাঁকিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পড়ে।

এই ব্যাখ্যানটি কতদূর সত্য তাহার বিচার আবশ্যক। আমরা গত চৈত্রের "প্রবাসী"তে "উদ্ভিদের বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা হইতে যদি গাছে প্রকৃত সাড়ার (আণবিক বিকৃতি) প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাহা গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার দ্বারা গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া আসে। উত্তেজনা দ্বারা যে এক রসপ্রবাহ কোষপরম্পরায় চলিয়া যে এক অপ্রত্যক্ষ বা অবান্তর সাড়ার উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূল কারণ। সুতরাং কোষসামগ্রীর চাপকেই যদি ভূশায়িত ডালের সোজা হওয়ার কারণ বলা যায়, তবে বলিতে হয়, ঐ চাপের উত্তেজনার দ্বারা চাপপ্রাপ্ত অংশের যে বৃদ্ধি-স্তম্ভন হয়, তাহাই ঐ ব্যাপারের মূল কারণ। কিন্তু নীচেকার অর্দ্ধেকটার বৃদ্ধিরোধ ও উপরের বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকিলে, গাছ কখনই উপরের দিকে বাঁকিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার মাথা নিশ্চয়ই আরো অধিক নীচু হইয়া পড়িত। কাজেই দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা উঁচু হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে কখনই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার প্রকৃত কারণ স্থির করিবার জন্য, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নূতন আবিষ্কারগুলির প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

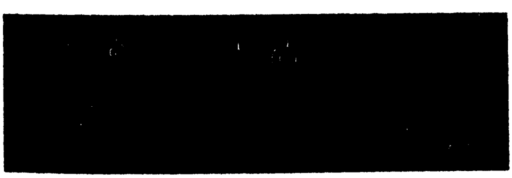
ভূশায়িত ডাল যখন ধনুকাকারে বাঁকিয়া মাথা উঁচু করে, তখন এই বক্রতার দুইটি কারণ আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। (১)—হয়ত ডালের ভূসংলগ্ন অংশটা উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক বাড়িতেছে, অথবা (২) নিম্নার্দ্ধের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া, কেবল উপরার্দ্ধের বৃদ্ধিই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রকৃত কারণ, তাহা স্থির করিবার জন্য অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং শেষে দ্বিতীয় কারণটিকেই যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন,—ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই শিকড় ও গুঁড়ি নিজেদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ঐ প্রকার বিপরীত কার্য্য দেখায়। অর্থাৎ পৃথিবীর টান পাইলে নীচের দিকে বর্দ্ধিত হওয়া একা শিকড়েরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম, এবং সেই প্রকার উপর দিকে বাড়া গুঁড়িরও একটি ধর্ম্ম। আচার্য্য বসু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ব্যাখান গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, আমরা সুপরিচিত প্রাকৃতিক কার্য্যগুলিতে জড় ও শক্তির যেমন বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাহারি একটি। গাছের ডালে ও শিকড়ে এক একটা অদ্ভুত রকমের বিশেষ ধর্ম্ম আরোপ করিয়া কারণ দেখাইতে যাওয়া, পণ্ডশ্রম মাত্র। সুপথ পাইলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সহজ হইয়া পড়ে। উদ্ভিদতত্ত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত জটিল সমস্যাগুলির সমাধান কোথায়, বসু মহাশয় দিব্যচক্ষে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং কিছুকালের গবেষণায় সকলগুলিরই ভিতরকার গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু মহাশয়ের ঐ সকল সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে হইলে, প্রথমেই তাঁহারি আবিষ্কৃত দুই একটি নূতন তথ্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা সকলেই দেখিয়াছি, লজ্জাবতী লতার ডালে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, তাহার পাতা কিছুক্ষণের জন্য নামিয়া গিয়া, ক্রমে পূর্ব্ববৎ খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে যে আণবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে, আচার্য্য বসু মহাশয় তাহাকেই পাতার পড়ার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে, গাছের কোনও অঙ্গকে অতিরিক্ত শীতল করিলে যখন তাহার অণু সকল অসাড় হইয়া পড়ে, তখন সহস্র আঘাতেও সেস্থানের আণবিক বিকৃতি হয় না। লজ্জাবতী লতার পত্রবৃন্তে খুব ঠাণ্ডা দিয়া, তাহাতে আঘাত উত্তেজনা প্রয়োগ কর, পাতা কোন ক্রমেই নামিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়া প্রবাহিত হয়, সেখানে ঠাণ্ডা দিলে, উত্তেজনার কার্য্য রোধ হইয়া যায়। ভূশায়িত ডালের কোন অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য বসু মহাশয় শাখার উপরে ও নীচে ক্রমে শীতল জল সেচন করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, ডালের, তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, কিন্তু উপরে জল সেচন মাত্রেই তাহার উপরদিকে উঠা (Apogeotric movements) রোধ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভূশায়িত ডালের উপরার্দ্ধই যে ভূমধ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়, তাহাতে অণু মাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছের শিকড় কেন নীচের দিকে বাঁকিয়া যায়, এবং তাহারি গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা কেন উপরে উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন দুইটি প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের নিকট প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিতগণ গাছের উপর ও নীচের অংশে দু'টা পৃথক ধর্ম্ম আরোপ করিয়া যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার আমরা কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাঁহারা ঐ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলির মূল যত দিন পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে না পারিতেছেন, ততদিন কেহই তাঁহাদের ঐ ব্যাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ডারুইন্ সাহেব তাপ দ্বারা শিকড়ের অগ্রভাগের একটা পাশ (Unilateral) উত্তেজিত করিয়া দেখিয়াছিলেন, শিকড়ের ডগা বাঁকিয়া সেই উত্তেজনা হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেই প্রকার উত্তেজনাই গাছের বর্দ্ধনশীল অপর কোন অংশে প্রয়োগ করিলে তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য দেখা যায়। অর্থাৎ এ স্থলে মূলের অগ্রভাগ বাঁকিয়া উত্তেজনার কেন্দ্রের-দিকেই চলিতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য একই উত্তেজনার

এই দুই বিপরীত ফলে ডারুইন্ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বহুচিন্তায় ইহার অন্য কোনও ব্যাখ্যান না পাইয়া, এ গুলিও উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণ, উদ্ভিদ মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার অনুকূল বলিয়া, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে সেগুলি ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, গাছের উর্দ্ধাধঃ অংশের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ও তাহাদের আঘাত অনুভূতির পার্থক্য সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাউক। উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, আহত স্থান হইতেই উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া স্বতঃই দুই প্রকারের সাড়ার উৎপত্তি করে।* (১ম) আহত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া রসপ্রবাহের সাড়া। (২য়) আণবিক বিকৃতিজাত সাড়া। এই দুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথমটিরই বেগ দ্রুততর, এবং ইহাই গাছকে বাড়ায়। দ্বিতীয় অর্থাৎ আণবিক বিকৃতিজাত প্রকৃত সাড়া কিছু মন্থর গতিতে চলে, এবং তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হয়। এই দুই বিচিত্র প্রবাহের কথা অনুমানমূলক নহে, জীবিত উদ্ভিদের অঙ্গে আঘাত দিলেই যে ঐ দুই সাড়া বিভিন্নগতিতে সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, আচার্য্য বসু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিত্ব জানিতে হইলে, বৈদ্যুতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ। ৩য় চিত্রের "a" অংশের "A" চিহ্নিত স্থানটি কোনও শাখার একটি বর্দ্ধনশীল অংশ। ঐ স্থানে একখণ্ড তারের একপ্রান্ত সংলগ্ন করিয়া,



(a)   (b)   (c)

৩য় চিত্র।

তাহার অপরপ্রান্তটিকে এক নিকটবর্ত্তী পত্রে সংযুক্ত রাখা হইয়াছে, এবং সেই তারের ভিতর একটি তড়িৎ মাপক যন্ত্র (Galvanometer) সন্নিবিষ্ট আছে। কোনও আঘাত উত্তেজনায় বৃক্ষ অঙ্গে যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দিক ও পরিমাণ ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা যায়। আচার্য্য বসু মহাশয় দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ আণবিক উত্তেজনার সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলে, তড়িৎ মাপক যন্ত্রের শলাকা যে দিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়া চলিলে সেটি বিপরীত দিকে ফিরিয়া পড়ে। "a" চিত্রটির "T" চিহ্নিত স্থানে আঘাত দাও, দেখিবে "G" চিহ্নিত যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা ঐ আঘাতের রসপ্রবাহজনিত সাড়ার কাজ,—কারণ আমরা বলিয়াছি রসপ্রবাহের সাড়ার গতিই দ্রুততর। এই সাড়া থামিয়া গেলে, শলাকাটিকে বিপরীতদিকে চলিতে দেখা যাইবে, ইহাই সেই নাতিদ্রুত প্রকৃত সাড়ার কাজ।

আচার্য্য বসু মহাশয় কোন বৃক্ষশাখায় ৩য় চিত্রের অনুরূপ তার সংযুক্ত করিয়া তড়িৎমাপক যন্ত্রের শলাকার বিচলন পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই চিত্রের "a" চিহ্নিত অংশস্থ "T" স্থানটি তাপ প্রয়োগ করিয়া বা চিমৃটি কাটিয়া উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তড়িৎমাপক যন্ত্রে কেবল রসপ্রবাহের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তার পর তিনি সেই স্থানেই আবার বহুক্ষণ ধরিয়া প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, প্রথমে রসপ্রবাহের সাড়া, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনার সাড়া যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য বসু মহাশয় "b" চিত্রের "A" চিহ্নিত স্থানেও উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল আণবিক সাড়ার প্রবাহের লক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, রস প্রবাহের উত্তেজনার লক্ষণ এ স্থলে মোটেই দেখা যায় নাই।

পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষাগুলির ফলে বেশ বুঝা যায়, বর্দ্ধনশীল অংশ হইতে কিছু দূরে, অর্থাৎ "T" এর মত স্থানে একদিক ঘেঁসিয়া (Unilateral) উত্তেজনা দিলে, শাখার সেই দিক দিয়া কেবল রসপ্রবাহের দ্রুত সাড়া চলিতে আরম্ভ করে। আণবিক বিকৃতিজাত প্রকৃত সাড়া ঐ মৃদু উত্তেজনায় সেখানে মোটেই পৌঁছায় না, এবং এই প্রকার এক দিকে সোঁধ

* আমরা গত চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

উত্তেজনায়, শাখার অপর পাশের কোন প্রকার বিকার হয় না। বর্দ্ধনশীল অংশে যদি প্রকৃত উত্তেজনা উৎপাদন করা আবশ্যক হয়, তবে সেই স্থানে বা "T" এর মত দূরবর্ত্তী অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করার আবশ্যক হয়। আঘাত-উত্তেজনাজাত ঐ রসপ্রবাহে ও আণবিক সাড়ায় উদ্ভিদদেহের আকারগত কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, এখন আলোচনা করা যাউক। এই অঙ্গবিকৃতির ব্যাপার বুঝিতে হইলে, রসপ্রবাহ দ্বারা গাছের বৃদ্ধি ও আণবিক বিকৃতির প্রবাহ দ্বারা যে সেই বৃদ্ধিরই রোধ হয়, এই দু'টি স্থূল কথা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বপরীক্ষায় দেখিয়াছি, দূরবর্ত্তী স্থানে আঘাত দিলে, শাখার আহত পার্শ্ব ধরিয়া কেবল রসপ্রবাহের সাড়াই বর্দ্ধনশীল অংশে পৌঁছায়। কাজেই এ স্থলে অনুত্তেজিত পার্শ্বটি অপেক্ষা উত্তেজিত পার্শ্বটিই বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার ফলে শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়। * বলা বাহুল্য এস্থলে শাখার উত্তেজিত অংশটা ধনুর কুব্জ (convex) পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া শাখা-প্রান্তকে উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে দেখিয়া, ডারুইন্ সাহেব অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আচার্য্য বসু মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ণিত প্রত্যক্ষপরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যানে সেই প্রাচীন সমস্যাটির মীমাংসা হইয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্দ্ধনশীল অংশ হইতে দূরে প্রবল উত্তেজনা দিলে, প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ চলিয়া শেষে কেবলমাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আণবিক সাড়া গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই এখানে শাখার উত্তেজনাপ্রাপ্ত দিক্‌টার বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া, অপর পার্শ্বের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়ে। এস্থলে ধনুর ন্যুব্জ (concave) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে। বৃক্ষ অঙ্গে প্রবল তাপ প্রয়োগ করিয়া ডারুইন্ সাহেব, তাহার অগ্রভাগটিকে যে উত্তেজনার দিকেই যাইতে দেখিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যান আমরা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারি।

দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ না করিয়া, ঠিক্ বর্দ্ধনশীল অংশেই মৃদু আঘাত দিলে, শাখার কিপ্রকার বিকৃতি হয়, আচার্য্য বসু মহাশয় তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩য় চিত্রের "b" অংশটির "A" চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার বর্দ্ধনশীল অংশ। মনে করা যাউক, ঐ স্থানে যেন মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইল। এখানে উত্তেজনা প্রাপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং তাহারি ঠিক্ বিপরীত অর্থাৎ "B" চিহ্নিত অংশে কেবল রসপ্রবাহের চিহ্ন দেখা যাইবে। * কিন্তু আমরা দেখিয়াছি রসপ্রবাহ গাছের বৃদ্ধি করায়, এবং প্রকৃত সাড়ার বৃদ্ধি রোধ হইয়া যায়। কাজেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উত্তেজনায়, এখানে "A" অংশের বৃদ্ধি রোধ, "B′" ও "B" এর বৃদ্ধির দ্রুততা সংঘটনই সম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবিকল এই ফলই পাওয়া গিয়াছিল,—শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, এবং উত্তেজনার কেন্দ্রটি ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "A" চিহ্নিত স্থানে প্রবল উত্তেজনা দিলে, পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তেজিত অংশটা তখন ধনুর কুব্জ পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। কারণ এস্থলে প্রবল উত্তেজনায় "A" অংশটি অসাড় হইয়া যায়, এবং তাহারি বিপরীত দিক্ অর্থাৎ "B" স্থানে প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই মোটের উপর "B" স্থানের তুলনায় "A" স্থানের বৃদ্ধি অধিক হইয়া পড়ায়, শাখাটি বাঁকিয়া যায়।

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে সাড়ার প্রবাহের কোনদিকে যাওয়া সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচার্য্য বসু মহাশয় ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা যেন কেহ মনে না করেন। উদ্ভিদ দেহে সত্যসত্যই উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলির সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখন আচার্য্য বসু মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত উত্তেজনায় ডাল ও

* কোন জিনিষের একটা পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা প্রসারিত হইলে সেটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়ারই যে সম্ভাবনা, পাঠক একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

* গাছের আঁশ (Fibre) যেদিকে থাকে, উত্তেজনা মাত্রই যে তাহা অনুসরণ করিয়া সহজে চলাফেরা করে আচার্য্য বসু মহাশয় অনেক পরীক্ষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আঁশ ভেদ করিয়া অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে উত্তেজনা সহজে চলিতে পারেনা।

শিকড়ের নানা বিকৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের অঙ্গ বিশেষে যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অমূলক। আঘাত উত্তেজনার মাত্রা ও প্রয়োগ স্থান ভেদে কখনো রসপ্রবাহ এবং কখনো প্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্য লাভ করিয়া, উদ্ভিদের শাখামূলকে যে কত বিচিত্রভাবে বাঁকাইয়া বাড়াইতে পারে, তাহা আচার্য্য বসু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের ধর্ম্ম পৃথক নয়, উভয়েই আঘাত উত্তেজনায় একই প্রকারে সাড়া দিতে পারে।

এখন ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় গুঁড়ির উপরদিকে যাওয়া ও শিকড়ের নীচে নামার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এসম্বন্ধে আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ গুঁড়িও শিকড়ে এক একটা বিশেষ ধর্ম্মের আরোপ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, আচার্য্য বসু মহাশয় তাহাতে মোটেই আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইনি বলিতেছেন শাখা ও মূলের ধর্ম্ম একই —মধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রসপ্রবাহের সাড়া, এবং অপরটিতে আণবিক উত্তেজনার সাড়া কাজ করে বলিয়া, আমরা উদ্ভিদের ঐ দুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেখিতে পাই। মনে করা যাউক, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কোষসামগ্রীর (Statoliths) ভারজনিত মৃদু উত্তেজনা একপার্শ্ব বহিয়া শিকড়ে আসিয়া পৌঁছিল। এস্থলে প্রকৃত সাড়া প্রবাহ আসা অসম্ভব; কারণ মৃদু উত্তেজনায় কেবল দ্রুততর রসপ্রবাহের সাড়া চালিত হয়। কাজেই এখানে দূরবর্ত্তী মৃদু উত্তেজনা দ্বারা শিকড় যে বাঁকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার মনে করা যাউক, বৃক্ষের গুঁড়ির সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কোষসামগ্রীর চাপে, যেন সেটি প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। এস্থলে রসপ্রবাহের সাড়া কাজ করিতে পারিবে না, * কেবল প্রকৃত সাড়াই প্রাধান্য লাভ করিয়া গুঁড়িকে বাঁকাইয়া দিবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রকৃত সাড়া ও রসপ্রবাহের সাড়া উদ্ভিদদেহকে ঠিক্ বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া দেয়। সুতরাং সেই পূর্ব্বের উদাহরণে রসপ্রবাহের সাড়ায়, শিকড়টা যে দিকে বাঁকিয়াছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় গুঁড়িটা যে তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকেই বাঁকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

শিকড়ের নীচের দিকে নামা ও গুঁড়ির উপরদিকে উঠাকে বৃক্ষদেহের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া, পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ Geotropism, এবং Apo-geotropism প্রভৃতি যে সকল শব্দ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কত নিরর্থক, আচার্য্য বসু মহায়য়ের পূর্ব্ববর্ণিত আবিষ্কারগুলি হইতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নীচের দিকে নামা ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় ও শাখার বিশেষ ধর্ম্ম নয়। জড়দেহে আঘাত উত্তেজনা দিলে, তাহার যে আণবিক বিকৃতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মূল ধর্ম্ম। উদ্ভিদের অঙ্গবিকৃতি উঠা নামা বাঁকাচোরা সকলই জড় ও শক্তির সেই এক মহাধর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদাই নিয়মিত হইতেছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

* কারণ আহত স্থানের কোষ হইতেই জল বহির্গত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে রসপ্রবাহের সাড়ার উৎপত্তি করায়। এজন্য ঠিক্ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়াই দেখা যায়।

"মাথায় ঘোল।"

কোন অপকর্ম্ম করিলে মাথায় ঘোল ঢালার কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি গল্প পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা অনূদিত হইতেছে—

ভগবান্ (বুদ্ধ) যখন জেতবনে বিহার করিতেছিলেন, তখন তিনি আয়ুষ্মান্ 'লকুণ্টক' ভদ্রিকের বিষয় ইহা বলেন। আয়ুষ্মান্ 'লকুণ্টক' বৌদ্ধশাসনে প্রজ্ঞায় প্রসিদ্ধ, মধুরস্বর মধুরধর্ম্মকথক, তত্ত্বনির্ণয়োচিত জ্ঞানসম্পন্ন ও অত্যন্ত ক্ষীণাসব ছিলেন; কিন্তু অশীতি স্থবিরের মধ্যে (দেহ) প্রমাণে নিকৃষ্ট, ও 'সামনেরের' (সামনের-প্রথম শিক্ষার্থী, শৈক্ষ, novice) ন্যায় ক্ষুদ্র ছিলেন,—যেন ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছেন।

এক দিন তিনি তথাগতকে বন্দনা করিয়া জেতবনের অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিলে, 'দশবলকে (বুদ্ধকে) বন্দনা করিব'—এই মনে করিয়া ত্রিশজন জানপদ ভিক্ষু জেতবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বিহারের অন্তর্গৃহে স্থবিরকে (লকুণ্টক) দেখিতে

পাইলেন। তাঁহারা ইহাকে 'সামণের' মনে করিয়া (উপহাস-ভাবে) ইহাঁর চীবর পার্শ্ব ধরিতে লাগিলেন, হস্ত ধরিতে লাগিলেন, মস্তক ধরিতে লাগিলেন, নাক মলিতে লাগিলেন ও কাণ ধরিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে চালিত করিয়া ও (ঐরূপে) হস্তদ্বারা দুর্ব্যবহার করিয়া, গাত্রে চীবর স্থাপন পূর্ব্বক শাস্তার (বুদ্ধ) নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর শাস্তা মধুর সম্ভাষণ করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "মাননীয়, স্থবির 'লকুণ্টক' ভদ্রিক নামে আপনার একজন মধুর ধর্ম্মকথক শ্রাবক আছেন, শুনিয়াছি। তিনি এখন কোথায় আছেন?"

'ভিক্ষুগণ, তাঁহাকে কি তোমরা দেখিতে ইচ্ছা কর?'

'হাঁ, মাননীয়।'

'ভিক্ষুগণ, দ্বারস্থিত অন্তর্গৃহে তোমরা যাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক চীবর পার্শ্বাদি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, ইনিই তিনি।'

'মাননীয়, এইরূপ প্রার্থিত-প্রার্থন পূর্ণমনোরথ* শ্রাবক কি কারণে অল্পপ্রভাব হইয়াছেন?'

'স্বয়ংকৃত পাপের জন্য।"

ভগবান্ এই বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া অতীত কথা বলিতে লাগিলেন—

"পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজ্য করিতেছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মদত্তকে জীর্ণ, জরাপ্রাপ্ত হস্তী, বা অশ্ব, বা গরুকে দেখাইতে পারা যাইত না। ব্রহ্মদত্ত ক্রীড়াশীল হইয়া সেই প্রকার হস্তি প্রভৃতিকে দেখিলেই বন্ধন করাইতেন; পুরাতন শকট দেখিয়া তাহা ভগ্ন করাইয়া দিতেন; বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে দেখিলে আহ্বান করাইয়া উদরে প্রহার করাইতেন, ভূমিতে পতিত করাইতেন, আবার উঠাইয়া ভয় প্রদর্শন করাইতেন, বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিলে, লঙ্ঘক (বাজীকর) গণের মত ভূমিতে সম্পরিবর্ত্তনাদি ক্রীড়া করাইতেন, যদি দেখিতে না পাইতেন, 'অমুকের ঘরে বৃদ্ধ আছে'—ইহা শুনিয়াও (ঐ বৃদ্ধকে) আহ্বান করাইয়া ক্রীড়া করিতেন।

মনুষ্যগণ লজ্জিত হইয়া রাষ্ট্রের বাহিরে নিজের পিতা মাতাকে প্রেরণ করিতে লাগিল। মাতৃ পূজন ধর্ম্ম, পিতৃ পূজন ধর্ম্ম প্রচ্ছিন্ন হইল। রাজসেবকগণ ক্রীড়াশীলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক মরিয়া মরিয়া নরকচতুষ্টয় পূর্ণ করিতে লাগিল, দেবপরিষৎ পরিহীন হইল।

শক্র অভিনব দেবপুত্রগণকে দেখিতে না পাইয়া ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া জানিলেন, এবং 'ইহাকে দমন করিব' এই মনে করিয়া (নিজের) বৃদ্ধরূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুরাতন শকটে দুই পাত্র* তক্র স্থাপন করিয়া দুইটী বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ যোজন পূর্ব্বক এক উৎসব দিবসে,—যখন ব্রহ্মদত্ত অলঙ্কৃত হস্তীতে আরোহণ করিয়া অলঙ্কৃত নগরকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন বস্ত্র-(কম্বল) আচ্ছাদিত † হইয়া, সেই যান চালাইতে চালাইতে রাজার অভিমুখ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা জীর্ণযান দেখিয়া বলিলেন 'এই যানকে অপনীত কর!' (তাঁহার) মনুষ্যগণ বলিল 'কোথায় দেব, আমরা ত দেখিতে পাইতেছি না!' শক্র নিজের প্রভাবে কেবল রাজাকেই নিজে দেখা দিতেছিলেন। অনন্তর রাজা বহু নিকটবর্ত্তী হইলে, শক্র উপরিভাগে ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার মস্তকে একটী পাত্র ভগ্ন করিলেন, এবং তাহাদ্বারা রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্বিতীয় পাত্রকেও (রাজার মস্তকে) ভগ্ন করিলেন। রাজার মস্তক হইতে চারিদিকে তক্র গলিয়া পড়িতে লাগিল! তিনি তাহাতে ম্লান ও লজ্জিত হইলেন, এবং জুগুপ্সা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শক্র যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা উপদ্রুত হইয়াছেন, তখন শকট অন্তর্হিত করিয়া শক্রশরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আকাশে বজ্রহস্তে অবস্থান করিয়া তর্জ্জন করিলেন—'পাপ, অধার্ম্মিকরাজ! তুমি কি কখন বৃদ্ধ হইবে না? তোমার শরীরকে জরা কি প্রহার করিবে না? ক্রীড়াশীল হইয়া বৃদ্ধগণকে বাধা প্রদান করিতেছ! এই কর্ম্মকারী কেবল তোমার জন্য মনুষ্যেরা মরিয়া মরিয়া নরকসমূহ পরিপূর্ণ করিতেছে! মনুষ্যেরা পিতামাতাকে সেবন করিতে পারিতেছে না। তুমি যদি এই কর্ম্ম হইতে বিরত না হইবে, বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। এখন হইতে আর এই কর্ম্ম করিও না।' পরে শক্র মাতাপিতার গুণ বলিয়া

* মূল—"পত্থিত পত্থনো অভিনিহার সম্পন্নো'।

* মূল 'চাটী'।

† 'পিনোতিক নিবন্দে' ইহার সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায় না, W. H. Rouse (অনুবাদক) 'পিনোতক' শব্দের অর্থ 'rags' লিখিয়াছেন। Childers বস্ত্র ও কম্বল উভয় অর্থ ই হইতে পারে বলেন।

ও বৃদ্ধ-পূজন-কর্ম্মের ফল প্রকাশ করিয়া, উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নিজের স্থানেই গমন করিলেন। রাজাও সেই হইতে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে মনও করিলেন না।"

শাস্তা এই অতীত কথা বলিবার পর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা দুইটী বলিলেন--

"হংসা কোঞ্চা ময়ুরা চ হত্থিয়ো পসদা মিগা।
সব্বে সীহস্স ভায়ন্তি, ন'ত্থি কায়স্মিং তুল্যতা ॥ ১ ॥
এবং এবং মনুস্সেসু দহরো চে পি পঞ্ঞবা।
সো হি তত্থ মহা হোতি নেব বালো শরীরবা তি ॥ ২ ॥" *

শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনা বলিয়া সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া জাতককে সম্যক্ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন (সত্যপর্য্যবসানে সেই ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, ও কেহ কেহ অর্হৎ হইয়াছিলেন)—সেই সময়ে রাজা লকুণ্টক ভদ্রিক হইয়াছিল, সে সেই ক্রীড়াশীলতায় অন্যের ক্লেশহেতু হইয়াছিল। আর শক্র হইয়াছিলাম আমিই।" †

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, হস্তী, পৃষ্ণ (বিন্দু বিশিষ্ট হরিণ) ও অপরাপর মৃগ সকলেই সিংহ হইতে ভীত হয়, কিন্তু তাহাদের শরীরের সাদৃশ্য নাই। ১।

এবমেবং মনুষ্যেষু দহরশ্চেদপি প্রজ্ঞাবান্।
সোহপি তত্র মহান্ ভবতি নৈব বালঃ শরীরবান্ ॥ ২ ॥

এই প্রকারই মনুষ্যগণের মধ্যে বালকও যদি প্রজ্ঞাবান্ হয়, সেও সেখানে মহান্, বালক মহাশরীর হইলেও মহান্ হয় না।

পেকিং রাজপুরী।

(৪)

সম্রাটের চীনদেশের উন্নতির চেষ্টায় বাধা পড়ায় তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার এই উন্নত আশা ছিল যে তিনি চীন সাম্রাজ্যকে উন্নতির পথে ধাবিত করিয়া, পৃথিবীর অপরাপর শক্তিশালী জাতিগণের মধ্যে মান্যগণ্য হইবেন এবং জাপানকর্ত্তৃক পরাভবের প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সেই সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিল। পুনর্ব্বার রাজ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল! এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সেই অদৃঢ় দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনাটী সম্রাজ্ঞীর শক্রগণের এবং বিদেশীয়গণের মধ্যে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হইল, যে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! আবার রাজ-পুরীর বাহিরে রাষ্ট্র হইল যে সম্রাটকে তিনি কারারুদ্ধ করিয়াছেন, পুনরায় কেহ কেহ রটাইল যে বৃদ্ধারাণী কোয়াংশুকে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করিতেছেন! হায়! যে দেবর ও ভগ্নী-পুত্রকে তিনি বাল্যাবস্থা হইতে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন, যাঁহাকে অন্য কোন রাজকুমারের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়াছেন তাঁহাকে তিনি হত্যা করিবেন এও কি সম্ভব হয়? বলা বাহুল্য যে পেকিনের ফরেন লিগেশনেই এই প্রকার কদর্য্য সংবাদের সৃষ্টি ও প্রচার অধিকতর পরিমাণে হইতে লাগিল। এই সকল বিদ্বেষসূচক মিথ্যা সংবাদের সত্যতা নির্দ্ধারণ কেবল সময়সাপেক্ষ ছিল। তাহা এখন প্রমাণ হইয়াছে। বৃদ্ধারাণী সম্রাটকে হত্যা করিতে চাহিলে তাঁহার যে সকল সুযোগ, লোকজন ও আধিপত্য ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসেই সম্রাটকে হত্যা করিতে পারিতেন।

বিদেশীগণ ইহাও রাষ্ট্র করিয়াছিলেন, যে বৃদ্ধা মহারাণী সম্রাটকে তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এ কথাও সত্য নহে। কেননা তিনি সম্রাটের নিকট একাধারে জেঠী, মাসী এবং ধর্ম্ম-মাতা রূপে বর্ত্তমানা; কারণ বৃদ্ধারাণী তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহাকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়াছিলেন। এমন যে মহামান্যা ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে সম-আসনে উপবেশন করা চীনদেশের, চীনদেশের কেন, সমস্ত আসিয়াবাসীর নিকট নিয়মবিরুদ্ধ। ইউরোপীয়গণের নিকট এ দৃশ্য দৃষ্টিকটু হইতে পারে। কারণ আসিয়া-বাসিগণ পিতামাতাকে অবনত হইয়া প্রণাম করণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ পিতামাতাকে প্রণাম করার পরিবর্ত্তে কর-মর্দ্দন করিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী সম্রাটকে এ বিষয়ে

---

* সংস্কৃত —হংসাঃ ক্রৌঞ্চা ময়ূরাশ্চ হস্তিনঃ পৃষ্ণা মৃগাঃ।
সর্ব্বে সিংহস্য (সিংহাৎ) বিভ্যতি, নাস্তি কায়ে তুল্যতা ॥ ১ ॥

† এই জাতকের নাম 'কেলিশীল' জাতক; দ্বিতীয় খণ্ডের ২১,ও সমগ্র গ্রন্থের ২০৩ সংখ্যক।

জোর করিয়া বাধ্য করেন নাই, কিন্তু সম্রাট নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক, পূর্ব্বপুরুষগণের নিয়মানুসারে এই প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা মহারাণী এখনও রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার বয়স এখন ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এ বয়সে তাঁহার বিশ্রাম লওয়াই বিধেয়, কিন্তু রাজ্যে এখনও বিশেষ সুশৃঙ্খলা হয় নাই। তাই সাহস করিয়া রাজ্যের ভার আপন হস্ত হইতে সম্রাটকে দিতে সাহস পান না।

সম্রাজ্ঞী সংস্কারক দলকে ধ্বংস করিয়া নিজে শাসনভার লওয়া অবধি বিদেশীগণ তাঁহাকে, "এণ্টিফরেণ" অর্থাৎ বিদেশী-দ্বেষী মনে করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। এবং সময় সময় যে গোঁয়ার ও মূর্খ চীনাগণ কোন কোন বিদেশীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সে কার্য্যগুলিও বৃদ্ধারাণীর প্ররোচনায় হইয়া থাকে বলিয়া রটনা করিয়া থাকে। তাঁহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের দুই বৎসর মধ্যে "বক্‌সার গুপ্তসমিতির দল" ক্রমে প্রবল ও অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল এবং নানা স্থানে বিদেশীগণের উপর, অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই ঘটনা গুলিও বৃদ্ধারাণীর চক্রান্তে ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি বিদেশীগণ ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কোন নিরপেক্ষ বিদেশীর মতে এ কথা সত্য নহে। এই গুপ্তসমিতি বহু কাল হইতেই চীনদেশে বর্ত্তমান আছে, ইহা চীনজাতির দৈনিক জীবনের এক গুহ্য অংশ বলিলেও ভুল হয় না। এই গুপ্তসমিতির সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন জড়িত থাকায়, ইহা তাহাদের জীবনে অতি মহৎভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। পরস্পর ভ্রাতৃভাব ও একতা স্থাপন এবং পরস্পরকে আনুকুল্য করাই এই গুপ্তসমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময়ে পেকিন হইতে বহুদূরে উত্তর চীন রাজ্যে এই "গুপ্তসমিতির" দল অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং নানা দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ইহারা ১৯০০ খৃঃ পেকিনের ইউরোপীয়গণকে আক্রমণ করে।

যে কারণে বক্‌সার দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ এই:—যে সকল ইউরোপীয় চীনদেশে বাস করেন, তাঁহারা চীনজাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। দেশী খৃষ্টানগণ দেশে নানা অবৈধ ও বে-আইনী কার্য্য করিতেন, তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দিবার সময় বিদেশী পাদরিগণ গিয়া তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেন। পেকিনের লিগেশনের বিদেশী রাজদূতগণ কেহ কোন প্রদেশের কোন অংশ আপনারা লইবেন বলিয়া দাবি করিতে থাকেন, কেহবা কোন বিশেষ বাণিজ্যের অধিকারের জন্য দাবি ছাঁদিয়া বসিতে লাগিলেন, কোন স্থানে কোন অজ্ঞাত চীনাকর্ত্তৃক কোন বিদেশী হত হইলে বা অত্যাচরিত হইলে, সেই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে হয়ত তাহার জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান করিতে আবদার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অহরহ কত শত ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার অন্যায় আবদার বর্ত্তমানে চীনদেশ ভিন্ন অন্যত্র প্রায় লক্ষ্য হয় না। বিদেশীগণের এই সকল অত্যাচার ও অন্যায় দাবির জন্য চীনজাতি ক্ষেপিয়া উঠিল। কারণ বহুদিন হইতে এই ভাবে ইহারা বিদেশীগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে। কাজেই তাহারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। যেমন কোন ক্ষুদ্র একটী কীটকে পীড়ন করিলে, সেও উল্টিয়া তাহার প্রতি-শোধ লইতে চেষ্টা করে, চীন জাতির সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া-ছিল। এই কারণ বশতঃ বক্‌সার সম্প্রদায়ের নেতাগণ বিদেশীগণকে পেকিং হইতে তাড়ান বা তাহাদের দিন দিন বর্দ্ধিতপ্রভাবকে খর্ব্ব করার মানসে অস্ত্রধারণ করিল। প্রথম প্রথম এই গুপ্তসমিতির দল প্রজাসাধারণ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু যখন তাহাদের প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং দাবাগ্নির ন্যায় তাহাদের দলবল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন রাজবংশের কোন কোন কুমার বা প্রিন্স এই সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের সঙ্গে যোগ দান করিলেন। তাহার মধ্যে প্রিন্স টোয়ান সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিলেন। এবম্বিধ ব্যক্তির প্রকাশ্যভাবে গুপ্তসমিতির সঙ্গে যোগদান করায় অবস্থার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অপরাপর স্বদেশপ্রেমিকগণ এবং অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

ক্রমাগত অসন্তোষ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বক্‌সার গুপ্তসমিতি সকল একত্রযোগে এক প্রধান শক্তির আকার ধারণ করিল। বিদ্রোহিগণের পেকিং লিগেশনের বিদেশীগণকে সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করার প্রধান কারণ এই যে তাহাদের

ধারণা হইয়াছিল যে বিদেশী রাজদূতগণ বৃদ্ধারাণীকে বিদেশী-বিদ্বেষী মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেকিনের পবিত্র রাজ-সিংহাসন হইতে মহামান্যা সর্ব্বপূজনীয়া বৃদ্ধা রাজমাতাকে অপসারণ করাইলে, জাতীয় অবমাননা হইবে, পবিত্র দেব-সিংহাসন কলঙ্কিত হইবে, এই আশঙ্কায় প্রজামণ্ডলি আরো ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা এই জনরবের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এবং স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া পেকিনের লিগেশনের বিদেশী দূত সকলকে নিপাত করিবার মানসে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল এবং সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মনদূত ভন-কেউলারকে পথিমধ্যে পাইয়া হত্যা করিল।

এই উন্মত্ত বক্সারদল কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সত্য ও দয়াদি গুণকে বলিদান করিয়া, যেখানে যে বিদেশীকে পাইল সেই স্থানেই তাহাকে নৃশংসরূপে হত্যা করিতে লাগিল। লিগেশনকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর গুলি চালাইতে লাগিল। মিশনারিগণের গির্জ্জা ও বাসস্থান আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। একজন পাদ্রীকে ক্রুশ যন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। তিনদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর একজন পাদ্রীকে বাহুদ্বয় দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া কেরসিন তৈল যোগে জীবিত অবস্থায় অগ্নিসংযোগ-পূর্ব্বক হত্যাকরা হয়। অবশ্য এই সকল পাশবিক কার্য্য নিম্নশ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল, উচ্চ শ্রেণীর নেতাগণের অনুমত্যনুসারে যে এই সকল অমানুষিক কাণ্ড ঘটে তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদিও সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী প্রবলপ্রতাপান্বিত ও শাক্ত শাসনের পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহারা এই প্রবল ঝড়ের গতির বিরুদ্ধে চলিলে নিজেরা ধ্বংস হইবেন মনে করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছার সহিত সেই প্রবল বিদ্রোহঝড়ের গতির সঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন এবং এই উপায়েই দুরন্ত অপরাধিগণকে শাস্তি দিয়া রাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতের কোন সম্রাট বা রাজাই রাজ্যের সমস্ত বিদ্রোহী প্রজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সহসা তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য পেকিং সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে লোকের প্রবল উত্তেজনার উপশমের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। বৃদ্ধামহারাণীর অন্তরের গূঢ়ভাব নিজের প্রজার পক্ষে, কি বিদেশীয়দিগের পক্ষে সহানুভূতিসূচক ছিল তাহা বলা কঠিন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার গাঢ় সহানুভূতি নিজের প্রজাবর্গের পক্ষেই ছিল, এবং তাহাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তিনি বিদেশীদিগকে হত্যা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহা কখনও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন না। যিনি প্রায় ৩০ বৎসরের অধিককাল অতি দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন এবং শাসনসংক্রান্ত নানা বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এ ভাব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এরূপ গুরুতর কার্য্যের ফল যে ভবিষ্যতে বিষম হইবে তাহাও কি তিনি জানিতেন না? কিন্তু জানিয়া তিনি কি করিবেন? তিনি সেই সময়ে উত্তেজিত বিদ্রোহিগণকে দমন করিতে বাস্তবিকই অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল যে বিদ্রোহিগণের সঙ্গে রাজকীয় সৈন্যগণ যোগ দিলে, তাহারা মনে করিবে রাজসরকার তাহাদের সপক্ষে আছেন এবং এই উপায়ক্রমে বিদেশি-গণের বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ন্যায়পথে টানিয়া আনিতে পারিবেন। বিদেশীয় জাতি সকলের যুদ্ধজাহাজ যখন টাকু দুর্গ অধিকার করিল তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যুদ্ধঘোষণা করিয়া, বক্সারদিগের কার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হইল।

পেকিন লিগেশন অবরোধ করা হইলে বিদেশী জাতিরা সমস্ত লোক ব্রিটিশলিগেশনে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ফরেনলিগেশন, পেকিন নগর-প্রাচীরের অতি সন্নিকট এবং সহরের মধ্যে। সেই প্রাচীরের উপরে বিদ্রোহিগণ তোপ বসাইয়া আক্রমণ করিলে এবং ইচ্ছা করিলে লিগেশনের ভিতর যত আমেরিকান ও ইউরোপীয়গণ ছিল তাহার একজনও জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না এবং এই ব্যাপারের কাহিনী বর্ণনা করিতে কেহই জীবিত থাকিতেন না।

আক্রমণকারিগণের পশ্চাতে এমন এক শক্তি কার্য্য করিতেছিল যে তাহারা সেই শক্তির বশীভূত হইয়া বিদেশি-গণকে সদলে নিপাত করিতে চেষ্টা পায় নাই। অনেকের বিবেচনায় সেই শক্তিই সম্রাজ্ঞার শক্তি বলিয়া বিবেচিত

হইয়া থাকে। এক জন ইংরেজ, যিনি সেই অবরোধকালে লিগেশন মধ্যে ছিলেন, আমাকে বলিয়াছিলেন যে "The Boxers acted in a half-hearted manner; if they liked they could easily have killed every one of the Legation."

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাদের গ্রীষ্মাবাসে ছিলেন, রাজমন্ত্রিগণ নিষেধ করা সত্বেও তাঁহারা পেকিনের শীতাবাসে আসিয়া উপস্থিত হন, উদ্দেশ্য যে রাজধানীতে সম্রাজ্ঞী উপস্থিত থাকিলে বিদ্রোহিগণ ও রাজকীয় সৈন্যগণ কতক শান্তমূর্ত্তি ধরণ করিবে। রাজকীয় সৈন্যগণ বক্‌সারদিগকে থামান দূরের কথা তাহারা নিজেরাই এমন সকল জঘন্য কার্য্য করিতে লাগিল যে সে সকল অকথ্য। এ বিষয় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভুল ধারণা হইয়াছিল যে পেকিনে তাঁহাদের পরম পূজনীয় ও মহামান্য পবিত্র মূর্ত্তিদ্বয় উপস্থিত থাকিলে ক্ষিপ্তপ্রায় বিদ্রোহিগণ ঔষধ-ভীত সর্পের ন্যায় অবনতমস্তক হইবে। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইয়াছিল। উন্মত্ত সৈন্যগণ এবং ক্ষিপ্তপ্রায় বক্‌সারগণ তাঁহাদের অনেক আদেশ গ্রাহ্য করে নাই অবশেষে বিদেশী রাজন্যবর্গের যুক্ত-সৈন্যের অভিযান পেকিনে পৌঁছিল। সম্রাজ্ঞী ভয়ে ভীতা হইলেন এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। বিদেশীগণ টিন্‌সিন হইতে পেকিন যাইবার পথে চীনাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, সেই সকল অতিরঞ্জিতভাবে বৃদ্ধাসম্রাজ্ঞীর নিকট সংবাদরূপে প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই বিপদের সময়ে তিনি বিদেশীগণের হস্তে বন্দি হইবার আশঙ্কায় পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তবু বিদেশী সৈন্যগণ যাবত নগরের বারিদ্বার (Water Gate) পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়াছিল তাবত তিনি নগর মধ্যেই ছিলেন। বিদেশী সৈন্যগণ লিগেশনে পৌঁছিলে তিনি এক গোশকটে ছদ্মবেশে সামান্য গরিব লোকের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার হাতের আঙ্গুলে বড় বড় নখ ছিল। ইহা বড় লোকের চিহ্ন স্বরূপ। তাই ভয়ে অতি যত্নের বহুকালরক্ষিত নখ সকল কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। আপন বস্ত্রাদি ধনরত্নাদি ও তৈজসপত্রাদি কিছুই লইতে পারিলেন না। সেই রাত্রিযোগে রাজপরিবারের সিংগান-পু নামক স্থানে পলায়ন করা একমাত্র উপায় যোগ্য ছিল। রাজকীয় সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রাজকীয় দপ্তর সিংগান-ফু প্রেরিত হইল। রাজকীয় সৈন্যগণের মধ্যে অনেক "বক্‌সার গুপ্তসমিতির" লোক প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা পদে পদে বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। সৈনিককর্ম্মচারিগণ ও সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থাকায়ও তাহারা তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিতে লাগিল না। বিদ্রোহিগণের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে সে যুদ্ধ থামিয়া গেলে, হয় ত বিদেশিগণ কর্ত্তৃক না হয় ত গবর্ণমেন্টকর্ত্তৃক তাহারা গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা আরো দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিল।

রাজকীয় পলায়মান অভিযানের সিংগান-পু যাইতে যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তথায় পথিমধ্যে অনেক গ্রামে বক্সার-গুপ্ত-সমিতির লোকদিগের আড্ডা ছিল। সেইজন্য, সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণ রাজকীয় দলকে আশ্রয় দিতে বা আহারাদি সরবরাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। সেই সেই স্থানের লোকেরা ধারণা করিয়াছিল, যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ তাহাদের বিপক্ষে এবং বিদেশিগণের পক্ষে ছিলেন। প্রিন্স সু তাঁহার পেকিন হইতে সিংগান-ফু যাওয়ার বিবরণে লিখিয়াছিলেন যে "অনেক দিন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ উদর পূরিয়া আহার করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের খাদ্য সৈন্যগণ চুরি করিয়া বা কখনও বলপূর্ব্বক খাইয়া ফেলিত। সম্রাটই নাকি ক্ষুৎপিপাসা অবিরত সহ্য করিতেন, কোন বৃদ্ধারাণীকে তাঁহার অনাহার কষ্টের কথা জানিতে দিতেন না। তিনি নিজে না খাইয়া রাণীদিগকে দিতেন। সকলকেই অল্পাধিক জঠরজ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছিল।"

বৃদ্ধারাণী প্রথম প্রথম ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অতি সাহস ও দক্ষতার সহিত সমস্ত বিষয়ের সুবন্দবস্ত করিয়াছিলেন। কেন না তিনি পূর্ব্বেও একবার এই প্রকার বিপদে পড়িয়া স্বামীসহ রাজধানী হইতে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিদেশীগণের সঙ্গে দ্বিতীয়যুদ্ধকালে। সে বার তাঁহারা জেহল নামক স্থানে পলাইয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। এই সকল বিপদে পড়িয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। পেকিন রাজপুরীতে

কোন বিষয় তারিখসহ উল্লেখ করিতে হইলে এই পলায়নের দিন হইতে গণিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

[ক্রমশঃ

রামধনের কীর্ত্তি।

রামধন মণ্ডল বরিশালের কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করে। দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অজ্ঞাতনামা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দশটাকা জলপানী পাইল; এবং কলেজে পড়িতে বরিশালে গেল।

তাহার পিতা তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিত না। অগত্যা তাহাকে ছেলে পড়াইয়া আরো তিনটি টাকা উপার্জ্জন করিতে হইত। সুতরাং জলপানীর টাকাটা দানাপানিতেই ব্যয় করিতে হইত; জলপানী ব্যাপারটার জল্পনা দরিদ্রের মনে স্থান পাইত না।

ত্রিসংসারে তাহার বৃদ্ধপিতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। মৃত্যু যখন সেই একমাত্র আশ্রয়ও কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন বালক রামধন বড় কাতর হইয়াছিল। পুত্রকে রুদ্দমুখ দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "বাবা রামধন, ঠিক আমার এই বিছানার নীচে তিনটা বোগ্‌নোভরা পাঁচহাজার টাকা আছে, তারাই তোমার সহায় ও আশ্রয় হবে, ভয় কি বাবা। তুমি যদি বুঝে সুঝে চল্‌তে পার, তোমার ভাবনা কি?"

রামধন মনে করিল, ইহা বিকারের প্রলাপ। সারাজীবন যে অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট পাইয়া জীর্ণ পর্ণকুটীরে লালিত হইয়াছে, সে একেবারে পাঁচহাজার টাকা প্রাপ্তির কথা প্রলাপ ও স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবেই ত।

তথাপি পিতার মৃত্যুর পর কৌতূহলবশে ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া দেখিল, তিনটি পিত্তলের হাঁড়ির মুখে লোহার তাওয়া ঢাকা রহিয়াছে। ঢাকা সরাইতেই বরদ সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত মুদ্রাগুলির সহিত রামধনের শুভদৃষ্টি হইল। প্রথম-প্রণয়প্রসঙ্গভীতা নবোঢ়ার মত রামধনের অন্তরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

রামধন স্থির করিল, এই টাকা লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া লেখা পড়া করিবে।

যথা চিন্তা, তথা কাজ। বরিশালের কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইয়া একেবারে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং হিন্দু হোষ্টেলের ত্রিতলে একা একটি ঘর লইয়া বাস স্থাপন করিল।

রামধন অতি অল্পকালের মধ্যে মহাধনবান বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল। কলেজের ব্যায়ামবিভাগে চাঁদা দিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিত এবং ব্যায়ামান্তে পেস্তা কিশমিশ, বাদাম আখরোট, চালগুজা সরভাজা পেট ভরিয়া খাইত এবং সঙ্গীদিগকে খাওয়াইত। কারণ ব্যায়ামান্তে পুষ্টিকর খাদ্যাহার শাস্ত্রের ব্যবস্থা!

অহোরাত্রে পাঁচবার চা খাওয়ার জন্য হোষ্টেলময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মৌতাতের সময় প্রসাদপ্রার্থী অনেক বন্ধু যুটিত। বনমালী জলখাবার যোগাইয়া উঠিতে পারিত না; ব্রজঠাকুর চপ কটলেট ভাজিতে ভাজিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিত; রজনী বেচারার সোডা লেমনেড যোগাইতে দশবার তেতলা উঠানামা করিতে পায়ে বাত ধরিয়া গেল। ভজহরির কুল্পিবরফ এবং বাথগেটের পাইন-এপল্ পানীয় না হইলে রামধনের সান্ধ্য মজলিস ভাল জমিত না। প্রত্যহ চার পয়সার মাখনের পাতামোড়া ঠোঙা ঝুলাইয়া ভোজ-নাগারে যাইত এবং আপনার পার্শ্ব ও সম্মুখবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কিয়দংশ বিতরণ করিয়া দিত। এইরূপে রামধনের প্রসার ও খ্যাতি খুব জমিয়া উঠিল।

রামধনের বিশেষত্ব সকল দিকে। হেয়ারকাটার চুল ছাঁটিত; লেড্‌ল কোম্পানি শার্ট যোগাইত; নৃত্য ধোপা তিন দিন অন্তর কাপড় কাচিত; এবং দন্তমঞ্জন হইতে সাবান এসেন্স পর্য্যন্ত রামধনের চেরিব্লশমের প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব দেখা যাইত।

রামধন যখন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিত তখন বাম-হস্তের দিব্য ইস্ত্রিকরা চকচকে শার্টের কফের উপর বেলফুলের কুণ্ডলিত মালা মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ বিতরণ করিত। শনি রবিবারে থিয়েটার কামাই যাইত না; এবং বিলাসিনীদিগকে পুষ্পার্ঘ্য দিতে সে মুক্তহস্ত ছিল। ম্যাকবেথ অভিনয় দেখিতে কাহাকেও পুষ্পার্ঘ্যদিবার অবসর না পাইয়া (লেডি ম্যাক-বেথকে উপহার দিতে তাহার বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই) বিকৃতদর্শন ডাইনী পিশাচীদের শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু পুষ্পাঞ্জলি

দিয়া দর্শকদের রূঢ়হাস্যাহত হইয়া বেচারা বড় ব্যথা পাইয়াছিল; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল "তোমরা সবাই ভালো, কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো।"

রামধন হোষ্টেলে আসার পর অনেককে মনিব্যাগের বন্ধন বড় একটা খুলিতে হইত না। কিন্তু রামধনের ব্যাগ অনাসক্ত নিত্যমুক্ত হইয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেছিল। এবং বনমালী, ব্রজ, রজনী ও ভজহরির ট্যাক যে পরিমাণে ভারি হইতেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে শ্রীমান রামধনের ব্যাগ লঘু হইতেছিল।

রামধন দেখিল যে তৎপঠিত রসায়ন শাস্ত্রে টাকার উবায়ু সংজ্ঞা না থাকিলেও, টাকা নিতান্ত উবায়ু। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে পঞ্চসহস্রের মধ্যে পঞ্চশত মুদ্রা রহিল কি না সন্দেহ। তখন রামধন ধার লইতে আরম্ভ করিল। বাজারে তাহার নাম ডাক যথেষ্ট। প্রথম প্রথম বেশ ধার মিলিতে লাগিল।

কলেজের বেতন, হোষ্টেলের খাই খরচ, পরীক্ষার ফি প্রভৃতি অবশ্য নগদদেয় বিষয়ে খরচ করিতে করিতে অবশিষ্ট অর্থও শীঘ্র নিঃশেষের অভিমুখী হইল।

তখন বনমালী, ব্রজ, রজনী, ভজহরি, নৃত্য প্রভৃতি পাওনাদারেরা তাগাদা আরম্ভ করিল। তাগাদা প্রথমে অনুরোধ, তৎপরে অনুযোগ, অবশেষে আস্ফালনে পরিণত হইল। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু হাওলাত লইয়া পাওনাদারদের থামাইল। কিন্তু অবশেষে বন্ধুদের নিকটও ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইল।

চারিদিকে শাণিত-তাগাদা-শরবর্ষী চতুর্দ্দশ রথীতে আক্রান্ত হইয়া বেচারা রামধন একদা রাত্রে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেসনে এবং সেখানে প্রথম চলিষ্ণু ট্রেন ডায়মণ্ড হারবারের দেখিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া তাহাতেই সওয়ার হইয়া একেবারে ডায়মণ্ডহারবার গিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা পুলিশের ভয়ে এবং কি এক অজ্ঞাত সঙ্কোচে লোকালয়ে যাইতে পারিল না। গ্রামের বাহিরে এক বনের মধ্যে একটা অতি উচ্চ দেবদারুর ঘনকুঞ্চিত পত্রান্তরালে লুকাইয়া রহিল; সমস্ত দিন অনাহারে ভয়ে ভয়ে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখিল এক বৃদ্ধ গলায় টুঁটি আঁটা মালা পরিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ ডেডলেটার-আপিশ-ফেরত চিঠির মত নানাবিধ ছাপে ভরিয়া, সেই গাছের তলায় উপস্থিত হইল। ভীত ভীত ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু রামধনের সৌভাগ্যক্রমে উপরে চাহিল না। চারিদিক জনহীন দেখিয়া বৃদ্ধ বস্ত্রান্তরাল হইতে একটা কাপড় মোড়া পুলিন্দা বাহির করিয়া ভূমিতে রাখিল, তারপর সেই দেবদারু বৃক্ষটার পাদদেশে একটা ছোট শাণিত খোন্তা দিয়া ত্রস্তহস্তে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই পুলিন্দাটা প্রোথিত করিল এবং গর্ত্তটিকে বেশ করিয়া ভরিয়া দিয়া তাহার উপর একটা আশশেওড়ার গাছ রোপণ করিল এবং সেই গাছের আশপাশে ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্থানটিকে যথাসম্ভব নিঃসন্দেহ করিল। তৎপরে পাছে তাহার নিজের স্থান ভুল হইয়া গোলমাল উপস্থিত হয় বলিয়া সেই স্থানটাকে চিহ্নিত করিবার জন্য খোন্তার কোণ দিয়া দেবদারু গাত্রে ত্বক কাটিয়া লিখিল 'ইহ'।

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিল। রামধন বৃক্ষচূড় হইতে যখন দেখিল যে বৃদ্ধ বহুদূরে চলিয়া গেল, তখন সে বৃক্ষাবরোহণ করিয়া দেবদারুর একটা শাখা ভগ্ন করিয়া তৎসাহায্যেই সেই গর্ত্তের উপরকার আলগা মাটি খুঁড়িয়া বৃদ্ধপ্রোথিত পুলিন্দাটি বাহির করিয়া লইল। এবং পকেট হইতে রজর্সের চকচকে একখানা ছুরি বাহির করিয়া সেই পুলিন্দাজড়ান মোমজমা কাপড়ের সেলাই কাটিয়া ফেলিল। কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইল একটা টিনের চোঙ। টিনের চোঙের ঢাকনি খুলিয়া বাহির হইল একটা লম্বা মোটা বাঁশের চোঙা। চোঙার ভিতরে দেখা গেল কতকগুলি করেন্সি নোট। সেগুলি দেখিয়া রামধন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; নিমজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয় লাভের মত সে সেই চোঙাটিকে দ্বিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিল। আশা আশ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। রামধনের অদৃষ্টে গুপ্তধন প্রাপ্তিযোগ যথেষ্টই ছিল।

রামধন নোটগুলিকে সজ্জিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চোঙার মধ্যে চোঙায় গুপ্ত করিল, এবং ছুরি দিয়া বৃক্ষগাত্রে বৃদ্ধের লেখার সঙ্গে ত্বক কাটিয়া লিখিল—

'ইহ গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,

নিল এই ঋণ,
শোধ্য পেলে দিন'।

তৎপরে রামধন গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিল এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই তিলকমালা-ধারী বৃদ্ধের পরিচয় জানিয়া লইল।

বৃদ্ধের নাম জগন্নাথ, জাতিতে স্বর্ণবণিক, ধর্ম্মে পরম বৈষ্ণব। সে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু দুই দুর্বৃত্ত অনাচারী মদ্যপ পুত্রের অসাবধান ব্যয়ে বৃদ্ধের অবস্থায় ভাঁটা লাগিয়াছে, ইত্যাদি।

রামধন বুঝিল পুত্রের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই ধনগুপ্তি।

রামধন পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বৃদ্ধের বাড়ী গেল এবং বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া, তাহার করুণকাহিনী শুনিয়া, বহু সমবেদনা ও আশ্বাস দিয়া, বৃদ্ধকে পরম আপ্যায়িত করিয়া আসিল।

রামধন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে হোষ্টেলে গিয়া উপস্থিত। তাহার পলায়নে হোষ্টেলময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে সমস্ত হোষ্টেল সন্ধ্যাকালের কাকসমাকুল বটবৃক্ষের মত, লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মত মুখর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ আসিয়া 'হ্যাণ্ড্‌শেক্' করিল, কেহ পিঠে চাপড় কষিল, কেহ নমস্কার করিল, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শ্রীমান রামধন তাহার চিরায়ত্ত হাস্যে সকলকে প্রীত-আপ্যায়িত করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিল যে পাওনাদারদের নালিশ অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাদি হোষ্টেলের আপিস ঘরে লইয়া রাখা হইয়াছে, এবং অদ্য বেলিফ আসিয়া প্রকাশ্য নিলামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা ঋণানুপাতে সকল পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া রামধন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বর্ণ চসমার স্বচ্ছ অন্তরালে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "ফোঃ ক্রাউণ্ড্রেল্‌স্; ফাই আন্‌গ্রেট্‌ফুল্ ব্রুট্‌স্'! তারা আমাকে এত ছোটলোক মনে করে?"

কেহ কেহ তাহাকে 'এড্‌ভাইস্ গ্রাটিস্' দিল যে, পাওনাদারেরা যে রকম চটিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে সহজে তুষ্ট করা যাইবে না। অতএব কোন 'ডেঞ্জার্ ব্রেভ' না করিয়া তাহার 'গা ঢাকা' দেওয়াই ভাল।

রামধন হাসিয়া তাহার সদ্যোদ্গত গুম্ফে একটা পাক দিয়া প্রভুত্বের ভাবে বলিল, "মেক্ ইওর্‌সেল্‌ভ্‌স্ ঈজি, মাই ডিয়ার্ ফ্রেণ্ড্‌স্, আই অ্যাম্ কোয়াইট্ এ ম্যাচ্ ফর্ দেম্।" তারপরে চোঙার মধ্য হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচন বন্ধুদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া রামধন বলিল, "ডোণ্ট্ ইয়ু থিঙ্ক্ আই অ্যাম্ ওয়েল্ ইকুইপ্‌ট্'।"

তখন 'হিপ্ হিপ্ হুরে' এবং 'থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ রামধন বাবু' শব্দে (তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রচলিত হয় নাই) হোষ্টেল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

রামধন তাহার বিস্মিত জিজ্ঞাসু বন্ধুদিগকে বুঝাইল যে তাহার অলস কর্ম্মবিমুখ পাজি নায়েবটা জমিদারী হইতে ঠিক সময়ে টাকা পাঠায় নাই বলিয়াই ত' এত অনর্থ। সে নিজে গিয়া তাহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিয়া এই টাকা লইয়া আসিয়াছে। ইত্যাদি।

রামধন সেইদিনই সমস্ত পাওনাদারদের সতিরস্কার দেনা দিল। বন্ধুগণ দেখিয়া আনন্দিত হইল যে, 'রামধন বাবু' 'অনারেবলী অ্যাকুইটেড্'।'

রামধন বন্ধুবর্গকে পরিতোষ করিয়া ভোজ দিল। সে দিন ভজহরি পঁচিশ টাকার রোজবেরি-রসগোল্লার কুলপি বরফ বিক্রয় করিয়াছিল।

রামধন এক্ষণে ঠেকিয়া শিখিয়া বিশেষ মিতব্যয়ী ও সংযমী হইল। সে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এফ, এ, কোন গতিকে পাশ করিল। কিন্তু তদনন্তর বিশেষ মেধাবী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাহার নূতনতর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। সে এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের উকিল বিশ্বম্ভর বিশ্বাসের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল এবং শ্বশুরের আশ্রয়চ্ছায়ে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল।

রামধন বিবাহলব্ধ ও শ্বশুরদত্ত টাকা বাঁধিয়া একদিন ডায়মণ্ড্ হারবার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ডায়মণ্ড হারবারে গিয়া বুড়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বুড়া ত'

কাঁদিয়াই আকুল। তাহার হরিনামের ঝুলি রামধনের মাথায় বার বার ঠেকাইয়া কত রকম শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ করিল।

ক্ষণেক পরে কিঞ্চিৎ সংবৃত হইয়া বলিতে লাগিল—

"আমার গুণধর পুত্রদ্বয় আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ও নষ্ট করিতেছিল বলিয়া বৃদ্ধবয়সের অভাবের দিনের জন্য আমি সেই পাঁচহাজার টাকা সেই দেবদারুতলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তখন আমার থলি শূন্য দেখিয়া এক পুত্র অন্যত্র চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে; এবং অপরজন মত্তাবস্থায় একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া দ্বীপান্তরে বাস করিতেছে। অন্য ছেলেটাও যদি দেশছাড়া হইয়া দ্বীপান্তর যাইত ত' আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। যাহাই হউক, তবু কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া অর্থের সন্ধানে গিয়া দেখিলাম সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ গলায় চাদর বাঁধিয়া দেবদারুরই একটা শাখায় ঝুলিয়া সকল দুশ্চিন্তা, সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিতাম; কেবল তোমার লিখিত বাক্য—

'ইহ গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,
নিল এই ঋণ,
শোধ্য পেলে দিন'।

আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া অকাল অপমৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই শ্লোকের 'ঋণ' ও 'শোধ্য' এই দুটি কথা দুই বন্ধুর মত আমার দুই কর্ণে ক্রমাগত আশা ভরসা, সান্ত্বনা আশ্বাস দিতে লাগিল। সেই দুটি কথার পরামর্শ মত আমি অপেক্ষা করিয়া আছি; এবং দারিদ্র-অনশন-ঋণে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়াও অজ্ঞাত ঋণীর নিরন্তর শুভকামনা ও সুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। বাপধন, তুমি আমারই ঐকান্তিক প্রার্থনাতে এত বড়, এত সুশীল হইয়াছ। যদি আশ্বাস দিয়া না যাইতে, তবে বৃদ্ধের মনস্তাপে পলে পলে দগ্ধ হইয়া তুমি অধঃপাতে যাইতে, ইহা নিশ্চয়"।

রামধন হাসিয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিয়া সুদসমেত ঋণ শোধ করিল। তখন বৃদ্ধ জগন্নাথ রামধনকে উকিল জানিয়া তাহা দ্বারা এক উইল প্রস্তুত করাইল।

সমস্ত অর্থ গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ৺শ্যামসুন্দরের দৈনিক সেবার ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে। পুত্রদ্বয় গৃহপ্রত্যাগত হইলে পৈতৃক গৃহে বাস-অধিকার পাইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইবে মাত্র। সম্পত্তির ট্রাষ্টি ও একজিকিটার নিযুক্ত হইলেন অন্য দুই জনের সহিত *হাইকোর্টের সুশীল ধর্ম্মাত্মা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামধন মণ্ডল।*

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৬-০৭ সালের ভারতের বাণিজ্য হিসাব।

ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্ণল নামক সরকারী বাণিজ্য পত্রিকায় ১৯০৬ সালের এপ্রেল হইতে ১৯০৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১২ মাসের বাণিজ্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষেপ সঙ্কলন নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

আমদানি।

এপ্রেল—মার্চ্চ	১৯০৪-০৫	১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭
মাল	টাকা	টাকা	টাকা
বেসরকারী	৯৬,৬৭,৮২,৮৮৪	১০৩,০৬,৫৬,৬০২	১০৮,৩০,৬৯,১৪৪
সরকারী	৭,৭৩,৪৪,৫৭০	৯,০২,৯৬,৭১৪	৮,৯৩,৪৬,১৫০
মোট আমদানি— টাকা	১০৪,৪১,২৭,৪[illegible]	১১২,০৯,৫৩,৩১৬	১১৭,২৪,২৪,১৫,২৯৪
সোণা রূপা প্রভৃতি			
বেসরকারী	৩৩,০২,৭৫,২৯৮	২০,৯২,১২,৮৯০	২৭,২০,০৯,৮৫৮
সরকারী	৬,৪৮,০৬,৪৫২	১০,৭২,৯৭,২৪৩	১৭,৩৭,৮৮,২৫৬
ধনরত্নের মোট— টাকা	৩৯,৫০,৮১,৭৫০	৩১,৬৫,১০,১৩৩	৪৪,৫৭,৯৮,১১৪
সর্ব্ব মোট আমদানির— মূল্য	১৪৩,৯২,০৯,২০৪	১৪৩,৭৪,৬৩,৪৪৯	১৬১,৮২,১৩,৪০৮

গত বৎসরে বিদেশী দ্রব্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকারও অধিক ভারতে আমদানি হইয়াছে। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশেই আমদানি অধিক। বাংলা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; তবু আমরা স্বদেশী বলিয়া গর্ব্ব করিতে লজ্জাবোধ করি না!

রপ্তানি।

এপ্রেল—মার্চ্চ	১৯০৪-০৫	১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭
মাল	টাকা	টাকা	টাকা
বেসরকারী	১৫৭,৫১,৪৩,৪৪৪	১৬১,৭০,৭৮,৯৯২	১৭৬,৫৬,১৫,১৬৫
সরকারী,	২০,৭৭,০৮৫	১১,৭৫,৮৮৫	১০,৭৯,১০৫
মোট রপ্তানি টাকা	১৫৭,৭২,২০,৫২৯	১৬১,৮২,৫৪,৮৭৭	১৭৬,৬৬,৯৪,২৭

এপ্রেল—মার্চ্চ মাল	১৯০৪-০৫ টাকা	১৯০৫-০৬ টাকা	১৯০৬-০৭ টাকা
সোণা রূপা প্রভৃতি ধন			
বে-সরকারী	৮,০৮,৮৫,৬৫৬	৬,৪৪,৯৭,৫৬৯	৫,৭১,৩০,০৭৬
সরকারী	৮,৪৫,২২,৫১১	৯,০২,০২,৪৮৫	৫২,৪৫০
মোট সোণা রূপার মূল্য	১৬,৫৪,০৮,১৫৭	১৫,৪৭,০০,০৫৪	৫,৭১,৮২,৫২৬
সর্ব্ব মোট রপ্তানির মূল্য	১৭৪,২৬,২৮,৬৯৬	১৭৭,২৯,৫৪,৯৩১	১৮২,৩৮,৭৬,৭৯৬

গত বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ কোটি টাকারও অধিক ভারত হইতে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয়গণ ধনশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইহা দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিবেন। বিলাতী ধনশাস্ত্র বলে যে দেশের রপ্তানির পরিমাণেই দেশের ধনবৃদ্ধির পরিচয়, যত রপ্তানি হইবে বিদেশের ধন তত ঘরে আসিবে। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি ভারত ও ইংলণ্ডের অবস্থা এক নহে। ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ, তাহার রপ্তানি মানেই ধনবৃদ্ধি; আর ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, আমাদের রপ্তানি মানে অন্ননাশ ও দুর্ভিক্ষ। আমাদের দেশে আমদানির বৃদ্ধি যেমন অর্থনাশের কারণ, রপ্তানি বৃদ্ধি তদপেক্ষা সর্ব্বনাশের হেতু। আমাদের দেশের আমদানি রপ্তানিতে আমরা দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। একমণ পাট ৮৲ টাকায় আমরা বিদেশে রপ্তানি করিতে, রপ্তানি শুল্ক আমাদিগকে দিতে হইবে মনে করা যাক ২৲ টাকা; অতএব একমণ পাটে আমরা পাইলাম ৬৲ টাকা মাত্র। সেই একমণ পাটে বিলাত হইতে ২০ জোড়া কাপড় হইয়া আসিল, তাহার মূল্য দিলাম আমরা মনে করা যাক ৪০৲ টাকা ও শুল্ক ৮৲ টাকা। আমরা পাট বেচিয়া বিদেশীর কাছে পাইয়াছিলাম ৬৲ টাকা মাত্র, বিদেশীকে ফিরাইয়া দিলাম ৪৮৲ টাকা। ৪২৲ টাকা আমাদের ঘর হইতে অধিক চলিয়া গেল। প্রত্যেক রপ্তানি কাঁচা মাল সম্বন্ধে এই কথা। তারপর খাদ্য শস্য যত রপ্তানি হয় তাহা ত, একেবারে সমূলে বিনাশের কারণ, যে পরিমাণ রপ্তানি সেই পরিমাণ উদরের শূন্যতা ত অনিবার্য্য। আমরা সরকারী কর্ত্তাদের বড় বড় অঙ্কপাত দেখিয়া যেন ভ্রান্ত না হই; আমাদের সর্ব্বনাশের প্রতি যেন অন্ধ হইয়া না থাকি। আমরা যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে দেশে যাহা প্রস্তুত হয়, এরূপ জিনিষ বিদেশের কিছু লইব না, তেমনি আরো প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে বিদেশকে শিল্পপণ্য দিতে পারি দিব, কিন্তু "শস্য বা কাঁচা মাল বিদেশকে দিব না। এবং এই প্রতিজ্ঞা হৃদয়ের রক্ত দিয়াও পালন করিতে হইবে, নতুবা সমগ্র জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

যাইতে আসিতে করাতের দাঁতের মত সরকার হইতে মালের উপর শুল্ক আদায় করা হয়। এই সেই অর্থটা আমাদের পকেটই রিক্ত করিয়া গৃহীত হয়, তাহারও পরিমাণ দেখা যাউক—

আমদানি শুল্ক	১৯০৪-০৫	১৯০৫-০৬	১৯০৬-০৭।
সায় লবণ	৭,২৩,৪৫,৯২২।	৬,৮৪,০৬,৪০৫।	৬,৯২,০৩,৬৩২।
রপ্তানি শুল্ক	১,৩১,৭৫,৭৭২।	১,১৫,১১,২৫৭।	১,০৫,৩০,৯১৯।

লবণের মাশুল হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও আমদানি শুল্ক বাড়িয়াছে এবং বিদেশীর সুবিধার জন্য রপ্তানি শুল্ক কমিয়াছে।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাট, তুলা, গালা, চামড়া প্রধান। ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। খাদ্যসামগ্রীর রপ্তানি অল্প কমিয়াছে। চা অধিক রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধাতব সামগ্রী, তৈল, ঔষধ প্রভৃতি অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর অধিক রপ্তানি হইয়াছে।

আমদানি মধ্যে শিল্পপণ্য প্রধান। গত বৎসর আমদানি অল্প কম হইয়াছে। কিন্তু খাদ্যপেয় সামগ্রী, যেমন চিনি, মসলা, লবণ, সুরা, অধিক আমদানি হইয়াছে। ঔষধও অধিক আমদানি হইয়াছে।

আমাদের দেশে প্রধান আমদানি দ্রব্য চিনি ও কাপড়, উভয় দ্রব্যই অধিক আমদানি হইয়াছে।

চিনি জাভা হইতেই অধিক আসিয়াছে; জাভার পর অষ্ট্রিয়া। কিন্তু কোন দেশই আমাদের দয়া করিতে ত্রুটি করেন নাই। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ, আফ্রিকার মিশর ও নেটাল, আমেরিকার মেক্সিকো, মরিসস্ প্রভৃতি, এসিয়ার চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকলেই কিছু না কিছু চিনি পাঠাইয়াছেন। ভারতীয় সকল প্রদেশের মধ্যে ১৯০৬ সালে সিন্ধু প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদেশী চিনি লইয়াছিল, ১৯০৭ সালে বোম্বাই সর্ব্বপ্রধান, ১৯০৬ সালে বাংলা তৃতীয় ছিল, ১৯০৭ সালে বাংলা দ্বিতীয় হইয়াছে। এ বৎসর সিন্ধু প্রদেশ তৃতীয় হইয়াছে, ৫০৪২৬৫ হন্দরের স্থলে এ বৎসর

মোটে ৪২৭৭৬ হন্দর বিদেশী চিনি লইয়াছে; সিন্ধু বাংলা অপেক্ষা চিনি বর্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

১৯০৭ সালের মার্চ্চ মাসে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় বিদেশী কাপড় অধিক আমদানি হইয়াছে। ভারতে ১৯০৬ এপ্রেল হইতে ১৯০৭ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ১১ মাসে ৬,৪৩,৩২৬ জোড়া কাপড় বয়ন হইয়াছে, গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ডবল। বম্বে প্রদেশেই অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। তৎপরে মধ্যপ্রদেশ, তৎপরে যুক্তপ্রদেশ ও আজমীঢ় মাড়োয়ার, তৎপরে বাংলা।

আমরা স্বদেশী বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, উপরের সংগৃহীত তত্ত্ব দেখিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, বাংলা এখনো সকল বিষয়ে সকলের পশ্চাতে। বাক্যকর্ম্মে সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে আমাদের শুভ নাই। বাংলা সাবধান না হইলে ঘরে পরে কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলিয়া দিবে।

১৯০৬-৭ সালে বাঙ্গলা দেশে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭ কোটি গজ কম বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু আবার আমদানী বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। বিলাতী লবণের কাট্‌তিও অনেক কম হইয়াছিল। চিনি কিন্তু বেশী আসিয়াছিল। যাহাই হউক, মোটের উপর আমরা কিছুতেই অহঙ্কৃত বা নিরুৎসাহ না হইয়া যেন স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, একসঙ্গে করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনীয়।

স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্জ্জনের মাত্রা ও প্রকার ভেদ।

স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্জ্জন সম্বন্ধে সমুদয় বাঙ্গালী একমত নহেন। অনেকে স্বদেশীর পক্ষপাতী কিন্তু বিদেশীবর্জ্জন চান না। যাঁহারা স্বদেশী ও বিদেশীবর্জ্জন দুই চান, তাঁহাদের মধ্যেও সামান্য সামান্য মতভেদ আছে। আমরা পূর্ব্বেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব।

প্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে বিদেশী জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদি, এবং অন্যান্য বিষয়েও কার্য্য করিবার উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না; করা উচিতও নহে। বিদেশী বিলাসদ্রব্য, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রব্য, অহিতকর ফ্যাশন ও সামাজিক রীতিনীতি, প্রভৃতি সমুদয়ই বর্জ্জনীয়। ফ্যাশন সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। কারণ এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সাহেবী পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাক গুলি দেশী উপাদানে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল জিনিষ সম্বন্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশী সে সকল জিনিষ কেনা আমাদের উচিত নয়। যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে হইতে পারে, তৎসমুদয়, বিলাসদ্রব্য হইলে ত্যাগ করা উচিত; প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইলে যতদিন ভারতবর্ষে না হয়, ততদিন বিদেশী ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে না। তৎসমুদয় বিলাসদ্রব্য হইলে, বর্জ্জনীয়; নতুবা ব্যবহার্য্য। কোন্‌টি বিলাসদ্রব্য এবং কোন্‌টি অবশ্য-প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে অবশ্য মতভেদ হইবে।

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত সমুদয় দ্রব্যকেই আমরা স্বদেশী বলিয়া থাকি; কিন্তু তন্মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

প্রথমেই ধরুন, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, কলম, কালী, মুদ্রাযন্ত্র, ইত্যাদি। লিখিবার কাগজ, কলম ও কালী এখন সমস্তই দেশী পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটু প্রকারভেদ আছে। লিখিবার কাগজের মধ্যে হাতের তৈয়ারী যে সকল অমসৃণ বা খস্‌খসে চিঠির কাগজ আদি পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ দেশী। বাঙ্গলা দেশে যে সকল কলের কাগজ লিখিবার জন্য এবং খবরের কাগজ, মাসিক পত্র ও পুস্তক ছাপিবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা ঠিক দেশী নহে। উহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু উহার কল বিলাতী, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতী, প্রধান কারিকরগণ বিলাতী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী; কেবল ঘাস, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেশী। বাঙ্গলা দেশে দেশীলোকদের কাগজের কল একটিও নাই। অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌয়ে দেশী লোকদের পরিচালিত একটি কাগজের



নির্ব্বাতিতে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত মুল তৈল চিত্র হইতে।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

কল আছে। উহারও কলকারখানা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দেশী ও বিলাতী লোকদের দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, তাহারা দেশের প্রয়োজনানুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ। অবশ্য কাপড় সম্বন্ধেও স্বদেশীর বিরোধীরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাঁতে যত কাপড় হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। অতএব বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করা যাইতে পারে না। কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেঁড়া পুরাতন কাপড়ও সেলাই করিয়া পরা যায়। কিন্তু ছেঁড়া পুরাতন কাগজে পুনর্ব্বার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় পরেন, তিনি কষ্ট করিয়া ৩ জোড়াতেও কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার খবরের কাগজের ১০,০০০ বা পুস্তকের ২,০০০ কাট্‌তি, তিনি ৭ হাজার বা দেড়হাজার ছাপিলে চলে না। অপেক্ষা করিবারও যো নাই। সপ্তাহে ১০,০০০ কাটতি হইলে ১০,০০০ই ছাপিতে হইবে। কিন্তু এ প্রভেদ সত্ত্বেও যাঁহাদের হাফটোন ছবি ছাপিতে হয় না, তাঁহারা বাজারে দেশী কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, ব্যবহার করিতে পারেন। সরকারী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ভারত সাম্রাজ্যে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে, কাগজের কল বেশ চলিতে পারে। ইহাতে অনেক মূলধনের দরকার। কিন্তু এক যোগে কাজ করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও চাই। যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাজ লইয়া টিটাগড় প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তবে ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে তাঁহারা কাজ পাইবেন না; এবং অতিরিক্ত মান্-অভিমান থাকিলেও চলিবে না।

কাগজ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং অন্যান্য সমুদয় বাঙ্গলা, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী মাসিকপত্রে বা পুস্তকে যেরূপ উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে হাফটোন ছবি ছাপা হয়, তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। উহা বিলাতী বা বিদেশী। যাঁহারা বিদেশী কিছুই ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য হাফ্‌টোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাঙ্গলা ইংরাজী দেশী ও বিলাতী মাসিকপত্র এবং পুস্তক বর্জ্জন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় বিলাতের ছাপা বহিও ত্যাগ করা উচিত; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালী, মুদ্রাযন্ত্র, দপ্তরী, সুতা, বাঁধাইয়ের কাপড়, সবই বিলাতী। হাফ্‌টোন ছবি বিলাসদ্রব্য কিম্বা উহার কোন উপকারিতা আছে, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। প্রসঙ্গতঃ হাফটোন ছবি সম্বন্ধেও ইহা বক্তব্য যে উহার সমুদয় যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, মালমসলা, বিলাতী বা বিদেশী; প্রস্তুত অবশ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন ভারতবাসী কর্ত্তৃক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইহাও জানা দরকার যে হাফটোন ছবি ছাপিবার কালী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। বিলাতী কিম্বা মার্কিন কালীই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়।

লিখিবার কালী খাঁটি দেশী বেশ পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও অনেকে বাধ্য হইয়া বা অন্য কারণে কোন্নগরে ওয়াল্ডি সাহেবের প্রস্তুত কালী ব্যবহার করেন।

তৎপরে মুদ্রাযন্ত্রের কথা। যত ছাপাখানা আছে, সমুদয়েই বিলাতী বা বিদেশী মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপিবার কল ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাসী কাঠের বা লোহার ২।১টি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতী। অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা বুঝিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না। যাঁহারা বিলাতীর কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁহাদিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র এবং পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় আপাততঃ পুস্তকাদি পাঠ ত্যাগ না করিয়া ছাপাখানার এই সব জিনিষ দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমরা যতদূর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিলাতী বা মার্কিন ছাপিবার কালী ব্যবহৃত হয়। দেশী কালী কেহ কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষে ভাল ছাপিবার কালী প্রস্তুত হয় না। যদি কেহ ভাল ছাপা চান, তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী কালীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশানুরাগ

পরিতৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বিদেশ গিয়া ভাল কালী প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে কালীর কারখানা খুলা।

তাহার পর যে সকল অক্ষর বা হরফের দ্বারা ছাপা হয়, তাহারও স্বদেশীত্ব বিচার্য্য। ইংরাজী ভাল সুদৃশ্য সাধারণ ও বিচিত্র নানা রকমের হরফ বিলাত ও মার্কিন দেশ হইতে আমদানী হয়। দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বে উহা বিদেশীর সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলা হরফ আমাদের দেশেই দেশী লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিন্তু হরফ ঢালাই-খানার যন্ত্রাদি বিদেশী। হরফ সাধারণতঃ, সীসা, আন্টিমনি, টিন ও তামা এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া, এই মিশ্র ধাতু হইতে প্রস্তুত হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে এই চারিটি ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভারত-বর্ষে খনি হইতে অতি অল্পই উত্তোলিত হয়।

যাহা হউক, ছাপাখানার এই সব ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় না। প্রধানতঃ চারি প্রকার জিনিষের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় হইতেছে; কাপড়, লৌহইস্পাত প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, লবণ এবং চিনি। দেশী কাপড় কলের তাঁতের ও হাতের তাঁতের, এই দুই প্রকার। কলগুলি বিদেশী, কোন কোন হাতের তাঁতও বিদেশী। কিন্তু দেশী খুব ভাল হাতের তাঁতও পাওয়া যায়; তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ের কলও কতক দেশী লোকের, কতক ইংরাজদের। তন্মধ্যে আমাদের দেশীলোকের কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা ছাড়া কাপড়ের আর এক শ্রেণীবিভাগ আছে। সরু সুতার ও মোটা সুতার। মোটা সুতা ভারতবর্ষজাত কাপাস হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। সরু সুতার জন্য মিসর ও মার্কিন-দেশের কাপাস ব্যবহৃত হয়। আজকাল সিন্ধু দেশে সরু সুতার উপযোগী কাপাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দেশী কাপড় পরিতে চান, তাঁহারা বোম্বাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হইতে হাতের তাঁতে বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং রংও আমরা প্রস্তুত করিতে না পারিলে খাঁটি দেশী কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক কথা। যদিও ভারতবর্ষের মাটির নীচে যথেষ্ট লোহা আছে, তথাপি, হাতের তাঁতের মাকু প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য লোহা ইস্পাত প্রভৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আসে। কলের তাঁত ত সমস্তই বিদেশী। ৺জামষেদজী নাসেরবাঞ্জি তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারখানা খুলিবার উদ্যোগ করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কার্য্য কিছু দিন পরে আরম্ভ হইবে, কিন্তু উহার সমুদয় মূলধন ভারতে পাওয়া গেল না। উহার অনেক অংশীদার বিদেশী। এই কারখানা হইতে লোহা উঠিতে আরম্ভ হইলে আমরা দেশী লোহা ইস্পাত যত আবশ্যক পাইব।

তাতা মহাশয়ের নামের উল্লেখে একটা কথা মনে হইল। তিনি মোটর গাড়ী, ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক বিস্তর বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন। আমরা অনেকে তাহা করি না। কিন্তু তিনিই যে সকল কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত হাজার হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশীব্রত পালন সম্ভব হইয়াছে। আবার তাঁহারই চেষ্টার ফলে আমরা দেশী লোহা ইস্পাত এবং তন্নির্ম্মিত দ্রব্যও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতী জিনিস ব্যবহার করেন বলিয়াই তাঁহাকে দেশের শত্রু বা স্বদেশীর বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি "স্বদেশী"র জন্য কি করিতেছেন তাহাও দেখা উচিত। অবশ্য সকলেই যদি বিলাতী বর্জ্জন ও দেশীদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, দুইটাই করেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়।

যাহা হউক, আমরা যদি মোটা কাপড় পরিতে রাজী হই, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি, এবং প্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা হইলে স্বদেশোৎপন্ন কাপড়ে সকলেরই লজ্জানিবারণ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

কিন্তু শীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা খারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে দেশজাত পশমে হাতের তাঁতে বোনা অল্প পরিমাণ গরমকাপড় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বেশীর ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা দেশী বলিয়া ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়াল, কানপুর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। ইহারা পশম আমদানী করেন প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে। সুতরাং

শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই আমাদিগকে পোষাক বিষয়ে খাঁটি স্বদেশী থাকিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে আর এক উপায় হইতে পারে। আমরা অনায়াসে তূলা-ভরা জামা ও পাজামা পরিতে পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় হয় না, এরূপ সুন্দর তূলাভরা জামা এবং পাজামাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাল্কা ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ আরাম।

আমাদের দেশে এখন সুন্দর সুন্দর ছুরী কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কোম্পানীদের কারখানায় যথাক্রমে কামান বন্দুকাদি অস্ত্রশস্ত্র, এবং রেল-গাড়ী চালাইবার এঞ্জিনাদি হইতেছে। কারীকর দেশী, সুতরাং ভারতে এ সবই হইতে পারে। তাতা মহাশয়ের লোহার খনির কাজ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে আমদানী লোহার পরিবর্ত্তে দেশী লোহা ইস্পাতও পাওয়া যাইবে। কিন্তু ছুরী কাঁচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির কারখানা আমাদের নিজের কখন হইবে?

বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ লবণ দামেও সস্তা এবং যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বিদেশী চিনি দেশী চিনি অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং দেখিতেও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। এইজন্য অনেকে বিদেশীই ব্যবহার করেন। যাঁহারা বেশী দাম দিয়াও দেশী চিনি খাইতে প্রস্তুত, দোকানদারেরা অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে লাভের আশায় দেশী বলিয়া বিদেশী চিনি দিয়া ঠকায়। কেবল গুড় খাওয়া একটা উপায় বটে; কিন্তু গুড়ও বিদেশ হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত করিয়া দেশী বলিয়া বিক্রী করিলে লাভ থাকে। যাঁহারা চিনি প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় জানেন তাঁহারা বলেন যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া কারখানা স্থাপন করিলে এবং দেশী লোকদ্বারা চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ তাহারা বেশী বেতন চায়) দামে বিদেশীর সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলে। এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানা আছে, তন্মধ্যে কানপুর ও সাজাহানপুর এবং বেহার প্রদেশের গুলি ইংরাজদের। কোটচাঁদপুরে একটি দেশী কারখানা আছে।

মোটকথা, কাপড়, চিনি, কিম্বা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জ্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল সস্তা জিনিষ উৎপাদনও করিতে হইবে। বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের আমরা পক্ষপাতী; কিন্তু উহাতেই আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা উচিত নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক একদিকে বলিতেছে যে বাঙ্গালী কেবল বকিতেছে ও বর্জ্জন করিতেছে কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই বাঙ্গা-লীর বকা ও বর্জ্জনের ফল ভোগ করিতেছে—দেশী জিনিষ প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া বদনামও হই-তেছে, এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের বাক্যের দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা লইয়া ধনবান্ হইতেছে, এ দৃশ্য বোধ হয় আমাদের পক্ষে প্রীতিকর বা গৌরবজনক নহে।

স্বদেশী ও বহিষ্কার।

"হা ধিক্! হা ধিক্! দেব, অদিতিপ্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল ভূমে,
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস!"
"বলহে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?" বৃত্রসংহার।

"Small islands, not capable of protecting themselves, are the proper objects for Kingdoms to take under their care; but there is something absurd in supposing a continent to be perpetually governed by an island."

Thomas Paine.

যাহার স্বদেশ আছে তাহারই পক্ষে স্বদেশী খাটে, স্বদেশী লইয়া মাতামাতি করিবার তাহারই অধিকার আছে। যাহার স্বদেশ বলিয়া দাবী করিবার কিছুই নাই, কোন ভূমিখণ্ডকে স্বদেশ বলিয়া দাবী করিতে গেলেই অমনি বিদেশী আসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া নাকের সম্মুখে তরবারি ঘুরায়, তাহার স্বদেশী—তাহা যতই কেন 'হনেষ্ট' হউক

না—কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় নিতান্ত অলীক। সুতরাং 'স্বরাজ' স্বদেশীর অপরিহার্য্য আশ্রয়। রাজনৈতিক শক্তি হাতে না থাকিলে যে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে বহুদূর যাইতে হয় না, ঘরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলে। যে পরিমাণে ইংরাজ এ দেশের রাজনৈতিক শক্তি হস্তগত করিয়াছে সেই পরিমাণে এ দেশের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে আমরা সেই নষ্ট রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়া পাইব, সেই পরিমাণে আমাদের নষ্ট শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার সাধিত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের স্বদেশী জয়যুক্ত হইবে। যাঁহারা আপনাদিগকে রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশী আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের যে সকল শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অবশ্য এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা বলিতেছেন, যে তোমরা এখনও কোন রাজনৈতিক অধিকারের উপযুক্ত হও নাই, সুতরাং তাহা পাইবে কিরূপে? তোমরা যে স্বরাজ চাও, আগে স্বরাজের উপযুক্ত হও! স্বরাজ পরিচালনে যে সকল নৈতিক গুণ প্রয়োজন তাহা আগে আয়ত্ত কর, তবে স্বরাজ দাবী করিও। ইহার অর্থ এই, যে পাখী আগে নির্ব্বাত প্রদেশে উড়িতে শিক্ষা করুক, তারপর তাহার প্রতি বায়ুমণ্ডলের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ পণ্ডিতদিগকেই লক্ষ্য করিয়া মেকলে বলিয়াছেন,—

"The maxim is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into water till he had learnt to swim. If men are to wait for *liberty* till they become wise and good in *slavery* they may indeed wait for ever."

ইঁহারা বুঝিতে পারেন না, যে দাসত্বে যদি মানুষ স্বাধীনতার উপযোগী গুণগ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হয়, তবে স্বাধীনতা ও দাসত্বে প্রভেদ কোথায়? কিন্তু সে কথা যাক্। আসল কথা এই, আমরা কি জগতে যে সমস্ত স্বাধীন জাতি আছে, নৈতিক ভাবে সকলের অপেক্ষাই হীন? যে ইংরাজ সেদিনও বুয়র যুদ্ধের সময় গির্জ্জায় গির্জ্জায় প্রার্থনা করিয়াছিল, "হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের অস্ত্রশস্ত্রকে আশীর্ব্বাদ কর" সেই ইংরাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ যদি ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় তবে বুঝিতে হইবে "নীতি ও নীতিহীনতা এই দুইএর পার্থক্যটা মানববুদ্ধির অতীত। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যে নৈতিক হিসাবে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা আমার গায়ের জুরি কথা নয়। পণ্ডিতপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার সমাজবিজ্ঞান পুস্তকে (Sociology) খৃষ্টীয় জাতিসকলের নৈতিক চরিত্র আমাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছেন—

"What a pity! these Heathens can not be induced to send missionaries among the Christians!"

বস্তুতঃ কথাটা এই, যে আমাদের স্বরাজের যোগ্যতা নাই তাহা নহে, কিন্তু ইংরাজের সে নৈতিক বল নাই, সে ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তা নাই, যাহার খাতিরে সে নিজের স্বার্থের হানি করিয়া আমাদের উপযুক্ততার বিচার করিতে পারে। এমন অনেক ভ্রান্ত লোক আছেন যাঁহারা বলিবেন, যে ইংরাজ স্বীয় ঔদার্য্যে দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, অনেক অর্থব্যয়ে দাসত্ব প্রথার ন্যায় মানবজাতির মহাকলঙ্ক জগত হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত বুঝিলে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না, তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে দাসত্ব প্রথার উন্মোচন ইংরাজের স্বাধীনতাপ্রীতি ও মহানুভবতার পরিচায়ক নহে। আমি এ কথা অস্বীকার করি না, যে ইংরাজ জাতির মধ্যে দুই চারিজন লোক এমন ছিলেন না বা এখনও নাই, যাঁহারা প্রকৃতই স্বাধীনতার উপাসক, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ জাতির মনের ভাবে (Sentiment) ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। এই তো সে দিন বেলফোর সাহেব ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িতদিগকে যে ইংলণ্ড আশ্রয় দান করেন এই কার্য্যটির উপর একটি তীব্র শ্লেষ করিলেন, এবং কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না। ইংরাজ চরিত্রের এই অবনতি সব দিকেই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমার কথা এই, দাসত্বপ্রথার উন্মূলনের মধ্যে স্বার্থ ছিল, পরার্থ বড় বেশী ছিল না। দু'চার জনের মহত্ব ছিল, সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার ভাগী সমগ্র ইংরাজ জাতি নহে। অথচ সমস্ত জাতিটা উদ্বুদ্ধ না হইলে এত বড় একটা ব্যাপক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা দু'চার জনের

মহত্ত্বের উপর নির্ভর করে না, এখানে সমগ্র ইংরাজ জাতির স্বার্থ জড়িত, সমগ্র ইংরাজ জাতির উদ্বোধন প্রয়োজন। সে উদ্বোধন স্বার্থে আঘাত না পড়িলে, পকেটে হাত না পড়িলে অসম্ভব, যেমন দাসত্ব প্রথার উন্মোচনের বেলায় হইয়াছিল। ইংরাজ যদি স্বাধীনতার সম্মান রক্ষার জন্যই এতটা মহত্ত্ব দেখাইয়া থাকিবে, তবে আজ স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া মাতা ও ভগিনীদিগকে পশুপালের ন্যায় কারারুদ্ধ করিতেছে কেন? একটু রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন বলিয়া মহাত্মা ব্রাইটের কন্যাকেও ইংরাজ আজ কারাগারে প্রেরণ করিতে কসুর করিতেছে না। আজ ইংলণ্ডে নারীজাতির প্রতি ইংরাজ যে ন্যায়বিগর্হিত ব্যবহার করিতেছে তাহা স্মরণ করিয়া কে আর বিশ্বাস করিবে যে ইংরাজ তাহার ব্যবসায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কোনও মহৎ কার্য্য করিতে সক্ষম। না, না; দোকানদারের হৃদয়ে ক্ষতিলাভগণনা ছাড়া কোনও মহৎ ভাব স্থান পাইতে পারে না! স্পেন্সার ক্রীতদাসদিগের মুক্তির যে দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার একটী পারলৌকিক, অনেকে পারত্রিক কল্যাণ কামনায় ব্যক্তিগত ভাবে দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রধান করিতেন,—"For the good of his soul or to make his peace with God"—বণিকবৃত্তি ষোল আনাই বিদ্যমান! দ্বিতীয় কারণটি ঐহিক এবং ব্যবসাদার জাতির জাতীয়ত্বের পূর্ণ পরিচায়ক, কড়াক্রান্তির হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। দাসদিগকে কেন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল? যে হেতু,—It was discovered that the labour of a bondman, whether slave or serf, was *unprofitable.* অর্থাৎ মজুরী পোষাইল না। আমরাও যদি মুক্তি চাই, ইংরাজকে বুঝাইতে হইবে, অবশ্য আবেদন নিবেদনের দ্বারা নহে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা, যে মুজুরী পোষাইল না, ভারত শাসনের খরচা পোষাইল না। আমরা যদি এই "unprofitable" এর যুক্তি আবিষ্কার করিতে পারি তবে অচিরে ইংরাজের স্বাধীনতাপ্রীতি গজাইবে, ন্যায়নিষ্ঠা জাগিবে। আমরা যদি এমন গণ্ডগোল—অবশ্য ভিক্ষার ঝুলির আন্দোলন নহে—উপস্থিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে ভারতশাসন আর ভারত-শোষণ নহে, ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হইলে উপনিবেশের সম্বন্ধের ন্যায় ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে হইবে, তবে অচিরাৎ ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের মুক্তির জন্য অনেক বক্সটন গ্রেনভিল্ শার্পের আবির্ভাব হইবে। কেন না, পকেটে হাত পড়িলেই ইংরাজের মনুষ্যত্ব খোলে। আমরা যদি হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত, গুজরাত হইতে আরাকান পর্য্যন্ত এমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে আমাদের স্বরাজের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আর ভারতশাসন সম্ভব নয়, তাহা হইলেই কেবল দোকানদার ইংরাজের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হইবে, ইতিপূর্ব্বে নহে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে ভারতশাসন যেন ইংরাজের পক্ষে শান্তিপূর্ণ না থাকে, অনায়াসসাধ্য না হয়। আর কিছুও যদি না পারি এটুকুও কি পারিব না?—

"ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে।"
"ষোল কোটী ভাই, ষোল কোটী বোন্
আমরা কি কেউ কম?"

হাতী নিজের দেহ না দেখিয়াই নিজেকে কম মনে করে, আমরা যদি আমাদের এই বিরাট দেহ নাড়া দিই তবে কি আর অত্যাচারীর অত্যাচার চলে? আমরা ঘুমাইয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ করিলাম,—

"ধিক্ লজ্জা! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর।
সুখে নিদ্রা যায় দৈত্য দেবে উপেক্ষিয়া—
স্বর্গবিরহিত দেব, চিন্তায় ব্যাকুল।"

তবে এস সকলে রাবণের চিতা জ্বালাইয়া দিই—

"জ্বলুক দেষের তেজ অমরা ঘেরিয়া
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায়;
দহুক দানব কুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা ঘোর চির শোকানলে।
চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেবসন্নিধানে,
হইবে অমর হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত।"

অমর কবির এই অমৃত ইঙ্গিত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, স্ববলে স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে, ইংরাজের মুখাপেক্ষা করিলে কোনই ফল হইবে না। তবে যে আমাদের উপযুক্ততার কথা উঠিয়াছে, তাহা আমাদের অযোগ্যতার নিদর্শন নহে কিন্তু যাঁহারা আমাদের নেতৃত্বের অভিমান করেন তাঁহাদিগের ভীরুতার ফল। ইঁহারা

আপনাদের অযোগ্যতা দেশের ঘাড়ে চাপাইতেছেন। ইঁহাদেরই কথা শুনিয়া দেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, এখন ইঁহারাই পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, দেশ প্রস্তুত নয়। দেশ প্রস্তুত নয়, তাহা নহে, কিন্তু ইঁহাদের কাপুরুষতা প্রতিপদে দেশের গতিরোধ করিতেছে। ইঁহারাই বিগত বিশবৎসর ধরিয়া শিক্ষা ও উপদেশের দ্বারা দেশকে রণক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, দেশ যে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদেরই কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল, কিন্তু ইঁহারা এখন রণক্ষেত্রে আসিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন। ইঁহাদের কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, যে যখন ইঁহারা সমরবাজনা বাজাইয়াছিলেন তখন এতটা মনে করেন নাই যে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিবে, ভাবিয়াছিলেন বক্তৃতাতেই ভারত উদ্ধার হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। কিন্তু রণভেরীর নিনাদ শুনিয়াই ইঁহারা বলিতেছেন,—

সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥

কিন্তু এখন পলাইলে চলিবে কেন? দেশ এখন আর ছাড়িবে না। অধ্যক্ষ কেয়ার্ড (Principal Caird) বলিয়াছেন,—

"When a nation's spirit has been so quelled by despotism that it has long ceased to resist, it is in no condition to discover the hopelessness of its bondage; but when the spirit of freedom rises and the attempt is made in vain to throw off the hateful yoke, it is then that in the mortifying sense of abortive effort, it finds in its bitter experience a measure of the power that enthrals it."

আমাদের তথাকথিত নেতারা দেশের বন্ধনের কঠোরতা ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া মোচনের যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে আর এখন কুলাইতেছে না, তাই তাঁহারা পলাইবার আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু দেশ যে "উঠ্‌বো মোরা, উঠ্‌বো মোরা, বিধির আদেশ বাণী" বলিয়া হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া সকল বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য দণ্ডায়মান, ইহা দেখিয়া নেতারা ভয় পাইতেছেন, তাঁহাদের শক্তিতে কুলাইতেছে না, তাই তাঁহারা উল্টা সুর ধরিয়াছেন। আমরা কিন্তু জীবনসংগ্রামে পলায়নপর প্রত্যেক মানুষের কাছে ভগবানের যে আদেশবাণী প্রতিনিয়ত আসিতেছে সেই বাণী স্মরণ করিয়া নেতাদিগকে সাহস অবলম্বন করিতে বলিতেছি—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্মগমপার্থ নৈতং ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

ইহাতেও যদি নেতাদের ঘুম না ভাঙ্গে, তবুও যদি ইঁহারা বায়ুর গতি নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে দেশ নিশ্চয়ই তাঁহাদের নেতৃত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে, কোন বাধা মানিবে না। দেশের প্রকৃত নেতা তখন কার্য্যক্ষেত্রেই প্রস্তুত হইবে। আর যদি নেতা নাই মেলে, তবে কি দেশ এই ভাবে পড়িয়াই থাকিবে? না, তা হবে না,—

"নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরও বহুযুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির অন্ধকারে?"

এ ব্যবস্থা কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাই,—

"চলহে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া,
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগ কাল,
যুদ্ধের অনন্ত বহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে।"

দেশে যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা হইতে কাহারও নিস্তার নাই। দেশে discontent (অসন্তোষ) নাই বলিয়া পার্লামেণ্ট শান্ত হইলেই দেশ শান্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। যাঁহারা ভাবেন যে এই স্বদেশী সংগ্রাম কেবল ভাত কাপড়ের কথা তাঁহারা মনে রাখিবেন, "Man doth not live by bread alone." আবার যাঁহারা স্বদেশীকে বহিষ্কার হইতে অথবা রাজনৈতিক বহিষ্কারকে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বহিষ্কার হইতে পৃথক করিয়া মনে করেন যে কেল্লা ফতে করিয়াছি, শ্যাম ও কুল দুই রাখিয়াছি তাঁহারা অজ্ঞ কি অসরল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে যে তাঁহারা একেবারে অনভিজ্ঞ তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। বিদেশী দ্রব্য দেশ হইতে বহিষ্কার না করিয়া নিরক্ষর জনমণ্ডলীকে স্বদেশী দ্রব্য কিনিবার উপদেশ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, একটা উৎকট আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে এমন আহাম্মকের অসদ্ভাব নাই বলিয়াই তো লর্ড মিণ্টো বাহাদুর বহিষ্কারী

দিগকে 'অসৎ' বলিয়াও নিরাপদে ঘরে ফিরিয়াছেন। অন্যদেশ হইলে পোষাক ধোবাবাড়ী না দিয়া গৃহে ফিরিতেন না*। দেশী লাল চিনি বিদেশী পরিষ্কার বিট্‌চিনির সঙ্গে তাহার দেড়গুণ দরে বিক্রী হইতে অনুমতি করিরা দেশী চিনি কিনিতে লোক সকলকে অনুরোধ করার ন্যায় একটা অসঙ্গত ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। লোককে যখন স্বার্থত্যাগ করিতে বলা হয়, তখন ত্যাগের হেতু প্রদর্শন করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এখানে ত্যাগের যে যুক্তি দেখান হইবে তাহার বলে এত বড় মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। জনসাধারণের দয়াবৃত্তি বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি কোন দেশেই এখনও এরূপ তীক্ষ্ণ হয় নাই, যে পরের দুঃখ নিবারণের কথা ভাবিয়া বা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের উপকার হইবে এই চিন্তা করিয়া হাতের সম্মুখে পাইয়া দেড়গুণদরে নিকৃষ্ট জিনিষ কিনিবে। এরূপ আশা করাই বাতুলতা মাত্র। পশ্চাৎদিক্ হইতে একটা ভাবের বন্যা বহাইতে না পারিলে একার্য্য সাধিত হইতে পারে না। আমরা বহুদিন হইতে স্বদেশী স্বদেশী করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ভাব জাগে নাই। এবার যে স্রোত খরবেগে বহিয়াছে, তাহার কারণ এই বহিষ্কারের বন্যা। একটা দারুণ উত্তেজনা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে দৃঢ় করিয়াছে। এ উত্তেজনা তুলিয়া লইলে আমাদের স্বদেশীও উঠিয়া যাইবে। সুতরাং স্বদেশী রাখিতে হইলে বহিষ্কার অপরিহার্য্য। বিলাতী দ্রব্য দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে, স্বদেশী এক দণ্ডও তিষ্ঠিবে না। আবার যাঁহারা ঝেরিয়া mountএ কর্জ্জন বাহাদুরের নিকট Exploitation ও Administration এর অঙ্গাঙ্গী ভাবের Sermon শুনিয়াছেন তাঁহারা কি করিয়া বাণিজ্যবহিষ্কার হইতে রাজনৈতিক বহিষ্কারকে পৃথক করিতে উৎসাহী হইবেন? ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতশাসনযন্ত্রের যে সম্বন্ধ তাহাতে বাণিজ্যকে রাজনীতি হইতে পৃথক করা একেবারেই সম্ভব নহে। আমরা যে পরিমাণে স্বদেশীতে মনোযোগ করিতেছি, সরকারের বিদেশী অনুরাগ সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে, সরকার রাজ্যরক্ষা অপেক্ষা বাণিজ্য রক্ষার দিকে বেশী মনোনিবেশ করিতেছেন। লোকের মনে সুশাসনের একটা ভ্রান্ত সংস্কারই যে ইংরাজের ভারত-রাজত্বের একমাত্র স্তম্ভ, বাণিজ্যের অনিষ্টের একটা যৎকিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইতে না হইতেই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ইংরাজ রেগুলেশন লাঠির আঘাতে সেই স্তম্ভই ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহা দেখিয়াও যদি আমরা বাণিজ্যকে রাজনীতি হইতে পৃথক ভাবিতে পারি তবে আমাদের মত হস্তীমুর্খ আর দুনিয়ায় মিলিবে না। আসল কথা এই একটা উচ্চ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের জড়তা যাইতে পারে না, আর কিছুতেই আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিতে পারে না। আমরা যে স্বরাজের আদর্শে এত মাতিয়া উঠিয়াছি ইহা তাহারই অন্যতম প্রমাণ। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" তো কত শুনিয়াছি, কিন্তু কই এ জাতি তো ইতিপূর্ব্বে শরীর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে নাই। যেই ইহার পশ্চাতে রাজনৈতিক আদর্শ যুক্ত হইয়াছে অমনি আখ্‌ড়ায় আখ্‌ড়ায় দেশ ছাইয়া পড়িতেছে। যদি পতিতকে উদ্ধার করিতে চাও, যদি তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাও, তবে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না। তাহার সম্মুখে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার দ্বার খুলিয়া দাও, সে আপনিই আপনার সংস্থান করিয়া লইবে। যদি স্বদেশীর সফলতা চাও, তবে স্বরাজের আদর্শ লইয়া বাহির হও, বহিষ্কার মন্ত্রবলে সিদ্ধিলাভ করিবেই করিবে। সর্ব্ব বিভাগে বহিষ্কার চালাইতে পারিলে, রামনামে যেমন ভূত পলায়, দেশের সকল উপদ্রবের শান্তি হইবে। এখন দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের যে অবস্থা তাহাতে বহিষ্কার ছাড়া অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনে অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এখনকার মত বহিষ্কার অনলই যথেষ্ট। এই আগুনেই এখন ভারতের রাজনৈতিক গগন জ্বলিয়া উঠুক, সূচনাতেই যখন ইংরাজ ভীত হইয়াছে, তখন আর কিছু করিতে পারি আর না পারি, তার অদৃষ্টের যদি এতই জোর থাকে, এটুকু তো হবে,—

"ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে।"

যে বহিষ্কার আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল রোগের ভেষজ্ স্বরূপ (Panacea for all evils) তাহার বিরুদ্ধে সময়ে অসময়ে কতকগুলি আপত্তির অবতারণা করা হয়,

* "He must have been pelted with rotten eggs."

তাহার অধিকাংশই ভীরুতা ও স্বার্থপরতা প্রণোদিত। সুতরাং সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহার দুইটী আপত্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ যুক্তির বিড়ম্বনা আছে বলিয়া মনে হয়। তাহাদের বিচার না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানির সম্ভাবনা, তাই সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। প্রথম আপত্তিটি এই যে বহিষ্কার অর্থনীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। যে জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায় তাহা না কিনিয়া অধিক মূল্যের জিনিষ কিনিলে পরিণামে লোকসান ছাড়া লাভ হইতে পারে না। সস্তায় জিনিষ পাওয়ার অর্থ ঐ জিনিষটি প্রস্তুত করিতে কম অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং কম অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার জন্য বেশী ব্যয় মূর্খতা মাত্র। বিলাতী কাপড় ক্রয় করিলে যদি ৩০কোটী টাকা খরচ করিয়াই চলে তবে তার জন্য ৫০ কোটী টাকা খরচ করা অন্যায়, কেন না, এই ২০ কোটী টাকার পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম বৃথায় নষ্ট হইল। উহা অন্য ক্ষেত্রে খাটাইলে পরিণামে বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা। কথাটা নির্ঘাত সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে কয়েকটি 'কিন্তু' আছে। প্রথম 'কিন্তু' এই যে যদি ১০ বছর কিছু বেশী অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া চিরকালের জন্য ৩০ কোটীকে ১৫ কোটীতে নামাইয়া আনা যায় তাহা হইলে পরিণামে লোকসান না হইয়া লাভ হইল। কাপড়ের ব্যবসায়ে আমাদের সে লাভের কেবল সম্ভাবনা নহে নিশ্চয়তা রহিয়াছে। আমাদের দেশে শ্রম ইংলণ্ড অপেক্ষা বহুগুণে সস্তা। তার উপর বিলাতী কাপড় এ দেশে আসিতে জাহাজ ভাড়া লাগে। অধিকন্তু যদি তূলা দেশে জন্মাইতে পারি তবে তো সোণায় সোহাগা, এখন বিলাতী যে কাপড় যে দরে কিনি, দেশের কাপড় তখন তার সিকি দরে পাওয়া যাইবে। আর এটা কেবল একটা প্রথম পরীক্ষা (experiment) নহে। এক সময় ছিল ভারত পৃথিবীর কাপড় যোগাইত, কিন্তু ইংরাজের অত্যাচারে তাহা নষ্ট হইয়াছে। আমাদিগকে তাহার পুনরুদ্ধার মাত্র করিতে হইবে। সে নষ্টোদ্ধার বহিষ্কার ব্যতীত সম্ভব নয়। বাজারে বিলাতী কাপড় থাকিতে আমাদের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। রাজশক্তি হাতে থাকিলে সকল দেশে যাহা হয় ও হইতেছে আমরাও তাহা করিতে পারিতাম। বিলাতী কাপড়ের উপর কর বসাইয়া দেশী শিল্পের রক্ষা করিতাম। রাজস্বার্থ আমাদের বিরোধী, সুতরাং প্রজাশক্তির দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিতে হইবে। বহিষ্কার সেই সাধন-প্রণালী। ইহা প্রজামণ্ডলীর স্বপ্রতিষ্ঠিত কর এবং স্বরাজের প্রথম অভিব্যক্তি। Protective tariff যখন আমাদের শক্তির অতীত, তখন consumers' leagueই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। ভারতের অবস্থায় এই protection এবং experiment যে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিরোধী নহে, তাহা অর্থনীতিবিদ্ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন,—

"A protecting duty, continued for a reasonable time, will sometimes be the least inconvenient mode in which the nation can tax itself for the support of such an experiment."

আমাদের যে শুধু experiment নয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন আর সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই যে বহিষ্কার অর্থনীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে কি আমরা বহিষ্কার ছাড়িতাম? কখনই না। যদি বাণিজ্যনৈতিক বহিষ্কারের দ্বারা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তবে তাহা নিশ্চয়ই অবলম্বনীয়। অর্থনীতিবেত্তা ও রাজনীতিতত্বজ্ঞ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়াও এই উপদেশ দান করিয়াছেন,—

"The Protectionist doctrine finds support in some particular cases which involve the interests of national subsistence and of national defence."

তারপর ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতেই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন,—

"The Navigation Laws were probably, tho' economically disadvantageous, politically expedient."

ভারতবাসী জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হইয়াছে। বহিষ্কার জাতীয়জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আপত্তি থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যুদ্ধে যেমন কোটী কোটী টাকা বৃথা ব্যয় হয় এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে অর্থনীতির দোহাই দিয়া দেশকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবে? আমাদের দেশ



কবিতাসুন্দরী।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

শত্রু দ্বারা আক্রান্ত এবং আমরাও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি—"যুদ্ধের অনন্তবহ্নি জ্বালাও অম্বরে," বহিষ্কার আমাদের অস্ত্র। অর্থই মানবের একমাত্র সম্পদ নহে, আরও সম্পদ্ আছে। মনুষ্যত্ব লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সব উপায় মাত্র।

এই খানেই সুতরাং ধর্ম্মনীতির ভিত্তি হইতে দ্বিতীয় আপত্তিটি উঠিতেছে। তাই যদি হয় তবে বিশ্বপ্রেমের বিরোধী বহিষ্কার অবলম্বন করিতেছ কেন? বিশ্বপ্রেম কি মনুষ্যত্বের অন্তর্গত নহে? বিশ্বপ্রেম মনুষ্যত্বের অন্তর্গত ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু যাহার স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি নাই, তাহার বিশ্বপ্রীতি প্রবঞ্চনা মাত্র, ইহা আরও সত্য কথা। তবে যার স্বদেশপ্রীতি আছে তার বিশ্বপ্রীতি নাও থাকিতে পারে, তার স্বদেশপ্রেম তাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। সেইজন্য প্রশ্নটির বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না, যাহা মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করে তাহা কখনও গ্রহণীয় নহে। কিন্তু "All that glitters is not gold." ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বহিষ্কার উপায়, উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বাবস্থাতেই বিশ্বপ্রেমের বিরোধী হইত। অবশ্য বাণিজ্য-নৈতিক বহিষ্কারের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কোন সংঘর্ষ নাই, কেন না, কাপড় বা নুনের সঙ্গে কোন মানুষের প্রেমের আদান প্রদান হয় না। এখানে একটা কথা স্বতঃই আসিতেছে, বিশ্বপ্রেম আদান প্রদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, শুধু আদান বা প্রদান নহে। যেখানে আদান প্রদান দুই নাই, সেখানে আর যাই থাকুক প্রেমের সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, উদ্দেশ্য এক হইলেও উপায় বিভিন্ন হইতে পারে। যাহা এক অবস্থায় ব্যবস্থা, অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাহাই অব্যবস্থা হইয়া পড়ে। যে বিষ স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের বিনাশক, বিকারের রোগীর তাহাই অমৃত, শরীর রক্ষার একমাত্র উপায়। উদ্দেশ্য যদিও শরীর রক্ষা, তবুও একই বস্তু অবস্থাভেদে শরীরের পক্ষে বিষ ও অমৃত। এই সত্যটি মনে রাখিয়া একবার মানবসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। সমাজশরীরেও অনেক রোগ রহিয়াছে এবং তাহারও চিকিৎসা প্রয়োজন। বাত পিত্ত কফের বৈষম্যে যেমন শারীরিক রোগের উৎপত্তি, মানবসমাজের বৈষম্যে তেমনই বিশ্বপ্রেমের বিপত্তি; যেহেতু, প্রেমের আদান প্রদানে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সাম্য চাই, উভয়ের সমপদবীস্থ হওয়া চাই, নহিলে প্রেম হইল না। এখন যদি ইউরোপ ও এসিয়ার কথা বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইউরোপের শ্বেতজাতি সকল এসিয়াকে এমন নিম্ন পদবীস্থ মনে করিতেছে যাহাতে তাহার পক্ষে এসিয়াবাসীকে প্রেম করা অসম্ভব। মানুষ যেমন অরণ্যবাসী পশুদিগকে প্রেম করিতে পারে না, শুক্লজাতিগণও তেমনই শুক্লেতর বর্ণের জাতি সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। মানুষ যেমন বনের পশুদিগকে তাড়াইয়া, হত্যা করিয়া অরণ্যে নগর বসায় এবং সে নগরে পশু প্রবেশ করিলে তাহাকে হত্যা করে বা তাড়াইয়া দেয়, ইউরোপও এসিয়া সম্বন্ধে তাই করিতেছে। শ্বেতকায়গণ এসিয়ার সর্ব্বত্র লুটপাট্ করিয়া বেড়াইবে, কোন বাধা মানিবে না, কিন্তু আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিয়ায় যাও, কালিফর্ণীয়াতে যাও, এসিয়াবাসীকে কুকুর বিড়ালের ন্যায় তাড়াইয়া দিবে। শ্বেতকায়গণ এসিয়াবাসীকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। এরূপ স্থলে বিশ্বপ্রেমের নিশান লইয়া এসিয়ার পক্ষে ইউরোপকে প্রেম করিতে যাওয়া কি "খামাখা গৌরাঙ্গ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়" এর মত বাতুলতা নহে? ইউরোপের মদান্ধতা দেখিয়া আমরা তাহাকে পশু মনে করিতেছি, আমাদের শক্তিহীনতা দেখিয়া ইউরোপ আমাদিগকে পশু মনে করিতেছে, এরূপ স্থলে প্রেমের কথা উত্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইউরোপ যে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মানুষের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে এই মদান্ধতা হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে বিশ্বমানবের পরিত্রাণ নাই, বিশ্বপ্রেম চিরদিন ভিত্তিহীন থাকিবে। ইউরোপেরও পশুত্ব ঘুচিবে না। এসিয়া তাহার প্রাচীন সভ্যতা, উন্নত নীতি ও ধর্ম্মের দ্বারা ইউরোপের চিকিৎসা করিতে পারে বটে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে পূর্ণতা দিতে পারে বটে, কিন্তু ইউরোপ প্রভু, এসিয়া দাস। প্রভু দাসের কাছে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে না, কেহ কখনও শুনে না। একবার আমেরিকার একটী সভায় একজন বাঙ্গালী নেশা করার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে একজন মার্কিন রমণী তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে এই বলিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন যে একজন ভারতবাসী তাহাদিগকে উপদেশ দেয় ইহা

অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? অর্থাৎ অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বৃদ্ধা পলিতকেশা সর্ব্বোচ্চ-ধর্ম্মমণ্ডিতা ভারতজননীর কাছে উপদেশ লইতে অর্ব্বাচীন আমেরিকা কুণ্ঠিতা, কেন না, ভারতমাতা পশুবলে তাহার নিকট হীনা। সুতরাং ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা ইউরোপের অজ্ঞানান্ধকার দূরের চেষ্টা বৃথা। চিকিৎসা দুই প্রকারে হয়—ঔষধপ্রয়োগ ও অস্ত্রাঘাত। ঔষধে না সারিলে অস্ত্রাঘাত অবশ্য করণীয়। সুস্থশরীরে অস্ত্রাঘাত প্রেম-বিরোধী, অসুস্থ শরীরে না করাই প্রেমবিরোধী। স্বাভাবিক শরীরে বিষ দেওয়া অন্যায়, কিন্তু বিকারগ্রস্ত সন্তানকে মা নিজহস্তেই বিষ দেন, তাহা মাতৃত্বের বিরোধী নহে। এসিয়াবাসী শ্বেতকায়গণের হস্তে যে ব্যবহার পাইতেছে তাহাতে যদি সমগ্র এসিয়াবাসী আজ প্রতিজ্ঞা করে এবং সে প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মবুদ্ধিতে পালন করে যে সমস্ত শ্বেতপুরুষকে পদাঘাতে এসিয়া হইতে দূর করিয়া দিবে তাহা হইলে কিছুই অন্যায় হয় না। ইহা প্রতিহিংসা নহে, কেন না, ইউরোপের মদান্ধতা, তাহার ঐশ্বর্য্যবিকার নিবারণের অন্য ঔষধ নাই, অন্য উপায় নাই। ইহাতে কেবল এসিয়ার কল্যাণ নহে, ইউরোপেরও সমূহ কল্যাণ, বিশ্বমানবের কল্যাণ। এ কথা ঠিক যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা ছাড়া বিশ্বমানব পূর্ণতা লাভ করিবে না। এ কথা আরও ঠিক, প্রাচ্য সভ্যতায় এমন সকল অমূল্যরত্ন আছে যাহা গ্রহণ না করিলে বিশ্বমানব অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইউরোপ এক উদ্দাম রাজ্য-ও-ধন-পিপাসায় মত্ত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কলুষিত করিতেছে। এ পিপাসা দমন না হইলে সভ্যতাসূর্য্য মেঘমুক্ত হইবে না, করদানে জগৎকে উপকৃত করিবে না। ইউরোপীয় সভ্যতার কল্যাণের জন্যই এই পিপাসা দমন অত্যাবশ্যক কিন্তু আঘাত না পাইলে এ পিপাসা দমন হইবে না। এ জগতের কল্যাণের জন্য এসিয়াকে এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এবং এই আঘাত দিবার শক্তি লাভ করিলেই প্রাচ্য সভ্যতা জগতের গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বিশ্বমানবের যে অনন্ত উন্নতিস্রোত শ্বেতকায়গণের ঐশ্বর্য্যমদান্ধতারূপ শিলাখণ্ডে আটকাইয়া গিয়াছে, জননী এসিয়াকে তাহা পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া সে স্রোতের মুখ খুলিয়া দিতে হইবে। সে জন্য এসিয়াবাসীও যে মানুষ, শুক্লজাতি সকলের নিকট সর্ব্বাগ্রে প্রতিপন্ন করিতে হইবে। পদাঘাত ছাড়া অন্য যুক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না। দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। জাপানের সভ্যতা, তাহার ধর্ম্ম ও নীতি, এখনও যাহা, ত্রিশবছর পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। কিন্তু জাপানবাসী দশবছর পূর্ব্বেও "Little monkeys of the Far East" ছিল। ইউরোপীয়গণের চক্ষে পশুবল-গর্ব্বজনিত অজ্ঞানতার ছানি এমন পুরু হইয়া পড়িয়া গিয়াছে যে তাহারা দেখিতেই পায় না, ইউরোপের বাহিরে আবার সভ্যতা আছে, খৃষ্টধর্ম্মের বাহিরে আবার ধর্ম্মনীতি আছে। এ অজ্ঞানতা কিছুতেই গেল না, একটা পদাঘাতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। কিন্তু যেই জাপান পদাঘাতে যাহার ভয়ে বিগত পঁচিশ বছর ইউরোপ থরহরি কম্পিত ছিল সেই রুষ ভল্লুককে ভূতলশায়ী করিয়াছে, অমনি ছানি খসিয়া পড়িয়াছে, জাপানের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতি সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছে। ইহাতে জাপান যে কেবল সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইল তাহা নহে, বিশ্বমানবের উন্নতির এক অধ্যায় জগতের চক্ষের নিকট উদ্ভাসিত হইল। যুদ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় বিশ্বপ্রেমের পক্ষে বিষ। কিন্তু রুষ-জাপযুদ্ধ বিশ্বপ্রেমের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। আজ ঐ "Little monkey" গণের সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য মদগর্ব্বিত ইউরোপ লালায়িত, পদাঘাতে প্রেম উদ্বুদ্ধ। সুতরাং এ পদাঘাত প্রেমবিরোধী নহে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে প্রাচ্য সভ্যতার কথা বলিয়াছি, ভারত সে সভ্যতার একমাত্র না হইলেও সর্ব্বপ্রধান আকর। সুতরাং বিশ্বমানবের চিরকল্যাণের জন্য ভারতকে জাপানের পদবী লাভ করা কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সে কল্যাণসাধনের জন্য ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। কিন্তু ভারতের অবস্থা কি? ভারতবাসী যে মানুষ জগৎ তাহা স্বীকার করিতেছে না। এরূপ স্থলে ভারতের পক্ষে তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য (God-appointed Mission) সাধন একেবারেই অসম্ভব। দাসীর কাছে কেহ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে না! সেই জন্যই ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা বিধাতার বিধান রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা যদি বিধাতার বিধান না হয় তবে বিধান কি জানি না। এবং সেই জন্যই ভিক্ষালব্ধ স্বরাজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। জগৎকে বিলো-

ড়িত করিয়া আত্মশক্তির মহিমায় স্বরাজ উদ্ধার করিতে হইবে। রাজনৈতিক বহিষ্কার স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র। ইংরাজ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে না। তাহাকে আঘাত করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে যে আমরা মানুষ, আমাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে হইবে। বিষপ্রয়োগ ছাড়া ইংরাজের বিকার ঘুচিবে না। এই বহিষ্কারের বিষবড়ি অজ্ঞান ইংরাজকে সজ্ঞান করিবে। এখন ইংরাজের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। খাদ্য যদি খাদকের সঙ্গে প্রেম করিতে যায় তবে তাহার পক্ষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া উদরে স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক! তবে খাদক যে সময়ে সময়ে খাদ্যের প্রতি সুমিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে তাহা প্রেম নহে! মানবসন্তান যে মৎস্যকুল বিনষ্ট হইল বলিয়া সময় সময় আক্ষেপ করে এবং "গুপ্ত"-কমিশন বসাইয়া মৎস্যকুল রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করে, তাহাতে কি মৎস্যজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়? তবে ইংলণ্ডে দু'চার জন নিরামিষাশী নাই তাহা বলিতেছি না এবং তাহাদের দৃষ্টি যে কখন কখন ভারতের মৎস্যদের উপর পড়ে না তাহাও নহে। তবে সে দৃষ্টি প্রেমদৃষ্টি নহে, কৃপাদৃষ্টি, অনুকম্পা। কিন্তু কবি বলেন, "অনুগ্রহ ক'রে এই ক'রো, অনুগ্রহ ক'রো না আমায়"। যদিও সময়ে সময়ে "our fellow-subjects" সাম্যের মধুরধ্বনি করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই "under our rule in India" সে প্রেমের ভাক্তত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়। সাম্যের আসনে না উঠিলে প্রেম আসিতে পারে না। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পারে, যদি ভারত ইংলণ্ডের সমপদবী লাভ করে। সেই জন্যই ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন, এ বহিষ্কার সেই স্বরাজ সাধনের পূর্ব্ব মুখ। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা বলিয়াছি ইংরাজ তাহার এক বিরাট প্রতিভূ। দুঃখের বিষয় ইংরাজ আপনার সে মহা কর্ত্তব্য ভুলিয়া পরপীড়নে ও পরস্বাপহরণে এত ব্যস্ত যে আমরা তাহার সৎগুণ অনুকরণে একেবারে অসমর্থ। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আপনার দীপ্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অন্যদিকে আবার ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া ইংরাজ আপনার শ্রেষ্ঠতারূপ গর্ব্বের উচ্চশিখরে এমন ভাবে আসীন যে, তাহার চক্ষে ভারতের মিথ্যাবাদিতা ছাড়া আর কিছুই পড়িতেছে না। সে ভারতমাতার পার্থিব সম্পদ্ আহরণে এত মনোযোগী যে আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে নজর দিবার তাহার অবকাশই নাই। ভারতমাতার পার্থিব দৈন্য তাহাকে আরও অন্ধ করিয়াছে। অথচ এ দুয়ের সম্মিলন ছাড়া জগতের কল্যাণ নাই। এই সম্মিলনের অন্তরায় আমাদের রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা ও ইংরাজের অন্ধতা। ইংরাজের চোখ ফুটাইতে হইলে আমাদিগকে শক্তিলাভ করিতে হইবে। শক্ত আঘাত না পাইলে ইংরাজের চোখ খুলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বার্থে আঘাত না পড়িলে ইংরাজের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিবে না। সেই আঘাতের আয়োজন বহিষ্কার, পরিণতি স্বরাজে। ভারত স্বীয় শক্তিবলে স্বরাজ লাভ করিলেই ইংলণ্ডের মদান্ধতা ঘুচিবে, ভারতেরও জগৎকে স্বীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বিতরণের যোগ্যতা ও অধিকার জন্মিবে এবং বিশ্বমানব চরিতার্থতা লাভ করিবে। যেদিক্ দিয়াই বিচার করি, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দায়িত্বের কথাই বলি, আর ভারতের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের কথাই ভাবি, অথবা সমগ্র মানবজাতির দিকেই তাকাই, বহিষ্কার অমৃতবার্ত্তা শুনাইতেছে। সুতরাং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ইউরোপীয় জাতি সকলের পররাজ্যপিপাসার ন্যায় জাতীয় স্বার্থপ্রসূত নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবেই হইবে, বিধাতার বিধান প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য এ জগতে কাহারও নাই। তাই বলি ভারতবাসী ভাই হিন্দু মুসলমান, স্বরাজের জন্য প্রস্তুত হও, স্বরাজের নিশান লইয়া অগ্রসর হও, বিজয়লক্ষ্মী তোমাকে বরণ করিবার জন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান, জয় তোমারই। ইহার পরও যদি কেহ বলিতে চান যে বহিষ্কার বিশ্বপ্রেম বিরোধী, তবে বলি ভাই তুমি আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্লান্ত হইতেছ, বিশ্বপ্রেমের নামে অবান্তর মনঃকল্পিত ছায়ার অনুসরণ করিতেছে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে তোমার বিশ্বপ্রেম abstract cosmopolitanism, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিশ্বপ্রেম নহে। ওটা বিশ্বপ্রেম নহে, ভিত্তিহীন বিশ্বপ্রেমের ধূম্না মাত্র।

এতক্ষণ বহিষ্কারের দার্শনিক ভিত্তির অনুসন্ধান করা গেল, এখন সামাজিক বহিষ্কার বা ব্রহ্মদণ্ডের দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা যাক্। বুদ্ধদেব যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জনৈক শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা স্বমতে আনিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা এখন সকলেই অবগত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহনও যে ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হয় তো সকলে অবগত নহেন। যাঁহার হৃদয়তন্ত্রী সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে এমন এক সুরে বাঁধা ছিল যে ইতালীর দুঃসংবাদে তিনি শয্যাশায়ী হইতেন এবং স্পেনের সুসংবাদে টাউনহলে আনন্দোৎসব করিতেন তিনিও বহিষ্কারকে বিশ্বপ্রেমের বিরোধী মনে করিতেন না। তিনিও এক শিষ্যের কোন অপরাধের জন্য তাহার উপর ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। পরিশেষে শিষ্য স্বীয় দোষ সংশোধন করিয়া গুরুর সঙ্গে মিলিত হন। কেহ অত্যাচরিত আইরিশ জাতির বিপক্ষতাচরণ করিলে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিতেন। তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে Reform Bill ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে ইংরাজের সঙ্গে সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যাইয়া বাস করিবেন। এমন কি এই উপলক্ষে ইংরাজ বন্ধুদের সঙ্গে পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। * কিন্তু যখন বিল পাশ হইল, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পত্র লিখিলেন, "*We* have succeeded in the reform question"। হৃদয়টা সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে এমনই একীভূত যে ইংলণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহার মনুষ্যত্বের পথ খুলিয়া গেল, দেখিয়া বিশ্বপ্রতিনিধি বাঙ্গালী রামমোহন নিজেকে উপকৃত মনে করিতেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বপ্রেমিক থাকিতে পারেন, কিন্তু এমন অর্ব্বাচীন কেহ নাই, যে বলিবে শাক্যসিংহ বা রামমোহনের মধ্যে বিশ্বপ্রেম ছিল না, আমাদের বিশ্বপ্রেমিকেরাও নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

* এইখানে চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।—লেখক।

হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি।

আজ আমাদের কি অশুভ দিন, কি দুঃসময়ই না উপস্থিত! আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে, একই দেশে, একই আব্‌হাওয়ার উপভোগের আস্বাদনে এবং একই সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে, হিন্দু মোসলমান আমরা একত্র এক সঙ্গে, বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। এই সাত শত বৎসরের সম্মিলনপ্রভাবে, প্রকৃতিগত সখ্য ও সাম্যবন্ধনের যে যে স্থায়ী কারণ তাহাও ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্বে এ দেশের রাজপাট নামেমাত্র মোসলমানদিগের হস্তগত ছিল, কিন্তু রাজত্ব রক্ষার যে সকল কার্য্য, তাহার অধিকাংশই হিন্দুদিগের আয়ত্তাধীন ছিল। তৎপর প্রায় দেড় শত বৎসর যাবৎ ইংরেজ রাজের রাজত্ব হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু মোসলমান আমরা একই অবস্থাপন্ন হইয়া একই দাসত্ব-শৃঙ্খলে, সুখে দুঃখে জড়ীভূতভাবে কোন মতে জীবন কাটাইয়া আসিতেছি। এখন দেশের মধ্যে দশ জনের নিকট, এবং রাজদরবারের মধ্যে রাজপুরুষদিগের নিকট, সুধু হিন্দুর সুখসুবিধা অথবা কেবলই মোসলমানের সুখসুবিধা বলিয়া পৃথক একটা কিছু জিনিস নাই; পৃথক কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। নৈসর্গিক কোন ঘটনাতেও তেমন কোন পৃথক পৃথক সুখসুবিধা কাহাকেও বিতরণ করিতেছে না। যেমন রাজবিধির একই বিধানে হিন্দু মোসলমান একই প্রকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিগত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম আদিও তেমনি বিধাতা হিন্দু মোসলমানকে সমানভাবে বিতরণ করিতেছেন। বিধাতা হিন্দুকে অপবিত্র কাফের ভাবিয়া তাহাদের বাড়ীতে রৌদ্রের প্রখর তাপ এবং মোসলমানকে প্রিয়পাত্র জানিয়া তাহাদের উপর অমৃতবর্ষণ করিতেছেন না। সুদীর্ঘকালের সম্মিলনবশতঃ হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অধুনা একটা স্থায়ী আত্মীয়তার ভাব পরস্পরের প্রাণে প্রাণে এমনি করিয়া জড়িত হইতেছিল যে, সে ভাব অতি মধুর অতীব আনন্দপ্রদ! সেই আনন্দপ্রদ প্রীতিবন্ধনের দরুণ হিন্দুকে মোসলমান এবং মোসলমানকে হিন্দু সাহায্য করিয়া

আসিতেছিল। মোসলমানের মান ইজ্জত হিন্দু রক্ষা করিয়া আসিতেছে আর হিন্দুরও ইজ্জত লুবয়ত মোসলমান-গণ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সুমধুর অমৃতযোগের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা দেখিয়া আমরা অতীব পুলাকিত হইয়াছিলাম; আমাদের আজীবন কঠোর চেষ্টা, উদ্যম এবং কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া জীবনকে সার্থক ভাবিতেছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ কতিপয় উদ্দৃপ্ত লোকের কুকাণ্ডময় ঘটনায় আমাদের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দোদুল্যমান আশা-লতিকার মাথায় ঘোরতর বজ্রাঘাত হইয়াছে। কুক্ষণে কুমিল্লার কুকাণ্ড-সংঘটন-বার্ত্তা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে; কুক্ষণে মগড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতির কুসংবাদ আমাদের নিকট ঘোষিত হইয়াছে; প্রাণের বিষম মর্ম্ম-বেদনার মধ্যে আবার জামালপুরের ভীষণ দুর্ঘটনার কথায় আমাদিগকে একেবারে গভীর বিষাদে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে!! এই কথা লিখিতে লিখিতে সিরাজগঞ্জের ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া প্রাণ মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে!! হায়! কি ভাবিলাম, আর কি হইল! কি দশা হইতে চলিল! কোন্ যাদুমন্ত্রবলে অসম্মিলনের বিষম বিষ সমস্ত বঙ্গ ও ভারত যুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল? কোন্ চক্রীর চক্রান্তপ্রভাবে হঠাৎ এই ভীষণ কালানল আজ এমনি করিয়া দাউ দাউ জলিয়া উঠিল!! হে ঈশ্বর! তুমি জান, তুমিই অবগত আছ, এই অবস্থার মধ্যে ভারতের ভাবী দশার কি হইবে?

পূর্ব্বে পুঁথিপুস্তকে পাঠ করিতাম যে, মোসলমানগণ হিন্দুদিগের আরাধ্য দেবতার প্রতিমা আদি বিধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুগণের কুলমহিলাদিগের মান ইজ্জতের প্রতি মোসলমানগণ অযথা আক্রমণ করিয়া বিশ্ব কলঙ্কিত করিয়াছে; এ কথা অনেক স্থলেই বিশ্বাস করিতাম না; অনেক স্থলেই বলিতাম যে, মোসলমানের শত্রুপক্ষীয়গণ উহার মিছামিছি একটা রটনা করিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ এই সভ্যতাভব্যতার দিব্য আলোকপ্রভা এবং উদার সাম্যবাদমতাবলম্বী ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের উন্নত সুশাসনের ঢক্কানিনাদের মধ্যে যাহা কখনও কল্পনা জল্পনাতেও উদয় হয় নাই, সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতরে আজ মোসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুপরিবারের লাঞ্ছনা এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমানাশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, জানিয়া শুনিয়া আমরা আজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের চিত্ত মন কম্পিত হইতেছে; ভাল লোকের নিকট আমাদের আর উত্তর দান সরিতেছে না!! আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না যে, এ আবার কোন্ সুলতান মাহমুদ গজনভী, বা কোন্ মহাম্মদ ঘোরি, অথবা কোন্ এক ইসা খাঁ কালা পাহাড়ের আমল উপস্থিত হইল! আর কোন্ বা পীর পয়গাম্বর জাহেদিনের আবির্ভাবে জেহাদের এমন ভয়ঙ্কর উগ্রভাব আবার ধরাতলে দেখা দিতে চলিল!!

মানুষ ধর্ম্ম লইয়া আছে, মানুষ ধর্ম্মকে বড় ভাল বাসে; প্রাণ যায় যাউক কিন্তু ধর্ম্মের অবমাননা এবং পরিবারের লাঞ্ছনা কোন জীবন্ত মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না। জামাল-পুর এবং কুমিল্লার ঘটনায় হিন্দুভ্রাতাগণের অন্তর আত্মায় কি যে বিষম ভীষণ আঘাৎ লাগিয়াছে। তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যে এক নিদারুণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা আর অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সাধ্য নাই যে, আজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্রে সংহার করিলে, কিম্বা কালসর্পে দংশন করিলে কোনই ক্ষোভ জন্মিত না; কিন্তু যে নিদারুণ বিষে তাহাদের মর্ম্মস্থল আজি জর্জ্জরিত করিতেছে, তাহার বুঝি ঔষধ নাই, বুঝিবা তাহার আর শান্তি নাই! একটী পুরুষে নয়, দুইটী পুরুষে নয়, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে কিন্তু এই কালান্তক বিষ অতি তীব্রতর হইয়া উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, গঙ্গা যমুনার ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, আর দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত অতি বিপন্ন হিন্দু মোসলমান জাতিদ্বয়কে ঘোর রসাতলে বুঝি বা নিমজ্জিত করিবে! বিগত বৎসর এমনি দিনে, এমনি সময়ে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষের দুরাবস্থার মধ্যে, যে হিন্দুগণ ক্ষুধাতুর মোসলমানগণকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া উপকার করিয়াছিল, যে হিন্দুগণ মোসল-মানগণের শেষ সময়ে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও মোসলমানের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, সেই হিন্দুগণের প্রতি, সেই মোসলমান জাতি, এবার হঠাৎ যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া উঠিয়াছে, তাহা

অকথ্য এবং অসহনীয়! পৃথিবীতে এমন কোন হৃদয়হীন লোক নাই, যে ব্যক্তি এই সকল কুকার্য্যের সমর্থন করিতে পারে, এমন কোন শিক্ষিত ভদ্র মোসলমান এস্‌লাম-সমাজে নাই যে, এমন সকল কুকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারে। এই সকল অতীবগর্হিতকার্য্যের পিছনে কোন ভাল মোসলমানের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। এই সমস্ত কার্য্যের দরুণ আমরা অতীব মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছি; সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। এস্‌লাম-শাস্ত্রের এমন কোন বিধান নাই যে, অনর্থক কাহারও মনে অযথা পীড়া দেওয়া হয় এবং নিরর্থক একটা মারামারী ঘটায়। হিন্দু কিম্বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে এদেশে এখন আর ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ করা যাইতে পারে না। কোরাণ হাদিম মতে এদেশের হিন্দুদিগকেও আর কাফের বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহারা নামাজ রোজা করিতে হজ্জ করিতে ও জাকাত দিতে মোসলমানদিগের প্রতিবন্ধক জন্মায় না, মোসলমানদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেও বাধা দেয় না। কোর্ব্বাণী করিতেও হিন্দুদিগের কোন আপত্তি নাই। ছাগ, দুম্বা, উট দ্বারা কোর্ব্বাণী করিতে যথা তথা তাহাদের নিকট অবারিত দ্বার। কেবল হিন্দু পল্লী ও হিন্দু দেবমন্দিরের সন্নিকটে হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচরে গোহত্যা করিতে তাহাদের মাত্র আপত্তি বটে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোর্ব্বাণী করাও মোসলমানদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ ফরজ কর্ম্ম নহে। কোর্ব্বাণী না করিলে মোসলমানী নষ্ট হয় না। আর কোর্ব্বাণী করিবার জন্য আরব দেশে—এমন কি পবিত্র মক্কা মদিনার মধ্যেও—নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন যথাতথা কোর্ব্বাণী দেওয়া যাইতে পারে না। হিন্দু ভ্রাতৃগণ একথা যেন মনে করেন না যে, মোসলমান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার ও উদ্দীপ্ত বিদ্বেষময়। প্রকৃত প্রস্তাবে এস্লামধর্ম্মের মত এবং ভাব অতীব উদার ও অতীব অমায়িক। সুতরাং আমরা সুশিক্ষিত হিন্দুভ্রাতাগণকে আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের উদারতার দিকে আকর্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাই আজ আমরা অতিশয় মর্ম্মবেদনার সহিত সমগ্র ভারতের হিন্দুগণের সমীপে আমাদের অন্তরের বিভোর সমবেদনা ও সহানুভূতি ও জ্ঞাপন করিতেছি; নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের কতিপয় অজ্ঞান-উদ্দৃপ্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের সমগ্র মোসলমান জাতিকে দেশের এই দুঃসময়ের মধ্যে অবিশ্বাস করিবেন না, এই দুঃসময়ের মধ্যে মোসলমানদিগকে খল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন না। অবশ্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই একথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, এই সকল কার্য্য কখনই একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন মোসলমানগণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না; মোসলমানগণ দ্বারাও এই সকল ভেদবুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি-পরায়ণ রাজপুরুষগণ চিরকাল কৌশল খাটাইয়া এ দেশকে যে নীতিবলে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতিবলেই আজ "বিলাতিপণ্য বাণিজ্যরক্ষা" ও "স্বদেশী" দলন এবং "পার্টিসন" সুদৃঢ় করণ উদ্দেশ্যে মেড়ায় পাঁঠায় লাগাইয়া দিয়া একগুলিতে তিন শিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাই বলি হে ভেদনীতিপরায়ণ রাজনীতিজ্ঞগণ! আপনারা দুর্ব্বল অক্ষম চব্বিশ কোটি হিন্দুকে লাঠি ধরিতে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা এই স্বদেশীভাবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি উত্তম কার্য্যই হইয়াছে। এতদিন পরে অতি উত্তম ও প্রকৃত পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী সামরিকজাতিতে পরিণত হইবেক, আর অন্ততঃ পক্ষে দশ কোটি ভারতরমণী উগ্রা চামুণ্ডার বেশে রণরঙ্গে নৃত্য করিতে বাধ্য হইবে, ইহা ভাবিতেও কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, কাহার না চিত্ত মনে আশার উচ্ছ্বাস উথলিয়া ওঠে। ফলতঃ ঈশ্বর বুঝি দুর্ব্বল বাঙ্গালিকে চিরকলঙ্ক হইতে বিমোচন করিবার জন্যই এই অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতেছেন, বিধাতার স্বর্গীয় বরেই বুঝি সকলেই ভারতময় সাড়া দিয়া দাঁড়াইতে বসিয়াছে! তাই যাহা ঘটিতেছে, বুঝিবা তাহার জন্য পরিতাপ করিবার কিছু নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে মঙ্গলঘটনার নিমিত্তই মঙ্গলময় এই বিপদরাশি আনয়ন করিয়াছেন! কিন্তু তথাপি আমরা আশা করি, তথাপি আমরা অনুনয় বিনয়সহকারে আজ হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়-ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি, যাহাতে অতি শীঘ্র এই

দাবানল প্রশমিত হয়, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করি। নচেৎ আমাদের সাধের "স্বদেশী" অকালে মারা পড়িবে, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে কণ্টক পড়িবে। তাই আসুন আমরা জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করি, বাদবিষম্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক হইয়া যাই।

আবদুল হামিদ্ খান্ ইউসফজী,
সেক্রেটারী, ...সাধারণ সম্মিলন, টাঙ্গাইল।

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। রিয়াজ-উস্-সালাতিন শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, মালদহনিবাসী গোলাম হোসেন কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় রচিত বঙ্গ ইতিহাসের এই অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাম হোসেন্ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক; কাজেই তিনি নিজের জ্ঞানে, এবং দু এক পুরুষ পূর্ব্বের কথা গল্পচ্ছলে শুনিয়াও অনেক যথার্থ ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। সিয়ারউল মতক্ষরীন্ প্রণেতা প্রায় রিয়াজ প্রণেতার সমসাময়িক লোক। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মালদহের আর একজন মুসলমান এই রিয়াজ অবলম্বন করিয়া খুর্সিদ-জহান্-নামা রচনা করিয়াছিলেন; তাহার নাম ইলাহি বক্স। বেভারিজ সাহেব ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বৃদ্ধ ইলাহি বক্সের নিকট হইতে তাঁহার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহার অংশবিশেষ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সোসাইটির কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, যে আবদুল করিম্ নামে রিয়াজপ্রণেতার এক শিষ্য ছিলেন, এবং ঐ আবদুল করিম্ ইলাহি বক্সের শিক্ষক ছিলেন। এইরূপে মালদহে ইতিহাস লিখিবার একটা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছিল। ইলাহি বক্সের গ্রন্থে তৎসাময়িক মালদহ এবং কলিকাতার যে বর্ণনা আছে, তাহা সুপাঠ্য। রিয়াজঅনুবাদককে ইলাহি বক্সের গ্রন্থের ঐ অংশটুকুর অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস গঠিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল উপাদান সংগৃহীত হওয়া উচিত। রিয়াজ পড়িয়া মনে হইল যে রামপ্রাণ বাবু এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়।

২। আহ্নিকতত্ত্বমালা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত। যাঁহারা নিত্যকর্ম্মের জন্য মন্ত্রতন্ত্র মানেন এ গ্রন্থ যে তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানের মন্ত্রই সংকলিত হইয়াছে। যাঁহারা এ সকল বিধি নিত্য কর্ম্মের জন্য গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের নিকটেও এ প্রকার সংগ্রহ খুব আদৃত হইতে পারে; কিন্তু সে প্রকার ভাবে সর্ব্বশ্রেণীর নিকট আদৃত করাইতে হইলে, কেবল মন্ত্র বা শ্লোক শুনিয়া লিখিয়া দিলে চলে না, কোন গ্রন্থের কোন অংশ হইতে উহা সংকলিত তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া চাই। এই সংগ্রহে অনেক উদ্ভট রচনার শ্লোকও প্রাচীন গ্রন্থের মন্ত্রের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়াছে।

৩। রাজা রামমোহন রায়—জীবনচরিত—শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত, মূল্য ॥০। গ্রন্থখানির ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল, দামও অল্প। গ্রন্থখানি তেমন বড় নয়, কিন্তু রাজার জীবনের প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে এবং সরল ভাবে লিখিত হইয়াছে।

৪। হরিমঙ্গল (পদ্যগ্রন্থ)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক সংকলিত। গ্রন্থকার কেবল পরের কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নয়; সুকবি তাঁহার নিজের কয়েকটি সুরচিত পদ্যও এই গ্রন্থে দিয়াছেন। এখানি বালকদিগের শিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই হরিমঙ্গল পড়িয়া দেবপ্রীতি বিকাশ করিবার সহায়তা পাইতে পারেন।

৫। চীনদেশে সন্তান চুরি;—শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। একবার হিন্দিভাষায় রচিত একখানি চীন দেশের সুরচিত বিবরণ সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে গ্রন্থখানি চীনপ্রবাসী একজন পঞ্জাবী ডাক্তারের রচনা, একখানিও চীনপ্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তারের রচনা। গ্রন্থকার; প্রবাসী এবং নব্যভারতের পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত; Modern Review পত্রেও চীন দেশের কথা ইনি লিখিয়াছেন। অতি প্রাচীন সভ্যতায় গৌরবান্বিত চীনদেশের বিবরণ পড়িতে আমরা যথেষ্ট উৎসুক; কাজেই এই সকল গ্রন্থ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি।

৬। নব্যবাঙ্গালীর কর্ত্তব্য—শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। আমাদের কর্ম্মনিষ্ঠতা নাই, সুসংস্কৃত বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সাহস নাই: কেবল বক্তৃতা করিতে পারি। গ্রন্থকার সেই সকল কথাই এ গ্রন্থে বিশেষ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে নিজের জীবনের কয়েকটি কথাও সবিনয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি শৈশবকাল হইতেই যে গ্রন্থকার এই সকল সদ্ভাব পোষণ করিতেছিলেন, সমালোচক নিজে তাহার সাক্ষী।

৭। বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—চতুর্থ খণ্ড। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড প্রবাসীতে সমালোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডও পূর্ব্ব খণ্ডগুলির মত সুসম্পাদিত হইয়াছে। এখণ্ডে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লেখক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং একালের খ্যাতিযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের জীবন কথা বিস্তৃত ভাবে আছে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, যে এ প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। আশা করি ইহার মধ্যেও এ গ্রন্থ যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে।

৮। দুর্ব্বা (পদ্যগ্রন্থ)—সাহিত্যসেবক-রচয়িতা শিবরতন মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করি, যে তিনি এ প্রকার কবিতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার সুগৃহীত ব্রতই ভাল করিয়া উদ্যাপন করুন।

৯, ১০ ও ১১। শ্রীরাজ মোহন রায় কবীন্দ্র রচিত, আশা ও কল্পনা, ভারতভিক্ষা এবং চারু। ইহার কোনখানিতেই চারুতা নাই। "কা কা রব আর করিস্‌নে বায়স,—হৃদয় আমার কাঁপিয়া ওঠে," এ রকম কবিতা লিখিয়াও রায়মহাশয় আপনাকে কবীন্দ্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। "আশা ও কল্পনা" পড়িয়া কবির কোন ভবিষ্যতের আশা আছে তাহাও কল্পনা করিতে পারিলাম না। 'ভারতভিক্ষা' হেম বাবুর রচনা পাঠের অজীর্ণ-উদ্গার।

১২ ১৩। সুকন্যাচরিত (পদ্য)—দেবী ভাগবত হইতে সঙ্কলিত সতীচিত্র, শ্রীবলরাম দাস গুপ্ত প্রণীত লেখা ভাল; তবে প্রোল্লসিত, কিমাশ্চর্য্য প্রভৃতি পদ পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার প্রণীত সান্ত্বনাখানি ভাল হয় নাই।

১৪। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ—কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

১৫। সংসার চক্র—৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬। দেহাত্মিক তত্ত্ব—ডাক্তার সাহা প্রণীত।

QUEEN LOUISE

BY RICHTER.

Doubtless this picture is known to many of our readers. It is the portrait of that beautiful Queen of Prussia, to whose reiterated entreaties for her country. Napoleon Bonaparte is said to have been first deaf, then half-humorous, and last of all abrupt, in his refusal. The so called "insult" offered by him to Queen Louise in the beginning of the century, was diligently kept in mind by those who desired to stir up war with France, and had no little part in bringing about the terrible revenge of 1870. For Queen Louise was the mother of the old "Grey Kaiser" William, who was the fisrt Emperor of United Germany, and she has become a kind of patron saint in the new German tradition.

We see her here, attired for the state banquet of Napoleon's reception, in what is known as an "Empire" gown, from the fact that it represents the fashion that characterised the Napoleonic Court. As a type of a noble and beautiful woman, a queen full of love of people and country, strong amidst reverse, sweet and patient under poverty, it deserves long study. The absence of all jewels save crown and wedding ring marks the moment as one of national desolation. The lofty brow shows intellect, even as the ermine cloak bespeaks the ceremonial occasion. But the clear forth-shining eyes, and the face, with its gravity and innocence, tell that this woman, seated amongst kings, and and guardian of a nation's vows, was none the less of peerless womanhood, full of purity and modesty and incorruptible simplicity, possessed of the mind of a statesman, and the heart of a child.

চিত্র-পরিচয়।

রিক্‌টার অঙ্কিত রাণী লুই। ইনি প্রুশিয়ার রূপলাবণ্যময়ী রাণী; যুক্ত-জর্ম্মণীর প্রথম সম্রাট প্রজাপূজ্য কৈসর উইলিয়মের জননী। সাম্রাজ্য-লোলুপ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যখন দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন, তখন রাণী লুই আপনার দেশ রক্ষার জন্য নেপোলিয়নের নিকটে বহু অনুনয়প্রার্থনা করেন। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ বধির, পরে শ্লেষবর্ষী এবং অবশেষে অকস্মাৎ অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হয়েন।

নেপোলিয়ন প্রুশিয়া জয় করিয়াছেন। বিজয়ীর দৃপ্ত অভিমান সান্ত্বনা করিবার জন্য অভিনন্দন-অভ্যর্থনার উৎসব আয়োজন হইয়াছে। অত্যাচারের উপর অপমান সংযোগ; রাণী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিত্রে রাণীর সেই অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে।*

রাণী নেপোলিয়নের দরবারের দস্তুর মত পরিচ্ছদ-পরিহিতা। মহীয়সী সুন্দরী মহিলা, প্রজা ও দেশপ্রীতিপূর্ণপ্রাণা রাণী, বিপদে অচলা, দারিদ্র্যে ধৈর্য্যশীলা মধুময়ী, আমাদের সযত্নপ্রণিধানযোগ্যা। মুকুট ও বিবাহের অঙ্গুরী ব্যতীত সকল রত্নাভরণের অভাব জাতীয় দুর্দ্দিন জ্ঞাপন করিতেছে। প্রতিভাদীপ্ত উন্নত ললাট, স্বচ্ছ উজ্জ্বল দৃষ্টি, সরল গম্ভীর মুখ, আমাদিগকে যেন মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে এই যে মহিলা নৃপতিবৃন্দ পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, ইনি অসাধারণ স্ত্রীলোক, ইনি একটি জাতির রক্ষয়িত্রী দেবী, পবিত্রতা শালীনতা ও সরলতাময়ী, এবং ইঁহার মন রাজনীতিবিশারদের মত ও হৃদয় শিশুর ন্যায়।

* জর্ম্মণেরা এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে বিস্মৃত হয় নাই। ১৮৭০ সালের ফরাসী বিজয়ে তাহাদের বহুপোষিত প্রতিহিংসা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল।

মা।

কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে।
বছর ক'টি হল গত
যেন কোটি যুগের মত;
যুগ যুগান্ত যেন অন্ত কত চিন্তার গোলে।
ছেলে বেলার কথা তোমার,
জাগ্‌ছে মনের মাঝে আবার;
তুই ছিলি তোর সোণার মত, জানাই তা কি বোলে।
তেম্‌নি বরণ, তেম্‌নি গড়ন্‌,
তেম্‌নি হাসি তেম্‌নি ধরন;
আয় রে সোনা মাণিক দিয়ে পূরাই বুকের খোলে।
ঘরে দোরে তোমার মায়া
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছায়া,
ওঠে কেঁপে বুক্‌টা চেপে তোমার কথা হোলে।
তোমারি সে খেলার ঘরে
খেল্‌না আছে শিশুর তরে;
আঙ্গিনাতে দোল্‌না তোমার, আপন মনে দোলে।
আলো পেয়ে সাজ্‌ল ধরা,
ফুল ফুটেছে বাগান ভরা;
তোমার হাসি ভালবাসা কেউ কি হেথা ভোলে?
ছাড়িয়ে আমার বক্ষ-সীমা
সুখে ছিলে তুমি কি মা?
থাক্‌ সে কথা; দুঃখ ব্যথা দূরে গেছে চ'লে।
আজকে শোয়া-বসা মানা;
কাঁধে তুলে চাঁদের ছানা
জ্যোছ্‌না দিয়ে গা ভেজাবো, প্রাণটা যাবে গ'লে।
কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির মধ্যে রাণী লুইর ছবি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা অন্যত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

গত বৎসর বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সময় পুলিশ যেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারই একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া "নির্যাতিতে আশীর্ব্বাদ" নামক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহ নামক একটি যুবক মার খাইতে খাইতে জলে পড়িয়া গিয়াও "বন্দেমাতরম্" বলিতে ছাড়েন নাই। ঊর্দ্ধে সিংহবাহিনী দেশমাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইহাই ছবির বিষয়। শিল্পনৈপুণ্যে ইহার তাদৃশ উৎকর্ষ না থাকিলেও জাতীয় ভাবব্যঞ্জক বলিয়া ইহা মুদ্রিত হইল।

কংসবধের পর "শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক পিতামাতার কারা-মোচন" রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। ইহাতে মাতৃস্নেহ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবকী সস্নেহে কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিতেছেন। কৃষ্ণ বিষাদপূর্ণ দৃষ্টির সহিত অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পিতামাতার পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিতেছেন। বলরাম পিতা বাসুদেবকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

"কবিতা-সুন্দরী" বহরমপুরের চিত্রকর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ পাল কর্তৃক অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একখানি পুস্তকের জন্য এই ছবিটি আঁকাইয়া প্রবাসীতে ছাপিতে দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ছবিখানির পশ্চাৎ-দৃশ্য সুন্দর হইয়াছে। কবিতা দেবীর ছবিরও বাহ্যসৌন্দর্য্য আছে। কবিতার গভীর ও উচ্চ ভাব প্রকাশ করা বোধ হয় এই চিত্রের উদ্দেশ্য নহে। প্রিয়নাথ বাবু নিজেই এই চিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছেন:—

আসিলে কি মনোরমে হৃদয় মাঝারে?
বাজাও বাজাও বীণা, মানস-কাননে
গাহিয়া উঠুক পাখী; মধুর ঝঙ্কারে
ফুটিয়া উঠুক ফুল আনন্দ-পবনে।
সজনি লো, তোরে আমি করিয়াছি চির-
জীবনসঙ্গিনী মোর; তুমি যেন মোরে
ফেলিয়া যেওনা একা, চঞ্চল অধীর,
এ মধু যৌবন-জ্যোৎস্না-যামিনীর-ভোরে।
নীলবাসে ঢাকা তনু, কণ্ঠে ফুলহার,
ভালে স্বর্ণটিপ, উড়ে মোহন চিকুর,
খচিত কোমল করে কঙ্কণ সোণার,
অলক্ত রঞ্জিত পদে শোভিছে নূপুর।
ঢল ঢল আঁখি দুটি, অধরেতে হাসি,
ওইরূপ চিত্তে মোর থাকুক বিকাশি'।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে কাব্যের বাহ্যসৌন্দর্য্যই চিত্রের বিষয়ীভূত।

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটে অবস্থিত মূল মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীসংখ্যা ৫০০।



৺ মাতাজী মহারাণী।

তদ্ভিন্ন ১৬টি শাখা পাঠশালা আছে। এই সকল পাঠশালায় বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজারূপ হিন্দুধর্ম্মের নিম্নাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন গৃহকর্ম্ম এবং সামান্য লেখাপড়া শিখান হয়। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এতই কম যে যতই সামান্য হউক যে কেহ স্ত্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তিনিই দেশের মহৎ উপকারী বন্ধু। মাতাজী মহারাণী হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝিতেন, আমরা তাহা বুঝি না। স্ত্রীশিক্ষার তাঁহার যে আদর্শ ছিল, আমাদের আদর্শও তাহা হইতে

কিছু ভিন্ন। এরূপ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মতভেদ থাকাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি রাজবংশ-সম্ভূতা ও বিদুষী হইয়া স্বজাতির সেবায় ও উন্নতিকল্পে নিজের ধন, বিদ্যা ও শক্তি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আত্মোৎসর্গ পূজনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে যাহা ঘটিয়াছে, সকলেই সংবাদপত্রে তাহার বিষয় পড়িয়াছেন। আমাদের হৃদয় এই ঘটনায় সাতিশয় বিষাদভারাক্রান্ত হইয়াছে। হায়! কবে আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইবে? কবে সকলে দেশের ও জাতির মঙ্গল বুঝিবে? কবে "ধর্ম্ম-" বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা দূর হইবে? যে সকল বদ্‌মায়েস এই পৈশাচিক কাণ্ড করিতেছে, তাহাদের উত্তেজনার কারণ কি? কে তাহাদের মন্ত্রণাদাতা, কে তাহাদের উত্তেজক? এই কাণ্ডের জন্য সমুদয় মুসলমান সমাজকে দায়ী করা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, সাধুচরিত্র, স্বদেশপ্রেমিক লোক আছেন। স্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশীবর্জ্জনকে ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ সমুদয় বঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু তাঁতি অপেক্ষা মুসলমান তাঁতির সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনে তাহাদের অধিক লাভ। যে জামালপুরে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানেই হিন্দু তাঁতির সংখ্যা (১৯০১ সালের সেন্সস্ অনুসারে) ৩৫৫, এবং মুসলমান তাঁতির সংখ্যা ১১১০। বিদেশীবর্জ্জনের জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর বিলাতী জিনিষবিক্রেতাদের ক্ষতি হইবার কথা। সুতরাং কেবল মুসলমানদেরই উত্তেজিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ এমন কথা কেহই বলেন নাই, এবং এমন চেষ্টাও কেহ করেন নাই, যে কেবল মুসলমান দোকানদারদের দোকানে বিলাতী জিনিষের বিক্রয়ই বন্ধ হউক ও হিন্দুর দোকানের বিলাতী জিনিষ বিক্রী হইতে থাকুক। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যায় অধিক। সুতরাং হিন্দু কর্তৃক তথায় মুসলমানের উৎপীড়ন বিশ্বাস-যোগ্য নহে। বিদেশী জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিবার জন্য যদি কোথাও দোকানদারদের উপর জুলুম হইয়া থাকে, তাহা অন্যায় হইয়াছে, এবং তাহা বন্ধ করা উচিত; কিন্তু জুলুম হইয়া থাকিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই উপর হইয়াছে। তবে মুসলমানেরা অধিক উত্তেজনাপ্রবণ বলিয়া যদি ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা কতকটা দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইতেও পারে। কিন্তু এরূপ দোকানদার কয়জনই বা আছে, যে তাহাদের জন্য একটা দেশব্যাপী অশান্তির আবির্ভাব হইবে? তা ছাড়া বিদেশীবর্জ্জনের আন্দোলন ত পশ্চিমবঙ্গেও হইতেছে। সেখানে ত হিন্দু মুসলমানের বিবাদ হইতেছে না। তা ছাড়া, ভারতবাসী ইংরাজদের সংবাদপত্রে এই বলিয়া বিদ্রূপ বরাবর করা হইতেছে যে বিদেশীবর্জ্জন পণ্ডশ্রম মাত্র; ও চেষ্টা ব্যর্থ, নিষ্ফল হইয়াছে। আবার কিন্তু ঐ কাগজগুলাই বলিতেছে যে বিদেশীবর্জ্জন আন্দোলনে মুসলমান দোকানদারদের ক্ষতি হওয়ায় তাহারা ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু যদি বিদেশীবর্জ্জন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি কেমন করিয়া হইল? সত্যবাদী শ্বেতসম্পাদকগণ বলুন, তাঁহাদের কোন্ কথাটা সত্য। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে প্রভেদ আছে; আমাদের বিবেচনায় এই প্রভেদগুলিই দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে স্বদেশী ও বিদেশীবর্জ্জন খুব বেশী জীবন্ত ভাবে চলিতেছে। বঙ্গের দ্বিখণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনও তথায় অধিকতর প্রবল। গবর্ণমেন্ট ফুলার সাহেবের আমলে নিজের তরফ হইতে অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গকে জব্দ করিতে পারেন নাই। তাই এখন ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বাধাইতেছেন। গবর্ণমেন্টের প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘি ঢালিবার ও বাতাস দিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি ধনী মুসলমান আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ধনী দেশশত্রু মুসলমান কেহ নাই।

এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেকে আহত এবং দু একজন হতও হইয়াছেন। অনেকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে। এ সকলই দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ সকলই বরং সহ্য হইতে পারে। কিন্তু নারীগণের উপর অত্যাচার সহ্য হয় না। যে দেশে যাহার দ্বারাই এরূপ অত্যাচার হউক না কেন, শুনিলেও শরীরের রক্ত ফুটিতে থাকে। ইহার প্রতীকার সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। কিন্তু কলম দিয়া কাগজে আঁচড় কাটিয়া কি ফল? বাঙ্গালী হিন্দুধর্ম্মের বড়াই ও নারীর সতীত্বের বড়াই করে, কিন্তু ধর্ম্মের ও নারীর সম্মান রক্ষার্থ

কাহারও ত প্রাণ গেল না। সাত্বিকতার অর্থ কাপুরুষতা নহে। যে কাপুরুষ, সে কোন ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বত্র বালক যুবা বৃদ্ধ শরীর ও মন দৃঢ় করিতে এবং আত্মরক্ষা ও উৎপীড়িতের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে শিখুন। অন্য অস্ত্র নাই ; কিন্তু লাঠি আছে। বাঙ্গালীর মা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত হউন। কত বঙ্গনারী ডাকাইতের সঙ্গে যুঝিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিরোধী হইবেন, আমাদিগকে বিদ্রোহী বলিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী বলিলেই আমরা অধার্ম্মিক হইয়া যাইব না। এবং যদি আমরা বিদ্রোহী হই, তাহাও গবর্ণমেণ্টেরই দোষ।

এখন গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষকে দলন করিবার জন্য গুণ্ডামির প্রশ্রয় দিতেছেন। কিন্তু সরকারের জানা উচিত যে সামান্য কারণেই এই গুণ্ডারা গবর্ণমেণ্টেরও বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। গবর্ণমেণ্টের আরও একটা কথা ভাবা উচিত। সরকার আমাদিগকে নিজের আইন আদেশ মান্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণে বধ ও সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারেন; অরাজকতা উপস্থিত করিয়া আমাদের পরিবারবর্গের ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন করিয়া তুলিতে পারেন। ইহার বেশী কিছু করিতে পারেন না। কিন্তু আমরা এরূপ বিপদে ও কষ্টে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায় ভয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

আমাদেরও একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। ইংরাজেরা পুণ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে না। টাকার জন্য করিতেছে। আমাদের দেশে বাণিজ্য করিয়া ইংরাজ ধনী হইয়াছে। এই বাণিজ্যে হাত দিলে ইংরাজ সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন দ্বারা আমাদিগকে স্বদেশসেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং এখন আমাদিগকে প্রাণপণ করিতে হইবে। অনেকে প্রথমে বোধ হয় ভাবেন নাই যে এতটা হইবে। কিন্তু

"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

এখন পশ্চাতে তাকাইলে হইবে না। অগ্রসর হও।

জামালপুরের কাণ্ডকে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া মনে করা উচিত নয়। কিন্তু সরকারী কোন কোন কর্ম্মচারী এবং কোন কোন মুসলমান এইটাকে জাতিবিবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান লোকেরা চেষ্টা করুন যাহাতে ঝগড়ার কারণ সকল অন্তর্হিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবের বিস্তার না হইলে সকল কারণ দূরীভূত হইবে না। ইহা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের প্রীতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই জন্য এই বিষয়ে যথাসাধ্য মন দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা সকলে মনে রাখিবেন যে কোন পক্ষই অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পোষণ করিলে চলিবে না। কোন পক্ষই এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে অপর পক্ষ আমাদের প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। প্রীতি সমানে সমানে হয়, ছোট ও বড়র মধ্যে অনুগ্রাহক অনুগৃহীতের ভাবমাত্র আসিতে পারে। সুতরাং প্রীতি স্থাপন করিতে হইলে কাহাকেও খাট হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। কেবল এই টুকু চাই যে কেহ কাহারও ন্যায় সঙ্গত অধিকারে হাত দিবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে অপরের মনে কষ্ট না দিবার জন্য, নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতে স্থলবিশেষে ক্ষান্ত থাকিবেন।

লাহোরের "পঞ্জাবী"র মালিক ও সম্পাদকের জেল হইয়াছে এই অপরাধে যে তাঁহারা ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিতে চেষ্টা করিতেছেন। দুনিয়া বড় মজার জায়গা। ইংরাজ ভারতবাসীকে খুন করিলে বেকসুর খালাস পায়, বা দু পাঁচ টাকা জরিমানা দেয় কিম্বা বড় জোর সামান্য কারাদণ্ড হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষের আগুনে জল ঢালেন, আর এই কথাগুলা বলিলেই আগুনে ঘি ঢালা হয়! যাহা হউক, আশা করি এখন সম্পাদক ও মালিক জেলে যাওয়ায় ভারতবাসী ইংরাজকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইংরাজেরা প্রায়ই অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে তাঁহারা তরবারির দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তরবারির দ্বারাই স্বাধিকারে রাখিতেছেন এবং পরেও রাখিবেন। মানিয়া লইলাম ইহা সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি ইহা সত্য

হয়, তাহা হইলে আমাদের ভালবাসা ও "রাজভক্তি" (loyalty) পাইতে চাও কেন? খুব তলোয়ার চালাও; তাহা হইলেই হইবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশবশক্তি প্রয়োগে ভালবাসা ও ভক্তি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বোধ হয় তাহা নয়; ইংরাজ এত বোকা নয়। বোধ হয় ইংরাজের অভিধানে রাজভক্তি মানে ভীরুতা, কাপুরুষতা ও প্রভুর পদলেহন। কারণ এই গুণগুলি পাশববলে উৎপন্ন হইতে পারে।

মোট কথা এই—প্রজারঞ্জন ব্যতীত রাজভক্তি অসম্ভব; অস্ত্র আইন থাকিতে, সৈনিক বিভাগে শাদা কালো, বিচারে শাদা কালো, চাকরীতে শাদা কালো, রেল গাড়ীতে শাদা কালোর প্রভেদ থাকিতে রাজভক্তি অসম্ভব। যদি কথায় কথায় ধমক দিয়া তরবারি দ্বারা ভারতবর্ষ জয়ের কথা তুল, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক যে সে তরবারিটা আমাদেরও, না কেবল ইংরাজের, আমাদের পক্ষে অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক যে আমাদের কোথাও আঁস্তাকুড়ে বা অন্যত্র মরিচাধরা তরবারি আছে কি না ও তাহাতে শান দিলে চলে কি না। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। পাশবশক্তির কথা তুল, ত একদিন তাহার বিরুদ্ধে পাশব শক্তিই দাঁড়াইবে। কিন্তু ধর্ম্মানুগত শাসনরূপ দেবশক্তি প্রয়োগ করিলে, যাহা চাও তাহাই পাইবে।

তপস্যা।

সুগভীর অমানিশা শেষে বহিল উষার সমীরণ,
নিশিথিনী টেনে নিল তার শিথিলিত অঞ্চল-বসন;
নীলাম্বরে ধীরে অতি ধীরে তেয়াগিয়া নীল-শয্যাতল
আঁখি মুছি' শুকতারা আসি দাঁড়াইল স্থির সমুজ্জল,
নয়নেতে ঘুমঘোর তার এখনও রহিয়াছে মাখা
স্বপনেতে কি যেন দেখেছে কার যেন মুখচ্ছবি আঁকা।
চারিদিকে কেহ কোথা নাই সুবিশাল বিজন বিপিন,
রাতি-শেষে ঝিল্লিরব সেথা ক্ষীণ হ'তে হইতেছে ক্ষীণ;
শেফালির শ্যাম তনু বেড়ি নৃত্য করি জোনাকির দল
ক্লান্ত হ'য়ে, অবসন্ন হ'য়ে আশ্রয় করেছে ভূমিতল।
অন্ধ অলি ভুলি ভবিষ্যতে, যথা ইচ্ছা করি মধু পান
ডাকি' আনে মৃত্যু আপনার বাড়াইয়া দেহ পরিমাণ—
তেমনি সে জোনাকির দল শূন্যমঞ্চে নাট্য শেষ করি
মন্দীভূত ক্ষীণ দীপ্তিটুকু দিতেছিল দুর্ব্বার উপরি।

সেথা হ'তে নহে বহুদূর—সুনির্ম্মল স্বচ্ছ সরোবর
চারিদিকে ঘাট বাঁধা তার, শিলা দিয়ে শ্বেত মনোহর।
তারি এক শিলাপটে বসি, যোগী এক ধেয়ানে মগন,
আঁখি তাঁর অর্দ্ধ-নিমিলিত, বিগলিত যুগল নয়ন।
যোগীর সে যোগাসন খানি রহিয়াছে চুমি' ধরাতল
ধরা হ'তে বহু উর্দ্ধে তবু জাগে তাঁর দৃষ্টি অচপল;
পৃথিবীর অণু পরমাণু, কবে কারে করে আকর্ষণ
"জড়তত্ত্ব নয় শুধু এতো—চেতনের সদা নিদর্শন"!—
এই বাণী, মহামন্ত্র এই, হে সৌম্য, হে পুত্র অমৃতের,
আনিয়াছ এ জগতে তুমি, মুগ্ধ তাই মানব বিশ্বের।
ধ্যানমগ্ন হে ঋষি তোমার, অকলঙ্ক শুভ্র পদতলে
ভক্ত আসি' নৈবেদ্য সম্ভার দিয়া গেছে তপ্ত অশ্রুজলে;
তবু তব ধ্যান ভাঙে নাই কি গভীর, হে চির-কুমার,
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্ঞা তোমার!

যুগ যুগান্তের কথা সে ত, একদিন আর একদিন
সামগান উঠেছিল হেথা, পূর্ণ করি এ ঘোর বিপিন;
শান্তিরস ব্রহ্মচর্য্য হ'তে, বিশ্বপ্রেমে আত্ম-নাশ করি
এ ভারত পূর্ণ করেছিল, স্বার্থপাপ লাজে ছিল মরি;
সেই দিন, সেই শুভক্ষণ এ শ্মশানে আনিবে আবার
বুঝিয়াছি তারি লাগি এই, সুকঠোর তপস্যা তোমার।
শুভলগ্ন আসিবে যখন, ত্যজি তব আসন মর্ম্মর
হে তপস্বী দাঁড়াইবে উঠি— প্রসারিয়া উর্দ্ধে দুটী কর।
আজিকার সীমাবদ্ধ প্রেম—সেই দিন হবে সীমাহীন,
ব্যবধান জড় চেতনের দূর হবে সেই একদিন।
যে সাধনা করিতেছ তুমি, সেই চির-সাধনার ধন
পলে পলে উঠিবে বাজিয়া সুগম্ভীর বেদের মতন।
ক্ষুদ্র জ্ঞান অন্ত আছে যার—অনন্তে সে হইবে বিলীন
আন তবে আন ঋষিবর—সেই মহা শুভ একদিন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত



শস্যশেষ-সংগ্রাহিকা।

THE GLEANER. BY JULES BRETON.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৪। | ৩য় সংখ্যা।

মাষ্টার মশায়।

ভূমিকা।

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমুদ্রে একটু খানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড় জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জ্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট্ হ্যাট্ পরা বাঙালী বিলাতফের্ত্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দুতিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন—মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও!

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতী দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভাল করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্কষ্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর একবার ইংরাজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল—একি! এ ত আমার পথ নয়।—তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, হবেও বা, এইটিই হয় ত সোজা রাস্তা।

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্ত্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল—একি ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে একি রকম ব্যবহার সুরু করিল! এই, গাড়োয়ান্, গাড়োয়ান্!—গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল—কহিল, তুম্ ভিতর আকে বৈঠো! সহিস্ ভীতকণ্ঠে কহিল, নেহি সা'ব, ভিতর নেহি জায়েগা! —শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, জল্‌দি ভিতর আও!

সহিস্ সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—কিছুই দেখিতে পাইল না তবু মনে হইল পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া

আছে। কোনো মতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।—বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোন মতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া দুটা রেড্‌ রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, আরে কাঁহা যাতা!—কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনো মতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সঙ্কীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল—কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল—যে, কোন্‌ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, Nature abhors vacuum—তাই ত দেখিতেছি! কিন্তু এটা কিরে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব্ব একটা কিছু ঘটে।—"পাহারাওয়ালা" বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এম্‌নি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মত পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো, সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এম্‌নি ভাবে, খাড়া হইয়া মিটুমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল চট্‌ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেম্‌নি মনে করা অমনি অনুভব করিল সাম্‌নের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনো মতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দ্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এদিকে গাড়িটা কেবলি ময়দানের রাস্তায় উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলি বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়েগুলো থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হটাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বল!

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘোরাইলি কেন?

গাড়োয়ান আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কই, ময়দানের মধ্যে ত ঘুরাই নাই!

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল—তবে একি শুধু স্বপ্ন?

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল—বাবু সাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইল না—কেবলি ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার!

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ সরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জ্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কীতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন।

[illegible]

লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া দলিলের সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুট্‌বল্ ক্লাবের না-ছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মা'র ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাপ্‌ড়ির মত,—যে দেখিল সেই বলিল আহা ছেলে ত নয় যেন কার্ত্তিক। অধর বাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে।

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্ব্বে অধর বাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান নাই। দুটো একটা সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না;—বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হটিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী উত্থাপিত করিলেন সব ক'টাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাশ করা এক বুড়ো মাষ্টার রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি না কি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্য্যন্ত মাষ্টারি মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন সেই জন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও!

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাষ্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এণ্ট্রেন্স স্কুলে কোনো মতে এণ্ট্রেন্স পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্নঅংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মত সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্য্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? কাহাকে চাও?—হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল—বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।—দরোয়ান কহিল—দেখা হইবে না। তাহার উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—বাবু চলা যাও।

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল—সে কহিল, নেহি জায়গা!

বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালস ভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপ চাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সে দিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাষ্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পড়া কি পর্য্যন্ত?

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল—এণ্ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি।

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল—শুধু এণ্ট্রেন্স্ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও ত নেহাৎ কম দেখি না।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়-প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—কত এম-এ, বি-এ, আসিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনা বাবু এণ্ট্রেন্স্ পাস করা মাষ্টারের কাছে পড়িবেন?

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও! রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতি ও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্য্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—সে মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল হরলাল বাড়ীতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়ীতে রাখিয়া যে টুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুক দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাষ্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার অবস্থা ভাল হইবে এই আশায় সে বহুকষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনো দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙ্গা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এদুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় তাহার মত করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই, পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপাপড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়াছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে;—একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ছেলেকে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন

মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন। অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে!

৪

বেণুর বয়স এখন এগার। হরলাল এফ্ এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট্ ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্পীয়ারের জুলিয়স্ সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে আ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই; এখন সে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভাল লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিল—তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল সকালে একঘণ্টা বিকালে একঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে! আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য!

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল, যে, তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাষ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল বড় মানুষের ঘরে মাষ্টারের পদবীটা কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পর্দ্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্য্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ সাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।

সে দিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি

না করিয়া পড়াইয়া গেল—সে দিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট ছোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চ্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মাষ্টার মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকাল বেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল বিকাল হইতে তোর কি হইয়াছে বল্ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভাল করিয়া খাইতেছিস্ না—ব্যাপার খানা কি!

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বরাবর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—মাষ্টার মশায়—

মা কহিলেন—মাষ্টার মশায় কি?

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন।

ননীবালা কহিলেন—মাষ্টার মশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড় চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে?

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন? যাহার যখন খুসি আসিতেছে যাইতেছে।

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে এই হইলেই ভাল হয়—না হয় আমি তোমার দুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—এত অতি ভাল কথা—উভয়পক্ষেই ভাল।

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সে দিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাঁট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত তাহার বদলে সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝক্‌ঝক্

উপর মাষ্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নামলেখা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নূতন ভাল বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, বাবা মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধর বাবু ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আট্‌কাইয়া গেল;—কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ী চল।

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল যেমন করিয়া হউক্ মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের প্যাঁট্‌রা বাহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়ীতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি চল—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মত আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেকচারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভাল লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে দেশে মাকেও দু'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু'চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল,—"না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট্ আনিতে পার?" কোনো বড়-লোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুসি হইয়াই কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।"—তার পরে সাহেব তাহার বেশ-ভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"পনেরো টাকা অগ্রগাম দিতেছি—আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভুতের মত খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরাণীরা বাড়ী গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ী গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটখাট গলির মধ্যে ছোটখাট বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন,—"বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস্ তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব? রোস, একটা বড় বাসা করি তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাস পরিবর্ত্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মনস্থির করিতে পারিল না।

হয় ত কোনো দিনই তাহর সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল! আয়নাতে, ছবিতে, আস্‌বাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোন তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মত গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্ধুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্! ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাষ্টার মশায়কে কেই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল বলিয়া লাভ কি—বেণু হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াই-বেন—আহা বাছার মা মারা গেছে!

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল অধর বাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি। বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি?"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্ত্তিকের মত ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল!

আহার সারিয়াই বেণু কহিল—মাষ্টার মশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, হরলাল উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল—"বাস, এই পর্য্যন্ত! আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি।

"পর্ব্বত হইতে নদী
ধায় যবে সিন্ধুপানে
কে রোধিবে গতি তার"!—মধুসূদন।

"Onward, brave men, onward go!
Place is none for rest below."—*J. S. Blackie.*

একদা এক সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষার জন্য যাইতেছিল। বৈশাখ মাসের দুপুরবেলা, দীর্ঘ পথ, বিস্তৃত প্রান্তর। বেচারী আর পারে না, শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পথ-পার্শ্বস্থিত এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়াছে আর ইষ্টদেবের কাছে কষ্টাপনোদনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছে, "ঘোড়া চড়িয়ে দে রাম!" এমন সময় পুলিশের এক কর্ত্তা জবরদস্তীলব্ধ গ্রামবাসীর এক পূর্ণগর্ভা ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ঘোটকী সেই স্থানে আসিয়াই একটী বৎস প্রসব করিল। এখন উপায় কি? এই নবপ্রসূত বৎসকে কে গ্রামে পৌছাইয়া দেয়? উপায় জুটিতে দেরী হইল না। নিকটে স্থূলকায় সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারই স্কন্ধে বৎসটী চাপাইয়া দিয়া গ্রামের দিকে ছুটিলেন। সন্ন্যাসীবেচারা নাচার! তাই অশ্বশাবকটি ঘাড়ে লইয়া মনের খেদে "উল্টা বুঝ্‌লিরে রাম!" বলিতে বলিতে গ্রামের দিকে চলিল! এই বৈশাখ মাসের দিনে, কমিল্লার ঘটনারূপ দুস্তর প্রান্তর অতিক্রম-প্রয়াসী আমাদের ইংরাজরাজকে যদি তাঁহার মনের ভাব জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, "উল্টা বুঝ্‌লিরে রাম"! আজ যদি তাঁহাকে কেহ এই আশ্বাস দিতে পারে যে, বঙ্গবিভাগ তুলিয়া লইলে বিভাগের পূর্ব্বে দেশের লোকের মনের ভাব সরকারের প্রতি যাহা ছিল তাহাই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, তাহা হইলে ইংরাজরাজ নাকে কাণে খত দিয়া (অবশ্য নিজের কাছে, নইলে prestige থাকে না!) আজই ভাঙ্গাবঙ্গ জোড়া দিয়া দিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার রাজনৈতিক জীবনকে বিনাশ করাই বঙ্গবিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, এই কিঞ্চিদধিক একবৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে শক্তি ও গতি লাভ করিয়াছে তাহার বেগ সামলাইতে যাইয়া ইংরাজরাজ আজ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। আজ বঙ্গভাগ করিয়া ব্রিটিশ-সিংহ (!) এই ভারতভূমে যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, দশটা বঙ্গ একত্র শাসন করিতে যাইয়া তিনি কখনও এরূপ হইতেন না। কাপড়ে আগুণ লাগিলে মূর্খ লোকে যেমন তাহা নিবাইতে যাইয়া আরও বাড়াইয়া তোলে, বাঙ্গালীর প্রজাশক্তির সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ আজ সেই মূর্খতারই পরিচয় দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা "উল্টা বুঝ্‌লিরে রাম" আর কি হইতে পারে? সন্ন্যাসীর "উল্টা বুঝ্‌লিরে রাম" অপেক্ষা যে ইংরাজরাজের আক্ষেপ অনেক গভীর অর্থ-ব্যঞ্জক তাহা বুঝিতে অধিক সময় লাগিবে না। সাধের ফুলারকে বিদায় দিবার সময় বড়লাট মিণ্টো সাহেব এইরূপ অর্থযুক্ত একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই! "পবন বপন করিলে মহাপবন কর্ত্তন করিতে হয়"। বীজ বপন করিয়াছ, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, না বুঝিয়া বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ তুমি নিজেই সে বৃক্ষে জল সেচন করিতেছ; সুতরাং ফল তোমাকে ভক্ষণ করিতে হইবেই, আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? দেবতারা যাহাকে শাস্তি দিবেন, আগে তাহার বুদ্ধিনাশ করেন। ইংরাজের বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছে, এখন "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"র পালা আরম্ভ হইয়াছে।

এত দিন বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন উদ্ভিদধর্ম্মী ছিল, vegetate করিতেছিল। উদ্ভিদের জীবনেরও একটা পরিণতি আছে, কিন্তু উদ্ভিদ তাহা জানে না। তাহার ভিতরে কোন বোধ নাই। বাহিরের শক্তি তাহাকে যাহা গড়িয়া তুলে সে তাহাই হয়। সে নিজের অজ্ঞাতসারে আপনার ভাগ্য গ্রহণ করে। এত দিন আমরা ইংলণ্ডের নেজুড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিলাম, ইংলণ্ড যা করেন তাই, ইংলণ্ড ভাগ্যবিধাতা। ইংলণ্ড বিধান করিতেছেন কি বিনাশ করিতেছেন সে খবরও লই নাই, উদ্ভিদের সে খবর লইবার অধিকার নাই। ইহার সঙ্গে ক্ষণিক সুখদুঃখের জ্ঞান-যুক্ত হইলেই আমরা উদ্ভিদরাজ্য ছাড়িয়া প্রাণীরাজ্যে প্রবেশ করি। ৭ই আগষ্ট আমাদের বহিষ্কার (Boycott) ঘোষণার দিন, আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণীরাজ্যে প্রবেশের দিন। প্রাণীজগতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমা-

দের বহিষ্কারঘোষণার একটা বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। গরু জ্যামিতির বিংশ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে নাই, যে ত্রিভুজের দুই বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু ভয় পাইলে সে ঐ তৃতীয় বাহু ধরিয়াই দৌড়ায়, তাহার ভুল হয় না। আমরা যে ৭ই আগষ্ট বহিষ্কার ঘোষণা করিয়াছিলাম, তাহাও বিচারবিতর্কের দ্বারা ঠিক করিয়া করি নাই, সহজ ভাবে (instinctively) করিয়াছিলাম। বিচার বিতর্ক করিয়া করিতে গেলে হইত না। যেহেতু, বুদ্ধিমানেরা এখনও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। কন্‌গ্রেসে বহিষ্কার লইয়া মতভেদ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বহিষ্কারের মধ্যে কি অনন্ত শক্তি, কি অসীম সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাহা না জানিয়াও আমরা এ অস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমরা সুখ দুঃখ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভয় পাইয়া বহিষ্কাররূপ তৃতীয় বাহুতে দৌড়াইয়াছিলাম—সহজভাবে কিন্তু ঠিক ভাবে! তাই ৭ই আগষ্ট আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণীরাজ্যে প্রবেশের দিন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রেরণায় আমরা অজ্ঞাতসারে এই বহিষ্কার পথে দৌড়িয়াছিলাম। জাতীয়জাগরণের এই দিনকে অন্য এক দিক্ হইতে দেখা যাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, "ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ"। ঋষিরা মন্ত্র দেখেন, সৃষ্টি করেন না। সুতরাং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে সব সময় মন্ত্রের অর্থ বুঝেন তাহা নহে। সত্য দর্শন করিয়া জগতে প্রচার করা তাহার কাজ। অর্থ বুঝাইবার জন্য পরে ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণের আবির্ভাব হয়। এই বহিষ্কার-মন্ত্র বর্ত্তমান যুগে ভারতের বেদমন্ত্র, মোক্ষ-মন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অর্থ সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত, ঘোষণার পরে ইহার অর্থ, ইহার সামর্থ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যাঁহাকে এখনও এ মন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান প্রবক্তা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, সেই বিপিনচন্দ্রও প্রথম প্রথম ইহার অর্থ সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ঈশ্বরপ্রণোদিত হইয়া আমরা এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাই আমাদের অজ্ঞতা এখানে ধর্ত্তব্যই নয়। কবি বলিয়াছেন, ইন্দ্র যখন বজ্র নিক্ষেপ করিয়া বৃত্রসংহার

"স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি,
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন।"

কিন্তু তাহাতে অসুর বিনাশের বাধা উৎপন্ন হয় নাই। মহৎ কার্য্য এইরূপেই ভগবৎ প্রেরণায় সাধিত হইয়া থাকে।

৭ই আগষ্ট যেমন জাগরণের দিন, ১৬ই অক্টোবর তেমনই জাতীয়জীবনের আত্মজ্ঞানলাভের দিন। এতদিন বাঙ্গালীর একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান ছিল না। সে জ্ঞানলাভের চেষ্টাও হয় নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্য-যন্ত্রের একটা চক্রমাত্র ছিলাম, যে দিকে টানিতেছিল, সেই দিকেই যাইতেছিলাম। এমন কি ৭ই আগষ্টও ভয় দেখাইয়া ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা ছিল, নিজের মধ্যে সিদ্ধি খুঁজিবার তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীজাতি আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিল। জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম এই যে, আত্মজ্ঞান অনাত্মজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত, অনাত্মজ্ঞানের সংঘর্ষণে আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। এত দিন যাহা জড়িত ছিল, আজ তাহা বিভক্ত (differentiated) হইল। সে দিন বাঙ্গালী আত্মজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া ইংলণ্ডকে বলিল, "তোমার উপরে আমার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে না, আমার একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তুমি তাহার গড়ন ভাঙ্গনের কর্ত্তা নহ! তুমি বঙ্গ দ্বিখণ্ডই কর, আর শতখণ্ডই কর "আমরা বাঙ্গালী জাতি এক"। তাই সে দিন বাঙ্গালী জাতীয়নিশান উড়াইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছে এবং জাতীয়জীবনের মহালক্ষ্যের দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছে। এই খানে বাঙ্গালী ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে, এই দিন বাঙ্গালী জাতি আপনাকে ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, এই খানে জাতীয়জীবনের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম বটে' কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তীরা যদি আমার "আমি''কে আমি'' বলিয়া স্বীকার না করে তবে আমার আত্মজ্ঞান লাভ "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" থাকিয়া যায়। ইংরাজ যদি আমাকে গ্রাহ্য না করে অনাত্মা যদি আত্মার আত্মত্ব স্বীকার না করে, তবে আমার আত্মজ্ঞান কথামালা কথিত বৃষশৃঙ্গ স্থিত মশকের আস্ফালনের ন্যায়

না। আমার ও আত্মজ্ঞান তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এক ভদ্রলোক বিদেশে চাকরী করিতেন, তিনি এক জন বড় চাকুরে। বহুদিন পর বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু গ্রামে ঢুকিবার পূর্ব্বেই রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি যে পাল্কীতে চড়িয়া বাড়ী আসিলেন ইহা প্রতিবেশীরা দেখিল না বলিয়া তাঁহার মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। তাই পরদিন যখন পাড়ার লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কবে আসিলেন," তখন তিনি "কাল রাত্রিতে পাল্কীতে আসিয়াছি" বলিয়া মনের আপশোষ মিটাইলেন। বাস্তবিক প্রতিবেশী ইংরাজরাজ যদি আমাদের এই আত্মজ্ঞানকে স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে ইহার কিছু মূল্য থাকিত না। কিন্তু ইংরাজের কাঁধে অলক্ষ্মী চাপিয়াছে, সুতরাং সে যাহা করিতেছে তাহাতেই ভারতের প্রজাশক্তি এক পদ করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। বিগত বৎসর ১লা বৈশাখ ইংরাজ বরিশালে যাহা করিয়াছ, তাহা দ্বারা সে বাঙ্গালীর জাতীয়জাগরণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে; সে তাহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন উপেক্ষার বস্তু নহে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। তাই ১লা বৈশাখ বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদালাভের দিন। সে আত্মমর্য্যাদা ছোটখাট আত্মমর্য্যাদা নহে। যে ব্রিটিশ-সিংহ* প্রবল শক্তিতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, যে সাম্রাজ্যে সূর্য্যই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পান না, যে ব্রিটিশ সিংহের circular রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুঙ্কারেই মার্হাট্টা রাজপুত প্রভৃতি ত্রিশকোটি লোক অধ্যুষিত এই ভারত-সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে শাসিত হইতেছে, সেই সিংহ যখন শার্দ্দুলে পরিণত হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া ("Tiger qualitis" Pioneer) গুর্খা হাঁকাইয়া বন্দুক কামান লইয়া "মাথে টেরি লম্বা দাড়ী চস্মা বদ্ধ লোচন" এবং "walking stick" পর্য্যন্ত বর্জ্জিত কজন বাঙ্গালী বাবুর মিসিল ভাঙ্গিতে আসিয়াছিলেন তখন আমরা আমাদিগকে যতই হীন মনে করি না কেন, আমাদের প্রতিবেশী আর আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না। সে দিন ইংরাজ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে আমাদের আত্মজ্ঞান আত্মম্ভরিতা নহে, বাঙ্গালার জাগরণ স্বপ্ন নহে, কবি কল্পনা নহে। বাঙ্গালী যে সঙ্কল্প লইয়া জাগিয়াছে তাহা অমোঘ, মৃত্যুভয়ও যে তাহাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না, "আমাকে মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলেও আমি 'বন্দে মাতরম্' বলিতে ছাড়িতাম না" বাঙ্গালী বালক চিত্তরঞ্জনের সেদিনকার এই উক্তি হইতেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সেদিন বাঙ্গালী প্রতিবেশীর কাছে আত্মমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, নিজের কাছে আত্মজয় করিয়াছে।

এই খানেই বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনস্রোত থামিল না, বছর ঘুরিয়া না আসিতেই, ১লা বৈশাখের সাম্বৎসরিক উৎসব করিবার পূর্ব্বেই সেদিন কমিল্লায় প্রজাশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শুনিতাম দেবী নৌকায় আসেন, দোলায় আসেন, বড় জোর ঘোড়ায় আসেন। এখন যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহে (Electric current) চড়িয়া বসিয়াছেন। তাই মনে হয় প্রজাশক্তির পূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে আর বেশী সময় লাগিবে না, যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে অর্ব্বাচীনের ন্যায় দু'শ একশ বছর হাঁকিতেছিলেন তাঁহারাও বেগতিক দেখিয়া দশ বিশ বছরে নামিয়া পড়িয়াছেন। এখন বিধ্বস্ত রাজশক্তির কপটযুদ্ধেও উদ্যত বজ্র প্রজাশক্তির নিকট হারিয়া আত্মরক্ষার জন্য জম্বুক বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু ইংরাজের আজ যড়দশা, কে তাহাকে রক্ষা করিবে! প্রকৃতির প্রতিরোধ অনিবার্য্য!! আজ কমিল্লাবাসী দুজন হিন্দুকে নির্য্যাতন করিয়া তুমি জঘন্য পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, "পঞ্জাবী"র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর প্রতি জুলুম করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছ, কিন্তু অন্ধ তুমি দেখিতেছ না যে ইহাতে সমগ্র হিন্দুস্থানের মাংসপেশী দৃঢ় হইতেছে। তোমার এই ঘৃণিত অত্যাচারে আজ ভারত জননীর ধমনীতে যে রস সঞ্চারিত হইতেছে, শিরায় শিরায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহ

---

* এখন ব্রিটিশ-শৃগাল বলিলেও কিছু অগৌরব হইবে না। কেন না, আগে সিংহ বলিয়াই সংস্কার ছিল বটে, কিন্তু আজ কাল সে সংস্কার সংশোধন করিতে হইতেছে। এখন যে শক্তিতে রাজ্য চলিতেছে তাহা পশুরাজ অপেক্ষা ধূর্ত্তরাজ শৃগালেরই উপযুক্ত। যেখানে সিংহবৃত্তির প্রয়োজন সেখানে ইংরাজ নবডঙ্কা। এই সে দিন চোখের উপর বুয়ার যুদ্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সাম্রাজ্যের সকল শক্তি একত্র করিয়া চারি বছরের ধস্তাধস্তির পরও একদল অশিক্ষিত চাষাকে সম্যক দমন করা হইয়া উঠিল না, সুতরাং "হত ইতি গজঃ" রকম একটা সন্ধি করিতে হইল। ইংরাজেরও 'Tiger quality"র বীর্য্য কত তাহার আর জগতের জানিতে বাকী নাই, Pioneer না বলিলেও পারিতেন।

ঘনীভূত হইতেছে, যে দিন তোমাকে তাহার হিসাব লইতে হইবে, সেদিন তোমার ঐ রাঙ্গা মুখ কালি হইয়া য়াইবে; ও মুখে আর সেদিন ভ্রুকুটি থাকিবে না, দাঁতকপাটি লাগিয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। নিজেরা আইন পদদলিত করিতেছ, কিন্তু তাহা বলিলে Sedition, Sedition বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছ *। তোমাদের চীৎকারে মর্লী ভুলিতে পারেন, ভগবান ভুলিবেন না, প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবেন না। ন্যায় ও ধর্ম্ম চিরদিন পদদলিত থাকিবেন না, আপনার আসন আপনি করিবেন। যতই অত্যাচার কর না কেন, "আছে বল দুর্ব্বলেরও"। সেই দুর্ব্বলের বল আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই তোমাদের দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়া আইন আজ কমিল্লার প্রজাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই দুর্ব্বলের বলের নিকট পরাজিত হইয়া তুমি আজ অকুল সাগরে হাবুডুবু খাইতেছ, কুল কিনারা দেখিতেছ না, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ! যে শক্তিমান্ সে কি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ? তুমি ন্যায় পদদলিত করিতেছ; তাই তিনি তোমার আদালত পরিত্যাগ করিয়া সালিসী সমিতির (Arbitration Court) শরণাপন্ন হইতেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এইরূপেই আরম্ভ হয়। ভারতেও আরম্ভ হইয়াছে।

একবার খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছিলাম যে একজন রুষ নিহিলিষ্টকে তাহার এক মার্কীন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে তিনি বুঝিতে পারেন না কেমন করিয়া মানুষ Destructionist হয়। মানুষ চিরদিনই একথা ভুলিয়া যায় "যেথানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়।" রুষিয়ার রাজনীতি আমেরিকার রাজনীতি নহে সুতরাং রুষের বেদনা মার্কীন বুঝিবে কিরূপে? যদি রুষের অবস্থা মার্কীনের হয় তবে ঘটনাই তাহাকে বুঝাইবে, বুঝিবার জন্য উপদেশ প্রয়োজন হইবে না। সম্মোহনমন্ত্রে শাসিত ভারতও তো এতদিন বুঝে নাই, এখন যে বুঝিতেছে সে কেবল অবস্থার ফেরে পড়িয়া, রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে!

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ॥

যাহা হউক, মার্কীনের কথার কোনও উত্তর না দিয়া রুষিয়াবাসী, কিরূপে ঘটনাচক্রে তিনি Destructionist হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন—অত্যাচারী রুষরাজপুরুষগণের হস্তে তাহার পিতার মৃত্যু, ভগিনীর উপর অকথ্য অত্যাচার, নিজের নানাপ্রকার দুরবস্থা এবং গৃহত্যাগ। মার্কীনের রক্ত তখন গরম হইয়াছে, তিনি বলিলেন, "তুমি প্রতিকারের কি চেষ্টা করিয়াছ ?" রুষ এক এক করিয়া বুঝাইয়া দিল যে রুষিয়াতে রাজপুরুষগণের অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান নাই। তখন আর মার্কীন স্থির থাকিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল, তোমার অবস্থায় পড়িলে "I must have killed some body" তখন রুষটির উত্তরের সময় আসিল, তিনি বলিলেন, "Brother, it took me eight years to become a destructionist, but you have turned out one in half an hour!" স্বাধীনতার বরপুত্র মার্কীন অত্যাচারের বর্ণনা শুনিয়া আধঘণ্টায় তাহার প্রতিবিধানের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি? জার-পদানত রুষিয়ার আট বছর লাগিল। দেড়শত বছর লাগিলেও ভারতেও প্রকৃতি জাগিয়াছেন। যখন বরিশালের ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম তখন নিরুপায় ভাবিয়া, প্রতিকার অসম্ভব জানিয়া অক্ষম-ক্রোধে নিজের হাত পা নিজে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজের ক্রোধ আর তত impotent নহে। প্রকৃতি এই এক বছরে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। যদি রুষিয়ার রাজপন্থা অবলম্বন কর, তবে রুষপ্রজার বিষদন্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। ইহা তোমার আমার ঘরের কথা নহে, প্রকৃতির নিয়ম। তুমি যত বড় রাজ্যেরই অধীশ্বর হও না কেন, তুমিও প্রকৃতির প্রতিশোধের অতীত নও। তুমি মদান্ধ হইয়া ইহা দেখিতে না পাও, কিন্তু ইহার ক্রিয়া তুমি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। [illegible]

* এক দিন এক চোর এক গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোক তাড়া করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইলে চোর নিরুপায় দেখিয়া নিজেও "চোর" "চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলের চোখে ধুলা দিতে চেষ্টা করিল। আমাদের কর্ত্তাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে তাহাদের বুদ্ধি এই চোরের বুদ্ধি অপেক্ষা কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে।

নরমের কাছে নরম। তুমি যত বড় শক্ত, তোমার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও তত বড় শক্ত হইবে, ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ! বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানের জন্য প্রস্তুত হও, স্বকর্ম্মের ফল ভোগের জন্য প্রস্তুত থাক।

মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা যেন প্রত্যক্ষ্যবৎ উপলব্ধি করিয়া ইংরাজের কাছে ভারতশাসন সম্বন্ধে দুইটি পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে ইংরাজের কর্ত্তব্য, সে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়া চিরদিন ভারতের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে তাহা না করিলে তাহাদের নিকট মহাসঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে। ইংরাজ যদি আয়র্লণ্ডের ন্যায় ভারতের উপর অত্যাচার করে, তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করে তবে একশত বছরের মধ্যে ইংরাজের পক্ষে ভারতে অবস্থিতি করা মহাশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইংরাজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আজ ভারতশাসনের পথ আপনার পক্ষে যেরূপ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় তাহা কিরূপ সুস্পষ্টভাবে ধারণা করিয়াছিলেন এবং কিরূপ উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য, বাঙ্গালা কাগজের পক্ষে দীর্ঘ হইলেও আমরা রাজার সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন—

"Supposing that some hundred years hence the native character becomes elevated, from constant intercourse with Europeans and the acquirements of general and political knowledge as well as of modern arts and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society? It should not be lost sight of that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which any English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one fourth of the knowledge and energy of that country she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, an ally of the British Empire, or troublesome and annoying as a determined enemy."

রাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। ইংরাজ কুশাসনে ভারতকে "determined enemy"তে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে! সে এখন ভারত শাসন লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, সে এখন মহা বিপদসাগরে ভাসমান। জলে পতিত হইলে মানুষ যেমন যা পায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাই ধরে, সামান্য তৃণখণ্ডেরও আশ্রয় গ্রহণ করে, ভারতে ইংরাজও আজ তাই করিতেছে। নহিলে কি সে আজ পলাসীর স্মৃতি, ক্লাইবের স্মৃতি রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠে? যে বীরত্বে ইংরাজ পলাসীতে জয়লাভ করিয়া ছিল তাহা জগতে কে না জানে? ইংরাজ জাতির মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকিত, জাতীয় শঠতা ও প্রবঞ্চনাতে যদি একটুও লজ্জাবোধ করিত, তবে এই প্রস্তাব লইয়া সে কখনও জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইত না। মনুষ্যত্ব তো দূরের কথা, কুকর্ম্মকারীর সাধারণ লজ্জাবোধও এই জাতির লোপ পাইয়াছে। তাহা না হইলে, পলাসীর স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, যাহাতে পলাসীর নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হয় সে সেই জন্যই ব্যস্ত হইত। ইংরাজজাতির কি ভয়ানক নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে! যে ক্লাইবের কুকর্ম্ম সমসাময়িক জনমণ্ডলীর নিকট আদর পাইল না বলিয়া তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া ভবযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইল, সেই প্রবঞ্চকচূড়ামণির স্মৃতিরক্ষার জন্য আজ ইংরাজজাতি মাতিয়া উঠিয়াছে। পার্লামেণ্টের উচ্চসৌধ হইতে 'সাধু' নামে বিখ্যাত মর্লীও চাঁদা স্বাক্ষর করিতে পশ্চাৎপদ নহেন! যুধিষ্ঠির থাকিলে নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, "কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্"। এখন আমাদের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? যদি প্রজাদ্রোহী রাজশক্তি আজ বঞ্চক ক্লাইবের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করে, তবে জাগ্রত প্রজাশক্তির সমবেত চেষ্টায় স্বদেশবৎসল নবাব মিরকাশিমের স্মরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া মতিভ্রান্ত রাজপুরুষগণের কুকর্ম্মের কার্য্যতঃ প্রতিবাদ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এস ভাই সকলে জীবনপণ

করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, প্রজাশক্তির পূর্ণ আত্মতৃপ্তির দিনকে আরও নিকটতর করিয়া দেও।

বল ভাই বন্দেমাতরম্!
দিল্ দরিয়ায় উঠ্‌বে তুফান মন্দ্রগভীরম্!
ওম্ বন্দে মাতরম্।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পেকিং রাজপুরী।

বৃদ্ধারাণীর ব্যক্তিগত স্বভাব ও প্রকৃতি।

চীনের বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী অতি দানশীলা। তিনি দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। যদি রাজ্যের মধ্যে কোনও স্থানে কখনও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি সরকারি আদেশ দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসমূহকে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন। রাজবাটীর সদর দরজায় প্রত্যহ বহু কাঙ্গাল গরিব অন্নভিক্ষা পাইয়া থাকে।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। চীনদেশের নর্থ চায়না হেরাল্ড (North China Herald) নামক ইংরাজী একখানি কাগজে তাঁহার সদ্বিচার ও করুণহৃদয়ের পরিচায়ক একটী ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই:—

"বক্সার বিদ্রোহের সময় ওয়াং (Wang) নামক একজন প্রসিদ্ধ বদমাইস কোন চীনা মুসলমানের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। উক্ত মুসলমান টাকা আদায়ের জন্য ওয়াংএর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করে, সরকারী আদেশ অনুসারে তাহার কর্জ্জা টাকা মহাজনকে দিতে বাধ্য করে। কিন্তু সে টাকা দিতে অস্বীকার করে, পরন্তু বিচারক মাণ্ডারিনকর্ম্মচারির প্রতি অপমানসূচক ভাব প্রকাশ করে। তজ্জন্য উক্ত মাণ্ডারিনের আদেশে ওয়াংকে যথেষ্ট প্রহার করা হয়। এই জন্য ওয়াং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করে। বক্সারগণ পেকিনের বিদেশীগণকে আক্রমণ করিলে ওয়াং একদল বিদ্রোহীর দলপতি হইয়া উক্ত মুসলমানের বাটী আক্রমণ করে, তাহাকে তাহার বাটীর এগারজন স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাসহ হত্যা করে। কেবল মাত্র সেই পরিবারের একটী বধূ উপরে কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। এই যুবতী রমণী আরো দেখিতে পাইয়াছিল যে ওয়াং ও তাহার সঙ্গীগণ ঐ বৃদ্ধের ও তাহার চারি পুত্রের মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই বধূটী এই হত্যাকাণ্ডের পরই পেকিং হইতে পলাইয়া অন্যত্র কোন আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে তাহার শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারীদিগকে গোপনে অনুসন্ধান করে, এবং খোঁজ করিয়া তাহাদের বাটীর ঠিকানা ও নাম অবগত হইতে পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে দরখাস্ত করে।

"এক দিন যখন বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী গ্রীষ্মাবাস হইতে শীতাবাসে যাইতেছিলেন তখন এই উনবিংশবর্ষীয়া শোকপরিচ্ছদপরিহিতা যুবতী রমণী দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার শিবিকার সম্মুখে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। রাণী এই যুবতীর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে মস্তক উত্তোলন করিয়া একখানি আবেদনপত্র প্রদান করিল। তাহাতে তাহার শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারী ওয়াংএর বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিল। আবেদনপত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে রাণীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাঁহার একজন খোজাকে আদেশ করিলেন যে সে এই রমণীকে ফৌজদারি বিচারালয়ে লইয়া (Board of punishment) যায় এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া সত্বর তাহার বিচার করিয়া যথা যোগ্য দণ্ড বিধান করা হয় এবং অবশেষে মোকর্দ্দমার কথা তাঁহাকে জানান হয়। বিচার আদালত ওয়াংকে তাহার দুই পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রসহ ধৃত করিয়া অপরাধী স্থির করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করণ পূর্ব্বক তাহাদের নিষ্ঠুর অমানুষিক কার্য্যের যথা যোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।"

এইরূপ জনরবে শুনা যায় যে সম্রাজ্ঞী নিজে অত্যন্ত অপব্যয়ী! রাজপুরীর ও নিজের ব্যয়ের জন্য তিনি অযথা অর্থব্যয় করেন। কিন্তু রাজসংসারে অর্থগৃধ্নু রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য অনেক সময় অযথা অর্থব্যয় হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে অনর্থক অর্থ ব্যয় করেন এমন বোধ

হয় না। বহুকাল হইতে এই প্রকার অপব্যয় রাজপুরীতে চলিয়া আসিতেছে। এমন কি মাঞ্চু রাজবংশের পুর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণও মিতব্যয়িতার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক সম্রাট সম্বন্ধে এই প্রকার প্রবাদ আছে যে একদা তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদের জোব্বাটীর দক্ষিণ আস্তীনের এক প্রান্ত সামান্য-ভাবে ছিন্ন হইয়াছিল, কেন না সর্ব্বদা লিখিবার সময় দক্ষিণ হস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐপ্রকার নূতন একটী জোব্বা প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে। তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী উত্তর করিল যে ঐ প্রকার একটী জোব্বা প্রস্তুত করিতে তিন হাজার টেল (বর্ত্তমানে তিন হাজার টেল সাড়ে শাত হাজার টাকার সমান) ব্যয় হইবে। তখন সম্রাট কহিলেন যে জোব্বাটী নূতনই আছে, মাত্র তাহার একটী আস্তীনের এক প্রান্ত সামান্যভাবে ছিন্ন হইয়াছে। উহার আস্তীনটী বদলাইলেই যথেষ্ট হইবে। এই বলিয়া তিনি ঐ কর্ম্মচারীকে আস্তীন বদলাইবার জন্য জোব্বাটী প্রদান করিলেন। কএক মাস পরে ঐ জোব্বার আস্তীন বদল হইয়া আসিল। সম্রাট অবশেষে হিসাবে দেখিতে পাইলেন, যে একটী নূতন জোব্বা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় পড়িত, এক আস্তীন বদলেই তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে! আর একজন সম্রাট ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের বাহিরে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন দোকান হইতে কএক আনার খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। পর দিন ঠিক ঐ প্রকার খাদ্য কর্ম্মচারিগণ দ্বারা খরিদ করাইয়া আনাইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার মূল্য কত"? কর্ম্মচারী উত্তর করিল "ইহার মূল্য চারি টেল (দশ টাকা)।" তখন সম্রাট কহিলেন তিনি গত কল্য মাত্র কএক আনায় ঐ প্রকার খাদ্য বাহিরের দোকান হইতে নিজে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। সম্রাট আজ ঐ প্রকার খাদ্যের এত অধিক মূল্য হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী উত্তর করিল যে বাহিরে ঐ মূল্যে ঐ প্রকার খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু রাজপুরীর ভিতর উহা চারি টেলের কমে কখনও পাওয়া যাইবে না। কর্ম্মচারী আরো কহিল, যে সম্রাট ইচ্ছা করিলে রাজপুরীর বাহির হইতে উক্ত খাদ্য আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু উক্ত মূল্যে রাজপুরীর মধ্যে কেহই ঐ খাদ্য আনিবে না। তাহার কারণ কোন খাদ্য দ্রব্য বাহির হইতে ভিতরে আনিতে হইলে ক্রমান্বয়ে বহু কর্ম্মচারীর হাত দিয়া তবে অবশেষে সম্রাটের নিকট পৌছে এবং প্রতি কর্ম্মচারীই কিছু না কিছু লাভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইজন্য সম্রাটের নিকট কোন দ্রব্য পৌছিতে এত ব্যয় পড়ে। রাজকর্ম্মচারিগণ নিজেরা হিসাব করিয়া সাবধান না হইলে কখনই রাজপুরীর খরচ কমাইতে পারা যায় না। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সম্রাটগণ যাহা পারেন নাই তাহা একজন রমণীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ রমণীগণ বাহিরে গিয়া কোন বিষয় নিজ চক্ষে অবলোকন করিতে পারেন না। শুনা যায় যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর জন্য প্রত্যহ যে ডিম সরবরাহ করা হয় তাহার প্রত্যেকটী ডিমের খরচ প্রায় সাড়ে সাত টাকা করিয়া পড়ে।

বৃদ্ধারাণীর নিজের নাকি বেশী কিছু জাঁক জমক নাই। এরূপও শুনা যায় যে কোন ইউরোপীয় নৃপতি অপেক্ষা তাঁহার নিজের যে বেশী কিছু ধনরত্ন আছে তাহা বোধ হয় না। তিনি নাকি মুক্তা খুব ভাল বাসেন, এবং তাঁহার জেড পাথরের অনেক মূল্যবান রত্ন আছে। হীরকাদি তাঁহার বিশেষ নাই। প্রতি বৎসর অপর সকলকে উপহার দিতে তাঁহার অনেক খরচ হয়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অন্তঃকরণ নাকি খুব মহৎ। তিনি বড় স্বদেশপ্রেমিক, আপন দেশকে ও আপন জাতিকে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার অন্তঃকরণে জাতীয়তার ভাব বড় বদ্ধমূল। যখন রাজ্যে আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তখন তিনি চিন্তায় ম্রিয়মান হন। এমন কি সময় সময় আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাবত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত না হয় তাবত তাঁহার শান্তি থাকে না। বাহিরের সংবাদ শুনিয়া তিনি সময় সময় গুরুতর ভ্রমসংকুল কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু উপায় নাই, মাত্র পরের কথার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিয়া চলিতে হয়।

কএক বৎসর হইতে বিদেশীগণের ক্ষতিপূরণের দেনা দিবার জন্য, রাজ্যে নূতন এক কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া

তাঁহার বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়; সেই প্রস্তাবটী অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে "আমার ভয় হয়, এই কর স্থাপন করিলে পাছে লোকের উপর জুলুম হয়। অধস্তন কর্ম্মচারিগণ এই সুযোগ পাইয়া গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিবার আরো সুযোগ পাইবে।" এই বলিয়া নানা আপত্তি করিতেছিলেন। তিনি রাজ কর্ম্মচারিগণকে ছাড়েন না। তাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া বিদেশী ক্ষতিপূরণ অনেক দিয়া থাকেন।

তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি থাকিলেও নিজ কর্ম্মচারিগণ ও পারিষদগণ কর্তৃক সময় সময় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃতি এই যে কোন রাজকর্ম্মচারী বা পার্শ্বচরকে তিনি প্রথমে অবিশ্বাস করেন না। তাহাদের মতে গা ঢালিয়া দিয়া প্রথম প্রথম চলিয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, তখনই তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন বা কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিয়া থাকেন। অনেক সময় কর্ম্মচারিগণের পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে গোলযোগে পতিত করিয়া থাকে।

এই প্রকার পরস্পরবিসংবাদী গোলমেলে বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া যথার্থ মত গঠন করা সহজ নহে। তিনি যাহাদিগের চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করেন তাহারাই তাঁহাকে প্রতারণা করিতে থাকে। সময় সময় তিনি অন্নরূপে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মেজাজটী একটু চড়া হইলেও তাহা রমণীসুলভ নম্রতার সীমা অতিক্রম করে না। রাগিলে তাঁহার স্বর কিঞ্চিৎ কর্কশ হয় কিন্তু তাহা উচ্চ নহে।

বৃদ্ধারাণী অতি নম্র প্রকৃতির, মিষ্টভাষিণী, কৌশলী, এবং অত্যন্ত সামাজিক। এ বিষয়ে মিস্ কার্ল বলেন যে "as for tact and social savour she is remarkable. I never knew any one to possess these qualities to a greater degree. At first audience to foreigners, Sir Claude Macdonald in reporting it, spoke of the Empress Dowager as 'a kind and courteous hostess, who displayed both the tact and softness of a womanly disposition'. Lady Susan Townby says of her, 'Where has she learned the ease and dignity with which she receives her European guests ?"

লিগেশনের প্রায় সমস্ত বিদেশীগণই তাঁহার সামাজিকতা ও কৌশলের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

প্রুশিয়ার প্রিন্স এডানবার্ট যখন পেকিং পরিদর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বদলবলে বৃদ্ধা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এতগুলি বিদেশী লোকের অভ্যর্থনার জন্য তিনি নাকি প্রথমতঃ একটু সংকুচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রিন্স এডানবার্টের সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক কমনীয় সামাজিক ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত ও মোহিত হইয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞী কখনও হয়ত আপন পরিচারিকা বা রাজকুমারীগণের সঙ্গে সরলভাবে, বালিকার মত আলাপাদি করিতেছেন, এমন সময়ে যদি কোন সরকারি চিঠি আসিল, অমনি তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া রাজকীয় বিষয় মনযোগ দিয়া পাঠ করিয়া, যথা যোগ্য হুকুম দিয়া আবার যে সরল বালিকা সেই সরল বালিকাবৎ সকলের সঙ্গে হাস্য কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। তিনি ফুল বড় ভালবাসেন, তাঁহার মাথায় ফুল, খোপায় ফুল, সিংহাসনে ফুলের স্তবক, শয়নাগারে ফুল, সর্ব্বত্র এই ফুল দৃষ্ট হয়, এবং বিষাদেই হউক বা হর্ষেই হউক সর্ব্বদাই তিনি স্বাভাবিক দৃশ্য ভালবাসেন। সম্রাজ্ঞী মুক্ত বায়ুর বড় পক্ষপাতী। তিনি সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে থাকিতে ভালবাসেন না। প্রায় প্রত্যহ হ্রদে নৌকায় ভ্রমণ, পর্ব্বতগাত্রে মন্দিরে আরোহণ, উদ্যানমধ্যে ফলপুষ্পচয়ন ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকার্য্য। তাঁহার রুচি অতি মার্জ্জিত। সাহেবগণ মধ্যে তাঁহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনেক কথা শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন "Oh! She is nothing but an old Cow!" Oh! She has a tiger's soul in a woman!" মূল কথা সাহেব ভায়ারা ইঁহার কাছে কর্তৃত্ব ফলাইতে না পারিয়া এই প্রকার গালি দিয়া থাকেন।

নিবারণ করিয়া থাকেন। চীনারা ভারতবাসীর মত গোলামের জাতি নহে, বা চীনের বাদশাগণ মোগলবংশের শেষ বাদশাগণের মত অপরিণামদর্শী নহেন, তাই চীনদেশে গৌরাঙ্গগণের এত গাত্রজ্বালা।

সম্রাজ্ঞীর অবয়ব।

তিনি উচ্চে প্রায় পাঁচ ফুট হইবেন। গ্রীবাটী সুগোল, মস্তকটী সুগঠিত, হস্ত দুইখানি অতি সুন্দর, শরীরের বর্ণ শ্বেত, মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ। এত বয়সেও দন্ত দুপাটী মুক্তামালার মত ঝক্‌মক্‌ করিতে থাকে; ওষ্ঠ দুখানি পাতলা, মুখখানি অতি সুন্দর, চক্ষু দুইটী কৃষ্ণবর্ণ ও সোজা ভ্রূযুগল কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র, এবং ললাট প্রশস্ত। তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করেন যে তাঁহার বয়স চল্লিশের কিছু উপর হইবে। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন ৭২ বৎসর। শরীরটী সম্পূর্ণ সুন্দর। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছদ উত্তম এবং অতি মার্জ্জিত রুচিবিশিষ্ট।

তাঁহার উদ্যানের কোন বৃক্ষের প্রথম ফল ফুল সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে উপহার না দিলে, রাজপুরীর অন্য কাহারো স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই।

সম্রাট।

সম্রাট কোয়াংশু প্রায় অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজমাতার হস্ত হইতে রাজ্যের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। বৃদ্ধারাণী সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার প্রদানকালে নিম্নলিখিত উপদেশ স্বরূপ রাজাজ্ঞা প্রদান করেন যে "আপন শরীর আয়ত্তাধীন রাখিবে, মানসিক চর্চ্চা বৃদ্ধি করিবে এবং রাজ্যশাসন কার্য্যে অদম্য উৎসাহ ও মনোযোগ প্রদান করিবে।" এবং সম্রাট নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত রাজাজ্ঞায় উত্তর প্রদান করেন যে "প্রার্থনা করি পরমপূজনীয়া সম্রাজ্ঞী আমাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করিবেন। আমি ঈশ্বরকে ধরিত্রীকে ও পূর্ব্ব পুরুষগণকে প্রণাম করণ পূর্ব্বক, প্রথম চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবসে, আমার রাজত্বের একাদশ বর্ষে স্বয়ং রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিলাম।" চীনদেশে কোন শক:শকাব্দা প্রচলিত নাই। এক এক সম্রাটের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গননায় রাজকার্য্যের ও রাজ্য মধ্যে তারিখ গণনা করা হইয়া থাকে। যথা সম্রাট বলিলেন যে "আমার রাজত্বের একাদশবর্ষে" ইত্যাদি। ১৮৮৯ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি সম্রাট কোয়াংশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজে শাসন করিতে লাগিলেন। কোয়াংশু তাঁহার বাল্য নাম নহে, তিনি সম্রাট হইলে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে এই নাম প্রদান করেন। কোয়াংশু অর্থ "সর্ব্বগৌরবান্বিত পদাধিকার" (Glorious Succession).

বর্ত্তমান সম্রাট "পবিত্র বংশের" বা মাঞ্চু রাজবংশের দ্বাদশ নৃপতি। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি প্রায় পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের রাণীদ্বয় তাঁহার পক্ষ হইয়া এক যোগে রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব্ব প্রাসাদের রাণীর ১৮৮১ খৃঃ কাল হয়, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান বৃদ্ধারাণীই একক তাঁহার পক্ষ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সম্রাটের বয়স এখন প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে, পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতে রাজ্য শাসন হিসাব করিলে, তাঁহার রাজত্ব বর্ত্তমান সময় ৩০ বৎসর পূর্ণ হইবে। রাজত্বকালের এই হিসাবে মাঞ্চুবংশের সম্রাটগণের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থানীয়।

সম্রাটের ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণী শক্তি বা মনোহারিত্ব নাই। এ বিষয়ে তিনি বৃদ্ধ সম্রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের বোধ হয়। তাঁহার শরীরটী প্রায় পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে হইবে। দেহটী হালকা হইলেও সুগঠিত। তাঁহার মস্তকটীর গঠন মন্দ নয়।

মুখমণ্ডল সমধিক পুষ্ট না হওয়ায়, উদাসীনের চেহারার মত দেখায়। তাঁহার শরীরের গঠন হালকা হইলেও তাঁহাতে যে যথেষ্ট শক্তি আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজপরিবারের অন্যান্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ তত শ্বেত নহে। কারণ মাঞ্চুগণের শরীরের বর্ণ প্রায়ই ইউরোপীয়গণের বর্ণের সদৃশ। অনেক মাঞ্চুকে ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করাইলে শ্বেতাঙ্গগণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা কঠিন। স্ত্রীলোকগণের বর্ণ ততোধিক পরিষ্কার।

সম্রাটের মস্তকের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ ও লম্বা এবং তাহা অতি যত্নে রক্ষিত। এরূপ শুনা যায় যে তিনি

মুখমণ্ডলে ক্ষৌর কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, তবে বাধ্য হইয়া মুখমণ্ডলে ক্ষুর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ চল্লিশ বৎসর বয়সের নিম্নে কোন চীনারই প্রায় দাড়ি গোঁপ রাখিবার নিয়ম নাই। উচ্চবংশীয় চীনাদিগের ন্যায় তাঁহার হস্তপদ গুলি ছোট ছোট ও দেখিতে সুন্দর। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং প্রায় সাদাসিদে ধরণের। কোন রাজকীয় কার্য্য বা পর্ব্ব উপলক্ষ ভিন্ন মণিমুক্তাদি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। তাঁহার মুখের চেহারায় দয়ার লেশ আছে বেশ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি চতুরতা ও বুদ্ধিব্যঞ্জক। তিনি কিছু লাজুক এবং নির্জ্জনতাপ্রিয় লোক। বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে তাঁহার আত্মবিশ্বাস বিলক্ষণ আছে।

তাঁহার সেই উদাসীনের মত মুখভাব, তীব্র চক্ষুর্জ্যোতি এবং সংসারের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার মনে কোন গূঢ় চিন্তা নিহিত রহিয়াছে। তিনি কি সর্ব্বদাই এই চিন্তা করেন যে তাঁহার প্রথম উদ্যমের সংস্কারকল্প নিষ্ফল হইল, তজ্জন্যই কি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? তিনি কি আশা করিয়া আছেন যে চীন সাম্রাজ্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাশালী করিতে সমর্থ হইবেন? কে বলিতে পারে তাঁহার মনের ভাব কি?

রাজমাতার সঙ্গে তাঁহার কোন মনান্তর নাই, বরং তাঁহার সঙ্গে অতি সদ্ভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সংস্কারকল্পে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি বৃদ্ধারাণীকেই যে একক দোষী করেন এমন বোধ হয় না, কারণ এ কার্য্যটী সংস্কারবিরোধী রাজমন্ত্রিগণের চক্রান্তেই ঘটিয়াছিল। এবং তাঁহার হস্ত হইতে রাজক্ষমতা অপহরণ করিয়া যে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর হস্তে প্রদত্ত হয়, তাহাও মন্ত্রিগণের চক্রান্ত। মন্ত্রিগণের ধারণা হইয়াছিল যে অসমান পথে অতি দ্রুত-বগে শকট চালাইলে পদে পদে যেমন বিপদের আশঙ্কা সম্রাটের মতানুযায়ী সংস্কার কার্য্য দ্রুত চালাইলেও তেমনি আশঙ্কার কারণ ছিল। বৃদ্ধারাণীর মনেও সেই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

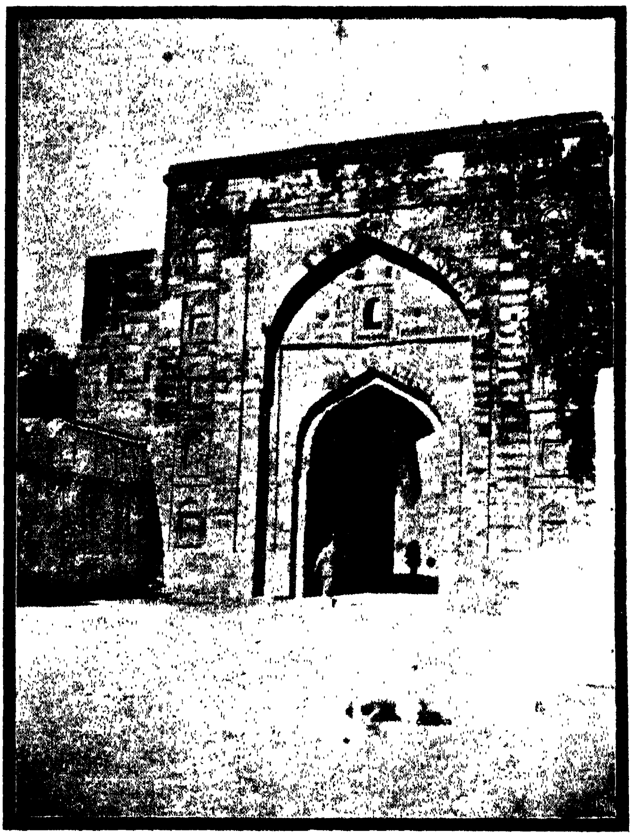
বর্ত্তমান সম্রাট সামান্য সামান্য বিষয়ে আদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible]

রাণীর সম্মতি ভিন্ন হইতে পারে না। প্রধানমন্ত্রিসভায় (Grand Council) যে সকল জটিল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে তাহাতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়ে এক যোগে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন। কোন রাজকীয় পত্রাদি আনীত হইলে প্রথমে বৃদ্ধারাণীর হস্তে প্রদত্ত হইয়া থাকে। তিনি তাহা পাঠ করিয়া, সম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন এবং সম্রাট পাঠ করিয়া তাহা পুনরায় রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামলাল সরকার।

জোনপুর।

বারাণসী হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে জোনপুর সহরের নাম আমাদের নিকট কেবলমাত্র সুগন্ধি তৈল ও কেওড়ার উৎপত্তিস্থল বলিয়া পরিচিত। অতি সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই জানেন যে জোনপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা ঘটনার জন্য বিখ্যাত। দিল্লীতে পাঠান সম্রাটগণের রাজত্বকালে জোনপুর একটি খুব বড় প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল ও তৎকালিক প্রথা অনুসারে জোনপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-গণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর সম্রাটদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেন। এই বিদ্রোহই জোনপুরের প্রাধান্য ও পতন উভয়েরই কারণ। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যের দিনে জোনপুর ভ্রমণে আসিয়া সহসা এত কথা মনে হয় না। সহরটি বেশী বড় নহে ও প্রধান রাজপথের উপরিস্থিত গৃহসমূহ বিশেষ দর্শন যোগ্য নহে। কিন্তু যখন গুমতী নদীর উপরিস্থ সেতুর উপর আসিলাম তখন সহসা মনে উদিত হইল যে বোধ হয় জোনপুর মুসলমানগণের কীর্ত্তিকলাপ এখনও রক্ষা করিতেছে। এবং যখন জোন-পুরের মসজিদ সমূহ দেখিলাম ও তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ শুনিলাম তখন জোনপুরের প্রতি একপ্রকার ভক্তির ভাব উদিত হইল। এই ক্ষুদ্র সহর একদিন মুসলমানগণের ঐশ্বর্য্য ধারণ করিয়া প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি সুশোভিত হইয়া [illegible]



জোনপুর দুর্গের সিংহদ্বার

আজ সামান্ত সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট মাত্র ইহা পরিচিত।

জোনপুরে এখন যে সকল ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা মুসলমান কীর্ত্তিকলাপেরই ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু তাহাই তৎপূর্ব্ব-কালিক হিন্দু কীর্ত্তিকলাপেরই পরিচয় দান করিতেছে। কারণ এই মসজিদগুলি অধিকাংশই হিন্দুদেবদেবীর মন্দির হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কেল্লার মসৃণ প্রাচীর দেখিয়া কখনই মনে হয় না যে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরস্থ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন কেল্লার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তখন দেখা গিয়াছিল যে প্রায় প্রত্যেক প্রস্তরে হিন্দুধর্ম্মের কিছু চিহ্ন খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন যবনপুর বা যবনেন্দ্রপুর হইতে জোনপুর নামের উৎপত্তি। তবে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইংরাজী ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান সম্রাট ফিরোজ শা জোনপুরে প্রথম মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত করেন। কথিত আছে তিনি প্রথমে তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করিবেন মনস্থ করেন, কিন্তু স্বপ্নাদেশ বশতঃ মালিক জুনার (দিল্লীর মহম্মদ তুগ্‌লকের) নামে উৎসর্গ করেন। জোনপুরের প্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নাম খোজা জাহান, তিনি মহম্মদ তুগলকের প্রধান খোজা ছিলেন ও ক্রমে তাঁহার উজীর হন। ইং ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাতার নিবাসী তাইমুর কর্ত্তৃক তুগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসন হইতে তাড়িত হইলে খোজা জাহান স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

খোজা জাহানের বংশ শারকী বংশ বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা বংশানুক্রমে প্রায় একশত বৎসর জোনপুরে রাজত্ব করেন। তাঁহারা কখন কখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতেন কিন্তু অধিকাংশ সময়ই স্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য চালাইতেন ও তাঁহাদের নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। এই জন্য দিল্লীর সহিত তাঁহাদের ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলিত। যখন সিকন্দর লোদি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন তখন শারকীবংশীয় হুসেন শা জোনপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বিদ্রোহ সিকন্দর লোদিকে এত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল যে তিনি হুসেনকে পরাজিত করিয়া জোনপুর অধিকার করেন এবং বিদ্রোহী হুসেন শার সমান্য মাত্র চিহ্নও রাখিবেন না স্থির করেন। শারকীবংশ নির্ম্মিত সমস্ত প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি তাঁহার আদেশমত ভূমিসাৎ করা হয়। ইহাই জোনপুরের আধুনিক দুরবস্থার প্রধান কারণ। নচেৎ আজ জোনপুর দিল্লী আগরার ন্যায় জগতের নিকট ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিত। ভগ্নপ্রাসাদ ও মসজিদের প্রস্তরস্তূপ হইতে প্রস্তর লইয়া ধনী মুসলমানগণ নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। জোনপুরের পতনের আরও একটি কারণ এই যে সিকন্দরের পুত্র জালাল জোনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার সহসা মনে হইল যে জোনপুর তেমন স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। সেইজন্য জালাল এই স্থান হইতে চার ক্রোশ দূরে জালালপুর নামে একটি নগর নির্ম্মাণ করেন, ও তাহা প্রাসাদ মসজিদ আদি দ্বারা সুশোভিত করেন। কিন্তু এখন সে সকলের কোন চিহ্নও নাই। কেবল তাঁহার নির্ম্মিত সৈ নদীর উপরিস্থ একটি সুদৃঢ় সেতু তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে।

ইংরাজী ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন কর্ত্তৃক জোনপুরের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় কিন্তু হুমায়ুন কিছুকাল জোনপুরে বাস করিয়া ইহার পূর্ব্ব সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন এবং কোন কোন মসজিদ পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। আকবর কর্ত্তৃক মুনিম খাঁ জোনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মুনিম খাঁ জোনপুরের শেষ শাসনকর্ত্তা। তৎপরে জোনপুরের শাসনভার নাজিম কিম্বা কেল্লার অধ্যক্ষের হস্তে অর্পিত হয়। অবশ্য তখন জোনপুর "প্রদেশ" ছিল না। কেবল মাত্র সহরের শাসন কার্য্য কেল্লার অধ্যক্ষের দ্বারা চালিত হইত।

দিল্লীর দরবার হইতে প্রত্যাগমনের সময় লর্ড কার্জ্জন জোনপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। এখানে নিকটবর্ত্তী সকল বিখ্যাত সহরে যাইবার অতি সুন্দর সুন্দর রাজপথ আছে। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরের গৃহগুলি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য সহরের ন্যায়ই নির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে মসজিদ বা কোন ধনী ওমরাহের সমাধিস্থল। এই সমাধিগুলি অধিকাংশই সংস্কারাভাবে জীর্ণ। পথে যাইতে যাইতে প্রায়ই এরূপ সমাধি সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনযোগ্য বস্তুর মধ্যে আমার ভাল লাগিল গুমতী নদীর উপরিস্থ সেতু ও কেল্লা। মুনিম খাঁ কর্ত্তৃক এই সেতুটি

নির্ম্মিত হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় চারি বৎসর লাগিয়াছিল। কথিত আছে যে একদিন আকবর নৌকা করিয়া গুমতীতে বেড়াইবার সময় একটি বৃদ্ধার ক্রন্দন শ্রবণ করেন ও অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে বৃদ্ধা নদী পার হইবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। তখন আকবর তাহাকে আপনার নৌকায় উঠাইয়া পার করিয়া দেন ও এই সেতু নির্ম্মাণের আদেশ দেন। ইহা ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহা প্রায় ৩৫০ ফুট লম্বা। ছয়টি সেতুস্তম্ভে ছয়টি প্রস্তর-লিপি পারসী ও আরবী ভাষায় খোদিত। সকল গুলিই বেশ পড়া যায়। তাহা ঈশ্বরের মহিমা, আকবর ও মুনিম খাঁর প্রশংসা ও সেতুনির্ম্মাণকারীর নাম ঘোষণা করিতেছে। আফজল্ আলি নামক কোন কাবুলী দ্বারা এই সেতুটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখানকার কেল্লা ফিরোজ শা কর্তৃক ইং ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখন ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। কেল্লার ভিতর এখন কেবল মাত্র একটি ছোট মসজিদ আছে। এই মসজিদ সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত হয়, তৎপরে অন্যান্য বড় মসজিদ প্রস্তুত হয়। এই মসাজদ ব্যতিরেকে কেল্লার ভিতর একটি হামাম্ বা Turkish Bath আছে। কেবল ফটকটি এখনও ঠিক দণ্ডায়মান আছে। কেল্লার ভিতর হইতে চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য অতি সুন্দর। গুমতী নদী কেল্লার পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতেছে। কেল্লার ভিতর সমস্তই ময়দান। স্কুলের ছাত্রগণ এখানে ফুটবল প্রভৃতি খেলিয়া থাকে। কেল্লার কতকটা এখন স্থানীয় কোতোয়ালীতে পরিণত করা হইয়াছে। কেল্লার ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেই একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জোনপুরের রাজ-কোষ হইতে দরিদ্রদিগকে ধনদান করিবার আজ্ঞা খোদিত আছে ও যদি কোন রাজকর্ম্মচারী তাহা অপহরণ করেন তাহাকে অভিশাপ করা হইয়াছে। মসজিদের সম্মুখে একটি প্রস্তর স্তম্ভে (monoloth pillar) আরবী ভাষায় খোদিত দুই তিনটি প্রস্তর লিপি আছে। তাহা কেবল ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিয়া খোদিত। কোন কোন অংশ পাঠ করা যায় না।

জোনপুরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মসজিদ পূর্ব্বে মহারাজ এই মন্দির ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু স্থানীয় সকল হিন্দু তাঁহাকে বাধা প্রদান করাতে তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই মন্দিরে যদিও উপাসনা রহিত হয় তথাপি ফিরোজ শা বা তাঁহার কোন শাসনকর্ত্তাকে এই মন্দির অথবা অন্য কোন মন্দিরে হস্তক্ষেপ করিবেন না এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। কিন্তু শারকী বংশীয় ইব্রাহিম্ খাঁ এই প্রতিজ্ঞাপত্র অমান্য করিয়া অটলা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ করেন ও এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। কেহ কেহ বলেন ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধমঠ ছিল। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ নিদর্শন নাই। মসজিদটি কেবলমাত্র প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একটি খুব বড় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। পশ্চিমে মসজিদের প্রার্থনা গৃহ। ইহার মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ কিন্তু তাহার সম্মুখে একটি অতি উচ্চ ফটকের ন্যায় অট্টালিকা অবস্থিত। সেইজন্য গম্বুজটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মসজিদগুলিতে অন্যান্য মসজিদের ন্যায় অত্যুচ্চ মিনারেট নাই। প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে দ্বিতল বারান্দা স্তম্ভশোভিত হইয়া অতি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। ইহাদের ঠিক মধ্যস্থলে এক একটি উচ্চ ফটক। এই মসজিদগুলি দুষ্প্রাপ্য মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত নয় বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্য্যের কোন হানি হয় নাই। সুনিপুণ কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ কৌশল ইহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। এখানে ফারসী ভাষায় তিনটি প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায় যে ফিরোজ শা ইংরাজী ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করেন ও ইব্রাহিম সা ইংরাজী ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। সংস্কৃতে আরও কয়েকটি লিপি আছে। তদ্দ্বারা জানা যায় যে ইহা হিন্দু ভাস্কর নির্ম্মিত। শারকী বংশীয় জোনপুরের শেষ অধিপতি হুসেন শা কৃত জামি মসজিদ্ অপর একটি প্রধান মসজিদ। কেহ কেহ বলেন ইহা কোন ফকিরের সম্মানার্থ নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। কেহ কেহ বলেন যে ইহা কোন দুর্ভিক্ষের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে শারকীবংশীয় ইব্রাহিম ও তাঁহার পরিবারবর্গ সমা-ধিস্থ। এইখানে একটি সমাধির উপরিস্থ প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। কথিত আছে যে উহা মর্ম্মর



জোনপুরে গোমতীর উপর আকবরনির্ম্মিত সেতু।



জোনপুর দুর্গে একশিলা স্তম্ভ, এবং মস্‌জিদ।

বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও চতুর্দ্দিকে স্তম্ভশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। তিন দিকে তিনটি ফটক। পূর্ব্বদিকের ফটকটি সিকন্দর লোদি কর্ত্তৃক ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখনও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। দুটি তিনটি প্রস্তর লিপিতে কোরাণ হইতে উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি সংস্কৃত প্রস্তরলিপি আছে কিন্তু তাহা পাঠ করা যায় না।

• জোনপুরের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক মসজিদ লাল-দরওজা। শারকীবংশীয় মাহমুদ শার পত্নী বিবিরাজি কৃত নিকটস্থ প্রাসাদের রক্তবর্ণ দ্বার হইতে এই নামের উৎপত্তি। এই মসজিদ সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। ইহাতে হিন্দু কারুকার্য্যের অংশ অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভগ্নাবস্থায়। সম্প্রতি ইহা সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্য আরও কমিয়া গিয়াছে। কোরাণ হইতে উদ্ধৃত উপদেশ দুইটি প্রস্তর ফলকে খোদিত। তিন চারিটি সংস্কৃত প্রস্তরফলক হিন্দু কার্য্যকলাপের পরিচয় দান করিতেছে। হিন্দু ভাস্কর নিযুক্ত করাই মসজিদে হিন্দুভাবের আধিক্যের কারণ।

জোনপুরের কতকগুলি প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তুর পরিচয় দান করিলাম। আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র জীর্ণ পুরাতন মসজিদ আছে। কিন্তু কোন প্রাসাদের চিহ্নও নাই।

জোনপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে দুঃখ হয় বটে কিন্তু এই দুঃখের সহিত কোন কষ্টকর স্মৃতি মনে উদিত হয় না। আমি মসজিদের ছাদের উপর হইতে জোনপুরের ঘনসন্নিবেশিত গৃহরাজিও বহু দূরে বৃহৎ আম্রকানন দেখিতে পাওয়া যায়—একদিন যে সকল স্থানে সুসজ্জিত প্রাসাদ শোভা পাইত ও সুন্দর উদ্যান তাহার শোভা বর্দ্ধন করিত, এখন সেই সকল স্থানে শৃগালগণের বাসস্থান। কেল্লার ধ্বংসাবশেষ হইতে গুমতীর বক্রগতি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। একটি সামান্য প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে জোনপুরের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শারকীবংশীয় অধিপতি মামুদ সা ও তদীয় পত্নী বিবিরাজি চিরনিদ্রায় শয়ান। তাঁহাদের মধ্যে জোনপুরের শেষ দুর্দ্দান্ত অধিপতি হুসেন শা চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। এক একটি সামান্য প্রস্তরখণ্ড তাঁহাদের বিশ্রাম-স্থল চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীশিশিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একাদশী ব্রত।

নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপে চারিদিক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদের নিদাঘচর্য্যার আয়োজনের শক্তিমত কোন ত্রুটিই হইতেছে না। বৈদ্যুত ব্যজন ঘূর্ণিত হইতেছে। যন্ত্রধারা উন্মুক্ত হইয়াছে। দ্বার-বাতায়ন-মুখ উশীরগুচ্ছে সমাবৃত। হিমসংস্পৃষ্ট বহুবিধ সুরভি-শীতল পানীয় দ্রব্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পিপাসা তবুও উপশান্ত হইতেছে না। প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। সকলেই অস্থির হইয়া পড়িতেছে। নিদাঘ নিবারণের নিখিল উপকরণই কোন ফল প্রসব করিতে পারিতেছে না।

আমরা যখন এই বিবিধ উপায়ে পরিবৃত থাকিয়াও গ্রীষ্মে দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছি না, তখন পাঠকগণ, ভাবিয়া দেখুন, যাহাদের জলবিন্দু গ্রহণ পর্য্যন্ত আমরা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি তাহাদিগকে এই সময়ে কতদূর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। ধন্য তাহাদের আমাদের কথায় বিশ্বাস, যে প্রাণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অস্ফুট কাতর ধ্বনি করিতেছে, তবুও তাহারা মুখ ফুটিয়া বলিবে না যে একটু জল চাই! আর আমরা? আমরা তাহাদের সরল বিশ্বাসের উপর যতদূর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারি তাহাতে কোন বিষয়ে স্বল্পমাত্রও পরাঙ্মুখ হইতেছি না! কর্ত্তব্য পালন করিতেছি! ধর্ম্মরক্ষা করিতেছি! শাস্ত্রের মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছি! ধিক্ আমাদের কর্ত্তব্যে, ধিক্ আমাদের ধর্ম্মে, এবং শত ধিক্ আমাদের শাস্ত্রমর্য্যাদায়।

আমরা অত্যল্পমাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়ি, দুই মাস গ্রীষ্মের যাতনা নিবারণ জন্য কত প্রকার আয়োজনে নিযুক্ত থাকি, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া আমাদের গৃহ-সংসার, যাহাদিগের দ্বারা নিয়ত পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে কাল যাপন করিতে হয়, তাহাদের এই বার মাসের কঠোর যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়াও আমরা দেখিতে পাই না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না। এতই আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি! এতই আমাদের শাস্ত্রানুরাগ! 'আমরা' শব্দে আমি পশ্চিম বঙ্গীয় উচ্চ বর্ণকে দ্বিজজাতিকে লক্ষ্য করিতেছি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ

জাতিকে। আমরা পশ্চিম বঙ্গীয়গণ একাদশী তিথিতে বিধবাগণকে, অসমর্থা হইলেও, কিঞ্চিন্মাত্রও আহার করিতে দিই না। সুবিষম ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে মরিতেও দেখিব, কিন্তু বিন্দুমাত্র ঔষধ প্রদান করিব না। ইহা অতিরঞ্জিত নহে। পশ্চিম বঙ্গের এতাদৃশ ঘটনা বিরল নহে। আমি নিজেই তাহার এক প্রধান সাক্ষী। সে কি এক লোমহর্ষণ ব্যাপার, পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিবরণে জানিতে পারিবেন!

১২৯৭ সাল। জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তি। গ্রীষ্মের প্রভাব সময়োচিত। আমাদের গ্রামে (হরিচন্দ্রপুর, মালদহ) কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের পরমপূজনীয়া বিধবা পিতামহী ঠাকুরাণী দিবা সার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহরে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। সে দিন একাদশী। তিনি বিধবা হইয়া কিরূপে ঔষধ সেবন করিবেন! গ্রামবৃদ্ধগণের মত হইল না। তৃষ্ণায় তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল, তেল মাথাইয়া জল ঢালা। তাহাই হইল, কিন্তু সেই ভীষণ রোগের জ্বালা, তৃষ্ণা কি ঐ প্রক্রিয়ায় উপশান্ত হইতে পারে? পিতামহী আমার পরদিন দ্বাদশীর অতি প্রত্যূষে ওষ্ঠপ্রান্তে এক-আধ বিন্দু জলগ্রহণ করিয়া তৃষ্ণার ও ব্যাধির জ্বালা হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন! আমরা বীর আর্য্যসন্তান, বীরের ন্যায় শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিলাম!

কলেরার ন্যায় ব্যারামেই যখন আমরা এইরূপে বিধবা বধ করিতে পারি, তখন নীরোগ অবস্থায় বিধবাগণের অনশন যন্ত্রণার দিকে যে আমরা আদৌ ভ্রূক্ষেপ করি না, ইহা বলাই বাহুল্য। পরিণত বয়স্কা বিধবাগণ একাদশী সন্নিহিত জানিয়া কতদুর ভীত হন, তাহাও দগ্ধ নয়নে বহুবার দর্শন করিয়াছি। আর যাঁহারা অতি শৈশবেই বৈধব্যবেদনানলে আহুতিরূপে নিক্ষিপ্ত, সেই ক্ষীরকণ্ঠ বালিকারা? তাহাদের অবস্থা আরও অরুন্তুদ। অনেকেই জানেন, যে সংসারে এইরূপ বালবিধবার অসদ্ভাব নাই, সে স্থানে ঐ নির্ব্বোধ বালিকাগণের দ্বারা একাদশী ব্রত পালন করাইবার জন্য সমস্ত পরিবারবর্গকে কতদুর অশান্তিভোগ করিতে হয়। তাহাদের কাতর ক্রন্দন শব্দে মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। তবুও সাহস করিয়া কেহ একপাত্র জলও তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবে না।

পাছে বাহিরে আসিলে কিছু খাইয়া ফেলে, এই ভয়ে গৃহ মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াও রাখা হয়! কোন কোন সময়ে বিধবা দুহিতার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বাষ্পপুলিতনয়না কোমল প্রাণা জননীও দুহিতার সহিত একই গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া একাদশীব্রত পালন করেন!

এই বিধবা বধের কি কোন প্রতিকার নাই? আমাদের ধর্ম্মব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহোদয়গণ সহমরণরূপ বিধবাবধের কোন প্রতীকার করিতে পারেন নাই; তাঁহারা কি এই একাদশীব্রত সম্বন্ধেও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? তাঁহারা কি ইহার যুক্তাযুক্তত্ব বিবেচনা করিবেন না? হিন্দুর শাস্ত্র কি এতই নিষ্ঠুর, যে তাহা এইরূপে স্ত্রীবধ করিবার অনুমোদন করিবে? স্ত্রীবধও যদি এইরূপে অনুমোদিত হয়, তবে সেই শাস্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। যদি বস্তুতই শাস্ত্র তাহা বলিয়া থাকে, আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, তবুও ত তাহার সংস্কার করা উচিত। তবেই ত শাস্ত্রের যথার্থ রক্ষণ হয়। জীর্ণ গৃহ সংস্কৃত না হইলে, কে তাহাকে আশ্রয় করিবে; এ অবস্থায় তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন অসম্ভব।

ভারতের সমস্ত প্রদেশেই দ্বিজগণের বসতি আছে, কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নহে। একাদশীর এতাদৃশ কঠোর নিয়ম পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না,— যতদুর জানিতে পারিয়াছি। এই বঙ্গদেশেরই অপর বিভাগে অসমর্থ বিধবাগণকে দুগ্ধ ফল-মূলাদি ভোজন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিধবাগণ দ্বারা পরিগৃহীত এই আচরণকে কোন মতেই অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এক নবদ্বীপাধিকৃত পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বত্রই ঐ এক মত দেখিতে পাওয়া যায়— অসমর্থ হইলে অনুকল্পবিধান সঙ্গত।

তত্ত্বনিরূপণ ও সকলের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অপক্ষপাত হৃদয়ে ধর্ম্মবিচার করিলে বিচারের ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই তাহা না করিয়া বিচারকগণ পূর্ব্ব গৃহীত স্ব স্ব মতকে যেকোন প্রকারে হউক সমর্থন করিবার জন্য চেষ্টা করেন; নিজের বিজিগীষাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। ফলে এই দাঁড়ায়, বিচারে তিনি নিরপেক্ষ [illegible]

করিয়া একটী দল বাঁধিয়া তুলেন, ও অনুকূল তর্কের আবিষ্কার করিতে করিতে নূতন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া ফেলেন।

একাদশীব্রতে যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, (১ সম্পূর্ণ উপবাস ও ২ অসমর্থপক্ষে কিঞ্চিদ্ ভোজন) তাহা কেহ সামঞ্জস্য করিয়া মিটাইয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক দুর্লভ। এক পক্ষের প্রামাণ্য স্থাপিত হইলে, অপর পক্ষের অপ্রামাণ্য দুর্ব্বার। যাঁহাদের পক্ষের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিরন্তর তর্কপ্রবাহ পরিচালনা করিতে থাকিবেন, যাহাতে বর্ত্তমানের ন্যায় কোন কালেই তত্ত্বনির্ণয়ের আশা করিতে পারা যায় না। অতএব প্রামাণ্য অপ্রমাণ্য বিচার না করিয়া, স্বীকার করিয়া লওয়া হউক উভয়ই প্রমাণ; তবে যে মত বহুলোকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। বার্ত্তিককায় কুমারিল ভট্টের পথ * অনুসরণ করিলে, বোধ হয়, এতাদৃশ ব্যবস্থা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যদি উভয়ই প্রমাণ হয়, তবে যে পক্ষ গ্রহণ করিলে প্রভুত মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই গ্রাহ্য। একাদশী ব্রতে অনুকল্প বিধানে বিবিধ অনর্থপাত নিবারিত হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে।

ধর্ম্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল সংস্কৃত নিবদ্ধ অক্ষর পংক্তি দেখিয়াই কিছু নির্ধারণ করা উচিত নহে। ইহাতে বহুদোষের সম্ভাবনা। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রমাণ, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না, বা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিও দেখিতে পাই না। মীমাংসকগণের ইহা অবিদিত নহে যে, আমরা এই নূতন মত প্রচার করিতেছি না। যাঁহারা সত্যসত্যই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতেন, তাঁহারাই বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। *

ধর্ম্ম মীমাংসা করিতে যাইয়া সকলেই নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র যে একই কথা বলিতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কতকগুলি স্থান আছে, যাহাতে সকলের ঐকমত্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য কোন কষ্ট কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন থাকে না। আবার আর কতকগুলি স্থানও আছে, যাহাদের অনৈক্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। এতাদৃশ স্থলে ঐক্য স্থাপন কেবল কতকগুলি দুরূহ তর্কজাল উৎপাদন করিয়া ফেলে।

যখন ধর্ম্ম অপকৃষ্ট হইতে থাকে, লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল অক্ষর পংক্তি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া সাধনেই বিপ্রতিপন্ন হইয়া উঠে, ও যথার্থ মঙ্গলকে বিসর্জ্জন দিয়া স্ব স্ব নির্ব্বন্ধ বা মিথ্যা সম্মান অহঙ্কারের পরিরক্ষণকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, তখন অন্তর্দৃষ্টির অভাব ও বহির্দৃষ্টির প্রাবল্যে লোক দিনে দিনে কল্যাণপথভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ অমঙ্গলকেও অমঙ্গল বলিয়া চিনিতে পারে না, প্রত্যুত অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়াই স্থাপন করিতে সযত্ন হয়।

উদ্দেশ্য-লক্ষ্য জানা থাকিলে, তাহা পাইবার অনেক উপায় হইতে পারে। কোন ব্যক্তি এক নূতন গ্রামে যাইবে। কেহ তাহাকে পথ বলিয়া দিল, এবং পথে কিরূপে যাইতে হইবে সমস্তই উপদেশ করিল। সে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াই হয় ত আশ্রিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপে এক অভিনব মার্গের উদ্ভাবন করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারে; উপদেশকের উপদেশ তাহার কোন উপকার না করিতেও পারে।

শাস্ত্রীয় বিষয়েও এতাদৃশ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। ইহার অনাদরেই আমাদের শাস্ত্রে শত শত নিয়ম উৎপন্ন হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে, ও উঠিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মীমাংসকগণের 'ব্রীহি-অবঘাত'কে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্রীহি-ধান্য হইতে তুষ পৃথক্ করিয়া লইলে, তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। তুষ ছাড়ান অনেক উপায়ে হইতে পারে, কিন্তু তাহা না করিয়া অবঘাতেরই দ্বারা তাহা করিতে হইবে, তাহা না হইলে,—

* "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদ্ অসতি হ্যনুমানম্" ইত্যাদি মীমাংসাদর্শনের (১-৩-৩) স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী নির্মূল বলিয়া কয়েকটী স্মৃতিবচনের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করেন। কুমারিলভট্ট তাহাতে বলিয়াছেন যে, ঐ স্মৃতি বচনের মূল বেদ নাই, তাহা কে বলিল, কেহ সমস্ত বেদ খুঁজিয়া দেখে নাই, এক সামবেদেরই এক সহস্র শাখা। অতএব যে পর্য্যন্ত ঐ স্মৃতির মূলভূত শ্রুতি বা বেদ পাওয়া না যায়, ততদিন ঐ স্মৃতি অনুসারে কাজ চলিবে না, বস্তুত ঐ স্মৃতিবচন অপ্রমাণ নহে! ১৩১২ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

* পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা দর্শনসূত্রের শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য। বঙ্গদর্শনের লিখিত প্রবন্ধেও তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রকারান্তরে তুষ ছাড়াইলে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, ইহা নিয়ম বিধি।

কেহ কাহাকে কোন কার্য্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান-কালে, স্বাভিমত সুগম উপায়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু নানা কারণে, যাহা একের সুগম, তাহা অন্যের দুর্গম। আজকাল উদুখল মুষলে তুষ ছাড়ান অপেক্ষা যন্ত্রের সাহায্যেই তাহা সুকর। যন্ত্রনিষ্পন্ন তণ্ডুলের অপর তণ্ডুল অপেক্ষা কোন অপকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না—যদি আমাদের শাস্ত্রানুসারে অবঘাতজাত তণ্ডুলের এক অলৌকিকত্ব অপূর্ব্বত্ব স্বীকার করা না যায়।

ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, এরূপ বহু স্থান আছে, যেখানে কোন নিয়ম স্বীকার না করিলে চলিতেই পারে না; যেমন চকমকি পাথর হইতে আগুন বাহির করিতে হইলে লৌহখণ্ড দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ঐ পাথরে আঘাত করিতে হইবে। কিন্তু এখানে এতাদৃশ নিয়ম করা ঠিক হইবে না যে, ডান হাতেই লৌহখণ্ড ও বাম হাতেই পাথর খানা ধরিতে হইবে। কোন লোকের হয়ত ঐরূপেই সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোন লোকের বাম হাতেই লৌহদণ্ড ও ডান হাতেই পাথর খানা ধরা সুবিধাজনক।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি এইরূপ মত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধাদিতে দক্ষিণাদিমুখে উপবেশন করিবার যে নিয়ম আছে, তাহা ত উচ্ছিন্ন হইল;—সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডকেই ত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইল! এ সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। শ্রাদ্ধাদিতে উপবেশনাদি সম্বন্ধে যে নিয়মবিধি, যজমান অনায়াসে তাহা অনুকরণ করিয়া চলিতে পারেন; তাহাতে কোন হানির সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত যদি কিছু লাভের প্রত্যাশা থাকে, তাহাও যদি হয়, হউক। একাদশী উপবাসে তাহা চলিতে পারে না। একাদশীর অনশনে কত মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হইতেছে, তাহা সকলেই, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গীয়গণ উত্তমরূপেই জানিয়াছেন ও জানিতেছেন।

একাদশীর উপবাস প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য অভিপ্রেত [illegible]

করিবেন না। শ্রী হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধে একাদশীতিথিতে বিধেয় অবিধেয় সমস্তই উপনিবদ্ধ আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই তিথিতে বিশেষ-রূপে সংযত হইয়া একাগ্রতায় ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে; ভগবানের উপাসনা করাই সেই তিথির প্রধান কার্য্য। এখন যদি ভগবানের উপাসনাই করিতে না পারা যায়, তবে বৃথা কেবল অনশন করিলে হইবে কি? পরিক্লিষ্ট শরীরে ও পর্য্যাকুলচিত্তে কি প্রকারে ভগবদারাধনা সম্ভাবিত হইতে পারে? একাদশী ব্রতের এই ভগবদারাধনারূপ দৃশ্যমান প্রয়োজনীয়তা যখন দেখা যাইতেছে, তখন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য কল্পনা করা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অসমর্থ লোকের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ পর্য্যন্ত অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই অনুকল্প বিধান যে স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বলিবার কোন হেতু নাই। একজনের একটী অযৌক্তিক অন্যায্য কথার উপর নির্ভর করিয়া এতদূর গুরুতর পাপকার্য্যের অনুমোদন কাহারও শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

বিচারকগণের এ কথাটার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত:—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যখন পিপাসায় অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণবায়ু শরীর হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করে, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত থাকিলেও ব্রতিনী কিঞ্চিৎ উদক্ পান, বা কিঞ্চিদ্ ভোজনকে কেবল স্মরণই করেন না, কাতর বচনে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনাও করিয়া থাকেন,—যদিও আমাদের ন্যায় কুলিশকঠোর পুরুষাপসদগণের বধির কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। এখন জিজ্ঞাসা করি এই মিথ্যাচরণ দ্বারা একাদশীর উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হয়? অতএব—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

এই ভগবানের উপদেশকেই অবলম্বন করিয়া কি আমাদের চলা উচিত নহে?

অসমর্থ বিধবাগণের উপবাসে অনুকল্পবিধান অনুজ্ঞাত হইলে সকলেই নিজ নিজ অশক্তি প্রকাশ করিয়া অনুকল্পই

করিবে, মূল উপবাস কেহই করিবে না—এ আশঙ্কা বৃথা। অসমর্থ হইয়াও যাহারা এখন শাস্ত্রানুরাগে উপবাস করিতে পারে, তাহারা কি ঐ শাস্ত্রানুরাগেই নিজের শক্তি-অশক্তি বিবেচনা করিবে না? কেহ এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেও তাহা বিশেষ বিচার্য্য হইতে পারে না। প্রত্যেক নিয়ম সম্বন্ধেই এই আপত্তি করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, সংসারে এতাদৃশ কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা সমস্তদিকেই কল্যাণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। যাহা একদিকে ভাল, তাহা অপরদিকে মন্দ। ভিক্ষুক আসিবে ভয়ে কে না পাক করিয়া থাকে?

কথা হইতেছে—যাহার দ্বারা কল্যাণ প্রচুর, এবং অকল্যাণ অল্প, তাহাই বিধেয়। অসমর্থ বিধবাগণের উপবাসে অনুকল্প বিধানে কল্যাণই প্রচুর, অতএব তাহাই বিধেয়।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ ধর্ম্মব্যবস্থাপকপদের গৌরবে নিজে অভিমানী হইয়াও, সামাজিক বিষয়ে মঙ্গলবিধান বা অমঙ্গল নিরাকরণে বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন না। কেহ বা করিলেও, অপরে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষচক্ষু নিক্ষেপ করিয়া নিগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কতই না উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। এক একজন তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, যে কোন পাঠকের তাহা লজ্জা, ক্ষোভ ও দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে। তাঁহাদিগকে কার্য্যের উপাদেয়তা বুঝাইয়া দিলেও, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের নির্ব্বন্ধ রক্ষাতেই যত্নবান্ থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রকেই রক্ষা করিতেছেন, লোককে নহে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, শাস্ত্র শাস্ত্রের জন্য নহে, শাস্ত্র লোকের জন্য। ইহলোক, পরলোক উভয়ই আছে, সত্য। কিন্তু যখন আমাদের উভয় লোকেরই সহিত সম্বন্ধ, তখন অন্যতরকে একবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবস্থাপকগণও তাহা করেন নাই; তাঁহারা উভয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব পশ্চিমবঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণ অবিলম্বে সচেষ্ট হউন, যাহাতে তাঁহারা এই নিরপরাধ বিধবাবধের দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে আত্মাকে, দেশকে ও শাস্ত্রকে মুক্ত করিতে পারেন। বিধবাগণের উপর এই অসীম অত্যাচার কখনই কল্যাণাবহ নহে। ভগবান প্রসন্ন হউন, 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

শ্রীবিষ্ণুশেখর ভট্টাচার্য্য।

লক্ষ্মণাবতী।

বৃহৎ এবং সুন্দর। সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। সেই অপূর্ব্ব সম্মিলনের জন্যই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক। কি সরোবর, কি সিংহদ্বার, কি নগরপ্রাচীর, কি উপাসনালয়,—সকল দৃশ্যই একরূপ, বৃহৎ এবং সুন্দর। সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন অন্যত্র নিতান্ত দুর্লভ। তাহার প্রধান কারণ,—গৌড়ের বিচিত্র ভাগ্য-বিবর্ত্তন। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে;—যাহা বৃহৎ, তাহাই কেবল কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে।*

যেখানে একদিন বৃহৎ রাজনগর ছিল, সেখানে এখন বিজন বন! তাহার স্থানে স্থানে হলচালনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এখানে সেখানে—কত স্থানে—কত পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ;—তাহার উপর বৃক্ষলতা;—বৃক্ষলতার উপর দিবসের আলোক এবং রজনীর অন্ধকার,—কখন গাম্ভীর্য্য, কখন সৌন্দর্য্য,—কখন গাম্ভীর্য্য-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন,—সকল সময়ের জন্য এক অন্তহীন অপূর্ব্ব দৃশ্যপট বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে।

পুরাকালে ভাগীরথীর এক শাখা এই প্রাচীন নগরীর পশ্চিমাংশে প্রবাহিত ছিল। তাহার জন্য সে কালের কবিকুল গৌড়নগরীর বর্ণনা করিতে হইলে, ভাগীরথীর উল্লেখ করিতেন। এখন ভাগীরথী সরিয়া গিয়াছেন। কেবল বর্ষাকালে এখনও পূর্ব্বাবস্থার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অন্য কালেও লোকে সেই পুরাতন খাতের প্রতি—ভাগীরথী বলিয়াই সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া থাকে।

এক দিকে ভাগীরথী, অন্য দিকে মৃৎপ্রাচীর, ইহার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ রাজনগর—তাহাই

* এক্ষণে গৌড়ের স্থানে স্থানে জীর্ণ সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণাবতীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভুবন বিখ্যাত গৌড়নগরের সাধারণ আয়তন। তাহার বাহিরে নগরোপকণ্ঠ, তাহা দশ ক্রোশ। পশ্চিমে ভাগীরথী-স্রোত নগর রক্ষা করিত। সে দিকে প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব দিকে মৃৎপ্রাচীর;—প্রথমে একটি, তাহার পর ১৫০ ফুট প্রস্থ গভীর পরিখা, তাহার পূর্ব্বে আবার মৃৎপ্রাচীর,—উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। এই মৃৎপ্রাচীরের তলদেশ প্রায় ২০০ ফুট প্রস্থ,—সমতলপ্রদেশ হইতে প্রাচীরের শিখরদেশ ৪০ ফুট উচ্চ। ইহার পার্শ্বদেশ ইষ্টকগঠিত ছিল; শিখরদেশে প্রহরী মন্দির দেখিতে পাওয়া যাইত;—এখন তাহার চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই! পূর্ব্বদিকের প্রাচীর হইতে পশ্চিমাস্তে ভাগীরথী পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এক রাজপথ প্রচলিত ছিল; এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরমধ্যস্থ রাজনগর উত্তর-দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত। উত্তরাংশ সমধিক পুরাতন; তাহার তুলনায় দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উত্তরাংশে অট্টালিকাদি অধিক নাই; দক্ষিণাংশেই তাহার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরাংশের প্রধান দৃশ্য—সাগর-দীঘি,—ঝুনঝুনিয়া মসজেদ,—মকদুম আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিমন্দির,—সদুল্লাপুরের গঙ্গার ঘাট,—এবং পরিখা প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গাকার বিজন বন। এই অংশই ইতিহাস বিখ্যাত "লক্ষ্মণাবতী।" তাহার প্রধান কীর্ত্তিচিহ্ন—

সাগরদীঘি।

ইংরেজাবাদ আধুনিক নগর। তাহাই এখন মালদহ জেলার সদর মোকাম। সেখানে আসিয়া গৌড় পরিদর্শনে যাত্রা করাই সুসঙ্গত। ইংরেজাবাদ হইতে এক মাইল বাহিরে আসিলেই, মৃৎপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন তাহার উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজি;—মধ্যস্থলে শকট চালনার উপযোগী রাজপথ;—তাহা নূতন পথ নহে;—মৃৎপ্রাচীরের শিখর দেশমাত্র। এই মৃৎপ্রাচীরের পূর্ব্বাংশে নিম্নভূমি; স্থানে স্থানে জলমগ্ন; সর্ব্বত্র শস্যক্ষেত্র। ইহার পশ্চিমাংশে সমতল প্রদেশ; স্থানে স্থানে বৃক্ষবাটিকা; অধিকাংশ স্থানেই বিজন বন। এই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, পরিখা প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গাকার বিজনবন দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার অনতিদূরে—দক্ষিণ ভাগে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর কাভেজা জঙ্গল। তাহাই সুবিখ্যাত সাগরদীঘির পাহাড়। জঙ্গলভেদ করিয়া সাগর দীঘিতে অবতরণ করিবার গ্রাম্য পথ;—তাহা এখন জনসমাগমশূন্য।

সাগরদীঘি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ;—হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়া সুপরিচিত।* তাহার বর্ত্তমান আয়তন ৫৫০ বিঘা! এরূপ সুবৃহৎ সরোবর হিন্দু বা বৌদ্ধ নরপালদিগের শাসন সময়েই নানা স্থানে খনিত হইত। কত কালে, কত শ্রমে, কত ব্যয়ে এই সুবৃহৎ সরোবর খনিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এই সরোবরে অবতরণ করিবার জন্য ছয়টি সোপানশ্রেণী গঠিত হইয়াছিল;—উত্তরে একটি, দক্ষিণে একটি, পূর্ব্বে দুইটি, এবং পশ্চিমে দুইটি,—তাহার ইষ্টক প্রস্তর স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু সোপানাবলী ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাগরদীঘি দেখিয়া, দেখিবার আশা পরিতৃপ্ত হয় না; বিজনবনের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইয়া, পর্য্যটকগণ পলক মধ্যেই দর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এখানে গজারোহণে গমন করাই প্রশস্ত।+

কাহার কীর্ত্তি দর্শন করিলাম? হিন্দু কীর্ত্তি সন্দেহ নাই;—কিন্তু কাহার কীর্ত্তি? নিকটে পরিখা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, সম্মুখে সুবৃহৎ সরোবর,—সমস্তই জনশূন্য,—সমস্তই একরূপ, বৃহৎ এবং সুন্দর। ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতি ভিন্ন তথ্য নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। জনশ্রুতি সাগরদীঘিকে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের কীর্ত্তি বলিয়া অদ্যাপি বিঘোষিত করিয়া আসিতেছে।§ এই সেই ইতিহাস বিখ্যাত "লক্ষ্মণা-বতী,"—হিন্দু রাজ্যের শেষ রাজধানী;—মুসলমানাধিকারের প্রথম বিজয়ক্ষেত্র,—এখন শ্মশানভূমির ন্যায় হায় হায় করিতেছে!

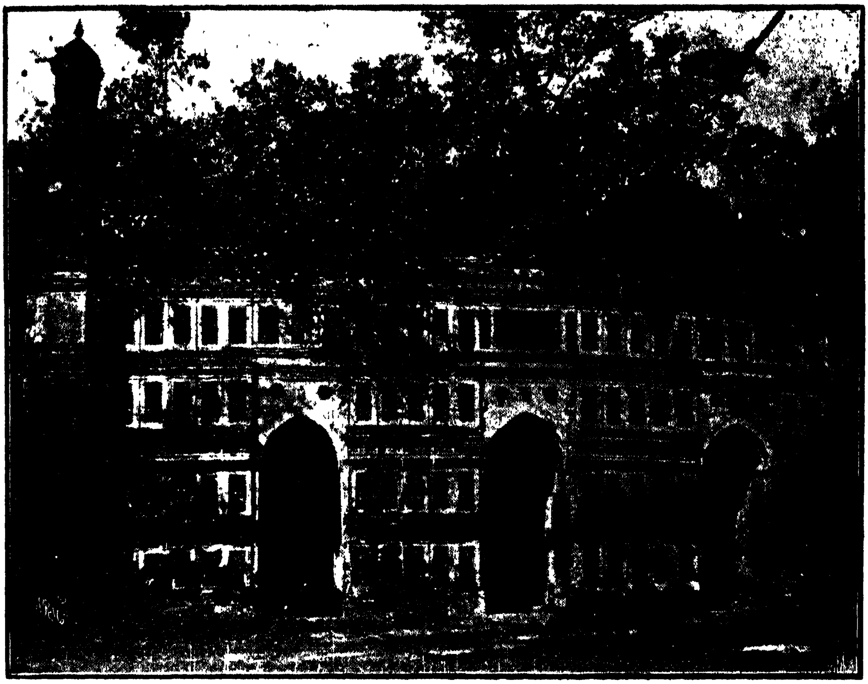
এত বড় বৃহৎ জলাশয়; তাহার তীরে দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান লিখিত ইতিহাসে লিখিত আছে,—লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে, বক্তিয়ার খিলিজি

---

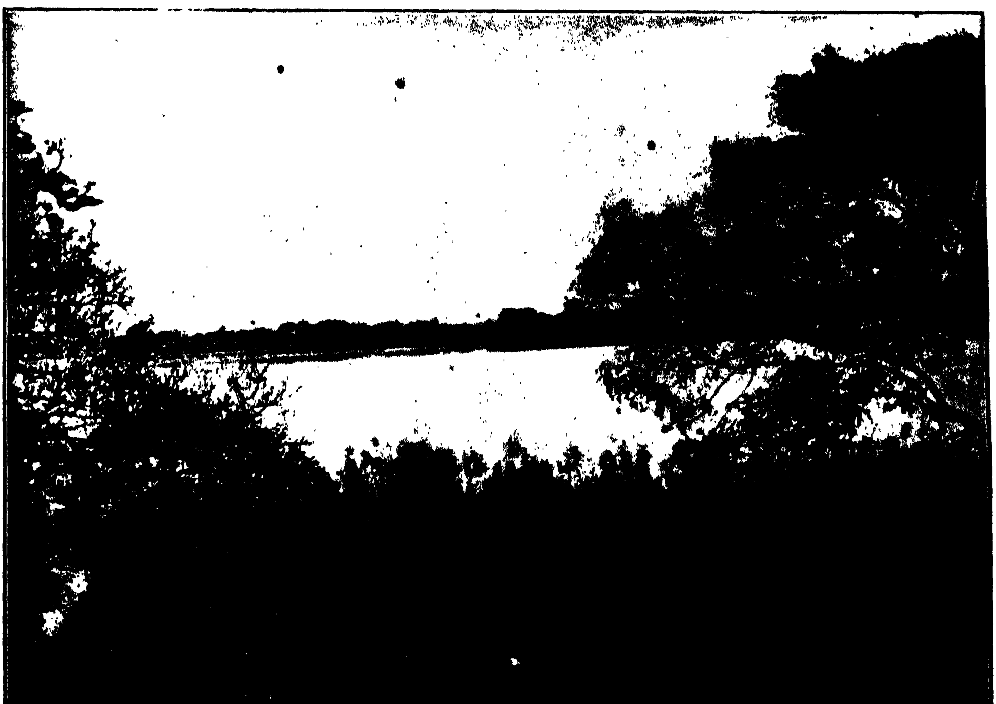
* Its length is from North to South, proving its Hindu origin.—*Ravenshaw's Gour, p. 6.*

+ এখন ধীবরগণ ইহার মধ্যে নৌকা লইয়া বাস করিতেছে। বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন বলিয়া, কোন স্থান হইতেই আদ্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নদী বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

§ This great work is said to have been commenced in the reign of Lachman Sein abbut A. H. 520 (A.D.



ঝুন্‌ঝুনিয়া মস্‌জেদ্‌



সাগরদীঘি

বহুসংখ্যক দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া উপাদান সংগ্রহ করেন এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়া, বিজয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। সুতরাং এত কালের পর দেবমন্দিরের চিহ্ন দর্শনের আশা নাই। কিন্তু দেবমন্দিরের ইষ্টকপ্রস্তর ভাঙ্গিয়া লইয়া বক্তিয়ার যে সকল মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, সেই সকল পুরাতন মস্‌জেদই বা এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কেবল সাগরদীঘির অনতিদূরে দুইটি মস্‌জেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তাহাও সমধিক পুরাতন নহে;—অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহারই একটির নাম

ঝুন্‌ঝুনিয়া মস্‌জেদ।

গঠনগৌরবে এই মস্‌জেদ পর্য্যটকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। ইষ্টকপ্রস্তরে সুগঠিত,—সুদৃঢ় বলিয়া এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বাহিরের ইষ্টক সজ্জা এবং ভিতরের প্রস্তরস্তম্ভ গৌড়ীয় গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব সূচিত করিতেছে। তাহার প্রধান প্রশংসার বিষয়—রচনাসামঞ্জস্য। মিনার, প্রবেশদ্বার, গম্বুজ পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে; অভ্যন্তরের খিলান, স্তম্ভ এবং কক্ষগুলিও সেইরূপ। উপরে তৃণগুল্মের অত্যাচারে গম্বুজ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে; সুদৃঢ় বলিয়াই এখনও মস্‌জেদটি দণ্ডায়মান আছে। এখানে পর্ব্বোপলক্ষে এখনও জনসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দিকে বিজন বন, তাহার মধ্যে এই বিচিত্র মন্দির,—ফলকলিপি ভিন্ন তাহার আর কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। ফলকলিপি মস্‌জেদের প্রবেশদ্বারের শিরোভাগে সংযুক্ত আছে। তাহা "তোগ্‌রা" অক্ষরে খোদিত। সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ফলকলিপি পর্য্যটকের সকল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে না। ইতিহাস লেখকের নিকট এই মস্‌জেদ নানা কারণে বহুমূল্য বলিয়া সুপরিচিত। ইহা কোন রাজা বা রাজপুরুষের কীর্ত্তি নহে;—নাগরিকের কীর্ত্তি;—একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার দান।* হোসেন শাহ বাদশাহের পুত্র মাহমুদ শাহের শাসনসময়ে হিজরী ৯৪১ শকে (১৫৩৪-১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) এই মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইবার কথা ফলকলিপিতে লিখিত আছে। তাহাতে মুসলমান মহিলার নাম নাই;—কেবল "মহিলা নির্ম্মিত" বলিয়া উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি সেই ধর্ম্মপ্রাণা মুসলমান-মহিলার নামানুসারে অদ্যাপি ইহাকে "ঝুনঝুনিয়া-মস্‌জেদ" বলিয়া ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে। সেকালে গৌড়ের নাগরিক ঐশ্বর্য্য কিরূপ ছিল, মহিলা নির্ম্মিত মস্‌জেদ দর্শন করিলে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম গোত্রের উল্লেখ না করিয়া নীরবে নিঃস্বার্থভাবে এরূপ বহুমূল্য মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়া যে মুসলমানমহিলা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা জানিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠে। সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। এই মস্‌জেদ পারিবারিক উপাসনালয় নহে; সাধারণের ব্যবহারার্থ উৎসর্গীকৃত "জুমা মস্‌জেদ"। সে কথা ফলকলিপিতে উল্লিখিত আছে।

যে দিন এই সুরচিত সাধারণ উপাসনালয়ে ভক্ত উপাসকগণ প্রথমবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের পবিত্র নামে সমবেত হইয়াছিলেন, সেদিন গৌড়ের পূর্ব্ব সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল; মস্‌জেদের সম্মুখে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের বাহিরে প্রাচীর, প্রাচীরে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার, তাহার বাহিরে রাজপথ,—এখন তাহা ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে! নিকটে জনমানবের বসতি নাই; কিন্তু সেকালে ঘন বসতি বর্ত্তমান ছিল। নচেৎ এরূপ বহুমূল্য মসজেদের প্রাঙ্গণ সংকীর্ণ হইত না। এখন এখানে ব্যাঘ্রভীতি;—স্থানে স্থানে হলচালনার সূত্রপাত হইলেও, ব্যাঘ্রভীতি বিদূরিত হয় নাই। শিকারীগণ এখানে আসিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন;—ব্যাঘ্র একবার সাগর দীঘির পাহাড়ের নিবিড় বনে পলায়ন করিলে, তাহার অনুসরণ করা অসম্ভব। এই মস্‌জেদের নিকটেই আর একটি মস্‌জেদ। তাহা ঠিক মস্‌জেদ নহে, তাহা

মক্‌দুম আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিমন্দির।

প্রাঙ্গণ আছে, প্রাচীর আছে, প্রবেশদ্বার আছে, পর্ব্বোপলক্ষে জনসমাগমেরও অভাব নাই;—কিন্তু সকলই কেমন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কারাভাবে সমাধিমন্দির জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে বৃক্ষলতা প্রশ্রয়লাভ

* Its builder is, a lady,—may she live long, and may God continue her high position ইহাই ফলকলিপির অনুবাদ।

করিয়া, স্থানটি ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। মকদুম সাহেব সাধুপুরুষ ছিলেন। মালদহ প্রদেশে এরূপ সাধুপুরুষের সমাধিমন্দিরের অভাব নাই। কিন্তু এই সমাধিমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

সমাধিমন্দির ইষ্টক প্রস্তরে গঠিত। প্রাঙ্গণদ্বারের ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—সুবিখ্যাত বাদশাহ হোসেন শাহ ৯১৬ হিজরী শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) একটি তোরণদ্বার নির্ম্মিত করিয়া, সাধুপুরুষের সমাধিমন্দিরের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা "ঝুনঝুনিয়া মসজেদ" নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। মকদুম আখি সিরাজুদ্দীনের নামের সহিত নানা অলৌকিক কাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই দুইটি মুসলমান কীর্ত্তি চিহ্নের অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে একটি গ্রাম্য পথ; তাহা ধরিয়া ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলে, পুরাতন সোপানাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটস্থ গ্রামের নাম সদুল্যাপুর। তজ্জন্য পুরাতন সোপানাবলীর নাম

সদুল্যাপুরের ঘাট।

এই স্থান হইতে মৃৎপ্রাচীরের আরম্ভ। একদিকে ভাগীরথী, অন্য দিকে মৃৎপ্রাচীর,—এখানেই তাহার সূত্রপাত। অবস্থান দেখিলে মনে হয়,—সেইকালে এই পর্য্যন্ত নগরসীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। মুসলমান শাসনসময়ে পুরাতন দেবমন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গঙ্গার ঘাট বিনষ্ট হয় নাই। এখনও গঙ্গাস্নানোপলক্ষে পুরাতন ঘাটে জনসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও মেলা বসিয়া থাকে, চিতা প্রজ্জ্বলিত হয়, তর্পণশ্লোকে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া থাকে। মালদহ প্রদেশে এই স্থান মুক্তিক্ষেত্রের ন্যায় সমাদর লাভ করিতেছে। তজ্জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে এই স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

ঘাটের অনতিদূরে যে মৃৎপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমধিক পুরাতন,—উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গুয়ামালতী* নামক গ্রামের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে নগরতোরণ বর্ত্তমান ছিল। এক তোরণের নাম "দ্বারবাসিনী",—দ্বার দেশে দেবীমূর্ত্তি খোদিত আছে। নগরলক্ষ্মী নগররক্ষার্থ দণ্ডায়মানা,—দেখিলে সেকালের স্বপ্নমোহে অভিভূত হইতে হয়। আর একটি তোরণের নাম "পাতাল-চণ্ডী"। এই সকল পুরাতন নাম ধরিয়া, লক্ষ্মণাবতীর নগরসীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

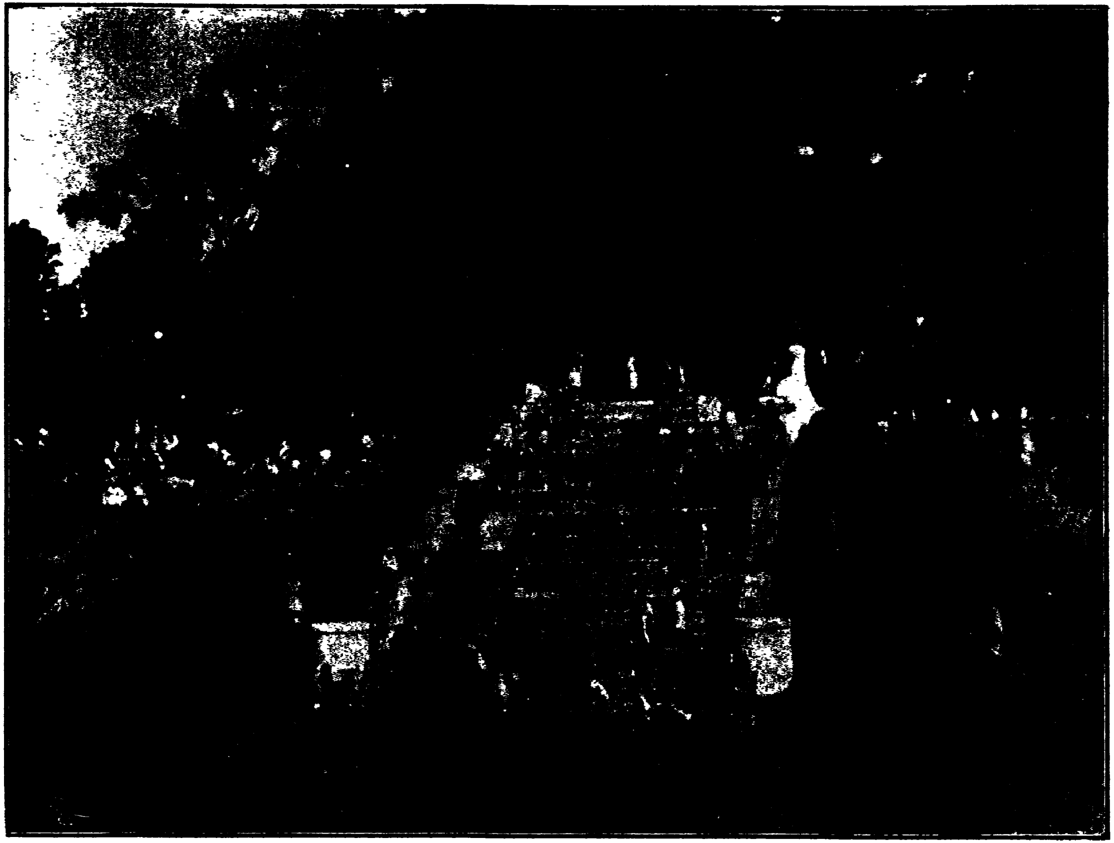
গোড়াধিপতি আদিশূর নরপতির বিশেষ আমন্ত্রণে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহা এদেশের প্রচলিত জনশ্রুতি। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে কোন্ স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক স্থাননির্দ্দেশে এরূপ মতভেদ অভাব নাই। মৎস্যদেশ—বিরাট ভবন—কীচকবধের স্থান বঙ্গদেশেও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহাভারতের বর্ণনার সহিত তাহার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য না থাকিলেও, লোকে স্বদেশের গৌরববর্দ্ধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণাগমনের কথাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়া আসিতেছেন,—পূর্ব্ববঙ্গের রামপালনগরই ব্রাহ্মণাগমনের পুণ্যস্থান। সেখানে এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন—গজারি বৃক্ষ—প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রামপাল একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু রামপাল কখনও সমগ্র গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল না। আদিশূর কোথায় রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মণগণই বা কোন্‌স্থানে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন,—তাহার কথা কুলশাস্ত্রগ্রন্থে যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের জনশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

আদিশূরের পূর্ব্বে বৌদ্ধাধিকার প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ নরপালগণকে পরাভূত করিয়া আদিশূর ধর্ম্মসংস্থাপন কামনায় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। কুলশাস্ত্র গ্রন্থেই লিখিত আছে,—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশ সিংহো
বিজিত্য বৌদ্ধনৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং দ্বিতিজান্ বিজিত্য
যথা সুরেন্দ্র স্ত্রিদিবং শশাস॥"

সেখানে—শূরবংশসিংহ আদিশূর বৌদ্ধ নরপালবংশের পরাজয় সাধন করিয়া, গৌড়রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া

* এখানে একটি ইংরেজকুঠি সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন কুঠি



সাহুল্লাপুরের গঙ্গাতীর।

কোথায়? রামপাল বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রসঙ্গ নাই; গৌড়ের প্রসঙ্গ আছে। রামপাল তাহার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু গৌড় নামে পরিচিত ছিল না। তবে কোন্ স্থান ব্রাহ্মণাগমন স্থান? কুলশাস্ত্রগ্রন্থে তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এইরূপ,—

"সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহুসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কাণ্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্॥"

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণগণের কাণ্যকুব্জ হইতে পাবন-পাপমুক্ত—সুরসরিদবধৌত—মনোজ্ঞ গৌড় নগরে আগমন করিবার কথা উল্লিখিত আছে। সেকালের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র এবং মগধদেশ বৌদ্ধাচারপ্লাবিত বলিয়া তীর্থযাত্রা ব্যতীত, অন্য ব্যপদেশে আর্য্যগণ তথায় পদার্পণ করিতেন না;—করিলে, পুনসংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। গৌড় ভাগীরথীসলিল বিধৌত বলিয়া পবিত্র এবং পাপমুক্ত। তাহা ছাড়িয়া গঙ্গাহীন পূর্ব্ববঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণ পদার্পণ করিতে সম্মত হইতেন কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কুলশাস্ত্রগ্রন্থের এই শ্লোক স্পষ্টাক্ষরে গৌড়নগরীকেই সূচিত করিতেছে।

সদুল্যাপুরের গঙ্গার ঘাটের গঠন পারিপাট্য, তাহার অদূরবর্ত্তী সাগরদীঘি নামক সুবৃহৎ সরোবর, সরোবরের নিকটে প্রাচীর পরিখাবেষ্টিত দুর্গাকার পুরাতন স্থান, এবং জনশ্রুতি সমস্বরে এই স্থানকেই "সুরসরিদবধৌত" গৌড়-নগরী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে।

যে জ্ঞানগৌরবের জন্য আধুনিক বঙ্গভূমি ভারতবিখ্যাত কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণই তাহার মূল কারণ। তাঁহাদের বংশধরগণের কীর্ত্তিকাহিনীতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে নব্যবঙ্গের পূর্ব্বপিতামহগণ প্রথম পদার্পণ করেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় গৌরবক্ষেত্র। কুলশাস্ত্র গ্রন্থের প্রমাণ সত্য হইলে, এই স্থানই সেই স্থান। তাহার কথা স্মরণ করিলে, ক্ষণকালের জন্য নিমীলিত নয়নে সেকালের স্বপ্নকাহিনী স্মরণ করিতে হয়। গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে মনে হয়,—এখনও বুঝি সেই বেদবেদাঙ্গপরায়ণ পঞ্চব্রাহ্মণের পঞ্চকণ্ঠসমুদ্ভূত ধীরোদাত্ত বেদধ্বনি পুরাতন সোপানাবলী হইতে অনন্ত আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া আর্য্যসভ্যতার মূলমন্ত্র বিঘোষিত করিবার জন্য অধস্তন বংশধরগণকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া কহিতেছে,—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্॥"

পুরাতন পরিখা, প্রাচীর, এবং রাজদুর্গের শূন্য স্থান, বিগতবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া ইতিহাসলেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহার রচনাপারিপাট্যের অন্য কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান নাই, সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহা মৃৎপ্রাচীর এবং পরিখা প্রাচীরের উপর বৃক্ষলতা; পরিখার জলে শৈবালদাম। এই পরিখা মুসলমান দুর্গের পরিখার ন্যায় প্রশস্ত নহে। দুর্গের নাম কি ছিল, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হলকর্ষণ প্রভাবে প্রাচীরের নানাস্থান সমভূমিতে পরিণত হইতেছে। পশ্চিমে অনতিদূরে ভাগীরথী—পূর্ব্ব প্রাচীরের বাহিরে জলাভূমি—এই স্থানকে দুর্গরচনার উপযুক্ত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকিবে। এই রাজদুর্গে হিন্দুবৌদ্ধের তুমুল সংঘর্ষ;—ইহাতেই হিন্দু মুসলমানের প্রথম কলহ কোলাহল। সে দিন যে ধ্বংসলীলার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেই রাজ-দুর্গ কালক্রমে বিজনবনে পরিণত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পাঠানশাসন সময়েও এই দুর্গ হয়ত ব্যবহৃত হইত। পাঠানেরা বঙ্গদেশে আসিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করায়, দিল্লীশ্বর বহুবার গৌড় আক্রমণ করেন। দিল্লীশ্বর কখন পরাভূত হইতেন, কখন বা সন্ধিবন্ধন করিতেন। এই সকল সন্ধি বিগ্রহের প্রসঙ্গে "একডালা দুর্গ" নামক একটি দুর্গের নাম ইতিহাসে লিখিত আছে। একডালা দুর্গ কোথায় ছিল, তাহা লইয়া নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ পূর্ব্ববঙ্গে—কেহ উত্তরবঙ্গে—তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সন্ধি বিগ্রহের ইতিহাস পাঠ করিলে, একডালাদুর্গ গৌড়ের নিকটেই অবস্থিত ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন হইতে একডালা আসিতে নদী পার হইতে হইত। সাগরদীঘির নিকটে "ডালখানা" নামক একটি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। অবস্থান দেখিলে মনে হয় পাঠান শাসন সময়ে সাগরদীঘির নিকটবর্ত্তী পুরাতন দুর্গ বিজন বনে পরিণত হইয়া থাকিলে এখানে "ঝুনঝুনিয়া মসজেদ" নির্ম্মিত হইত না। এ অঞ্চল অবশ্যই জননিবাসে পূর্ণ ছিল।

এখন সকলই এক পথে চিরপ্রস্থান করিয়াছে। হিন্দু বৌদ্ধের সাম্রাজ্য কলহ—হিন্দুমুসলমানের তুমুল দ্বন্দ্ব—সকলই নীরব হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবিলে বিষাদে অভিভূত হইতে হয়,—মানববিক্রমের এরূপ অলজ্ঘ্য পরিণামে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

এই সেই ইতিহাসবিখ্যাত গৌড়দুর্গ,—এই সেই লক্ষ্মণাবতী,—এই সেই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী,—এই সেই বিপুলবিজয়গৌরবের অচিন্তিতপূর্ব্ব মহাশ্মশান,—বৃহৎ এবং সুন্দর,—সৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলনক্ষেত্র,—সেকাল এবং একালের বিচিত্র সন্ধিস্থল,—এখন চিতাভস্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া, নীরবে কাল গণনা করিতেছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

জর্ম্মন শিক্ষানীতি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মনী বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অনেক পশ্চাতে ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জর্ম্মনগণ শিক্ষানীতির এমন আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছে, জর্ম্মানীতে নানাপ্রকারের শিক্ষা এত দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, যে ইংলণ্ডের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞগণ আপনাদিগের বাণিজ্যপ্রাধান্য রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহারা মনে করিতেছেন, ত্বরায় জর্ম্মনীর অনুকরণে শিক্ষাসংস্কার না করিলে ইংলণ্ডকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্ম্মনদিগের নিকট সর্ব্বত্র পরাজিত হইতে হইবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমরসচিব হল্ডেন (R. B. Haldane) এই চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া ১৯০১ সনে জর্ম্মনীতে গমন করেন এবং তথাকার শিক্ষাপ্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ সনের অক্টোবর মাসে লিবারপুল নগরে তৎসম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পরে তাঁহার 'শিক্ষা ও সাম্রাজ্য' (Education and Empire) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। আমরা উহার সারসংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আবশ্যক মত অপরাপর গ্রন্থ হইতেও তথ্য প্রদান করা যাইতেছে।

জর্ম্মনীতে প্রাথমিক (primary), মাধ্যমিক (secondary), শিক্ষা সম্বন্ধীয় (technical) এবং বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত—সমস্ত শিক্ষাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জবরদস্তী (compulsory) এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার সরকার বাহাদুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। (বলা বাহুল্য, জর্ম্মনীর "সরকার" বৈদেশিক নহে, সুতরাং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজপুরুষগণের করায়ত্ত হইলেও তাহাতে অনিষ্টসম্ভাবনা কম)। জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে (volksschulen) প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক বালক চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই সকল বিদ্যালয়ে বা এতদপেক্ষা উচ্চতর পাঠাগারে পাঠ করিতে বাধ্য। চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিলে প্রত্যেক ছাত্রকে আরও তিন বৎসর নৈশবিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। জর্ম্মনীতে ১৯০১ সনে ৬০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ঐ বিদ্যালয় সমূহে ১৩৮,০০০ শিক্ষক ও ৯০ লক্ষ ছাত্র ছিল। (মনে রাখিতে হইবে, জর্ম্মনীর লোক সংখ্যা ১৯০০ সনের ১লা ডিসেম্বর ৫,৬৩,৬৭,১৭৮ ছিল—৭৫ বৎসরে জন সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়াছে।) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক ব্যয় এক কোটি ৭৫ লক্ষ পৌণ্ড, তন্মধ্যে রাজসরকার হইতে ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার পৌণ্ড প্রদত্ত হয়—বাকি সমস্ত স্থানীয় কর দ্বারা সংগৃহীত হয়। (জর্ম্মনীতে শিক্ষানুরাগ এত প্রবল যে এই সকল বিদ্যালয়ে শতকরা ৩·৬ হইতে ৭ জনের অধিক ছাত্র অনুপস্থিত থাকে না।) প্রাথমিক শিক্ষা বে-খরচা (free)।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে জবরদস্তী (compulsory)। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সন্তোষজনক নিদর্শন পত্র (certificate) না পাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যবসায় (profession) শিক্ষা করিবার অধিকার জন্মে না। অধিকন্তু ঐ নিদর্শনপত্রের জোরে সামরিক বিভাগের কর্ম্ম হইতে এক বৎসর রেহাই পাওয়া যায়। (এখানে বলা আবশ্যক যে জর্ম্মনীতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কয়েক বৎসর সৈনিকরূপে কর্ম্ম করিতে বাধ্য—সুতরাং এক বৎসর রেহাই পাওয়া একটা মন্দ অধিকার নহে।) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রাচীন (classical) ও আধুনিক (modern)। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি আবার দুই প্রকারের—প্রথম

প্রকারের বিদ্যালয়ে ল্যাটীন পড়ান হয়—দ্বিতীয় প্রকারের পাঠাগার সকল উচ্চ শিল্পবিদ্যালয় প্রবেশোপযোগী শিক্ষা দেয়। জর্ম্মনীতে বালকদিগের জন্য ১,১০০ ও বালিকাদিগের জন্য ৩০০ মাধ্যমিক পাঠশালা আছে। ঐ সকল পাঠশালায় ২০,০০০ শিক্ষকের নিকট ৩,৭৫,০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। বার্ষিক ব্যয় ৪০ লক্ষ পৌণ্ড—উহার অধিকাংশ সরকারের দান ও ছাত্র বেতন হইতে প্রাপ্ত। এই সকল বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্তই সরকারী—দক্ষতার নিদর্শন পত্র না পাইলে কেহ উহাতে পড়াইতে পারে না। বালকগণ দশ এগার বৎসর বয়সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছয় বৎসর তথায় অধ্যয়ন করে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চ শিক্ষাও দুই ভাগে বিভক্ত—এইখানেই জর্ম্মনীর বিশেষত্ব। বিষয়বাণিজ্যনিরপেক্ষ উন্নত শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানসম্মত শিল্প শিক্ষার জন্য কলাভবন (technical Highschool) প্রধান প্রধান নগরমাত্রেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে আবার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। কলাভবনে যে সাধারণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যায়ই উন্নত, পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছে। বার্লিননগরের ঠিক মধ্যস্থলে কতকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ওগুলি কারখানা (Factories), কিন্তু তাহা নয়—উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগার (laboratories)। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ২২ জন রসায়নাধ্যাপক আছেন—তাঁহারা আপন আপন পরীক্ষিতব্য বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া নানা প্রকার তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এইরূপেই জর্ম্মনীতে কৃত্রিমনীল আবিষ্কৃত হয়—সম্প্রতি উহার ব্যবসায়ে প্রায় তিন কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে—ফলে ভারতে নীলের ব্যবসায় মাটী হইতেছে। আলকাতরা হইতে নানা প্রকার রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ব্যবসায়ে প্রায় চারি কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে। উহাতে পাঁচ শত রসায়নবিৎ, ৩৫০ এঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ এবং ১৮০০ শ্রমজীবী নিযুক্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ডে ঐ ব্যবসায়ে ৩০।৪০ জনের অধিক রাসায়নিক কর্ম্ম করে না।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যবসায়োপযোগী রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নহে। বার্লিনে একটী বিখ্যাত বিজ্ঞানশালা আছে, তাহার নাম Technische Hochschule (Technical High School)। উহা architecture, civil engineering, marine engineering, mechanical engineering, chemistry এবং general technical science, এই ছয় ভাগে বিভক্ত। রাজসরকার হইতে ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ইহাতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষার এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহার তুলনা ইংলণ্ডেও মিলে না। এই বিজ্ঞানশালায় তিনচারি হাজার ছাত্র হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিতেছে—বহুসংখ্যক অধ্যাপক অধ্যাপনাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে ইহার জন্য যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন আর তাহাতে সঙ্কুলন হয় না। জর্ম্মণীতে ২২টী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছেই তাহা ছাড়া এই শ্রেণীর ১০টী বিজ্ঞান-শালা আছে, নূতন আর একটী স্থাপিত হইতেছে। সরকার বাহাদুর তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের শতকরা সত্তরটাকা প্রদান করেন। এই সকল বিজ্ঞানালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু বেতন এত কম যে ছাত্রগণ উহা দিতে ক্লেশ বোধ করে না। জর্ম্মনীর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানশালাগুলি দেশবিদেশের বিদ্যার্থীদ্বারা পরিপূর্ণ। তাহার কারণ এই যে এখানে শিক্ষালাভ করিলে অন্নসংস্থানের জন্য ভাবিতে হয় না—শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই অক্লেশে জীবিকা উপার্জ্জন করা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জর্ম্মনীর বিশেষত্ব, একদিকে উচ্চতম জ্ঞানচর্চ্চা অপরদিকে বিষয়বাণিজ্যে উন্নততম বিজ্ঞান-প্রয়োগ। বার্লিনে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রভূত কর স্থাপিত হইয়াছে। লাইপজিগে (Leipzig) একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও তৎপার্শ্বে একটী বাণিজ্যবিষয়ক (commercial) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাসচিব (Minister of Education) সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেছেন, কোথায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক, বা কোন্ বিদ্যালয়ের কিরূপ পরিবর্দ্ধন প্রয়োজনীয়। ইহার জন্য যত অর্থের আবশ্যক হউক না কেন, অবাধে অর্থসচিবের

(Minister of Finance) নিকট হইতে তাহা আদায় করিতেছেন। (আমাদের কর্ত্তারা কোন্ স্কুল -বা কলেজ উঠাইয়া দিবেন, কোন্ অবৈতনিক কলেজটী বৈতনিক করিয়া গরিবছাত্রগণের ইহ-পরকাল নষ্ট করিবেন, তাহার অনুসন্ধানেই অধিক তৎপর।) জর্ম্মনীর ২২টী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২,৫০০ অধ্যাপক ও ২২,০০০ ছাত্র। ১০টী বিজ্ঞানশালায় (Technical High Schools) ৮৫০ অধ্যাপক ও ১১,০০০ ছাত্র। এতদ্ব্যতীত ১৮টী নিম্নতর শ্রেণীর শিল্প বিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক বাণিজ্য শিক্ষালয় (Commercial High Schools or Colleges) আছে। এক প্রুসিয়াতেই ২৫৯টি কৃষিবিদ্যালয় আছে। উহার ছাত্রসংখ্যা ১০,০০০। ইহা ছাড়া ১০০০ অপর প্রকারের বিদ্যালয় আছে তাহাতেও কৃষি-শিক্ষা দেওয়া হয়। (ভারতগবর্ণমেন্ট ৩০ কোটী প্রজার জন্য এক পুষা কৃষিকলেজ স্থাপন করিয়াই ভাবিতেছেন,বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষারচূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে)। বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অপর যাবতীয় শিক্ষার জন্য রাজকোষ ও স্থানীয় কর হইতে বার্ষিক ২ কোটী ৫০ লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় হয়। (ইহাতে জন প্রতি প্রায় সাতটাকা ব্যয় দেখাইতেছে। ভারতবর্ষে জনপ্রতি শিক্ষা ব্যয় বার্ষিক এ-ক-আ-না।) জর্ম্মনীতে কেমন দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৮১ সনে) যত নূতন সৈন্য গৃহীত হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রতি ৫৯ জনে একজন নিরক্ষর ছিল। তাহার দশ বৎসর পরে প্রতি ১৪১ জনে একজন, আর ১৮৯৮ সনে ১২৫০ জনের মধ্যে একজন নিরক্ষর দেখা গিয়াছিল। (ভারতে শতকরা ৮৯ জন অধিবাসী বর্ণজ্ঞান-শূন্য।)

জর্ম্মনীতে বিষয়বাণিজ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেমন বহুল-রূপে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মনী এক তোলা বিয়র-মদ রপ্তানি করিত না—আজ বৃটেনের সমপরিমাণ রপ্তানি করিতেছে। ইহার কারণ জর্ম্মনীতে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিয়র প্রস্তুত-করণে উৎকৃষ্টতর প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে জর্ম্মনরা বিয়র প্রস্তুত করিতে জানিত না বলিলেই হয়। এজন্য Sedlmayr ও Dreher নামক দুইজন জর্ম্মন ইংলণ্ডে গমন করিয়া বিয়রের কারখানাগুলি পরিদর্শন করেন এবং ইংলণ্ডীয় প্রণালীর দোষগুণ সম্যক বুঝিতে পারিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইলে বিয়র-ব্যবসায়ের আরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। ১৮৬২ সনে Brauer-bund নামক একটী সমিতি স্থাপিত হয়, বিয়র-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধান উহার লক্ষ্য। উহার সংশ্রবে ম্যনিক প্রভৃতি নগরে বিজ্ঞানশালা (Scientific stations) প্রতিষ্ঠিত হয়—বিয়র প্রস্তুতকরণে কোনও অভিনব সমস্যা উপস্থিত হইলে উহার মীমাংসার ভার ঐ সকল বিজ্ঞানশালার উপর অর্পিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে বিয়র প্রস্তুতকরণ শিখাইবার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জর্ম্মনী ও অষ্ট্রিয়ায় এই শ্রেণীর দশটী বড় ছয়টী ছোট বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অধ্যাপনা গৃহ (class-rooms) ও পরীক্ষাগার (laboratories) উভয়ই আছে, এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কার-খানা (experimental malteries and a brewery) রহিয়াছে। যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সৈনিককর্ম্ম হইতে একবৎসর রেহাই পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই এই সকল "বিয়র-বিদ্যালয়ে" প্রবেশ করিতে পারে। অধিকন্তু প্রবেশার্থীর বয়স ১৭ বৎসরের কম হওয়া আবশ্যক, এবং সে যে অন্ততঃ দুই বৎসর কোনও কারখানায় শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারও নিদর্শন চাই। শিক্ষয়িতব্য বিষয় যথা —পদার্থবিদ্যা (physics), সাধারণকল (General machinery), মদ তৈয়ার করিবার কল, অজৈব রসায়ন (inorganic chemistry) উদ্ভিদ বিদ্যা, বিয়র প্রস্তুত করণ, আমদানি রপ্তানি, বিয়রমূলক জৈব রসায়ন (organic chemistry), fermentation chemistry, Zymotechnical analysis, স্থাপত্য ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন পরীক্ষাগারে হাতে কলমে শিক্ষা তো আছেই। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আইন, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বক্তৃতা শুনিতে পারে। পরীক্ষা লিখিত ও হাতে কলমে—উভয় প্রকারের—শুধু মুখস্থ করিয়া পাস্ করিবার যো নাই—সংবৎসর ধরিয়া পরীক্ষার্থী যেরূপ কাজ করিয়াছে, তাহাও হিসাবে ধরা হয়। পরীক্ষো-

ত্তীর্ণ যুবক ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইয়া আরও দুই এক বৎসর কোনও কারখানায় কর্ম্ম করে এবং এইরূপে যথাসম্ভব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি অনেক কারবারে আগে ইংলণ্ডের অবিসংবাদী প্রাধান্যছিল। এখন জর্ম্মনী ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আলকাতরা হইতে বিভিন্ন প্রকারের রং (aniline colours) ইংলণ্ডেই আবিষ্কৃত হয় এবং ইংলণ্ডেই উহার কারবার আরম্ভ হয়। এখন উহা সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মনীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইংরাজব্যবসায়ীরাই এখন ঐ সকল রং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমদানি করে। ইহার কারণ কি? কারণ জর্ম্মনীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সমূহে ঐ বিষয়ের বহুল চর্চ্চা হইতেছে, এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে দিন দিন ঐ ব্যবসায়ের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কেবল স্কুলকলেজ দ্বারা শিল্পোন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা নহে। জর্ম্মনীতে এক প্রকারের বিজ্ঞানালয় আছে, উহার নাম Central-Stille। ইংলণ্ডে উহার অনুরূপ কিছুই নাই। মনে করুন কোনও ব্যবসায়ে উন্নত বিজ্ঞান-জ্ঞান আবশ্যক, অথচ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত বিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। তখন কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া একটী আদর্শ বিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠা করে। উহাতে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদিগকে নিযুক্ত করা হয় এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল প্রশ্ন তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হয়। এই বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত তত্ত্বানুসন্ধানের ফল ঐ ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়া ভোগ করে। ইংলণ্ডে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও অজ্ঞাত, সুতরাং ইংলণ্ড যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্ম্মনীর নিকট পরাস্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পুণ্যশ্লোক তাতার বিজ্ঞানশালা এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আশা করি, উহা দ্বারা ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইবে।

১৮৬৬ সনে সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথ্যু আর্নল্ড বলিয়াছিলেন:—"The methods of teaching in Germany were more gradual, more natural, and more rational than the English" [জর্ম্মনশিক্ষা পদ্ধতি ইংলণ্ডীয় পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর ক্রমোন্নতিশীল, অধিকতর স্বাভাবিক ও অধিকতর যুক্তি-যুক্ত।] বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় তাঁহার এই উক্তি প্রমাণিত হইতেছে। আজ কাল ভারতে যাঁহারা জাতীয়শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জর্ম্মনশিক্ষা প্রণালী অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। বঙ্গের নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জর্ম্মনীর অনুকরণে এই সকল বিদ্যালয়ে বে-খরচা প্রাথমিক শিক্ষা ও তৎপার্শ্বে উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিকশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এ দেশে কয়েক বৎসরে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। যে যে বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর অমনোযোগী, তত্তৎশিক্ষাই আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, নতুবা একই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া বহু শক্তি ও সময় ক্ষয় হইবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অযথা শক্তিক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

ভারতীয় মোসলমান। *

প্রথম যুগে ভারতবর্ষের সহিত মোসলমানের তিন প্রকার সংশ্রব ছিল, বাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যাধিকার। এই তিন উদ্দেশ্যেই প্রথম যুগে মোসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁহারা কেবল রাজ্য লোভেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেন। এই বিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত আরব জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। লোহিত সাগরের তীরবাসী আরবগণের সহিত মিশরবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে আরবগণ ষাণ্মাসিক বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনে পটু হইয়া উঠেন। তার পর মিশরের অধঃপতন ঘটিলে প্রাচ্য দেশ সকলের সমস্ত বাণিজ্য ও ব্যবসায় আরবগণের হস্তগত হয়। তাঁহারা মশলা, মণিমাণিক্য এবং গজদন্তের অন্বেষণ করিতেন বলিয়া ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের নাম তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রজালপূর্ণ ছিল। আদম ও হবা স্বর্গচ্যুত হইয়া যে তুঙ্গ শৈলে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা সিংহলে অবস্থিত বলিয়া জনশ্রুতি থাকাতে এই দ্বীপের সহিত পবিত্র স্মৃতি জড়িত ছিল। পরবর্ত্তী কালের আরবগণ সিংহল দ্বীপকে আদি মানবজাতির বাসভূমি বিশ্বাসে তীর্থরূপে পরিণত করেন।

যে সকল মোসলমান (মোপালা) দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মপ্রচার, কি বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিবার

* লণ্ডন Society of Arts নামক সমিতির অধিবেশনে মিঃ ইউসফ আলী এম, এ, এলএল, এম, (ক্যাণ্টাব) যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তদবলম্বনে লিখিত। এই অধিবেশনে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপায় নাই। এই সকল মোসলমান খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; এই সময়েই আরবগণ কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল। মোপালাগণ অদ্যাপি মালাবার উপকূলে আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশরূপে পরিগণিত রহিয়াছেন। তৎপ্রদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার তাঁহাদের মধ্যে এরূপভাবে অনুকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহারা এখন তামিল ভাষায় কথা কহেন এবং সেই ভাষাতেই কোরাণ পাঠ করেন; ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য মোসলমান হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে এবং তাহার পরেও বহুসংখ্যক ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রচারক ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে স্থায়িভাবে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে তৎপ্রদেশের সুগঠিত ও সমৃদ্ধ উদারমতাবলম্বী মোসলমান সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

ভারতবর্ষে মোসলমানের রাজ্যাধিকারই জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত। কারণ বিপুল সৈন্যের অভিযান সহজেই ছোট বড় সকলেরি চোখে পড়ে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্ব্ব প্রথমে মোসলমানের রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিনকাসেম (সাধারণতঃ মোহাম্মদ কাসেম নামে পরিচিত) মুলতান নগর অধিকার করেন। তৎকালে মুলতান সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু প্রদেশের শাসনজন্য মোহাম্মদ যে সকল ব্যবস্থা করেন, তাহা সাম্যমূলক ও ন্যায়াত্মক ছিল। বস্তুতঃ মোহাম্মদের শাসনকাল মোসলেম ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অংশ। মোহাম্মদ ব্রাহ্মণগণকে রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং আকবরে যে উদারমত বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার বীজ তদীয় হৃদয়েও নিহিত ছিল। সিন্ধু অধিকারের পর সে প্রদেশে বহুসংখ্যক মসজিদ ও মোক্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ জন্যও কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হিন্দুগণের সহিত ব্যবহার কালে সমদর্শিতার অভাব দেখা যাইত না। মোহাম্মদ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে পূজা অর্চ্চনার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; কাহাকেও তাহার স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করা হয় নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বংশের অভ্যুদয়ে ইসলাম পরিপুষ্ট হয়, এবং সে নূতন বংশের প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হিজিরী পঞ্চমশতাব্দীতে তুর্কিবংশের উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হয়, এবং তাহার বেগে সমগ্র মোসলমানজাতি আলোড়িত হইয়া উঠে। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুলতান মাহমুদগজনী। ইনি ১০০১ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সামরিক কীর্ত্তিলাভ, দেবমূর্ত্তির ধ্বংসসাধন এবং সোমনাথ ও মথুরা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরসমূহের ধনরত্ন লুণ্ঠন তাঁহার ভারতাক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। মোহাম্মদ-বিন-কাসেম জলপথে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুলতান মাহমুদ গজনী ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তবর্ত্তী গিরিপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই সময় আফগানিস্থান ভারতপ্রবেশের দ্বাররূপে পরিণত হয়। যে সকল আরব সেনাপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাঁহারা সকলেই ইরাণের শাসনকর্ত্তার আজ্ঞাধীন ছিলেন, ইরাণের শাসনকর্ত্তা আবার বোগ্দাদের খলিফার অধীন ছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের পথগামী আক্রমণকারীরা স্বস্বপ্রধান ছিলেন, কাহারও আজ্ঞাধীন ছিলেন না। এই কারণ তাঁহাদের যুদ্ধপ্রণালী অধিকতর সুসম্বদ্ধ ও সুদৃঢ় ছিল। ইঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষেই স্থায়ি নিবাস নির্দ্দেশ করেন। সুলতান মাহমুদ গজনীর পরে ভারতবর্ষ মোসলমান কর্ত্তৃক বহুবার আক্রান্ত হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষে বহু মোসলমান বংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তৎসমুদয়ের ইতিহাস সন্ধি বিগ্রহ, বিপ্লব বিদ্রোহ এবং পারিবারিক কলহের বিরক্তিজনক বিবরণেই পরিপূর্ণ। তবে এই সময় মধ্যে কতিপয় মনোজ্ঞ বা তেজোগর্ভ চরিত্র ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সুলতানা রিজিয়ার নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইনি নারী হইয়াও পুরুষ বেশে অশ্বে আরোহণ করিতেন। দুই একজন ধর্ম্মাত্মা নরপতির বিষয়ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা নিজেদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থে এক কপর্দ্দকও রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিতেন না। মোসলেম শাস্ত্রের আদর্শানুসারে অবসরকালে কোন প্রকার ব্যবসায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ভারতে মোগল রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে সকল সুলতান শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণচেতা অনুদার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং সুশাসন অথবা লোকহিতকর অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দ্বারা কাল-পৃষ্ঠে চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই।

মোগল নাম ঠিক নহে, তাঁহাদিগকে চাঘটাই তুর্কি নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। মোগলগণ বাবরের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান জয় করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উদ্যান, সরিৎ, ফল এবং সুরা তাঁহাদের প্রিয় ছিল। মোগলগণ কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য ক্রীড়া ভাল বাসিতেন। কিন্তু এই বলিষ্ঠ জাতির নিকট সঙ্গীত, কবিতা এবং সাহিত্যও উপেক্ষিত হইত না; তাঁহারা তৎসমুদয়ের চর্চ্চাতেও অবহিত থাকিতেন। মোগলরমণীগণ বিনা অবগুণ্ঠনে পুরুষ সমাজে উপস্থিত হইতেন। রাজার মন্ত্রণাকক্ষেও মোগলরমণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। পিতৃস্বসা প্রভৃতি বর্ষীয়সী আত্মীয়াগণের প্রতি মোগল-গণ সাতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গোলবদন বেগম নিজে কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী সেলিমা সুলতান বেগমও উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে তৎকালে আমীর ওমরাহগণ যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহার একখানি করিয়া সংগৃহীত হইত। অনেকের বিশ্বাস যে, ঈদৃশ মোসল-মান রমণীর সংখ্যা অত্যল্প, কিন্তু এই বিশ্বাস ভুল; বহুসংখ্যক মোসলমান-রমণীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও লিখিত হইবে। ঐসকল ব্যক্তির ইহাও মত যে, ইসলাম বহুগুণের আকর, কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রশংসার যোগ্য নহে জাহাঙ্গীর মদ্যপানে বিভোর হইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেন, আর তদীয় মহীয়সী মহিষী নুরজাহান প্রকৃত পক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজমুদ্রায় জাহাঙ্গিরের নামের পার্শ্বে নুর জাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত। আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেব উন্নিসা বেগম কোরাণের টীকা লিখিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক পারসী কবিতাও বিদ্যমান রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে গাজিয়াবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা গাজি উদ্দীনের সহধর্ম্মিণী গুন্না বেগম উর্দ্দুভাষায় কবিতা রচনা করিতেন; স্বয়ং কবি সৌদা গুন্নাবেগমের শিক্ষাদাতা ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, গুন্না বেগমের শুভবিবাহের সম্বন্ধ প্রথমতঃ অযোধ্যার নবাব সফদার জঙ্গের সহিত ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া মোগলসাম্রাজ্যের উজীরের সহিত সম্পন্ন হয়। ইহার ফলে বাদশাহের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটে; মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্য্যন্ত এই মনোমালিন্য সমভাবে ছিল। এই প্রসঙ্গে ভূপালের ভূতপূর্ব্ব বেগমের নামের উল্লেখও অত্যাবশ্যক। ইনিও সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে অদ্যাপি ভারতীয় মোসলেম সমাজের পর্দ্দার অন্তরালে সাহিত্যিকপ্রতিভা লুক্কায়িত রহিয়াছে।

যে সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া মোসলেম সমাজের ভিত্তি-ভূমি জীর্ণ এবং মোসলমানগণকে অধঃপতিত করিয়াছে, মোসলমান-মহিলার প্রাগুক্ত গুণ বর্ণনা দ্বারা তৎসমুদয়ের সমর্থন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে মোসলেমসমাজেরও পুনরুত্থান অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান উদীয়মান মোসলমান সম্প্রদায় ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীজাতির যে সুস্নিগ্ধ প্রভাব ও প্রসন্নদৃষ্টি জীবন উন্নত ও মধুর করিয়া তুলে, তাহা হইতে মোসলমানগণ সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবন্ধন বঞ্চিত রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই পাশ্চাত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরলোকগত জজ বদর উদ্দীন তায়েবজির ন্যায় আর কেহই একাগ্রচিত্তে যত্ন করেন নাই, এবং এতদ্বিষয়ে তিনি যে প্রকার সফলকাম হইয়াছেন, তদনুরূপ সাফল্যও আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই।

আকবরের চরিত্র ও তদীয় ইতিহাসপরিকীর্ত্তিত ব্যবস্থা সকল সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। আকবর অবিচলিত সাহস এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি আপনার শক্তি সামর্থ্য সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় ও সাম্যের প্রসারণ কল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আকবর শাহ শাসনব্যাপারে দুইজন প্রতিভাশালী রাজপুরুষের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন; একজন রাজা তোডরমল, অপরজন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ (মানসিংহ?) রাজস্বসংস্কারকার্য্যে তোডরমল বাদশাহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। মহারাজ জয়সিংহ অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন; তিনি রাজাদেশে কাবুলে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হন এবং তদুপলক্ষে যে গভীর রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহা রাজাপ্রজা উভয়েরই মহত্ত্বসূচক ছিল। এই দুইজন রাজপুরুষের সহায়তায় আকবরশাহ যথার্থ লোকহিতকর রাজব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তন করেন; সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজও এই সকল ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া তৎসমুদায় সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাঠানভূপতি সের শাহ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণ শাসননীতির যে রেখাপাত করেন, আকবর তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলেন, ইহা যথার্থ। কিন্তু সকলেই অন্যের ভিত্তির উপর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সমস্ত ব্যবস্থার উপর তাঁহার মনস্বিতার যে ছাপ পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁহার কৃতিত্ববাচক। যে দেশে একজাতি অন্যজাতির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং রাজনীতিতে ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রভাব বিস্তৃত করে, সে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কখনও স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কিন্তু জনসাধারণের একতা, সহযোগিতা, রাজানুগত্য ও রাজনৈতিক আস্থাই রাজা প্রজা, উভয়েরই সুখের নিদান,—আকবর শাহ রাজনীতির এই মূল সূত্র উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

নানা কারণে মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। আকবর শাহের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে তেজস্বী ও বিচক্ষণ রাজার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববিষয়ে লোকের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার পক্ষপাতী করিয়া তুলিবার ক্ষমতা ছিল না; যে কার্য্যপটুতা, পরিশ্রম এবং গঠনশক্তি কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মানুষকে সমর্থ করে, তাহারও অভাব ছিল। আমীর ওমরাহগণের হিংসা দ্বেষ এবং ষড়যন্ত্রও মোগল সাম্রাজ্য বিনাশের প্রবল কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আকবরও এই কারণের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। তারপর তদীয় উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে যখন কঠোর শাসননীতির সহিত হিন্দুবিদ্বেষ মিলিত হয়, তখন আমীর ওমরাহগণের হিংসা, দ্বেষ ও ষড়যন্ত্র পুনর্ব্বার নবতেজে দেখা দেয়। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পক্ষে উহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। বেতনভোগী সৈন্যগণ কর্ম্মবিমুখ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে নিয়মানুগত করিয়া তুলিবার শক্তি বাদশাহগণের ছিল না। যে সকল সৈন্যের বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বীরকীর্ত্তি লাভ তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। আর যে সকল সৈন্যের অপকার্য্যে সে সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুর্ব্বলচেতা ছিল। এই সকল সৈন্য শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিল, কিন্তু তাহাদের একযোগে কাজ করিবার উপযুক্ত নৈতিক বলের অভাব ছিল।

ভারতীয় মোসলমানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় দেখা যায় যে, তাঁহাদিগকে ইংরাজ কখনও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কখনও বা বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টান ছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী এঙ্গলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় মোসলমানের চরিত্রে অনেক সদ্গুণ দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, সর্ব্বোপরি তাঁহারা মোসলমানের ইতিহাস অবগত ছিলেন, এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতীয় মোসলমান অকারণে ইংরেজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন; কারণ, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করদরাজ মনপ্রাণে রাজভক্ত ছিলেন, এবং তদীয় বিচক্ষণ মন্ত্রী সার্ সলার জঙ্গ কার্য্যতঃ দক্ষিণাপথ ও মধ্যভারতের শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। মোসলমান সম্বন্ধে ইংরেজের অবিশ্বাস ও সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে ওয়াহেবী মতের প্রচারে তাঁহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তথাকথিত প্রত্যক্ষ কারণের উপর স্থাপিত হয়, এবং তজ্জন্য ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু তৎকালেও স্থির ধীর ব্যক্তি সকল কতিপয় লোকের অপরাধের জন্য সমগ্র মোসলমান সমাজকে দায়ী করিবার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন; কারণ, মোসলমান সমাজের পূর্ব্ব ইতিহাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে রাজদ্রোহিতা সে সমাজে অতি ঘৃণ্য পাপ বলিয়া পরিগণিত। ভারতীয় মোসলমানের ইতিহাসে বা ধর্ম্মে এরূপ কিছুই নাই, যাহা প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতি ও স্বাধীনতাবর্দ্ধক সাম্রাজ্যের অধিবাসীরূপে উচ্চ স্থান গ্রহণের পক্ষে বিরোধী। সম্প্রতি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত মোসলমানের সম্বন্ধ ক্রমশঃ সদ্ভাব ও সহৃদয়তা পূর্ণ হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের সর্ব্বোত্তম কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া এক সম্মিলিত স্বদেশহিতৈষী দল স্থাপনের সময় আগত হইয়াছে। হিন্দু অথবা ভারতীয় অন্য কোন জাতির প্রতি অন্ধ ও অনমনীয় বিদ্বেষ মোসলমানের জাতীয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি নহে। মোসলমান নেতৃগণ নৈতিক বল, স্বাধীনচিত্ততা ও আনুগত্যের সুসম্মিলন, লক্ষ্যের অকপটতা এবং সর্ব্বোপরি সাধুতা, সত্যবাদিতা এবং রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

ভারতীয় মোসলমানের উন্নতি, অবনতি, তাঁহাদের নিজ হস্তেই নির্ভর করিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মোসলমানের সংখ্যা ২৫ কোটি; তন্মধ্যে ভারতীয় মোসলমান সওয়া ছয় কোটি; লোক সংখ্যার হিসাবে ভারতে মোসলমান অপ্রধান বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জনসংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং যদি মোসলমান আপনাদের নৈতিক বল কতদূর তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রভাব লোকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশ্মীর ও পূর্ব্ব বঙ্গের মোসলমানেরা পল্লীবাসী কৃষক ও দরিদ্র; তদ্ব্যতীত আর সকল স্থানেই মোসলমানগণ সাধারণতঃ নগরেই বাস করিয়া থাকে। মোসলমান শিল্পিকুল প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। চিকিৎসা ও আইন প্রভৃতি ব্যবসায়ে মোসলমানগণ সম্মানভাজন হইয়া রহিয়াছেন; অবশ্য এই সকল ব্যবসায়ে তাঁহাদের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। শাসনবিভাগে চরিত্রের দৃঢ়তা বহুদর্শিতা ও পরিশ্রমপটুতা প্রভৃতি গুণের আবশ্যক; এই সকল গুণগ্রামেও মোসলমান শ্রেষ্ঠ, মোসলমানী সাহিত্য ওজস্বিতা ও সৌন্দর্য্যগুণে

উৎকৃষ্ট। এক বিষাদ ভাব এই সাহিত্যের স্বচ্ছ প্রবাহ আবিল করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু উচ্চ আকাঙ্খা ও নূতন চিন্তার বেগে সে আবিলতা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জয়াসবাসী মালিক মোহাম্মদ পদ্মাবতী নামক গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হিন্দিতে রচনা করিয়া জনপ্রিয় তুলসীদাসী রামায়ণ রচনার পথ পরিষ্কৃত করিয়াগিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কি অত্যুক্তি হইবে?

শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহই ভারতীয় মোসলমানের পক্ষে এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মোসলমানকে কেবল ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে ইসলামের সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করিতে হইবে; এই সকল ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্ম হইলেও তৎসমুদয় অসাম্প্রদায়িক এবং উদার হইবে। তারপর সামাজিক ব্যাপারেও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী আনয়ন করিতে হইবে; সামাজিক ব্যবস্থা সকল উন্নতির পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে, এবং সামাজিক বিষয়ে যাহাতে নারীজাতির অধিকতর সহায়তা লাভ করা যায়, তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দাতব্য বিভাগ এবং ওয়াকফ সুসংস্কৃত করিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে; এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা এক দিকে জাতীয় উন্নতি পরিপুষ্ট এবং অপর দিকে সকল প্রকার জড়তা ও কর্ম্মবিমুখতা নিরাকৃত হইবে। বর্দ্ধমান আলীগড় কলেজে সার সৈয়দ আহমদের প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি শিক্ষা সম্পর্কে মোসলমানের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে; কেবল পুরুষশিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই চলিবে না, স্ত্রীশিক্ষার কীদৃশ অবস্থা তাহাও দেখিতে হইবে। যে শিক্ষাপ্রণালীতে নিম্ন ও ও মধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা উত্তম ও লোকের অনুরাগবর্দ্ধক নহে, তাহা বৈষম্যোৎপাদক হয়। যদি কেহ আমার হস্তে জাতীয়উন্নতির পতাকা প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করেন, তবে আমি তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্য সকল অঙ্কিত করিব, "রাজার প্রতি দৃঢ় ভক্তি, স্বদেশের নিমিত্ত প্রীতি, সকল প্রতিবাসীর সহিত সদ্ভাব এবং নিজের জন্য অখণ্ড সততা।" আত্মনির্ভরশীলতা ভারতীয় মোসলমানের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা বাক্যে শেষ করা যায় না। কেবল মনঃকল্পিত নীতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ অথবা ক্ষণভঙ্গুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া মোসলমানগণ যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন তাহা অপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও সহায়তা আত্ম নির্ভর দ্বারা লাভ করা সম্ভব। ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহনীতি মোসলমান সমাজের পক্ষে অহিতকর হইবে, এবং এই বিংশ শতাব্দীতে পরানুগ্রহই পঙ্গুজাতির এক মাত্র যষ্টি নহে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সমসাময়িক ভারত।

(Ernest Piriouর ফরাসী হইতে)

নূতন সমাজ।

গেজেটে প্রকাশিত একটা রাজকীয় পরোয়ানা, আজিকার জাপানকে গড়িয়া তুলিয়াছে। যেরূপ সহজে জাপান রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে য়ুরোপীয় পাঠক শুধু নহে— যাহারা ইহার দ্রুত উন্নতি স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহারাও বিস্ময়বিহ্বল। কেহ কেহ মনে করেন, এ একটা চোখের ভুল। রঙ্গ-নৃত্যে নর্ত্তকীরা যেরূপ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার মুখস্ খুলিয়া ফেলে, ও তৎক্ষণাৎ গাল-ফুলো শিশুর মুখস্ পরিয়া, শিশুর মত আধো-আধো কথা বলিতে বলিতে আবার হঠাৎ আসরে নামে, এবং দর্শকেরাও তাহাতে ভুলিয়া যায়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

কিন্তু ভারত এরূপ পরিবর্ত্তনশীল নহে। ভারত দেড়শত বৎসর ইংরাজ-শাসনাধীনে রহিয়াছে, তবু এখনো বিলাতী বনিয়া গেল না। এ কথা ঠিক, "উদীয়মান সূর্য্যের" নব-সাম্রাজ্যের ন্যায় ভারত নিজ অদৃষ্টের প্রভু নহে। এ কথা সত্য, ভারত নানা কারণে জড়বৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হিন্দুর সমাজতন্ত্রই ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক; কেন না, হিন্দুসমাজ আদৌ উন্নতিশীল নহে। আরো ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, ব্রাহ্মণ-সভ্যতা ও এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন-সভ্যতা—এই দুই সভ্যতার মৌলিক বিরোধিতাই ইহার মুখ্য অন্তরায়। এ দুই সভ্যতা কোথাও আসিয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে না,—মিশিয়া যাওয়া ত দূরের কথা। তা ছাড়া বহুকাল ধরিয়া উভয়ই পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিল। তাই, দেড়শো বৎসরের শেষেও, ইংরাজের ঢেউ লাগিয়া, ব্রাহ্মণ-সমাজের শুধু বাহির কিনারাটা ভিজিয়াছে। স্বধর্ম্মভ্রষ্ট জাতিচ্যুত লোকের দ্বারাই এখনকার নূতন সমাজ গঠিত। এই সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি সমধিক হইলেও, ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম। এই বৃহৎ প্রায়দ্বীপের জনসংখ্যার তুলনায়, এ সম্প্রদায়ের লোক তিল পরিমাণ বলিলেও হয়;—অসীম তমোরাশির মধ্যে যেন দুই চারিটি জোনাকি জ্বলিতেছে। কিন্তু তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না,—য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব, হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই গূঢ় প্রভাব—এই অদৃশ্য সামাজিক আন্দোলন—আণবিক গতির ন্যায়, বিস্তার অপেক্ষা গভীরতায় বেশী। এই আন্দালন—বর্ণভেদ-ঘটিত স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, ধর্ম্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা—এই তিন আকারে দেখা দিয়া থাকে।

এ দেশের নবাগত প্রভুদিগকে, সে কালের হিন্দুরা যখন

খুব নিকট হইতে প্রথম দেখিল, তখন তাহারা কিরূপে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বেশ কল্পনা করা যায়। প্রত্যক্ষবাদী কাজ-সর্ব্বস্ব সওদাগর, অগ্রপশ্চাৎদর্শী শ্রমশিল্পের উদ্যোগী—যাহারা সকল জিনিসেরই শুধু বাজারদর নির্দ্ধারণেই সুপটু, সেই সব "জেণ্ট্‌ল্‌মেন" যাহারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কোন ধার ধারে না, যাহারা শুধু বাহ্যলালিত্যেই বিমুগ্ধ, যাহারা কায়দা-দুরস্তভাবে আহার করে, ফিট্‌ফাট্‌ ধরণে পরিচ্ছদ পরে, খুব খুটিনাটির সহিত ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করে, দেহচর্য্যাই যাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম, যে জাতি উদ্যম অধ্যবসায় ও কার্য্যতৎপরতায় উন্মত্তপ্রায়, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রাচীনতন্ত্রের হিন্দুদের সমস্ত ধারণা যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এই হিন্দুরা সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সন্ন্যাসী। ইহাদের নিকট বর্ত্তমান জীবনের প্রায় কোন মূল্যই নাই। জীবনের দুঃখ কষ্ট প্রশমন করা অপেক্ষা, কিরূপে জীবন হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সেই বিষয়েই তাহাদের অধিক চিন্তা ………এইরূপ অবস্থায়, তাহাদের জীবনের যে কোন কেজো উদ্দেশ্য থাকিবে, তাহাদের কাজের কোন বিনিময়-মূল্য থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যক্ষকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম :- "কালেজ ছাড়িয়া আপনার ছাত্রেরা কি কাজ করে? তাহাদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি?" মনে হইল, আমার এই প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন :—অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই অধ্যয়ন করে; পদমর্য্যাদা লাভের জন্য প্রায় কেহই অধ্যয়ন করে না। যেমন এখন, তেমনি পরেও, ভিক্ষার উপরেই উহাদের নির্ভর। অবশ্য ইহা জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ মাত্র। সকলেই এই আদর্শ অনুসারে কাজ করে না। কুসীদজীবী ও বেণিয়ার কথা স্বতন্ত্র।……কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোকদের ইহাই আদর্শ। ইহাই সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শ, মঠের আদর্শ, ধ্যানধারণার আদর্শ। বড় বড় ধর্ম্মসংস্কারক মাত্রই ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন।

এইরূপ মনের প্রকৃতি হইলে, যাহাকে আমরা উন্নতি বলি, তাহা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কথাটা যেন মনে থাকে, হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান জীবন জীবন-সোপানের একটি ধাপমাত্র—পরে আরো অনেক জীবন আছে। সংসারচক্রের ভ্রমণপথে যখন অনেকগুলি জীবন একে একে পার হইতে হইবে, তখন সঙ্গে বোজ্‌কা বুজ্‌কি যত কম থাকে ততই ভাল। যদি হিন্দু এ সংসারের অনিত্যতা অনুভব না করিত তাহা হইলে গৃহের বন্দোবস্ত ও সমাজের বন্দোবস্তের প্রতি আরো অধিক মনোযোগী হইত; দুঃখ কষ্ট প্রশমনে স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে আরো যত্নশীল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হেতু ইহসংসার একটি পান্থশালা মাত্র—যেখানে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন স্বল্প কালের জন্য আতিথ্য প্রাপ্ত হয়,—অতএব এখানকার জিনিষ পত্র যেখানে যেমনটি আছে ঠিক সেই ভাবেই সেইখানে রাখিয়া দেওয়াই ভাল—নাড়াচাড়া করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদের আবার তেমনি ঐহিক উন্নতির উপর অগাধ বিশ্বাস; এখানে পাকা আড্ডা গাড়িয়া, কিরূপে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারি আমাদের শুধু সেই চিন্তা;—পারত্রিক স্বর্গসুখের প্রতি আমরা উদাসীন। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায়, ইহজীবনের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাঁহারা স্বভাবতই রক্ষণশীল। গূঢ়ভাবেই হউক, প্রকাশ্যভাবেই হউক, —তাঁহারা পরিবর্ত্তন ও উন্নতির বিরোধী।

ইংরাজি সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা—এই দুই সভ্যতার আদর্শের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দেশজয়সূত্রে একদিন হঠাৎ এই দুই সভ্যতার মুখামুখী সাক্ষাৎ হইল। একটি হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল, অপরটি ভৌতিক উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী; একটি নিশ্চেষ্ট সহনশীল, প্রবল প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নতশির;—অপর সচেষ্ট উদ্যমশীল, প্রাকৃতিক শক্তির উপর আধিপত্য করিতে—প্রাকৃতিক শক্তিকে আপনার কাজে খাটাইতে সমর্থ। প্রথমটি নিঃস্বার্থ,—আত্মসুখকে অবজ্ঞা করে, ধন ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে; দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষবাদী, সুখমোহে মুগ্ধ, রজতকাঞ্চনের একান্ত অনুরাগী। হিন্দুসমাজে, ব্যক্তির নড়িবার স্থান নাই, ব্যক্তি যেন একটা জাঁতার মধ্যে নিষ্পেষিত। পক্ষান্তরে, ইংরাজ সমাজ, ব্যক্তিকে মুক্তিদান করে, ব্যক্তির নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য একটু খোলা বাতাস রাখিয়া দেয়, ব্যক্তির জন্য একটু স্থান

ছাড়িয়া দেয়। এ সমস্ত সত্ত্বেও এই দুই সভ্যতার কোন প্রকার দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। বিজয়ীরা বুঝিয়াছিলেন, কালের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। সাধারণতঃ দেশকে সভ্য করিবার দিকে তাঁহাদের বড় একটা চেষ্টা হয় নাই। দেশীয় সমাজেরও যেরূপ গঠন, দেশীয় সমাজ যেরূপ নমনশীল, উহার মধ্যে যেরূপ অসংখ্য বর্ণভেদ, তাহাতে করিয়াও দেশী সমাজ ইংরাজি সভ্যতার তোড় কতকটা আটকাইয়াছে—উহার ধাক্কা কতকটা সামলাইয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজ-শাসন অল্পই ধ্বংস করিতে পারিয়াছে এবং যাহা কিছু করিয়াছে তাহাও অজ্ঞাতসারে। ইংরাজ প্রকাশ্যে আপনার কোন মত জাহির করে নাই; ইংরাজ একথা বলে নাই—"হয় ক্রুশ নয় মৃত্যু"; ইংরাজ নিজ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছে; ধর্ম্মান্ধতা কিংবা ধর্ম্মোন্মত্ততার নিকট কোন সাহায্য গ্রহণ করে নাই। কিন্তু নদী যেমন অবিরাম প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে উহার পাড়কে ধসাইয়া ফেলে, সেইরূপ ইংরাজি সভ্যতার প্রভাব, অল্পে অল্পে গূঢ়ভাবে হিন্দুসমাজের উপর প্রকটিত হইতেছে। উহার জল চোঁয়াইয়া ক্রমশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। সমাজভিত্তির কোন এক টুকরা স্খলিত হইয়া যদি একবার এই স্রোতের মুখে পড়ে, তাহার আর নিস্তার নাই।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, সমাজ ও ধর্ম্ম এই উভয় লইয়াই ব্রাহ্মণ্য। সমগ্র ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বর্ণভেদপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যেক বর্ণ পরপ্রবেশরোধী ও গণ্ডীবদ্ধ। প্রত্যেক বর্ণসমাজ তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির হইয়া চিন্তা করে, কার্য্য করে; তাহার ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখে, তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে দেয় না, সমস্ত স্বাধীনতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে।

বর্ণভেদ প্রথাই য়ুরোপীয় সভ্যতার দুর্দ্দমনীয় প্রতিপক্ষ! প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রথার উপর প্রতিদিনই আক্রমণ চলিতেছে; কেন না, বিলাতী ভাবের যাহা কিছু হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই এই প্রথার বিরোধী। বর্ণভেদপ্রথা, বহুকাল ধরিয়া স্বীয় প্রতিরোধিনী শক্তির ও জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। এই বর্ণভেদপ্রথাই বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে বিদূরিত করে। এমন কি, এই প্রথা, এ দেশের মুসলমানের স্কন্ধে—খৃষ্টানের স্কন্ধেও চাপিয়া বসিয়াছে। এই বর্ণভেদপ্রথা বিজেতাদিগকেও নিরস্ত্র করিয়াছে, বড় বড় ধর্ম্মসংস্কারক যাহারা প্রথমে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহাদিগকেও আপনার দলে টানিয়া লইয়াছে। কেহ যদি উহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয় অমনি নুইয়া পড়ে; তাহার পিছনে গিয়া লুকায় ও তাহাকে আত্মসাৎ কিম্বা বিনষ্ট করে। বিবাহ ও আহার এই দুই প্রধান বিষয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করা যে কি সাহসের কাজ তাহা য়ুরোপীয়দিগের ধারণাতেও আইসে না। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ যদি কোন হীন পাত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিম্বা কোন বৈশ্য পতিত ব্রাহ্মণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করে তাহা হইলে তার কলঙ্কের আর সীমা থাকে না। যে দুঃসাহসী এই অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে তৎক্ষণাৎ সমাজচ্যুত হয়; তাহার বৈষয়িক ও সামাজিক মানসম্ভ্রম, তাহার সুখ-সম্পদ, তাহার ইষ্টদেবতা, তাহার জাতি—সমস্তই সে হারায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এইরূপ কলঙ্কঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

এই বর্ণভেদপ্রথা প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয় সরকারী শিক্ষাপ্রণালী হইতে। এখন নির্ব্বিশেষে সকল বর্ণের লোককেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্বে বিদ্যা, শাস্ত্রত ও কার্য্যত ব্রাহ্মণেরই একচেটিয়া ছিল,—ব্রাহ্মণের মানমর্য্যাদার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। একথা সত্য, যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে তাহাদের মধ্যে এখনো অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। অন্য জাতির লোকেরা য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রতি বিমুখ; এবং তাহার বিশেষ কারণও আছে। কিন্তু ইহা ত স্পষ্ট পড়িয়া আছে—যাহা সাধারণের পক্ষে তেমন সুলভ নহে এরূপ উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত না করিয়া, যাহা সাধারণের অর্থসাধ্য ও বুদ্ধির উপযোগী এরূপ প্রাথমিক শিক্ষা ও কেজো ধরণের শিক্ষা যদি বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে যাহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত, যাহারা ব্রাহ্মণ্যের পরিত্যক্ত উপকণ্ঠে বাস করে, সেই ভাসন্ত জনসাধারণ, সেই নীচ শ্রেণীর লোক, সেই 'পারিয়া'—তাহাদের মধ্যেও শিক্ষার প্রভাব পৌঁছিতে পারিত। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, শুধু কতকগুলি বাছা বাছা লোকের মাথাতেই দুই চারিটা নূতন কথা ঢুকাইয়া দিয়াছে; এবং সেই কথাগুলা তাহারা বেশ পরিপাকও করিয়াছে। সেই কথাগুলি এই :—

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত প্রযত্নের ফলদায়িতা; "জাতিভেদ সকলেরই জন্য" এই কথার পরিবর্ত্তে "প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার জন্য।"

অজ্ঞাতসারে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত মর্ম্মানুযায়ী অনেক কাজ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত— লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একটি গুরুপরিণামগর্ভ রাজবিধির ঘোষণা। কিন্তু তিনি যে উহার সমস্ত ভাবী পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের রাজবিধিই ভারতের "স্বত্বাধিকারের ঘোষণাপত্র" কিম্বা আরো ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, উহা সাম্যনীতির সনন্দ। উহাতে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "ভবিষ্যতে ভারতবাসী কোন লোক, কিম্বা মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতবাসী কোন প্রজা,— কি ধর্ম্মভেদ, কি দেশভেদ, কি জাতিভেদ—এরূপ কোন ভেদ বশতঃ কোন সরকারী উচ্চপদে কিম্বা সরকারী কোনও প্রকার কর্ম্মে নিয়োজিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেক না।"

আমি বেশ কল্পনা করিতে পারি—হিন্দুদের নিকট এই সুসমাচার যখন প্রথম পঠিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল; তাহারা হাঁ করিয়া শুনিয়াছিল—উহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু একটু পরেই বুঝিল,—যে প্রকার ভেদাভেদ তাহারা মানিয়া চলে, ইংরাজ-সরকার সে সমস্ত তুচ্ছ করিতেছে—ভারতের অকাট্য ও জটিল বর্ণভেদপ্রথাকে উহারা আমলে আনিতেছে না। সকল জাতিই সমান—এই নূতন কথা, এই অদ্ভুত কথা ইহার পূর্ব্বে তাহারা কখন শুনে নাই। তাই অনেকেই এই সাম্যনীতির নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা ইহার পক্ষ অবলম্বন করিল তাহারা অচিরাৎ ধনশালী হইয়া উঠিল।

আরো একটা গুরুতর কথা। বংশমর্য্যাদার খাতিরে কাহাকে কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। শুধু তাহা নহে, সরকারের অধীনে কোন সামান্য কাজ পাইতে হইলেও পরীক্ষা দিতে হইবে—প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা দিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা-প্রথা যার পর নাই (democratic) গণতন্ত্রমূলক। যেমন, কাশীর রাজা বলিয়াছিলেন,—"ছুতার কামার প্রভৃতি নীচ জাতির লোকেরাও এখন কোন প্রদেশের জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারে;—একজন ব্রাহ্মণের উপরেও হুকুম জারি করিতে পারে। এ কি সহ্য হয়?" অবশেষে রাজা বলিয়া উঠিলেন:—"গণতান্ত্রিক শাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত করা নিতান্তই অসঙ্গত"। অসঙ্গতই হোক্, আর সুসঙ্গতই হোক্, এই শাসনপদ্ধতিই ভারতে এখন প্রচলিত হইতেছে; সুতরাং এই পদ্ধতির নিকট এখন বর্ণ-ভেদপ্রথাকে নতশির হইতেই হইবে।

কিন্তু ইংরাজ এ সম্বন্ধে বেশী দূর অগ্রসর হন নাই। ইংরাজসরকার যেমন রাজবিধির দ্বারা দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজবিধির দ্বারা বর্ণ-ভেদপ্রথা রহিত করেন নাই। হিন্দুসমাজকে ভূমিসাৎ করা—সাম্যতন্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে সমস্ত একাকার করিয়া তোলা—এ বিষয়ে ইংরাজ সরকারের কোন বিশেষ প্রযত্ন ছিল না। ইঁহারা 'জ্ঞান-পাপী' নহেন। তবে বর্ণ-ভেদপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কতকটা অজ্ঞাতসারে 'পাপ' করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন সেই 'পাপের' ফল ফলিতে আরম্ভ হইবে।

আরো দেখ, এই বর্ণভেদ প্রথা, আজিকালকার চাল-চলনের প্রতিকূল। ইস্কুলের বেঞ্চি গুলা অনেক সময়ে বিভিন্ন বর্ণকে—বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের কাছাকাছি আনিয়া দেয়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দ্বারা, হিন্দুর পূত-দেহে যেটুকু অনন্যস্পৃশ্য মাহাত্ম্য ছিল, তাহা সহপাঠীদিগের দৈনন্দিন সংসর্গে, দৈনন্দিন সংস্পর্শে, দৈনন্দিন সহবাসে ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; ভেদাভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এখন হয় ত বাধ্য হইয়া অনেক সময় একত্র থাকিতে হয়, শুইতে হয়, এক গাড়ীতে যাতায়াত করিতে হয়। এখন ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, সভাসমিতির ছড়াছড়ি হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— সুতরাং এখন পরস্পরের সহিত মেলামেশার কোন বাধা নাই। এখানকার স্ত্রীলোকেরা যেরূপ অবগুণ্ঠনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, এখানকার পুরুষেরাও সেইরূপ কতকগুলা অন্ধ-সংস্কারের দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার মহা দিন সমাগত হইলে এই দুই পর্দাই যে খসিয়া পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল আচার ব্যবহারের প্রতি

উচ্চবংশীয় লোকের বিদ্বেষ ছিল, সহস্রবৎসরব্যাপী প্রচলিত প্রথা যে সকল বিষয় নিষেধ করিয়া আসিয়াছে, এখন হয় ত তাহাই বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণ হীনতা স্বীকার করিয়া হাতের কাজে—শ্রমের কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন এইরূপ কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া মনে করিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখনকার কালের গতি কোন দিকে, ইহার দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। শব স্পর্শ করা একটা অপবিত্র কাজ। পূর্ব্বে এদেশে এই কাজটা কতকগুলা ঘৃণিতজাতির একচেটিয়া ছিল। কিন্তু শবচ্ছেদ ব্যতীত চিকিৎসাসম্বন্ধীয় কোন শিক্ষাই হইতে পারে না; চিকিৎসাবিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসাপত্রও পাওয়া যায় না। যে হিন্দু ছাত্র, শবচ্ছেদের টেবিলের উপর, শবদেহে প্রথম ছুরী চালনা করে, সে অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল ইহাকে সাহসের কাজ বলিয়া কে মনে করে? এইরূপে, একে একে বর্ণবিশেষের একচেটিয়া চলিয়া যাইতেছে। এখনকার হিন্দুসমাজ প্রথমে একটুকরা জমিরও দখল ছাড়িতে চাহে না, পরে একটু একটু করিয়া পিছু হটিতে থাকে, এবং যখন কিছুতেই পারিয়া উঠে না, তখন ধীরগম্ভীরভাবে দখল ছাড়িয়া দেয়।

এদেশে আর্থিক অবস্থারও অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হঠাৎ-নবাব, ধনশালী ব্যক্তি, কুঠিওয়ালা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী—এই সব লোক বড় বড় সহরে (যেখানে তাহাদের কুলের খবর বড় একটা কেহ জানে না) সহজেই পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে। আবার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে প্রভূত অর্থদান করিয়াও কখন কখন তাহারা এই পদমর্য্যাদাকে বৈধ করিয়া লয়। বেণেদের উপর লোকের যে ঘৃণা ছিল তাহা ক্রমশই এখন চলিয়া যাইতেছে। অন্ততঃ যখন তাহারা খুব ধনশালী হইয়া উঠে, ও ধনের সদ্ব্যবহার করে, তখন লোকে তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করে না। বস্তুতঃ, উচ্চ বর্ণের লোকেরা আজকাল বণিক্‌বৃত্তি ও শিল্পকর্ম্মকে ততটা ঘৃণার চক্ষে দেখে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাতের কাজ ও কায়িক শ্রমের কাজ এখন আর হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সব ব্যবসায় জ্ঞানবিজ্ঞান-সাপেক্ষ, বর্ণভেদপ্রথার সহিত তাহাদের বড় একটা বিরোধ নাই। একজন ব্রাহ্মণ এখন ইচ্ছা করিলে ফোটো-চিত্রকরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। এ ব্যবসায়টা হিন্দু শাস্ত্রের নিকট অপরিচিত ছিল, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রে ইহার কোন নিষেধ নাই! অতএব, হাতের কাজের বিরুদ্ধে যে অন্ধ সংস্কার ছিল তাহা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। বিলাতীভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ এখন সুখসুবিধার মর্য্যাদা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুনি ঋষির বংশধরেরা এখন—খুব মৃদুস্বরে—টেলিফোনের বন্দনা গান এবং পার্শিরা উচ্চকণ্ঠে ধনের জয়গান করিতেছে। "একজন পার্শি তাহার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করিল,—পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; দুইজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল:—"মার্কিন দেশ।"

ইংরাজ-শাসনে, লোকের অবস্থা-বিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে। যে সকল লোক, বহুশতাব্দী হইতে অন্যান্য বর্ণের ঘৃণার পাত্র হইয়া—পদদলিত হইয়া জীবনযাপন করিতেছিল—যাহাদের না ছিল ধর্ম্ম, না ছিল শাস্ত্র—সেই সব পারিয়ারা এখন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। আর যাই হোক্, এই সকল পারিয়া কতকগুলা অন্ধ সংস্কার হইতে বর্জ্জিত ছিল: তাই শ্রমশিল্পের উদ্যোগীগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। তাহারাই এখন এই সব নূতন শিল্প-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বর্ণভেদপ্রথা যেমন একদিকে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপ আবার সময়বিশেষে নুইয়াও পড়ে; কখন অপরাধী ব্যক্তিকে নির্দ্দয়ভাবে সমাজচ্যুত করে, কখন বা আদর দেখাইয়া প্রশ্রয় দেয়;—এইরূপ নানা উপায়ে আপনাকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে * * * সমাজচ্যুতির দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার্য্য। বহুপুরাকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-দিগের উর্ব্বর-কল্পনা-শক্তি, অপরাধীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত একটা ফলদায়ক ও সহজ অনুষ্ঠানপদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে 'কালাপানি' পার হওয়া এতই গুরুতর অপরাধ, যে তাহার জন্য অপরাধীকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সহিত একটা রফানিষ্পত্তিও হইতে পারে। সমাজের অনুগত বিনীত বিদেশযাত্রী—যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া



ভারয় পক্ষীর গান।

Song of the Lark. By Jules Breton.

আবার সমাজে প্রবেশ করিতে চাহে—তাহাকে শুধু কতকগুলি বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবনতি স্বীকার করিতে হয় মাত্র। অতিসূক্ষ্ম অলৌকিকগুণযুক্ত একটি বটিকা—যাহাতে পঞ্চগব্যের সারাংশ আছে—সেই বটিকাটি গলাধঃকরণ করিতে হয়। তাহার পর, পুরোহিতের কর-কমলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাবর্ষণ। এই সম্মান প্রদর্শনে ও দক্ষিণা-দানে সমাজ পরিতুষ্ট।

অতএব দেখ, এই বর্ণভেদের সমাজ, কি তুচ্ছ মূল্যেই আপনার অধিকার ছাড়িয়া দেয়, এবং এক্ষণে যাহা নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত শুধু সেই কর্তৃত্বটুকু বজায় রাখিবার জন্যই তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। ইহা সত্ত্বেও এখনো উহা দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান। অনেক সময়, বর্ণগত ভেদাভেদ জাতিগত ভেদাভেদের উপর নির্ভর করে। এদেশে, জাতির মূল সোপান হইতে কতকগুলা ছোট-ছোট শাখা-সোপান নিঃসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতবিদ্য য়ুরোপীয় ও মধ্য-আফ্রিকার কাফ্রির মধ্যে যে ব্যবধান, এখানকার কাশ্মীরী পণ্ডিত ও অনার্য্য ভীলের মধ্যে সেই ব্যবধান। তাহার কারণ, আজিও বর্ণভেদ প্রথা, স্বকীয় প্রভাবপ্রতিপত্তি কতকটা বজায় রাখিয়াছে, বৈধক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, শাস্ত্রের মুখ্য অনুশাসনগুলি পালন করিতেছে। অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল; দুই একটা যাহাও ঘটে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আজকাল বিভিন্ন জাতীয় লোকের একত্র ভোজন কতকটা সহিয়া যাইতেছে। পার্শি, মুসলমান, য়ুরোপীয়দিগের সহিত হিন্দুরা এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছে, ইহা ত প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু যদি কেহ বিধবা বিবাহ করে, কিংবা নিকৃষ্ট বর্ণের কোন রমণীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের পতিত হইতে হয়। লাহোরের মন্ত্রণা-সভা (১৯০০) এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন,—যাহাদের মধ্যে একত্র আহারের চলন আছে, সেই সব শাখা-বর্ণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ এখনই চলিতে আরম্ভ হউক। এই প্রস্তাবটী কি সমাজ-বিপ্লব-কর প্রস্তাব?—কখনই না। জাতিভেদের মূল-ভাবের সহিত ইহার বেশ ঐক্য আছে। মন্ত্রণা-সভা এইরূপ যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্ব হইতে অনেক আটঘাট বাঁধিয়া। সভা পূর্ব্ব হইতেই কাশীর পণ্ডিতদিগের বিধান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতরা বলিয়াছেন, ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।

পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার পদ্ধতি রহিত হইলেও আমাদের ধর্ম্ম যেমন মরে নাই,—প্রত্যুত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন আকারে রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ বর্ণ-ভেদের ভাবটি যাহা অনেক সময়ে ভিন্নজাতীয় লোকের জাতিগত স্বাভাবিক সংস্কার বই আর কিছুই নহে—সেই ভাবটি হিন্দু নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও রহিয়া গিয়াছে। যে কোন হিন্দুর সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, প্রথমেই সে এই বলিয়া কথা আরম্ভ করে, "আমি ব্রাহ্মণ"—আমি যে ভাবে বলি—"আমি ফরাসী।"

এই জাতিভেদ প্রথা যদি শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে, ইংরাজ-শাসন ইহার উপর খুব একটা আঘাত করিতে পারিত। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মমূলক ব্যবস্থা, দেশ-বিশেষের জাতীয় ব্যবস্থা। ইহাই উহার প্রতিরোধিনী শক্তির নিগূঢ় রহস্য। যে দিন ফরাসী অভিজাতবর্গ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হারাইল, সেই দিন হইতেই তাহাদের অধঃপতন আরম্ভ হয়। কিন্তু তবু তাহারা একটা বিশেষ শ্রেণীরূপে আমাদের সমাজের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবন যাপনের একটা বিশেষ ধরণ আছে, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ মতামত আছে, কতকগুলি বিশেষ অন্ধসংস্কার আছে! ছোট লোক হইয়াও যাহারা বড় লোকের ভাণ করে, সেই Snob ও পুরাতত্ত্ববেত্তার চক্ষে, এই অভিজাতবর্গই পুরাতন জিনিসের—মৃত জিনিসের একমাত্র রক্ষক। আমাদের আভিজাত্যের মত এই জাতিভেদপ্রথারও কঠিন প্রাণ—উহা মরিয়াও মরে না। আমাদের অভিজাতবর্গের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে এখানকার জাতিভেদপ্রথারও কতকগুলা ডাল মরিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন কোন গাছের মত ইহারও ছায়া বিষময়। বর্ত্তমান যুগের সহিত এই প্রথার খাপ্ খায় না। ইহা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়,—ইহা সামাজিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। যেরূপ গুরুভার বর্ম্মাবরণে ইহা সমাজ-দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে

তাহাতে সমাজের চলৎশক্তি, সমাজের স্বাধীনতা, সমাজের ব্যক্তিগত চেষ্টা সমস্তই রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই, —জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক—সমস্ত সংস্কার-কার্য্য—সমস্ত পরিবর্ত্তন আজকাল ইহারই বিরুদ্ধে নিয়োজিত। এখনও উহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমান চলিতেছে, কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট লোকেরাও এই সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝে না, কিংবা উহার উপর, তাহাদের তেমন বিশ্বাসও নাই। দিন দিন এই সকল অনুষ্ঠানের সার্থকতা চলিয়া যাইতেছে এবং উহার মন্ত্রাদি এখন কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস বশতঃ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য এখন বিলুপ্তপ্রায়। তাই সমাজচ্যুতির দণ্ডকেও লোকে এখন সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

কোন একটা ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত, এ দেশে সমাজ-সংস্কারের কোন অনুষ্ঠানই সফলতা লাভ করিতে পারে না। এই ব্রাহ্মণ্যিক ভারতে, সামাজিক সমস্যা মাত্রই ধর্ম্মের সমস্যা। নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে একটা ধর্ম্মজাগৃতির আবশ্যক —কিংবা একটা ধর্ম্মবিপ্লবের আবশ্যক। এখানকার লোকেরা সাধু সন্ন্যাসী ও "বুজ্‌রুগ্"দিগের কথা ভিন্ন আর কারও কথা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। জনসাধারণের উপর —নূতন কোন আচার অনুষ্ঠানের, নূতন কোন পূজা-পদ্ধতির কিংবা জাদুমন্ত্রাদির যেরূপ প্রভাব এমন আর কিছুরই নহে। সম্প্রতি, যেখানে কতকগুলা আদিমবাসী 'বুনো'র বসতি সেই গ্রাম-কে-গ্রাম সুরার ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছে। যিনি এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছেন তিনি সেই পরিব্রাজক তত্ত্বদর্শী জাদুকর শ্রেণীর লোক যাহারা জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যাহাদের দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, যাহাদের কেশ জটাবদ্ধ, যাহাদের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত। ইনি একজন সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ, এই দুই সমসাময়িক সম্প্রদায় যাহারা সাহসপূর্ব্বক সমাজসংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহারা নব-হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদিগকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অকপট মৌলিকতার অভাব নাই—গভীর ধর্ম্মভাবের অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় কোন ধর্ম্মবিশেষের ঈশ্বরপ্রেরিত "পয়গম্বর" ছিলেন না। তিনি শুধু মনে করিয়াছিলেন,—বৌদ্ধ, ইস্‌লাম, খৃষ্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পৌরাণিক অংশ ও বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিয়া যদি উহাদের সারাংশ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একটা মানবসাধারণ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বৃথা প্রয়াস! ইহাকে একটা বিশেষ ধর্ম্মমত না বলিয়া, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের একটা পন্থা-বিশেষ কিংবা বিভিন্ন ধর্ম্মভাবের একটা সুন্দর সঙ্কলন বলা যাইতে পারে মাত্র—যাহা স্বাধীনচেতা উদারমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগেরই উপযোগী। বস্তুতঃ রামমোহন রায় বিশেষ-রূপে সমাজসংস্কারেই ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে সতীদাহপ্রথা রহিত হয়। তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র সমাজসংস্কারক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে পদক্ষেপ করেন। কেশবচন্দ্র উপবীত রহিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, জাতিভেদের সকল বন্ধনই তিনি ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে, বিবাহের বৈধবয়সের সীমা বর্দ্ধিত হয় এবং বিবাহে কন্যার সম্মতি-গ্রহণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০০এর সামাজিক মন্ত্রণা-সভায়, সভাপতি মহাশয় এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, এ দেশে যাহা কিছু সমাজসংস্কার হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের প্ররোচনায় ও সহকারিতায়। ইহাদের শাখা-সমাজ দেশময় পরিব্যাপ্ত। ইহাদের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত আছে, সেই সকল মত উহারা পুস্তিকাদিতে প্রকাশ করে, এবং প্রচারের জন্য লোকও স্থানে স্থানে প্রেরণ করে। এইরূপে কতকগুলি উদারভাবের মত উহারা দেশময় প্রচার করিয়াছে। পরিশেষে তাহাদের সমস্ত কার্য্য সামাজিক মন্ত্রণা-সভায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রতি বৎসর খৃষ্টমাসের সময় এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই অবিরাম প্রচার কার্য্যের ফলে, খুব গোঁড়া লোকদের মধ্যেও আজকাল পরমধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা ও উদারতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে। "পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের গৌড় ব্রাহ্মণেরাও এই গূঢ় রহস্যময় প্রভাবের বশবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিয়াছে"।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য-সমাজ জাতিচ্যুত ব্যক্তিদিগকে

সাদরে গ্রহণ করে। এই সব উচ্চশ্রেণীর 'পারিয়া' ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারক, রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র—যাহারা ইংরাজিতে সুশিক্ষিত—ইহাদের দ্বারাই এই নূতন সমাজ সংগঠিত। ইহারাই নব্যভারতের দল। জাতিচ্যুতি দণ্ডকে ইহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। উহাদের মধ্যে একজন আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"বিলাত হইতে যখন ফিরিয়া আসি, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা আবার আমাকে পাকড়াও করিবার চেষ্টায় ছিল। প্রায়শ্চিত্ত করিলে আবার আমি সমাজে গৃহীত হইব—এইরূপ তাহারা আমাকে আশ্বাস দিল। কিন্তু আমি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। কেন না, তাহা হইলে আমাকে সেই কদর্য্য পঞ্চগব্য গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আমার আত্মীয় বন্ধুগণ প্রথম প্রথম কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের মত আমা হইতে তফাতে থাকিতেন, পরে আবার তাঁহারা সকলেই আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন।" যিনি আমাকে এই সব কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সমসাময়িক ভারতের একজন রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের কোন কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, পরে ইংলণ্ডে গিয়া সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও তাঁহার উদ্যম চেষ্টার বলেই তিনি এখন একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাঁর জন্য বিলাতের (democracy) গণতন্ত্রদলের নিকটেও তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে ঋণী। তিনি তাঁহার জাতিকুল একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—আর তাহার গণ্ডীর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

সর্ব্বপ্রথমে যাহারা হিন্দুয়ানী ত্যাগ করে তাহারা অপর পক্ষ-কৃত অত্যাচারের উত্তর-স্বরূপ পাল্টা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। বন্ধনমুক্ত নব্যসম্প্রদায়, সেই সব স্বেচ্ছাচারীর দল, স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সম্মুখেই গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত সেকালের নব্যসম্প্রদায়ের একটা চিত্র দেখ;—ইরাজী শিক্ষার জন্য যাহারা গর্ব্বিত সেই হিন্দু যুবকেরা প্রায়ই ঘোর মদ্যপায়ী, গো-খাদক ও কক্কুট মাংসভোজী। তাহারা জল না মিশাইয়া খাঁটি মদ্যপান করিত, এবং তাহাদের কোন অন্ধ সংস্কার নাই—তাহার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে—ইহাই জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধমাংস ভোজন করিত। কেহ কেহ মনে করে, অতিরিক্ত মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভোজন—ইংরাজি শিক্ষারই অপরিহার্য্য ফল, কিন্তু তখনকার নব্য-ভারত মনে করিত, ঐরূপ পানভোজনেই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়—সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে এই পানভোজনই যথেষ্ট * * * তখনকার নব্যভারতের মতে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখা যারপরনাই অসঙ্গত। লোক-সমাজে রমণী উপস্থিত থাকিলে, সমাজের শোভাবৃদ্ধি হয়—একটা আকর্ষণ থাকে। পেরিক্লিসের সময়কার গ্রীকযুবক-দিগের ন্যায় তখনকার নব্যভারতও আস্পেশিয়া (Aspasiar) সংসর্গ অন্বেষণ করিত—যদিও গ্রীকদেশের মত এখানকার আস্পেশিয়া তেমন বিদুষীও ছিল না—গুণবতীও ছিল না। * * তখনকার নব্যভারত এই কথা বারম্বার বলিত যে, নৈতিক সাহস পাশ্চাত্য শিক্ষারই অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু এই নৈতিক সাহস ক্রমে আততায়ীর ভাব ধারণ করিল। একদিন, কতকগুলি হিন্দুযুবক, গোমাংস শুধু প্রকাশ্যরূপে আহার করিয়াই সন্তুষ্ট হইল না,—যেখানে কতকগুলি প্রাচীনতন্ত্রের হিন্দু বাস করিত তাহাদের বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়া, গরুর হাড় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল, আর "গোমাংস"! "গোমাংস!" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যিনি আমাকে এই সব কথা বলিতেছিলেন সেই রক্ষণশীল হিন্দু শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন;—"ইহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল"। তোমাদের কি স্মরণ হয় না, আমাদের দেশের পাদ্রিবিদ্বেষীর দল একবার কোন "পুণ্য শুক্রবারে" Sausage নামক মাংস-পিঠা প্রকাশ্যভাবে আহার করিয়া কি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিল? কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আজকালের নব্য সম্প্রদায় এবিষয়ে একটু সতর্ক হইয়া চলে। বোম্বাই হইতে লাহোর পর্য্যন্ত যে সকল কংগ্রেস-প্রতিনিধির সহিত আমি রেলগাড়ীতে একত্র ভ্রমণ করিয়াছি, তাহারা তাহাদের ভৃত্যদের নিকটে গোপন করিয়া রেলওয়ে ভোজনাগারের ম্লেচ্ছ-পরিবেশিত রাঁধা-মাংস ভোজন করিত। এই সব সরলচিত্ত লোকের নিকট অপদস্থ হইবার ভয়েই এইরূপ করিত।

এতক্ষণ আমি হিন্দুদের কথাই বলিয়াছি; কেন না,

সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু এই সব সুসভ্য আধুনিকভাবাপন্ন এসিয়ার লোক--যাহারা ইংরাজিতে চিন্তা করে, যাহারা ইংরাজি ধরণে জীবন যাপন করে, যাহারা দোলনা-কেদারায় আপনাদের গৃহ সজ্জিত করে, যাহারা "বীফ্ ষ্টিক্" আহার করে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার ইংরাজী খেলায় আমোদ পায়, যাহারা শরীর ধোলাই করিবার জন্য লণ্ডনে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেক পার্সি ও কতকগুলি মুসলমানও আছে। বোম্বাই নগরে জজ্ তৈয়াবজীর বাড়ীতে আমি একবার খুব মিশ্রধরণের মজ্‌লিস দেখিয়াছিলাম। প্রবাসী রাজারা সেখানে প্রটেষ্টাণ্ট বিশপদের সহিত রোমান ক্যাথলিক বিশপেরা পার্শি পুরোহিতদের সহিত মুসলমান মৌলবীদের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিতেছে, মেশামিশি করিতেছে। এইসব বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন ছাঁচের লোক এক টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে-- অথচ কেহই তাহাতে বিস্মিত কিম্বা বিরক্ত নহে। আমি একথা বলিতেছি না, সকল পার্সি সকল মুসলমানই হিন্দু-দিগের সহিত ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। আমি এখানে ইতর সাধারণের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে সকল পার্সি, যে সকল মুসলমান, হিন্দুদের ন্যায়, ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে জাতিগত কিংবা বর্ণগত কোন অন্ধসংস্কার নাই। "প্রত্যেক আংশিক সমাজ, বৃহৎ সমাজ হইতে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।" এই কারণে, বর্ণভেদের ভাব যে পরিমাণে কমে, সেই পরিমাণে জাতীয়ভাব বিস্তারের সুবিধা হয়। রাষ্ট্রীয় মহাসভায় পার্সি মেথা বলিয়াছিলেন :—"সাধারণ ভ্রাতৃভাবে হৃদয় আর্দ্র হইলে তবেই পার্সি ভাল পার্সি হইতে পারে, মুসলমান ভাল মুসলমান হইতে পারে, হিন্দু ভাল হিন্দু হইতে পারে." ইহা কি লক্ষ্য করিতেছ না, যেখানে দেশপ্রীতি বলিয়া কোন ভাবই ছিল না, কোন শব্দই ছিল না, সেই পুরাতন ভারত-ভূমিতে এইবার দেশপ্রীতি জাগিয়াছে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চক্ষুদান।

ধীর সন্ধ্যা ধীরে এল নেমে;
গৃহে মোর প্রদীপ জ্বলিল।
অতি স্নিগ্ধ, ক্ষুদ্র আলো রেখা
মৃদু উজলিল।
না চাহিতে, গৃহলক্ষ্মী আসি,
হাসিয়া সুধায়,
'পানীয় কি খাদ্য কি লাগিবে
সোণালী সন্ধ্যায়?'
বলিলাম,—'খাদ্য নাহি চাই
এ শুভ সময়ে,
যদি পার, সুগন্ধি পানীয়
এস সখী, লয়ে।
নির্ম্মল, রঙ্গিল হবে তাহা
গরম, সরস,
স্নিগ্ধ খুসি নিয়ে আসে যাহে
শ্রান্তি করি বশ!'

ধীরে হেসে, আজ্ঞা লয়ে শিরে,
চলে গেলা প্রিয়া;
—কি সুন্দর মন্থর গমন!
রহিনু চাহিয়া!

* * *

ম্লান মুখে, ধূম-উদ্গারিত,
পূর্ণপাত্র নিয়ে পদ্মহাতে,
নত মুখে দাঁড়াইলা প্রিয়া
আমার সাক্ষাতে।
বুঝিলাম, কোন বেদনায়
ব্যথিতা প্রেয়সী।
মুগ্ধ আমি, লুব্ধ নেত্রে চেয়ে
রহিলাম বসি!
চাহিতেই মোর পানে, তার
নয়ন ঝরিল,
জল ভরা পুষ্প দুটী যেন্
বাতাসে নড়িল!

কহিলাম, 'কি করিলে ! 'চা'য়ে
অশ্রু মিশাইলে ?
এত যত্নে ক'রে আহরণ,
মাটী করে দিলে ?'
সে কহিল, 'কত হতভাগ্য
তীব্র যাতনায়,
কত অশ্রু—কত তপ্তরক্ত
ক্ষিপ্ত বেদনায়
ঢালিয়াছে, আছে মাখা তাহা।
প্রাণেশ আমার,
শুধু এক বিন্দু দীন অশ্রু
সমবেদনার,
মিশাইয়া দিলাম যতনে :
ওগো প্রাণনাথ,
পান করে, প্রাণে প্রাণে লহ
জীবন্ত আস্বাদ।'
স্তব্ধ হয়ে শুনিলাম বাণী ;
অমূল্য ইঙ্গিতে
গলিল পাষাণ ; অশ্রু এল,
দীন-জীর্ণ-চিতে
তীব্র ব্যথা ছাইল নিমেষে।
দেখিনু প্রত্যক্ষ,
জীর্ণ, রুগ্ন, ক্ষুধিত কঙ্কাল
কত লক্ষ লক্ষ
বেদনায় যাতনায় আহা,
ভূমে ঢলে পড়ে ;
সেই পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত, তাহে
রক্ত নাহি ঝরে,
শুধু ফেটে শুষ্ক অস্থি জাগে ;
শত কষ্টে তুলি,
সেই দীর্ঘ হাড়ময় কর
নাড়িছে পুটুলি !
শিহরিল আন্দোলিত হিয়া।
বাড়াইয়া কর,
লইলাম পূর্ণ পাত্র খানি।
বক্ষের উপর
ধরিনু ছাঁপিয়া, তারপর
শিরে ছোঁয়াইয়া,
টেবিলে রাখিনু।—শুভ সন্ধ্যা
উঠিল ফুটিয়া,
নির্ম্মল বেদনা ভরা সুখে ;
বাঙ্গালীর প্রাণ
বারে বারে কাতরে কাঁদিল,
—কোথা ভগবান !

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন।

মাতৃপূজায় বলি।

বলিদান ভিন্ন কখন কোনও পূজা সম্পূর্ণ হয় না। দেবীর পূজায় বলিদানের আবশ্যকতা আছে। মাতৃভূমির পূজাতেও যে বলিদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। আমরাও বুঝিয়াছিলাম।

বিগত ৯ই মে, বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার সময় পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরে মাতৃপূজার প্রথম ও প্রধান বলিদান হইয়া গিয়াছে। এক একটী দেবীর পূজায় শত সহস্র বলিদান হইয়া থাকে; আমাদের মাতৃপূজায় যে কত বলিদান হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় মাতৃপূজার প্রথম বলি। যদিও লাজপৎ রায়ের অনেক মতের সহিত আমাদের মত মিলিত না, তাহা হইলেও, তাঁহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র স্বদেশ-প্রেম, অদ্ভুত আত্মত্যাগ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাগ্মিতায় আমরা মুগ্ধ ছিলাম। লাজপৎ রায় যথার্থই মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আমরা অনুমোদন না করিলেও, তাঁহার হৃদয়ের আমরা প্রশংসা করিতাম। এরূপ অকপট স্বদেশানুরাগ ও তেজস্বিতা আমরা আর কোথায় দেখিতে পাইব ?

কোন্ অপরাধে লাজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই লাজপৎ রায়ের এই মহাবিপদে আমাদের হৃদয় স্বতঃই ব্যথিত হইতেছে ; স্বতঃই আমাদের চক্ষু বাষ্পসমাকুল

হইতেছে এবং স্বতঃই তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, পুত্র ও পরিবার-বর্গের জন্য আমাদের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। লাজপৎ রায় এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের আদালতে তাহার বিচার হইল না এবং লাজপৎ রায়কেও আত্মসমর্থনের অবসর দেওয়া হইল না!

গুজব এই যে—আর এই গুজবটি পঞ্জাববাসী ভারতমাতার কতিপয় কুসন্তান এখন রটাইতে সাহস করিয়াছেন—গুজব এই যে, লাজপৎ রায় পঞ্জাবে একটী মহান্ ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার অধীনে না কি সহস্র সহস্র লোক ছিল। বৃটিশ রাজশক্তিকে খর্ব্বীকৃত করাই এই ষড়যন্ত্রের না কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিগত ১০ই মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। ঐ তারিখে লাজপৎ রায় সদলবলে না কি লাহোরের কেল্লা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই না কি পঞ্জাবের ছোটলাট ইবেট্‌শন্ বাহাদুর বড়লাটকে তারযোগে ইতিকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করেন; এবং বড়লাট বাহাদুর ভারত-সচিব মর্লি সাহেবকে এ সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করেন, এবং মর্লি সাহেব লাজপৎ রায় ও তাঁহার শিষ্য সর্দ্দার অজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করেন! জানি না, এই গুজবের মূলে কোনও সত্য আছে কি না; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইহার মূলে বিন্দুমাত্র সত্য নাই। যাঁহারা এখন এই গুজব রটাইতেছেন, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে তাহা রটাইতে সাহস করেন নাই। করিলে, লাজপৎ রায়, আদালতেই হউক, আর যে রূপেই হউক, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অবসর পাইতেন। কি কারণে, বিনা বিচারে লাজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন দণ্ড হইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট না জানাইলে, আমাদের জানিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই।

বৃটিশ রাজ্যের আইন এই প্রকার যে, বিনা বিচারে কোনও বৃটিশ প্রজার দণ্ড হইবে না। তবে লাজপৎ রায়ের এইরূপ দণ্ড হইল কেন? ১৮১৮ সালের একটি আইন আছে, তাহাতে বড়লাটকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কোনও ব্যক্তি বৃটিশ মিত্র রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ, অথবা বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে অশান্তি বা বিদ্রোহ ঘটাইলে, বড়লাট বিনা বিচারে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দেশান্তরিত করিতে পারিবেন। এই আইনের বলেই কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে পুনায় নাতু ভ্রাতৃদ্বয় ধৃত ও কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং এই আইনের বলেই আজ মহামনা ও স্বদেশপ্রাণ লাজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশান্তরিত হইলেন। ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে কি অসীম, তাহা এতদ্দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। আমরা ইংরাজের এই অসীম প্রতাপের কথা জানি। জানি বলিয়াই, আমরা স্বদেশপ্রাণ মাতৃভক্ত সন্তানগণকে সাবধানে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বারম্বার উপদেশ দিয়া আসিতেছি। ইংরাজ রাজা, আমরা প্রজা। এদেশে রাজশক্তি প্রবলপরাক্রান্ত এবং প্রজাশক্তি একান্ত দুর্ব্বল। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সংঘর্ষে দুর্ব্বলই চিরকাল বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। অন্ততঃ আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। জানি না, আমাদের কোনও কোনও নেতা এই ঘটনা হইতে কোনও শিক্ষালাভ করিবেন কি না।

বঙ্গদেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদ জন্য এক গুরুতর অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্জাবে অশান্তির কারণ কি? সেখানে জমিদার ও প্রজাসম্বন্ধীয় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে,* যাহাতে কি জমিদার কি প্রজা কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তৎপরে, কর্তৃপক্ষেরাও না কি খাল হইতে জল লওয়া সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাও প্রজাবর্গের পক্ষে সন্তোষজনক নহে। পূর্ব্বে শস্যক্ষেত্রের জন্য জল লইলে, ৩৲ টাকা ফী দিতে হইত। কিন্তু এখন কেহ কার্পাস-ক্ষেত্রের জন্য জল লইলে, তাহাকে ৮৲ টাকা এবং ইক্ষু-ক্ষেত্রের জন্য জল লইলে, তাহাকে ১২৲ টাকা ফী দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারণে, পঞ্জাবের জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যে, লাজপৎ রায় প্রমুখ পঞ্জাবের নেতৃবর্গ বৃটিশ শক্তিকে খর্ব্বীকৃত বা বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন, ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। লাজপৎ রায় বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির ন্যায় "ভিক্ষা-নীতি"র পোষকতা করিতেন না। তিনি পুরুষকার ও স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্বদেশে যাহাতে দেশীয় বস্তুর উৎপত্তি ও প্রচার

* এই আইন গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় নামঞ্জুর হইয়াছে। এ স্থলে প্রজাশক্তির জিত হইয়াছে—প্রবাসী-সম্পাদক।

হয়, তদ্বিষয়ে তিনি কায়মনোবাক্যে এবং কার্য্যেও চেষ্টা করিতেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি "বিদেশী বর্জ্জনে"র সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। পঞ্জাবের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর লাজপৎ রায়ের যে প্রভূত শক্তি ছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের "বিদেশী-বর্জ্জন" যাহাতে পঞ্জাবে প্রচারিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই যদি লাজপৎ রায়কে নির্ব্বাসিত ও পঞ্জাবের নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্ট যে মহা ভ্রম করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বিফল এবং প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যই যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রজাশক্তি যতই পদদলিত হইবে, ততই তাহা প্রবল হইবে। এই কারণে, আমরা লাজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। গভর্ণমেণ্ট এতদ্দারা ভারতব্যাপী যে মহান্ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যে সহজে প্রশমিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। লাজপৎ রায় যদি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আদালতে তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করিলে, কেহই অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু তাঁহার যে কি অপরাধ, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। রুশ গভর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়া রুষীয় প্রজাবর্গের নেতৃসমূহকে সাইবীরিয়া প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ভারতে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন, দেখিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। যে সময়ে বিলাতে উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য রহিয়াছে, জন মর্লির ন্যায় উদারমনা ব্যক্তি ভারতসচিবের পদে আরূঢ় রহিয়াছেন, লর্ড মিণ্টোর ন্যায় রাজপুরুষ ভারতের বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই সময়ে এইরূপ অনুদার-নীতির প্রবর্ত্তন করা যে কি ভয়ানক অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। প্রজাশক্তিই যে রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি, তাহা আমরা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি। সুতরাং প্রজাশক্তিকে দলন করিবার চেষ্টা করিয়া গভর্ণমেণ্ট কেবল আত্ম-অমঙ্গলই সাধন করিতেছেন।

আর লাজপৎ রায়? তাঁহার কথা আর কি বলিব? আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনিই মাতৃপূজার প্রথম ও প্রধান বলি। সম্ভবতঃ, এই পূজায় এইরূপ বলিদান আরও অনেক হইবে। তজ্জন্য স্বদেশ-সেবী মাত্রকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আজ পঞ্জাবে যাহা ঘটিল, কাল তাহা বঙ্গদেশে, পরশ্ব মাদ্রাজে এবং তৎপর দিন বোম্বাইয়েও ঘটিতে পারে। জীবন না দিলে, জীবন-লাভ ঘটে না। যাঁহারা এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ বলিদানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন। লাজপৎ রায়কে যখন স্পেশিয়াল্ ট্রেনে দেশান্তরিত করিবার উদ্যোগ করা হয়, তখন তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমতি লইয়া জনৈক বন্ধুকে এক পত্র লিখেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন :—"Don't be anxious about me. What God does, He does for the best." অর্থাৎ "আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন।" তেজস্বী হৃদয়ের কি তেজস্বিতা দেখুন! বিপদের সময় কি অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখুন! স্বদেশের মঙ্গলসাধনে কি আত্মবিস্মৃতি দেখুন! ধন্য, লাজপৎ রায়, ধন্য তুমি! তুমিই ভারতমাতার প্রকৃত ভক্ত সন্তান। এই কারণেই বুঝি সর্ব্বাগ্রে তোমারই বলিদান হইল। তোমার ন্যায় মহাপুরুষের বলিদান ভিন্ন দেবতার প্রীতি জন্মিবে কিরূপে? তুমি, ভারতমাতার পবিত্র ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলে বটে; কিন্তু শত শত ভারত-সন্তান তোমার স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। তোমার নাম গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে থাকিবে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যদিও সর্ব্ব সময়ে তোমার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু তথাপি তোমার শ্রদ্ধেয় চরিত্রে আমরা ভক্তিমান্ ছিলাম। তোমার এই বিপদকে আজ ভারতবাসী মাত্রেই আপনার বিপদ্ বলিয়া গণ্য করিতেছে। তুমি আজ নিজ প্রাণ দিয়া ভারতবাসীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া গেলে। ধন্য তুমি! ধন্য তুমি!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই।

আমরা অনেকে স্বরাজ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ইহা দোষের বিষয় নহে, বরং ভালই। এ বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি কথা স্মরণ রাখা উচিত।

যে সকল দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল দেশ কি স্বর্গে পরিণত হইয়াছে? তাহাদের কি আর কোন অসম্পূর্ণতা ও অভাব নাই? তাহা ত নহে। ঐ সকল দেশের লোকে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার জন্য, সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ করিবার জন্য, পানদোষাদি নিবারণ করিবার জন্য, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, শিল্পবাণিজ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার জন্য, এবং সর্ব্বোপরি বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভার্থ, সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে। নানা বিদ্যায় পারদর্শিতালাভ ও মানবজ্ঞান-ভাণ্ডারে নূতন নূতন রত্নসঞ্চয়ের জন্য ঐ সকল দেশে কতই না যত্ন চলিতেছে! ধরুন, মার্কিন দেশ। তথায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে এখনও উচ্চ সরকারী কাজে ভয়ানক ঘুষ চলিতেছে, নানা প্রকার দুর্নীতি আছে, শ্বেত-জাতি ও কৃষ্ণবর্ণ-নিগ্রোর বিদ্বেষবশতঃ সময়ে সময়ে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও অবিচার হইতেছে। এই সকল বিষয়ে সংস্কারের জন্য তথায় কত চেষ্টা হইতেছে। তদ্ভিন্ন আর যে সকল চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদয় চেষ্টাই সেখানে অনলসভাবে চলিতেছে। এইরূপ সমুদয় আত্মশাসক দেশেই নানা অসম্পূর্ণতা, অভাব ও দুর্নীতি থাকায় সর্ব্বত্রই উন্নতির চেষ্টা বহুমুখে খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

সুতরাং স্বরাজকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির একমাত্র ও অমোঘ ঔষধ মনে করিয়া যদি আমরা "স্বরাজ," "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করি, তাহাতে কেবল নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইবে। স্বরাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, থাক্ বা না থাক্, আমাদের অন্য কর্ত্তব্য বিস্তর আছে, এবং চিরকালই থাকিবে।

গাছে ফুল ফল ধরিলে বড় সুন্দর দেখায়, আমাদের খুব সুখ এবং উপকার হয়। কিন্তু ফুল ফল ধরিবার আগে কতকগুলা "অসুন্দর, শ্রমসাধ্য" ও কষ্টকর কাজ করিতে হয়। যেমন মাটিতে চাষ ও সার দেওয়া, বীজ বোনা, জল সেচন করা, ইত্যাদি। জাতীয় উন্নতি হইলে জাতীয় ঐশ্বর্য্যে ও শক্তিতে সকলেই মোহিত হয়। কিন্তু তাহার আগে কতকগুলা গোড়ার কাজ করিতে হয়। তাহার মধ্যে একটা প্রধান কাজ, জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা, এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা। আর একটা প্রধান কাজ, এবং ইহাই সর্ব্বপ্রথম কাজ, জনসাধারণের পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা ও সুস্থ সবলদেহ হইবার ব্যবস্থা। আর একটা কাজ, জাতির নানা শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন, অহঙ্কার, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব দূরীকরণ। আর একটা কাজ, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন। এইরূপ নানাবিধ গোড়ার কাজ আছে। এই কাজগুলি আমরা করিতেছি কি? সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া সবাই মুগ্ধ হয়, কিন্তু উহা মাটির আঁধারে লুক্কায়িত অসুন্দর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নিজ শোভা বিস্তার করে। সেইরূপ, জাতীয় উন্নতির গোড়ার কাজে হুজুগ নাই, বাহবা নাই, উত্তেজনা নাই, কিন্তু উহাই প্রধান কাজ।

অনেকে বলিবেন, আগে স্বরাজ হউক, তাহার পর এ সকল চেষ্টা করা যাইবে, স্বরাজ না হইলে এ সকল চেষ্টা ভাল করিয়া করা যায় না। আমরা স্বীকার করি যে স্বরাজ না থাকায় যথোচিত শিক্ষা বিস্তার হইতেছে না, শিল্পোন্নতি হইতেছে না, সরকার ইচ্ছা করিয়া জাতিতে জাতিতে ঝগড়া লাগাইয়া দিতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু অন্যদিকে ইহাও ঠিক্ যে স্বরাজ, নিজ পৌরুষেই হউক, বা রাজানুগ্রহেই হউক, লাভ করিতে হইলে পর্য্যাপ্তভোজনপুষ্ট সুস্থ সবল দেহ, জ্ঞানোন্নত তেজস্বী সাহসসম্পন্ন মন, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে স্বজাতিপ্রেমিক উদার হৃদয়, জনসাধারণ ও নারীর প্রতি ন্যায়কারী সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি চাই। এ সকলের ব্যবস্থা আমরা করিতেছি কি?

তার পর, স্বরাজ পাইলেও তাহার রক্ষা কে করিবে? এই ত পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নিজের দেবমন্দির, দেবমূর্ত্তি, মাতা স্ত্রী-ভগিনী ও কন্যার সতীত্ব, রাখিতে পারিল না। কাগজে লম্বা লম্বা টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাইয়া, তারস্বরে চীৎকার করিয়া কি আমরা স্বরাজ পাইব ও রাখিতে পারিব? পূর্ব্ব-

বঙ্গের হিন্দুরা কাগজের গাঁয়ে কলমের দ্বারা যত আঁচড় কাটিয়াছেন, সতীত্বাপহারক দস্যুর গায়ে হাতের নখ দিয়া ততটা আঁচড় কাটিলেও তাঁদের উপর লোকের শ্রদ্ধা ও প্রকৃত সহানুভূতি হইত। আমরা গভীর দুঃখে এই কথা লিখিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের কলঙ্ক আমাদেরই কলঙ্ক।

যে অস্ত্র ধরিতে, অস্ত্র চালনা করিতে পারে না, সে অমানুষ, অভদ্র, কাপুরুষ, প্রত্যেক সক্ষম বাঙ্গালী ইহা বুঝুন, প্রত্যেক সক্ষম ভারতবাসী ইহা বুঝুন। এই লেখকের মত যাঁহাদের আর কাপুরুষত্ব ঘুচাইবার বয়স নাই, এবং স্বাস্থ্যও নাই, তাঁহাদেরও কলম চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চালাইতে শিখিবার সুযোগ অন্বেষণ করা উচিত।

বালকগণকে বলি, যুবকগণকে বলি, তোমাদের হাতে যেমন কলম চলে, লাঠিও তেমনি করিয়া চালাইতে শিখ। পরপীড়নের জন্য নয়, আত্মরক্ষার ও দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য। ইংরাজ আমাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিবে, ও ভীষণ অত্যাচার করিবে। কিন্তু ভয় পাইও না; বিদ্রোহাপবাদকে অগ্রাহ্য করিও। মানুষের মত বাঁচিতে হইলে সর্ব্বদা রাজদ্বারে উৎপীড়িত ও দণ্ডিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

হিন্দুসমাজকেও দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করি। (১) পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল নারীর সতীত্ব অপহৃত হইল, তাঁহারা সকলেই অথবা প্রায় সকলেই বিধবা। ইহার কারণ কি? বিধবার আত্মীয়স্বজনেরা সধবাদের রক্ষা করিলেন, বিধবাদের জন্য কিছুই করিলেন না, ইহাই কি কারণ? অথবা সতীত্বাপহারক পিশাচেরা কি এই ভাবিয়া কেবল তাঁহাদিগকেই আক্রমণ করিয়াছে ও করিতেছে, যে তাঁহাদের উপর অত্যাচারের জন্য তাঁহাদের স্বামী না থাকায় কেহ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে না? কারণ, যাহাই হউক, যে সমাজে অসহায়া বিধবার আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করিতেছে, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য। আর অধঃপতনের বাকীই বা কি আছে? ইংরাজের অন্যায় অবিচারের জন্য আর্ত্তনাদ ও লম্ফঝম্প করি; অথচ কাপুরুষ আমরা বিধবাদের উপর অত্যাচার নিজেরাও করি, অপরের অত্যাচার হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না; ধিক্ আমাদিগকে! (২) হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ, যে এত দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইল, অথচ একজন হিন্দুও তজ্জন্য নিজের মাথা দিল না? আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে হিন্দু সব সহিতে পারে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও তাহার নারীর সতীত্বনাশ সহিতে পারে না। কিন্তু হায়! তাহাও সহিয়া গেল! অতএব, হে হিন্দু, যদি এখনও তোমার আরও মরিতে বাকী থাকে ত মর। কিন্তু ভগবানের কৃপায় মরাও বাঁচে; অতএব যদি বাঁচিতে চাও, ত এখন বৃথা আস্ফালন, চীৎকার ও লম্ফঝম্ফ ছাড়িয়া মানুষ হও। দুর্নীতি ছাড়, সামাজিক কুরীতি ছাড়, ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার ছাড়, "ইতর" শ্রেণীর লোকদের ও "অহিন্দু"দের প্রতি অবজ্ঞা ছাড়। এখনও নিজের মূল্য যদি না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কখনও বুঝিতে পারিবে না।

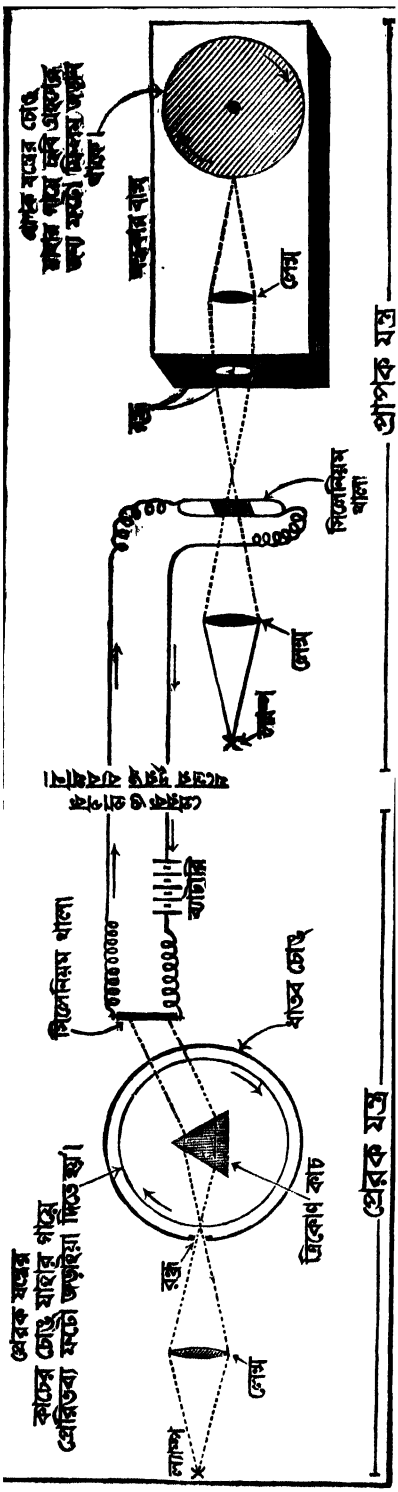
আমরা স্বরাজ চাই; কিন্তু মনুষ্যত্বও চাই;—স্বরাজের আগে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার পরে, মনুষ্যত্ব চাই।

টেলি-ফটোগ্রাফী।

দূরস্থিত পদার্থ আমাদের নগ্ন দৃষ্টিতে ছোট দেখায়; দূরস্থ বস্তুর দৃশ্যমান আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের ফটোগ্রাফ তোলাকে টেলি-ফটোগ্রাফী বলে। টেলি অর্থে দূর, ফটোগ্রাফ অর্থে আলোকচিত্র। এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রদীপ' পত্রিকায় কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে টেলিফটোগ্রাফীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; দূরস্থিত ক্ষুদ্রদৃশ্য পদার্থের বৃহত্তর চিত্রাঙ্কনেই আবদ্ধ না থাকিয়া টেলিফটোগ্রাফী বৈদ্যুতবলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ফটোগ্রাফ প্রেরণ করিতেছে। ইহার আবিষ্কারে পুলিশ ও ডিটেকটিভদিগের পলাতক অপরাধীকে দূর দুরান্তে অতি শীঘ্র পরিচিত করিয়া ধরিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

ম্যনিচের অধ্যাপক কর্ণ এইরূপ যন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক উন্নত প্রণালীর নির্ম্মাতা। তাঁহার ও তাঁহার যন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৯০১ সালে উক্ত অধ্যাপক বৈদ্যুত বলে দূরে চিত্র বা চিহ্ন প্রেরণের চেষ্টায় পরীক্ষা করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রেরিতব্য চিত্র একটা কাচের চোঙের মধ্যে রক্ষিত হয়; চোঙটা আপন অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে অবিরত আবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং অক্ষদণ্ডানুসারে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া



যায়। কাচ চোঙের চারিদিকে ধাতব আবরণ; এবং আবরণ গাত্রে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথে আলোকরশ্মিপাতে আলোকিত হয়। আলোকাধার একটি Nernst incandescent lamp; ইহার আলোক একটা ত্রিকোণ কাচের দ্বারা বক্রীকৃত হইয়া একটা সিলেনিয়ম* কোষের মধ্যে নীত হয়; এই পদার্থ আলোকপাতে অত্যুত্তম বিদ্যুত পরিচালক হয়, এবং আলোকের ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতে পরিচালকতা বৃদ্ধি পায়। ইহাই টেলি-ফটোগ্রাফীর প্রেরণ যন্ত্র; প্রাপক যন্ত্রও এতদ্বিধ; উভয় যন্ত্র টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রাপক যন্ত্রের কাচ চোঙের ধাতব আবরণের রন্ধ্র মুখে একটি ফটোগ্রাফের ফিল্‌ম্ বা মসলা-প্রলেপ সংযুক্ত থাকে। এই ফিল্‌মে প্রেরিত চিত্রের প্রতিচিত্র মুদ্রিত হয়। এই যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য উভয় চোঙের সম-আবর্ত্তন ও সম-অপসরণ। নতুবা প্রেরিত চিত্র প্রাপক যন্ত্রে ভাল মুদ্রিত হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তন কালের যন্ত্রে ৫ইঞ্চি × ৭ইঞ্চি ছবি ১৫ মিনিটের মধ্যে বিদ্যুত বলে প্রেরিত ও ফটোগ্রাফে চিত্রিত হইয়া যাইত। আধুনিক যন্ত্রে সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া ৬ হইতে ১২ মিনিট হইয়াছে। এবং ক্রমশই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই যন্ত্রের আধুনিক উন্নতি সিলেনিয়ম কোষের দোষ অপসরণ করিয়াছে। সিলেনিয়ম কোষের উপকারিতার সঙ্গে অপকারিতাও যথেষ্ট ছিল; ইহা উজ্জ্বল আলোকে যেমন বিদ্যুৎ পরিচালনে সাহায্য করিত, অল্পালোকে তেমনি বাধা দিত; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রাপক যন্ত্রেও তুল্য বলশালী সিলেনিয়ম কোষ ও আলোক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অসুবিধা অপসরণে ও সূচী বৈদ্যুতমান যন্ত্রের পরিবর্ত্তে দড়ি ধরণের বৈদ্যুতমান (galvanometer) ব্যবহারে সময়ের সংক্ষেপ হইয়াছে ও চিত্র পরিষ্কার মুদ্রিত হইতেছে।

শূন্য মার্গ লম্বিত তার যোগে প্রেরিত চিত্র যত শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, জলতলচারী তার প্রেরিত চিত্র তত শীঘ্র মুদ্রিত হয় না।

অধ্যাপক কর্ণ ১০৮০ মাইল দূরে যে চিত্র প্রেরণ করিয়া

* গন্ধক দ্রাবক কারখানার আবর্জ্জনাজাত এক প্রকার মূল পদার্থ।

মুদ্রিত করাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সাধারণ ফটোগ্রাফ ভিন্ন অন্য চিত্র বলিয়া বুঝা যায় নাই।

ইহার উপকারিতা অপরাধী নির্দ্ধারণে উপলব্ধি হইতেছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খবরের কাগজের প্রতিযোগিতার দিনে বহু কাগজওয়ালাও ইহার অনুরক্ত হইতেছেন।

যন্ত্রটি বুঝিবার জন্য ইহার নক্সা মুদ্রিত হইল। এবং ইহার নির্ম্মাণ ও কার্য্যপ্রণালী সংক্ষেপে নিম্নে পুনরুক্ত হইল।

একটি সিলেনিয়ম ধাতুর প্লেটের মধ্য দিয়া বৈদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হয় এবং তাহা পরিবর্ত্তনীয় আলোক সাহায্যে কখন দ্রুত এবং কখন বিলম্বিত হয়। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মত ইহারও তারসংযুক্ত প্রেরক ও প্রাপক-যন্ত্র আছে। প্রত্যেক যন্ত্র একটি কাচের চোঙ আবৃত করিয়া একটি ধাতব চোঙ। কাচের চোঙে প্রেরিতব্য চিত্র সংযুক্ত থাকে। এবং কাচ চোঙ ঘুরিতে থাকে। ধাতব চোঙে একটি রন্ধ্র থাকে; এই রন্ধ্রপথে কেন্দ্রীভূত আলোক Nernst Lamp হইতে প্রবিষ্ট হইয়া ফটোগ্রাফের ফিল্মের মধ্য দিয়া একটা ত্রিকোণ কাচে গিয়া পড়ে, এবং সেখান হইতে বক্রীভূত হইয়া বৈদ্যুত-প্রবাহমধ্যবর্ত্তী সিলেনিয়ম থালে গিয়া পড়ে। এই আলোকের আঘাত পরম্পরায় বৈদ্যুত-প্রবাহের বেগতারতম্যে প্রাপক-যন্ত্রে যথাযথ চিত্র মুদ্রিত হইয়া উঠে।

অধ্যাপক ও তাঁহার আবিষ্কারের বৃত্তান্ত Illustrated London News ও Scientific American পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহা হইতেই সংগৃহীত হইল।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের আর একটি উদ্ভাবনের উল্লেখ করা আবশ্যক। তাহার নাম টেল-হারমোনিয়ম বা দূর-সঙ্গত। এক স্থানে ঐকতান সঙ্গত হইলে তাহা দূর দূরান্তে এই যন্ত্র সাহায্যে প্রেরণ করা যাইবে। এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে দূরস্থ গায়ক, বাদক বা সঙ্গীত ও সঙ্গত-সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য সকলের উপভোগ করিবার উপায় হইয়াছে; এক জনের গান বা বাজনা এক সঙ্গে বহু স্থানে শুনাইবার উপায় হইয়াছে। সাধারণ নাট্যসম্প্রদায়ের খুব সুবিধা হইয়াছে; তাহারা ভাল ভাল কনসার্টদলের বাদ্য এক সঙ্গে বহু লোকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। বাজনা বা গানওয়ালাদের এক একটা কেন্দ্র-আফিস থাকিবে এবং যে নাট্যসম্প্রদায় তাহাদের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের গৃহের সহিত সেই কেন্দ্রের সংযোগ থাকিবে, এবং ইচ্ছামত চাবি ঘুরাইয়া কেন্দ্র আফিসের বিদ্যুৎবল সংগ্রহ করিয়া ঘরে বসিয়া আলো জ্বালার ন্যায় গান শুনিবার সুবিধা হইবে। এই সঙ্গীত বহন ব্যাপারও বিদ্যুৎ-বলেই সংঘটিত হইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের হাতে বিদ্যুৎ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিত্য নূতন বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতেছে। বজ্রকে এমন করিয়া সেবক করিতে আমাদের ইন্দ্রদেবও সক্ষম হয়েন নাই, তাঁহার পূজক আমরা ত' অতি তুচ্ছ, আমাদের এ সকল কল্পনারও অতীত!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ চিত্রবিদ্যায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন জানা যায় নাই। আমরা পরে জানিতে পারিলাম যে কলিকাতার তৈলচিত্রকর শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবনের কিয়দংশকাল পশ্চিমোত্তর প্রদেশ প্রবাসে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদের সাহগঞ্জ নামক পল্লীতে স্বীয় ব্যবসায়ের কেন্দ্র-স্বরূপ করিয়া যুক্তপ্রদেশের বড় বড় সহরগুলিতে, পঞ্জাবে এবং রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় অনেক রাজা মহারাজা ও পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিত্রালয় হুগলি, সিমলাগড় গ্রামে। তাঁহার পিতা পরোপকারী সরলহৃদয়, নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং গ্রামের সকলের সম্মানভাজন ছিলেন এবং মাতামহ সংস্কৃত অধ্যাপকতা করিতেন। বামাপদ বাবুর মাতুলদ্বয় তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে অধিক দিন তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতে দিতেন না। এই কারণে বামাপদ বাবুর বাল্যশিক্ষা বর্দ্ধমানের গ্রাম্য বিদ্যালয়েই



শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হইয়াছিল। তাঁহার সাত আট বৎসর বয়সের সময় তিনি শ্রীধরপুরের ৺ ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। পরে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে অধ্যাপক পণ্ডিত করাইবার জন্য চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন। মাতুলদ্বয়ের অকাল মৃত্যু হইলে বামাপদ বাবু স্বগৃহে আসিয়া পিতা ও পিতৃব্যের তত্বাবধানে পুনরায় ইংরাজী শিক্ষারম্ভ করেন। তখন নিজগ্রামে বা তন্নিকটে ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকার জন্যই ট্রেনিং স্কুলে ভর্ত্তি হন। উহা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মহোদয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে এবং এখানে ছাত্রাবস্থায় বামাপদ বাবু স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পাঠ্যবিষয়গুলিতে তাঁহার তত মনোযোগ ছিল না, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। অঙ্কের সময় তিনি সচিত্র পুস্তকগুলি হইতে নানা প্রকার ছবি আঁকিতেন এবং সহপাঠীদিগের Sketch বা Caricature আঁকিবার চেষ্টা করিতেন। শৈশবে অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার অনুকরণে সঙ্গীদের মাটির পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে শ্রীধরপুরের স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া তাহাকে হরিতাল মাখাইয়া বাহির করিতেন। এবং কোন দলাদলি হইলে বিপক্ষদলের নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক বিকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন। তাহাতে বিপক্ষ দলের যতই গাত্রদাহ হইত তিনি স্বদলের মধ্যে ততই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। জয়পুররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় রাও কান্তিচন্দ্র বাহাদুর তখন জনাই ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এক দিন চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা করিতে যান। বামাপদ বাবু ঐ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি অঙ্কের পরিবর্ত্তে এক চিত্র আঁকিয়া বসেন। কান্তিবাবু অঙ্ক দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে না পারায় এতক্ষণ কাগজে পেন্সিল লইয়া বালক কি করিতেছিল, পরীক্ষকের জানিতে কৌতুহল জন্মিল। তিনি কাগজখানি লইয়া দেখেন যে তাহাতে একটী বালক অঙ্ক কষিতে না পারিয়া পেন্সিল মুখে দিয়া চুসিতেছে। কান্তি বাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন এই কি তোমার অঙ্কক্ষা? বঙ্গের খ্যাতনামা ইংরাজী লেখক Mukherji's Magazine এবং Rais and Rayetএর সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরীক্ষা করিতে গিয়া বামাপদ বাবুর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হন। বামাপদ বাবু বলেন "শম্ভুচন্দ্র বাবুর সুন্দর মুখশ্রী, ঢল ঢলে বড় বড় চক্ষু, গৌরবর্ণ সুগোল দেহ, পরিধানে কাশ্মিরী শালের চোগা, মাঝখানে সিঁতি, বাবরিকাটা চুল এবং সকল দিকেই বেশ ফিট ফাট চেহারা দেখিয়া তাঁহার মূর্ত্তি আঁকিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। শম্ভুচন্দ্র বাবু পরে সে চিত্র দেখিয়া তত্রস্থ জমীদার এবং পরে বামাপদ বাবুর শ্বশুর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন "এই বালককে অবিলম্বে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চিত্র-শিল্পের দিকে

ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক আছে।” অনেকেই তাঁহাকে এরূপ উৎসাহ দেওয়ায় এবং তাঁহারও চিত্রবিদ্যা শিখিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় তিনি ট্রেনিং স্কুল ছাড়িয়া সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন আর্ট স্কুল বহুবাজার বৈঠকখানায় ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ লক সাহেব তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুদিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তাঁহার তৈলচিত্র আঁকিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু সে সময় আর্ট স্কুলে তৈলচিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দেওয়া হইত না। সুতরাং তিনি আর্ট স্কুল ত্যাগ করিয়া প্রথিতনামা প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট অয়েল পেণ্টিং শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এবং এই সময় সুকুমার শিল্পসম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বেকার (Becker) নামে একজন অভিজ্ঞ জার্‌মন্‌ চিত্রকর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বামাপদ বাবু তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রীতিভাজন হন। বামাপদ বাবুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তিনি যত্ন সহকারে তাঁহাকে চিত্রাঙ্কণ ও পুরাতন চিত্রাদির সংস্কার বিষয়ক শিক্ষা দেন। বেকার সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইল যে দুই জনে মিলিত হইয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই সময় বামাপদ বাবুর কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল।

১৮৭৯ অব্দে—“Calcutta Fine Art Exhibition” নামে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহাতে স্বহস্তাঙ্কিত একখানি চিত্র পাঠাইতে বেকার সাহেব বামাপদ বাবুকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একটী তৈলচিত্র মূর্ত্তি আঁকিয়া পাঠান। উহা প্রদর্শনী সভা কর্ত্তৃক “the best figure subject in oil by a native of India” বলিয়া ধার্য্য হয়। বড়লাট লর্ড লিটন, ঐ সভার সভাপতি এবং ছোটলাট সার এষলি ইডেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন। লক সাহেব প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বামাপদ বাবুই স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে বেকার সাহেব হঠাৎ কোথায় চলিয়া যান। বামাপদ বাবু তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও আর দেখা পান নাই। ইহার পর হইতে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন।

১৮৮১ অব্দে তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং তাঁহার আত্মীয় তথাকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কিছুদিন থাকিয়া পরে সাহগঞ্জ পল্লিতে সপরিবারে বাস করেন। এখানে অবস্থানকালে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিলাত হইতে নানা রঙ্গে ছাপাইয়া লইতে মনস্থ করেন কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখান হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ যান। তথায় ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এবং ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক এক্ষণে কলিকাতা British Indian Associationএর সহকারী সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি Tribune পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এক্ষণে আমেরিকা প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী) মহাশয়ের যত্নে লাহোর যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া (Chief Court) চীফ কোর্টের জজ পণ্ডিত রামনারায়ণ, মাননীয় জষ্টিস প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর এবং সর্দ্দার দয়াল সিং প্রমুখ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করেন। একবার লাহোর আর্ট স্কুল দেখিতে যাইবার কালে তথাকার অধ্যক্ষ মিষ্টার কিপলিংএর সহিত চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। বামাপদ বাবুর পরিচয় পাইয়া প্রিন্সিপাল কিপ্লিং স্বীয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন “একজন বাঙ্গালী চিত্রকর এতদূর আসিয়া তোমাদের নগরে চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন আর তোমরা কি করিতেছ?” ইহাতে ছাত্রগণ ঈর্ষান্বিত অথবা উৎসাহযুক্ত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু বামাপদ বাবু লাহোরের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতির প্রশংসাপত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে।

লাহোর ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতসহর, অম্বালা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ধোলপুর, আলওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া রাজা মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যশ এবং অর্থলাভ করেন এবং সর্ব্বত্রই সকলকে সন্তোষ দান করেন। জয়পুরে রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত

তাঁহার পরিচয় হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কাজ হয় নাই। পরে মহারাজার তৎকালীন খাস্‌মন্ত্রী রাও সঙ্গারচন্দ্র সেন বাহাদুরের সাহায্যে তিনি মহারাজা মাধো সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে বামাপদ বাবুর পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বামাপদ বাবু আরও কিছুকাল এলাহাবাদে থাকিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। কলিকাতার স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাননীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিরর সম্পাদক মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, স্বর্গীয় মিঃ মনোমোহন ঘোষ এবং মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর,—দ্বারবঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মাননীয় রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর প্রমুখ রাজা ও ভূম্যধিকারীর এবং এডভোকেট জেনারেল মাননীয় উডরফ্, কলিকাতার কর্পোরেসনের সভাপতি লী সাহেব, সাহাবাদের ডিষ্ট্রীক্ ও সেসন জজ গুডেয়ার ডে সাহেব, হাইকোর্টের রেজিষ্টার মিঃ বেল্‌চেম্বার্স প্রমুখ কয়েক জন য়ুরোপীয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

কয়েকবৎসর পরে রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কল্পনা অর্থাৎ পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা নবীভূত হইয়া উঠে। ১৮৯০ অব্দে তিনি তাঁহার চিত্রিত "অর্জ্জুন ও উর্ব্বশী" এবং "উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়" নামক দুইখানি চিত্র ছাপাইবার জন্য য়ুরোপে পাঠান। কলিকাতার জনৈক উদার হৃদয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবিষয়ে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। 'প্রবাসীতে' ঐ দুইখানি ছবিই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য এই দুখানি পৌরাণিক চিত্র হইতে বামপদ বাবুর চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার বিচার করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। এসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন "ছবিগুলির ছাপা যদিও মন্দ হয় নাই তথাচ মূল ছবির ন্যায় তত ভাল হয় নাই এবং ছাপান ছবিতে কএকটা দোষ স্পষ্টই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই—অনেক চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করাইতে পারি নাই; এদিকে সংশোধন করাইবার জন্য কিছু বেশী খরচ করিতে হইয়াছিল"। তাঁহার পৌরাণিক চিত্রের ন্যায় বঙ্গীয় গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটী আদর্শ দৃশ্য, হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য এবং উৎকৃষ্ট বাংলা উপন্যাস ও কাব্যনাটকাদি হইতে কতকগুলি দৃশ্য অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা আছে। উপযুক্ত অর্থসাহায্য এবং উৎসাহ পাইলে উক্ত বাসনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। ১৮৭৯ অব্দের যে সুকুমার শিল্প প্রদর্শনীতে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ১৯০২ অব্দের পুনরায় সেই প্রদর্শনীতে তিনি বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতি, "কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে জলঙ্গীতে সূর্য্যাস্ত" এবং মুশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে "আসন্নঝড়" এর দৃশ্য প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত বহু চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে বামাপদ বাবুর চিত্রই সকলের চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং দর্শকবৃন্দের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ ও প্রদর্শনীসভাদত্ত স্বর্ণ পদক তাঁহার পরিশ্রম সার্থক করে। * "The Indian Daily News." এতদুপলক্ষে লেখেন—

"Mr. B. P. Banerjee, the artist who carried away the gold medal in the Fine Art Exhibition, Calcutta, and who has painted the portraits of some of the leading Chiefs and Rulers of India, had a beautiful collection of oil paintings on view. The centre piece of the stall contained an exceptionally fine portrait in oils of the King-Emperor in full Court robes, worn at the opening of Parliament, a likeness which is strikingly correct. This was copied from a cabinet photo and does the artist every credit. There were two other pictures exhibited by the same gentleman, which are deserving of special mention. They are Sunset at Jalanghee near Krishnagar, and "Approaching Storm"—a scene depicted near Murshidabad."

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

PEASANT GIRLS.

By Jules Breton.

How beautiful and powerful, and yet how simple and true to common life, are these two peasant girls by Jules Breton! One has stopped, enchanted, on her way out to work in the sunrise, to listen to the song of the soaring lark; and the other, having finished her day's gleaning, is returning, with swinging step, to

---

* The Indian Daily News. 13th March 1902.

her home. In each, the beauty of the picture lies in something below the surface. In one it is the look of ecstasy, as if the child's heart joined in the bird's song; in the other more beautiful than the dark strong beauty of the face, is the balance and poise of the freely moving figure. It is a beauty seen constantly in Indian streets and road ways. How many hundreds of times in a day might one note just this queenly bearing in coolie woman or in peasant, but none, alas, have eyes of reverent and sympathetic vision wherewith to see.

It is interesting to remember that out of the seven modern pictures which we have now reproduced, six have been French, and one German. The French have made no secret of the fact that their one great object was the renewing of the home-land—"pour refaire la patrie"—and that for that, they were working so hard before the eyes of the world in science, in art, in literature, in industry, in agriculture; and even the German, Richter, in his portrayal of Queen Louise, seeks obviously the glory of Germany rather than his own.

There can be no doubt that some of the greatest art of the world, in many different ages, has been born of the impulse of Nationality, and still is the great idea fertile and potent, ready as ever to lead new generations to new and untried heights.—N.

চিত্র-পরিচয় ।

জুল্‌স্ ব্রেটন অঙ্কিত কৃষক-কন্যা । এই দুইটি কৃষক-কন্যা কি সুস্থ সুন্দর! একজন সূর্য্যোদয়ে কাজে যাইতে যাইতে উচ্চ-গগন বিহারী ভারয় পক্ষীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া থামিয়াছে; অপরা সমস্ত দিনের উঞ্ছবৃত্তি শেষ করিয়া লীলাঙ্কিত গতিতে গৃহে ফিরিতেছে। প্রত্যেক চিত্রের সৌন্দর্য্যই গূঢ়, যত্নানুমেয়। একটিতে আনন্দোচ্ছ্বল দৃষ্টি, যেন বালিকাহৃদয় বিহগসঙ্গীতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; অপরটিতে স্বাস্থ্যব্যঞ্জক মুখের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার সহজ সঞ্চলিত দেহখানির সামঞ্জস্য ও শ্রী অধিকতর চিত্তহারী। এরূপ সৌন্দর্য্য ভারতের পথে ঘাটে দেখা যায়। দিনের মধ্যে কত শত বার এই রাণীজনোচিত শ্রী কুলি-রমণী বা কৃষকপত্নীতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হায়, সহানুভূতি ও সম্ভ্রমপূত দৃষ্টি কয়জনের আছে?*

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে আমরা আজ পর্য্যন্ত যে ৭ খানি চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহার ৬ খানি ফরাসী ও ১ খানি জর্ম্মন। ফরাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার মাতৃভূমির স্মরণ; এজন্য বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, কৃষিপ্রভৃতি সকল বিভাগে তাহার বিপুল শ্রমনিদর্শন বিদ্যমান দেখা যায়; এবং এমন কি জর্ম্মন রিক্‌টার ও রাণী লুইর চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার আপনার নিজের অপেক্ষা স্বদেশ জর্ম্মনীর যশোগৌরব অধিক কামনা করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। যুগে যুগে প্রসূত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে বহুতর যে এই জাতীয়তা প্রণোদিত তাহা নিঃসন্দেহ বুঝা যায়; এবং এখনো সেই মহান, সক্ষম প্রবর্ত্তনা নবতর বংশ-পরম্পরাকে নূতন ও অননুসৃত উচ্চ আদর্শের পথ দেখাইবার জন্য সতত প্রস্তুত আছে। নিঃ

* বাংলার কৃষক-কন্যার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য অনশন-ম্যালেরিয়া প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছে। স্বাস্থ্যের অনিন্দ্য নিটোল মুক্ত স্বাধীন সৌন্দর্য্য যদি দেখিতে হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্ররাজ্যে যাইতে হয়। বম্বের পথে ঘাটে পুষ্টকেশীযুক্তা ভারবাহিনী মহারাষ্ট্ররমণীর সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধা সম্ভ্রম উদ্রেক করে।—প্রবাসী সম্পাদক।

গ্রন্থ সমালোচনা ।

১। ময়না—নাটক- শ্রীতারকনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক লিখিত। নাটকখানির প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে নাটকের আখ্যানবস্তু আসামের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, এবং এই নাটকে "ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে নাই"। কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম যে প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে ইতিহাস উপেক্ষিত হইয়াছে এবং ইতিহাসপ্রতিষ্ঠিত অতি বড় বড় কথা দুঃসাহসের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি বলিতেন, আমি যাহা খুসি লিখিয়াছি, তবে কথা থাকিত না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে কবির অতটা ক্ষমতা যে নাই, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতিহাসের যাথার্থ্য যে রক্ষিত হয় নাই তাহা এই সমালোচনায় কিঞ্চিৎ দেখাইবার প্রয়োজন; কারণ অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, এই প্রস্তাবনা লেখক।

অন্য কোথাও ইতিহাস লিখিত না হউক, আসামে আহম রাজত্বকালে হইয়াছিল। প্রাচীন বুরঞ্জি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ না হইলেও ইতিহাস। এই বুরঞ্জি এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গেট্ সাহেব আসামের ইতিহাস লিখিয়াছেন।

সমালোচিত নাটকের নায়ক লক্ষ্মী সিংহ (যাঁহার আহম নাম সুন্‌হেওফা), ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী বরবড়ুয়া কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হয়েন; এবং তখন তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর। কীর্ত্তি-চন্দ্র বরবড়ুয়া কিম্বা অন্য কোন মন্ত্রী তাঁহার শ্যালক নহেন, এবং রাণীও বন্ধ্যা ছিলেন না। নাটকবর্ণিত ঘটনার সময় লক্ষ্মী সিংহের পুত্র যুবরাজ ছিলেন। নাটক, মোরান্ এবং মোয়ামরিয়া শব্দগুলির প্রভেদ গেট্ সাহেবের গ্রন্থে বিশেষভাবে আছে। যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা মাটক বিদ্রোহ নহে; উহার নাম মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ। বিদ্রোহের কারণের মধ্যে একটা হাতী আছে বটে, কিন্তু সেটা রুগ্ন হাতী নয়। কথাটা এই:— একদিন মোয়ামারিয়া গোঁসাই রাজাকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু বরবড়ুয়ার দিকে চাহিলেন না। ইহাতে বরবড়ুয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গোঁসাইকে খুব অপমান করিয়া গালি দেন। অল্প সময় পরে যখন মোয়ান্ সর্দ্দার নাহর, রাজাকে হস্তী উপহার দেয়, তখন মন্ত্রীকে না জানাইয়া দেয়। মন্ত্রী তাহাতে অপমানিত হইলেন মনে করিয়া নাহরকে কাণ কাটিয়া বিদায় দেন। অপমানিত নাহর, পূর্ব্বোক্ত মোয়ামারিয়া গোঁসাই-এর শিষ্য ছিল। বিদ্রোহের মূল এই ঘটনায়। রাঘ (রঘু নহে) যখন রাজাকে বন্দী করে, তখন নাহরের পুত্র রামাকান্তকে সিংহাসনে বসান হয়। রাঘ নিজে বরবড়ুয়া হইয়া পূর্ব্ব রাজার পত্নীগুলিকে নিজের সেবায় অন্তঃপুরবাসিনী করে। পরে আবার মোয়ামারিয়াদিগকে পরাজয় করিয়া লক্ষ্মীসিংহের দল, লক্ষ্মীসিংহকে রাজা করে। লক্ষ্মীসিংহ এবং তাঁহার পূর্ব্বের দুই জন রাজা রংপুরে রাজধানী করিয়াছিলেন; লক্ষ্মীপুরে নহে।

২। কিরাতার্জ্জুন—প্রথম ৫ সর্গের বঙ্গানুবাদ- শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক রচিত। বহু পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রঘুবংশের পদ্যানুবাদ পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। ভারবির অর্থগৌরবযুক্ত কাব্যের এই পদ্যানুবাদ যে যথাযথ হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু রচনায় যে গাম্ভীর্য্যে এবং অর্থ

গৌরবে ভারবির কাব্যের খ্যাতি, অনুবাদে তাহা সুরক্ষিত হওয়া সহজ নহে। দ্রৌপদীর কতকগুলি উক্তি তেজস্বিতায় অতুলনীয়; এখন ঐ উক্তিগুলি মুখে মুখে নিত্য উদ্ধৃত হইয়া থাকে। "পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাং," "নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা" প্রভৃতি বচন স্মরণ করিলে যে ভাব মনে হয়, অনুবাদে তাহা রক্ষিত হওয়া দুঃসাধ্য। সে জন্য নবীন বাবুকে দোষ দিতে পারি না। উন্নততর ইংরাজি ভাষায়ও রমেশচন্দ্র অর্জ্জুনের শৌর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বিচ্ছিন্নমাত্র বিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি

কিম্বা

বংসালক্ষ্মী মনুদ্দত্য সমুচ্ছেদেন বিদ্বিষাং
নির্ব্বাণমপি মন্যে হমস্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ

চিরদিনই মূল হইতে পঠিত হইবে। তবুও বঙ্গভাষায় উহার অনুবাদের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের কার্য্য সাধনে নবীন বাবুর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। অপরাংশের অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে আশা করি।

৩। শোক-গাথা—(পদ্য) শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণীত। ত্রিপুরার বিধবা রাজকুমারীর শোক-গাথা অনেক স্থলেই মর্ম্ম স্পর্শ করে। গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য্য অতি পরিপাটি হইয়াছে।

৪। বেণু—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী কৃত। ভাল বাজে নাই।

৫। কায়স্থ দর্পণ—শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থের প্রথম অংশে কায়স্থদিগের প্রাচীন ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সেটুকু বহুবিধ ভ্রমপ্রমাদযুক্ত; এবং তাহার সমালোচনা অতি দীর্ঘ না করিলে কিছু বলা চলে না। শেষ অংশে অনেক কায়স্থ বংশের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে; উহা যত অধিক সংগৃহীত হয়, ততই ভাল। ভবিষ্যতে যথার্থ ইতিহাস লেখকের পক্ষে ঐ উপাদানের প্রয়োজন আছে।

৬। জাপানী বোল চাল। হিন্দি ভাষায় শ্রীযুক্ত প্যারেলাল বুক্তি কর্ত্তৃক রচিত। বিক্ষিপ্ত ভাবে কতকগুলি শব্দ বা পদের অর্থ দিয়া গ্রন্থ লিখিলে জাপানী ভাষা শিক্ষায় কাহারো সাহায্য হয় না। যদি সর্ব্বনাম শব্দ গুলি কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদ দ্বারা রূপ করিয়া দিতে পারিতেন, এবং সেই সঙ্গে অনেক ক্রিয়া পদের এবং বিশেষ্য বিশেষণের তালিকা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদেশে বসিয়া প্রথম শিক্ষার কিছু সহায়তা হইত।

৭। Practical Telegraph Connection—শ্রীঘকেলাল প্রণীত। কিছুই শিখিতে পারা যায় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

শৈলবালার প্রতি গিরি-কন্দর।

হে শৈলজে, পলে পলে তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু হয়ে
তুমি পশেছিলে যবে এ আমার নিভৃত হৃদয়ে,
বিস্ময়ে আনন্দে কত তখন তোমায় সমাদরে
ডেকে নিয়েছিনু সখি! আজ কি তা' কিছু মনে পড়ে?
নিরস কঠোর প্রাণে ঘেরা শুধু ছিল অন্ধকার,
তুমি সেথা অলক্ষিতে করে দিলে আলোক সঞ্চার!
সরল চাঞ্চল্য তব সুমধুর 'কল' 'কল' তান,
মাধ্বীর মধুরতা মোরে যেন করেছিল দান!
কত দিন কত রাতি সুধামাখা সুখের স্বপনে
চলে গেল মোর হায়, তোমা বাঁধি দৃঢ় আলিঙ্গনে!
মহা মিলনের সেই গাইবারে সুবিজয়-গাথা
বারেক জীবনময়ি! কেহ ত গো নাহি ছিল সেথা!
নীরবতা-বিজনতা আপনার প্রশান্ত অঞ্চলে,
আমাদিগে রেখেছিল সতত ঢাকিয়া কুতূহলে!
মাঝে মাঝে শুনিতাম যেন কিবা স্বপনের ঘোরে
গাইছে পাখীতে গান, ফুল-কলি পড়িতেছে ঝরে!
মুগ্ধ আমি ভুলে সব দ্বিগুণ আবেগে তোমা বধু,
বক্ষে চাপি' চির-তৃষা চাহিতাম নিবারিতে শুধু!
সে যে ওগো কিবা ভাব, কি মদির-অমিয়-উচ্ছ্বাস,
কল্পনা উন্মনা হয়, ভাষাতে কি হবে পরকাশ?
একদিন অকস্মাৎ জলধির বাঁশরী কোথায়
আকুল-আহ্বান-সুরে বাজিয়া উঠিল 'আয়' 'আয়'!
ভেঙ্গে গেল সুখ-স্বপ্ন, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার,
তুমি প্রিয়ে! বাহিরিলে চূর্ণ করি বক্ষ অভাগার!
বুঝিবা এমনি করে আত্ম-হারা রাধা গোপ-নারী,
শ্যামের মুরলী-রবে ছুটে ছিলা নিজ গেহ ছাড়ি'!
আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন,
তোমার উত্তাল স্রোতে ভেসে গেল তৃণের মতন!
সেই যে গো তুমি গেলে আর কভু আসিলে না ফিরে,
শাঙন-অমার তমঃ আবরিল অন্তরে বাহিরে!
সুখ-শান্তি-আশা-হীন সারা রাত্রি সারা দিনমান
হৃদয়ের ক্ষত-চিহ্নে করি আজি স্মৃতি তব ধ্যান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৭ম ভাগ। | ভাদ্র, ১৩১৪। | ৫ম সংখ্যা।

খালাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্র বাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু একজন পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্ব-স্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প-প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্র বাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সেই জন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়া-ছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্র বাবুও ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কন্‌গ্রেস্ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন। ডেপুটি বাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল—"ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল—"স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়্‌তাম, তেমন ত কৈ দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না ?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস ?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—'এজি এজি সিপাহী দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নগেন বাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন ?"

নগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন ?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে ?"

গিরীন্দ্র বলিল—"এমন চাকরি করেন কেন ?"

"খাব কি ?"

"কেন আপনার ত ল-লেকচর কমপ্লিট রয়েছে। ওকালতীটে পাস করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে একজামিন পাস করা পোষায় ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল—"ফিরিঙ্গীর চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা, আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর সপক্ষে না বিপক্ষে ?"

"সপক্ষে। এই দেখনা, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি ?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্‌নে ইন্দু! সেখানে কিনলে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাতেই বা ক্ষতি কি। লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করাতে কি কোন হানি আছে ?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল—"ঐ মাতৃপূজক-সমিতি কন্‌গ্রেসের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহবা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দে মাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস্ জনম ভূমির
ভকত সন্তান,
মায়ের পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা,
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই, এমন সুদিন কবে আর পাবি,
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক্ সে কিঞ্চিৎ,
ছেড়ে লাজ অপমান।
যার কিছু নাই সে দিক্ কেবল
ব্যথিত হৃদয় খান ॥

বাটীর সকলেই, কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোট খানি দেখিয়া, খাতাপেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল—"মহাশয়ের নাম ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"নাম দরকার কি ?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন "জনৈক বন্ধু।""

সত্যেন্দ্র বলিল—"ওহে, লেখ জনৈক ডেপুটি। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্র বাবু বলিলেন—"না, না। জনৈক বন্ধু বলেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল,

একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল—"ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল—"ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।"

এক জন ছেলে বলিল,—"বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল—"তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে?"

"দেড় রূপিয়া।"

"অ্যাঁ—দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহার অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—"হাঁ, সত্য বৈ কি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চারি-পাঁচ জন বালক সে চাপরাশিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল—"একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাশিকে বলিল—"দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে একটিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাশি বলিল—"বাবু ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল—"আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।" আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাশিকে দিল।

চাপরাশি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল—"বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা" বলিয়া চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল—"ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া, টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। এক জন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুলোগ পাগলা হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল—"বন্দে মাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোক ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য' করিয়া, চাপরাশি প্রফুল্ল মনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাশিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেঁও এত্তা দেরী কিয়া ?" বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"ড্যাম শূয়ারকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া ?"

চাপরাশি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল—"হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন——"

"ক্যা হুয়া ?"

"লেকিন ইস্কুলকে লেড়কালোক—" চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কা লোক ? বন্দেমাতরম্ ? ছিন্ লিয়া ?"

এতক্ষণে চাপরাশিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন লিয়া।"

"কাহেকো দিয়া ?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পচাশ আদমি—হাম একেলা, কেয়া করেঁ ?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া ?"

চাপরাশি বলিল—"হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া, হুজুর। লেকিন কোই কনেষ্টিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করেঁ, হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস লে লিয়া। এক রূপিয়া সে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব পরবর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কালোককো হাম জেহেল মে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবেরা হুইস্কি পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"very sorry to intrude—" তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—"I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া, তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন—"কোতোয়ালী দারোগাকে আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন—"'Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"দিন দিন 'বন্দে মাতরম' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা সাহেব বলিলেন—"While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান

অবস্থা, বাঙ্গালীর বেয়াদবি, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু" গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জান্‌তা ?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

."ক্যা action লিয়া ?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাস মে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইহাঁ হায়, ইতালা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাশিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা বলিল—"কোথাও জখম আছে ?"

চাপরাশি, সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জখম হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"ড্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।" দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ হইলে—পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন—"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।" হুকুম দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল—"হুজুর আপনার এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চাপরাশি বলিল—"হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি ?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"শূয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিন জনকে চাপরাশি অম্লানবদনে সেনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত না। বালকত্রয় বলিল—"দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ ? আমরা কি করিয়াছি ?"

দারোগা বলিল—"কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" বলিয়া দারোগা তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন ?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোন ডেপুটি বাবু আসিবে; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিন জনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও, সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস।"

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম্ নেটিভ্ পুলিস্ এই রকম dishonestই বটে।"

দারোগা তখন, বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন

চারিজন লোক এবং সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্র বাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটি বাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্র বাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"না,—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটি বাবু বলিলেন—"ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন—"তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্তবৃত্তিময় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটি বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না।

চারুশীলা বলিলেন—"ছি! অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়,—ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সে দিন মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাপরাশিকে রাজি করে, তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয় নি, মারেও নি। তা ছাড়া যে তিন জন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিলও না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটি বাবু একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এ সব প্রমাণ হয় তবে না।"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ নাই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলে মানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটি বাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটি বাবু যেন গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল—"সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন, বলিলেন,—"এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কই তেমন ত কিছু দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot;—নগেন্দ্র বাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"আজ্ঞা—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা,

সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হাল্লা,—কাপড় পোড়ান, এ সব কি ?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন—"ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিট গুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে ? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্র বাবু খুসী হইয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সব জিনিবই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে আট টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ্য। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন ?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন ?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র! Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"হাঁ হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্র বাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যে দিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামিন হইয়া তাহাদিকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাশি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটীভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলি মিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে মুড়িয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগজিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সেনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাশি সহ বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু

তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—"কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন "চড় দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল, আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তার বাবু স্বীকার কারলেন যে স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গালার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটি বাবু দুই তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল বন্দে মাতরম্ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্ত বাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে। কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies'—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন কোনও কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে তাহাকে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে খানসামা উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারোমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীল বাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া, জজ সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণ রবে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী

টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেদিন ডেপুটি বাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটি বাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, চুপ করিয়া, বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটি বাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনি সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন,—"থাক, দরকার নেই।"

ভাব গতিক দেখিয়া, নগেন্দ্র বাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্র বাবু জল খাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জল খাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চা টুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে, উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন, সারে নাই।

নগেন বাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এস এস উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেন বাবু বলিলেন—"আজ সাহেব আমার ৫০৲ বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেন বাবু বলিলেন—"ওকি, চোখের জল ফেল কেন?" বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"ওগো আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনোও কথা বলো না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্র বাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম?—কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্র বাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটি বাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।" সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন—"কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"ওকি—ওকি—শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন—"আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি, বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোনা রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ট্রেণের সময় সন্নিকট। ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটি বাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েক খানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারি পার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্র বাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা" গুলি চারুশীলা লইয়া জলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময়, ডেপুটি বাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারি গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন—"আজ ইস্কুল গেলি নে?"

"না আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে না কি?"

"না।"

"তবে?"

"ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়—"বলিয়া বালক আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্ত বাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সে দিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন।

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন—"ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপিলে বোধ হয় টিকবে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন—"তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপিলের দিন কবে হয়েছে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই করবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিল—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলেই একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন—"আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্য কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগস্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক জোড়া বালা এক জোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপিলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায়গ্রহণ করিয়া স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জজ সাহেব আপিল ডিসমিস করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতি মধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাসকামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া, সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া, আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সে দিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্র বাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম

কিন্তু বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুণাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাশি ফিরিয়া, তাঁহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল!

সেখানে কয়েকজন চুণাপুঁটি পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাশি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, জুতাকা আওয়াজ মৎ করিয়ে, সাহেব গোসসা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। চুণাপুঁটিগণ তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্র বাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আপিস কামরায় আসিলেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন—নগেন্দ্র বাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্র বাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্র বাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্র বাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে, মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্যদিনের মত, সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুডমর্ণিং সার।"

"গুড্‌মর্ণিং বাবু।"

বাবু!—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্র বাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্র বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন বেদনা অনুভব করিলেন না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন—"সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমায় কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্র বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্র বাবুর মুখ পানে চাহিলেন। বলিলেন—"তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনিও কি একজন স্বদেশী না কি?"

নগেন্দ্র বাবু গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন—"স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না। তিনি বুঝিলেন যে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, নগেন্দ্র বাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন—"হাঁ আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way—শুনিলাম না কি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এত দিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই। সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাজকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনি সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধ পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত বা আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্র বাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কি না। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্র বাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আফিসে আমার কর্ম্মত্যাগ পত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা, এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্র বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া, বলিলেন—"গুডমর্ণিং।"

* * *

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্র বাবুর চাকরির শেষ দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবা মাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্র বাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্র বাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপার খানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি, বাহে? বাবুর সাদি নাকি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হয়েছিল, আজ খালাস হইছে।"

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্র বাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্যদিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুইমাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গৌড়-দুর্গ।

গৌড়ের ইতিহাস-বিখ্যাত পূর্ব্ব-সৌভাগ্য বর্ত্তমান নাই। কিন্তু গৌড়-দুর্গের সমুন্নত সিংহদ্বার এখনও জরাপলিত কলেবরে দণ্ডায়মান আছে। তাহার উপর কত বৃহৎ বৃক্ষ অঙ্গবিস্তার করিয়াছিল! গম্বুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; খিলান ফাটিয়া ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছিল। এখন কিছু কিছু জীর্ণ-সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে।

সম্মুখে সিংহদ্বার। তাহার নাম "দখল-দরওয়াজা।" তাহার উভয় পার্শ্ব হইতে প্রাচীর এবং পরিখার আরম্ভ। সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া, প্রাসাদ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইলে আরও অনেক তোরণ দ্বার অতিক্রম করিতে হইত। তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। দুর্গাভ্যন্তরে বিজন বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে কদলীকানন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রাচীরের উপরে বিজন বন, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপে চারিদিক ঢাকিয়া রাখিতেছে। দুর্গমধ্যে দৃশ্যাবলীর অভাব নাই। তন্মধ্যে (১) দখল-দরওয়াজা (২) বাইসগজী, (৩) কদম রসুল, এবং (৪) পূর্ব্বদ্বার উল্লেখ-যোগ্য।

দখল-দরওয়াজা।

দখল-দরওয়াজা বৃহৎ এবং সুন্দর। তাহা ইষ্টকপ্রস্তরে রচিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে বিভূষিত, সমুন্নত মিনার গম্বুজে সুরক্ষিত। এই সিংহদ্বার উত্তরমুখে অবস্থিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে আসিতে সিংহদ্বারের সম্মুখভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখে অত্যুচ্চ খিলান; তাহা উত্তর দক্ষিণ লম্বা; তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ পথ। এই প্রবেশপথটি ১১২ ফুট দীর্ঘ,—তাহার উভয় পার্শ্বে প্রহরী কক্ষ,—মস্তকের উপর একটিমাত্র দীর্ঘ খিলান। সিংহদ্বারের সম্মুখ-ভাগ ৭০ ফুট,—চারি কোণে চারিটি মিনার,—দেখিতে মসজেদের মত মনোহর। দ্বারদেশে কোনও ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বার্ব্বক শাহ বাদশাহ এই সুবৃহৎ দুর্গদ্বার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন।

দুর্গের আয়তন বৃহৎ নহে। দীর্ঘে অর্দ্ধক্রোশ;—প্রস্থে ৬০০ হইতে ৮০০ গজ। দেখিতে বহুভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়,—তাহার বিস্তার অপেক্ষা দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অধিক। পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথীস্রোত প্রবাহিত ছিল। সে দিকে প্রাচীর পরিখার আড়ম্বর নাই; ভাগীরথী পরিখার ন্যায় দুর্গরক্ষা করিত। প্রাচীর পার্শ্বে ইষ্টকের আচ্ছাদন ছিল, তাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকাস্তূপ; উপরে স্থানে স্থানে প্রহরী মন্দির। এখন প্রহরী মন্দির বর্ত্তমান নাই; ইষ্টকের আচ্ছাদনও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সেকালের প্রচলিত সমর কৌশলের পক্ষে গৌড়-দুর্গ অভেদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। তথাপি এই দুর্গদ্বারে সমর কোলাহলের অভাব ছিল না। ইহা অনেকবার অবরুদ্ধ ও পরাভূত হইয়াছে; অনেকবার ইহার নিকট পরাভূত হইয়া আক্রমণকারিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং এই দুর্গ-দ্বার অনেক জয় পরাজয়ের অতীত সাক্ষী বলিয়া পর্য্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিয়া থাকে।

ইহার গঠন-কৌশল চিত্তাকর্ষক। যাহারা এই রাজ-দুর্গ রচনা করিয়াছিল, তাহারা ইহাকে সুদৃঢ় করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; ইহাকে সুন্দর করিবার জন্যও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিল। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান নাই। তাহার চতুর্দ্দিকে যে বিচিত্র প্রাচীর বর্ত্তমান ছিল, তাহারই কিয়দংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম "বাইশগজী।"

বাইশ গজী।

দুর্গাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। তাহা তিনটি মহলে বিভক্ত ছিল। সকল মহলেই অট্টালিকা এবং সরোবর দেখিতে পাওয়া যাইত, অট্টালিকা বর্ত্তমান নাই; সরোবর তিনটি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার একটি সরোবর প্রস্তরবেষ্টিত। এই তিন মহল যে প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল তাহারই নাম বাইশ গজী,—তাহা ২২ গজ উচ্চ,—ইষ্টক নির্ম্মিত—সুদৃঢ় এবং সুন্দর। এখন সর্ব্বত্র প্রাচীর বর্ত্তমান নাই; যাহা আছে, তাহার উপরেও সুবৃহৎ অশ্বত্থ এবং তিন্তিড়ী বৃক্ষ। প্রাচীরের তলদেশের বিস্তার ১৮ ফুট; শিখরদেশের বিস্তার ৯ ফুট হইবে। প্রাচীরের বর্ণ রক্তাভ; স্তরে স্তরে ইষ্টক রাশি সুসজ্জিত, শীর্ষ স্থানে খোদিত ইষ্টকের



দখল দরওয়াজা—ধ্বংসাবশিষ্ট অবস্থা





পুষ্পহার। ফ্রাঙ্কলিন যখন বাইশগজী পরিদর্শন করেন, তখনও তাহার সৌন্দর্য্য বৃক্ষলতায় এখনকার মত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। তিনি বিস্মিতনেত্রে এই বিচিত্র প্রাসাদ-প্রাচীর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"শীর্ষদেশে খোদিত ইষ্টকের বিচিত্র পুষ্পশোভার প্রাচুর্য্য। প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা তিন মহলে বিভক্ত ছিল। প্রথম মহল প্রকাশ্য দরবার মহল। দ্বিতীয় মহল বাদশাহের খাসমহল। তৃতীয় মহল বেগম মহল। পশ্চিম পার্শ্বে বিখ্যাত "চাঁদদ্বার" বর্ত্তমান ছিল; তাহা মুসলমান স্থাপত্যের মহামূল্য ইষ্টক প্রস্তরময় রচনা কৌশলে সুরচিত হইয়াছিল। এখন দিন দিন ধ্বংস দশায় নিপতিত হইতেছে; তথাপি সে ধ্বংসাবশেষ এখনও সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।*"

ক্রেটন সাহেব "চাঁদ দ্বারের" একটি চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এই রাজদুর্গ, এই রাজপ্রাসাদ, এই রাজ-অন্তঃপুর এবং এই বিচিত্র প্রাচীর বেষ্টিত মহাল সকল সেকালে কত বিচিত্র ঘটনা দর্শন করিয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিলে স্বপ্নমোহে অভিভূত হইতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসলেখকগণ স্কটের গৌরব লাভ করিতে লালায়িত; কিন্তু স্কটের ন্যায় স্বদেশের পুরাতন দৃশ্যাবলী লইয়া উপন্যাস রচনার জন্য লালায়িত হইলে, এই সকল দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিত।

মহল তিনটি পর্য্যায় ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণে অবস্থিত। বাইশ গজীর অভ্যন্তরে যে ভূমিখণ্ড অবস্থিত ছিল, তাহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত। প্রথম মহল,—দরবার মহল,—সর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণ। তাহাতে যে সরোবর আছে। তাহাও বৃহৎ নহে। দরবার মহলের দক্ষিণে বাদশাহের খাস মহল; তাহার দক্ষিণে বেগম মহল;—আয়তনে এই উভয় মহল প্রায় সমতুল্য। তিন মহলের সমগ্র ভূমির আয়তন ৭০০ গজ দীর্ঘ ২৫০ গজ প্রস্থ। সুতরাং বাইশ গজী প্রাচীর ১৯০০ গজ দীর্ঘ ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এক মহল হইতে অন্য মহলের পার্থক্য রক্ষার্থ পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা আরও দুইটি প্রাচীর ছিল, তাহাও বাইশগজী। সর্ব্বসাকল্যে বাইশ গজীর পরিমাণ ২৪০০ গজের কম হইবে না। এরূপ প্রাচীর রচনায় কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বাইশ গজীর বিচিত্র কীর্ত্তি কাহার, তদ্বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত প্রমাণ বর্ত্তমান ছিল। গুন্না-মালতীর কুঠিতে একখানি প্রস্তর ফলকের খোদিত লিপিতে ফ্রাঙ্কলিন সে বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার মূল ও ইংরাজি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—খৃষ্টীয় ১৪৬৬ অব্দে বাদশাহ বার্ব্বক শাহ কর্তৃক এই বিচিত্র প্রাচীর, প্রাসাদ ও সরোবর এবং পুষ্পোদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দখল-দরওয়াজা এবং বাইশ গজীর গঠন প্রতিভার মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ফলকলিপির অনুকূল। সিংহদ্বার হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সমস্তই এক বাদশাহের অতুল কীর্ত্তি,—এক ভাবে সুগঠিত,—এক ভাবে সুরক্ষিত,—এক ভাবে সুসজ্জিত —বৃহৎ এবং সুন্দর।*

দুঃখের বিষয় এই যে,—বাইশ গজী রক্ষা করিবার জন্য জীর্ণ সংস্কার আরব্ধ হয় নাই। তাহা বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে!

বাইশ গজীর বাহিরে—উত্তর দিকে—দুর্গাভ্যন্তরে যে উন্মুক্ত প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে কদলীবন জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই স্থানে সুবিখ্যাত বাদশাহ হোসেন শাহার সমাধি,—তাহা এখন অনাদরে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে!

---

* The upper part of the parapet is decorated with a profusion of flower work carved in the brick. The palace is entirely in ruins. It was formerly divided into three parts, *viz.*—the public hall of audience, the dwelling house of the sovereign, and the Imperial Harem. At its western entrance formerly stood the famous Chand Durwaza, built of brick and stone in a rich style of Musalman architecture. It is now verging daily to decay, though its remains are even still magnificent.—Francklin's Report.

* যে কবি ফলকলিপি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি এই সকল কীর্ত্তি-সংস্থাপক বাদশাহের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন,—"For ever let us pray to the Almighty for the prosperity of this monarch, so long as the feathered tribe shall warble forth their notes in this garden." এখনও কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ এখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় গান করিতে বিরত হয় নাই; কিন্তু সে উদ্যান নাই—তাহার স্থানে বনভূমি বর্ত্তমান।

গৌড়কীর্ত্তির সহিত হোসেন শাহার নাম চিরসংযুক্ত রহিবে; বাঙ্গালার সাহিত্য-ইতিহাস হইতেও হোসেন শাহার নাম বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার সমাধি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে!

দুর্গাভ্যন্তরে, শাহীমহলের পূর্ব্বদিকে এক পুরাতন সরোবর, তাহার পূর্ব্বে "কদম-রসুল,"—তাহা নানা কারণে অদ্যাপি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

কদম রসুল।

ভারতবর্ষে প্রস্তরনির্ম্মিত পদচিহ্নের অভাব নাই। গয়াধামের বিষ্ণুপাদপদ্ম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "কদম রসুল" সেইরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত পাদপদ্ম,—মহম্মদের পাদপদ্ম। লোকে বলে,—ইহা আরবদেশের মদিনা নগর হইতে বাদশাহ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিল।

কদম রসুল গৌড়ে আনীত হইয়াও একস্থানে রক্ষিত হয় নাই। হোসেন শাহ ইহাকে কোথায় রাখিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র নসরিৎ শাহ ১৫৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে এক বিচিত্র মসজেদ নির্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে "কদম-রসুল" সুসংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই মসজেদও "কদম রসুল" নামে পরিচিত হইয়াছে। ফলকলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান; তাহাতেই এই কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মসজেদ মধ্যে "কদম রসুল" নাই। তাহা যে কীলকের উপর সংস্থাপিত ছিল সেই কীলক ও বেদী পড়িয়া রহিয়াছে! নবাব সিরাজদ্দৌলা কদম রসুলকে গৌড়ের নিবিড় বন হইতে মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছিলেন। মীরজাফর খাঁ তাহাকে আবার গৌড়ে পুনঃ সংস্থাপিত করেন। রাভেন্শা তাহাকে এই মসজেদে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা মসজেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকটস্থ একটি পল্লীগ্রামে এক "কদম রসুল" আছে,—তাহার অধিকারী বলেন—ইহাই সেই ইতিহাস বিখ্যাত "কদম রসুল!"

"কদম রসুল" না থাকিলেও, মসজেদের মাহাত্ম্য আছে। লোকে এখনও এখানে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে। ইহা মূর্ত্তিপূজার প্রকারভেদ মাত্র। কোন্ সময় হইতে মুসলমান সমাজে "কদম রসুলের" পূজা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা একটি ঐতিহাসিক কৌতূহলের ব্যাপার।

মসজেদটি সুদৃঢ় এবং সুন্দর। চারি কোণে ছাদের উপর চারিটি কৃষ্ণ মর্ম্মরের সুদৃশ্য মিনার ছিল; এখন একটি মাত্র স্বস্থানে বর্ত্তমান আছে। এই মসজেদ পুরাতন রাজপথ পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত,—সম্মুখে তোরণদ্বার—ভিতরে প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের সম্মুখে মসজেদ। এখানে দুইটি প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটিতে "কদম রসুল" মসজেদ; অপরটিতে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকারে সমাধিগৃহ—তাহা ফতে খাঁর সমাধি বলিয়া কথিত।

তোরণদ্বারে এবং প্রাচীরগাত্রে ফলকলিপি সংযুক্ত আছে;—তাহা অন্য স্থান হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। কারণ, একটি লিপি হিজরী ৮৮৫ সালের ইউসফ শাহা বাদশাহ নির্ম্মিত মসজেদের ফলকলিপি বলিয়া উল্লিখিত।

কদম রসুলের বর্ত্তমান মসজেদ এবং তাহার মাহাত্ম্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—গৌড়ের বাদশাহগণ এখানে বহুমূল্য ইষ্টক প্রস্তরে নানা স্থাপত্য কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাদলের ইঞ্জিনিয়ারগণ অনেক প্রস্তর লইয়া গিয়াছেন।*

মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন—এই খানেই হোসেন শাহার সমাধিমন্দির বর্ত্তমান ছিল। তাহা মালদহের লোকে স্বীকার করে না। ফ্রাঙ্কলিন এই স্থান পরিদর্শন করিবার সময় দৃশ্যাবলীর অবস্থা ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তিনি এখানে আসিয়া শ্বেত ও নীল বর্ণের সুরঞ্জিত ইষ্টকে সুসজ্জিত ভিত্তিগাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন কেবল ইষ্টক প্রস্তরের বাহুল্য,—যাহা কেহ অপহরণ করে নাই—তাহাই পড়িয়া রহিয়াছে! তথাপি মসজেদ বিলক্ষণ মনোহর।

মসজেদের তিনদিকে বারান্দা—মধ্যস্থলে মূল কক্ষ। তাহাতে বেদীর উপর "কদম রসুল" প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন কক্ষমধ্যে একটি অতি পুরাতন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃহৎ সিন্দুকের সাজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা এখানে রহিয়াছে কেন, কেহ তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারে না। মদিনা

* Creighton's report says—"even in Orme's day British Engineers had largely utilised its ruins."



চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মা।

হইতে এই সিন্ধুকে "কদম রসুল" আনীত হইয়া থাকিলে, ইহাকে মসজেদে স্থানদান করিবার কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র।

পূর্ব্ব দ্বার।

কদম রসুলের নিকটেই পূর্ব্বদ্বার,—খিলানের উভয় পার্শ্বে প্রহরীকক্ষ, মধ্যস্থলে রাজপথ। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার রচনাপ্রণালীর সহিত অন্যান্য নগর-দ্বারের রচনাপ্রণালীর সামঞ্জস্য নাই। গৌড় পরিত্যক্ত হইবার পর সময়ে সময়ে তথায় রাজধানী সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে শাহসুজার এই নগরদ্বার নির্ম্মিত করিবার কথা রাভেন্সা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে পুরাতন নগরদ্বার বর্ত্তমান ছিল, তাহার সম্মুখে রাজকারাগার, তাহার ভূগর্ভনিহিত অন্ধকার কক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বদ্বারের ইষ্টকরচনা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহার প্রধান প্রমাণ—বালি চূণের আচ্ছাদন। গৌড়ের অন্য কোনও ভিত্তি গাত্রে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। বালি চূর্ণের "আস্তর" যে আধুনিক, তাহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী।

ক্রোম ট্যানিঙ্।

(শ্রীযুক্ত আলফ্রেড চ্যাটারটন কৃত প্রবন্ধ হইতে)।

কাঁচা বা কষকরা চামড়া ভারতের রপ্তানি পণ্যজাতের মধ্যে আদর হিসাবে চতুর্থ। প্রতি বৎসর গড়ে ৯ কোটি টাকার চামড়া রপ্তানি হয়, গত বৎসর ১৪ কোটি টাকার হইয়াছিল।

এই চামড়া কষ হইয়া কতক অমনি গোটা এবং কতক সৌখিন দ্রব্যে পরিণত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই আমদানি দ্রব্যজাতের মূল্য পরিমাণ ২৫।৩০ লক্ষ টাকা। এই মহালাভজনক ব্যবসা ভারতীয় দ্বারা সম্পূর্ণ হস্তগত হয় ত' নাও হইতে পারে, কিন্তু ভারতের চামড়া বিদেশে গিয়া যেরূপ সুন্দর কষ হইয়া আসে, সেইরূপ কষ যে এদেশেও হইতে পারে, তাহা সকলে কেন বুঝেন না?

দেশীয় বর্ত্তমান কষকরা প্রণালী অতি প্রাচীন এবং তজ্জাত চামড়া ভাল হওয়া অসম্ভব। পল্লী-মুচির হস্তেই চামড়া তৈয়ারি এবং গঠন উভয়ই ন্যস্ত; শ্রমবিভাগের অভাবে যে কদর্য্য চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহা হইতেই জুতা, ঘোড়ার সাজ, মোশক, জল তুলিবার 'মোট' প্রভৃতি তৈয়ার হয়। সামান্য উপায়ে প্রস্তুত চামড়াজাত দ্রব্য স্থায়ী ও সুশ্রী হইতে পারে না। দরিদ্র ভারতবাসিগণই এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চর্ম্মব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ লাভ হইবে।

চামড়া কষের নানা প্রণালীর মধ্যে ক্রোম ট্যানিঙ্ বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ক্রোম একপ্রকার ধাতু; ইহার দ্বারা চামড়া কষ করিলে চামড়া নানা বর্ণের হয় এবং জলবারক হয়। মান্দ্রাজের বহু কারিগরের বিশ্বাস ছিল যে এদেশের আবহ-অবস্থায় ক্রোম প্রণালী অসম্ভব। অনেক পরীক্ষা বিফল হইয়াছিল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—সকলে য়ুরোপে কাটতির যোগ্য চর্ম্ম প্রস্তুতের দুরাশা করিয়াছিলেন; ভারতের আবশ্যকমত যথাসম্ভব উত্তম চর্ম্ম প্রস্তুতে কেহ মনোযোগ করেন নাই।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যে পরীক্ষার জন্য মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া বহু বিফলতা অতিক্রম করিয়া সফলতার নিকটস্থ হইতে হইয়াছে। Procter's 'Principles of Leather Manufacture' নামক গ্রন্থ হইতে এবং ভারতসচিব নিযুক্ত একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ কারিগরের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এ দেশ ব্যবহার্য্য সকল প্রকার চর্ম্মবস্তু নির্ম্মাণোপযোগী উত্তম চর্ম্ম উৎপন্ন হইতেছে; এবং কালে এই ক্রোমকষ প্রণালী ভারতীয় প্রচলিত সামান্য প্রণালী অতিক্রম করিয়া সাধারণ-আদৃত হইবে আশা করা যায়।

ক্রোম প্রণালীজাত চর্ম্ম দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীজাত চর্ম্ম অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণকাল স্থায়ী; ব্যয়পক্ষে উভয় প্রথার পার্থক্য অল্পই।

ক্রোম প্রণালীজাত চর্ম্মের রঙ্ স্বভাবত ফিকা নীল এবং স্বল্পমিশ্রণে কষ করিলে চর্ম্ম প্রায় সাদা হয়। উভবিধ বর্ণই অপছন্দ নহে। কষ সম্পূর্ণ হইলে চামড়া ইচ্ছামত নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লওয়া যাইতেও পারে। মান্দ্রাজের এই পরীক্ষাশালাসঞ্জাত চর্ম্ম আমদানি বিলাতী চর্ম্ম অপেক্ষা হীনগুণ হইলেও অল্প মূল্য বলিয়া এ দেশে বেশ সমাদৃত হইয়াছে। আধুনিক চর্ম্ম প্রস্তুতকারক কল ব্যবহার করিলে মূল্য আরো হ্রাস হইবে এবং বিলাতী চামড়াকে একেবারে বাজার হইতে অপসৃত করিতে পারিবে মনে হয়।

ক্রোম চর্ম্মের গুণাগুণ।

(১) বৃক্ষত্বক দ্বারা কষকরা সাধারণ চর্ম্ম অপেক্ষা ইহা ওজনে হাল্কা। রাসায়ণিক দ্রব্য মিশ্রণে কষ হয় বলিয়া তরুত্বক কষের মত ক্রোমকষে চর্ম্মে গুরুত্ব সংযোগ হয় না। (২) বল্কল কষকৃত চর্ম্ম অপেক্ষা ক্রোম চর্ম্ম দৃঢ় অথচ অতি কোমল, এ জন্য পাদুকার উপরের সাজের পক্ষে ইহা অতি উপযুক্ত। ব্যাগ, পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতির জন্য দেশীয় প্রণালীজাত কঠিন চামড়া উপযুক্ত। (৩) যদি খুব সাবধানতার সহিত কষকরা না হয়, তবে ক্রোম প্রণালীতে চামড়ার আঁশ সাধারণ প্রণালী অপেক্ষা অধিক ছড়াইয়া যায়, ইহা অনেক কাজে দোষ বলিয়া গণিত হয়। সাবধানতায় এ দোষ নিবারিত হয় এবং চামড়া অধিকতর দৃঢ় হয়। ক্রোমচর্ম্মে ঘোড়ার সাজ, কলের পেটি খুব ভাল হয়। জুতার তলাও খুব মজবুত হয়। ক্রোমচর্ম্মে জুতার তলা করিলে এক অসুবিধা এই যে জলে ভিজিলে মসৃণ স্থানে পদস্খলন সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। (৪) সাধারণ চর্ম্ম জলে ভিজিলে কষের কতক মসলা জলে ধুইয়া বাহির হইয়া যায়; এবং ভিজিয়া শুকাইলে কড়া ও কঠিন হইয়া উঠে। ক্রোম চর্ম্ম অধিকক্ষণ জলে ভিজিয়া থাকিলেও কোন রূপ অবস্থা ব্যতিক্রম ঘটে না। গরম জলে সিদ্ধ করিলে সাধারণ চর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ক্রোমচর্ম্মের প্রায় কোন ক্ষতিই হয় না। ক্রোমচর্ম্ম সাধারণ জল কাদা স্যাঁতায় অবিকৃত থাকে। স্যাঁতা দেশের পক্ষে ইহা উপযোগী। মধ্যে মধ্যে কোনরূপ পালিশ লাগাইলে ইহা আরো জলবারক হয়, না লাগাইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

চর্ম্ম।

ক্রোমচর্ম্ম প্রস্তুত করিতে খুব ভাল চামড়া পাওয়া আবশ্যক। পাতলা চামড়া কষাইখানা হইতে সংগ্রহ হইতে পারে। মোটা চামড়ার জন্য মহিষের চামড়া মন্দ নয়। কোন কোন চামড়া প্রয়োজনাতিরিক্ত মোটা হয়; কলে চিরিয়া লওয়া সহজ, স্বল্পব্যয় ও সুবিধাজনক; কলের অভাবে চামড়া চাঁছিয়া পাতলা করিতে বহু চর্ম্ম, শ্রম ও সময় অপব্যয় হয়। কলিকাতার বাজারের লবণ-আর্সেনিক দ্বারা প্রস্তুত চামড়া বেশ উপযোগী। ভাল বাছুরের চামড়া পাওয়া কঠিন; অভাবে ছাগল ভেড়ার চামড়া চলিতে পারে।

লোমসহ বন্য পশুর চর্ম্ম রক্ষায় অনেকের সখ আছে। ক্রোম প্রণালীতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি লোমশ চর্ম্ম প্রস্তুত হইতে পারে; ক্রোম মিশ্রণে লোমের কোন ক্ষতি হয় না। কুম্ভীর ও সর্প-চর্ম্ম (সর্প-চর্ম্ম মহিলাদিগের কোমর বন্ধ করিতে আজ কাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে!) এই উপায়ে সুন্দর প্রস্তুত হয়। ভারতে সর্প কুম্ভীর প্রচুর; অক্ষত অচ্ছিন্ন চর্ম্ম ক্রোম ট্যানিঙ্ করিয়া বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় করা যাইতে পারে।

ট্যানিঙের পূর্ব্বাহ্নানুষ্ঠাতব্য প্রক্রিয়া।

প্রথমত চামড়া উত্তমরূপে রক্ত ও ধূলিকর্দ্দম শূন্য করিয়া লইয়া ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। চামড়া বেশ নরম হইলে কয়েকবার জল বদলাইয়া উহা বেশ করিয়া ধৌত করিতে হইবে। লবণরক্ষিত বা টাটকা চামড়া খুব ভাল করিয়া ধুইতে হয়। তৎপরে চূণের হ্রদে ফেলিতে হয়। চূণের চারিটি হ্রদ করিয়া প্রথমটাতে অতি পুরাতন রাখিয়া পর পর অপেক্ষাকৃত নূতন নূতন চূণ রাখিতে হয়; চতুর্থ হ্রদে টাটকা চূণ থাকিবে। চামড়া প্রত্যেক হ্রদে ২॥০ দিবস করিয়া রাখিয়া একে একে চারিটাতেই রাখিতে হয়; এই চূণখাওয়ানতে এইরূপে ১০ দিন ব্যয়িত হয়। তৎপরে প্রচলিত উপায়ে চামড়াকে মাংসলোম শূন্য করিয়া চামড়া Scudding করিতে হয়। চূণখাওয়ানর সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে চূণের তেজে চামড়া ফুলিয়া উঠিবে কিন্তু চামড়া অত্যধিক খাইয়া যাইবে না। ইহাতে সাবধান না হইলে প্রস্তুত চর্ম্ম উত্তম হইতে পারে না। জুতার তলার জন্য চামড়া তৈয়ারি করিতে অধিক সতর্কতা আবশ্যক। Sulphide of Sodium ব্যবহার করিলে অল্প চূণ খাওয়াইলে চলে। উহার ব্যবহার প্রণালী এইরূপ:— এক পাউণ্ড (আধ সের) সোডিয়ম সলফাইড যত অল্প পরিমাণ জলে সম্ভব গুলিয়া তাহাতে ৬ হইতে ৮ পাউণ্ড টাটকা জলসংযোগে স্ফুটিত গুঁড়া শামুকের চূণ যোগ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে জল মিশ্রিত করিয়া ঘন লেই তৈয়ার করিতে হইবে। এই লেই তিন ঘণ্টা থিতাইলে চামড়ার মাংসের দিকে মাখাইয়া চামড়া ভাঁজিয়া ঠাণ্ডা স্যাঁতা জায়গায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে লোম সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। তখন সাধারণ উপায়ে চামড়া লোম শূন্য করিয়া ফেলিতে হয়। লোম শূন্য করিয়া চামড়া জলে ধুইয়া ফেলিয়া টাটকা চূণের গামলায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে ফুলিয়া উঠে। তখন তাহাকে Scudding করিতে হয়। তৎপরে চামড়া একেবারে চূণ হীন করিবার জন্য জলে ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া রগড়াইয়া কাচিতে হয়। তৎপরেও যে চূণ লাগিয়া থাকে তাহা ১০০ ভাগ জলে ·৭৫ ভাগ lactic acid মিশাইয়া মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া চামড়া ভিজাইয়া দিতে হয়। এই মিশ্রণে ভিজিলে চামড়ার ফুলা কমিয়া যায় এবং স্পর্শে মসৃণ পিচ্ছল বোধ হয়। চামড়া একেবারে চূণহীন হইয়াছে কি না জানিতে হইলে স্থূলাংশ হইতে একটু চামড়া কাটিয়া সেই কাটা চামড়ায় এক ফোঁটা সুরাসারমিশ্রিত phenol phthalein দিলে যদি চামড়াখণ্ড লাল হইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে তখনো তাহাতে চূণ আছে এবং চর্ম্মখণ্ডের বর্ণব্যতিক্রম না ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে উহা চূণ হীন হইয়াছে। প্রত্যেক চর্ম্ম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহা lactic acid solution হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়।

জ্বরান।

তৎপরে চামড়ার লোমের দিকের আঁশে টান নিবারণের জন্য চামড়ায় যে ফটকিরি প্রয়োগ করা হয় তাহাকে pickling বা জ্বরান কহে। pickling solution এইরূপ:—চূণহীন জলশূন্য চামড়ার প্রত্যেক ১০০ পাউণ্ডের জন্য পটাশ ফটকিরি (potash alum) ৬ পাউণ্ড এবং ৪ পাউণ্ড সাধারণ লবণ একটা বড় আবর্ত্তনসম্ভব পিপার মধ্যে রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণ জলে গুলিতে হইবে। এই মিশ্রণ-পিপায় চামড়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পিপা ঘুরাইয়া পাক দিতে হইবে।

ক্রোম ট্যানিঙ্ যদিও হ্রদে বা গামলায় হইতে পারে, তথাপি ঐরূপ আবর্ত্তন-সম্ভব পিপা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এই পিপা অনেকটা বিলাতী মাখনতোলা কলের প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে ব্যবহৃত পিপার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ফুট এবং চৌড়া ৩ হইতে সাড়ে ৪ ফুট। বর্ত্তমানে উহা কুলি সাহায্যে ঘুরান হয়; পরে কর্ম্ম বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে কলের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। হাতের বলে মিনিটে ২।৩ বারের অধিক পিপা ঘুরান যায় না, কলের সাহায্যে পিপার আয়তন অনুযায়ী মিনিটে ৪ হইতে ৮ বার ঘুরান যাইবে। ট্যানিঙের জন্য অল্পবেগ চলিতে পারে; কিন্তু ধৌত করায় ও চূণশূন্য করিতে খুব জোরে পাক দেওয়া দরকার। পিপার মধ্যে শক্ত কাঠের গোঁটা সংলগ্ন করা দরকার, তাহাতে পিপার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ফিরিয়া ঘুরিয়া উল্টিয়া যায়। উপরি বর্ণিত সকল প্রক্রিয়ায় এই পিপা কল ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ইহাতে কর্ম্মও সহজ ও সুবিধাজনক হইয়া থাকে।

ক্রোমট্যানিঙ্।

এই উপায়ে চামড়া তৈয়ারি করিবার, দুইটি প্রণালী আছে; উহা (১) সকৃৎধাবন ও (২) দ্বিত্বধাবন বলা যাইতে পারে। দ্বিত্বধাবন প্রণালীতে চর্ম্ম ভাল হয় এবং অল্প অসতর্কতায়ই চর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ট্যানিঙের জন্য বাজারে বহুবিধ ট্যানিঙ্-দ্রব বিক্রয় হয়; নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য নিজেরা মিশাইয়া ব্যবহার করিতে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে কিন্তু সেই সকল প্রস্তুত মিশ্রদ্রব ব্যবহারে প্রতিবারে একপ্রকার চর্ম্ম উৎপাদন করা যায় এবং তাহা নষ্ট হইবারও আশঙ্কা থাকে না। সকল তৈয়ারি মসলার মধ্যে Martin Dennis Chrome Tannage Company of Newark, New Jersey, কৃত Tanolin ও Lepitil, Dollfus and Gausser of Milan কৃত Chromo-Chrome পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। Procter সাহেবের পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠা লিখিত সরল পদ্ধতিতেও ঠিক তুল্য ফল পাওয়া যায়। তাহা এই:—১০ পাউণ্ড ক্রোম এলাম (ফটকিরি) ৪ গ্যালন জলে গুলিয়া ট্যানিঙ-দ্রব প্রস্তুত করিতে হয়। ফটকিরি গুঁড়া করিয়া লইলে মিশ্রণ-কার্য্য শীঘ্র হয়। তৎপরে সাধারণ কাপড়কাচা সোডা ৩ বা সাড়ে তিন পাউণ্ড জলে গুলিয়া ফটকিরির জলে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়। মিশ্রিত হইয়া জল ফুটিয়া উঠিলে মিশ্রণটিকে বেশ করিয়া নাড়িয়া গুলিয়া লইলেই ক্রোমট্যানিঙের মসলা হইল। সোডা অধিক সংযুক্ত হইলে জলের তলায় থিতানি পড়ে। ইহাতে মূল্যবান মসলা অনর্থক নষ্ট হয়। এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। মান্দ্রাজে Chrome alum ৷০ আনায় এক পাউণ্ড

পাওয়া যায়, এবং সেই মসলায় তিন পাউণ্ড তৈয়ারি চামড়া প্রস্তুত পাওয়া যায়। সোডা এক আনায় এক পাউণ্ড; এবং এক পাউণ্ড সোডায় ১০ পাউণ্ড চামড়া তৈয়ার হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে সাধারণ প্রচলিত বল্কল-কষপ্রণালী হইতে ক্রোমকষপ্রণালী ব্যয়সাধ্য নহে। উপরে ক্রোমদ্রব প্রস্তুতের যে ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১০ পাউণ্ড ক্রোম ৪ গ্যালন জলে) তাহাতে ক্রোম শত করা ২৫ ভাগ থাকে; উহা হইতে জল সংযোগে তরল করিয়া কাজ করিতে হয়। ট্যানিং শতকরা একভাগে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ভাগে শেষ করিতে হয়।

ট্যানিং পূর্ব্বোল্লিখিত পিপার মধ্যে করিতে হয়। সারি সারি পিপা রাখিয়া প্রথমটিতে অল্প মসলার ট্যানিংদ্রব রাখিয়া ক্রমশ ভাগ বাড়াইতে হয়; এবং ৫০০ হইতে ৬০০ পাউণ্ড চামড়া প্রথম হইতে শেষ পিপা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ডুবাইয়া লইয়া যাইতে হয়। চামড়ার drawn grain না হয়, এজন্য প্রথম পিপায় ১৫ পাউণ্ড সোডিয়ম্ সলফেট (Sodium Sulphate) যোগ করা উচিত। ট্যানিং সম্পন্ন করার সময় চামড়ার স্থূলতার উপর নির্ভর করে। ছাগল ভেড়ার চামড়া কয়েক ঘণ্টায়, গরুর চামড়া এক হইতে তিন দিনে এবং মহিষের চামড়া ৭ হইতে ১০ দিনে সমাপ্তকষ হয়। দিবারাত্রি পিপা ঘুরাইলে সময় কম লাগে, কলে ঘুরাইলে আরো অল্প সময়ে হয়। যখন চামড়ায় নীল রং হয় এবং চামড়ার মধ্যেও সাদা সাদা দাগ দেখা যায় না, তখন ট্যানিং সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতিরিক্ত ট্যানিংে চামড়া খারাপ হয়, এবং শীঘ্র ভঙ্গুর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে; ইহার প্রতিকার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। চামড়া সমস্থূল না হইলে ট্যানিং দ্রবে দিবার পূর্ব্বে চাঁছিয়া সমস্থূল করিয়া লওয়া দরকার, কারণ স্থূলাংশ বিলম্বে এবং পাতলা অংশ শীঘ্র কষ হইয়া যায়।

যখন বুঝা গেল যে ট্যানিং সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন চামড়া মসলার জল হইতে তুলিয়া কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর উপর্য্যুপরি মেলিয়া রাখিতে হয়, ২৪ ঘণ্টায় মসলা ভিতরে শুষিয়া চামড়া শুকায়। চামড়ায় তৎপরেও যে মসলা থাকে তাহাতে গন্ধকদ্রাবক (Salphuric acid) থাকে, উহা চামড়ার অনিষ্টকারক। ক্রোম চামড়া ভাল না হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ (১) অতিরিক্ত চূণ খাওয়ান, (২) অতিরিক্ত মসলা খাওয়ান এবং (৩) গন্ধকদ্রাবক দূর না করা। দ্রাবক দূর করিবার জন্য চামড়া উত্তমরূপে জল বদলাইয়া বদলাইয়া ধৌত করিয়া পিপায় সোহাগা মিশ্রিত জলে ধৌত করিতে হয়। সেই মিশ্রণে শতকরা আধভাগ এবং ১০০ পাউণ্ড ভিজা চামড়ার জন্য ৩ পাউণ্ড হিসাবে সোহাগা সংযোগ করিতে হয়। দ্রাবক সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে কিনা তজ্জন্য লিট্‌মস্ কাগজ (Litmus Paper)* ভিজাইয়া দেখিতে হয়। যখন পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গেল যে চামড়া দ্রাবকশূন্য হইয়াছে, তখন সোহাগা মিশ্রণ হইতে তুলিয়া কয়েকবার জল বদলাইয়া ধুইয়া ফেলা দরকার।

তেল-সাবান প্রয়োগ।

সাবানের জলে তেল ফেটিয়া ফেনা হইলে তাহাতে ক্রোম চামড়া ভিজাইলে চামড়া বেশ নরম ও নমনীয় হয়। যদি চামড়ায় রং করা না হয়, তবে ক্রোমট্যানিঙের ইহাই শেষ প্রক্রিয়া। ইহাকে ইংরাজিতে fat-liquoring বলে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য সাবান নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়:—

একটা কাঠের টবে ১০০ পাউণ্ড রেড়ির তেল রাখ এবং ২০ পাউণ্ড কষ্টিক পটাশ (Caustic Potash) জলে গুলিয়া ঠাণ্ডা হইতে দেও। ঠাণ্ডা হইলে পটাশ দ্রব ধীরে ধীরে তেলে ঢাল এবং তেল ক্রমাগত নাড়িতে থাক। পনর মিনিট নাড়িয়া বেশ করিয়া উভয় পদার্থ মিশ্রিত কর। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই সাবান ব্যবহার উপযোগী হইবে।

Fat-liquor করিতে ৭ পাউণ্ড সাবান ২ গ্যালন ফুটন্ত গরম জলে গুলিয়া সমপরিমাণ রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশাইয়া ফুটাইয়া লইয়া ফেননযন্ত্রে (Emulsifier) ঢালিয়া ফেনাইয়া তুলিতে হয়; ২ পাউণ্ড ডিমের হরিদ্রা-অংশ যোগ করিলে চামড়া অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি টিনের চোং সাড়ে তিন ফুট উচ্চ দশ ইঞ্চি বেধ, তাহাতে পিচকারীর মত দাঁটি এক মুখে সংলগ্ন, এবং দাঁটির মুখ বহু ছিদ্রময় হইলেই ফেননযন্ত্র হয়। সাবান মিশ্রিত তেল উহাতে ঢালিয়া দাঁটি চালাইলেই ফেনিত হইয়া উঠিবে। ফেনিত তেল গরম জলের সহিত নির্ব্বিবাদে মিশাইয়া যায়। জলের কাজ বা সাধারণ মোটামুটি কাজের জন্য চামড়ায় যথাশক্তি তেল শোষণ করান ভাল; ইহাতে চামড়ার মূর্ত্তি কিছু ময়লা হইলেও মজবুত ও স্থায়ী হয়।

চামড়ায় সাবান ফেনা সংযোগের জন্যও ঘূর্ণীপিপা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে পিপায় গরম জল ঢালিয়া গরম করিয়া লইতে হয়। তৎপরে ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহিট তাপপ্রাপ্ত জলে সাবান-ফেনা তরল করিয়া লইয়া পিপায় চামড়ায় ঢালিয়া পিপা পাক দিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে সব জল চামড়া শোষণ করিয়া লইয়াছে। তখন চামড়া উঠাইয়া কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর ছড়াইয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য শুকাইতে দিতে হয়। তৎপরে পাথরের টেবিলের উপর ফেলিয়া পালিশ করিয়া কাঠের ফ্রেমে টাঙাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইলে খোঁটাঘসা (পশ্চিমে মুচিরা এই খোঁটাকে 'বেউঙ্গি' বলে) করিয়া লইলে চামড়া অতি কোমল, মসৃণ ও চকচকে হয়। এতক্ষণে প্রকৃত ক্রোমচামড়া প্রস্তুত হইল। যদি চামড়া দেখিতে সুশ্রী করিতে হয়, তবে সাবান ফেনা কম শোষণ করাইতে হয়, এবং খোঁটাই করিয়া ফরাশী-খড়ির গুঁড়া সোজা পিঠে ছড়াইয়া দিতে হয়। চামড়ার যে পিঠে মাংস থাকে সে পিঠ অসমতল ও কর্কশ হয়, তাহার নিবারণ আবশ্যক হইলে কলের অভাবে হাতে চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

জুতারতলার চামড়া

তৈয়ার করিতে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রণালীই অবলম্বন করিতে হয়; মোটা চামড়া বলিয়া সম্পন্ন হইতে ৭ হইতে ১০ দিন সময় লয় এবং দ্রাবকশূন্য হইয়াছে কিনা খুব সতর্কতা-সহকারে পরীক্ষা করা দরকার। ইহাতে সাবানফেনা প্রয়োগের বোধ হয় দরকার হয় না। ৫০ পাউণ্ড মর্ম্মপ্যারাফিন, সাড়ে বার পাউণ্ড চর্ব্বি ও ও আড়াই পাউণ্ড ধুনা একত্র চিটকে তামার বা এল্যুমিনিয়ম পাত্রে রাখিয়া আগুনে গলাইয়া খুব উত্তপ্ত থাকিতে চামড়া তাহাতে ডুবাইলে চামড়ার ভিতরের ছিদ্র সকল ভরিয়া চামড়া নিরেট বায়ুশূন্য হয়। বায়ু বুদ্বুদ উদ্গাত হওয়া বন্ধ হইলে চামড়া তুলিয়া মিশ্রপ্রলেপ ঝরিতে দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে চামড়া খুব চাপ দিয়া গুটাইয়া লইতে হয়।

রঙিন চামড়া।

জুতা, ঘোড়ার সাজ প্রভৃতির জন্য চামড়া কালো বা বাদামি রং করিতে হয়; ইহাতেই চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। aniline (নীল বা আলকাতরা হইতে প্রস্তুত একপ্রকার রং) বড় মহার্ঘ্য। Avaram

---

* হলুদমাখা ও জবাফুলমাখা কাগজ সহজে তৈয়ারি করা যায় এবং উহা লিটমাস কাগজের কাজ করে। লিটমাস কাগজের বর্ণ দ্রাবকসংযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে চামড়ায় দ্রাবক আছে কিনা।—লেখক।

গাছের ছাল ইহার সস্তা পরিবর্ত্ত। ট্যানিং-দ্রবে শতকরা ৫ ভাগ ছাল দিয়া চামড়া আধঘণ্টা পিপাই করিতে হয়; তারপর ধৌত করিয়া বাইক্রোমেট পটাশদ্রবে পুনরায় পিপাই করিতে হইবে। ১০০ পাউণ্ড চামড়ার জন্য ৮ আউন্স উক্ত লবণ দরকার। তৎপরে সাবান-ফেনাই করিয়া সাধারণ উপায়ে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ত্বকের কষ বিলম্বিত করিলে রং গাঢ় হয়। অল্প কষ করিলে বাদামি রং হয়।

জুতার উপরের সাজের চামড়া খুব নরম করিতে হইলে একটু অধিক চূণ খাওয়াইতে হয়। aniline রং করিয়া রংটাকে স্থায়ী করিবার জন্য উদ্ভিজ্জকষপ্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। ইহাতেও avaram ছাল বেশ উপযোগী। চামড়ার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ ছাল লইতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে mordant বলে। আধঘণ্টা ধরিয়া ১৪০° ফা তাপে পিপাই করিয়া কয়েকবার জল বদলাইয়া ধুইয়া ছড়াইয়া শুকাইয়া লইলে চামড়ার পীতাভ রং হয়। এক্ষণে ১৬০° ফা তাপে পিপার মধ্যে চামড়ার ওজনের শতকরা ৫ ভাগ সাবান-ফেনাই করিয়া শীতল ও শুষ্ক করিবার জন্য ছড়াইয়া টেবিলে বিছাইয়া দিতে হয়। শীতল হইলে গরম জলে চামড়ার উপরের তেল ধুইয়া ফেলা দরকার নতুবা রং সর্ব্বত্র সমভাবের হয় না। আজ কাল বহুবিধ রঙের মসলা পাওয়া যায়, সে সকল দ্বারা ইচ্ছামত রং হইতে পারে।

মান্দ্রাজের কারখানায় প্রধানত নিম্নলিখিত চারিটি মিশ্রণ বিভিন্ন রং উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(১) ৪ আউন্স Phosphine substitute ও ১ আউন্স new acid brown.

(২) ৩ আউন্স Phosphine substitute, ও ৩ আউন্স new acid brown, সিকি আউন্স acid green.

(৩) ৪ আউন্স Phosphine substitute, ৩ আউন্স new acid brown.

(৪) ৫ আউন্স Phosphine substitute ২ আউন্স new acid brown, এক-পঞ্চমাংশ আউন্স acid green.

রঙিন্ মসলার পরিমাণ চামড়া অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। ভেড়ার চামড়ার জন্য আধ আউন্স, গরুর পাতলা চামড়ার জন্য এক আউন্সের কিছু বেশী। aniline রং গরম জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া ফিলটার করিয়া লওয়া উচিত; ১৫০° ফ তাপে পিপার মধ্যে রং করা দরকার। প্রথমে আবশ্যকীয় রঙের অর্দ্ধেকটা দিয়া পিপাই করিয়া ১৫ মিনিট পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক রং যোগ করিতে হয়। আধ ঘণ্টা পরে বার আনা অংশ রং পিপা হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া ডিম্বের-হরিদ্রাংশ চামড়ার ওজনের শতকরা ১ ভাগ হিসাবে যোগ করিয়া আরো ২০ মিনিট পিপাই করিয়া ঘোড়াঞ্চির উপর শুকাইতে দিয়া চামড়ার উপর পিঠ ২০ ভাগ গ্লিশারিন মিশ্রিত জল দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া দিতে হয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে উঠাইয়া খোঁটাই করিতে হয়। তৎপরে রং আরো ভাল করিতে হইলে শতকরা আধ ভাগ রঙ্ মিশ্রিত জলের প্রলেপ নরম তুলি দিয়া চামড়ার সদর পিঠে মাখাইয়া দিতে হয়। এবং তৎপরে আবার খোঁটাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া season করিতে হয়।

Seasoning.

৩ আউন্স ডিমের সাদা ও এক পাউণ্ড দুধ জলে মিশাইয়া এক গ্যালন কর এবং সমস্ত মিশ্রণ রঙিন হয় এমত পরিমাণ রঙ সংযোগ কর। পাতলা করিয়া এই রঙ চামড়ার সোজা পিঠে মাখাইয়া শুকাইয়া দোলন যন্ত্রে পালিশ করিয়া পুনরায় খোঁটাই করিয়া পুনরায় seasoning মিশ্রণ মাখাইয়া পালিশ করিয়া লইলেই চামড়া ব্যবহারোপযোগী হয়।

কালো রং।

Corvoline B. T. aniline রঙের উপর খয়েরের প্রলেপ দেওয়া অপেক্ষা Haematine বা logwood কাঠের তরলসারের প্রয়োগের পর হীরাকষের প্রলেপ (ferrous sulphate) লাগাইলে কার্য্য ভাল হয়। চামড়ার ওজনের শতকরা দেড় ভাগ লগউডসার জল মিশ্রিত করিয়া লগউডসারের দুই আনা অংশ কাপড় কাচা সোডা তাহাতে মিশ্রিত কর। এই মিশ্রণে চামড়া প্রথমে পিপাই করিয়া আধ ঘণ্টায় চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ হইলে পিপা হইতে উঠাইয়া চামড়ার সদর পিঠ ভাল করিয়া পালিশ কর। তৎপরে টেবিলের উপর মাংসপিঠ উপর দিকে করিয়া চামড়া বিছাইয়া দুই পাশ মুড়িয়া মাংসপিঠ একেবারে ঢাকিয়া ফেল এবং চাপিয়া ঘসিয়া এমন ভাবে দুই পার্শ্ব আটকাইয়া দেও যেন খুলিয়া মাংসপিঠ বাহির হইয়া না পড়ে। তৎপরে শতকরা ১ ভাগ হীরাকষের মিশ্রণে চামড়া দুইবার চুবাইয়া তুলিয়া গরম জলে ধুইয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে হীরাকষের লোহা লগউডসারের সহিত রাসায়নিক সংযোগে চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ হইতে গাঢ়কৃষ্ণ করিয়া দিয়াছে। এই লোহা মাংসপিঠে লাগিলে চামড়া খারাপ হইয়া যায়। এবং হীরাকষ চামড়ায় লাগিয়া থাকিলে সাবান ফেনাই কার্য্যকর হয় না; এজন্য হীরাকষের সামান্য কণাও ধুইয়া দূর করা উচিত। সাবান ফেনাই সর্ব্বত্র সমান। কেবল seasoning মসলা বাদামি চামড়ার মসলা হইতে পৃথক। কালো চামড়ার seasoning মসলা এই:—

এক কোয়ার্ট গরম জলে ২ আউন্স লগউড্সার গুলিয়া ঠাণ্ডা হইতে দেও; ১ কোয়ার্ট ঠাণ্ডা জলে তিন-চতুর্থাংশ আউন্স হীরাকষ গুলিয়া দেও। ১ পাঁইট রক্ত, ১ পাঁইট দুধ, ও আধ আউন্স গ্লিসিরিন এক কোয়ার্ট জলে তরল করিয়া লও। ইহার সহিত লগউড্সার মিশ্র ভাল করিয়া মিশ্রিত কর; তৎপরে হীরাকষের জল ঢালিয়া মিশাইয়া আরো জল ঢালিয়া সমস্ত মিশ্রটাকে ১ গ্যালন কর। একটা স্পঞ্জ দিয়া পাতলা করিয়া চামড়ায় মাখাইয়া চামড়া অল্প ভিজা থাকিতে পূর্ব্ববৎ খোঁটাই পালিশ করিলেই চামড়া ব্যবহার্য্য হইল।

মিশ্র-কষ।

কোন কোন অংশে ক্রোম চামড়া বল্কলকষের চামড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এ জন্য মিশ্র-কষ প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় প্রণালীর সুবিধা ও সদ্গুণ সংযোগে চামড়া অতি উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু মিশ্র-কষ ব্যয়সাধ্য। যদি মিশ্র-কষের পর পুনরায় রং করা না হয়, তাহা হইলে বাদামি রং করা ক্রোম চামড়ার তুল্য মূল্য হয়। মিশ্র-কষের স্বাভাবিক রং অরুচিকর নহে।

মিশ্র-কষের ত্রিবিধ উপায়। (১) উভয় কষের মসলা মিশ্রিত করিয়া কষ করা। এ উপায় এখনো পরীক্ষিত হয় নাই। (২) ক্রোম-কষ করিয়া পরে বল্ক-কষ করা বা (৩) বল্কল-কষ করিয়া ক্রোম-কষ করা। এই উভয় প্রণালীতে ফল একবিধই হয়।

Avaram বল্কলে কষ করার পর হরিতকীর কষ বা চর্ব্বী শোষণ করাইবার পূর্ব্বে দেশী চামারের কাছে কষকরা চামড়া কিনিয়া ক্রোম-কষ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট চামড়া উৎপন্ন হইয়াছে। খুব সৌখীন জুতার তলার জন্য এই চামড়া অতি উপযুক্ত। ঘোড়ার সাজ করিলে বর্ষার জলে অবিকৃত থাকে। জুতার উপরের সাজও খুব ভাল ও মজবুত হয়, অথচ নরম জলবারক প্রভৃতি ক্রোম চামড়ার সকল গুণই ইহাতে থাকে।

ক্রোম-কষের খরচ।

সম্পন্ন চামড়ার প্রতি পাউণ্ডে দেশীয় কারখানায় দুই হইতে আড়াই আনা খরচ পড়ে। ক্রোম-কষে তিন আনা খরচ পড়ে। ক্রোম-কষে চামড়ার ওজন বৃদ্ধি হয় না; ইহা ধরিয়া হিসাব করিলে বল্কলকষের অপেক্ষা

অধিক ব্যয়সঙ্কুল নহে। রঙিন্ চামড়ায় অবশ্য খরচ অত্যন্ত অধিক পড়ে; কিন্তু সে সব চামড়া কেবল ভাল কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রোম-কষের কারবারে অধিক মূলধন আবদ্ধ করিতে হয় না, কারণ ইহাতে কাজ খুব শীঘ্র সম্পন্ন হয়। দেশীয় প্রণালীতে কলকারখানার দরকার নাই। ইহাতে দরকার। কিন্তু যে পরিমাণ মূলধন মুক্ত থাকে তাহা ব্যয় করিলে যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে পারে।

উপসংহার।

বই বাঁধার চামড়ার জন্য avaram বক্কলের কষকরা চামড়া উপযুক্ত নহে। উহাতে catechol tannin থাকে, তাহা বই বাঁধার চামড়ার উপযোগী নহে; বই বাঁধার চামড়া pyrogallol tannin দ্বারা উৎকৃষ্ট হয়। হরিতকী বহেড়া ও divi-divi কষে pyrogallol tannin আছে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ হরিতকী বহেড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের কাজে লাগান যায় কি না একবার চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া দেখা দরকার। গৃহপালিত পশুচর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়, তাহাও একটা লাভজনক ব্যবসায়সামগ্রী। আমাদের দেশে গরু দাগা প্রথা বহুপ্রচলিত; ইহাতে চামড়া খারাপ হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমশ এ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করাও উচিত। একটু সতর্কতা ও চেষ্টা করিলে আমাদের লুণ্ঠিত, পরহস্তগত ধন-সামগ্রী আমরা আবার ফিরিয়া পাইতে পারি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার হইয়াছে।

শ্রীমঞ্জুপ্রিয় মালাকর।

দুই রকম কবি—
হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

কবিদের শ্রেণীবিভাগ।

মোটামুটি কবিদের দুই দল আছে। একদল তাঁহাদের যুগের ভাব ও চিন্তার প্রতিধ্বনি করেন; তাঁহাদের কাব্যে আমরা পড়ি—

What oft was thought, but ne'er so well express'd.

ইহারা নিজ নিজ সময়ের প্রতিনিধি কবি (representative poets)। যেমন ইংলণ্ডে টেনিসন্। ভাষার লালিত্যে ও তেজে ইহাদের পদ্যগুলি সমসাময়িক লোকদের হৃদয় অধিকার করে; কিন্তু ঐ পদ্যগুলিতে অভিব্যক্ত ভাবগুলি সে সময়ের প্রধান প্রধান লোকদের অন্তরে আগে থেকেই ছিল। এই সব কবিরা দলের সঙ্গে সঙ্গে চলেন, অগ্রে নহে। তবে, তাঁহাদের ভাবগুলি তৎক্ষণাৎ বুঝা যায়, তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও আদর অতি শীঘ্র ও বহুজন-ব্যাপী হয়। সেই সময়ের লোকেরা তাঁহাদিগকে নিজের বক্তা বলিয়া গ্রহণ করে, পথ ঘাটের লোকেরাও তাঁহাদের কথাগুলি আবৃত্তি করে।

আর এক শ্রেণীর কবিরা ভবিষ্যতের দূত; তাঁহারা এক রকম ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বা prophet, নবমন্ত্র ঘোষণা করিতে আসেন, এবং প্রায় সব সময়েই প্রেরিত পুরুষের পুরস্কার পাইয়া থাকেন,—হয় দরিদ্র অজ্ঞাত যশোহীন জীবন যাপন করেন, না হয় লাঠি ও ঢিলের সাহায্যে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া প্রচার কার্য্য সংক্ষেপ করা হয়। তাঁহাদের ভাব কেহ তখন তখন বুঝে না, কারণ তাহা সে সময়ের অনেক অগ্রবর্ত্তী। এ ভাবগুলি এত নূতন, আমাদের সংস্কারের এত বিরোধী, যে আমরা কবিকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করি।

কিন্তু সময়-স্রোত বহিতে থাকে; ক্রমে আমাদের মনোবিকাশ হয়; নূতন ভাব আর তত নূতন তত কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমরা কবিকে বুঝিতে আরম্ভ করি, স্বীকার করি "লোকটা ত ঠিক বলেছিল। কি আশ্চর্য্য সে এত বৎসর আগে এ সব কথা জেনেছিল!" তখন মৃত কবির ভিটের চারিদিকে ভক্তগণ একত্র হন; তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়া কত যুবক সেই মত প্রচার করিতে ব্রতী হয়। এইরূপে তাঁহার ভাব ক্রমে জগৎ জয় করে। যেমন ইংরাজী গাথায় পড়া যায় যে সেনাপতি পার্সি (Percy of Northumberland) মৃত হইয়াও এক যুদ্ধ জিতিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কবিদের সুখ কম, কিন্তু গৌরব বেশী।

হেমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িকদের বক্তা ছিলেন, ভবিষ্যৎ যুগের দূত ছিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করিতেছি না। আমি এখনই দেখাইব যে তাঁহার কাজের কত মূল্য ও কত গৌরব ছিল।

হেমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ।

হেমচন্দ্রের যৌবনে শিক্ষিত ভারত এক নূতন ভাবে নাচিয়া উঠিয়াছিল, এক নূতন মদে মাতোয়ারা হইয়াছিল। পাশ্চাত্য-জ্ঞান ততদিনে অনেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল; শিক্ষিতেরা তখন বাড়ী বাড়ী কর্ত্তার পদে উঠিয়াছিলেন, কারণ ততদিনে খাঁটি সেকেলে বুড়োর দল প্রায় অদৃশ্য হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও সাধারণভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল; আর আগেকার মত মিশনরি স্কুল ও হিন্দু কলেজ পাশকরা জনকত "কেষ্ট বন্দো"তে আবদ্ধ ছিল না। এই নব

শিক্ষিতেরা একটি গঠিত দল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; এই শ্রোতৃবর্গ এক ভাবে সংযুক্ত, এক বক্তার বাণী ইহাঁদের সকলের কাছে পৌঁছিতে পারে।

এই শিক্ষিত দল তখন মহা আশায় আশ্বাসিত হইয়া সমাজ-সংস্কার, জাতীয় উন্নতি, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি জনহিতকর কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যতে—অতি নিকট ভবিষ্যতে—সব কুসংস্কার, সব কুশাসন, সব কুনীতি দূর হইবে; অতি শীঘ্র জ্ঞানের রাজত্ব আরম্ভ হইবে। এই মহা কার্য্যে একজন বক্তার একজন গায়কের আবশ্যক। গান সঙ্গে না থাকিলে প্রচার সফল হয় না, এ কথা মেথডিষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা বেশ জানিতেন; বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জর্জ হুইট্‌ফিল্ড ধর্ম্মপ্রচার করিতেন আর কিন্নর কণ্ঠে চার্লস্ ওএস্‌লি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতেন; তাহাতে ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জনসাধারণ নব ধর্ম্মে নাচিয়া উঠিয়াছিল।

হেমচন্দ্র সেই সময়ের গায়ক, কাব্যে সেই ভাবগুলির প্রতিনিধি। তাঁহার ওজস্বী অথচ সুললিত ভাষা অতি শীঘ্র সহস্র সহস্র হৃদয়ে ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র পাঠককে নবভাবে দীক্ষিত করিল। শুধু বক্তৃতা বা পুস্তিকা (pamphlet) দ্বারা এ কার্য্য করিতে বড় বিলম্ব হইত, ও উহা বড় কঠিন হইত। আমাদের কবির পক্ষে এ কি গৌরব নহে?

তাঁহার সামাজিকতা (Collectivism)।

এই কার্য্যে হেমচন্দ্রের মনের দুইটী বিশেষ বৃত্তি বড়ই সাহায্য করিয়াছিল। প্রথম, তাঁহার কাব্যে সামাজিকতা অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয়; তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন তাহা দশের জন্য, লোকসমষ্টির জন্য; একাকী ঘরের কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা "পর্ণ-কুটীরে অতি বিষণ্ন" নির্জ্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া হেমচন্দ্রের কবিতা গীত হয় নাই। তাঁহার প্রতিছত্রে দেখা যায় যে তিনি সর্ব্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির মধ্যে একজন; যেন এ জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে একা দাঁড়াইয়া নীরবে অন্য সব লোককে দেখিতেছেন, এরূপ তাঁহার মনের ভাব নহে। সপ্তকোটি ভ্রাতার সঙ্গে একত্র দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, সপ্তকোটি-কণ্ঠের কল-কল-নিনাদের সুর তিনিই ধরাইয়া দিতেছেন এবং নিজেও তাহাতে যোগ দিতেছেন ইহাই তাঁহার ভাব।

হেমচন্দ্রের প্রায় সব পদ্যেই এই সামাজিকতা আছে। কি বিন্ধ্যগিরি কি পদ্মের মৃণাল কি কালচক্র যাহাই কবি দেখেন তাহাতেই তিনি জাতি ও দেশের কথা ভাবেন; শুধু এ দেশ নহে জগতের অন্যান্য দেশও তাঁহার মনে পড়ে। আবার তাঁহার কতকগুলি কবিতা শ্রেণীবিশেষকে লইয়া। এমন কি "শিশুর হাসিতে" পর্য্যন্ত এই সার্ব্বজনীন ভাব আছে; তিনি একা এই সুখকর দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন না—

> দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
> কে না ভাসে, কে না চায়,
> আবার দেখিতে তায়?
> এক মাত্র আছে অই অখিলমোহন—
>
> জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
> শিশুর হাসির কাছে,
> সবি পড়ে থাকে পাছে
> যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই!

এমনকি রাত্রে একাকী—

> —বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
> ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
> দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধু জন।

হেমচন্দ্র বিজনচিন্তায় পর্য্যন্ত দেশ ও জনসমাজকে ভুলিতে পারেন না!

এই ভাবের পূর্ণবিকাশ তাঁহা স্বদেশ-প্রেমসূচক পদ্যগুলিতে। এক্ষেত্রে হেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এগুলি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে গাঁথা আছে, সুতরাং বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের* সেই মত কবিতার তুলনা করিলেই বুঝা যায় হেমচন্দ্র কত সামাজিক, রবীন্দ্র কত একক (individualistic)। রবীন্দ্র দেশের দশা ভাবিয়া যেন একা একধারে দাঁড়াইয়া থাকেন, দলে মেশেন না। তাঁহার এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্য "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" এবং "সে যে আমার জননী রে!"

---

* প্রবন্ধ ১৩০৯ সালে রচিত। তখন রবীন্দ্রনাথের "বাউল" বাহির হয় নাই।

প্রথমটিতে কবি দেশের কথা বলেন; আকাশ নদী সমুদ্র ক্ষেত্র বনের কথা আছে, এদেশের মানুষদের কথা নাই। সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদের একটু শব্দও নাই।* "আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা, সেই বংশোদ্ভব জাতির" নামগন্ধও নাই। পদ্যটি পড়িয়া মনে হয় ভুবনমনোমোহিনী বুঝি নিঃসন্তান।

"সে যে আমার জননী রে!" এই পদ্যের বিশেষত্ব "আমার" এই কথাটিতে,—কবি একা একপাশে দাঁড়াইয়া দূর হইতে জননীর কুপুত্রদের ব্যবহার দেখিতেছেন, লজ্জায় অধোবদন, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়, একা হইয়াও জননীর সেবায় ব্রতী। আর সমস্ত লোক যাহাই করুক না কেন তিনি একা নিজ কর্ত্তব্য করিবেন, কাহারও মুখ চাহিবেন না। এই মনের তেজ, এই এককতা ধর্ম্মসংস্কারকের হৃদয়ের পূত অগ্নিশিখা। To be in a minority of one কম সাহসের কথা নহে।

হেমচন্দ্র, কিন্তু, কুলাঙ্গার ভ্রাতাদিগকেও আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে যাইয়া হাত ধরিয়া টানিতেছেন। হেমচন্দ্র বলেন "আমরা," রবীন্দ্র বলেন "আমি;" ইহাই উভয়ের পার্থক্য। এই জন্য রবীন্দ্রকে aristocrat হেমচন্দ্রকে democrat বলি। [একথা তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে; কারণ মিল্টন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইলেও aristocrat এবং শেলী রায়বাহাদুরের (Baronet) জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও democrat.]

হেমচন্দ্রের সামাজিকতার আর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহার রচনার ধরণ। তাঁহার ছবিগুলি বড় বড়, পটখানি পরিপূর্ণ, দৃশ্য সুদূরব্যাপী,—যেন প্রাসাদগবাক্ষ হইতে জনসমষ্টি দেখিতেছি, যেন পর্ব্বতশিখর হইতে দেশ জনপদ নদনদীর ছবি আঁকা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গ অতি স্পষ্ট, পরিসীমার রেখাগুলি অতি পরিষ্কার।

তাঁহার কাব্যে চিরন্তন সহজ ভাব।

(Eternal Primary Feelings.)

হেমচন্দ্র যে সকল ভাব তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতি সরল অতি সনাতন; তাহা প্রাচীনকালেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনেক লোকের হৃদয়ে থাকিবে। মুটে মজুরও তাহা বুঝিতে পারে। দয়া, প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, পুত্রস্নেহ, প্রভৃতি মানবজাতির প্রাথমিক ভাবগুলিতে কিছু কঠিনতা নাই, বুঝিতে বিদ্যা বা সভ্যতা আবশ্যক হয় না। *প্রাচীন জগতের প্রশ্নগুলি (problems) বড় সহজ* ছিল, লোকের মনের বাসনাগুলি বড় স্পষ্ট, অবিকৃত ও অমিশ্র ছিল। এই জন্য হোমার ও বাল্মীকির এত পশার। তাঁহারা যে সব মনোবৃত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন, তাহা অতি সাদাসিদে অতি সহজে বুঝা যায়। এই জন্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীত কৃষকেরা পর্য্যন্ত গায়। এজন্য ভেনিস নগরের মাঝিরা নৌকা চালাইতে চালাইতে কবি ট্যাসোর "জেরুজিলম বিজয়" মহাকাব্যের ছত্রগুলি পালাক্রমে আবৃত্তি করিতে থাকে।

কিন্তু এর সঙ্গে একট অসুবিধাও ছায়ার মত লাগিয়া আছে। বর্ত্তমান জগতের প্রশ্নগুলি এত সহজ নহে; সমাজ ও শিক্ষা যেমন বাড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটিল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমরা আর প্রাথমিক মনোবৃত্তিগুলি দ্বারা বড় একটা পরিচালিত হই না, এখন সূক্ষ্মতর ভাবগুলি (secondary feelings) আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করে। সুতরাং এখনকার কবির কাজ বড়ই কঠিন। একেত, তাঁর মালমশলা জটিল, তায় আবার ও গুলিকে সহজে কবিতার ছাঁচে ঢালা যায় না। কম লোকেই উহা বুঝে, অথচ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিলে, তথায় প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিতে না পারিলে, কবিতা বিফল হয়। ইউরোপে কেবল গেটে এবং জর্জ ইলিয়ট্ এই কাজ হাতে লন; এবং তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিচক্ষণ পাঠকেরা আর সেকেলে কবি বা ঔপন্যাসিকের লেখায় সন্তুষ্ট নন; তাঁহারা তাহা ছেলে বেলার যোগ্য বলিয়া মনে করেন। কাজেই ইউরোপে সরল, সাধারণ কবিতা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

হেমচন্দ্র যখন আসরে নামেন তত আগে এসব নূতন প্রশ্ন এদেশের কাব্যে কেন ইংলণ্ডেও বড় স্থান পায় নাই, তাই তাঁহার লেখায় এদের আভাস নাই। আমাদের মধ্যে কেবল রবীন্দ্র এই নূতনতম যুগের ভাব অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্য সফলও হইয়াছেন। যদি পদ্য বলিতে

* ইহার উত্তর "প্রথম সামরব তব বনভবনে" নহে। প্রথম বটে, কিন্তু এখন কি?

"জীবনের সমালোচনা"* বুঝি তবে হেমের অনেক কবিতা পদ্য নহে। আর যদি পদ্য "ভাবময়ী চিন্তা" impassioned thought হয় তবে হেমের পদ্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; তিনি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর পদ্য লিখিয়াছেন। তাঁর এক একটা রচনা পড়িয়া উঠিবার সময় বোধ হয় না যে আগে যাহা ছিলুম সেই মানুষই রহিয়াছি; অনুভব করি যে মনটা বিচলিত উচ্ছসিত হইয়াছে, এই নীচ ধুলো-মাথা জগৎ হইতে উঁচু হইতে ইচ্ছা হয়,—ইহাই পদ্যের কাজ।

অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের অভাব।

নবপ্রথার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র নাথে অন্তর্দৃষ্টি introspection বড় বেশী; তিনি মনের ভাব গুলি অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন। বড়ই তলাইয়া দেখেন; একটি মাত্র হৃদয় অথবা এক হৃদয়ের ভাববিশেষ লইয়া তাহাকে এত নাড়িয়া চাড়িয়া উলটিয়া পালটিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন যে তাহার কোন ভগ্নাংশেরও দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের পক্ষে ইহার একটি বিশেষ কারণ আছে।

রাজনৈতিক নৈরাশ ও অধুনিক কবিতা।

হেমচন্দ্রের যৌবনে যে প্রবল আশা ও স্বদেশপ্রেম বাঙ্গলাকে নাচাইয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল; কারণ ফল আশানুরূপ হয় নাই। নৈরাশ উৎসাহের স্থান অধিকার করিল। নেতারা "সুমেরু হইতে কুমারী অবধি" জগৎজয়ের আশা অনেক দিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছেন; শুধু দুটো মোটা খেয়ে মোটা পরে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে দেশের লোক দেশে থাকবে এই ভাবনায় ব্যস্ত! সমাজ-সংস্কারের স্রোত ও প্রতিহত নিবর্ত্তিত হয়েছে। নূতন স্বচ্ছ জলের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের স্থানে শুধু কাদা ও কঙ্কর হাতে লাগ্‌ছে, আমাদের উত্তম উৎসাহ বহির্জগত হতে প্রতিহত পরাঙ্মুখ হয়ে আমাদের গৃহে ও হৃদয়ে আবদ্ধ হয়েছে। যে জলরাশি মাঠের উপর দিয়া বিস্তারিত হলে লোকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ, তাহাই সঙ্কীর্ণ বাঁধের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় স্ফীত ভীষণ, দ্রুতগামী হয়েছে। মানসদৃষ্টি সংকুচিত হওয়ায় আমাদের introspective করে তুলেছে; আমাদের ভাবগুলি বেশী গভীর, বেশী সূক্ষ্ম, বেশী তীব্র।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আমাদের আর কোনও কবি বা ঔপন্যাসিক এত সূক্ষ্মরূপে চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করেন নাই, আর কেহই হৃদয়ের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে প্রবেশ করেন নাই। এর সঙ্গে তুলনায় হেমনবীনের রচনাকে অনেক সময় সেকেলে বাঁধাগদ্ (conventional) এর মত বোধ হয়। এই দেখুন হেমচন্দ্র তাঁহার "কালচক্র" "অশোকতরু" "জীবন মরীচিকা" প্রভৃতি অনেকপদ্যে নিজ জীবনে বিফলতার কথা বলে আক্ষেপ করেছেন; ইহার ধরণ একরকম, এটা আমাদের সুপরিচিত, কতকটা সেকেলে। আর দেখুন রবীন্দ্র ব্যর্থমনোরথে গাইতেছেন:—

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্ন তন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।

* * * *

স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা!

* * * *

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান
বিফল বাসনারাশি।

এই দুই শ্রেণীর ভাবের মধ্যে কত তফাৎ তাহা সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্র সংসার-যুদ্ধে পরাস্ত; কর্ম্মক্ষেত্রে চেষ্টার সফলতা পান নাই; তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে নিজের অন্তরে অপমানিত বা ক্ষুব্ধ বোধ করিতেছেন না। "জগৎসভার কাছে অজ্ঞাত অখ্যাত" হউন না কেন, উচ্চ আদর্শ (ideal) ছাড়েন নাই। তাঁহার আরাধ্যা দেবীর কাছে সেই ভগ্নমনোরথ সেই বিফল-বাসনা উপহার দিতেছেন; কারণ সব পরাজয়ই লজ্জার কথা নহে, সব সফলতাই গুণের প্রমাণ নহে; সুধু চেষ্টা, এমন কি হতাশযুদ্ধ, প্রকৃত পুরুষত্বের পরিচয় দেয়।

* মাথু আর্ণল্ড নামক সমালোচক-শ্রেষ্ঠের মত;—এখনও সকলে অনুমোদন করেন নাই।

মহৎ উদ্দেশ্য, অসিদ্ধ হইলেও, মহৎ থাকে। হেমচন্দ্রে এ ভাবের আভাস নাই।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, এরূপ পদ্যে বহুব্যাপী মানবভাব (broad human interest)এর উদ্রেক করা যাইতে পারে না। এরূপ পদ্যে যাঁহারা মগ্ন হন তাঁহারা শিক্ষিত সমাজে সংখ্যায় কম। তাই, যখন সুধু দুই একটি লোক রবীর সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া বলিতে থাকেন—

দেখি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন খানি।

অথবা,

নাথ যার যাহা আছে তার তাই থাক,
আমি থাকি চির লাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে, নয়নে নয়নে,
থাক থাক চির বাঞ্ছিত!

তখন সহস্র সহস্র হতাশ কণ্ঠ হেমের প্রতিধ্বনি করিবে—

জীবন এমন ভ্রম, আগে কে জানিত রে?

কাব্যগঠন ক্ষমতা। (Construction)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সুক্ষ্মে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার কাব্য-গঠন ক্ষমতা খর্ব্ব হয়েছে। যেমন তাঁহার ছোট গল্পগুলি বড় সুন্দর, উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌছিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ নভেলগুলি তাহা নহে। কাব্যগঠন অর্থাৎ মালমশলার ঠিক আয়োজন ও বিন্যাস করিতে মাইকেল প্রথম, তারপর হেম, তারপর রবি। কিন্তু মাইকেলও প্রথম শ্রেণীর নহেন।

যে শিল্পী তাজমহলের নক্সা (plan) আঁকিয়াছিল তাহার প্রতিভা একমত, আর যে কারিগর তাজের একটি প্রস্তরফলক লইয়া তাহাতে অতিসূক্ষ্ম বিশ রকম পাথর বসাইয়াছে (mosaic) তাহার প্রতিভা অন্য মত।

অথবা যেমন একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ছয়মাস ধরিয়া একটি কপি গাছ আঁকে, প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক ভাঁজটি রঙ্গটি রেখাটি সযত্নে নকল করে ; অথচ সেই সময়ের মধ্যে মাইকেল-এঞ্জেলোর মত ইতালীর চিত্রকর রোমের প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-প্রাসাদের ভিতরের ছাদ কত সাধু যোগী ও দেবদূতের চিত্রে পূর্ণ করিয়া ফেলেন।

কিম্বা যেমন ডাক্তার রস্ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর একবিন্দু রক্তে কত সহস্র জরের পোকা আছে তাহা গণেন, অথচ সেই সময়ের মধ্যে Cuvier বা Linnæus শত শত জন্তু ও উদ্ভিদকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ করেন।

রবীন্দ্র অণুবীক্ষণধারী ডাক্তার বা ওলন্দাজ চিত্রকর ; মাইকেল, হেম, বঙ্কিম ঠিক মাইকেল-এঞ্জেলোর মত। গদ্যে "আনন্দমঠ" ও "চোখের বালী" * এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য বেশ বুঝাইয়া দেয়।

প্রকৃতিবর্ণন।

হেমের স্বভাববর্ণনার প্রধান লক্ষণ এই দুটি—ইহা উপমামূলক এবং মানব-সংস্পৃষ্ট। কবি পদ্মের মৃণাল দেখিলেন আর অমনি তাহার সাদৃশ্যে জাতীয় উত্থান পতনের কথা মনে হইল ; বিন্ধ্যগিরি দেখিয়া অমনি সেকাল ও একালের পার্থক্য মনে পড়িয়া গেল। কোন একটি পাখীর ডাক শুনিয়া সেই মত প্রেয়সীর কথা হৃদয়ে জাগিল। অশোক-তরু, যমুনাতট, সকলই গাছ বা নদী ছাড়া অন্য ভাবনা কবির হৃদয়ে জাগ্রত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ নদী পর্ব্বত প্রভৃতিতে কবি যেন জীবন দেখিতে পান না ; ও গুলির নিজের কোন মূল্য বা আদর নাই ; তাহারা কেবল এই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে যে উপমার পদার্থ হইয়া কবির হৃদয়ে অপর কোন দ্রব্যের—জাতি, দেশ, মানবজীবন, অতীত স্মৃতি প্রভৃতির—ভাব আনিয়া দিবে, অথবা উহাদের রঙ্গ গন্ধ শব্দ আমাদের বাহেন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবে। সুতরাং এই "অপর কোন দ্রব্য"ই হেমের নিকট প্রকৃতির চেয়ে বেশী আদরণীয়।

হেমচন্দ্র প্রকৃতি-বর্ণনা করিতে গিয়া সুধু প্রকৃতির দৃশ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না ; উহার সঙ্গে মানবকে সংযোগ করিয়া দিতে না পারিলে অসুখী হন। অর্থাৎ প্রকৃতি মানবের কাজের মানবের মনোবৃত্তির পট back-ground মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

নবীনের ভাবও ঠিক এই মত ;

* আমার দৃষ্টান্তটা ঠিক হয় নাই। "চোখের বালীতে" যথেষ্ট গঠন-নৈপুণ্য আছে।

বিজলী যেন "সুরবালাগণের রূপজ্যোতি," "বঙ্গের দশা দেখিতে মুহূর্ত্তেক গগন-গবাক্ষ খুলিয়া চমকিছে।"

তামসী রজনী শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত রেখা ভাসিল এখনি,
বঙ্গ ভবিষ্যত, আহা, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কালশেষ যেন নিশামণি!

অথবা,

কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হবে বিদারিত
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিদ্রিত।

এই সব স্থানে 'যেন' কথাটা যেন বড় অক্ষরে লেখা বলিয়া বোধ হয়। এখানেও ঠিক সেই মত উপমার প্রাধান্য, সেই মত মানবের সঙ্গে সংযোগ, সেই মত প্রকৃতির নিজস্ব স্বত্বের অনাদর। এ বিষয়ে হেম নবীন বাইরনের শ্রেণীর। দুই জনেরই reflective landscape painting. ইংরাজ কবি বাইরন Childe Haroldএ নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছেন; যেখানেই যান প্রকৃতি দেখিয়া মানবের কথা মনে জাগে; হয় নিজের জীবনের ঘটনা ও অবস্থা না হয় ঐ ঐ দেশের অতীত ইতিহাস ও সাহিত্য। সুইট্জারল্যাণ্ড দেশে প্রশান্ত লিমান্ হ্রদ দেখিলেন, অমনি সংসারের জ্বালা ঝঞ্ঝাট ত্যাগ করিয়া একান্তে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইল। ফেরারা নগরে গেলেন অমনি তথাকার কবি ট্যাসোর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ভেনিসে গিয়া কেবল সেই মহানগরের পূর্ব্ব গৌরব ও তৎসংসৃষ্ট নাটক ও কাব্যগুলির কথাই বলিলেন। রোমে গিয়া কেবল কল্পনার চক্ষে তাহার অতীত ইতিহাসের ঘটনা ও বীরগণকে দেখিতে থাকেন। হেমেরও তাহাই কিন্তু রবির প্রকৃতিবর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক, idealised. তাঁহার চক্ষে প্রকৃতি নিজেই আদরের জিনিষ, উহার জীবন আছে, মনোবৃত্তি আছে, অনুভবক্ষমতা আছে, হৃদয় আছে। জগৎ জড় নহে, সেও একটা প্রাণী। আমরা একটু তলাইয়া দেখিলেই সেই প্রকৃতির প্রাণ ধরিতে পারি।

যেমন, রবীন্দ্র পুরীতে গিয়া সমুদ্র দেখছেন। সমুদ্রের বর্ণ শব্দ আকার কিছুই তাঁহার মন আকৃষ্ট করিল না; এমনি সমুদ্রের উপমায় সমুদ্র ভুলিয়া মানবজীবনের অস্থায়িত্ব রাজ্যসাম্রাজ্যের বিনাশ প্রভৃতি কথাও ভাবিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—সমুদ্রটা এমন করে কেন? এটা কি অন্ধ উন্মাদ? অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মের বশে আসিতেছে ও যাইতেছে? জড় পদার্থ মাত্র?

কবি এ বিশ্বাসে মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি সমুদ্রের হৃদয়ের সঙ্গে নিজ হৃদয় যোগ করিয়া দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—

হে আদি জননী সিন্ধু! বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে! তাই তন্দ্রা নাহি আর,
চক্ষে তব,—

"তাই"ত; এতক্ষণে সমুদ্রের গূঢ় রহস্য টের পাওয়া গেল; ওটা আমাদের মতই হৃদয়যুক্ত কেবল চেহারাটা ভিন্ন। আর এখন উহার ব্যবহার অদ্ভুত বোধ হয় না; অতি সরল, এমন কাজকর্ম্ম ত প্রত্যহ (অন্যত্র) কত দেখিতেছি।

একি সুগম্ভীর স্নেহ খেলা
অম্বুনিধি ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপিয়া পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অশ্রুজলে স্নেহগর্ব্ব সুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে।

অর্থাৎ কবি দেখিলেন যে, সমুদ্রেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে; সে প্রাণ মেয়ের জন্য পাগল হইয়াছে, তাই মেয়েটিকে এত রকমে খেলা স্নেহ দিতেছে। এতক্ষণে সমুদ্রের আচরণের একটা কারণ বুঝা গেল, সমুদ্রের সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের একটা সহানুভূতি ও সম্বন্ধ দাঁড়াইল।

এরূপ বর্ণনায় রবীন্দ্র* অদ্বিতীয়; এর পাশে "হেম-নবীনের নাইকো জারিজুরি!" তাঁহাদের বর্ণনা যেন conventional বোধ হয়।

ভাষা।

ভাষার ঝঙ্কারে ও বেগে, লালিত্য ও তেজের সম্মিলনে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। যখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন আমাদের দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের পাঠকগণ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলাভাষায়ও এমন জিনিষ হইতে পারে! রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভাষার বর্ণনা এ প্রবন্ধে হইতে পারে না।

যদুনাথ সরকার।

* কবির হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরের যোগ হইলে কবি যে কেমন দিব্যচক্ষু পান তাহা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প গুলিতে সুন্দর দেখা যায়। গ্রীষ্মের ঠিক দুপুর বেলায় জনপ্রাণীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রকৃতির যে অস্ফুট স্বর জাগিয়া উঠে তাহা আর কোন লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন?

ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তুলার চাষের প্রসঙ্গে ঢাকার ভূতপূর্ব্ব এক রেসিডেণ্টের ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে এক পুস্তকের উল্লেখ ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় কিরূপ ছিল এই পুস্তকে তাহার বিশদ বিবরণ আছে। আমরা সংক্ষেপে সেই পুস্তকের সার সঙ্কলন করিয়া পাঠকগণকে অবগত করাইতে চেষ্টা করিব।

শিল্পস্থান।

প্রাচ্য দেশের মধ্যে ভারত বস্ত্রশিল্পের প্রাচীনতম স্থান এবং এখান হইতেই এই শিল্প পারস্য ও মিশরের মধ্য দিয়া য়ুরোপে নীত হয়। সমগ্র ভারতেই কার্পাস শিল্পের প্রসার ও প্রচলন ছিল; কিন্তু তন্মধ্যে বাংলাতেই এই শিল্পের পূর্ণ সৌষ্ঠব ও পরিণতি হইয়াছিল এবং বাংলার মধ্যে ঢাকা সর্ব্ব প্রধান। বাংলার বস্ত্র সম্বন্ধে ই, বেন্স নামক একজন ইংরাজ লেথক ব্রিটেনের কার্পাসশিল্পের ইতিহাস নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বাংলার কোন কোন বস্ত্র এমন সূক্ষ্ম যে মনে হয় ইহা কোন পরী বা পতঙ্গ কীটের বয়ন, মানুষের হস্তজাত নহে। এই প্রদেশের মসলিন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার মধ্যে ঢাকা, সোণারগাঁ, ডুমরোয়, তীতবাদী, জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান কার্পাস শিল্পের আড়ং ছিল।

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি প্রসিদ্ধ পর্য্যটক্ টেভার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়া ঢাকায় সর্ব্ব দেশের লোক সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ও আর্ম্মানী প্রধান। ১৮৫০ সালে ঢাকার তন্তুবায় সংখ্যা ছিল ৭৫০ ঘর।

সোণারগাঁকে লোকে সচরাচর পৈনাম বলে। ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত। বিক্রমপুর প্রকৃত বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। শের সাহের সময়ের কবর, মসজিদ পুষ্করিণী প্রভৃতি সোণারগাঁয় দেখা যায়। এখানকার অধিবাসী প্রধানত মুসলমান। ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজল ও র‍্যাল্ফ্ ফিচ্ সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্মবস্ত্রের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম মসলিন ও ফুলদার কাপড়ের জন্য এই সহর প্রসিদ্ধ ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল এবং তাহাদের খাতায় ১৩।১৪ শত তাঁতির নাম লিখিত ছিল। এক্ষণে (১৮৫০ সালে) তাঁতির সংখ্যা ৩০০ ঘর।

ডুমরোয় সাভারের নিকটে, বংশী নদীর তীরে। ইহা এই প্রদেশের প্রাচীনতম শিল্পস্থান। অধিবাসী প্রধানতঃ হিন্দু। এখানে বস্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপযোগী সুসূক্ষ্ম সূত্র অধিক উৎপন্ন হয়। তাঁতির সংখ্যা ৪০০ ঘর।

তীতবাদী লক্ষীয়া নদীর তীরে, কাপাসিয়ার নিকটে। উত্তম তুলা এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়; সেই জন্য এই প্রদেশের নামই হইয়াছে কাপাসিয়া। সূক্ষ্ম মসলিনও খুব ভালো হয়। তাঁতির সংখ্যা ২০০ ঘর।

জঙ্গলবাড়ী ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বধারে। পূর্ব্বে ঢাকার অন্তর্গত ছিল; এক্ষণে ময়মনসিংহের অন্তর্গত। এককালে সমৃদ্ধ শিল্পসহর ছিল কিন্তু এক্ষণে তাঁতির সংখ্যা মোটে ১০০ ঘর। সিরাজ-উদ্দৌলার সময় ৭০০ ঘর তাঁতি রাজকর্ম্মচারীদিগের উৎপাত অত্যাচারে এই সহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় (Bolts' Considerations on Indian Affairs, p. 194)।

বাজিতপুর এক্ষণে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হইয়াছে। এই প্রদেশের উৎপন্ন তুলা অত্যুত্তম এবং ঢাকার সূক্ষ্মতম মসলিন এখানেই প্রস্তুত হইত।

মুরাপাড়া, বালিয়াপাড়া এবং লক্ষীয়া নদীতীরবর্ত্তী আরো কয়েকখানি গ্রামেও কয়েক প্রকারের মসলিন প্রস্তুত হইত। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরে রেশম তুলায় মিশ্রিত একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কালোকোপা, জেলালপুর (ঢাকা), এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত নারায়ণপুর, চাঁদপুর ও শ্রীরামপুরে মোটা কাপড় উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত তিন স্থান ব্যবসায়ের প্রধান আড়ং ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি হইতে মোটা কাপড় ও ছিট য়ুরোপে প্রচুর রপ্তানি হইত।

তুলা।

ঢাকার মসলিনের জন্য তুলা সেই প্রদেশেই উৎপন্ন হইত। এই তুলার গাছ বাংলার সাধারণ তুলা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকারের ছিল (See Roxburgh's Flora

Indica, Vol. III., p. 184); সাধারণ তূলা অপেক্ষা ঢাকার তূলার আঁশ দীর্ঘ সূক্ষ্ম ও কোমল হইত। এই 'দেশী' তূলাকে সাধারণত 'ফোটি' বলিত। 'বৈরায়তি' নামক তূলা হইতেও সূক্ষ্ম মসলিন উৎপন্ন হইত, কিন্তু ঢাকায় ইহার অধিক আদর ছিল না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও উহারই শাখা নদী সকলের ধারে ধারে তূলার চাষ হইত। ১৮০০ সালের ঢাকার বাণিজ্য-রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে ঢাকার ফিরিঙ্গী বাজার হইতে ইদিলপুর পর্য্যন্ত ৪০ মাইল ভুভাগে কার্পাসের চাষ হইত এবং ইহার তুল্য তূলা জগতে আর কুত্রাপি হইত না। লক্ষীয়া নদী হইতে ধলেশ্বরী রূপগঞ্জ পর্য্যন্ত ও রাজসাহীর (?) ভূষণা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত কার্পাস চাষ ছিল। বৎসরে দুইবার—এপ্রেল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে—তূলা জন্মিত। ধান কাটিয়া বিচালীতে আগুন লাগাইয়া সেই ছাই সার প্রাপ্ত জমি চষিয়া তাহাতেই তূলা বপন করা হইত। তূলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ধান বা তিলের চাষ করা প্রথা ছিল। বারুইরাই পাটের চাষ ভালো করিত। বীজের গায়ে যে তূলা লাগিয়া থাকে তাহা হইতেই মসলিনের সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত; তাহার পরের তূলায় মাঝারী সূতা ও তাহার পরের তূলায় মোটা সূতা হইত। একটি কার্পাসকোষের মধ্যের তূলার এই তারতম্য টুকু ঢাকার তাঁতিরা ধরিয়া সূক্ষ্ম সূত্র উৎপাদনে চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

গ্রীষ্মের তূলা অপেক্ষা শারদী তূলা নিকৃষ্ট হইত। তূলার দাম গড়ে মণ প্রতি ৩৲ টাকা মাত্র ছিল।

গারো পাহাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে 'ভোগা' নামক এক প্রকার মোটা তূলা জন্মিত। মৃজাপুর ও আরাকান হইতেও প্রচুর তূলা ঢাকায় আমদানি করা হইত। ব্রহ্মযুদ্ধের পরে (১৮২৪) আরাকান হইতে তূলার আমদানি বন্ধ হইয়া যায়।

কাট্‌না কাটা।

কার্পাসের কোয়া হইতে স্ত্রীলোকেরা তূলা বাহির করিয়া পরিষ্কার করিত। বোয়াল মাছের কান্‌কো ও দাঁত চিরুণী রূপে ব্যবহৃত হইত। চালতা গাছের কাঠে তৈয়ারি তক্তার উপর তূলা রাখিয়া একটা লৌহশলাকা তূলায় জড়াইয়া জড়াইয়া আঁশ হইতে বীজ ছাড়ান হইত। তৎপরে একটা ধনুক দিয়া তূলা ধুনিত হইত। পেঁজা তূলা গোলা কাঠের গায়ে জড়াইয়া কাঠ খুলিয়া জড়ান তূলা দুইখান তক্তার মধ্যে চাপিয়া রাখা হইত। তার পরে নলীতে জড়াইয়া কুঁচে মাছের নরম চামড়ায় ঢাকিয়া রাখা হইত, যেন ধূলা মাটি লাগিয়া ময়লা না হয়।

সমস্ত সূক্ষ্ম সূত্র হিন্দুমেয়েরা প্রস্তুত করিত। এই কাজে বিষম ধৈর্য্যের দরকার; ধৈর্য্যগুণে হিন্দুমেয়ে জগতে অপরাজিতা; ডাক্তার কুক্ টেলর বলিয়াছেন যে হিন্দুর মেয়েদের এমন একটি অনন্যসুলভ ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিবার শক্তি আছে যাহাতে তাহাদের পেশীবলের অভাব পুরণ হইয়া যায়। ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কারাই সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে পারে। সূতা তৈয়ারির তোড়জোড় একটী চুবড়ীতে থাকে; তোড়জোড়ের প্রধান—'পুনি' (তূলার নলী), হাল্কা লোহা বা বাঁশের টাকু, কাদায় বসান একটা ঝিনুক বা শামুক; একটা ছোট পাথর বাটীতে একটু চা খড়ির গুঁড়া। টাকু একটা মোটা সূচের মত, তলার দিকে একটা বড় মটরের মত একটু মাটি লাগান। সূত্রবয়নকারিণী বসিয়া বামহস্তে তূলার নলী ধরিয়া থাকে ও মাটিতে আটকান ঝিনুকের খোলের উপর টাকু একটু কাত করিয়া রাখিয়া ডাহিনহাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে পাক দিয়া তূলার এক একটি আঁশ টানিয়া সূতা প্রস্তুত করে। মধ্যে মধ্যে আঙুলে খড়ির গুঁড়া লাগাইয়া লয়। খানিক সূতা পাকান হইলে তাহা টাকু হইতে খুলিয়া নাটাইয়ে জড়াইয়া রাখা হয়। বাতাস জলীয়বাষ্পশূন্য থাকিলে সূতা ভাল হয় না; এইজন্য সূত্রবয়নের সুবিধাজনক সময় প্রাতঃকাল বা বৈকাল ও সন্ধ্যা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সূক্ষ্মতম সূত্র বয়ন করা হয়। যদি প্রাতঃকালেও বাতাস শুষ্ক বোধ হয় তবে একটা চিটুকে পাত্রে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা পাকান হয়, পাত্রের জল গরমে বাষ্পীভূত হইয়া তূলার আঁশ সরস রাখে।

পূর্ব্বে দিল্লীর দরবারে যে সূত্র প্রেরিত হইত তাহার ১৫০ হাত সূতার ওজন হইত গড়ে ১ রতি মাত্র। ১৪০ হাতে ১ রতি যে সূতা তাহার 'পড়েন' ও ১৬০ হাতে ১ রতি ওজনের সূতার 'টানা' করা হইত। সোণারগাঁয় ১৭৫ হাত সূতার ওজন ১ রতি হইত। ১৮৪৬ সালে এই বক্ষ্যমান পুস্তক রচয়িতা রেসিডেণ্ট সাহেব দেখিয়াছিলেন যে আধসের তূলা হইতে ২৫০ মাইল লম্বা সূতা তৈয়ারী

হইয়াছিল। ডাক্তার কুক টেলার বলিয়াছেন যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত এই সকল সূতার অসমতা ও বন্ধুরতা পরিলক্ষিত হয় না; হিন্দু রমণীর স্পর্শানুভাবকতা এত সূক্ষ্ম। একজন বয়নকারিণী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূতা কাটিলে মাসে এক তোলা সূতা কাটিতে পারে। এই চরম পরিমাণ। সুসূক্ষ্ম সূত্রের এক তোলার দাম ৮৲ টাকা মাত্র।

মোটা 'ভোগা' তূলার সূতা চরকায় কাটা হয়। এই তূলা ধুনুরীরা পিঁজিয়া ধুনিয়া দেয়।

বয়ন।

মসলিন বয়নের কয়েকটি ক্রম, যথা:—সূতার পাইট ও সূতা গুটান, টানা খাটান, টানায় নলী পরান বা সানা দেওয়া ও বয়ন।

সূতা প্রথমে নলীতে জড়ান থাকে বা ফেটির আকারে থাকে। সেই সূতার নলী বা ফেটি জলে ভিজাইয়া দেয়। তার পরে একটা কাঠি নলীর মধ্যে পরায়, কাঠিটা এমন হওয়া চাই যেন নলীটা তাহার উপর ঘুরিতে পারে; একটা বাঁশের বাখারী অর্দ্ধেক চিরিয়া ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে কাঠিশুদ্ধ নলী আটকাইয়া বাঁ পায়ের বুড়া আঙুলের ফাঁসে চাপিয়া ধরিয়া নাটাইয়ে সূতা জড়াইয়া লয়; নাটাই একটা নারিকেল মালার উপর রাখিয়া ডান হাতে পাক দেয়, বাঁ হাতে নলী হইতে সূতা খুলিয়া লয়।

টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজান থাকে; প্রত্যহ দুইবার জল বদল করা হয়। চতুর্থ দিনে সূতার ফেটি জড়াইয়া তাহার মধ্যে দুইটা লাঠি দিয়া জোরে মোড়া দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। তার পরে রান্নার হাঁড়ির তলার ভুষাকালী মিশ্রিত জলে মোড়া খুলিয়া সূতা ডুবাইয়া দুই দিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর জল নিংড়াইয়া কাঠিতে টাঙাইয়া ছায়ায় শুকাইতে দেয়। আবার শুকাইলে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখে। তৎপর দিন একটা পিড়ির উপর সূতা খুলিয়া খৈয়ের মাড়ের সঙ্গে গুঁড়া চুণ মিশাইয়া সূতায় মাখান হয়। মনুর সময় হইতে সূতায় ধানের মাড় দেওয়া ভারতে প্রচলিত দেখা যায়। তার পরে নাটাইয়ে জড়াইয়া জড়াইয়া রৌদ্রে দেয়। তৎপরে সূতার শ্রেণী বিভাগ করে; অতি সূক্ষ্ম সূতা টানার ডাহিন দিকে, তার চেয়ে একটু মোটা বাম দিকে, তার চেয়ে মোটা মধ্য স্থলে দেওয়া হয়। এই হইল সাদা মসলিনের টানা। ডুরে মসলিনের জন্য দুই খেই সূতা একত্র পাকাইয়া একটা ডুরের টানা করে; এবং চারখানা মসলিনে চার খেই একত্র পাকায়।

পোড়েন বা ভরণার সূতা আগে প্রস্তুত করে না। বয়ন আরম্ভের দুদিন আগে প্রস্তুত করে। এক দিনের কাজ চলে এতখানি সূতা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখে। পরদিন জল শুকাইয়া মাড় দিয়া লয়। যতদিন না কাপড় বোনা শেষ হয় ততদিন রোজকার সূতা রোজ প্রস্তুত করিতে থাকে।

টানার স্থান তাঁতির গৃহের সন্নিহিত কোন গাছতলায় ফাঁকা জায়গা। ৪টা খুঁটা পুঁতে, খুঁটার মধ্যে মধ্যে দুটা দুটা করিয়া শরকাঠি পুঁতে। তাঁতি দুই হাতে দুইটা সূতার নাটাই লইয়া সেই খোঁটা ও কাঠির গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া দেয়। তার পরে সানা পরায়। একটা বেতের এক মুখ থেঁতো করিয়া সেই কুঁচি দ্বারা সূতার জোট ছাড়াইয়া দেয় (ইহাকে 'ঝাড়নি' বলে) এবং 'জোয়া' নামক ধনুকাকৃতি বেত দিয়া সূতা গুলিকে সমান্তরাল করিয়া দেয়। তৎপরে একটা দাণ্ডার গায়ে সেই সূতার টানা জড়াইয়া গৃহে আনে, তাঁত তাঁতির গৃহমধ্যেই থাকে।

চার কোণে চার খুঁটি পোঁতা থাকে, খুঁটির উপর লম্বালম্বিভাবে দুইটা বাঁশ বাঁধা থাকে, তাহার উপরে তাঁতের 'দাণ্ডাদড়ি' আশ্রিত থাকে।

মাকু সুপারীকাঠে প্রস্তুত হয়, দুই কোণে লোহা বাঁধান থাকে। মাকুর মধ্যে ছিদ্র থাকে, সেইখানে সূতার নলী পরান হয়, এবং নলীর সূতা মাকুর কোণের এক ছিদ্রের মধ্য দিয়া খুলিয়া খুলিয়া বাহির হইয়া যায়। টানার সূতার মধ্য দিয়া মাকু একদিক হইতে অপরদিকে যাতায়াত করিতে থাকে ও নলীর সূতা খুলিয়া ভরণা বয়ন করে। ভারতের হিন্দু তন্তুবায়দিগের মাকু চালাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্মে বলেন, যে যন্ত্র লইয়া হিন্দু তাঁতি সুসূক্ষ্ম মসলিন বয়ন করে, সেই যন্ত্রে য়ুরোপীয় তাঁতির অনমনীয় মোটা আঙুল মোটা ক্যাম্বিশ গড়া বুনিতে পারে কি না সন্দেহ। বয়নের সময় ঘর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য মাকু, নলী প্রভৃতিতে তৈল মাখাইয়া দেয় এবং একটা নল

থেঁতো করিয়া সেই কুঁচি সর্ষপ তৈলে ডুবাইয়া মাঝে মাঝে টানার উপর বুলাইয়া দেয়। ১০।১২ ইঞ্চি কাপড় বুনা হয় আর তাহার উপর একটু করিয়া চূণের জল ছড়াইয়া 'নাটা-নারদে' জড়াইয়া রাখে। দ্বিপ্রহরে কাপড় ভালো হয় না, এজন্য প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তাঁতিরা কাপড় বুনিয়া থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বায়ুমণ্ডল জলবাষ্প পূর্ণ থাকে, ঐ তিন মাসই বস্ত্র বয়নের উত্তম সময়। গরম শুখার সময় তাঁতের নীচে চিটকে পাত্রে জল রাখিয়া বাষ্প সংগ্রহ করে। বাষ্পাভাব হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যায়।

শুধু টানা তৈয়ারি করিতে দুজন লোকের ১০ হইতে ৩০ দিন লাগে। দুজন লোকে বুনিতে আরম্ভ করিলে সাধারণ কাপড় ১০ হইতে ১৫ দিন, সূক্ষ্ম ২০ দিন, সুসূক্ষ্ম ৩০ দিন, অতি সূক্ষ্ম ৪০।৪৫ দিন এবং অতি সূক্ষ্ম ডুরে বা চারখানা বুনিতে ৬০ দিন লাগে। ৭০।৮০৲ টাকার মলমল থান বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে।

ফুলদার জামদানি কাপড় বুনিতে ফুলের নক্সা কাগজে আঁকিয়া সেই কাগজ টানার নীচে ধরে ও তাহারই রেখার অনুসরণ করিয়া ফুল বুনে।

কাপড়ের নাম ও প্রকার।

মসলিন সাধারণত ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ চৌড়া হয়। মসলিনের দুই পাশে ছিলা থাকে। মিশরের মমী [অর্থাৎ রক্ষিত মৃতদেহ] শরীরে জড়ান কাপড় ঠিক মসলিনের মত ছিলাদার; হাজার হাজার বৎসর অবিকৃত রহিয়াছে। মসলিনের মধ্যে প্রধান গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) মলমল খাস—অর্থাৎ খাস রাজারাজড়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য। ইঁহাই 'আব্ধি' অর্থাৎ ১০ গজ লম্বা ১ হাত চৌড়া। ওজন ৮ তোলা ৬ আনা। মূল্য ১০০৲ টাকা। হাতের অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। ইহাকে লূতাজালের সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা বড় ঘরের মেয়েরা পরিধান করিতেন। নগ্নতা নিবারিত কেমন করিয়া হইত?

(২) ঝুনা—অর্থাৎ সূক্ষ্ম। দেশীয় নর্ত্তকী গায়িকারা এবং অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকারাই শুধু ব্যবহার করে। তিব্বতীয় 'দুলবা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—কলিঙ্গরাজ কোশলরাজকে এই বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন। এই বস্ত্র Gtsug-Dgah-mo নাম্নী এক ভিক্ষুণীর হস্তগত হয়; সে ইহা পরিধান করিয়া প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হয়, তাহার নগ্নতা আবরিত হয় নাই। তদবধি ভিক্ষুণীদিগের এই বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ হইয়াছে। টেবার্নিয়ে তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, এবংবিধ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিত না, মোগল দরবারে ও দরবারী আমির ওমরাহদিগের জন্যই সমস্ত ক্রীত হইত। পুরস্ত্রীরা গ্রীষ্মকালের পোষাক করিতেন এই কাপড়ে এবং রাজা-রাজড়ারা এই বস্ত্রপরিহিতা রমণী লাস্যলীলা দেখিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিতেন।

(৩) রং—ঝুনার মত উলঙ্গ বাহার কাপড়।

(৪) আব্-রবান্-অর্থাৎ বহমান (রবান্) জল (আব্)। সম্রাট ঔরংজেব তাঁহার কন্যার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে সকল অঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে দেখিয়া কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। কন্যা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ত' আবরুর জন্য সাত সাতটা জামা পরিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁয়ের আমলে একখানা আব্রুয়াঁ কাপড় ঘাসের উপর মেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই কাপড় ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, একটা গাভী চরিতে চরিতে ঘাসের সঙ্গে গোটা কাপড় খানাই খাইয়া ফেলিয়াছিল।

(৫) সরকার আলি—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের জন্য প্রস্তুত হইত।

(৬) খাসা—ইহার উৎকৃষ্টতম কাপড়ের নাম জঙ্গল-খাসা।

(৭) শুব্-নাম—প্রভাত শিশির, বা
শব্-নাম-সন্ধ্যার শিশির

(৮) আলবল্লা—এই বস্ত্র গ্রীক যোদ্ধারা বর্ম্মের উপর পরিত; সেই পরিচ্ছদের নাম ছিল 'আবোল্লা'।

(৯) তন্-জেব—তন্ মানে দেহ, জেব মানে অলঙ্কার।

(১০) তরহ্-উন্দাম—প্রায় উলঙ্গ (?)।

(১১) নয়ন-সুখ—নয়নানন্দকর বস্ত্র বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

(১২) বদন-খাস—কেবল দেহ, এই বস্ত্র পরিলে দেহ ভিন্ন বস্ত্র লক্ষ্য হয় না বলিয়া বোধ হয় এই নাম।

(১৩) শর্-বন্দ—শিরোবন্ধন, পাগড়ীর কাপড়।

(১৪) সরবতী—সরবতের মত পাতলা ; বা
শর্-বুটি—শিরোবেষ্টন, পাগড়ীর কাপড়।

(১৫) কামিজ—জামার কাপড়। জরির কাজ করা পোষাক পরিয়া তাহার উপর এই কাপড়ের 'জামা' (কুঞ্চিত, স্তর বিন্যস্ত আগুল্ফ লম্বিত এক প্রকার পরিচ্ছদ) পরিলে জরি সাটিনের জলুষ সাদা কাপড়ের সূক্ষ্ম-স্তর ভেদ করিয়া বাহির হইত ;—যেন বাষ্পভরা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া নক্ষত্র দ্যুতির চমকানিটুকু, আধো গুপ্ত আধো ব্যক্ত।

(১৬) ডুরিয়া।

(১৭) চারখানা।

(১৮) জামদানি—লতা পাতা ফুলকাটা কাপড়। সম্রাট ঔরংজেবের জন্য ২৫০৲ টাকায় ১ থান জামদানি তৈয়ারি হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর জন্য ফি থান ৪৫০৲ টাকা করিয়া পড়িত।

বাইবেল উল্লিখিত (Ezekiel xvi, 10, 13) মেশি নামক বস্ত্র বোধ হয় মসলিন (See Harris's *Natural History of the Bible.*) অতি পুরাকালে ভারতের এই বস্ত্র প্যালেষ্টাইনে নীত হইত ইহার প্রমাণ বাইবেলে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। (Exodus 34, 24, 23)। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারত বিদেশকে বস্ত্র সরবরাহ করিত। অধ্যাপক উইলসন তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ভারতীগণ শিল্পকুশলী সমুদ্রযাত্রিক ব্যবসায়ী জাতি ছিল। হায়, সে দিন আমাদের কেন গেল, আবার কবেই বা ফিরিয়া আসিবে !

ঢাকার কাপড়ের খ্যাতি রোমক দার্শনিকদিগের রচনায় ও জুভেনালের বঙ্গকবিতার মধ্যে দেখা যায়। প্রাচীনেরা এই বস্ত্রকে 'হাওয়ার কাপড়' (ventus textilis) আখ্যা দিয়াছিলেন। ঢাকার মসলিন গজ কতক ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছিল না হাওয়ার মত অদৃশ্য বলিয়া ?

এরিয়ানের পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এরিয়ান মিশরবাসী গ্রীক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তূলাকে প্রাচীন লাটিন লেখকগণ বলিতেন 'কার্বাসস,' হিব্রু 'কার্পাস,' পারস্য 'কার্বাস,' সংস্কৃত 'কার্পাস'।

দুইজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গীয় বস্ত্রের খ্যাতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (নবম শতাব্দী)। নবম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ আর দেখা যায় না। ১৫৮৬ সালে ইংরাজ পর্য্যটক র‍্যালফ্ ফিচ সোনারগাঁয়ের মসলিনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের বিশেষ সাহায্যকারিণী ছিলেন। তাঁহার সময়ে ঢাকার সূতি কাপড় ও মালদহের রেশমী কাপড় রাজদরবারের প্রধান পরিচ্ছদ বলিয়া গণ্য হইত।

সূক্ষ্ম মসলিনে হাজার হইতে দেড়হাজার সূতার টানা থাকে। মসলিনে দুই আড়াই হাজার সূতার টানা পর্য্যন্ত থাকিলেও তাহার সূক্ষ্মতা অন্য দেশের কারিগরের অনায়ত্ত।

ঢাকায় মসলিন ভিন্ন নিম্নলিখিত বস্ত্র সকল বয়ন করা হইত :—

(১) বাফতা—পারস্য শব্দ মানে 'বোনা'। ট্যাভার্ণিয়ে ইহার দুই থান প্রায় ১৫০ টাকায় ভড়োচে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছিলেন। হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয়।

(২) বুন্নি—লাল বা কালো পাড়ওয়ালা। মুসলমান মহিলার পরিধেয়।

(৩) একপাট্টা—উড়ানি রূপে ব্যবহৃত হইত।

(৪) জোড়—ব্রাহ্মণের পরিধেয়।

(৫) শাড়ী—পাড়ওয়ালা পরিধেয়।

(৬) ধুতি—ধৌত করা যায় বলিয়া এই নাম।

(৭) হাম্মাম—স্নানের সময়ের জন্য, মোটা কাপড়। শীতের সময় উড়ানিও হয়।

(৮) গামোছা।

(৯) গজি, গড়া—দরিদ্রের পরিধেয়। মৃতাবরণী।

মুগা রেশম মিশাইয়াও প্রায় ৩৬ প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইত। তন্মধ্যে প্রধান :—কুটাওরুমী, নওবুটি, আজিজুল্লা, লচক, কাশিদা (ফুলদার)। এই সকল 'মালদীকী' (মালদহকী আর্থাৎ মালদহের) কাপড়ের অনুকরণ। এই সকল কাপড় আরব, ব্রহ্ম, মিশর, তুর্কী দেশে যাইত। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে এই প্রকার মিশ্রিত উপাদানে বস্ত্রবয়ন প্রণালী মালদহ হইতে ঢাকায় প্রবর্ত্তিত হয়। মালদহের 'এলাচী' (দুপিঠ সমান) ও মশরু (সদর অন্দর পিঠওয়ালা) কাপড় মুসলমান অধিকারের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। রাণী হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেই রেশমের বস্ত্র বয়ন করিত,

কেহ হীন কাজ মনে করিয়া লজ্জা করিত না। পূর্ব্বকার স্ত্রীলোকদিগের—কি হিন্দু কি মুসলমান—বস্ত্র বয়নই অবসর-বিনোদন কার্য্য ছিল। ১৮২৮ সালে বিলাতী স্থতা দেশে ঢুকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কায়স্থ পুরুষগণও এই ব্যবসায় করিতে হীনতা বোধ করিত না। তাঁতি ছাড়া যুগীরাও তাঁতের কাজ করিত।

তাঁতি ও ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত।

তাঁতির ব্যবসায়ে পাকা লোককে 'কারিগর' বলিত, এবং শিক্ষার্থীকে 'নিকারী' বলিত। যাহারা স্থতার পাট করে তাহাদের মজুরী দৈনিক দেড় আনা, সাধারণ মসলিন বয়নকারী তাঁতির মজুরী দুই তিন আনা, ফুলদার মসলিন করার মজুরী চারি আনা অথবা ৭টা ফুলে এক আনা। শৈশব হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া শিক্ষা অভ্যাস ও জন্মগত ক্ষমতায় এক একজন কারুকর অদ্ভুতকর্ম্মা হইত। তখন খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ছিল—

		১৭৬০ সালে	১৮০০ সালে	১৮৩৭ সালে
চাউল ১/০ মণ	...	॥০—৸০	১৲—১॥০	১॥০—২৲
লবণ ১/০ মণ	...	১।০	৫৲	৫৲
সর্ষপ তৈল ১/০	...	৩।০	৫৲	৭৲

ভূমিকরও তখন অত্যল্প ছিল। এখন ত' সাহেবের অভর পকেট ভরাইবার চেষ্টায় কর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কাপড়িয়া মহাজনেরা কাপড় হাটে লইয়া গিয়া হাতে বা গজে মাপিয়া বেচিত। পাইকার, মুকিম, নাথোদারা অধিক পরিমাণে কিনিয়া খুচরা বেচিত। দালালেরা খরিদদার যুটাইয়া দিয়া কামশন পাইত।

ঢাকায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি ছিল। দালালের মারফতে কুঠিতে কাপড় ক্রীত হইত। কুঠিয়ালগণ দরিদ্র লোভী তাঁতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়া মাল একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। 'যাচনদার' যে দর বলিয়া দিত তাঁতিদিগকে সেই দরে কাপড় বিক্রয় করিতে হইত। প্রসিদ্ধ মনীষী বার্ক বলিয়াছেন যে তাঁতিরা বৎসরে যত টাকার কাপড় উৎপন্ন করিতে পারে তদপেক্ষাও অধিক টাকা জোর করিয়া তাঁতিদিগকে দাদন দেওয়া হইত। এইরূপে তাঁতিরা চিরজীবনের জন্য দাসত্বঋণে আবদ্ধ হইয়া নির্য্যাতিত জর্জ্জরিত হইত।

কাপড় ধোলাই—পাইট—প্যাক করা।

আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন যে সোণারগাঁয়ের কাছে শতরগুণ্ডা নামক স্থানের জলে কাপড় কাচিলে দিব্য পরিষ্কার হইত। ট্যাবার্ণিয়ে ব্যারোচি নামক স্থানের নদীর জলের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। নারায়ণদিয়া হইতে তেজ-গাঁ পর্য্যন্ত ভূভাগের জলের এই খ্যাতি এখনো আছে। তেজগাঁর সমৃদ্ধির সময় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাশী প্রভৃতি কুঠিয়ালের ধোলাই কারখানা ঐ স্থানে ছিল। নারায়ণদিয়ায় কূপের জলে কাপড় ধোয়া হইত।

কাপড় গামলায় ভিজাইয়া আড়ভাবে খাঁজকাটা তক্তার উপর ধোপা আছড়ায়। সুসূক্ষ্ম মসলিন আছড়ায় না। তৎপরে সাবান* সাজিমাটির জলে কাপড় ভিজায়। তৎপরে ঘাসের উপর ছড়াইয়া দিয়া জল ছড়া দেয়; অর্দ্ধ শুষ্ক হইলে ভাঁটিতে দেয়। সমস্ত রাত্রি ভাঁটিতে থাকার পর কাপড় বাহির করিয়া ক্ষারজলে ডুবায় এবং আবার শুকায় আবার ভাঁটিতে দেয়, এইরূপে ১০।১২ বার ভাঁটিতে দিলে কাপড় সুশুভ্র হয়। অবশেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া নেমুর রসমিশ্রিত জলে ডুবায়; নেমুর রসে কাপড় কাচলে এমন সাদা হয় যে চোখ ঝলসিয়া যায়। রেশমমিশ্রিত কাপড় কাচিতে নেমুর রসের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করে, ইহাতে রেশম উজ্জ্বল হয়। তৎপরে রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া লয়।

এক থান মসলিন কাচিতে ৩০৲ হইতে ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে।

কাপড় কাচা হইলে 'নারদীয়া' কাপড়ের পাট করে। জখমি স্থানে জলের আছড়া দিয়া নাগফেনীর কাঁটার চিরুনী দিয়া দিস্তে পড়া স্থতা সরাইয়া সমান করিয়া দেয়। ইহা-দিগকে 'কাঁটাদার'ও বলে।

'রফুগর' রফুকর্ম্ম করিয়া ছেঁড়া ফুটা, স্থতার গিঁট সারিয়া দেয়।

* সাবান মুসলমানগণ এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। 'সাবুন' আরবীয় কথা। ঢাকার সাবান তৎকালে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আদৃত ছিল। সাবানের প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে কলার বাসনার ক্ষার ব্যবহৃত হইত।

'দাগধুবী' মসলিনের সকল প্রকার দাগ দূর করে। আমরুল শাকের রস দিয়া লোহার দাগ উঠায়। অন্যবিধ দাগ উঠাইতে ঘি, চুণ ও খনিজক্ষার ব্যবহার করে।

'কুন্দেগর' তেঁতুল কাঠের তক্তার উপর মসলিন বিছাইয়া চালের জল ছড়া দেয় আর মসৃণ শাঁখ ঘসিয়া পালিশ করিয়া দেয়।

'ইস্ত্রীওয়ালা' অবশেষে ইস্ত্রী করে। ফুলদার মসলিন উপর নীচে কাগজের মধ্যে রাখিয়া তবে ইস্ত্রী করে। এই কাজ বোধ হয় মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

'নারদীয়া' কাপড় ভাঁজ করে, 'বস্তাবন্দ' প্যাক করে। দুখানা তক্তার মধ্যে কাপড় রাখিয়া দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়িতে দুইটা লাঠি লাগাইয়া মোড় দিয়া দিয়া গাঁট কশে। ট্যাবার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে মহম্মদ আলি বেগ পারস্যের দূত ভারতে ছিলেন। পারস্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহকে একটি মুক্তা খচিত নারিকেল খোল উপঢৌকন দেন। সেই নারিকেল খোলের মধ্যে ৬০ হাত লম্বা মসলিনের পাগড়ী ছিল।

সূচীকর্ম্ম।

ভারতে সূচীকর্ম্ম প্রায় মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। ধুবীজাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন হিন্দুরা ইহার চর্চ্চা করে না। সূক্ষ্ম সূচীকর্ম্ম ও বেল চিকণ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল মিশরে। নবম শতাব্দীতে মিশর আরব গ্রীসের সঙ্গে বঙ্গের ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল, সেই সময় উহা বঙ্গে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু এলিজাবেথের সময়, ১৫৪০ সালে একজন ভারতী প্রথমে ইংলণ্ডে সূচী নির্ম্মাণ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করে; প্রবর্ত্তকের মৃত্যুর সঙ্গে সেই সহজ শিল্পও লুপ্ত হইয়া ১৫৬০ সালে পুনরুদ্ধৃদ্ধ হয় (See *Art of Needle Work* by the Countess of Wilton, p. 254).

সীবন শিল্পের মধ্যে 'সিলাই' সাধারণ। সিলাইকর 'দর্জ্জী' প্রায় মুসলমান। তৎপরে 'রফুগর'; ইহারা সূক্ষ্ম মসলিন হইতে ২০ গজ সূতা বাহির করিয়া সেই খানে অন্য একটা সূতা বেমালুম পরাইয়া দিতে পারে। মসলিন ধোলাই হওয়ার পর যদি কোন এক থেই সূতা ঈষৎ স্থূল বোধ হয়, রফুগর তাহা বাহির করিয়া সরু সূতা পরাইয়া দেয়। ইহাকে 'চুনাই' বলে। প্রায় সকল রফুগর আফিংখোর, নেশা না লাগিলে ভালো কাজ করিতে পারে না।

জর-দো-জী (embroidery) বা ফুলকাটা কিনারা করা ঢাকার প্রসিদ্ধ শিল্প। এখানকার সোণা রূপা বা রেশমের কাজকরা কাপড় ফ্রান্সে যাইত। ঝিঁঝিঁ পোকার পক্ষ দ্বারাও শাল রুমাল মসলিন মশারীতে ফুলকাটা হইত। শল্মা চুমকীর নকাশী কাজ করিতে কাপড়ের উপর খড়ির নক্সা আঁকিয়া দাগে দাগে সেলাই করা হয়। এই ব্যবসায়ী-দিগকে 'জরদোজ' বলে।

চিকণকারী বা চিকণদোজী—জালিফুলকাটা। ইহা এক্ষণে বঙ্গদেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে লক্ষ্ণৌ সহরের চিকণের কাজ পৃথিবীর মধ্যে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

মুগা রেশম দিয়া ফুলকাটা কিনারাকে 'কাশিদা' বলে। এই ফুল একটু মোটা রকমের। এই রকম ফুলকাটা বস্ত্র বসোরা ও জেড্ডাতে খুব বিক্রয় হয়।

রং।

রংয়ের কারবার ঢাকায় উন্নত হয় নাই। কাপড়ের পাড়, নামাবলী ইত্যাদির জন্য শুধু লাল, কালো, নীল রংয়ের সূতা প্রস্তুত করা হইত। রংয়ীদের নাম 'পট্টোয়া' ও 'চিপিকার'। চিপিকারগণ কাঠের ছাঁচে রং লাগাইয়া কাপড় ছাপিত, যেমন করিয়া এখন বৃন্দাবনী কাপড় লক্ষ্ণৌ ছিট প্রভৃতি ছাপে।

ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অধঃপতন।

ভারতের বস্ত্রের সুখ্যাতি এরিয়ান, প্লিনি, ফা হিয়ান, ইবন্ বাতুতা, টেবার্ণিয়ে প্রভৃতি প্রাচীন বিদেশীরা করিয়া গিয়াছেন। তখন ভারতীগণ অর্ণবপোত চালনা করিয়া 'সমুদ্রযাত্রা' করিত ও 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসায় ব্যপদেশে সংশ্লিষ্ট ছিল, তখন জাত যাইবার ভয় ছিল না। তৎপরে ভারতের ব্যবসায় মুসলমানের হস্তগত হয়, হিন্দুগণ তখন বিধি নিষেধের জাল জড়াইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিবার যোগাড় করিতেছিল। তৎপরে উদ্যোগী পুরুষসিংহ য়ুরোপীয়গণ ভারতে পদার্পণ করিতে লাগিল। ১৫১৮ সালে প্রথম পর্ত্তুগীজগণ বাংলায় আসে। এই সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত

পর্ত্তুগীজগণকে কখন একক কখন আরাকানের মগ-দিগের সাহায্যে মুসলমান রাজগণের সহিত যুদ্ধলিপ্ত দেখা যায় ; বাংলার অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইবার চেষ্টার এই সূত্রপাত। এই সময় চট্টগ্রাম, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, সোণারগাঁ, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি, বাংলা (ঢাকা) ব্যবসায়ের প্রধান আড়ং ছিল। ১৬৬৬ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকায় কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। ইহাই চরম দুর্দ্দশার কারণ। কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার কাহিনী সকলেই অল্প বিস্তর পরিজ্ঞাত আছেন, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আজ কাল লাট মিণ্টোর জবরদস্তি আইনের আমলে সত্য কথা প্রকাশও নিষেধ। অতএব ইঙ্গিতে ইংরাজের অত্যাচার বুঝিতে হইবে—সাধু সাবধান! এত চেষ্টার পরেও গ্লাসগো জেলায় মসলিন বুনিতে পারে এমন তাঁতি ৬১৭ জন ও ম্যাঞ্চেষ্টারে ১ জন পাওয়া যায় কি না সন্দেহ (White *on Weaving.*)

কোম্পানি স্থতানটিতে জব চার্ণকের তত্ত্বাবধানে ১৬৯১ সালে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। তাহাই ১৬৯৯ সালে ফোর্ট উইলিয়ম (কলিকাতার কেল্লা) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সময় দেশী কারিগর, ব্যবসাদার ও মোগল দরবারকে ফাঁকি দিবার জন্য ইংরাজের চুরি জুয়াচুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যাপারের যে কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। সেই সময় ইংলণ্ডে এক গজ মসলিন ২২৲ ২৩৲ টাকায় বিক্রয় হইত। ১৭০০ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় মাল ইংলণ্ডে আমদানি বন্ধ করিবার জন্য এক আইন করে। সেই আইনে বাংলার নিম্নলিখিত বস্ত্র ইংলণ্ডে গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ঃ—

মলমল, আবরুয়াঁ, ঝুনা, রং, তর্-উন্দাম্, তাঞ্জেব, জামদানী, ডুরিয়া ও খাসা।

১৭০১ সালে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়।

১৬৬৬ সালে ওলন্দাজ বণিকগণও ঢাকায় যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। তাহারা জাপান ও য়ুরোপে বস্ত্র প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে তাহাদের কুঠি ইংরাজেরা জবরদস্তি দখল করিয়া অধ্যক্ষকে বন্দী করে।

ফরাশীগণ বাংলায় ১৬৮৮ সালে আসে এবং ১৭২৬ সাল হইতে ঢাকায় ব্যবসায় আরম্ভ করে। ১৭৭৮ সালে ইংরাজ ইহাদের কুঠি কাড়িয়া লয়। ১৭৮৩ সালে ফিরাইয়া দেয়। আবার ১৭৯৩ সালে লইয়া ফিরাইয়া দেয়। ১৮০৩ সালে তৃতীয় বার দখল করিয়া ১৮১৫ সালে ফরাশীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৩০ সালে ফরাশী গভর্ণমেণ্ট ইহা ঢাকার লোককে বিক্রয় করে।

মুর্শিদাবাদের জগৎসেঠ তাঁতি ছিলেন। তাঁহারো বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল।

১৮১৭ সালে ইংরাজের কুঠি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপে কাটতি বন্ধ হওয়ায় ও য়ুরোপের সস্তা কাপড়ের প্রতি-যোগিতায় বাংলার বস্ত্রশিল্প চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ের অবনতির সঙ্গে সহর গ্রাম হইয়াছে কোথাও বা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঢাকার সমৃদ্ধির সময়ে ঢাকা সহর ১৫ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। ১৮০০ সালে ঢাকার জন সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ, ১৮৩৮ সালে ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় হইয়া ছিল মোটে ৬৮ হাজার, আঙুল কাটা তাঁতিরা অকর্ম্মণ্য হইয়া চাষে মন দিল, মাকু ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিল। ইংরাজ গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে মজবুত; ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় নষ্ট করিয়া ঢাকায় দুইবার মার্কিণের তুলা চাষের চেষ্টা হইয়াছিল, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

এই সমস্ত হইতে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অবনতির সূত্রপাত ১৭৯৩ সাল হইতে ধরা যাইতে পারে, সেই সময় ইংলণ্ডে কলের তাঁত প্রচলিত হয়।

ঢাকার এই নষ্টশিল্প আবার কবে প্রবুদ্ধ হইবে ঈশ্বর জানেন।

গোরা।

১।

শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্ম্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে, কালেজে, আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ তরকারীর চুপ্‌ড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড় এই যে কাজের সহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা—ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোণার আলোকের

ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এমন দিনের বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তায় জনতার চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেকদিন চুকিয়া গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের অবস্থাটা এইরূপ। সভাসমিতি চালানো এবং খবরের কাগজ লেখায় মন দিয়াছে—কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়া উঠে নাই। অন্তত আজ সকাল বেলায় কি করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। পাশের বাড়ির ছাতের উপর গোটাতিনেক কাক কি লইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং চড়ুইদম্পতি তাহার বারান্দার এক কোণে বাসা নির্ম্মাণব্যাপারে পরস্পরকে কিচিমিচি শব্দে উৎসাহ দিতেছিল—সেই সমস্ত অব্যক্ত কাকলী বিনয়ের মনের মধ্যে একটা কোন্ অস্পষ্ট ভাবাবেগকে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

> "খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী
> কম্‌নে আসে যায়—
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি
> দিতে পাখীর পায়।"

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন্ পাখীর গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখীর সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

এমন সময় ঠিক তাহার বাসার সাম্‌নেই একটা ঠিকা গাড়ির উপর একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং ঠিকা গাড়ির একটা চাকা ভাঙিয়া দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া বেগে চলিয়া গেল। ঠিকা গাড়িটা সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া না পড়িয়া একপাশে কাত হইয়া পড়িল।

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল গাড়ি হইতে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবার উপক্রম করিতেছেন।

বিনয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "আপনার লাগেনি ত ?"

তিনি "না, কিছু হয় নি" বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন;—সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও উৎকণ্ঠিত মেয়েটিকে কহিল—"এই সাম্‌নেই আমার বাড়ী; ভিতরে চলুন।"

বৃদ্ধকে বিছানায় শোয়ানো হইলে মেয়েটি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা আছে। তখনি সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লইয়া বৃদ্ধের মুখে ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বিনয়কে কহিল,—"একজন ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না ?"

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বেহারা পাঠাইয়া দিল।

ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা কিছু পরিচয় সে সমস্তই বইয়ের ভিতর দিয়া। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই।

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া পড়িয়াছে সে কি সুন্দর মুখ! মুখের প্রত্যেক রেখা আলাদা করিয়া দেখিবার মত তাহার চোখের অভিজ্ঞতা ছিল না। কেবল সেই উদ্বিগ্ন স্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতামণ্ডিত উজ্জ্বলতা বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সদ্যঃপ্রকাশিত একটি নূতন বিস্ময়ের মত ঠেকিল।

একটু পরেই বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া "মা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েটি তখন দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ নীচু করিয়া আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,"—"বাবা! তোমার কোথায় লেগেচে ?"

"এ আমি কোথায় এসেছি" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বিনয় সম্মুখে আসিয়া কহিল—"উঠ্‌বেন না—একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আস্‌চে।"

তখন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন—"মাথার এই খানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্চে কিন্তু গুরুতর কিছুই নয়।"

সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তার জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনিও বলিলেন বিশেষ কিছুই নয়। একটু গরম দুধ দিয়া অল্প ব্রাণ্ডি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল—"বাবা, ব্যস্ত হচ্চ কেন? ডাক্তারের ভিজিট্‌ ও ওষুধের দাম বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেব।" বলিয়া সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল।

সে কি আশ্চর্য্য চক্ষু! সে চক্ষু বড় কি ছোট, কালো কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না—প্রথম নজরেই মনে হয় এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।

বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল,—"ভিজিট অতি সামান্য, সেজন্যে—সে আপনারা—সে আমি—"

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা ঠিকমত শেষ করিতেই পারিল না। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা যে তাহাকে লইতেই হইবে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় রহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন,—"দেখুন আমার জন্যে, ব্রাণ্ডির দরকার নেই—"

কন্যা তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল,—"কেন বাবা, ডাক্তার-বাবু যে বলে গেলেন।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, ওটা ওদের একটা কুসংস্কার। আমার যেটুকু দুর্ব্বলতা আছে একটু গরম দুধ খেলেই যাবে।"

বেহারা একবাটি গরম দুধ ও এক শিশি দাওয়াইখানার ব্রাণ্ডি আনিয়া বিছানার একধারে রাখিয়া দিল। মেয়েটি ব্রাণ্ডির শিশি লইয়া কহিল—"আমি বেশি দেব না—কিন্তু ডাক্তার যখন বলে গেছে তখন ওটা মান্‌তে হবে"।—বলিয়া দুধের সঙ্গে ফোঁটা কয়েক ব্রাণ্ডি মিশাইয়া দিল এবং স্বহস্তে বাটি ধরিয়া বৃদ্ধকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিল, বৃদ্ধ কোনো আপত্তি করিলেন না। দুধ খাইয়া বল পাইলে বৃদ্ধ বিনয়কে কহিলেন—"এবারে আমরা যাই। আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম।"

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"একটা গাড়ি।"

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"আবার কেন ওঁকে ব্যস্ত করা? আমাদের বাসা ত কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব।"

মেয়েটি বলিল—"না বাবা, সে হতে পারে না!"

বৃদ্ধ ইহার উপর কোনো কথা কহিলেন না এবং বিনয় নিজে গিয়া গাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নামটি কি?"

বিনয়। আমার নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন,—"আমার নাম পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নিকটেই ৭৮ নম্বর বাড়িতে থাকি। কখনো অবকাশমত যদি আমাদের ওখানে যান ত বড় খুসি হব।"

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে দুই চোখ তুলিয়া নীরবে এই অনুরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই গাড়িতে উঠিয়া তাঁহাদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোট একটি নমস্কার করিল। এই নমস্কারের জন্য বিনয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এইজন্য হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতি-নমস্কার করিতেই পারিল না। এইটুকু ত্রুটি লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত বিনয় নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল—মনে হইল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কি করা উচিত ছিল, কি বলা উচিত ছিল, তাহা লইয়া মনে মনে কেবলি বৃথা আন্দোলন করিতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিল যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে—সেটা

তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। তাহার মনের মধ্যে বাউলের সুরে ঐ গানটা বাজিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী
কম্‌নে আসে যায়।

বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন অপূর্ব্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারিদিকের কুৎসিৎ কলিকাতা মায়াপুরীর মত হইয়া উঠিল;—যে রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয়, এবং অপরূপ রূপ লইয়া দেখা দেয় বিনয় যেন সেই নিয়ম-ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে। এই বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল—তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ম্ময় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল নিজের পরিপূর্ণতাকে আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার কোনো উপায় না পাইয়া তাহার চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল। অত্যন্ত সামান্য লোকের মতই সে আপনার পরিচয় দিয়াছে—তাহার বাসাটা অত্যন্ত তুচ্ছ, জিনিষপত্র নিতান্ত এলোমেলো, বিছানাটা পরিষ্কার নয়, কোনো কোনো দিন তাহার ঘরে সে ফুলের তোড়া সাজাইয়া রাখে কিন্তু এম্‌নি দুর্ভাগ্য সেদিন তাহার ঘরে একটা ফুলের পাপ্‌ড়িও ছিল না; সকলেই বলে বিনয় সভাস্থলে মুখে মুখে যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারে কালে সে একজন মস্ত বক্তা হইয়া উঠিবে কিন্তু সেদিন সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র প্রমাণ হয়। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যদি এমন হইতে পারিত যে সেই বড় গাড়িটা যখন তাঁহাদের গাড়ির উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে আমি বিদ্যুদ্বেগে রাস্তার মাঝখানে আসিয়া অতি অনায়াসে সেই উদ্দাম জুড়ি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইয়া দিতাম! নিজের সেই কাল্পনিক বিক্রমের ছবি যখন তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল তখন একবার আয়নায় নিজের চেহারা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না—দেখিয়া মাথা নাড়িল—তাহার দেহরচনা সম্বন্ধে বিশ্বকর্ম্মার অবহেলায় মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় দেখিল একটি সাত আট বছরের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার বাড়ির নম্বর দেখিতেছে। বিনয় উপর হইতে বলিল,—"এই যে, এই বাড়িই বটে।" ছেলেটি যে তাহারই বাড়ির নম্বর খুঁজিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ মাত্র হয় নাই। তাড়াতাড়ি বিনয় সিঁড়ির উপর চটিজুতা চট্ চট্ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে কহিল—"দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।" এই বলিয়া বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র দিল।

বিনয় চিঠিখানি লইয়া প্রথমে লেফাফার উপরটাতে দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদের ইংরেজি অক্ষরে তাহার নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই কেবল কয়েকটি টাকা আছে।

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে দোতালার ঘরে লইয়া গেল।

ছেলেটির রং তাহার দিদির চেয়ে কালো কিন্তু মুখের ছাঁদে কতকটা সাদৃশ্য আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনয়ের মনে ভারি একটা স্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল।

ছেলেটিও বেশ সপ্রতিভ। সে ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার ছবি?"

বিনয় কহিল—"এ আমার একজন বন্ধুর ছবি?"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—"বন্ধুর ছবি? আপনার বন্ধু কে?"

বিনয় হাসিয়া কহিল,—"তুমি তাঁকে চিন্‌বে না। আমার বন্ধু গৌরমোহন, তাঁকে গোরা বলি। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েচি।"

"এখনো পড়েন?"

"না এখন আর পড়িনি।"

"আপনার স-ব পড়া হয়ে গেছে?"

বিনয় এই ছোট ছেলের কাছেও গর্ব্ব করিবার প্রলো-

ভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল—"হাঁ, সব পড়া হয়ে গেছে।"

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিল। সে বোধ হয় ভাবিল এত বিদ্যা সেও কত দিনে শেষ করিতে পারিবে!

বিনয়। "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল—"মুখোপাধ্যায়?"

তাহার পরে একটু একটু করিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। পরেশ বাবু ইহাদের পিতা নহেন—তিনি ইহাদের দুই ভাই বোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার দিদির নাম আগে ছিল রাধারাণী—পরেশ বাবুর স্ত্রী তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া "সুচরিতা" নাম রাখিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব হইয়া গেল। সতীশ যখন বাড়ি যাইতে উদ্যত হইল বিনয় কহিল—"তুমি একলা যেতে পার্‌বে?"

সে গর্ব্ব করিয়া কহিল—"আমি ত একলা যাই।"

বিনয় কহিল—"চল আমি তোমাকে পৌঁছে দিই গে।"

তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়া সতীশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল,—"কেন আমি ত একলা যেতে পারি!" এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় কেন তাহার বাড়ির দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ভিতরে আসবেন না?"

বিনয় সমস্ত মনকে দমন করিয়া কহিল—"আর একদিন আস্‌ব।"

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিনয় সেই শিরোনামা লেখা লেফাফা পকেট হইতে বাহির করিয়া অনেকক্ষণ দেখিল—প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাঁদ একরকম মুখস্থ হইয়া গেল—তার পরে টাকা সমেত সেই লেফাফা বাক্সের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনো দুঃসময়ে খরচ করিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না।

২।

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া কেবলি বর্ষণ হইয়াছে; সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেলা চারটে হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে কিন্তু মেঘের গতিক ভাল নয়। এই-রূপ আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জন ঘরের মধ্যে যখন মন টেকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় না সেই সময়টাতে দুটি লোক একটি দোতলা বাড়ির স্যাঁৎ-সেঁতে ছাতে দুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে।

এই দুই বন্ধু যখন ছোট ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই ছাতে ছুটাছুটি খেলা করিয়াছে; পরীক্ষার পূর্ব্বে উভয়ে চীৎকার করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এই ছাতে দ্রুতপদে পাগলের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে; গর্ম্মিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া রাত্রে এই ছাতের উপরেই আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন রাত্রি দুইটা হইয়া গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়া যখন তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তখন চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিয়াছে সেই খানেই মাদুরের উপরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কালেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকি রহিল না তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর একজন তাহার সেক্রেটারি।

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয় বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের শাদা—হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মত বড়—গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে "কেরে" বলিয়া চমকিয়া উঠিতে

হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড় এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুৎ; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মত; চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাৎলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মত ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মত অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিষকেও বিদ্যুতের মত আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনো মতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারিত না। পাঠ্য বিষয়ে গোরার তেমন আসক্তিই ছিল না; বিনয়ের মত সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।

গোরা বলিতেছিল,—"শোন বলি! নিবারণ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল, তাতে এই বুঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এতে তুমি হঠাৎ অমন ক্ষাপা হয়ে উঠলে কেন?"

বিনয়। কি আশ্চর্য্য! এ সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন চল্‌তে পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না।

গোরা। তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেচে। একদল লোক সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সব বিষয়ে উল্টোরকম করে চলবে আর সমাজের লোক তাদের অবিচলিতভাবে সুবিচার করবে এ স্বভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোকে তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোজা ভাবে যেটা করবে, এদের চোখে সেটা বাঁকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভাল এদের কাছে মন্দ হয়ে দাঁড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।

বিনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভাল তা আমি বলতে পারিনে।

গোরা একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল—"আমার ভালয় কাজ নাই। পৃথিবীতে ভাল দুচারজন যদি থাকে ত থাক্‌ কিন্তু বাকি সবাই যেন স্বাভাবিক হয়! নইলে কাজও চলে না প্রাণও বাঁচে না! ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরী করবার সখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়ে চল্‌বে জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হত না।

বিনয়। আমি দলের নিন্দের কথা বলচিনে—ব্যক্তিগত—

গোরা। দলের নিন্দে আবার নিন্দে কিসের! সে ত মতামত বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই ত চাই। আচ্ছা সাধু পুরুষ, তুমি নিন্দে করতে না?

বিনয়। করতুম। খুবই করতুম—কিন্তু সেজন্যে আমি লজ্জিত আছি।

গোরা তাহার ডান হাতের মুঠা শক্ত করিয়া কহিল—"না, বিনয়, এ চল্‌বে না, কিছুতেই না।"

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে কহিল—"কেন কি হয়েচে? তোমার ভয় কিসের?"

গোরা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি তুমি নিজেকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌চ!

বিনয় ঈষৎ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল—"দুর্ব্বল! তুমি জান, আমি ইচ্ছে করলে এখনি তাঁদের বাড়ি যেতে পারি—তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন—কিন্তু আমি যাই নি।"

গোরা। কিন্তু এই যে যাও নি সেই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারচ না। দিন রাত্রি কেবল ভাবচ, যাই নি, যাই নি, আমি তাদের বাড়ী যাই নি—এর চেয়ে যে যাওয়াই ভাল।

বিনয়। তবে কি যেতেই বল?

গোরা নিজের জানু চাপড়াইয়া কহিল—"না, আমি যেতে বলি নে। আমি তোমাকে লিখে পড়ে দিচ্চি, যে দিন তুমি যাবে সে দিন একেবারে পুরোপুরিই যাবে। তার পর দিন থেকেই তাদের বাড়ি খানা খেতে সুরু করবে এবং ব্রাহ্ম সমাজে নাম লিখিয়ে একেবারে দিগ্বিজয়ী প্রচারক হয়ে উঠবে।

বিনয়। বল কি! তার পরে?

গোরা। আর তার পরে! মরার বাড়া ত গাল নাই! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাণ্ডারীর মত তোমার পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা—কেবল না-হক্ ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো। কিন্তু এ সব কথা নিয়ে বকাবকি করতে আমার ধৈর্য্য থাকে না—আমি বলি তুমি যাও! অধঃপাতের মুখের সামনে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের শুদ্ধ কেন ভয়ে-ভয়ে রেখে দিয়েচ?

বিনয় হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেই যে রোগী সব সময়ে মরে তা নয়। আমি ত নিদেন কালের কোনো লক্ষণ বুঝতে পারচিনে।"

গোরা। পারচ না?

বিনয়। না।

গোরা। নাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে করচে না?

বিনয়। না, দিব্যি জোর আছে।

গোরা। মনে হচ্চে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেষণ করে তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ?

বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল,—"গোরা, বস্, এইবার থামো।"

গোরা। কেন এর মধ্যে ত আব্রুর কোনো কথা নেই। শ্রীহস্ত ত অসূর্য্যম্পশ্য নয়। পুরুষ মানুষের সঙ্গে যার শেক্‌হ্যাণ্ড্ চলে সেই পবিত্র করপল্লবের উল্লেখটি পর্য্যন্ত যখন তোমার সহ্য হচ্চে না, তদা ন সংশে মরণায় সঞ্জয়!

বিনয়। দেখ গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি—আমাদের শাস্ত্রেও—

গোরা। স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করচ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড় না! ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি ত মারতে আস্‌বে।

বিনয়। এ তুমি গায়ের জোরে বল্‌চ।

গোরা। শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন "পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।" তাঁরা পূজার্হা কেন না গৃহকে দীপ্তি দেন, পুরুষ মানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বল্লেই ভাল হয়।

বিনয়। কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড় ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষপাত করা উচিত!

গোরা অধীর হইয়া কহিল,—"বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নও—আমি বল্‌চি বিলিতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্চে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পূজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন—সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মত তোমার মনটা যে কারণে পরেশ বাবুর বাড়ির চারদিকে ঘুরচে, ইংরিজিতে তাকে বলে থাকে 'লাভ্'—কিন্তু ইংরেজের নকল করে ঐ 'লাভ্' ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে না পেয়ে বসে!"

বিনয় কষাহত তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"আঃ গোরা, থাক্, যথেষ্ট হয়েচে!"

গোরা। কোথায় যথেষ্ট হয়েচে! কিছুই হয় নি! স্ত্রী আর পুরুষকে তাদের স্বস্থানে বেশ সহজ করে দেখ্‌তে শিখিনি বলেই আমরা কতকগুলো কবিত্ব জমা করে তুলেচি!

বিনয় কহিল—"আচ্ছা মানচি স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ঠিক যে জায়গাটাতে থাকলে সহজ হতে পারত আমরা প্রবৃত্তির ঝোঁকে সেটা লঙ্ঘন করি এবং সেটাকে মিথ্যে করে তুলি কিন্তু এই অপরাধটা কি কেবল বিদেশীরই? এ সম্বন্ধে ইংরেজের কবিত্ব যদি মিথ্যে হয় ত আমরা ঐ যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ নিয়ে সর্ব্বদা বাড়াবাড়ি করে থাকি সেটাও ত মিথ্যে! মানুষের প্রকৃতি যা নিয়ে সহজে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে কেউ বা

প্রেমের সৌন্দর্য্য অংশকেই কবিত্বের দ্বারা উজ্জ্বল করে তুলে তার মন্দটাকে লজ্জা দেয়, আর কেউ বা ওর মন্দটাকেই বড় করে তুলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের বিধান দিয়ে থাকে; ও দুটো কেবল দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভিন্ন রকম প্রণালী। একটাকেই যদি নিন্দে কর তবে অন্যটাকেও রেয়াৎ করলে চল্‌বে না।

গোরা। নাঃ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। তোমার অবস্থা তেমন খারাপ হয় নি! এখনো যখন ফিলজফি তোমার মাথায় খেলচে তখন নির্ভয়ে তুমি 'লাভ্‌' করতে পার কিন্তু সময় থাকতে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ো হিতৈষী বন্ধুদের এই অনুরোধ।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—আঃ তুমি কি পাগল হয়েচ? আমার আবার 'লাভ্‌'! তবে এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, পরেশ বাবুদের আমি যেটুকু দেখেচি এবং ওঁদের সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওঁদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হয়েচে বোধ করি তাই ওঁদের ঘরের ভিতরকার জীবন যাত্রাটা কি রকম সেটা জানবার জন্যে আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল।

গোরা। উত্তম কথা, সেই আকর্ষণটাই সাম্‌লে চল্‌তে হবে। ওঁদের সম্বন্ধে প্রাণীবৃত্তান্তের অধ্যায়টা না হয় অনাবিষ্কৃতই রইল। বিশেষত ওঁরা হলেন শিকারী প্রাণী, ওঁদের ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষকালে এতদূর পর্য্যন্ত ভিতরে যেতে পার যে তোমার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো থাক্‌বে না।

বিনয়। দেখ, তোমার একটা দোষ আছে। তুমি মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই দিয়েচেন, আর আমরা সবাই দুর্ব্বল প্রাণী।

কথাটা গোরাকে হঠাৎ যেন নূতন করিয়া ঠেকিল। সে উৎসাহবেগে বিনয়ের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—'ঠিক বলেচ—ঐটে আমার দোষ—আমার মস্ত দোষ!"

বিনয়। উঃ, ওর চেয়েও তোমার আর একটা মস্ত দোষ আছে। অন্য লোকের শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয় তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।

এমন সময় গোরার বড় বৈমাত্র ভাই মহিম তাহার পরিপুষ্ট শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে আসিয়া কহিলেন—গোরা!

গোরা তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ্ঞে!"

মহিম। দেখতে এলেম বর্ষার জলধরপটল আমাদের ছাতের উপরে গর্জ্জন করতে নেমেচে কি না। আজ ব্যাপারখানা কি? ইংরেজকে বুঝি এতক্ষণে ভারতসমুদ্রের অর্দ্ধেকটা পথ পার করে দিয়েচ? ইংরেজের বিশেষ কোনো লোকসান দেখচিনে, কিন্তু নীচের ঘরে মাথাধরে বড় বৌ পড়ে আছে সিংহনাদে তারই যা অসুবিধে হচ্চে।

এই বলিয়া মহিম নীচে চলিয়া গেলেন।

গোরা লজ্জা পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—লজ্জার সঙ্গে ভিতরে একটু রাগও জ্বলিতে লাগিল, তাহা নিজের বা অন্যের পরে ঠিক বলা যায় না। একটু পরে সে ধীরে ধীরে যেন আপন মনে কহিল—"সব বিষয়েই, যতটা দরকার, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা যে অন্যের পক্ষে কতটা অসহ্য তা আমার ঠিক মনে থাকে না।"

বিনয় গোরের কাছে আসিয়া সস্নেহে তার হাত ধরিল।

৩।

গোরা ও বিনয় ছাত হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় গোরার মা উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখিলে গোরার মা বলিয়া মনে হয় না। তিনি ছিপ্‌ছিপে পাৎলা, আঁটসাঁট শক্ত; চুল যদি বা কিছু কিছু পাকিয়া থাকে বাহির হইতে দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম। মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার, নাকের ঠোঁটের চিবুকের ললাটের রেখা কে যেন যত্নে কুঁদিয়া কাটিয়াছে; শরীরের সমস্তই বাহুল্যবর্জ্জিত,—মুখে একটি পরিষ্কার ও সতেজ বুদ্ধির ভাব সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। রং শ্যামবর্ণ, গোরার রঙের সঙ্গে তাহার কোনোই তুলনা হয় না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই একটা জিনিষ সকলের চোখে পড়ে—তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জামা বা শেমিজ পরা যদিও নব্য দলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে

তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতান্তই খৃষ্টানী বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবু কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, আনন্দময়ী তাঁহার সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে পশ্চিমে কাটাইয়াছেন, তাই ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের বিষয় এ সংস্কার তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ঘর দুয়ার মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া মুছিয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া, সেলাই করিয়া, গুণ্‌তি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া তবু তাঁহার সময় যেন ফুরাইতে চাহে না। শরীরে অসুখ করিলে তিনি কোনোমতেই তাহাকে আমল দিতে চান না—বলেন—"অসুখে ত আমার কিছু হবে না, কাজ না করতে পেলে বাঁচব কি করে?"

গোরার মা উপরে আসিয়া কহিলেন—"গোরার গলা যখনি নীচে থেকে শোনা যায় তখনি বুঝতে পারি বিনু নিশ্চয়ই এসেচে। ক'দিন বাড়ি একেবারে চুপচাপ ছিল—কি হয়েচে বল্‌ত বাছা? আসিস্‌নি কেন? অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

বিনয় কুণ্ঠিত হইয়া কহিল—"না, মা, অসুখ না,—যে বৃষ্টিবাদল!"

গোরা কহিল—"তাই বই কি! এর পরে বৃষ্টিবাদল যখন ধরে যাবে তখন বিনয় বল্‌বেন যে রোদ পড়েচে! দেবতার উপর দোষ দিলে দেবতা ত কোনো জবাব করেন না—আসল মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন।"

বিনয় কহিল—"গোরা তুমি কি বাজে বক্‌চ!"

আনন্দময়ী কহিলেন—"তা সত্যি বাছা, অমন করে বল্‌তে নেই। মানুষের মন কখনো ভাল থাকে কখনো মন্দ থাকে, সব সময় কি সমান যায়! তা নিয়ে কথা পাড়তে গেলে উৎপাত করা হয়। তা আয় বিনু, আমার ঘরে আয়, তোর জন্যে খাবার ঠিক করেচি।"

গোরা জোর করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, মা, সে হচ্চে না, তোমার ঘরে আমি বিনয়কে খেতে দেব না।"

আনন্দময়ী। ইস্ তাই ত! কেন, বাপু, তোকে ত আমি কোনো দিন খেতে বলিনে—এদিকে তোর বাপ ত ভয়ঙ্কর শুদ্ধাচারী হয়ে উঠেচেন—স্বপাক না হলে খান না। বিনু আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর মত ওর গোঁড়ামি নেই, তুই কেবল ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাস্।

গোরা। সে কথা ঠিক, আমি জোর করেই ওকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ব। তোমার ঐ খৃষ্টান দাসী লছ্‌মিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চল্‌বে না।

আনন্দময়ী। ওরে গোরা, অমন কথা তুই মুখে আনিস্‌নে। চিরদিন ওর হাতে তুই খেয়েছিস্—ও তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেচে। এই সেদিন পর্য্যন্ত ওর হাতের তৈরি চাট্‌নি না হলে তোর যে খাওয়া রুচ্‌ত না! ছোটবেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া যে করে তোকে সেবা করে বাঁচিয়েচে সে আমি কোনো দিন ভুল্‌তে পারব না।

গোরা। ওকে পেন্‌সন্ দাও, জমি কিনে দাও, ঘর করে দাও, যা খুসি কর, কিন্তু ওকে রাখা চল্‌বে না মা!

আনন্দময়ী। গোরা, তুই মনে করিস্ টাকা দিলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যায়! ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, তোকে না দেখ্‌তে পেলে ও মরে যাবে।

গোরা। তবে তোমার খুসি ওকে রাখ। কিন্তু বিনু তোমার ঘরে খেতে পাবে না। যা নিয়ম তা মান্‌তেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না। মা, তুমি এত বড় অধ্যাপকের বংশের মেয়ে তুমি যে আচার পালন করে চল না এ কিন্তু—

আনন্দময়ী। ওগো, তোমার মা আগে আচার পালন করেই চল্‌ত; তাই নিয়ে অনেক চোখের জল ফেল্‌তে হয়েচে—তখন তুমি ছিলে কোথায়? রোজ শিব গড়ে পূজো করতে বস্‌তুম আর তোমার বাবা এসে টান মেরে ফেলে ফেলে দিতেন। তখন অপরিচিত বামুনের হাতেও ভাত খেতে আমার ঘেন্না কর্‌ত। সেকালে রেলগাড়ি বেশি দূর ছিল না—গোরুর গাড়িতে, ডাক গাড়িতে, পাল্কীতে, উটের উপর চড়ে কতদিন ধরে কত উপোস করে কাটিয়েচি—তোমার বাবা কি সহজে আমার আচার ভাংতে পেরেছিলেন? তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে তাঁর সায়েব মনিবরা তাঁকে বাহবা দিত, তাঁর মাইনেই বেড়ে গেল—ঐ জন্যেই তাঁকে এক জায়গায় অনেক দিন রেখে দিত—প্রায় নড়াতে চাইত না। এখন ত বুড়ো বয়সে চাক্‌রি

ছেড়ে দিয়ে রাশ রাশ টাকা নিয়ে তিনি হঠাৎ উল্টে খুব শুচি হয়ে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আমি ত পারব না! আমার সাতপুরুষের সংস্কার একটা একটা করে নির্ম্মূল করা হয়েচে —সে কি এখন আর বল্লেই ফেরে?

গোরা। আচ্ছা, তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা ছেড়ে দাও—তাঁরা ত কেউ কোনো আপত্তি করতে আস্‌চেন না। কিন্তু আমাদের খাতিরে তোমাকে কতকগুলো জিনিষ মেনে চল্‌তেই হবে। না হয় শাস্ত্রের মান নাই রাখ্‌লে, স্নেহের মান রাখ্‌তে হবে ত!

আনন্দময়ী। ওরে অত করে আমাকে কি বোঝাচ্চিস্‌! আমার মনে কি হয় সে আমিই জানি! আমার স্বামী, আমার ছেলে—আমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল বাধ্‌তে লাগল তবে আমার আর সুখ কি নিয়ে! কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েচি তা জানিস্‌? ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যে দিন বুঝেচি সে দিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেচি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক্‌ আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব!

আজ আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া বিনয়ের মনে হঠাৎ কি একটা অস্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা দিল। সে একবার আনন্দময়ীর ও একবার গোরার মুখের দিকে তাকাইল কিন্তু তখনি মন হইতে সকল তর্কের উপক্রম দূর করিয়া দিল।

গোরা কহিল—মা, তোমার যুক্তিটা ভাল বোঝা গেল না। যারা বিচার করে শাস্ত্র মেনে চলে তাদের ঘরেও ত ছেলে বেঁচে থাকে আর ঈশ্বর তোমার সম্বন্ধেই বিশেষ আইন খাটাবেন এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে?

আনন্দময়ী। যিনি তোকে দিয়েচেন বুদ্ধিও তিনি দিয়েচেন। তা আমি কি করব বল্‌! আমার এতে কোনো হাত নেই। কিন্তু ওরে পাগল, তোর পাগ্‌লামি দেখে আমি হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব তা ভেবে পাইনে। যাক্‌ সে সব কথা যাক্‌। তবে বিনয় আমার ঘরে খাবে না?

গোরা। ও ত এখনি সুযোগ পেলেই ছোটে, লোভটি ওর ষোলো আনা। কিন্তু মা, আমি যেতে দেব না। ও যে বামুনের ছেলে, দুটো মিষ্টি দিয়ে সে কথা ওকে ভোলালে চল্‌বে না। ওকে অনেক ত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তি সাম্‌লাতে হবে, তবে ওর জন্মের গৌরব রাখতে পারবে। মা, তুমি কিন্তু রাগ কোরো না! আমি তোমার পায়ের ধুলো নিচ্চি!

আনন্দময়ী। আমি রাগ করব! তুই বলিস্‌ কি! তুই যা করচিস্‌ এ তুই জ্ঞানে কর্‌চিস্‌ নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম বটে কিন্তু—যাই হোক্‌গে, তুই যাকে ধর্ম্ম বলে বেড়াস্‌ সে আমার মানা চল্‌বে না—না হয়, তুই আমার ঘরে আমার হাতে নাই খেলি—কিন্তু তোকে ত দুসন্ধে দেখ্‌তে পাব, সেই আমার ঢের। বিনয়, তুমি মুখটি অমন মলিন করো না বাপ,—তোমার মনটি নরম, তুমি ভাব্‌চ আমি দুঃখ পেলুম—কিছু না বাপ! আর একদিন নিমন্ত্রণ করে খুব ভাল বামুনের হাতেই তোমাকে খাইয়ে দেব—তার ভাবনা কি! আমি কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতের জল খাব, সে আমি সবাইকে বলে রাখ্‌চি।

গোরার মা নীচে চলিয়া গেলেন। বিনয় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—"গোরা, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে!"

গোরা। কার বাড়াবাড়ি?

বিনয়। তোমার।

গোরা। এক চুল বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে যার সীমা আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোন ছুতোয় সূচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষকালে কিছুই বাকি থাকে না।

বিনয়। কিন্তু মা যে!

গোরা। মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে! আমার মার মত মা ক'জনের আছে! কিন্তু আচার যদি না মান্‌তে সুরু করি তবে এক দিন হয় ত মাকেও মানব না। দেখ বিনয়, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো—হৃদয় জিনিষটা অতি উত্তম কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।

বিনয় কিছুক্ষণ পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—

দেখ, গোরা, আজ মার কথা শুনে আমার মনের ভিতরে কি রকম একটা নাড়াচাড়া হচ্চে। আমার বোধ হচ্চে যেন মার মনে কি একটা কথা আছে সেইটে তিনি আমাদের বোঝাতে পারচেন না তাই কষ্ট পাচ্চেন।

গোরা অধীর হইয়া কহিল—"আঃ বিনয়, অত কল্পনা নিয়ে খেলিয়ো না—ওতে কেবলি সময় নষ্ট হয় আর কোন ফল হয় না।"

বিনয়। তুমি পৃথিবীর কোন জিনিষের দিকে কখনও ভাল করে তাকাও না; তাই যেটা তোমার নজরে পড়ে না সেটাকেই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমি কতবার দেখেছি মা যেন কিসের জন্যে একটা ভাবনা পুষে রেখেছেন—কি যেন একটা ঠিক মত মিলিয়ে দিতে পারচেন না—সেই জন্যে ওঁর ঘরকরনার ভিতরে একটা দুঃখ আছে। গোরা, তুমি ওঁর কথাগুলো একটু কান পেতে শুনো।

গোরা। কান পেতে যতটা শোনা যায় তা আমি শুনে থাকি—তার চেয়ে বেশী শোন্‌বার চেষ্টা করলে ভুল শোন-বার সম্ভাবনা আছে বলে সে চেষ্টাই করিনে।

[ক্রমশ]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উমেশচন্দ্র দত্ত।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ভারতবর্ষে একথা অতি পুরাতন। কত কত সাধু মহাজন এই আদর্শ বক্ষে লইয়া জীবন গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কয়জন সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন জানি না। যাঁহারা হইয়াছেন প্রকৃতই তাঁহারা ধন্য। এই ধন্য পুরুষদিগের মধ্যে আমাদের উমেশচন্দ্র একজন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ হরমোহন দত্ত। তাঁহার জননী সর্ব্বমঙ্গলা অতি ধর্ম্মশীলা সুগৃহিণী ছিলেন। অষ্টমবর্ষে পিতৃহীন হইয়া তিনি জননীর এবং পিতামহীর স্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হন। গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁহার পাঠারম্ভ হয়। তিনি সুখ্যাতির সহিত প্রথমবিভাগে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং তাহাতেই ইংরাজী পাঠ করিবার কথঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া লন। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশন কলেজ হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া তাহাতেও বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তিলাভ করিতে না পারিলে সম্ভবতঃ তাঁহার আর পড়াশুনা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি যে এই সময় সুদ্ধ নিজের পড়াশুনা চালাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু পারিবারিক ভার বহন করিবার জন্যও তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার পড়াশুনার যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; যাহা হউক তিনি নিতান্ত দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কোন প্রকারে সাধন করিতে লাগিলেন। একটী বাড়ীর নিম্নতলে একটী ঘর ভাড়া করিয়া আপনার বাসা স্থির করিলেন, স্বহস্তে পাক করিতেন* এবং ছেলে পড়াইয়া যে সময় টুকু বাঁচিত তাহাতেই কোন প্রকারে নিজের পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইতেন। সেই বাটীতে যে সকল লোক বাস করিতেন তাঁহাদের অনেকেই সুরাসক্ত ছিলেন ও সুরাপান করিয়া মত্ততার বশে নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। ইহাতে তাঁহার যে সুদ্ধ পড়াশুনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নিরতিশয় বিকাশপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে আবার যখন স্বজনেরা জানিতে পারিলেন যে তিনি বৃত্তি ও অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন তখন তাঁহারা তাঁহার পরিবারভুক্ত হইতে আসিলেন। তিনি অবিকৃতচিত্তে সকলের ভার বহন করিয়াও আপনার পাঠাঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। যদি তিনি মুক্তপ্রাণে সুদ্ধ কেবল পাঠ ও আত্মোন্নতি লইয়া থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি আরও উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। এই ঘোরতর জীবনসংগ্রামের ভিতর মনস্বী উমেশচন্দ্র ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে দুই বৎসরের অধিক কাল পড়িতে পারিলেন না। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে

* এই সময়ে তাঁহাকে যেমন আপনার জন্য তেমনই ২।৩ জন আত্মীয়ের জন্যও রাঁধিতে হইত।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত

নিপীড়িত হইয়া সংসারভারাক্রান্ত যুবক মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িলেন এবং শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। জীবনে এ ব্রত আর পরিত্যাগ করেন নাই। এই অবস্থাতেই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি,এ, পাশ করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণের পথ কথঞ্চিৎ সুগম করিয়া লইলেন। ইহার পর হিন্দু স্কুল, কোন্নগর হাই ইংলিস স্কুল, বেথুন কলেজ এবং হরিনাভির ইংরাজী স্কুল, যখন যেখানে কাজ করিয়াছেন সেখানেই সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। হরিনাভি স্কুলে থাকিতে থাকিতে তাঁহার প্রকৃতি সর্ব্বতোমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন উমেশচন্দ্র জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। এইজন্য অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। একদিকে যেমন জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সকল প্রকার ক্লেশ দুঃখ বাধা বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, আর একদিকে ধর্ম্মকে জীবনের বস্তু করিবার জন্য ঘোরতর সাধনায় নিরত হইয়াছিলেন। পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলীই নাকি তাঁহার মনোরাজ্যে সত্য ন্যায় মঙ্গলের মহদ্ভাব সমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিল। ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়াছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মানুশীলনে ও ধর্ম্মসাধনায় অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মকে জীবন হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বুঝিতেন না, তাই যাহা কিছু সত্য ন্যায় ও মঙ্গল বলিয়া জানিতেন, তাহাই জীবনে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন। পরলোকগত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যাকুলচিত্ত উৎসাহী যুবকদিগের আসঙ্গ আরও তাঁহাকে অনুরাগী করিয়া তুলিল। জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্ম মধুরভাবে তাঁহার জীবনে একান্ত সম্মিলিত হইতে লাগিল। এই সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ তিনি বিশ্বাসানুরূপ ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স নয় বৎসর মাত্র। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুসারে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের প্রতিবেশী মণ্ডলী এ সময় যে কেবল নিদ্রিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা মৃত ছিলেন না। তাঁহারাও আপনাদের বিশ্বাস মত উমেশচন্দ্রকে তাঁহার অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত রাখিবার বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তখনকার সমাজ এবং তাঁহার নিগ্রহভাজন, কেহই মৃত ছিলেন না, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উভয়েরই প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়া যাইতে পারে না। উমেশচন্দ্র বিনয় ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাযোগে একে একে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হইল, তখন গ্রামের ক্ষমতাশালী পুরুষগণ দোকানদারদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, যেন কেহ বিধর্ম্মীদিগের নিকট মৃতসৎকারের জন্য কাষ্ঠ বিক্রয় না করে। সুতরাং উমেশচন্দ্র এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত দোকান ঘুরিয়াও একখানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু একজন লোকও তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য আসিলেন না। তখন তাঁহারা দুভাই কুঠার হস্তে আপনারাই বাড়ীর এক বৃহৎ আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও পিতামহীর সৎকারকার্য্য নির্ব্বাহিত করিলেন। শ্রাদ্ধের সময়েও তাঁহারা যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইলেন। উমেশচন্দ্র শেষে কলিকাতা হইতে ব্রহ্মোপাসকদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিলেন, এবং ব্রহ্মোপাসনা সহকারে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন।

হরিনাভির ক্ষেত্রেই তাঁহার জীবন প্রথম পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া নব সৌন্দর্য্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিল। এখানে তিনি প্রধানশিক্ষকরূপে অনেক কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইলেন। অনেকগুলি আত্মার ভার বিধাতা ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি যেরূপে সে ভার প্রীতি ও অনুরাগের সহিত বহন করিতে লাগিলেন তাহাতে যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসায় তাঁহার ছাত্রগণ মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে গুরু, কিন্তু ব্যবহারে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাহাদের অনেকেই বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিল। এখানে তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার কোন কোন বন্ধু এবং

ছাত্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। একটী ঘরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়া দিলে, কথা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন সামাজিকগণ বিরোধী হইয়া স্বভাবতঃ নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্য্যন্তও অবিচলিতভাবে সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে সাধুকার্য্যের সিদ্ধির জন্যই যেন বিঘ্নরূপ পূর্ণাহুতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। একদিন উপাসনা করিতেছেন এমন সময়ে সহসা কতকগুলি লোক তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া উপাসনা ভাঙ্গিয়া দিল, এবং যাঁহারা নিশ্চিন্তে উপাসনার আনন্দভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রহারের তিক্তরস আস্বাদন করিতে দিলেন। ভক্তিসাধনায় বিভীষিকা চিরদিনই পরম ঔষধ। ইহাতে কৃত্রিম ভক্তি অচিরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয় কিন্তু সরল ভক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া জীবন যৌবনে গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠে। এখানকার সামাজিকগণ বেশ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; তাঁহারা এখানেই ক্ষান্ত না হইয়া সেই ব্রহ্মোপাসনার গৃহে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য অবিলম্বে সেবায়ত নিযুক্ত করিলেন। এ পর্য্যন্ত সামাজিকগণ যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন তাহা ঠিকই করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু তাহার পর যখন উমেশচন্দ্র প্রতিবেশীগণকে এই কথা জানাইলেন তখন তাঁহারা অম্লানবদনে বলিলেন, আমরা আজন্মকাল ওটিকে কালীমন্দির বলিয়া জানি।

উমেশচন্দ্রের আর প্রত্যুত্তর করিবার কিছুই থাকিল না। এখন তিনি কি করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান সহায় হইলেন। তাঁহাকে নিরুপায় দেখিয়া একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, যতদিন আপনাদের উপাসনার জন্য আর কোন স্থান না হয়, আমার বাড়ীতেই আপনারা উপাসনা করিবেন। তিক্তের মধ্যে উমেশচন্দ্র ভগবানের করুণার মধুরতার আস্বাদন পাইলেন। যখন পরবর্ত্তীকালে এই বিদ্বেষী সামাজিকগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ভূমি দান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তখন উমেশচন্দ্রের কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কি অমৃতশান্তির প্লাবন উঠিয়াছিল; বিধাতাই তাহার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উদারতা, স্নেহশীলতা এবং ধর্ম্মজীবনের প্রভাব গ্রামবাসীদিগকে একেবারে আপনার করিয়া তুলিল। যখন কলিকাতায় উর্ব্বরভূমিতে এই কর্ম্মিষ্ঠ কৃষক আপনার কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন তখনও হরিনাভিতে প্রতি সপ্তাহে যাইয়া উপাসনা করিতেন এবং বার্ষিক উৎসবাদি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া অপার প্রীতি অনুভব করিতেন।

কলিকাতাই তাঁহার শেষ এবং প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে তাঁহার প্রিয়তম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি কলেজ এবং মূকবধির বিদ্যালয় তাঁহার নীরব প্রাণপাতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, উৎসাহময় রাত্রিজাগরণ, সাংসারিক ক্লেশ এবং স্বার্থনাশের পর সিদ্ধির মুখ দেখিয়াছেন কে তাহা বলিয়া উঠিতে পারে? কোনও সাধুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পদে পদে বাধা বিঘ্ন তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্ছনা যেন শতমুখী হইয়া ভয়ঙ্কররূপে নিগৃহীত করিতে থাকে। অর্থের অনটনে কতবার অন্ধকার দেখিতে হইয়াছে; উমেশচন্দ্র কেবল অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অদম্য অধ্যবসায়বলে কূলপ্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত ঝটিকা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন কখন কোন অভিযোগ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে, সিটি কলেজের নানা ক্ষেত্রে, মূকবধির বিদ্যালয়ে, অনাথবন্ধু সমিতিতে, ভারতসভায়, সিনেট হাউসে, একটী মানুষ যেন দশ জন হইয়া খাটিতেন, অথচ কোলাহল নাই। এমন নিস্পৃহ, নিষ্কাম, শান্ত, আত্মসংযত, কর্ম্মযোগী সচরাচর প্রকৃতই বড় দুর্ল্লভ।

তিনি নরনারী উভয়েরই সেবার জন্য যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে সেই মহাব্রত উদ্যাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। পুরুষদিগের জন্য যেমন ভাবিয়াছেন এবং খাটিয়াছেন, নারীজাতির জন্যও তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বামাবোধিনী পত্রিকা, বেথুন কলেজ এবং ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।"

নরনারীর সমান অধিকারে তাঁহা চিরদিন অটল বিশ্বাস

ছিল, এবং সেই জন্যই নরনারী সাধারণের জন্য সমানভাবে খাটিয়া গিয়াছেন। নারী চরিত্রে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। শিক্ষা পাইলে রমণীও যে পুরুষদিগের ন্যায় জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন ইহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাস বলেই তিনি তাঁহাদের জন্য পূর্ণপ্রাণে খাটিয়া গিয়াছেন। 'বামাবোধিনী' সেই বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গের অন্যতম ফল। পঁয়তাল্লিশ বৎসর এই কার্য্যে তিনি তিল তিল করিয়া নীরবে আত্মবলিদান করিয়াছেন, ইহাতে সহানুভূতি করিবার বা সংবাদ লইবার বেশী কেহ ছিল না।

মানব সমাজে যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহাদের জ্ঞান ধর্ম্ম-নীতি লাভের জন্য ত খাটিয়াছেনই, যাহারা দীন দরিদ্র এবং অঙ্গহীন তাহাদের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে। তাঁহার মূকবধির বিদ্যালয় তাঁহার উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দান করিতেছে। যখন তিনি সিটি কলেজের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ইহার প্রথম সূত্রপাত করেন তখন তিনি আশাও করিতে পারেন নাই যে পরিণামে তিনি ইহাকে এমন গৌরবের জিনিষ করিয়া তুলিতে পারিবেন। তিনি ব্রহ্ম নামে বীজ বপন করিলেন এবং ব্রহ্ম কৃপার উপর নির্ভর করিয়া একান্ত চিত্তে সরল প্রাণে খাটিয়া যাইতে লাগিলেন। না অর্থ, না ছাত্র, না শিক্ষক, শুদ্ধ আশা ও বিশ্বাস বলে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এ দেশে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না, আর কেহ হইলে এই একটী মাত্র ঘটনাতেই তাহার সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ জল করিয়া ফেলিত। কিন্তু তিনি ভীত বা নিরুৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিয়া আনিলেন। এ দিকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপুল অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মিউনিসিপালিটির সাহায্যে এবং গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি লাভে কৃতকার্য্য হইয়া বিদ্যালয়ের একটী বাড়ীর জন্য উদ্যোগী হইলেন। দেশের সম্ভ্রান্ত এবং মধ্যবিত্ত লোকেরাও তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন; এবং একটী সুন্দর সুপ্রশস্ত বিদ্যামন্দির তাঁহার অকাতর আত্মদানের পুরস্কার স্বরূপ উত্থিত হইল।

তাঁহার অনাথবন্ধু সমিতি এবং গিরিশ দাতব্যভাণ্ডার হইতে কি কম দীন দরিদ্র অনাথ ও অসহায় বিধবা জন সাহায্য লাভ করিয়াছে? তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে পরলোকগত বাবু শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সম্ভবতঃ মূকবধির বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হইতে উমেশচন্দ্র আপনার এই অনুরূপ আড়ম্বরশূন্য কর্ম্মী পুরুষের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইঁহার এই মধুর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। মাঘোৎসব উপলক্ষে দরিদ্রদিগের মধ্যে যে অর্থ বিতরিত হইত, উমেশচন্দ্র তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অল্প দিন হইল জয়নগর মজিলপুর প্রভৃতি স্থানে ঘোরতর অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। উমেশচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া একটী কমিটি স্থাপন করেন, এবং অর্থসাহায্যদানে অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নীরব গুপ্তদানের কথা কে বলিয়া উঠিতে পারে? তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরদুঃখ নিবারণে তাঁহার হস্ত নিয়ত মুক্ত ছিল।

আমাদের দেশে উচ্চ নীচ, জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকাংশ লোকেই অল্পবিস্তর মাদক সেবন করিতে করিতে বীভৎসরূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। যাহাতে এক বিন্দু মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহাতে এক তিল যত্ন নাই, কিন্তু পশুভাবাপন্ন হইয়া মরিবার জন্য মানবসন্তান লালায়িত, সত্য সত্যই এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর! শুদ্ধ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত লোকেরা মোহের বশীভূত হইয়া মাদকসেবী হইয়া পড়িতেছে তাহা নয় কিন্তু জ্ঞানগৌরবে যাঁহাদের মস্তক উন্নত তাঁহারাও যখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তুচ্ছ আমোদপিপাসায় মাদকসেবনে মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পড়েন তখন দেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল পুরুষগণ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই রূপ কতকগুলি পুরুষের যত্নে মাদকতা নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। উমেশচন্দ্র তাহার সভ্য হন; এবং যত দিন সভ্য ছিলেন, কখনও উদাসীন সভ্য হইয়া থাকেন নাই। শুনিয়াছি তিনি পবিত্রতারক্ষিণী সভারও সভ্য ছিলেন।

লেখা পড়া সহস্র সহস্র লোকে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত লোক কয়জন? জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া কৃতিত্বলাভের দৃষ্টান্ত বিরল নয়; কিন্তু প্রকৃত কৃতী লোক সত্য সত্যই বিরল। অনেকেরই জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ

আছে বলিয়া মনে হয় না। অর্থ এবং যশ উপার্জ্জনই যেন মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য ইহা হইতে উচ্চতর আর কিছু সাধনার বস্তু থাকিতে পারে, ইহা যেন তাঁহাদের মনেই হয় না। সুতরাং অধিকাংশ জীবনের পরিণাম সেই সর্ব্বসাক্ষী সূক্ষ্মদৃষ্টির কাছে এক মুষ্টি চিতাভস্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। এরূপ জ্ঞানার্জ্জন ও কৃতিত্বলাভ একেবারে বিড়ম্বনা না হইলেও, বড় বেশী কিছু নয়, ইহা সত্য। উমেশচন্দ্রের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তিনি প্রত্যেক লব্ধজ্ঞানকে সত্যের নিকষে পরীক্ষিত করিয়া লইতেন। যাহা রাখিবার তাহা রাখিতেন; যাহা না রাখিবার তাহা অস্থির ক্লেদবৎ পরিত্যাগ করিতেন, ইহাতে তাঁহার নিকট নূতন বা পুরাতনে ভেদাভেদ ছিল না। যখন জ্ঞান এইরূপে বিশুদ্ধ, সংস্কারমার্জ্জিত এবং রুচি সরস ও সঙ্গত হইয়া উঠিল তখন তাঁহার উদার হৃদয় দেশের কল্যাণকামী হইয়া উঠিল। এই জন্য তিনি অর্থ ও যশের পথ পরিহার করিয়া সত্য ন্যায় ও মঙ্গলের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনি ধর্ম্ম লইয়া তৃপ্ত রহিয়াছেন, তা নয় সকলকে ধর্ম্মপথে আহ্বান করিয়াছেন; তিনি আপনি জ্ঞানার্জ্জনের সুখে সুখী হইয়াছেন, তা নয় কিন্তু সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন এবং সমাজের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দুর করিবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। বিশুদ্ধ ও উন্নত সমাজের অঙ্গীভূত হওয়া অতীব সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা বিধাতার কৃপার দান। এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মে, জ্ঞানে এবং সুমার্জ্জিত রুচিতে শোভন সমাজ দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণের গভীর আকিঞ্চন ছিল। ভারতসংস্কারক ও বামাবোধিনী তাঁহার সেই আকিঞ্চনের ফল। ইহাতে তিনি জীবনক্ষেত্রে কর্ম্মকুশল কৃষকের ন্যায় যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, উদারপ্রাণে এবং মুক্তহস্তে তাহাই দেশের নরনারীকে বিতরণ করিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন। তাঁহার ভারতসংস্কারক বেশ প্রতিপত্তিশালী কাগজ হইয়াছিল; এমন কি গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে যখন সমস্ত কাগজের সম্পাদকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, বাঙ্গলা কাগজের মধ্যে সোমপ্রকাশ এবং ভারতসংস্কারক সেই সম্মান লাভ করিয়াছিল।

তিনি যাহা ভাল বলিয়া মনে করিতেন সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। গুণী ও সৎকর্ম্মশীল পুরুষের গৌরব ও সম্মানরক্ষাও তাহাদের মধ্যে একটী। ইহা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন কেন? তাই প্রতি বৎসর দেখিতে পাই, ভক্তিমান পুরোহিতের ন্যায় ফুলচন্দনে পুষ্পপাত্র সাজাইয়া ভক্ত এবং অনুরাগী বন্ধুগণ সঙ্গে, ডেভিড হেয়ার, মহাকবি মধুসূদন, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রভৃতি কৃতী ও সৎকর্ম্মশীল পুরুষদিগকে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করিবার জন্য চলিয়াছেন। সেই সময়কার তাঁহার মুখশ্রীতে আগ্রহ ও বিনয়ে এমন কোমল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, যে তখন তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যাইত না।

তাঁহার দেহ ক্ষীণ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে অতুল বল ধারণ করিতেন। তাই তাঁহাকে কখন ক্লান্ত হইতে বা বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিতে দেখা যাইত না। কোন না কোন ক্ষেত্রে কিছু না কিছু করিতেছেনই, দিন এবং রাত্রি সমভাবে খাটিয়া চলিয়াছেন কিন্তু মুখ কখন মলিন হয় নাই। কেমন করিয়া তিনি এ শক্তি লাভ করিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এ অক্ষয় শক্তি সঞ্চার হইত? যে অমৃত খনির সন্ধান পাইয়া তিনি অক্লান্ত কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে দু একটী কথা কহিয়া আজিকার এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ব্রাহ্মসমাজে বড় একটা সাধন ভজন নাই, অনেকেরই এই ধারণা। ইহার মূলে কতক পরিমাণে সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সাধন ভজন একেবারেই নাই ইহা সত্য নহে। অনেকে নিয়মিতরূপ উপাসনা সাধন করিয়া থাকেন এবং অনেকে নানাপ্রকার নামজপাদি গুপ্ত সাধনও করিয়া থাকেন। উমেশচন্দ্র নিয়মিতরূপে প্রতিদিন উপাসনাদি করিতেন। কি নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত তিনি উপাসনাদি করিতেন, যাঁহারা গভীরভাবে তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা জানেন। প্রতিদিনের জীবনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটী আন্তরিক চেষ্টা সততই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করিতেন, প্রত্যক্ষভাবে পূজা করিতেন এবং জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারই আদেশ বহন করিতেছেন, তাঁহারই কর্ম্ম সাধিত করিতেছেন এবং তাঁহারই সন্তানগণের

সেবা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। আগে প্রার্থনা না করিয়া তাঁহার কাছে আপনার দুর্ব্বলতা না জানাইয়া এবং তাঁহার কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং প্রভুই তাঁহার শক্তিপ্রাণ, প্রভুই তাঁহার বুদ্ধি ভরসা এবং প্রভুই তাঁহার কার্য্যের পরিণাম ফল ইহা জানিতেন। এই জন্য এই কর্ম্মযোগ তাঁহার কাছে মধুময় হইয়াছিল। তিনি উপাসনাকুটীরে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যে সমস্ত তত্ত্ব পাইতেন, জীবনের ক্ষেত্রে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেন; নহিলে প্রভুর নিকট যে অসত্যাচারী কপটী হইয়া যান। তাঁহার ভিতরের এবং বাহিরের জীবন যে একই ছাঁচে গঠিত হইতেছিল, তাঁহার কার্য্য প্রণালী হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা, সখা, গুরু, সকল আত্মীয়ের পরম আত্মীয় তাঁহার সমস্ত কার্য্যের প্রধান উৎস ছিলেন। ভুল ভ্রান্তি, পদস্খলন, অপরাধ তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়া শান্ত হইতেন।

কিন্তু তিনি উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য সাধনও করিতেন। যোগসাধনায় তিনি বেশ অগ্রসর হইতেছিলেন ইহাও আমরা জানিতাম। যাহাতে ভগবান লাভ হয়, যাহাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্পষ্টতর ও মধুরতর হইয়া আসে, তাহারই তিনি অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতে তিনি শান্তিও পাইতেন বলিয়া বেশ মনে হয়। তবে এ সমস্ত কথা বাহিরে প্রকাশ করা বোধ হয়, সমীচীন বলিয়া মনে করিতেন না এবং করাও উচিত বলিয়া মনে করি না। যেখানে যোগ তপস্যায় কৃতী পুরুষের কথা শুনিতে পাইতেন সেখানেই "তৃণাদপি সুনীচ" হৃদয়খানি লইয়া বিনম্রমুখে দীন ভিখারীর ন্যায় উপস্থিত হইতেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত সমভাবে মিশিতেন, সমস্ত সাধুভক্ত জনের চরণতলে বসিতেন, এবং সমস্ত ক্ষেত্র হইতেই ভগবানের কৃপার দান সংগৃহীত করিতেন। "জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের" এমন মধুর মিশ্রণ, এমন সুন্দর অভিব্যক্তি আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণকে বরণ করিতে শিখিয়াছিল; তাঁহার উদার প্রেম বিশ্বসংসারকে আপন করিতে শিখিয়াছিল। যাহা তিনি প্রভুর নিকট হইতে আদান করিতেছিলেন তাহাই তিনি বিশ্বসংসারকে প্রদান করিতেছিলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার ছিল না, গৌরব ছিল না, আড়ম্বর ছিল না, আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁহার প্রভু যেমন নীরবেই কাজ করিয়া যাইতেছেন, তিনিও সেইরূপ নীরবেই কাজ করিতে শিখিয়াছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তির সহিত কর্ম্মের যোগসূত্র কিরূপে তাঁহাতে মিলিত হইয়াছিল যদি আমরা ইহা হইতে না বুঝিতে পারি তবে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারা আমাদের সাধ্য নয়।

বাহিরে তাঁহাকে দেখিলে কেহই তাঁহাকে "বড়লোক" বা প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাঁহার বাহ্যমূর্ত্তি আদৌ আকর্ষণের বস্তু ছিল না; কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা শক্তি ও সদ্‌গুণে এমন বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যে অনেক বড়লোক এবং অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও তাঁহার নিকট জড়ের সুসজ্জিত মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহার অন্তর সুন্দর, তাহার বাহিরও সুন্দর হইয়া উঠে। সাধনায় মানুষ কতদূর উন্নত হইতে পারে উমেশচন্দ্রই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনটি বিশেষ সাধনায় তিনি পূর্ণ মনোযোগী হইয়াছিলেন, আর তাহারই সিদ্ধিতেই তিনি পৌরুষলাভ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার শক্তি যতই ক্ষুদ্র থাকুক না কেন, তাহার বিকাশের জন্য তিনি কখনও ত্রুটী বা অবহেলা করেন নাই। সদ্ব্যবহারেই শক্তির উপচয়, নতুবা অপচয় অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ বিধাতা তাঁহাকে যে সময়টুক দিয়াছিলেন তাহার সদ্ব্যবহারে তিনি কখনও শৈথিল্য করেন নাই। বিধাতার দানের উপেক্ষা তিনি জানিতেন না; সেই জন্য বিধাতাও তাঁহাকে কৃতিত্ব দানে কৃপণতা করেন নাই, বরঞ্চ গৌরবের মুকুটদানে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ কর্ত্তব্যকে তিনি কখনই ক্ষুদ্র মনে করিতেন না। যতই সামান্য হউক, অবহেলায় বা আলস্যে তাহা ফেলিয়া রাখিতে শিখেন নাই। ফলতঃ যাহা কিছু তাঁহার কাছে আসিত, যত্ন, নিষ্ঠা ও সদ্ব্যবহারের গুণে তাহা হইতেই কিছু না কিছু করিয়া তুলিতেন। একগাছি তৃণ একটী বালুকণা তাঁহার কাছে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। সুতরাং সময়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং শক্তি ও বস্তুর সদ্ব্যবহার তাঁহাকে পৌরুষদান করিয়াছিল।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সাধনাও তাঁহার সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম যে লোকদেখান কোন আড়ম্বর বিশেষ নয়, কিন্তু প্রকৃত জীবনের বস্তু, ইহা অতি সূক্ষ্মরূপেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সাধনার দ্বারা তাহাকে জীবনে পরিণত করিতে নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন।

> তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

ইহা তিনি পাঠ করিলেন লোকের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়, বেদী হইতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নয় কিন্তু নিজের জীবনে পরিণত করিবার জন্য। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ইহার প্রত্যেক কথাই তিনি কিরূপে জীবনে পরিণত ও আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।

> সুবিশালমিদম্বিশ্বম্ পবিত্রম্ ব্রহ্মমন্দিরম্,
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যংশাস্ত্র মনশ্বরম্;
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি প্রীতিঃ পরম সাধনম্,
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যম্ ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

তিনি ইহা পুস্তক এবং পত্রিকার শোভা এবং গৌরববর্দ্ধনের জন্য রচিত মনে করিতেন না; কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অবিনাশী উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা গিরিকন্দরে

বা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার জন্য গ্রহণ করেন নাই কিন্তু জনসমাজে, পরম পুরুষের প্রত্যক্ষ লীলাক্ষেত্রে, প্রতিদিনের প্রতিমূহূর্ত্তে জীবনের অনল-পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হইবেন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ শুনিতেন ভাষা ও ভাবে মুগ্ধ হইয়া ছুটী প্রশংসায় কথার শেষ করিবার জন্য নয়, কিন্তু আত্মার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য। কোন কথাই, কোন সত্যই তাঁহার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু মনে হইত, ব্রহ্মশক্তিপূর্ণ জীবন্ত বীজ যাহার সমাদর ও সদ্ব্যবহার করিলে, কালে সুবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করিতে পারে। ফলতঃ তিনি সকল কাজেই এবং জীবনের সমস্ত বিভাগে সুষমা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহাতে ভগবানের সন্তান নামের উপযুক্ত হইতে পারেন, সেই চেষ্টা, সেই সাধনাই করিয়াছেন। ভগবানই জানেন তাঁহার সে সাধনা কতদূর ফলবতী হইয়াছে।

কিছু দিন হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে পর, সমস্ত সংসার ও ছোট ছোট সন্তানগুলির প্রতিপালনের ভার তাঁহারই উপর পতিত হয়। তিনিও জননীর ন্যায় তাহাদের লালন পালন করিতে থাকেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাগুলি সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বামিহস্তে প্রদত্তা হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।

এ কথার যথাসম্ভব সার্থকতা হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

দুই বৎসর হইতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল এবং বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। গত ১লা জুন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের বার্ষিকী সভায় অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। ইহাই জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ কাজ। তাহার পরেই তাঁহার রোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করিয়া সেখানে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার শীত তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে অসহ্য হওয়ায় তিনি একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় মহাকষ্টে তাঁহাকে কলিকাতায় তাঁহার "দত্তনিবাসে" আনা হইল। এখানে আসিয়া দুদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। শান্ত ভাবে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে স্তিমিত দীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল। ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় সাধু-পুরুষের পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং অমৃতের কোলে নব চেতনা নব জাগ্রতি লাভ করিবার জন্য অনন্তমুখী হইয়া ইহলোকের লীলা শেষ করিলেন। যাহা জড়, জড়ে মিলিল; যাহা চৈতন্য, চৈতন্যের অন্বেষণে অনন্তের পথে ধাবিত হইল।

দলিত কুসুম।*

(লংফেলোর ইভ্যাঞ্জেলীন হইতে অনুবাদিত।)

প্রথম অধ্যায়।

এই পুরাতন বন, অশ্বত্থের তরু
মরমরে দীর্ঘ তার বাহু প্রসারিয়া।
শৈবালে আবৃত, পরি শ্যামল বসন
গোধূলি আলোকে যেন ধীর ব্রহ্মচারী
কহিছেন সবাকারে ভবিষ্যত বাণী।
অদূরে প্রস্তর খণ্ডে পড়িছে উছসি
আকুল সাগরবারি। সমীরণে বহি
আসিছে গম্ভীর ধ্বনি, ক্ষুদ্র বনভূমি
সেই প্রতিধ্বনি বুকে উঠিছে কাঁপিয়া।
এই সেই বনভূমি! কোথা তবে সেই
জীবন্ত হৃদয়গুলি, মৃগ-শিশু সম
শিকারীর বংশীরবে উঠিত নাচিয়া।
কোথা সে কুটীরগুলি দরিদ্রসম্পদ,
গ্রামবাসী চাষী সব রহিত যথায়।
মানবজীবন যেন গিয়াছে বহিয়া,
নদীর তরঙ্গ সম কাননের তলে;
যাদের ধরণীছায়া আছিল ঘিরিয়া
তবু হৃদয়েতে ছিল স্বরগের আলো।
ভেঙ্গেছে কালের স্রোতে সেই গৃহগুলি,
গৃহবাসী চিরতরে লয়েছে বিদায়,
শুষ্ক পাতা, ধূলি সম পড়েছে ছড়ায়ে।
দুরন্ত ঝটিকা যেন লইয়া তাদের
উড়াইয়া ফেলে দেছে সাগর মাঝার।
কিছু নেই, স্মৃতি শুধু রয়েছে এখনো।
যদি গো বিশ্বাস কর শুন এ কাহিনী,
স্নেহ, প্রেমে ভরা সেই আশা বালিকার,
ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা যার অতুল ধরায়।
নারীর সৌন্দর্য্য মাঝে কি অসীম প্রেম।
যার এ কাহিনী আজ(ও) সে বিজন বনে
আকুল উচ্ছ্বাসভরে গাহে তরুলতা।
গ্রাম্য বালিকার প্রেম, পুরাতন সেই
গ্রামবাসীদের সুখ আনন্দ আলয়।

১

সেই পুরাতন দেশে, সমুদ্রের তটে
ছিল ক্ষুদ্র গ্রাম এক। উপত্যকা তার
ফলে ফুলে ছিল পূর্ণ। পূর্ব্বদিকে ছিল

* ইহার প্রথম অধ্যায় ১৩০৮ সালের পরিচারিকায় প্রকাশিত

বিস্তৃত প্রান্তর এক, গ্রাম্য পশুপাল
সেথায় চরিত গিয়া। গ্রামবাসী মিলে
উন্নত প্রাচীর এক করেছিল সেথা,
যেন না প্রান্তরে পশে জোয়ারের জল।
দুরন্ত শীতের কালে খুলে দিত দ্বার,
খেলিত সাগর বারি প্রান্তর মাঝার।
পশ্চিমে দক্ষিণে ছিল শস্য ক্ষেত্রগুলি
বিস্তৃত হইয়া সেই সমতল ভূমে।
উত্তরেতে পুরাতন সুনিবিড় বন
উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী পরশে গগন।
সমুদ্র কুয়াসা সেথা বেঁধে আছে ঘর,
রাখিয়া দুইটি আঁখি গ্রামের উপর।
সেই গ্রামে গৃহগুলি রঙ্গীন সুন্দর,
ক্ষুদ্র সে কুটীর তবু শোভা অনুপম।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যবে অস্তগামী রবি,
রঞ্জিত করিয়া দিত গ্রাম্য পথগুলি,
বাতায়নে গৃহদ্বারে পড়িত ছড়ায়ে,
সে সময়ে গ্রাম্যনারী বালিকা সকলে
বসিয়া রহিত সবে। কারো বা বসন
নীল শুধু, কারো লাল, কারো শুভ্র বেশ,
অলস ভাবেতে কাটে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাবেলা,
মৃদু কথা কহে বৃদ্ধা, বালিকা ষোড়শী—
খুলিয়া দিয়াছে কণ্ঠ সঙ্গীত তরঙ্গে।
সেই পথে আসিতেন গ্রাম্য পুরোহিত,
বালক বালিকা সবে, অসীম পুলকে
ছুটিয়া যাইত কাছে, কারো চুমি মুখ
কারে বা আশীষ করি তুষিতেন সবে।
সদয় মহাত্মা তিনি, শিশুদের লয়ে
যেতেন সেথায় যেথা, বৃদ্ধা, বালা, নারী
সম্ভ্রমে দাঁড়াত হেরি, তাহাদের সবে
জিজ্ঞাসেন সে দিনের শুভ সমাচার।
তারপর ক্লান্ত দেহে, শষ্য ক্ষেত্র হতে
আসিছে গ্রামের লোক। ক্রমে অস্তগামী
রবি ডুবে, ধরা জাগে গোধূলি আলোকে,
মন্দির হইতে আসে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি।
প্রতি গৃহে বাহিরায় নীলধূম শিখা।
আনন্দ, আরাম, শান্তি, ভরা গৃহ গুলি।
সেইখানে, সেই গ্রামে আনন্দ পুলকে
গ্রামবাসী বাস করে, ঈশ্বরের প্রেমে,
মানবের প্রাণভরা স্নেহের মাঝার।
ভয়হীন দ্বেষহীন, সরল উদার,
কখনো সভয়ে তারা রুধেনাক দ্বার ;
সে গ্রামে দুরাত্মা নাই দুয়ার উন্মুক্ত
দিবসের আলোসম, গৃহবাসী হৃদি
তেমনি উদার। ধনী আর দরিদ্রেতে
নাহিক প্রভেদ। হৃদয় শোণিত সম
তারা যেন আপনার সহোদর ভাই।
সেইখানে কিছু দূরে সমুদ্রের তটে
বীরবল বাস করে। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে
সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী, শ্রেষ্ঠ সবাকার।
একাকী কৃষক তার একটি দুহিতা,
নয়নের মণি সেই ষোড়শী নলিনী
ক্ষুদ্র গ্রামে বিকশিত সৌন্দর্য্য লতিকা।
বৃদ্ধ সে কৃষক, তার মস্তক উপরে
কত যে গিয়াছে শীত নাহিক সীমানা।
তবুও সে দৃঢ় আজি, যেমন অদূরে
প্রাচীন পাদপ স্থির তুষারে আবৃত।
শুভ্র তুষারের মত কেশদাম গুলি
তেমনি মস্তকে তার শোভিছে কেমন।
নয়ন প্রফুল্ল হয় নলিনীরে হেরি,
সপ্তদশ বসন্তের আনন্দপ্রতিমা।
কালো দুটি আঁখি তারা অদূরে যেমন
ক্ষুদ্র কণ্টকের মাঝে শোভে ক্ষুদ্র ফল।
কালো বটে কিন্তু সেই ঘন পক্ষ্ম জালে
কি সুন্দর শোভে তার সে দুটি নয়ন।
গ্রামের উৎসব কালে নবীন বসনে
আবরি সুচারু তনু নলিনী সুন্দরী
হাসি মুখে দেয় সবে আহার যতনে।
কি শোভা সুন্দর ভাসে সে মুখের পরে।
কি শোভা তখন যবে নিদাঘ প্রভাতে
শুনি দূরে মন্দিরের আহ্বান সঙ্গীত,
যায় সেথা পূজিবারে। সুনীল বসনে,
শুভ্র আবরণে ঢাকি মস্তক যতনে।
শ্রবণেতে নীলদুল, অতি পুরাতন
তাহাদের যতনের সঞ্চিত সম্পত্তি
জননী কন্যারে দেয় এই বংশরীতি।
সর্ব্বাপেক্ষা যে স্বর্গীয় মধুর আলোক
খেলিছে আননে তার, ছার মর দ্রব্য
বাড়াতে পারে কি শোভা সে আলোর চেয়ে ?
উপাসনা সাঙ্গ করি, কহি মনোকথা
গৃহে ফিরে, ঈশ্বরের দত্ত পবিত্রতা
খেলে তার সারা অঙ্গে। বীরবল গৃহ
শোভিতেছে সিন্ধু তটে, সম্মুখে তাহার,
ছায়াদান করে সদা বৃহৎ পাদপ।
বন্য লতিকায় ঘেরা গৃহদ্বার গুলি
সেই স্থানে বিশ্রামের সুন্দর আসন।

কোথা বা পালিত পশু আনন্দে খেলিছে,
সম্মুখে শস্যের স্তূপ যতনে সঞ্চিত।
যতনে পালিত সেই বিহঙ্গের দল,
কলকণ্ঠে গায় গান। অদূর কাননে
ঢালিছে অমৃত ধারা বনের বিহগ।
এইরূপে শান্তি সুখে ঈশ্বর প্রসাদে
কৃষক কাটায় দিন। সুন্দরী নলিনী
গৃহ কাজ করে সুখে। উপাসনা গৃহে
কত যে যুবক তারা উপাসনা ভুলি
চেয়ে থাকে মুখে তার। ইষ্ট দেবী সম
যেন সে তাদের কাছে। কত যে যুবক
এসেছিল বিবাহার্থে। কেহ বা অধীরে,
চেয়ে থাকে পথ পানে সে যাবে বলিয়া।
একটি মুখের বাণী শুনিবার তরে,
চাহে কেহ আশা ভরে। কহে কেহ তারে
সুমধুর প্রেমবাণী। সে চাহে না কভু
ফিরিয়া তাদের পানে। হৃদয়েতে তার
একমাত্র দেবতার পবিত্র আসন।
বিমল প্রণয়ী তার, তারে বাসে ভাল।
বিমলের পিতা সেথা শিল্পকর্ম্মকার,
সুমন্ত তাহার নাম, যশ যেন এসে
বাঁধা আছে চিরদিন দুয়ারেতে তার।
বীরবল সনে তার বন্ধুতার ডোর
পড়েছে শৈশব হতে। বালক বালিকা
ফুটিয়া উঠিয়া ছিল, এক বৃন্তে যেন
দুইটি কুসুম সম। শৈশবে তাহারা
দোঁহে দোঁহাকার ছিল খেলিবার সাথী।
গ্রাম্য পুরোহিত দোঁহে সাদরে যতনে
দিইতেন শিক্ষা নব, শিখাতেন গান।
পাঠ সাঙ্গ হলে তারা চলে যেত ছুটে।
শিল্পকার গৃহ দ্বারে রহিত দুজনে,
দেখিত সে শিল্প গুলি বিস্মিত হইয়া।
শরতের সন্ধ্যাকালে আঁধার ঘনায়
আসিত যখন ধীরে, সেই শিখা-পানে
রহিত চাহিয়া দোঁহে। সহসা স্ফুলিঙ্গ
উড়িয়া যাইত দূরে অনল হইতে,
হাসিয়া বলিত তারা পরী মেয়ে গুলি
যেতেছে তাদের সেই মন্দিরে আপন।
বিহঙ্গের মত তারা আনন্দ উল্লাসে
ছুটিয়া বেড়াত সেই পর্ব্বতের তলে,
প্রান্তরের মাঝে তারা অন্বেষিত কভু
সেই বনভূমে অমূল্য প্রস্তর খণ্ডে
মায়াপুরী হতে পাখী আনে যা কুলায়।
সে প্রস্তর লভে যে সে হয় ভাগ্যবান।
এইরূপে কাটে দিন দেখিতে দেখিতে।
বাল্য খেলা সাঙ্গ হল। বিমল এখন
হয়েছে নবীন যুবা, আনন তাহার
স্নিগ্ধ প্রভাতের মত সুন্দর সরল।
তাহারি সে আলো নিয়ে আলো হয় ধরা।
গিয়াছে বালিকা কাল। নলিনী এখন
ষোড়শী সুন্দরী, সেই হৃদয়ে তাহার
রমণীর আশা সুখ জাগিছে সদাই।
হাসির সুখের যেন কনক কিরণ
বলে সবে নলিনীরে। কিছু দিন পরে
সে যখন যাবে তার পতির গেহেতে
আনন্দিত হবে গৃহ সে আলোক পেয়ে;
প্রেমে পুণ্যে পূর্ণ হবে; প্রভাতকমল
সুন্দর শিশুর মুখ উঠিবেক ফুটে।

২

পুনঃ ধরা পরে হ'ল বসন্ত বিকাশ,
রবির কিরণে হ'ল সবি আলোময়,
বিহঙ্গ গাহিয়া সদা মধু কলকণ্ঠে
উড়িছে বিমানপথে। শস্যভার লয়ে
কৃষক সঞ্চিছে যত্নে। ক্ষুদ্র গ্রামে হল
দুরন্ত শীতের পরে বসন্ত সঞ্চার।
নীহারে আবৃত ধরা হল আলোময়।
কুসুমসুরভিবাহী মলয় সমীর
বহে ধীরে ধীরে। শুষ্ক ম্লান ধরা হল
নবীন মাধুরীময় শিশুটির সম,
পরিয়া বিকচ সেই শ্যামল বসন।
চঞ্চল সাগরবারি প্রশান্ত বিমল।
শান্তির আলয় শোভে যেন সেই গ্রাম।
একই রাগিণী মধু বাজে চারিধারে
প্রকৃতি ও মানবের প্রফুল্ল অন্তরে।
বালক বালিকা খেলে, আনন্দের ধ্বনি
আসিছে সুদূর হতে। বিহঙ্গ গুঞ্জন
যেন প্রণয়ীর মৃদু প্রণয়বচন।
উপরে মহান রবি চাহি প্রেমভরে
পরিয়া কিরণময় বিচিত্র বসন।
সে বিমল আভা কভু পড়িছে শিশিরে
কভু পল্লবেতে জলে, উজলে কিরণ
যেন কত মণিময় অপূর্ব্ব ভূষণ।
আপনার কার্য্য ভার সাধিয়া মঙ্গলে,
দিবস বিদায় নিল গোধূলির কাছে।
গোধূলি আপন সেই নীরবতা লয়ে
নেমে এল ধরা পথে, নক্ষত্রভূষণ

শোভিছে অলকে তার। পশুপাল সব
গৃহে ফিরে গেল পথে উড়াইয়া ধূলি,
জানাইল আগমন ধরায় সন্ধ্যার।
গোধূলির ম্লান আলো ধীরে নিভে গেল।
বিমল গগনে শোভে চন্দ্রকর হাসি।
নলিনীর উদ্যানেতে ফুল রাশি রাশি
হাসিয়া ফুটিয়া আছে, সমীর নীরবে
চোরের মতন ধীরে চুরি করে যায়
মধুর সুবাস তার।
সেই সন্ধ্যাবেলা
নলিনীর পিতা বসি গৃহেতে আপন,
চাহিয়া প্রদীপ পানে। অগ্নিশিখা যেন
মৃদু সমীরের ভরে উঠিছে কাঁপিয়া,
কখনো প্রাচীরে ছায়া কখনো মিলায়।
বৃদ্ধ চেয়ে আত্মহারা, সহসা বিস্মৃত
আনন্দ উল্লাসে গায় সুখের সঙ্গীত।
কত অতীতের কথা, সেই বৃদ্ধ বুকে
হল প্রভাসিত। যেন তার বাল্যকাল
এসেছে সম্মুখে, এমনি সুখের দিনে
সুখের শৈশবে কাটে জননীর অঙ্কে
কি সুখ তখন? নলিনী বসিয়া আছে
জনকের পাশে, বিস্মিত চাহিয়া আছে
সহসা শুনিয়া সেই জনকের কণ্ঠে
আবেগ উল্লাস ভরা সুরহীন গান।
গান সাঙ্গ হল।
নীরবে বসিয়া দোঁহে
সহসা শুনিল দূরে পদশব্দ কার।
সম্মুখে খুলিয়া গেল গৃহের দুয়ার।
বৃদ্ধ জানে আসিয়াছে শৈশবের প্রিয়
বন্ধু সুমন্ত তাহার। নলিনী জানিল
তাঁর সাথে আগমন প্রেম দেবতার।
"প্রিয় বন্ধু এস এস", কহে বীরবল,
"তোমার বিহনে শূন্য আসন তোমার,
এস কহি পূর্ব্ব কথা।" নলিনী তখন
সাদরে আনিয়া দিল মিষ্টান্ন যতনে।
সুমন্ত বিষাদে কহে "সুখী বীরবল,
কখনো তোমার মন দুঃখ ছায়া এসে
করেনা মলিন, তুমি শুধু কৌতুকেতে
হাসি খেলা লয়ে, হরষে কাটাও দিন।
জান না কি আমাদের বিমল আকাশে
পড়েছে মেঘের ছায়া? কে জানে তেমন
হবে না মোদের ভাগ্য অন্ধকারময়?
শুন নাই সিন্ধু তটে রাজার তরণী
আসিয়াছে? কেন যে এসেছে এই গ্রামে
জানেনাক কেহ। এই আজ্ঞা প্রচারিল
কল্য ধর্ম্ম মন্দিরেতে গ্রামবাসী জনে
যাইতে হইবে। গ্রামবাসী মনে হায়
কত যে সন্দেহ, জাগে কত শত ভয়!"
কহে নলিনীর পিতা "কিছু নয় ভাই,
মিত্র ভাবে আসিয়াছে রাজার তরণী;
বুঝি রাজ্যে শস্য নাই, ফলেনি সুফল,
সে হেতু এসেছে তারা।" "গ্রামবাসী জন
বলে না তা'", কহে পুনঃ ব্যাকুলিত হয়ে
সুমন্ত বালক সম। অজানা বিষাদে
পরিপূর্ণ হিয়া তার, "জান না কি ভাই,
কত গ্রামে কত শত সরল বিশ্বাসী
গ্রামবাসী জনে রাজা দিল নির্ব্বাসন,
এ গ্রামের বহু লোক চলে গেছে ভয়ে
নিবিড় গহন বনে। সভয়ে কম্পিত
হৃদি, কত লোক ভাই আছে অপেক্ষায়,
কি জানি কি ঘটিবেক অদৃষ্টে তাদের
বিনা মেঘে বুঝি কাল হবে বজ্রাঘাত।
বুঝি অস্ত্ররাশি সব লইবে ছিনিয়া
কে জানিছে রাজ আজ্ঞা।"
"নিরাপদ মোরা"
হাসিয়া কহিল সেই কৌতুকী কৃষক।
"নাহি অস্ত্র, নাহি যন্ত্র, মোরা অস্ত্রহীন,
নাহি আমাদের তবে কোনই বিপদ।
কেন বন্ধু ভাবিতেছ বিষাদ ভাবনা?
আজি নিশাকালে কোন বিষাদ তিমির
আসিতে দিব না এই গৃহের দুয়ারে।
জান না কি সারাদিন কত পরিশ্রমে
নূতন করিয়া পুনঃ রচেছি যতনে
শয্যাগার বর্ষতরে, এস দুই জনে
আমাদের সন্তানের আনন্দের তরে
রহিব আনন্দে।" সম্মুখের বাতায়নে
বিমল নলিনী দোঁহে; নলিনী শুনিল
পিতার হরষ বার্ত্তা, সরমে চঞ্চল
হইল আরক্ত তার কপোলযুগল।
কৃষকের শেষ কথা হয়নি বিলীন,
হেন কালে খুলি দ্বার করিল প্রবেশ
বৃদ্ধ গ্রাম্য পুরোহিত প্রধান সবার।

[ক্রমশ]

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা হিন্দুসমাজে সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার পিতা শান্তনু ধীবর দাশরাজের কন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। দাশরাজ এই কারণে এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন, যে শান্তনুর পুত্র দেবব্রত থাকিতে সত্যবতীর পুত্র জন্মিলে সে ত রাজা হইতে পারিবে না। ইহাতে শান্তনু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। দেবব্রত তাহা লক্ষ্য করিয়া কারণ অনুসন্ধান করেন, ও তাহা জানিতে পারিয়া দাশরাজকে বলেন যে তিনি রাজসিংহাসনে নিজের সমুদয় দাবী পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহাতে দাশরাজ এই আপত্তি উথাপন করেন, যে দেবব্রত না হয় নিজের দাবী ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান হইলে তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহাতে, দেবব্রত, কখনও বিবাহ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেন। এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করায় তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। এই উপাখ্যানটি রবিবর্ম্মার "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা" নামক চিত্রের বিষয়। ভীষ্ম ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ভবিষ্যতে রাজপদ ত্যাগের চিহ্নস্বরূপ তিনি নিজ উষ্ণীষ দাশরাজকে দিয়াছেন। নিকটে একজন পারিষদ দণ্ডায়মান। স্বল্পবাসা সত্যবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকটি তাঁহার মাতা। ছেলেটি তাঁহার ভাই। সকলে স্মরণ রাখিবেন কর-মর্দ্দন প্রাচীন আর্য্য প্রথা।

রবিবর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত রাম বর্ম্মার অঙ্কিত "স্নানান্তে" নামক ছবির কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ইহার বিষয় সহজবোধ্য।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্ট প্রজাদমন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। ইহাতে কেহ বা ভয় পাইতেছেন, কেহ বা রাগ করিতেছেন, কেহ বা গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিতেছেন। যাঁহারা ভীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। আমরা ইংরাজের প্রভুত্বে ও স্বার্থে আঘাত করিলেও ইংরাজ চুপ করিয়া থাকিবেন, ইহা আশা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমরা যে পতিত দশা হইতে উঠিতে চাই, তাহার ভিত্তি ইংরাজের সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা বা সদাশয়তার উপর স্থাপন করা ভুল। ভগবানের ন্যায়বিধান এবং আত্মবলের উপর জাতীয় অভ্যুদয়ের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। জাতীয় অভ্যুত্থানের পথ কোন দেশেই কখনও পুষ্পাকীর্ণ দেখা যায় নাই। যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহাদের সুখে দুঃখে সমভাববিশিষ্ট, সম্পদে বিপদে নির্ব্বিকার হওয়া উচিত; এবং তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে, দেশের সেবা; কোনও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ নহে। তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপণ, সর্ব্বস্বপণ, প্রাণপণ করিতে হইবে। কারণ, এই ত সবে উৎপীড়নের আরম্ভ। এখন দুইজনের নির্ব্বাসন, কয়েকজনের জেল ও জরিমানা এবং দুইটি ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। শত শত ব্যক্তির নির্ব্বাসন ও কারাবাস, বহুসংখ্যক লোকের প্রাণদণ্ড, স্থলবিশেষে তোপে উড়ান, অনেকের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত, এ সমস্তই এখনও বাকী আছে। এই ভীষণ ভবিষ্যৎ যাঁহারা কল্পনা করিতে ভয় পান, বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করুন। কিরূপ মিথ্যা কথা বিলাতে টেলিগ্রাফ করিয়া এদেশের ইংরাজেরা বিলাতের লোকদিগকে এদেশের লোকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। সকলে বুঝিয়া রাখুন, ইংরাজের সাম্রাজ্য মানে ভারতবর্ষ; ভারতে ইংরাজের একচেটিয়া প্রভুত্ব নষ্ট হইলে ইংরাজ ইউরোপের একটা সামান্য জাতি হইয়া পড়িবে; সুতরাং ইংরাজ ভারতবাসীকে চাপিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিবে। এই সকল বুঝিয়া, যাঁহাদের সাহস হইবে না, তাঁহারা চুপ করিয়া থাকুন; কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করুন, যেন ভণ্ডামি করিয়া ইংরাজের পায়ে না পড়েন! যাঁহাদের সাহস হইবে, তাঁহারা দেশের কাজে প্রবৃত্ত থাকুন; পরিবারস্থ সকলকে সর্ব্বপ্রকার বিপদের জন্য প্রস্তুত করুন। ধর্ম্মবিগর্হিত কোন কাজ না করিয়া, কাহারও প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার না করিয়া দেশের কাজ করুন; কিন্তু দুর্ব্বল ও উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকুন। ফলাফল ভগবানের হাতে। ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।

কতকগুলি লোকের দণ্ড হইতেছে; দুদিন পরে আপাততঃ সব থামিয়া যাইতে পারে, না থামিতেও পারে। ইহা



স্নানান্তে।

শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মাকৃত অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে
শিল্পীর অনুমতি অনুসারে।

সকলের চেয়ে কঠিন সমস্যা নহে; অথবা সকলের চেয়ে কঠিন সমস্যা যে কোনটী তাহা বলা যায় না। ছাত্রদের উপর উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগাইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে কাপুরুষ করিবার আয়োজন সর্ব্বত্র হইতেছে। যে অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে তাহারা পিতৃতুল্য মনে করিয়া ভক্তি করিবে, সেই পূজনীয় ব্যক্তিগণকেই তাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দার কাজ করিতে হইতেছে! কোন কোন অধ্যাপক ও শিক্ষক ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতের পুতুলস্বরূপ হইয়া এই ঘৃণিত কাজ করিতেছে। ধিক তাহাদিগকে! গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র যে ছাত্রাবাসবিশিষ্ট কলেজ ও স্কুলের জন্য এত ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন, তাহা ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য নয়; তাহাদিগকে সর্ব্বদা দাগী বদমায়েসের মত নজরবন্দী রাখিবার জন্য। এই গোয়েন্দার নাগপাশ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে, ভবিষ্যতে দেশের কাজ করিবার জন্য লোকই বা কোথায় পাওয়া যাইবে? অতএব, আমাদের ছাত্রদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকে করিতে হইবে। চাকরী ও ওকালতী, জীবিকার এই দুই পথই স্বাধীন শিক্ষায় বন্ধ হইবে। সুতরাং অন্ততঃ প্রথম প্রথম স্বাধীন বৃত্তিশিক্ষা স্বাধীন শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হওয়া চাই।

হিন্দু-মুসলমানে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, জমীদারে রায়তে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে ঝগড়া বাধাইতেছেন, এবং বরাবর বাধাইবেন। কেন না, গবর্ণমেণ্টের এই ভেদনীতিই প্রধান সম্বল। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদন করিতে হইবে। মুখের সদ্ভাব নহে,—চিন্তার, অন্তরের, হৃদয়ের সদ্ভাব। কেন না, ভিতরে বিষ থাকিলে বাহিরে কুফল ফলিবেই।

দেশের সর্ব্বত্র অন্নাভাব, জলাভাব, স্বাস্থ্যের অভাব। পল্লীগ্রামগুলির দিকে সকলে দৃষ্টিপাত করুন।

নারীর অবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। কেবল পুরুষের উন্নতি সম্ভবও নয়, এবং সম্ভব হইলেও, তাহাতে দেশের উন্নতি হইবে না; কারণ নারী দেশের অধিবাসীর অর্দ্ধেক। হইলেও, নারীর নিজের আত্মার জন্য, উন্নতির, জ্ঞানলাভের, ধর্ম্মলাভের, মোক্ষলাভের সকল পথ মুক্ত থাকা চাই। বালবিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে আমাদের সমুদয় আশা-ভরসা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে এবং পরে আরও যাইবে। তাহাদের অনেকে ত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, অধিকন্তু জাতীয় চরিত্র হীন হইয়া যাইতেছে।

হে স্বদেশপ্রেমিক, সকলদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হউন।

যিনি যে প্রকারে পারেন, সাধারণ নিরক্ষর লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকে অন্ততঃ একজন লোককেও শিক্ষাদান করুন।

ভারতবর্ষের প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া কাপুরুষ করা হইয়াছে। তাহার পর এক একটি করিয়া ভারতীয় জাতিকে সিপাহী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। অথচ সকলেরই এই অধিকার থাকা উচিত। বাঙ্গালী ও তেলেঙ্গা আগে সৈন্য হইত; এখন আর হইতে পায় না। মারাঠা ব্রাহ্মণ আর সৈন্য হইতে পারে না। এইরূপে এখন যাহারা সিপাহী হয়, তাহাদিগকেও হয়ত সৈনিক বিভাগ হইতে তাড়ান হইবে। কারণ, ভারতবাসী ছাড়া এশিয়ার আর কোন্ কোন্ জাতি ও আফ্রিকার কোন্ কোন্ জাতিকে সৈন্য করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা সরকার পক্ষ হইতে অনেকবার করা হইয়াছে। তা ছাড়া, যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র যে কামান, ভারতবাসীর তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভারতবাসী খুব ভাল গোলন্দাজ হইত। কিন্তু এখন কেহ গোলন্দাজ হইতে পায় না।

এই প্রকারে যে নানা উপায়ে ভারতবাসীকে পৌরুষহীন করা হইতেছে, ইহার উপায় কি?

যুগান্তরের সম্পাদক বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অকপটতা ও নির্ভীকতার আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি। দেশের

এইরূপ নির্ভীক সেবকের প্রয়োজন। আমাদের স্বাধীন হওয়া একান্ত আবশ্যক, আমরা নিশ্চয়ই স্বাধীন হইব; এবিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত এক মত। কিন্তু তিনি, প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহভরে, ভারতবর্ষ যত শীঘ্র, যত সহজে এবং যে উপায়ে স্বাধীন হইতে পারে, মনে করেন, আমরা তাহা মনে করি না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সমস্যা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বহুশতাব্দীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধে আমাদের মনে ও পায়ে যে বেড়ি পড়িয়াছে, তাহা একদিনে ভাঙ্গিবার নয়। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন, দেশ তাহার জন্য, অন্তরে বা বাহ্য উপকরণে, কোন দিকেই, প্রস্তুত নয়; তাহার কোনই আয়োজন নাই। যখন দুইপক্ষে যুদ্ধ হয়, তখন উভয়পক্ষেই মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্ না করিয়া যে পক্ষ যুদ্ধঘোষণা করে, কিম্বা আপনার কার্য্যপ্রণালী ও জয়লাভের উপায় প্রকাশ করে, তাহাকে লোকে বিচক্ষণ মনে করে না। পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের চেষ্টাও এক প্রকার যুদ্ধ। ইহাতেও মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্যও প্রস্তুত হওয়া চাই, ইহারও আয়োজন চাই। মন্ত্রগুপ্তি কাপুরুষতা নহে, অসময়ে যুদ্ধঘোষণা বীরত্ব নহে, এবং আস্ফালন ত কোন কালেই বীরের ধর্ম্ম নহে। দুঃখের বিষয়, চা'লে ভুল আমাদের অনেকদিন হইতেই হইয়া আসিতেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ যেরূপভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহার দুই প্রকার সার্থকতা আমরা স্বীকার করি। (১) আর কোন উপায়ে না হইলে, শেষে যে উপায়ে ভারত-বাসীকে স্বাধীন হইতে হইবে, এখন হইতে তাহার জন্য ভারতবাসীর মনকে প্রস্তুত করা। (২) কেবল সাহসের জন্যই সাহসিকতা প্রদর্শনেও জাতীয় চরিত্রের উপকার হয়। যেমন মনে করুন, অনেক বৎসর হইতে ইংলণ্ডের ডোভার হইতে ফ্রান্সের ক্যালে পর্য্যন্ত ১৮ মাইল পরিমিত সমুদ্র সন্তরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা সফল হইলে কাহারও কোন লাভ নাই। কিন্তু এবম্বিধ সাহসের কাজে জাতীয় চরিত্রে বীরত্ব সঞ্চারিত, সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



তীর্থসোপানে।

মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক অঙ্কিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩১৪। | ৪র্থ সংখ্যা।

মাষ্টার মশায়।

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়"? বেণু বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশায়, আমি।"

হরলাল কহিল—এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ?

বেণু কহিল—অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানিতাম না।

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—সব ভাল ত? কিছু বিশেষ খবর

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেণ্ডইয়ারেই আট্‌কা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড় লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি ইচ্ছা?

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায় বারিষ্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?

বেণু কহিল—জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত

হরলাল কহিল—চল আমি সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে।

বেণু কহিল—না আমি সেখানে যাইব না।

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে এ কথাটা হরলালের মোটেই ভাল লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খাইয়া আসিয়াছ?

বেণু কহিল—না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না।

হরলাল কহিল—"সে কি হয়?" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া তিনি বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন—বেণু কাজটা ভাল হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।

শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"—বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—রোস, কিছু খাইয়া যাও।

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য-যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কোথায় যাও বাছা!

বেণু কহিল, আমার কাজ আছে আমি চলিলাম।

মা কহিলেন, সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না। এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছুই খাইতেছে না—খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল কিন্তু তোমার পেটে যে এত মৎলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস্ কেস্ করিব তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"—এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল্! ওঠ্!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সে দিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্ত্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল কিন্তু বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে—চৈত্র পর্য্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপে রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত আপন ছেলের মতই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতি বাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতে-ছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূর্ব্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন এখন যদি আমি দুই চার দিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল—যেমন করিয়া হৌক্ বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই!

হরলাল কহিল—অধর বাবু কি যাইতে দিবেন?

বেণু কহিল—আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যে রকম মায়া বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল—কি কৌশল?

বেণু কহিল—আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

হরলাল কহিল—তোমাকে টাকা ধার দিবে কে?

বেণু কহিল—আপনি পারেন না?

হরলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আমি!—তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল—কেন আপনার দরোয়ান ত তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।

হরলাল হাসিয়া কহিল—সে দরোয়ানও যেমন আমার টাকাও তেমনি।

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।

বেণু কহিল—আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।

হরলাল কহিল—তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় ত দিতেও পারেন।

বেণু কহিল—বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন ত টাকা দিবেন না কেন?

তর্কটা এই খানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া টাকা দিতাম। কিন্তু একা মাত্র অসুবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপ

বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। সৌখীন ধুতি চাদরের বদলে নধর শরীরে পার্সি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙ্গুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, একি.ব্যাপার? এত রাত্রে এ বেশে যে?

বেণু কহিল—পর্শু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছু দিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল পৃথিবীতে গরীব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল এমন একটা বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাজ করিতে পারিল!

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল এই আংটি গুলি আমার মায়ের।

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, বেণু খাইয়া আসিয়াছ?

বেণু কহিল, হাঁ,—আপনার খাওয়া হয় নাই?

হরলাল কহিল, টাকা গুলি গণিয়া আয়রণ চেষ্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।

বেণু কহিল, আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম, মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।

হরলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আমি চট করিয়া খাইয়া আসিতেছি।

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত স্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক সময়ে ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, আর নয় দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।

হরলালের মা কহিলেন—বাবা আজ রাত্রে এইখানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—না মা এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।

হরলালকে কহিল—মাষ্টার মশায়, এই আংটি ঘড়ি গুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক্‌। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল।

বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনি আয়রন সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা থলিতে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্ব্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্ধুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভাল ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল—বেণুর মা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দ্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচি গুলি কালো পর্দ্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কি একটা ভাঙ্গিয়া পর্দ্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জান্‌লায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, কি বাবা উঠিয়াছিস্?

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বাবা, আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে?

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলা লোহার সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া প্যাক বাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল—দুই তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি। থলেগুলা লইয়া সিন্ধুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল। একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলি বাতি উস্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভাল বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমার খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের

গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেই জন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিষ—এ আমারই জিনিষ।" এছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুই খানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দু'খানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও একতিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে—সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা কোথায় গিয়াছিলে?

হরলাল বলিয়া উঠিল—মা তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।—বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

[illegible] চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল—মা, তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন,—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, হরলাল, বাবা হরলাল।

হরলাল কহিল, মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও!

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল—বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।

হরলাল ভিতর হইতে কহিল—আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।

দরোয়ান কহিল—তবে কখন যাইবেন?

হরলাল কহিল—সে আমি তোমাকে পরে বলিব।

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল—এ কথা বলি কাহাকে? এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব?

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তারমালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এওত চুরি! এওত বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাও বাবা।

হরলাল কহিল—অধর বাবুর বাড়িতে।

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন ঐ যে হরলাল

কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না।

হরলাল কহিল—না।—বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধর বাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই তিন জন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল—অধর বাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।

অধর বাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল!

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল—আমারি সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি না হয় উঠি!

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—আঃ বোস না!

হরলাল কহিল—কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।

অধর। ব্যাগে কি আছে?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাষ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ বুঝি? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বক্‌শিষ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ! হয়ত পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ! এ ধার আমি শুধিব না!

হরলাল কহিল—আমি ধার দিই নাই।

অধর কহিলেন—তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে! তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?

হরলাল সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—উঁকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন?

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল আজ মফস্বলে গেলে না কেন?

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল কহিল—তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেল ?

হরলাল—"জানি না"—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল—টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ীর সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সাম্‌নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে হরলাল, কি হইল রে ?

হরলাল কহিল—মা, টাকা চুরি গেছে।

মা কহিলেন—চুরি কেমন করিয়া যাইবে ? হরলাল এমন সর্ব্বনাশ কে করিল !

হরলাল কহিল—মা, চুপ কর।

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—এ ঘরে রাত্রে কে ছিল ?

হরলাল কহিল—দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—সাহেব আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে ? আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না !

সাহেব বাঙ্গলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা !

হরলাল কহিল, মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ ? বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি !

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস্ নাই।

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন; সত্য করিয়া বল ব্যাপার খানা কি ?

হরলাল কহিল—আমি টাকা লই নাই।

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ?

হরলাল কহিল, আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।

বড়সাহেব কহিলেন—দেখ হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোন জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোন কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুসি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘদিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয় স্থান তাহাই এক মুহূর্ত্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হইয়া উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোন বিদ্বেষও নাই, কিন্তু

প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; ঠিকাগাড়ি ভর্ত্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকানা পড়িয়া দাও,—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোন প্রভেদ নাই, সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আফিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভর্ত্তি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোন তাড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে কখন বা একবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রুর চক্ষু মেলিয়া শিকার-লুব্ধ দানবের মত চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্য্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোন লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?"

হরলাল কহিল "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জান্‌লার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমুহূর্ত্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে ত একটা ভয় মাত্র, সে ত সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না;—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাট-

রূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল—বাবু ঘোড়া ত আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বল!

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না!

"কোথায় যাইতে হইবে" হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদর্শ সতী বিবি রহিমা।

উপরে যে সতী মহিলার নাম লিখিত হইল, ইনি ধর্ম্মাবতার আয়ুব নবীর অন্যতমা সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ইঁহার জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, বিধাতা নারীজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তই জগতীতলে এই সাধ্বী রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহার ন্যায় পতি-হিতৈষিণী ও পতিগতপ্রাণা রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে ঐশ্বরিক লীলায় স্বামী একান্ত হীনবস্থা ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিয়া কিরূপ অকৃত্রিম প্রেম ভক্তি সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাই লিখিত হইতেছে।

তুরস্কের সিরিয়া প্রদেশে আয়ুব নবীর বাসস্থান ছিল। নির্জ্জনে নিবিষ্টচিত্তে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দৈনন্দিন উপাসনা করিয়া ইঁহার জীবিতকাল পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইনি কোন জনপদ বিশেষের অধীশ্বর ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও কৃতিত্ব এত অধিক ছিল যে, সার্ব্বভৌম নরপতি ইঁহার নিকট অম্লানচিত্তে মস্তক অবনত করিতেন। কথিত আছে আর্য্য আয়ুবের হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যা চত্বারিংশৎ সহস্রের অধিক ছিল। আর এই সকল পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিমাণাধিক ভৃত্যাদিও ছিল। গচ্ছিত ধন যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইনি যেমন অগণিত ধনসম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, দানাদি সৎকার্য্যে ইঁহার হস্ত সেইরূপ মুক্ত ছিল। কথিত আছে আর্য্য আয়ুব প্রতিদিন দশজন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও দশজন বস্ত্রবিহীনকে বস্ত্র দান না করিয়া অন্নাহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তায় আয়ুবের সুযশোগীতি সর্ব্বত্র সর্ব্বজনবিশ্রুত ছিল। এজন্য অগণ্য অতিথি অহর্নিশ ইঁহার পুণ্যভবনে পানভোজনের নিমিত্ত সমাগত হইত। আয়ুব নবী ধর্ম্মশাস্ত্রের একজন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন; এজন্য শত শত অন্তেবাসী তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া নিয়ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় কালহরণ করিতেন। ইহার উপর অসংখ্য করিসেবক, অশ্বপালক, উষ্ট্ররক্ষক ভৃত্যগণের উচ্চ কোলাহলে আয়ুব নবীর বহির্ভবন নিয়ত মুখরিত হইত। মহামতি আয়ুব ক্রমে চারিজন ধনাঢ্যা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের গর্ভে আয়ুবের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য যে, এই সকল স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণের সেবার্থ শত শত দাস দাসী অন্তঃপুরে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত। বস্তুতঃ সুখের সময় সদস্য, মিত্র, স্ত্রী ও ভৃত্যগণের আনন্দ-কোলাহলে আয়ুবভবন "আনন্দ ভবন" বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

কাল-বৈচিত্র্যে ঈদৃশ পরম ভাগ্যবান আয়ুব যারপরনাই হীনাবস্থ হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ অনৈমিত্তিক কারণে অল্প দিনেই তাঁহার পূর্ণ ধনভাণ্ডার শূন্য হইল। উপযুক্ত

পারিশ্রমিক না পাইয়া পশ্বাদি সংরক্ষক ভৃত্যগণ ক্রমশঃ স্থানান্তরে যাইতে লাগিল; সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাভাবে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া তাঁহার গৃহপালিত পশুসকল দিন দিন বিনষ্ট হইতে লাগিল। অন্তঃপুরস্থ পরিচারিকাগণ প্রভু ও প্রভুপত্নীগণের শোচনীয় দশা দেখিয়া স্থানান্তরে উপজীবিকার অন্বেষণে বহির্গত হইল। প্রিয়তম শিষ্যগণ উপাধ্যায়কে শ্রীহীন দেখিয়া বিষণ্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুখের সময় যে সকল মিত্র-কুটুম্ব পারিপার্শ্বিক রূপে আয়ুবপার্শ্বে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেন, অতঃপর তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে আয়ুব নবীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তাঁহারা সকলেই "মোক্তেব খানা"য় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। নবীবর আয়ুব একদা উপাসনায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, "মোক্তেব" মন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইয়া তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণ একসঙ্গেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপে অল্পকাল মধ্যে আয়ুব নবীর আনন্দভবন মহাশ্মশানে পরিণত হইল এবং তিনি কেবলমাত্র পত্নীচতুষ্টয়সহ মহাশ্মশানের ইন্ধনরূপে এই শ্মশাননিকেতনে থাকিয়া দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময় পতিপরায়ণা রহিমাই কেবল নবীবরের শোকদুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন; রহিমা স্বামীর এতাদৃশ শোকাতীত ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মর্ম্মাহত হইলেন বটে; কিন্তু আশ্চর্য্যরূপে আত্মদমন করিয়া নিরন্তর শোকসন্তপ্ত স্বামীর চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন "বিপদ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়", হৃতসর্ব্বস্ব ইষ্টজন-বিয়োগ-বিধুর আয়ুবের ভাগ্যে ক্রমশঃ যেন তাহাই ফলিতে লাগিল। উল্লিখিত নিদারুণ দুর্দ্দশার উপর তিনি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার বিষময় বীভৎস স্ফোটক উদ্ভূত হইয়া এবং অল্পদিনেই পাকিয়া তাহা হইতে অতি দুর্গন্ধ পূঁয ও ক্লেদ নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে আয়ুব স্ফোটক-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন এবং ক্রমশঃ এত দুর্ব্বল ও বিকল হইয়া পড়িলেন যে, স্বেচ্ছায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সামর্থ্য রহিল না। তাঁহার দেহজাত রক্ত পূঁয ও ক্লেদের বিকট দুর্গন্ধ, প্রথমে গৃহময় তৎপর পল্লীময় পরিব্যাপ্ত হইল। এই হেতু যে সকল করুণহৃদয় প্রতিবেশী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার রোগযন্ত্রণায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা আর তাঁহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন না। অধিক কি এই সময় আয়ুব নবীর অপরা স্ত্রীগণ তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আসিতেও যারপর নাই ঘৃণাবোধ করিতে লাগিলেন। কেবল পরমাসতী রহিমাই এই দুঃসময়ে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর মুমূর্ষু স্বামীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

রহিমা বিজাতীয় দুর্গন্ধ অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া স্বামীর দেহোদ্ভূত পূঁয রক্তাদি প্রতিদিন সাত আটবার পরিষ্কার করিয়া দিতেন। শরীরজাত ক্লেদে পরিধানবসন দূষিত হইলে স্বহস্তে স্বামীকে বস্ত্রান্তর পরিধান করাইতেন। যখন আয়ুব স্ফোটক-যন্ত্রণায় শয্যাতলে পতিত হইয়া ছটফট্ করিতেন, তখন রহিমা গলদশ্রুলোচনে স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেন। ক্ষুধার সময় পথ্য রন্ধন করতঃ স্বহস্তে তুলিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন। স্বামীর কোনরূপ বিশেষ অসুখ বা অভাব উপস্থিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া ভীষণ কালরাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায় যাপন করিতেন। কথিত আছে, রহিমা এইরূপে অসহনীয় ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া চারিবর্ষ কাল নিয়ত স্বামিসেবা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পীড়ার উপশম হইল না।

ইহার পর আয়ুব নবীর উৎকট পীড়া আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। স্ফোটক সকল গলিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া শরীরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইল। হস্ত পদাদির মাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় নবীবর আয়ুবের অন্য তিন পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পিতৃভবনে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে আয়ুব রহিমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়তমে! আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া একে একে সকলেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল; বিধাতা এ দুরদৃষ্টে আরও যে কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার নিমিত্ত এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল দুর্ব্বিষহ ক্লেশ নিরাপত্তিতে সহ্য করিয়াছ, নারীকুলের কেহই সেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে নাই। আমি রোগ-যন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার অনিদ্রা ও অনাহার জনিত কষ্ট অনুভব করিয়া

তদপেক্ষা বিষমতর ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতেছি। অতএব আমি প্রহৃষ্ট চিত্তে বলিতেছি, তুমিও কিয়ৎকালের জন্য পিতৃগৃহে গমন করিয়া আত্মদুঃখের অপনোদন কর।" এই সকল কথা বলিয়া আয়ুব, রহিমার মুখপানে অনিমেষ দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন। পতিময়াত্মা রহিমা মুমূর্ষু পতির বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া ভগ্নহৃদয়ে কহিলেন—"নাথ! চিরসেবিকা অধীনীকে আজি এতাদৃশ অভাবনীয় নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি অজ্ঞাতসারে সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ক্রটী করিয়া থাকি, তাহা কি ক্ষমার যোগ্য নহে? নাথ! ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছি, কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে পতিসেবাই সতীর একমাত্র কার্য্য; পতি আরাধনাই সতীজীবনের নিত্যব্রত। পতিসেবাই সতীর প্রধান ধর্ম্ম এবং পতির চরণতলই সতীর স্বর্গ। ফলতঃ পতিই সতীনারীর চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রদাতা। যে নারী সুসময়ে স্বামীসুখের অংশভাগিনী হয়, আবার দুঃসময়ে পরিত্যাগ করিয়া সুখান্তরের চেষ্টা করে, সে নারী 'বারযোষা' নামের যোগ্যা। ইহকালে তাহার অপকীর্ত্তি দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিনী হয় এবং পরকালে সে অনন্তকাল নিরয়াগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। প্রভো! ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মহতী বাণী দাসীর হৃদয়কক্ষে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব চরণকিঙ্করীকে পিতৃভবনে গমনের কথা বলিয়া আর অধিক মর্ম্মাহত করিবেন না। আপনি মনে করিয়াছেন, অন্যান্য সপত্নী-গণের ন্যায় আমিও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া জনকাবাসে গমন করিব; কিন্তু নাথ! এরূপ কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। আপনাকে ঈদৃশ উৎকট সঙ্কটে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্ প্রাণে কোন্ সুখে পিত্রালয়ে অবস্থান করিব? পরলোকেই বা ঈশ্বরসমীপে কি উত্তর দান করিব? আর অধিক কি বলিব, আমি আপনার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ঈদৃশ বিষমতম বিপদে পতিত রাখিয়া সপত্নীগণের ন্যায় পিত্রাবাসে বা স্থানান্তরে প্রাণান্তেও গমন করিব না। কেবল দয়াময় পরম পিতার সন্নিধানে আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা ও চরণ সেবা করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিব।" প্রেরিত মহাপুরুষ আয়ুব মূর্ত্তিমতী সতীর এই সকল অমৃতায়মান প্রেমপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পীড়িতাবস্থাতেই অননুমেয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে আয়ুব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষ-কৃমির উদ্ভব হইল। তিনি অসামান্য সহিষ্ণুতাগুণে এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত নিদারুণ রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বিষকৃমির বিষদংশনে একান্ত অধীর হইয়া উচ্চ চীৎকারে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিগণ তাঁহার গলিত মাংসের দুর্গন্ধে ও ভীষণ চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া আসিবার পরামর্শ করিল। রহিমা প্রতিবাসিগণের এই নিদারুণ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া স্বামিশোকে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বামীকে স্ববাসে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ প্রতিবাসী সকলের চরণ ধরিয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এক প্রকার মাদুর যানে করিয়া সৌভাগ্যভ্রষ্ট আয়ুবকে গ্রামান্তরে লইয়া চলিল। তখন রহিমা অনন্যোপায়ে হৃদয়ভেদী আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ছায়ারূপে হৃদয়েশ্বরের অনুগমন করিলেন। প্রতিবাসিগণ নবীবরকে যে গ্রামে রাখিয়া আসিল, তাহার অধিবাসীরা কতিপয় দিন মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে দূরবর্ত্তী অন্য এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। কথিত আছে নবীবর আয়ুব মাদুরাসনে আরূঢ় হইয়া এইরূপ সপ্ত গ্রামে নীত হইলেন। রহিমাও একান্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্ত গ্রামে গমন করিলেন। নবীবর অবশেষে যে গ্রামে নীত হইয়াছিলেন, তদ্‌গ্রামবাসী কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি যুক্তি করিয়া তাঁহাকে এক জনশূন্য প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিল। রহিমা শোকে, দুঃখে ও অপমানে উন্মাদিনী হইয়া মুমূর্ষু স্বামীর সহিত বিজনপ্রান্তরে নির্ব্বাসিতা হইলেন। এইস্থানে একের অমানুষিক যাতনা এবং অপরের অমানুষিক পতিভক্তি লোকশিক্ষার চরম সোপানে পদার্পণ করিল।

নারীজনদুর্লভ পাতিব্রত্যের সহিত মিতব্যয়িতা বিবি রহিমার অপর এক সদ্‌গুণ ছিল। সম্পদকালে স্বামী তাঁহাকে যে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অসার ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া সমস্তই সঞ্চয় করিয়া

রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে স্বামী যখন সর্ব্বস্বান্ত ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পরমা সাধ্বী রহিমা এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঔষধ ও পথ্যাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়ুব দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় লোকালয়ে অবস্থানকালেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া রহিমা দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর পথ্যাদির কোনরূপ সংস্থান করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি উপায়ান্তরাভাবে বুভুক্ষিত ও ব্যাধিজর্জ্জরিত স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। সতীশিরোমণি রহিমা স্বামীকে বৃক্ষতলে রাখিয়া ভিক্ষার্থে প্রতিদিন চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে যাইতেন এবং সমস্ত দিন অতি বিনীতভাবে স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া খাদ্যদ্রব্য যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে স্বামীর জীবন রক্ষা করিতেন। রহিমা দীর্ঘকেশী এবং সুকুমারবপুশালিনী ছিলেন; এজন্য লোকালয়ে পরিভ্রমণ কালে তিনি সময় সময় ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। গ্রামবাসী নীচাশয় পামরেরা তাঁহাকে অসহায়া বোধে বহুবিধ অশ্রাব্য ব্যঙ্গোক্তি করিতে ক্রটী করিত না। রহিমা পাপিষ্ঠদিগের বাক্যবাণে ও বিগর্হিত ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইতেন বটে, কিন্তু যখন মনে করিতেন, চিরব্যাধিগ্রস্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট স্বামীর পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অদৃষ্টে এতাদৃশ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে, তখন সমুদয় দুঃখ নিমেষে ভুলিয়া যাইতেন।

একদা রহিমাদেবী, দিনমান স্বজাতীয় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোনও স্থানে এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাইলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ্বাস হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক পৌত্তলিক গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্ত্তা তখন বাটীতে ছিল না। তাহার স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়া স্বকীয় অদীর্ঘ কেশরাশির বিন্যাস করিতেছিল। রহিমাকে মলিন বেশে আগত৷ দেখিয়া কহিল,—"তুমি কি জন্য আমাদের বাটীতে আসিয়াছ?" রহিমা স্বামীর আদ্যন্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া সকাতরে কহিলেন —"মাতঃ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পতির দৈনিক পথ্যের সংগ্রহ করিয়া থাকি। অদ্য সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ কোনস্থানে এক মুষ্টি ভিক্ষাও পাইলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করিয়া অদ্যকার জন্য আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" মন্দবুদ্ধি গৃহস্থ-পত্নী রহিমার শিরোভূষণ অতি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম দেখিয়া পাপাশায় প্রলুব্ধ হইয়া কহিল,—"যদি তোমার মস্তকের কুন্তলরাশি কর্ত্তন করিয়া আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত ভিক্ষাদান করিব।" রহিমা কহিলেন, "মাতঃ! এই কেশরাশি আমার মস্তকে দেখিতেছেন বটে; কিন্তু ইহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমার স্বামী ইহার একমাত্র অধিকারী; বিশেষতঃ তিনি সুদীর্ঘ কাল হইতে উৎকট রোগযন্ত্রণায় উত্থানশক্তিবিরহিত হইয়াছেন। সুতরাং অনন্যোপায়ে এই কেশগুচ্ছ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া দৈনন্দিন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি এক্ষণে ইহা আপনাকে কর্ত্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে তাঁহার বিধিমত উপাসনা কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত করা হয়। অতএব আপনি কুন্তল প্রাপ্তির আশায় নিরস্ত হউন।" পাষাণময়ী মহিলা কহিল, "আমি তোমার অন্য কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করিনা; যদি তুমি আমার বাসনা পরিপূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। নতুবা রিক্তহস্তে আজি স্বামিসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।" পতিগতপ্রাণা রহিমা তাহার ঈদৃশ অনুচিত পরুষবাক্য শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর স্বামীর সমস্ত দিনব্যাপী উপবাসের কথা মনে করিয়া অগত্যা পৌত্তলিক রমণীর বিগর্হিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেই হ্রস্বকেশা নীচাশয়া নারী 'পরচুলা' পরিধানে স্বীয়সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার মানসে রহিমা দেবীর ভ্রমরগঞ্জিত সুদীর্ঘ কুন্তলরাশি স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া লইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক দিনের উপযোগী ভিক্ষা দিয়া বিদায় প্রদান করিল। রহিমা মুণ্ডিত মুণ্ডে ভিক্ষা লইয়া স্বামী সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য উপকরণ সহ অতি সত্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া বুভুক্ষিত স্বামীর ক্ষুধা ক্লেশ নিবারণ করিলেন। কথিত আছে রহিমা দেবী এইরূপে অসহ্য অপমান ও দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া অনন্য মনে সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্ত

স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এক দিনের নিমিত্তও আত্মসুখে দৃষ্টি বা কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই।

অষ্টাদশ বর্ষ পরে ঈশ্বরানুগ্রহে ক্রমশঃ আয়ুব নবীর উৎকট ব্যাধির উপশম হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিষকৃমির দংশন জ্বালা হ্রাস হইয়া আসিল, তৎপর ক্ষতস্থান সকল হইতে রক্ত পুঁজ পড়া বন্ধ হইল ও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া তত্রত্য মৃতচর্ম্মাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল স্থানের মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান পুনরায় নবমাংসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বসন্তের প্রারম্ভে নব পত্রের উদ্গমে বৃক্ষাবলীর যেরূপ লালিত্য বৃদ্ধি পায়, নবীবর আয়ুব দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তদনন্তর চিরসহায়া পত্নীসহ তরুতল পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্ববাসস্থানে উপস্থিত হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সতীকুলবরণীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া রহিমা দেবী এতকাল যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী, বিজনপ্রান্তরবাসিনী ও অবশেষে পথের ভিখারিণী হইয়া ছিলেন, যাঁহার জন্য সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল অশ্রুতপূর্ব্ব ক্লেশপরম্পরা অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে সেই জীবনসর্ব্বস্ব হৃদয়ারাধ্য পতিকে রোগবিমুক্ত ও নবকান্তিপূর্ণ দেখিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সৈয়দ সিরাজী।

পেকিন রাজপুরী।

সম্রাটের নিজের হস্তে কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও রাজ্যের সমস্ত ঘটনা ও রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয়গুলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, এবং রাজ্যের মঙ্গলকামনার্থ যখন যে ঘটনা ঘটে তাহার বিস্তারিত সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন রাজকার্য্যে নিজের বিশেষ কোন মত তিনি প্রকাশ করেন না। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী যে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তাহা তিনি বিশেষ অবগত আছেন, তবে বৃদ্ধার রক্ষণশীল মত, তাই রাজ্যের সংস্কারকার্য্য মৃদু-গতিতে চলিতেছিল। কিন্তু এইক্ষণ তিনিও বুঝিয়াছেন ও অপরেও জানিয়াছে যে বৃদ্ধারাণী সম্প্রতি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, চীনসাম্রাজ্যের উন্নতি না করিয়া তিনি কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। এইক্ষণ তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় জল প্রবেশ করিয়াছে যে, সংস্কার ভিন্ন চীনসাম্রাজ্য বিদেশীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

সম্রাট চীনরাজ্যের সমস্ত দূষিত রীতি নীতি, আইন-কানুনগুলি সংস্কার করিয়া ইউরোপীয় রাজ্য সকলের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে তাঁহার জীবনে সমর্থ হইবেন কিনা, কে বলিতে পারে? কিন্তু এযাবত সেই জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আছেন। ফল ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত।

রাজপুরীর ভিতরে যে হ্রদ আছে সেই হ্রদের সম্মুখে তাঁহার প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদ সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পরিপাটী। তাঁহার নিজ অন্তঃপুর বৃদ্ধারাণীর পুরী হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহার অন্দরমহলে স্বতন্ত্র খোজা ও পরিচারিকাদি কার্য্য করিয়া থাকে। প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি তাঁহার সেই জগদ্বিখ্যাত জেঠী মা, মাসি মা ও ধর্ম্মমাকে প্রণাম করিয়া, পরে দুই জনে একত্রে রাজসভায় গমন করেন। রাজকার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি নিজের কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কোন উৎসবোপলক্ষে নাট্যাভিনয় হইলে, রাজকীয় বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন করেন, এবং বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে অন্যান্য মহিষীগণ সমভিব্যাহারে কখন কখন উদ্যানভ্রমণে গমন করিয়া থাকেন, এবং সময় সময় নৌকারোহণে হ্রদে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া থাকেন। বৃদ্ধারাণী যেমন নাট্যাভিনয় দেখিতে ভালবাসেন, সম্রাট তাদৃশ নহে। কিছুকাল অভিনয় দর্শনের পরই তিনি হয়ত উঠিয়া গিয়া পুস্তকাগারে পুস্তক পাঠ করেন। না হয় একাকী ধূমপান করেন। ইংরেজীভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁহার অধিক মনোযোগ। নানা গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার অতি দৃঢ় মনোযোগ লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি নাকি প্রত্যহ একখানি পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার গ্রন্থাদি খরিদ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার একজন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী আছে। যখন যে নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাহা তাঁহার জন্য খরিদ

করা হইয়া থাকে।* ইহা ভিন্ন তিনি বিদেশী ভাষা হইতে অনেক পুস্তক চীনভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকেন। এই অধ্যয়ন কার্য্য ভিন্নও তিনি নানা গৃহকার্য্যে মন দিয়া থাকেন।

সম্রাট বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। নানাপ্রকার চীনদেশী বাদ্য-যন্ত্র এবং বিলাতী পিয়ানো পর্য্যন্ত বাজাইতে পারেন। বাজনার সুর ও তাল বোধ তাঁহার বিলক্ষণ আছে। ঘড়ি ইত্যাদি সংস্কার কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষ। প্রকাণ্ড ঘড়ি-গুলি খুলিয়া পুনরায় তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি যথা-স্থানে যোজনা করিতে তিনি বেশ পটু। একবার সম্রাট একটা ঘড়ি নাকি খুলিয়া তাহা পুনরায় যোজনা করিতে পারেন নাই,* সেই জন্য বৃদ্ধারাণী তাঁহার কোন প্রিয় ঘড়ি সম্রাটকে নাড়াচাড়া করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

সম্রাট কোয়াংশু অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন। এই অভ্যাস অন্যান্য আমীর চীনাগণের অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত! বড় বড় চীনারা প্রায়ই ৮৷৯টা বেলা না হইলে শয্যাত্যাগ করে না। সম্রাট কখন কখনও রাত্রি ২টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। যখন পূর্ব্বপুরুষগণের সপিণ্ডীকরণ বা পার্ব্বন শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তখন শেষ রাত্রিতে গ্রীষ্মাবাস পরিত্যাগ করিয়া, পেকিনে পৌছিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় অপরাহ্নে গ্রীষ্মাবাসে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি যুবতী রমণীগণের সঙ্গ ভালবাসেন না। অপর সুন্দরী রমণীগণকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রাজপ্রাসাদে তাঁহার প্রিয়পাত্রের সংখ্যা অধিক নাই। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন।

সম্রাট অপেক্ষা সম্রাজ্ঞীর সম্মান রাজপুরীতে অধিক। কেন না মহারাণী সম্রাটের "পূর্ব্বপুরুষ" (ancestor) বা গুরুজন বলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে মহারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে সম্রাট তাঁহার পার্শ্বে নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। যখন দুইজনে একত্র কোথায়ও গমন করেন, তখন সম্রাট বৃদ্ধা-রাণীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়া থাকেন। সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে তাঁহাকে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কেবল আহারকালে একসঙ্গে টেবিলপার্শ্বে উপবেশন করিয়া আহার করিয়া থাকেন।

সম্রাজ্ঞী যখন একাকিনী আহার করেন, তখন তাঁহার চামচ, ভোজনপাত্র, খাদ্যপাত্রের আবরণ, আহার্য্য মুখে তুলিবার কাদাফা (Chop Stick) প্রভৃতি রৌপ্যময়, কিন্তু সম্রাটের সঙ্গে আহার করিতে হইলে স্বর্ণময় দ্রব্যসকল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সম্রাটের প্রাসাদের দিকে তাঁহার অন্তঃপুরের বাহিরের অপর কোন রমণী দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না, এমন শুনা যায়।

সম্রাট নিজে উদ্যানে ভ্রমণকালে অপর কোন মহিলা তাঁহার সঙ্গে থাকে না। যদি কখনও নবীন সম্রাজ্ঞী তাঁহার সঙ্গে যাইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পরিচারিকাগণ সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। যখন বিদেশী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি-গণকে দরবার গৃহে আহ্বান করা হয়, বৃদ্ধারাণী সেই দরবার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্রাট নাকি এ সকল বড় ভাল বাসেন না। ইহার কারণ জানা যায় নাই। তবে কি তিনি বিদেশীকে ঘৃণা করেন? কে বলিতে পারে?

নবীন সম্রাজ্ঞী।

বর্ত্তমানে পেকিন রাজপুরীতে মহিলাগণ মধ্যে বৃদ্ধারাণীর নিম্নেই নবীন সম্রাজ্ঞীর পদমর্য্যাদা। তিনি অতি বিনয়ী সদ্ভাবসম্পন্না এবং পরম সুন্দরী রমণী। ইনি মাঞ্চু সৈনিক পরিবারের ডিউক চাও নামক একজন জেনেরালের কন্যা। উক্ত জেনারাল বৃদ্ধা মহারাণীর এক ভ্রাতা। তাঁহার মাতাও প্রাচীন রাজবংশের এক মহিলা ছিলেন। একদিকে সম্রাট যেমন বৃদ্ধারাণীর দেবর পুত্র ও ভগ্নী পুত্র, অপর দিকে নবীন সম্রাজ্ঞী বৃদ্ধারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। রাজপুরী মধ্যে এই তরুণী সম্রাজ্ঞীর, তাঁহার পিসীমা ও শাশুড়ীর নিকট বেশ প্রতিপত্তি আছে। এবং ইনিও চীন ভাষায় একজন সুশিক্ষিতা রমণী। দেশের রীতি অনুসারে বালিকাবস্থায় সম্রাটের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম না থাকায় উভয়কেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ১৮৮৯ খৃঃ সম্রাট নিজহস্তে রাজ্যশাসন ভার লইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। এই রাণী সম্রাট অপেক্ষা তিন বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা।

নব রাণীর চাল চলন বৃদ্ধারাণীর সদৃশ। ইনি উচ্চে পাঁচ ফুটের কম। হস্ত পদগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অতি সুন্দর।

তাঁহার মুখমণ্ডল অতি লাবণ্যময়, চক্ষু ছুটি চীনাকৃতির, বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর মত নহে। মুখখানি অপেক্ষাকৃত বড়, তাঁহার মেজাজ ও চাল চলন অতি মনোরম। তাঁহার চক্ষের ভাবে দয়া প্রকাশের চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর মত তিনি সুচতুর ও দক্ষ সম্রাজ্ঞী হইবেন কি না তাহা বলা কঠিন। তবে এইরূপ শুনা যায় যে বৃদ্ধা মহারাণী যখন সম্রাট কোয়াংশুর হস্তে রাজ্যভার দিয়া অবকাশ গ্রহণ করেন, সেই কালে এই নবীনা মহারাণী রাজপুরীর অন্দর মহলের সমস্ত কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই নবীনা রাণীই সম্রাটের পাটরাণী, তাঁহার নিম্নেই দ্বিতীয়া মহিষীর স্থান। এই দ্বিতীয়া মহিষী একজন গবর্ণর জেনেরালের কন্যা। এই দ্বিতীয়া মহিষীকে যখন সম্রাটের পত্নীরূপে নির্ব্বাচন করা হয়, তখন ইনি নাকি অতি সুন্দরী ছিলেন, এবং এখন অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়ায় সেই প্রথম কালীন সৌন্দর্য্যের অনেকটা লাঘব হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু ছুইটী খুব বড়, এবং পাটল বর্ণ, শরীরের বর্ণ শ্বেত, নাসিকাটী কিঞ্চিৎ চাপা, মুখখানি বড় কিন্তু দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার স্বভাব নাকি অতি উৎকৃষ্ট। তিনি বিশেষ চতুর বা কৌশলী নহেন। রাজপুরীর অপর মহিলাগণের সঙ্গে তাঁহার নাকি বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। এই সকল সত্ত্বেও পাটরাণী, দ্বিতীয় মহারাণীকে নাকি অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকেন। রাজবাটীর মধ্যে অপর রাজকুমারী বা মহিলাগণ অপেক্ষা এই দ্বিতীয়া মহিষীকে, পাটরাণী অধিকতর সম্মান ও যত্ন করিয়া থাকেন। সম্মানে রাজপুরীতে দ্বিতীয়া মহিষী তৃতীয়স্থানীয়া। পাটরাণী যেখানেই যাইবেন তাঁহার সঙ্গে তিনিও গমন করিয়া থাকেন। সপত্নীবিদ্বেষ ভারতবর্ষে যেমন বিখ্যাত, চীনদেশে তাহার বিপরীত। চীনদেশে কোন ব্যক্তির চারি পাঁচ পত্নী থাকিলেও তাহাদের সমাজের ও শিক্ষার এমনই গুণ, যে তাহাদের পরস্পরের অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা কলহ নাই। আমাদিগের দেশে যেমন বিমাতা সপত্নী পুত্রকে হিংসা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে, এ দেশে সে ভাবও লক্ষিত হয় না। প্রথমা পত্নী অপর অপর সতীনের পুত্র কন্যাদিগকে আপন পুত্র কন্যার মত ভালবাসিয়া থাকে। বাহিরে রাষ্ট্র যে সম্রাটের না কি বহু পত্নী ও উপপত্নী আছে, কিন্তু মিস্ কার্ল বলেন সে কথা সত্য নহে। সম্রাটের মাত্র দুইটী মহিষী।

সম্রাটের পাটরাণীর সখীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই রাজবংশসম্ভূতা কুমারী এবং রাজকুমারগণের বিধবা পত্নী। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সখী বা সহচরী "সি-গার্গা" (Fourth Princess)। ইনি বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স চিংএর কন্যা। এই মহিলা এইক্ষণ বিধবা। ইঁহার বয়স এখন প্রায় ২৪ বৎসর। টিন্‌সিনের (Tintsin) মাঞ্চু গবর্ণর জেনেরালের পুত্র ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি এত সুন্দরী যে পৃথিবীর যে কোন সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ইহাঁর তুলনা করা যাইতে পারে। সম্ভ্রান্ত সন্তানহীন বিধবা মহিলাগণের ন্যায় ইনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

এই স্থলে চীনদেশী বিধবাগণ সম্বন্ধে কুমারী কার্ল লিখিয়াছেন যে "চীনদেশী বিধবাগণ কখনও বিবাহ করে না। এরূপ করিলে তাহাদের জাতি যায় এবং খ্যাতি নষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় বিধবাগণকে যেমন তাহাদের স্বামীর চিতার উপর বলিদান করা হইয়া থাকে অর্থাৎ পোড়াইয়া মারা হইয়া থাকে, চীনদেশে তাদৃশ নহে। তবে চীনদেশে বিধবাগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিলে, তাহাদের এই কার্য্যকে চীনদেশে এখনও গৌরবের কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।"

এস্থলে মিশ্ কার্লের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম, তাহাতে তাঁহার চীনদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় যে নানা ভ্রম প্রমাদ থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তিনি লিখিয়াছেন যে চীনদেশী স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ করে না। এ কথা সত্য নহে। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই এই স্থানের অনেক বিধবার বিবাহের সংবাদ জানিয়াছি; এবং খাস পেকিননিবাসী একটী চীনা কেরাণী এখানে কাষ্টম আফিসে কার্য্য করেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলিলেন শত শত বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কথা এই যে চীনদেশে বিধবা বিবাহের বিধি আছে বটে, তবে যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা ভাল এবং দুই একটী পুত্র আছে তাহারা প্রায়ই বিবাহ করে না। তাহারা বিবাহ করিলে লোকচক্ষে কতকটা নিন্দনীয় হ



চীনদেশের টেঙ্গিয়ের বিধবাদিগের স্মারক তোরণ

উপহাসাস্পদ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জাতি যায় না। চীনদেশে জাতিভেদ নাই, সকলেই এক জাতি। সম্মানের হানি হইতে পারে। তা এরূপ সম্মানের হানি সকল দেশেই অল্পাধিক হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের মুসলমানগণের বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিলে তাহাকে নিকা বলে, এবং নিকায় কবিলা, বিবাহতে কবিলার তুল্য সম্মান পায় না। তাহাদের ছেলেরাও বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলের মত সম্মান পায় না। বোধ করি ইউরোপেও এই দুইয়ের মধ্যে সম্মানের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। তবে ব্রহ্মদেশে ও ইউরোপে এই বিধবা বিবাহ ব্যাপার যেমন শিথিল এদেশে তাদৃশ নহে। নিয়ম কিছু কড়া।

কুমারী কার্ল চীনদেশী বিধবাগণ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলে গৌরবান্বিত হয় বলিয়াছেন। আমাদের দেশে "সতীর" গৌরব ঐরূপ। আমাদিগের দেশের "সতী"-গণও অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেন বা করিয়া থাকেন, কেহ জোর করিয়া চিতার উপর তাঁহাদিগকে বলিদান করে না। মাঞ্চু রাজপরিবারের মধ্যে দেখিয়া যদি তিনি সমস্ত চীন রাজ্যের সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

আমাদিগের দেশের বিধবাগণের ও এদেশের বিধবা-গণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ ব্রহ্মচারিণী সাজিয়া আজীবন থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের পরিধানে সেই একখানি সাদা কাপড়; আভরণশূন্য দেহে, দিনান্তে একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, ও সামাজিক আনন্দ উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া মরণের দিন পর্য্যন্ত কাটাইতে হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রখর রৌদ্রের তাপে একাদশীর দিন তৃষ্ণায় গলা ফাটিয়া গেলেও এক বিন্দু জলও মুখে দিলে নরকগামিনী হইতে হইবে ভয়ে, অস্থির অবস্থায় কাটাইতে হয়। তবে দেড় বৎসর বয়স হইতে ১০।১২ বৎসর বয়সে যাহারা বিধবা হয়, তাহারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উপর এই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা অনেক স্থলে করা হয় না। কিন্তু দেড় হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের বিধবার সকলেরই একই দশা! আমাদিগের দেশের বিধবা-গণ যে এত কঠোর সাধন করিয়া আজীবন অতিবাহিত করেন, এ জীবনে তাহার পুরস্কার তাঁহারা কি পাইয়া থাকেন? পুরস্কারের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে পরের মুখ নাড়া ও কটু বাক্য সহ্য করিয়া একখানা সাদা কাপড় ও দিনান্তে আধ সের চাল্ লাভ হয়! তাঁহারা যে সর্ব্ব সুখ ত্যাগী হইয়া এত কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন পাত করেন, হিন্দু সমাজে তাঁহাদের সেই মহত্ব উপলব্ধি করিবার ও সহানুভূতি দেখাইবার শতকরা একজন লোক আছেন কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে চীনদেশী বিধবাগণ যাহা খুসি পানাহার করিতে পারে এবং যথারীতি বস্ত্রাভরণ ব্যবহার করিতে পারে এবং সামাজিক উৎসবেও যোগদান করিতে পারে। কোন কোন স্থলে বিধবা চীনা রমণীগণের গাউনের বর্ণের কতকটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। সে পার্থক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তাহারা মাত্র এক স্বামী সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবার এ দেশে পুরস্কার কি? এ দেশের বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ না করিয়া এই পুরস্কার পান যে তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদের নামের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকে। যে রমণীর আত্মীয়গণ অর্থশালী নহে, তাহাদের স্মরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য গ্রামবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া থাকে। আর এক কথা, আমাদের দেশের আট দশ বৎসরের বিধবা বালিকা স্বামীকে কখনও চেনে না অনেকের কবে কাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া-ছিল তাহাও জানে না কিন্তু এ দেশের কুমারীগণ সতর আঠার বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে বিবাহিতা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা সকলেই অল্পাধিক কাল পর্য্যন্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারে। এই দুই দেশের বিধবাগণ মধ্যে কত পার্থক্য, পাঠক এখন অনুমান করুন।

যে সকল বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করে না, তাহাদের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ "বিধবার স্মৃতি-তোরণ" (Widow's memorial arch) নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই স্মৃতি-তোরণ গ্রামের সম্মুখে সদর রাস্তার উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নির্ম্মাণের উপাদান কাষ্ঠ বা প্রস্তর। তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে বিধবাগণের নাম ধাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিবার জিনিষ বটে। আমাদিগের বাসার নিকট রাস্তার উপর ঐ প্রকার একটী "বিধবার স্মৃতি-তোরণ" নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা কাষ্ঠময়, উচ্চে প্রায় ত্রিশ ফুট

হইবে তাহার মধ্য দিয়া তিনটী পথ। প্রধান পথটী সদর রাস্তার উপর দিয়া এবং তাহার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী পথ। এই স্মৃতি-তোরণ এমনি শিল্পনৈপুণ্যে নির্ম্মিত, নানাবর্ণে ও সোনালিবর্ণে রঞ্জিত যে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ইহার ভিতর দিয়া যাইতে আসিতে উভয় দিকের নির্ম্মাণ প্রণালীই অবিকল একরূপ। দুই পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুরঞ্জিত দুইখানি কাষ্ঠফলক বা সাইনবোর্ড। তাহার নিম্নে তোরণ-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণমণ্ডিত চীনা অক্ষরে বিধবাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ। ইহাকে চীনা ভাষায় (Phie fang) ফাই ফাং বলে। ইহার একখানি ফটো পাঠাইলাম। এই ফটো দেখিয়া ইহার সৌন্দর্য্যের বা কারুকার্য্যের কিছুই বুঝা যাইবে না।

বিধবাগণের ন্যায়, যে সকল রমণী চিরকুমারী হইয়া জীবন পাত করিতে পারে, তাহাদের চীনদেশে আরো সম্মান। ঐ সকল সতীগণের স্মরণচিহ্ন স্বরূপও উক্ত প্রকারের স্মৃতি-তোরণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এইরূপ গৌরবান্বিত হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এরূপ সতীর সংখ্যা অল্প। আমাদিগের দেশের বিধবাগণ এদেশী বিধবাগণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ—সন্দেহ নাই—তবে "বেঁধে মার সে খুব সয়।"

চীনদেশে বালকবালিকাগণের বিবাহের সম্বন্ধ অতি অল্প বয়সে স্থির হইয়া থাকে। তিন চারি বৎসর বয়স হইতে ৮.১০ বৎসর বয়স মধ্যে অনেক পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ স্থির হইয়া চুক্তি পত্র লিখিত হইয়া থাকে। ষোল সতের বৎসরে উপনীত না হইলে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইতি মধ্যে পাত্রী মারা গেলে পাত্রকে অন্য পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, কিন্তু পাত্র মারা গেলে পাত্রীর বিবাহে গোল উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে এই প্রকার বাগ্‌দত্তা অথচ অবিবাহিতা কন্যাকে বিধবা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। কন্যার ভাবী স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর থাকিলে তাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কেবল কোন কোন স্থলে ঐ অবিবাহিতা অথচ বালবিধবাকে চিরকাল বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে হয় কিন্তু সর্ব্বত্র সকল সমাজে এই প্রকার নিয়ম পালন করা হয় না। বাগ্‌দত্তা অবিবাহিতা কন্যার ভাবী স্বামীর মৃত্যু হইলে ঐ বালিকাকে শোকচিহ্ন ধারণ করিতে হয়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক সকল বিধবা হইলে যেমন সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া আজীবন শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, এ দেশেও প্রথম প্রথম তিন বৎসর যাবৎ সাদা পোষাক কোন কোন স্থলে পরিয়া থাকে। তাহার পর নীল বর্ণের বা ভায়োলেট্ বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। আমাদিগের বিধবাগণ যেমন লাল বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন না, এ দেশের যে সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করে না তাহারাও লাল বা সবুজ বর্ণের পোষাক ব্যবহার করে না।

মিশ্ কার্ল লিখিয়াছেন যে এই প্রকার বাগ্‌দত্তা অবিবাহিতা কন্যাগণের ভাবী স্বামী মারা গেলে তাহারা আজীবন বৈধব্য দশায় থাকিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। তাহা সত্য নহে। এ অঞ্চলে অর্থাৎ ইউনান্ প্রদেশে, গোয়েজো, ছি-জোয়ান, হোনান প্রভৃতি প্রদেশে এ প্রথার চলন নাই। যুবতীগণ বিধবা হইলেও অধিকাংশ স্থলে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করে না, তাহারা এক একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশী বিধবাগণ যেমন সিঁদুর কপালে পরিতে পারেন না, পান খাইতে পারেন না, এদেশী বিধবাগণ মুখে পাউডার লেপন কার্য্য হইতে বঞ্চিত থাকেন। এবং লাল বর্ণের পরিচ্ছদ পরেন না।

নব সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে সচরাচর তাঁহার আট জন পরিচারিকা বা সখী থাকেন। কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে পরিচারিকার সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধা মহারাণীর ধর্ম্মকন্যা রাজকুমারী যখন রাজপ্রাসাদে থাকেন, তখন তিনি সমস্ত রাজকুমারীগণের শীর্ষস্থানীয়ারূপে গণ্যা হইয়া থাকেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা দুই নব সম্রাজ্ঞীর নিম্নে কিন্তু অপর সকল মহিলাগণের উপরে। রাজপুরীতে যত মহিলা আছেন তাহাদের প্রায় সকলেই পরস্পরের সঙ্গে ঔদ্বাহিক সম্বন্ধে বা রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ।

রাজপুরীর মধ্যে সম্রাজ্ঞীগণের পরিচর্য্যা করিবার জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পরিচারিকা আছে। বাহিরের লোকে তাহাদিগকে বাঁদী বা ক্রীতদাসী মনে করিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহারা ক্রীতদাসী নহে। প্রতি বৎসর বসন্ত কালে সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যক মাঞ্চুসৈন্যগণের নিম্নশ্রেণীর

লোকেরা, তাহাদিগের বয়স্থা কন্যাদিগকে রাজপুরীতে আনয়ন করিয়া সম্রাজ্ঞীগণের পরিচর্য্যার জন্য উপহার প্রদান করিয়া থাকে। রাজপুরীর প্রধান খোজা প্রথমতঃ এই সকল বালিকাগণের মধ্য হইতে সুন্দরীগণকে বাছিয়া বৃদ্ধা মহারাণীর কাছে সংবাদ দেয়। সম্রাজ্ঞী সকলকে দেখিয়া যাহাকে যাহাকে লইতে হইবে লইয়া অবশিষ্ট সকলকে বিদায় দিয়া থাকেন। এই সকল বালিকাগণের বয়স দশ হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা দশ বৎসর কাল পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজপুরীতে বাস করে। এই সকল বালিকা যশের সহিত কার্য্য করিলে দশ বৎসরান্তে তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া তাহাদের পিত্রালয়ে পাঠান হইয়া থাকে। এই যুবতীগণের অবস্থোন্নতির জন্য তাহাদের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহারা রাজপুরীতে বাস কালে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং অতি ভদ্র ভাবে সুখে দিন যাপন করিয়া থাকে।

এই সকল দাসীরূপী তরুণী পরিচারিকাগণ ভিন্ন, রাজপুরীতে আরো কতকগুলি অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোক বাস করে। ইহারা অল্পবয়স্কা পরিচারিকাগণের চালকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। যে সময়ে, যে স্থানে, যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা ইহারা তরুণীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকে। এই সকল নবীনা পরিচারিকাগণ রাজকুমারীগণের সঙ্গে অতি আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে।

কোন মহিলার বা সম্রাজ্ঞীর প্রথমা পরিচারিকা তাঁহার টেবেলের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য, কর্ত্রী যখন উঠিয়া গমন করেন, পরিচারিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে এবং এক কক্ষে ঐ পরিচারিকা তাঁহার কর্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করিয়া থাকে। এই প্রধান পরিচারিকার এক মুহূর্ত্তের জন্য আপন কর্ত্রী ছাড়া থাকিবার নিয়ম নাই। এই সকল পরিচারিকাগণের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার পাইয়া গমন করিয়া থাকে এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজসরকার হইতে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধা মহারাণীর একটী চীনা বৃদ্ধা পরিচারিকা আছে। মহারাণী এক সময়ে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ পরিচারিকা তাহার মায়ের স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধা মহারাণীকে পান করাইয়া সুস্থ করিয়াছিল। এই উপকারের জন্য মহারাণী ইহার নিকট বড় বাধিত। এই রমণীর পা বাঁধা ছিল। মহারাণী বাঁধা পার বিরোধী, তাই তাহার পা খুলিয়া দিয়া বিকৃত পদদ্বয়ের উপযুক্ত চিকিৎসা করাইয়া কতকটা স্বাভাবিক ধরণের করিয়াছেন। সে এইক্ষণ মুক্ত পদে চলিতে শিক্ষা করিয়াছে। মহারাণী এই রমণীর একটী পুত্রকে শিক্ষা দিয়া রাজকীয় দপ্তরে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল সরকার।

বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান।

আজ হইতে প্রায় সপ্তশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অবসান কালে সুবিখ্যাত বখ্‌তিয়ার খিলিজী (১) সপ্তদশজন মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া বাঙ্গলায় প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু ইহার পর আরও প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ অব্যাহত প্রভুত্বে শাসন চালাইতেছিলেন। বস্তুতঃ পাঠানাধিকারে বঙ্গবিজেতা মুসলমান সামন্তগণ বিজিতরাজ্যের অনেকাংশ জায়গীর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শাসন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা দিল্লীর অধীনতাশৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রভুত্ব চালাইতে থাকেন। তবে এই স্বাধীন পাঠান রাজবর্গ সমগ্র বঙ্গে কখনও একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, অনেক হিন্দু সামন্ত (বিশেষত প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে) প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন।

পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল ভুমি, পঞ্চকোট এবং বিষ্ণুপুর মুসলমানাধিকারের শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ এমন কি মেদিনীপুর এবং হিজলীও বহুদিন উড়িষ্যার গজপতি হিন্দুরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। পাঠানরাজত্বের শেষভাগে সুলেমান কররাণীর সেনাপতি সুপ্রথিত কালাপাহাড় তাহা উড়িষ্যার সহিত মুসলমান-

(১) সি, আর, উইলসন্ প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদই এই অভিযানের নেতা। সময় সম্বন্ধেও বিবিধ বিশ্বাস দেখা যায়। মতান্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দেই ইহা ঘটিয়াছিল।

শাসনাধীন করেন। পশ্চিমে বেহার প্রদেশ সময়ে সময়ে মাত্র পাঠান রাজগণের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহা লইয়া দিল্লীসম্রাটের সহিত বিবাদ ঘটে। উত্তরে কামতা-রাজ্য হোসেন শাহের সময়ে অধিকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগনিচয়ে কোচ্‌বংশীয় রাজগণ বহুদিন যাবত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। পূর্ব্বভাগে ভুলুয়া (বর্ত্তমান নওয়াখালি) এবং চট্টগ্রামে মুসলমান, ত্রিপুরা এবং আরাকান রাজ্যের মধ্যে প্রায়শ বিবাদ চলিত। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারে যায় বটে, কিন্তু ত্রিপুরা, কাছাড়, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে কখনও মুসলমানাধিকার বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল ও পাঠানদিগের শক্তিসংঘর্ষ চলে। অদ্যাপি পল্লীবাসীর ক্রীড়াপটে সেই মোগল-পাঠান প্রতি-যোগিতার কাল্পনিক স্মৃতি অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্তু অবশেষে মোগলবংশাবতংস আকবর শাহ রাজা মান-সিংহের সাহায্যবলে পাঠানবল দমন করিয়া বঙ্গভূমি অধিকার করেন। এই সময়ে যশোহরভূমে অমিতবিক্রম প্রতাপা-দিত্য হিন্দুরাজ্য স্থাপন মানসে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মানসিংহের বাহুবলে তাহা অকালে বিধ্বস্ত হয়।

শাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গের আরও অনেক নূতন স্থান মোগল সম্রাটের অধীনতাভুক্ত হয়। বঙ্গের পূর্ব্ব-ভাগবর্ত্তী চট্টগ্রাম ও আরাকানরাজের কবলমুক্ত হইয়া মোগলের অধিকারে গিয়াছিল। পরে যদিও কিছুকালের জন্য ইহা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়, কুটনীতিবিশারদ আওরঙ্গজেবের সময়ে কিন্তু স্থায়িরূপে অধিকৃত হইয়াছিল (১)। পরে ইনি যখন সাম্রাজ্যবৃদ্ধি লালসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া দক্ষিণাপথ বিজয়ে প্রাণপণে লাগিলেন, তখন এ দিকে শোভাসিংহ, রহিম শাহ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া প্রায় সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিয়া বসেন। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ নিতান্ত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তদীয় দুর্ব্বলতাবসরে ভূষণার সীতারাম নামে জনৈক কায়স্থপ্রবর স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করেন। তিনি রীতিমত দুর্গনির্ম্মাণ, নগর পত্তন ইত্যাদি করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁর সুযোগ্য পুত্র জবরদস্ত খাঁর শৌর্য্যবলে এবং নবীন সুলতান আজিমুশ্বানের শঠতায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু সীতারামকে সহজে দমন করা গেল না। অনন্তর নবাব মুর্শীদকুলীখাঁর প্রবল প্রতাপে সীতারাম সপরিবারে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন, এবং অতি নিষ্ঠুররূপে তদীয় জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মহারাজা প্রতাপা-দিত্যের পরে হিন্দু অভ্যুদয়ে একমাত্র সীতারামের নামই উল্লেখযোগ্য। মোগলের অমিত প্রভুত্বেও হিন্দুসমাজ এই দুই স্বদেশহিতৈষীর পুণ্যস্মৃতি ভুলিতে পারে নাই, অদ্যাপি তাঁহাদের নাম স্মরণে গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।

অতঃপর বাদশাহ পরিবারে গৃহবিবাদ অনেক গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদিগের সহিত আর কোনও সংঘটন ঘটে নাই। পরিশেষে ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ পলাশীষড়যন্ত্রে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই যোগ ছিল। তবে ইহা ঠিক যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর কেবল শাসন কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা বিজিত রাজ্যে ধর্ম্মবিস্তারেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদিও ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের কপোল কল্পিত "মুসলমানদের এক হস্তে কৃপাণ—অপর হস্তে কোরাণ লইয়া কৃতান্তের বেশে ধর্ম্মপ্রচার" কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মবিস্তারপ্রয়াস কখনই অস্বীকার করা যায় না। জনৈক মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (১), "বাঙ্গলায় মুসলমানবিস্তার—আদিমনিবাসী হিন্দুগণ সামাজিক কঠোর বিধিব্যবস্থা অসহ্য বোধে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া যেরূপ পুষ্ট করিয়াছে, মোগলশোণিতে ততদূর হয় নাই।" তাঁহার অবশিষ্ট উক্তির সারমর্ম্ম এই;—

'১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজির আগমন হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী লাভ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশতাব্দীকাল ধরিয়া বাঙ্গলা মুসলমান শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা সৈয়দ, মোগল ও আফগান-দিগকে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং পণ্ডিত ও

(১) কিন্তু চট্টগ্রামে বর্ত্তমান মুসলমানদের অধিকাংশ বাণিজ্য ও অপরাপর কার্য্যোপলক্ষে আগত আরবদিগের বংশধর। (A. S. B's J., p. 287).

(১) "The Origin of the Muhammadans of Bengal" by Khondkar Fuzli Rubbee, Messrs. Thacker Spink & Co., Calcutta, 1895.

ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জায়গীর প্রদান করিতেন। উত্তরকালে এই সকল জায়গীরের অনেকাংশ পুনর্গ্রহণ করা হইলেও প্রধানত রাঢ়দেশে ইহার প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। অনেক পরগণা এবং গ্রামের পারসী নাম রহিয়াছে। মুসলমান নরপতিদিগের স্বাধীন শাসন সময়ে (১৩৩৮—১৫৭৬ খৃঃ) বঙ্গদেশ উত্তর ভারতীয় মুসলমানদিগের আশ্রয়স্থান ছিল। গোরীবংশের পতনের পর মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের সময়ে এদেশে অনেক ধর্ম্মগুরু প্রেরিত হন। তাঁহাদের অনেকে অত্রত্য ঐশ্বর্য্য এবং ভূমির উর্ব্বরতার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় মুসলমান বিস্তার ঘটিয়াছে।'

ময়মনসিংহের মুসলমানাগ্রণী শ্রীযুক্ত গজনবীমহোদয়ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু তিনি বলেন, "মোটামুটি বলিতে গেলে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের শতকরা ২০ জন বিদেশীয় মূলোৎপন্ন এবং ৫০ জন তাহাদের শোণিতে মিশ্রিত, অবশিষ্ট ৩০ জন ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু ও অপরাপর জাতির বংশধর।" এইরূপ আরও অনেকে অনুমান করেন যে, মুসলমান সমাজের অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু হইতে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ পোদ, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দু এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে এইশ্রেণার মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ অধিক, প্রাচীন মুসলমান পরিবার তেমনি বিরল।

এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে রাজপুতেরা পাঠান বংশে স্থান লাভ করেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণও পাঠান দলের অধিকার-ভুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি পাইয়া থাকেন। বিহার প্রদেশে কোন কোন উচ্চ বংশীয় হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে সেখ আখ্যায় পরিচিত হন, এবং উচ্চ শ্রেণীর সেখদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধও চলে। কিন্তু নীচশ্রেণীস্থ হিন্দুরা মুসলমান সমাজেও সহজে সম্মান লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে নামান্তর ঘটে, তাহাতে পূর্ব্বনামের যথাসম্ভব আভাস থাকে। যথা,—শ্যামাচরণ মুসলমান ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমসের উল্লা নাম পায়। অনন্তর অবস্থার উন্নতির সহিত উপাধিও পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়। কথায় বলে,—

" আগে থাকে উল্লা, তুল্লা, শেষে হয় উদ্দিন ;
তলের মামুদ উপরে যায়, কপাল ফিরে যেদিন।" (১)

পরন্তু অনেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পায়। গোপাল মণ্ডল, কালাচাঁদ সেখ প্রভৃতি নাম অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়।

উপরিলিখিত বিবরণী ও অন্যান্য বহুতর প্রমাণ পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, যথার্থ ধর্ম্মলোভে মুসলমান সমাজে আকৃষ্ট উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা অতি কম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালাপাহাড়, হুসেন সাহ, এবং মুর্শীদকুলী খাঁর ন্যায় দৈব ঘটনাবশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্বারভাঙার অন্তঃপাতী পর-শোনির বর্ত্তমান রাজপরিবার এবং চট্টগ্রামের এলেকাধীন বড় উঠানের জমিদার আসদ্‌আলী খাঁদের পরিবারের নাম করা যাইতে পারে। বাখরগঞ্জে কতকগুলি মুসলমান আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। মগেরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করাতে, তিনি জাতিবহির্ভূত হন, তাই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ যাহারা উচ্চ সমাজে অবজ্ঞেয়, প্রধানত তাহারাই মুসলমান সমাজ পরিপুষ্ট করিয়াছে। তবে ইহাও বিরল নহে যে, অনেক চরিত্রভ্রষ্টা হিন্দু বিধবা ও কৌলীন্যপীড়িতা ব্রাহ্মণকন্যা মুসলমান উপপতির অঙ্কশায়িনী হইয়া এবং অনেক দুশ্চরিত্র হিন্দু যুবক মুসলমান যুবতীর প্রণয়ফাঁদে পড়িয়া ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে।

আরও একটী কারণে বঙ্গে মুসলমান সমাজ সহজে সুপুষ্ট হইয়াছে, মনে হয়। হিন্দুগণ হইতে মুসলমানদের বংশ বৃদ্ধির অনুপাত সর্ব্বত্রই অধিক। এমন কি পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় দ্বিগুণ এবং ছোটনাগপুরে প্রায় দেড় গুণ।

---

(১) অধুনা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদেরও অনেকে পূর্ব্ব পুরুষানুসৃত বংশগত উপাধি বদলাইয়া কুলীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।—

" বাপ পিতা মোর লিখিত 'দে,' কেটে করলেন 'দাস' ;
অবশেষে 'দাসগুপ্ত,' বৈদ্য জাতে পাশ।"

ইত্যাদি উদাহরণ কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিলে যথেষ্টই হস্তগত হয়।

(২) Beveridge's History of Backergunge, p. 340.

সমষ্টিটায় গড় ধরিলে দেখা যায়, শতকরা হিন্দু ৪, এবং মুসলমান ৭·৭ করিয়া বাড়ে। বোধ হয় এতাদৃশ তারতম্যের মূলে নিম্নোক্ত কারণ দুইটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। প্রথম কথা, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে, অনেকেরই সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা অকালে বদ্ধ হইয়া রহে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা হিন্দুবিধবা শতকরা গড়ে ১৬ জনেরও অধিক, কিন্তু মুসলমানবিধবা ১২ জনের বেশী নয়। ইহাদের মধ্যে চরিত্র নষ্ট হইলে হিন্দু-বিধবা সমাজশাসনে ভ্রূণহত্যায় বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে মুসলমান বিধবা প্রণয়ীর জেনানা মধ্যে স্থান লাভ করে এবং সন্তান প্রসবেও ক্ষমতা পায়। দ্বিতীয়ত মুসলমানদিগের খাদ্যগুলিও অধিকতর বলবৃদ্ধিকারক এবং তাহাদের বাসস্থানগুলিও সন্তানবৃদ্ধির অনুকূল। ইত্যাদিতেই সম্ভবত এদেশে মুসলমান-সংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত (১৯০১ খৃঃ) আদমসুমারীমতে বাঙ্গালার ৭,৮৪,৯৩,৪১৩ অধিবাসীর মধ্যে ২,৪৭,৮১,০৩৮ পুরুষ ও ২,৪৯,০৬,৩২৪ স্ত্রীলোক লইয়া ৪,৯৬,৮৭,৩৬২ হিন্দু এবং ১,২৮,৫৫,৮১৮ পুরুষ ও ১,২৬,৩৯,৫৯৮ স্ত্রীলোক লইয়া ২,৫৪,৯৫,৪১৬ মুসলমান। তন্মধ্যে—

	হিন্দু।	মুসলমান।
পশ্চিম বঙ্গ ...	৬৮,৫৫,১৬৪	১০,৮৭,৮২০
মধ্য " ...	৩৮,৮৩ ৩৬৭	৩৭ ৭৩,৩২১
উত্তর " ...	৩৯,৩৮,৫২৬	৫৮,৭৬,৪০৮
পূর্ব্ব " ...	৫৫,১৪,০২৫	১,১২,২০,৪২৭
উত্তর বিহার ...	১,১৫,৭৯,৫৩৩	২২,৪১,৯৪২
দক্ষিণ " ...	৬৯,৬৩,৫৮০	৭,৪৪,৫০৮
উড়িষ্যা ...	৪০,৩৪,৬৫৭	১,০২,৯৮১
ছোট নাগপুর ...	৬৯,১৮,৫১০	৪,৫১,০০১

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান সমষ্টি—২,৩০,২১,০৬৪; অতএব সমগ্র ভারতে ৪,৮৫,১৬,৪৮০ জন মুসলমান আছেন।

কিন্তু বাঙ্গলার এই সার্দ্ধ দুই কোটিরও অধিক সংখ্যক মুসলমানগণের অবস্থানকাহিনী জটিল রহস্যাচ্ছন্ন। যে বিহারভূমিতে তাঁহারা প্রথমে পদার্পণ করেন, বঙ্গদেশের তুলনায় তথাকার মুসলমান অধিবাসী অত্যন্ত কম। মুঙ্গের ও ভাগলপুর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মুসলমানপ্রধান নগর। কিন্তু সেই সকল স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা দশমাংশ মাত্র। উড়িষ্যায় এককালে পাঠানদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এক্ষণে তথায় শতকরা ২½ জন মাত্র মুসলমান। খাস বাঙ্গলাতেও—মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সন্নিধানে অনেক মুসলমানের বসতি আছে, এবং এই সকল জিলায় বহু জায়গীর ভূমিখণ্ডও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের তুলনায় এ স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। পূর্ব্ববঙ্গে দুই তৃতীয়াংশ এবং উত্তরবঙ্গে তিন পঞ্চমাংশ মুসলমান। তন্মধ্যে শতকরা—চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে ৭১, পাবনায় ৭৫, নোয়াখালীতে ৭৬, রাজসাহীতে ৭৮ জন করিয়া মুসলমান অধিবাসী রহিয়াছে; আর হিন্দুর অধিবাস এ সকলের কোথায়ও শতকরা ২৫ জনের অধিক নহে। বগুড়াতে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১৮ জন মাত্র, অবশিষ্ট ৮২ জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। অথচ এই সকলের কোনটি মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। ঢাকা প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া নবাববাহাদুরদিগের আবাস ছিল, কিন্তু এক ফরিদপুর ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর স্থানাপেক্ষা ঢাকার মুসলমানের সংখ্যা কম। এবং মালদহ ও মুর্শিদাবাদে প্রায় সার্দ্ধচতুঃশতাব্দীকালব্যাপী মুসলমান রাজধানী ছিল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলা হইতে মুসলমান বিরল। পরন্তু উত্তরকালে বাঙ্গালায় পাঠান প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইলেও এ দেশে পাঠান সংখ্যা কমে নাই। উপরোক্ত মুসলমান সংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালায় ৪,২৩,৭৪০ পাঠান, ১৮,৬৭৮ মোগল, ২,৩৬,৪৬৮ সৈয়দ এবং অবশিষ্ট সকলেই সেখ। আবার সেখদিগেরও অনেকে সুবিধা পাইলে পাঠান বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

সে যাহা হউক, প্রায় সপ্তশতাব্দ্যধিক কাল ধরিয়া একত্রাবস্থাননিবন্ধন হিন্দু মুসলমানের ভিতর যে গভীর মৈত্রীভাব ক্রমেই জমিয়া আসিতেছে, তাহা সভ্যতাদৃপ্ত প্রতীচ্যভূমিতে একধর্ম্মাবলম্বী জাতিদ্বয়ের মধ্যে আশাও করা যায় না। সেই যখন মুসলমানজেতা, হিন্দু বিজিত ছিল, তদবধি এই ভাব সঞ্জাত; এবং প্রতিবেশী হিন্দুমুসলমান পরস্পরের আপদ বিপদে পরস্পরের সাহায্য করায় ক্রমশঃ ইহা পুষ্টতর হইয়াছে। অবশ্য এই প্রীতিস্থাপনের মূলে রাজপুরুষের সহানুভূতিও অল্প সাহায্য করে নাই। বহুবধি

ইতিহাস দেশের বিস্তারিত বিবরণ জানাইতে পারিতেছে, তখনকার সুবিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের সময় হইতে আমরা হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমান রাজগণের সম্প্রীতির নিদর্শন পাইতেছি। প্রথমে—

"যে হুসেন শাহ সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে,
দেবমূর্ত্তি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে"

(চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

তিনি শেষকালে হিন্দুদিগকে এতাদৃশ উদারচক্ষে দেখিতেন যে, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে পরিদৃষ্ট হয়, যে তিনি চৈতন্যপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন এবং গোপীনাথ বসু—ওরফে (সুলতান দত্ত উপাধি) পুরন্দর খাঁ তদীয় প্রধান সভাসদ ছিলেন। হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া সেই সভায় হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যেরও প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" লেখক মালাধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তদানীন্তন বঙ্গভাষার লেখকগণ তাঁহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা হইতেও তদীয় উচ্চহৃদয়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

"পদ্মপুরাণে" বিজয় গুপ্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হুসেন শাহকে 'সনাতন,' 'নৃপতিতিলক' প্রভৃতি উচ্চ গৌরবযুক্ত বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন,। "পদাবলী"কার—

"শ্রীযুত হুসেন, জগতভূষণ, সোহ এ রস জান;
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।"

বলিয়া স্বকীয় বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। আর হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত 'পরাগলী মহাভারতে' কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন—

"নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার॥"

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁ সেনাপতি পদে বৃত হইলে তিনিও পিতার দৃষ্টান্তে শ্রীকর নন্দীকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করাইয়াছিলেন। নন্দী কবিও হুসেন শাহের গৌরব বর্ণনায় স্বীকার করিয়াছেন—

"নসরত শাহ তাত (১) অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥"

সুলতানের সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহও উদারনৈতিক পিতার আদর্শে "ভারত পাঞ্চালী" রচনা করাইয়াছিলেন।

অনন্তর মোগলকুলতিলক মহামতি আকবর শাহের নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য। তদীয় উদারচরিত্রে হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থ একসূত্রে মিলিত হইয়া রাজদণ্ডকে এক নূতন শক্তি প্রদান করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ তদীয় সমদর্শিতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া সমপ্রাণে রাজসিংহাসন ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ততোধিক বিস্ময়ের কথা, সম্রাট স্বয়ং বিজেতৃসুলভ অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া, হিন্দুচরিত্রের ভক্তি, বিশ্বাস, শান্তিপ্রবণতা প্রভৃতি মহৎভাবগুলিকে উদারভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এবং নিজেদের ধর্ম্মান্ধতা ও তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা শান্ত না হইলে বা হিন্দুপ্রীতি না পাইলে সাম্রাজ্যের কুশল আশা বিড়ম্বনা—ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদুপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফৈজী, আবুলফজল, নেজামুদ্দিন প্রভৃত উদারনীতিক মন্ত্রীগণেরও অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সম্রাটের পোষকতা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মন্ত্রণা সমভাবে সংযোগ করিয়া রাজবিধি সমূহ প্রণীত হইতেছিল; আর তৎ সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর প্রতি অবিচার এবং পুরাগত কুসংস্কারাদি প্রায় একরূপ বিদূরিত হইল। সেই বিজাতীয় রাজসাহায্যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনাদি অনূদিত হইল। এবং রাজা মানসিংহ প্রধান সেনাপতি, রাজা টোডরমল্ল প্রধান রাজস্বসচিব ও রাজা ভগবানদাসপ্রমুখ আরও অনেক হিন্দু উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এমন কি, আত্মাভিমানী রাজপুতগণ 'আচারবর্জ্জিত ম্লেচ্ছের' প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া বৈবাহিকবন্ধনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেই সুযোগে রাজান্তঃপুরেও নবভাব সঞ্চারিত হইল। এক কথায়—রাজ্যমধ্যে প্রজাবর্গের সাধারণ এক

(১) চট্টগ্রামে নসরত শাহের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এ নিমিত্ত পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

নবধর্ম্ম প্রচারিত হইল,—সকলেই এককণ্ঠে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" গাহিতেছিলেন।

প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া এই উদার নীতি চলিতে থাকে, পরে আওরঙ্গজেবের সময়ে স্রোত পুনরায় ফিরিয়া গেল। এই হিন্দুবিদ্বেষের ফল বাদশাহ নিজেই ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণে অশ্রান্তকর্ম্মা মহারাষ্ট্রীয় মুসলমানের মস্তক অবনমিত করিল, মধ্যদেশের ক্ষত্রিয় ও রাজপুতেরা পুনরায় মস্তকোত্তলন করিল এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জাঠ ও শিখগণ বিজাতীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়া অতুল বিক্রমে নূতন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিল। পরন্তু বাদশাহ আওরঙ্গজেব রাজকার্য্যে হিন্দু কর্ম্মচারী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিই তাঁহার যুদ্ধকার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বিশিষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভূপতি রায় এবং কিশোর রায় নামক দুইজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে তিনি এলাহাবাদ হইতে সঙ্গে লইয়া আইসেন। এখানে প্রথমে ভূপতিকে নিজের সহকারী এবং কিশোরকে প্রধান মুন্সীর কার্য্যে রাখেন, পরিশেষে তাঁহারা খাল্‌সা সেরেস্তার (রাজস্ব বিভাগের) প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রধান কানুন্‌গো দর্পনারায়ণ বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ের অভিজ্ঞতায় অদ্বিতীয় ছিলেন, নবাব সর্ব্ববিষয়ে তদীয় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রঘুনন্দন প্রথম খাল্‌সা দেওয়ান এবং রায় রায়ান্‌। যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ানী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজ্য স্থাপন করেন, এতদ্ভিন্ন কুলী খাঁর সময়ে দলিপ সিংহ, লাহরীমল্ল প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধভার পাইয়াছিলেন, এবং জমিদারদিগের মধ্যেও দয়ারাম, রঘুরাম ও রাজজীবন যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর পরবর্ত্তী নবাবগণও উদারভাবে হিন্দু কর্ম্মচারী পোষণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নবাব সুজাউদ্দিনের প্রধান মন্ত্রী রায় রায়ান্‌ আলমচাঁদ রাজস্বসংগ্রহকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তিনি সরফরাজের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গিরিয়ার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কথা শুনা যায়। নন্দলাল আলিবর্দ্দী খাঁর প্রধান সেনাপতি, রাজা জানকীরাম বিশ্বস্ত মন্ত্রী, তৎপুত্র রাজা দুর্ল্লভরাম উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, রায়রায়ান্‌ চিন্ময় রায় প্রধান রাজস্বসচিব, রাজা রামনারায়ণ পাটনার নায়েব নাজিম এবং বীরদত্ত, উমেদরায়, কীর্ত্তিচাঁদ, গোকুলচাঁদ, রায় চিন্তামণি দাস প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। বৈদ্যবংশসম্ভূত খ্যাতনামা রাজবল্লভ পেস্কারী হইতে আরম্ভ করিয়া নায়েব সুবাদারী পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন; তখন তিনি একরূপ ঢাকায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। রাজারাম প্রসিদ্ধ গুপ্তচর, মাণিকচাঁদ, মোহনলাল, শ্যামসুন্দর লালা প্রভৃতি সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন।

এইরূপে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ দিল্লীর আদর্শ নরপতি আকবরের অনুকরণে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বেশেষে যোগ্যতা বিচারে রাজকর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ হিন্দুকর্ম্মচারীমাত্রেই মন্‌সবদার (সেনানায়ক) ছিলেন, এবং নিম্নতন পদগুলিতেও হিন্দুর প্রবেশ অব্যাহত ছিল। বক্সী, মুন্সী, বিশ্বাস, সরকার, শিক্‌দার, মজুমদার প্রভৃতি নবাবী আমলের পদবী অদ্যাপি হিন্দুসমাজে বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। হায়, যাঁহারা এরূপ উদারভাবে রাজ্যপালন করিয়া গিয়াছেন, বিজেতা হইয়াও বিজিতকে এতাদৃশ নিরপেক্ষ অধিকার ভোগ করিতে দিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ রাজদ্বারে চাকরী ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতেছেন। কত খোসামদ-তোষামোদেও কর্ত্তৃপক্ষের মন নরম করা যাইতেছে না, প্রত্যুত্তরে বরং ভৎর্সনা গঞ্জনাই লাভ হইতেছে। গভর্ণমেণ্টেরই প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায়, সমস্ত বাঙ্গলায় মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা ১,২৮,৪৪৯; অথচ বিংশতিবর্ষাধিক বয়স্ক ৬,৪৩,২৬৭ শিক্ষিত মুসলমান যুবক রহিয়াছে।

পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে যে নিকৃষ্টভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহাতে স্বতই ঘৃণা আসে। ভেদনীতির গর্হিত প্রতারণায় কত অর্থহীন সার্কুলার বক্তৃতায় কেমন "দুয়োরাণী-সুয়োরাণী" আদর, আর কার্য্যকালে যাহা কিছু উদারতার পরিচয়—এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পোষণে! অনেক মুসলমান গভর্ণমেণ্টের তাদৃশ মায়া প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া

ফলে তাহাদিগের অনেককেই Survival of the fittest নীতির তাড়না খাইয়া ফিরিতে হইতেছে। এ যাবত ভারতীয় কোন জাতির প্রতিই কর্ত্তৃপক্ষের তেমন অত্যুদার অনুগ্রহ দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে "উপযুক্ত হও" "উপযুক্ত হও" বলিয়া তারস্বরে হাঁকিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্র মুসলমানদিগের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে তাঁহারা কোন বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন কি?

সুখের বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান সমাজ গভর্ণমেন্টের এ সকল বিদ্বেষভাবগর্ভ স্তোকবাক্যের পরিণাম বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক এবং এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহের নির্লজ্জতা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে। তাহারা নিয়তই শত-সহস্র প্রকারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সেই ঘৃণিত উদ্দেশ্য যে কিছুতেই সংসিদ্ধ হইবার নহে, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বিজিত ও বিজেতা হিন্দু মুসলমান মধ্যে উদারভাবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি, আরও বিস্তর দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখাইতে পারা যায় যে, এই জাতিদ্বয়ের মৈত্রীভাব ক্রমেই গাঢ়তর হইতেছে যে, দুই ধর্ম্ম এককালে গোঁড়ার একশেষ ছিল, আজ উভয়েরই সমাজগ্রন্থি শিথিল হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পূজ্যপাদ ভূদেব বাবু (সামাজিক প্রবন্ধে) লিখিয়াছেন, "ছাপরানগরবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটী সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন,—'মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচারী ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম, এমন মনে করিতে পারি না।' * * * আমি * * এক মৌলবীর সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম, "উওঃ ইয়ে হ্যায়," আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহা বাক্যটি কোনও প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল। * * * এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান, (হিন্দু) জ্যোতির্ব্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান বা সমাদর না করেন—যেখানে গোবধ করিতে কিছুমাত্র কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দু-দিগের পর্ব্বোৎসবে আমোদপ্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহকার্য্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন, বাঙ্গলার ও দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কারণ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সংকল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণসজ্জনের অতিথি-সৎকার করেন।"

এতদ্ভিন্ন প্রায়ই দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাণপাঠ ও কথকতায় অনেক মুসলমান শ্রোতা এবং "ওয়াজের" সময় অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু যোগদান করিতে-ছেন*। বঙ্গভাষায় এ যাবত ষট্‌চক্রভেদ, রাধাকৃষ্ণ লীলা ও শ্যামাবিষয়ক কাব্যরচয়িতা প্রায় ত্রিশ জন প্রাচীন মুসলমান কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের পদাবলী শুনিয়া মুসলমান বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। অনেকের নামও প্রায় হিন্দুর মত। দরাফ্ খাঁর গঙ্গাভক্তি বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। কেবল ধর্ম্মবিশ্বাস নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা হিন্দুসমাজের অনেক অর্দ্ধসংস্কারও গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা প্রভৃতিতে যথাবিধি পঞ্জিকা দেখা হয়, এমন কি, অনেকে কোন কোন বারে বাঁশ কাটিতে সাহস করে না; মারীভয় উপস্থিত হইলে কোন কোন মুসলমান শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পূজাও করিয়া থাকে। এ সমুদয় ছাড়া গ্রাম্যদেবতা পূজা আরও কতই আছে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মিরজাফরের মৃত্যুকালে তদীয় পাপ-মোচনের নিমিত্ত কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন নহে। বিশেষ কি, মুসলমান সাধকদিগের কবরস্থানের (দরগার) প্রতিও তাঁহাদিগের অপরিসীম ভক্তিমত্তা

* গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতসঙ্গীত-সমাজ প্রাঙ্গণ ও অপরাপর জায়গায় "ঈদ" ও অন্যান্য কতিপয় বিশেষ পর্ব্বে হিন্দুমুসলমানের পবিত্র সম্মিলন কি মধুর ও হৃদয়স্পর্শী হইতেছে, তাহা যে না দেখিয়াছে সে কল্পনায় কখনও অনুভব করিতে পারিতেছে না।

রহিয়াছে। ক্ষেমানন্দবিরচিত মনসার ভাসানে পরিদৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষা কবচ প্রভৃতি মন্ত্রপূত সামগ্রীর সহিত একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। তা ছাড়া, হিন্দুগণ তেত্রিশ কোটি দেবতা পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সত্যপীর (১), বদরপীর (২) প্রভৃতি মুসলমান সিদ্ধপুরুষকেও দেবতার আসন দিয়াছেন; এবং আধুনিক অনেক মুসলমান ফকিরও হিন্দুসমাজে সাধু সন্ন্যাসীর প্রায় পূজনীয়। তাঁহাদের স্পৃষ্টজল হিন্দুসাধারণ (ঔষধস্বরূপ) স্বচ্ছন্দমনে পান করিয়া থাকেন। এইরূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের গোঁড়ামি প্রায় নাই। এবং আচার ব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাস অনেক কমিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের স্পর্শে গঙ্গাস্নান করিতেন, নামে দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিতেন, সে সংস্কার এক্ষণে অন্তর্হিত প্রায়। অধুনা ভদ্র মুসলমানের উচ্চবংশজ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির সহিত একাসনে বসিতে কোনও সঙ্কোচ নাই। প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাদা, খুড়া, জেঠা, মামা ইত্যাদি প্রীতি-আহ্বান বিস্তর চলিতেছে।

কেবল বাহ্যভাবে নহে, খাদ্যাদিতেও মুসলমান-সংসর্গে হিন্দুদিগের পরিবর্ত্তন বিস্তর ঘটিয়াছে। মুসলমানের সিদ্ধ চাউল, চূণ, দধি, দুগ্ধ, লেমনেড, সোডাওয়াটার প্রভৃতি সমাজে অসঙ্কুচিতভাবে প্রচলিত। রুটীটা যদিও গোপনে চলে, কিন্তু জানে না এমন কেহই নাই। জবাই করা মাংসের প্রচলন তদপেক্ষা অধিক, এতদ্ভিন্ন কুক্কুট অধুনা বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রথম ও প্রধান পথ্য। রসনার পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত চলিতেছে, এরূপও বিরল নহে। বর্ত্তমানে এই সমস্ত সমাজে জানাজানি হইলে, ভ্রূকুঞ্চনাদি আছে বটে, কিন্তু "পতিত" হয় না। অন্য পরে কা' কথা, যাঁহারা সমাজের অধিনায়কত্বের দাবি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই তাদৃশ পরিবর্ত্তন অধিকতর দ্রুত লক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাক্ এই হিন্দু মুসলমান সম্মিলনে কি কি শুভফল ঘটিয়াছে। বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এতন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ যোগ্য। হোসেনশাহ প্রমুখ মুসলমান নরপতি বঙ্গ সাহিত্যের যে কিরূপ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, পূর্ব্বে তাহা কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। সেই উৎসাহ—সেই আগ্রহ ক্রমে শক্তিলাভ করায় অত্রত্য মুসলমানদিগের মাতৃভাষা ও বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে। গৌড়েশ্বরগণের অনুগ্রহে অনেক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পর পর ক্রমশঃ আলোয়াল, হামিদুল্লা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বঙ্গ ভাষার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক মদীয় সাহিত্যসুহৃদ শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের কৃপায় এক চট্টগ্রামের পরগণাংশ হইতেই শতাধিক প্রাচীন মুসলমান কবির রচনা উদ্ধার হইয়াছে। বঙ্গের অপরাপর স্থানে তাঁহার মত অনুসন্ধিৎসু লেখকের আবির্ভাব হইলে আমরা অন্ততঃ সহস্রাধিক তদানীন্তন মুসলমান কবির সংবাদ পাইতাম।

এই সকল কবিদিগের রচনায় হিন্দুপ্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবদ্দিন তাঁহার 'জামিল দিলারাম' কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্ত ঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষণের চন্দ্রকলা' 'রামচন্দ্রের সীতা,' 'বিদ্যাধরী চিত্ররেখা' ও 'বিক্রমাদিত্যের ভানুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; হিন্দু ও মুসলমানগণ এই ভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে [illegible]

(১) সত্যপীর=হিন্দুসমাজে সত্য নারায়ণ। তাঁহার সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত। যথা, মনসর হালক নামধেয় জনৈক বোগদাদ নগরবাসী সর্ব্বদা "আমি সত্য" "আমি সত্য" বলিতেন। তিনি এই ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কতিপয় গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রক্ত হইতেও এই কথা উচ্চারিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া জ্বালাইয়া ফেলা হয়। ইহাতে সেই চিতাভস্ম হইতেও ধ্বনি উঠিতে ছিল—"আমি সত্য" "আমি সত্য"। কবি রামেশ্বর উর্দ্দুতে সত্য-পীরের বক্তৃতা দিয়াছেন,—

"জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর,
তেরা দুঃখ দূর করত ও হাম ফকীর॥"

(২) বদর পীর—পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম সহর এই "বদর আউলিয়া"র খাস অধিকারভুক্ত। তথাগত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই "বদর সাহেবের" সেবা দিয়া থাকেন। নৌকার মাঝিরাও ডাকিয়া থাকে,—

"আমরা আছি পোলা পান
গাজি আছে নিথাপান,
সাহের গঙ্গা দরিয়া,
[illegible]"

বিচিত্রতা কি?” দীনেশ বাবুর মতে রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরে ‘লয়লা মজনু’র মত মুসলমানী কেতাব হইতে ভাব অপহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মুসলমান সাহায্যে বঙ্গভাষা আরবী ও পারসী হইতে অনেক শব্দসম্পদেও সৌভাগ্যশালী হইয়াছে। এখন ও ‘জমিদারেরা’ ‘আদালত’ দ্বারা ‘পরোয়ানা’ ‘জারি’ করাইয়া ‘জমি’ ‘নিলামে’ দেন; আর বিপক্ষের ‘মোক্তার’ তাহার ‘তদ্বির’ করে। আবার ‘ফৌজদারী’ ‘মোকর্দ্দমায়’ ‘হাকিমেরা’ ‘উকিলের’ সহায়তায় ‘আসামী’ ও ‘ফরিয়াদী’ পক্ষের ‘জবানবন্দী’ এবং সাক্ষ্য লইয়া ‘হুকুম’ দিয়া থাকেন। এতদধিক সুখের কথা মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষ এক সর্ব্বপ্রদেশসাধারণপ্রায় হিন্দী-ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান সংস্রবে হিন্দুদের জাতীয় পরিচ্ছদাদি—ও বহু স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিয়াছে। আজ ধূতীচাদরসম্বল হিন্দুগণ বিলাতী পোষাক সমূহ ছাড়িয়া দিলেও ‘ইজার’ এবং ‘চাপকান’ কি ‘চোগা’ পরিয়া, ‘সাম্‌লা’ মাথায় দিয়া স্বচ্ছন্দমনে ভদ্রসমাজে মিশিতে পারেন, চন্দনী বা গোলাপী ‘আতরের’ নিকট “এসেন্স” তুচ্ছ। হিন্দুদের আহার্য্য দ্রব্যে ও ‘দম,’ ‘দো-পেঁয়াজা’ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে, ‘আদব কায়দা’তে ও হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগের নিকট বিশেষ ঋণী। এতদ্ভিন্ন অঙ্ক, চিকিৎসা এবং সঙ্গীত শাস্ত্র মুসলমানদিগের হাতে পড়িয়া বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। এবং হর্ম্ম্য ও শিল্প কর্ম্ম এক উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে সংযত হইয়াছে। মুসলমান বিজেতৃগণই এদেশে প্রথমে বন্দুকের ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন। কাচ, বাতি, কাগজ ও তাঁহাদের দ্বারা প্রথম আনীত। এমন কি, এদেশে রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চ্চাও তাঁহাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তথাপি যাঁহারা মুসলমান শাসন বা সংসর্গে হিন্দুর চরমাবনতির কথা বলিতে চাহেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত বা মিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে এতাদৃশ উদার সম্বন্ধের সাক্ষ্য ইতিহাসে অতি সামান্যই পাওয়া যাইতে পারে। মুসলমানাধিকারের প্রথম ভাগ হিন্দুর পক্ষে যদিও তেমন সন্তোষজনক হয় নাই, তজ্জন্য দুঃখও আসে না। কারণ জেতা ও বিজিতের সংঘর্ষণকালে নিরবাচ্ছিন্ন শান্তির কল্পনা—বাতুলতা মাত্র। পরন্তু তাহার ফলে হিন্দুসমাজে চৈতন্য, রামানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া একান্ত রক্ষণশীল হিন্দুর কতিপয় অন্ধ-সংস্কার দূরীকরণ দ্বারা স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জনের কথা আমরা অদ্যাপি অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। অপরন্ত অধুনা যে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের কোনও কোন স্থানে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাবের কথা শুনা যাইতেছে, স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের রাজনৈতিক চাতুরীর বিষময় ফল মাত্র। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া এই ভেদনীতির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এতদিন তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা বারংবার বিফল হইয়াছে। এখনও শিক্ষিত মুসলমানসমাজ তৎপ্রতি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তবে কর্ত্তৃপুরুষ ক্ষমতাশালী কোনও মাতৃদ্রোহী কুচক্রীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে অজ্ঞ মুসলমান গুণ্ডার দলকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহার ফলে যদিও আমাদের মৈত্রীভাবে কিয়ৎ পরিমাণে মনোমালিন্য প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু অত্যাচারিগণ তাহাদের এ ভ্রম অবিলম্বে বুঝিবে। তখন তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইলে কর্ত্তৃপক্ষের কিছুতেই নিস্তার নাই। আমাদের মনে হয়, মহামতি আকবরের সুস্নিগ্ধ শাসনপালিত প্রজার উপর কুটবুদ্ধি আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিনী শাসন-নীতির ফল যেরূপ বিষময় হইয়াছিল, এবং সেই অভ্যুত্থানে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে হিন্দু রাষ্ট্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইংরাজের বর্ত্তমান উৎপীড়ননীতি সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবন খুলিয়া দিবে। প্রাণে আঘাত না পড়িলে, অভাব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং প্রতিবন্ধক দূর করিতেও হৃদয় মাতে না। তাহারই প্রমাণ, কূটমতি কার্জ্জনের দুর্দ্ধর্ষ শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া জাতীয় উত্থানের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। মিণ্টো, মর্লি, তোমরা আরও শতগুণ তেজে আমাদের হৃদয় পদ-দলিত কর,—আমরা পরাধীনতার যন্ত্রণা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করি। আর যেন ভগবান শীঘ্রই এমন দিন দেন, তোমাদিগকে দু’হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পাই।

হে ভাই হিন্দু ও মুসলমান, তোমাদের সম্মিলনে বঙ্গ-

ভূমি প্রয়াগতীর্থ প্রায়। তোমরা বিজিত-বিজেতা হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসিয়া আসিতেছ। কিন্তু ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে ঠাঁই ঠাঁই করিবার নিমিত্ত রাজপুরুষগণের উৎকট চেষ্টা চলিতেছে। সাবধান এই গলাগলি—জড়াজড়ি ছাড়িও না। তাহারা আমাদিগকে কোনরূপে ছাড়াছাড়ি করিতে পারিলে শেষে প্রত্যেককেই অসহায় পাইয়া, অত্যাচারের এক শেষ করিবে। প্রত্যেককেই আমরা বঙ্গের খাঁটি নবাব বংশধর 'এহতেসাম্উল্মুলক রাইস্উদ্দৌল্লা আমির উল্ ওমরা নবাব আসেফ কদর সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জা খান বাহাদুর মহবতজঙ্গ নবাব বাহাদুর অফ্ মুর্শিদাবাদএর পক্ষ হইতে' প্রকাশিত "বিজ্ঞাপন" খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া বর্ক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। আমাদের খুব আশা আছে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই তদীয় উপদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে কায়মনে যত্নশীল হইবেন।

জনৈক বাঙ্গালী।

মহানুভব শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী।

মহাপ্রভুর প্রিয়তম পারিষদগণের মধ্যে কাঞ্চনপাড়া নিবাসী শিবানন্দ সেনও একজন প্রধান ছিলেন। শিবানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা সকলই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ, চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা। মহাপ্রভুতে তাঁহার যে কি প্রকার অনুরাগ ছিল চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী গ্রন্থের এই বিবরণ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
শিবানন্দ সেন তথা গৌর সেবা করে॥
সেই শিবানন্দ হন অতি ভাগ্যবান।
সর্ব্বকালে কায়মনে চৈতন্যের ধ্যান॥
অন্য দেব দেবী কিছু সেবা নাহি করে।
গৌর বিনা অন্য নাম মুখে না উচ্চারে॥
কবিকর্ণপুর নাম তাঁর পুত্র হৈল।
কৃষ্ণ সেবা নিজ গৃহে প্রকাশ করিল॥
ঠাকুরের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায়।
শিবানন্দ সেন আসি দেখিল তাঁহায়॥
দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা।
বার্ণপায় পত্রে তিঁহ স্তব লিখিতে লাগিলা॥

ওরে মূঢ় কতকাল করিয়া মার্জ্জন।
কালবর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌরবর্ণ॥
আরবার সেই কাল আনিলি মন্দিরে।
শিবানন্দের প্রেম কথা কে বুঝিতে পারে॥

পরমার্থিক ধনে শিবানন্দের যে প্রকার সৌভাগ্য ছিল, পার্থিব সম্পদেও তিনি তদ্রূপ গৌরবান্বিত ছিলেন। অর্থের তিনি যথার্থ সদ্ব্যবহার জানিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান সময়ে, প্রতি বৎসর রথযাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রভুর দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রকেই শিবানন্দ সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও পাথেয়াদি যাতায়াতের তাবত ব্যয় নিজেই বহন করিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ পত্রে শিবানন্দের বিবিধ সদ্গুণের বর্ণনা মধ্যে এ বিষয়টিরও বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

চৈতন্য পার্ষদ শ্রীল সেন শিবানন্দ।
সবার পালন পথে করেন স্বচ্ছন্দ॥
পথের কণ্টকরূপ যত ঘাটিয়াল।
দান লাগি যাত্রিকেরে করয়ে জঞ্জাল॥
গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব পরম উদার।
উড়িয়া জগতি প্রতি ভয় সবাকার॥
শিবানন্দ উড়িয়া দেশের তত্ত্ব জানে।
পথে বিঘ্ন সমাধান করেন আপনে॥
আপনে পায়েন দুঃখ ভক্তের কারণে।
সেই দুঃখ শিবানন্দ সুখ করি মানে॥
চণ্ডালে যদ্যপি প্রভু দেখিবারে চায়।
প্রতিপাল্য করি তারে সেন লঞা যায়॥

বৈষ্ণবকুলপ্রদীপ এই ভাগ্যবান্ শিবানন্দ যে তিনটী পুত্র-রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন—

চৈতন্য দাস, রাম দাস, কবি কর্ণপুর।
শিবানন্দের তিন পুত্র প্রভুভক্ত শূর॥

তন্মধ্যে কবিকর্ণপূর শ্রীপরমানন্দ দাসই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আজ আমরা তাহার প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি।

শকাব্দীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ ১৪৪৭ শকে) পরমানন্দ দাস জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় পরমানন্দ অতি শিশুকাল হইতেই স্বভাবকবি। প্রভুর কৃপা লাভে অশেষ প্রকারে কৃতার্থ হইয়া, অতি অল্প বয়সে তিনি যে প্রকারে সারস্বতসম্পদের অধিকারী হইয়া-

ছিলেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী ও চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

হেথা গৌড় হৈতে যত বৈষ্ণব মণ্ডল ।
শ্রীচৈতন্য দেখিবারে যান নীলাচল ॥

ভক্তমণ্ডলী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে নীলাচলের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রেমানন্দে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন হরিধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া—

মহাপ্রভু কহে "উঠে চল পুরীশ্বর ।
আমরাহ যাই অদ্বৈতাদির গোচর" ॥
"চলহ গোস্বামী" বলি চলে পুরীশ্বর ।
গণ সঙ্গে শীঘ্র চলিলেন বিশ্বম্ভর ॥
দূর হৈতে দেখে প্রভু মহান্ত সকলে ।
সংকীর্ত্তন করি আসিছেন কুতুহলে ॥
স্বরূপ দিয়েছে মালা অদ্বৈতের গলে ।
মালা পাঞা দুই গুণ আনন্দ উছলে ॥
নৃত্য করি আসিছেন অদ্বৈত গোসাঞি ।
চতুর্দ্দিকে ভক্ত আইসে কৃষ্ণ গুণ গাই ॥
শিবানন্দ আদি যত তাঁহারহি সঙ্গে ।
দিশ্বিদিক নাহি কিছু প্রেমের তরঙ্গে ॥
দূর হৈতে অদ্বৈত দেখিলা গৌরহরি ।
চন্দ্র যেন আইল তারাগণ সঙ্গে করি ॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি অদ্বৈত পড়িলা ।
ভক্ত সব উর্দ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলা ॥
পরমানন্দ শিশু পুত্র শিবানন্দ কোলে ।
"কে বটে চৈতন্য প্রভু" পিতা প্রতি বোলে ॥
সবারে শুনাইয়া শিবানন্দ মহাশয় ।
নিজ পুত্রে করান চৈতন্য পরিচয় ॥—

বিদ্যুদ্দাম দ্যুতিরতিশয়োৎ কণ্ঠ কণ্ঠীরবেন্দ্র
ক্রীড়াগামী কনক পরিঘ দ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥

শিবানন্দ বলে　　অপূর্ব্ব সকলে
হের হের সবে চাঞা ।
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি　　ভক্ত সঙ্গে করি
আসিছে সদয় হঞা ॥
বিজুরীর দাম　　দ্যুতি অবিরাম
ছটা করে ঝল মল ।
উৎকণ্ঠিত তর　　কণ্ঠীরব বর
ক্রীড়াগামী নিরমল ॥
পরিঘ সোনার　　দীর্ঘবাহু তাঁর
সিংহগ্রীব মনোরম ।
নব দিনকর　　অরুণ অম্বর
রূপ অতি নিরুপম ॥
কমল নয়ান　　যার অভিরাম
ঝুরিছে প্রেমের ধার ।
কহে শিবানন্দ　　ঐ গৌরচন্দ্র
চরণে প্রণাম তাঁর ॥

ইহার পর যখন ভক্তগোষ্ঠীর সহিত প্রভুর শুভ সম্মিলন হইল তখন—

শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইলা ।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈলা ॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল ।
পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যে হইবে কুমার ।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার ।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু-আজ্ঞা ধরিল নাম পরমানন্দ দাস
পুরী দাস করি প্রভু করে উপহাস
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা ।
মহাপ্রভু-পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন ॥
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায় ।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥

ইহার আবার চারি পাঁচ বৎসর পরে পরমানন্দের বয়স যখন সাত বৎসর—

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল ।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল ॥
পুত্রে সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুর স্থানে ।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
"কৃষ্ণ কহ" বলি প্রভু বলে বার বার ।
তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল ।
তবু সেই বালক কৃষ্ণ নাম না কহিল ॥
প্রভু কহে "আমি নাম জগৎ লওয়াইল ।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে ।"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিল কহিতে ॥
"তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈল উপদেশে ।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ।
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান ।
এই ইহার মনোকথা করি অনুমান ॥"
আর দিন কহে প্রভু "পড় পুরীদাস" ।
এই শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ ॥

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন ।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥

কথিত আছে যে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণের ভূষণ বর্ণনাযুক্ত

এই শ্লোক তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে নির্গত হওয়ায় স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহাকে "কবিকর্ণপুর" এই উপাধিতে বিভূষিত করিয়া, কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা করেন। প্রভু শ্রীমুখে তাঁহাকে যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

> যৎসাম্বাদ্য মুহুঃস্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাম্
> দেয়ং তত্ত্বজনেষু ভাবিষু সুরৈদুর্প্রাপমেতৎ ত্বয়া ॥

প্রভুর অনুগ্রহ ও এই আজ্ঞা লাভ করিয়া, এই হইতে তিনি সংস্কৃত কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৬৪ শকে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ৯ বৎসর পরে এই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হয়—

> বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে
> শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি।
> বারে সুধা কিরণনম্ন্যসিত দ্বিতীয়া
> তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদ মুষ্য।

১৯১১ শ্লোকযুক্ত, বিংশ সর্গে পরিপূর্ণ, এই মহাকাব্য তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সের রচনা; এই কাব্য মধ্যে তিনি সংক্ষেপতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রায় সমগ্র লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। তৎপর ক্রমে অলঙ্কার-কৌস্তুভ, আর্য্যাশতক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরে আবার শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনে ১৪৯৪ শকাব্দায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক প্রণয়ন করেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক অতি প্রামাণিক ও আদরণীয় গ্রন্থ। মহাকাব্য মধ্যে যে সমস্ত লীলা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, কবি তাহাই এই গ্রন্থ মধ্যে নাটকাকারে বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ, ঘনশ্যামদাসঠাকুর প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই এই গ্রন্থ হইতে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই নাটকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া ১৬৩৪ শকে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীপ্রেমদাস ঠাকুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী নামক এক বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদও অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত।

তৎপর ১৪৯৮ শকে কবি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রণয়ন করেন। অনেকের এই প্রকার অনুমান যে এই গণোদ্দেশদীপিকাই কর্ণপূরগোস্বামীর শেষ গ্রন্থ। এই সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ভিন্ন তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক কয়েকটী মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন। পাঠকগণের চিত্ততর্পণের জন্য কর্ণপূরগোস্বামী কৃত একটি পদ এখানে আমরা—উদ্ধৃত করিলাম।

> কানু কি নিঠুর বচন শুনি সো সখি
> আওলহি রাইওকি পাশ।
> পন্থ ঘটিত দুঃখ ছল ছল লোচন
> কহতহি গদ গদ ভাষ॥
> সুন্দরি! দূর কর কানু আশোয়াস।
> ঐছে নিঠুর সনে প্রেম নহে সমুচিত
> না পুরব তুয়া অভিলাষ॥
>
> তোহারি নিদান হাম কতরেতে শুনায়লু
> তাহে যে সুকঠিন বাণী।
> সে হাম তুয়া পায় কত যে নিবেদয
> কহইতে দহই পরাণী॥
> ঐছন বচন রাই যব দূতী মুখে
> শুনইতে মুরছিত ভেল।
> ইহ পরমানন্দ দাসক হৃদি মাহা
> কো জানি রোপল শেল॥

মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র মহাত্মা শ্রীপুরীদাসকবিকর্ণপুর শ্রীগৌরাঙ্গের বরপুত্র বলিয়া ভাগবতমণ্ডলীর মধ্যে পূজিত হইয়াছিলেন। কবিরাজগোস্বামী অশেষ প্রকারে তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমদাস ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> অজ্ঞান তিমির সুর মহাকবি কর্ণপুর
> অতি শিশু যখন আছিলা।
> প্রভুস্থানে নীলাচলে গেলা চলি পিতৃকোলে
> নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা॥
> গতি হস্ত জানু যুগে প্রভু পাদপদ্ম আগে
> আনন্দে করিল পরণাম।
> দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ
> তাঁর মুখে দিলা ভগবান॥
> হস্তে ধরি শ্রীচরণ অঙ্গুলি চোষেণ ঘন
> প্রভুর পার্ষদগণ হাসে।
> নিজ পুত্রে কৃপা দেখি শিবানন্দ হইয়া সুখী
> উর্দ্ধ বাহু নাচেন হরিষে॥
> উচ্ছিষ্ট চরণামৃত শ্রীচৈতন্য কদাচিত
> নিজাচ্ছায় না দেন কাহারে।
> সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া
> আপনে দিলেন কর্ণপূরে॥
> কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা না পড়ি পণ্ডিত হৈলা
> জানিল সকল শাস্ত্র নীত।
> সপ্তদশ বর্ষ যবে কাব্য বর্ণিলেন তবে
> নাম তার চৈতন্য চরিত॥
> পূর্ব্বে অলঙ্কার যত অসৎ কথা সুঘটিত
> দেখি শুনি ঘৃণা উপজিলা।
> দিয়া কৃষ্ণ লীলা সার গ্রন্থ কৈল অলঙ্কার
> কৌস্তুভ তাহার নাম থুইলা॥

যে বর্ণিয়া কৃষ্ণলীলা কর্ণপূরে গ্রন্থ কৈলা
আর্য্য শতক হৈল নাম।
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন- চম্পু, নাম গ্রন্থ আন
ব্রজলীলা বর্ণন প্রধান॥
প্রভু কৃপা গুণ দেখি গজপতি হৈঞা সুখী
গৌরলীলা বর্ণিতে কহিল।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়-- নাটক অমৃতময়
রাজার বচনে রচিল॥

ভক্তমাল গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

শ্রীমান কবি কর্ণপূর শিবানন্দ-সুত।
তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা।
শিশুকালে যার মুখে পদাঙ্গুষ্ঠ দিলা॥
পদাঙ্গুষ্ঠ দানে ছলে শক্তি সঞ্চারিলা।
গর্ভে যবে, তবে পুরীদাস নাম দিলা॥
মহাকবি যেহ মহাকাব্য প্রকাশিলা।
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ যে বর্ণিলা॥

পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধবদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

জয় সেন পরমানন্দ কর্ণপুর কবি চন্দ্র
প্রভু যারে কহে পুরীদাস।
শিবানন্দ ঔরসেতে জন্ম কাঞ্চন পল্লীতে
সপ্তবর্ষে কবিত্ব প্রকাশ॥
মহাপ্রভু দয়া কৈলা পদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিলা
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা।
সাত বৎসরের শিশু আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু
সেই শক্তি প্রভাবে জন্মিলা॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় মহাকাব্য গ্রন্থচয়
রচিলেন কবি কর্ণপূর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয়
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর॥
কর্ণপুর গুণ যত এক মুখে কব কত
চৈতন্যের বর পুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি জ্ঞান চক্ষু দান করি
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥

শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ ও সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সমগ্র লীলা প্রকাশ করিয়া তিনি অশেষ প্রকারে ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উদ্ভিদ ও আলোক।

প্রথম প্রস্তাব।

নানাপ্রকার আঘাত উত্তেজনায় উদ্ভিদদেহের যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তন্মধ্যে আলোকজাত পরিবর্ত্তন গুলিই বোধ হয় খুব সুস্পষ্ট। আলোক স্পর্শে বৃক্ষ সকল পাতা ডাল উঠাইয়া নামাইয়া যে কত রকমে সাড়া দেয়, তাঁহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। ডাল বাঁকিয়া কখনো আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, এবং অবস্থাবিশেষে সেই ডালই আবার কখনো কখনো আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে আরম্ভ করে। রাত্রির অন্ধকারে বা মেঘলাদিনে কতকগুলি গাছের পাতা জোড় বাঁধিয়া গুটাইয়া আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া যায়। প্রখর সূর্য্যালোকে শিরিষ তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি পাতাকেও রাত্রির ন্যায় সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়।

একমাত্র আলোকের উত্তেজনায় নানা বৃক্ষের শাখা-পত্রকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। আলোকপাতে উদ্ভিদদেহের ভিতরে কি কাজ হয়, তাহা ইহাঁরা ধরিতে পারেন নাই। কাজেই কতকগুলি নিরর্থক ও অবান্তর কথায় উক্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের গবেষণার বিবরণী পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের স্বদেশবাসী এবং অধুনা জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, উদ্ভিদের উপরে আলোকের প্রকৃত কার্য্য আবিষ্কার করিবার জন্য কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বড়ই বিস্ময়কর। আচার্য্য বসু মহাশয়ের সরল ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, এ সম্বন্ধে বিদেশের মহাপণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্তগুলি যে কত নিরর্থক ও অসার, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোকের উত্তেজনাকে একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার স্থির করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গুলিকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। আলোকপাতে উদ্ভিদদেহে যে সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়, ইহারা সেগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এবং শেষে আলোকে নানা অদ্ভুত গুণের আরোপ করিয়া তাঁহারা নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। তাপ, বিদ্যুৎ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা প্রয়োগে, উদ্ভিদদেহের কি প্রকার সাড়া প্রকাশ পায়, আমরা আচার্য্য বসু মহাশয়ের

আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে তাহার আভাস দিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, উদ্ভিদদেহে উত্তেজনা মাত্রেরই প্রভাব এক। বসু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্য নানা পরীক্ষাদি করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহাও প্রায় তাপ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি তাপালোক ও বিদ্যুতাদির প্রভাবের মধ্যে একতা আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তাই তাঁহারা প্রত্যেক উত্তেজনাকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার মনে করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় এই ভ্রান্ত ধারণাই ইঁহাদের সমস্ত শ্রম ও চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছিল, নচেৎ আজ আমরা উদ্ভিদতত্ত্বের আর এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম।

লতানো গাছের ডাঁটার ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় এবং ধনুর ন্যুব্জ (concave) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাকে। এখন ডাঁটার উপরের অর্দ্ধে (অর্থাৎ যে অংশ দিবসে সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে) পূর্ব্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ভূমির দিকে ন্যুব্জ পৃষ্ঠ হইয়া বাঁকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডি ভ্রায়েসের (De Vries) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উদ্ভিদবিদ্ স্যাক্স (Sacks) সাহেবও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে যেখানেই দেওয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত নীচের অংশটাকে ন্যুব্জ পৃষ্ঠে রাখিয়া লতামাত্রেই বাঁকিয়া যায়।

ডি ভ্রায়েস্ সাহেব পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিয়াছিলেন,—লতানো গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় তাহাতে কখনো আলোক পড়ে না। এই জন্য লতার নীচের ও উপর পিঠের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। এখন পৃথক ভাবে উপর নীচে আলোকপাত করিলে, উপরার্দ্ধ যে আলোক হইতে দূরে, এবং নিম্নার্দ্ধ যে আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমগ্র লতাটিকে একই দিকে বাঁকাইয়া দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উন্মুক্ত থাকায়, ছায়াবৃত পৃষ্ঠের তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু সেই বিশেষত্ব যে কি, এবং আলোকের উত্তেজনা কিপ্রকারে কাজ করিয়া লতার ডাঁটাকে একবার আলোক হইতে দূরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়া লয়, ডি ভ্রায়েস্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়া নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই ন্যুব্জপৃষ্ঠ (concave) হয়, তাহা নয়। আচার্য্য বসু মহাশয় নানাজাতীয় গাছের পত্রমূলের* (pulvinus) উপর ও নীচে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির বোঁটা ঠিক্ লতারই মত নীচের দিকে ন্যুব্জ হইয়া পড়ে। সুতরাং লতা পাতা উভয়েরই ন্যুব্জতার কারণ যে এক তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল পাতার বক্রতার প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

উদ্ভিদের দিবা নিদ্রা (Diurnal Sleep, or para-heliotropism) পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুজিয়া আসে, দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রেও ঐ রকম পাতা বোজা দেখা যায়। ইহাকেই উদ্ভিদবিদ্গণ উদ্ভিদের দিবানিদ্রা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আধুনিক উদ্ভিদবিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন ফলই পাওয়া যায় না। স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ পর্য্যন্ত কেহই এই ব্যাপারের কারণ দেখাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্

* লজ্জাবতী শিরিষ প্রভৃতি অধিকাংশ ছুটি-ওয়ালা গাছের পাতা যেখানে শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে Pulvinus নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। ইহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ সমান উত্তেজনাশীল। পূর্ব্বোক্ত গাছগুলির পাতার উঠানামা ইত্যাদি ব্যাপার ঐ Pulvinus এর দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আমরা পত্রের ঐ বিশেষ অঙ্গটিকে "পত্রমূল" নামে অভিহিত করিতেছি।

বলিয়াছিলেন,—তীব্র আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, তাই তাহারা পাতা গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোকের অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ডারুইনের এই ব্যাখ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক বিবেচনা করুন, এবং ঐ উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য হইতে পারে কিনা তাহাও দেখুন।

এখন আচার্য্য বসু মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা প্রকার বাঁকাচোরার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন দেখা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুম্‌ড়া প্রভৃতি লতানো গাছের চারাকে সূর্য্যরশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি সাধারণ গাছের ন্যায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার পর ভারাধিক্য প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশায়ী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় বাড়িতে দেখা যায়। আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন, গাছ যখন শুইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ডাঁটার উপরকার অংশটা সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজনশীলতা অনেক কমিয়া আসে। কাজেই উপরার্দ্ধের তুলনায় নিম্নার্দ্ধ সাধারণতঃ অধিক উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে।

মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার একটি ডাঁটার উপরার্দ্ধে আলোকপাত করা গেল। এখানে উপরটা অল্প উত্তেজনশীল বলিয়া আলোকের উত্তেজনা তাহার বৃদ্ধির কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআড়ি ভাবে অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌছিয়া, সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়া দিল। কোন জিনিষের এক অংশ যদি অপর অংশের তুলনায় অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম প্রসারণের দ্বারা সেটিকে ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইতে দেখা যায়। ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ (Concave) অল্পপ্রসারণশীল অংশের দিকে থাকে। এখানে ডাঁটাটির অবস্থা এইপ্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ উহার উপরার্দ্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে কেবল নিম্নার্দ্ধেরই বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, কাজেই লতাটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধের উপর যেন নীচে হইতে আলোক পাত করা গেল। বলা বাহুল্য আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্তি মাত্র, ঐ অংশের বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে উপরদিকেও আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্দ্ধকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। কাজেই এখানেও নিম্নার্দ্ধের বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে।

কুম্‌ড়া ও লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে ও নীচে সুকৌশলে আলোকপাত করিয়া, শাখার বক্রতার পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অভ্রান্ত তাহা আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া ক্ষেত্রজ লতাগাছের ডাঁটা প্রভাতসূর্য্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রখরতা অনুসারে কি ভাবে বাঁকিয়া আসে, তাহাও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন; এবং এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে।

উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি খুব প্রখর থাকে, তবে যে কোন অংশে আলোক পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে ও ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে অধিক উত্তেজনশীল অংশটা থাকিবে।

২য়। উদ্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে যে অংশটিতে উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, কেবল সেটিকেই ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে দেখা যাইবে।

আচার্য্য বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল উদ্ভিদ দ্বিপ্রহরে পাতা গুটাইয়া নিদ্রিত হয়, তাহারা সকলেই পত্রমূলযুক্ত (Pulvinated) বৃক্ষ। ইহাদের প্রত্যেক পত্রমূলেরই নিম্নার্দ্ধ উপরার্দ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল। বসু মহাশয় প্রথমে পালিতা মাদার (Erythrina Indica) গাছের ছোট ছোট পাতার নিমীলন লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি

তত অধিক নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোক যখন উহার উপরের অংশে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌঁছিতে পারে না, কাজেই উপরার্দ্ধই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি মাথা উঁচু করিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার গাছ ছাড়া, আরো যে সকল গাছের পাতা ঊর্দ্ধ মুখে জোড় বাঁধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও আচার্য্য বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা গিয়াছিল। অপরাজিতা লতা (elitoria fernatea) এই শ্রেণীভুক্ত। দিবালোকের উত্তেজনায় ইহার পত্রমূল বাঁকিয়া গিয়া, পাতাগুলিকে কিপ্রকারে উঁচু করিয়া তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে সূর্য্য অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি, সেই দিকে মুখ রাখিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে।

প্রখর সূর্য্যালোকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া জোড় বাঁধা কেবল কতকগুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পত্রমূলযুক্ত গাছের পাতাই নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিতে চেষ্টা করে। এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা যাউক। আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন, এই সকল গাছের পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি অত্যন্ত অধিক। এজন্য পত্রমূলের উপরে যে সূর্য্যালোক পড়ে, তাহা আড়াআড়ি ভাবে বাহিত হইয়া উহার নিম্নার্দ্ধে পৌঁছিতে পায়। কিন্তু পত্রমূল মাত্রেরই নিম্নার্দ্ধের উত্তেজনশীলতা উপরের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, কাজেই এস্থলে পাতাগুলি সঙ্গে লইয়া পত্রমূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোকরশ্মি কেবল প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া পড়িলেই যে গাছের পাতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নামিয়া পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া ঐ অঙ্গে লাগিলেই, পাতা গুটাইতে আরম্ভ করে। কারণ বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া, উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধের উপরেই অধিক কার্য্যকারী হয়, এবং তাহাতে ঐ অংশেরই বৃদ্ধি রোধ করিয়া সেটিকে নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেয়। আমরুল (oxalis) লজ্জাবতী ও শিরিষ প্রভৃতি গাছের পাতা খুব রৌদ্রের সময় পরীক্ষা করি[illegible] ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত দিবা নিদ্রা প্রত্যক্ষ করিতে পা[illegible] প্রাতে রৌদ্র উঠিবা মাত্র এ সকল গাছের পাতা গো[illegible]া দেখা যায় না, কারণ পত্রমূল পরিবাহনক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র তাহার উত্তেজনা নীচে পৌঁছিতে পারে না। বহুক্ষণ আলোক পাতের পর সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌঁছায়, এবং তখনি গাছের পাতা নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত তথ্যগুলি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্রা (Nyctitropism) ও আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার আকার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপারের অতি সুন্দর ব্যাখ্যান আচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রসাদে পাওয়া গেছে। এই সকল বিষয়ের সৎব্যাখ্যান এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারেন নাই, এবং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য বলিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ তত্ত্বের ঐ সকল বৃহৎ সমস্যাগুলির কি প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা পরপ্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সমসাময়িক ভারত।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

নূতন সমাজ।

২

হিন্দু-পরিবারের পরিসর আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। যাহারা পিণ্ডদান করে, পিণ্ড গ্রহণ করে, পিণ্ডের অংশভাগী—সকলেই এই পরিবারের অন্তর্গত। হিন্দু মাত্রই আপনার পিতার উদ্দেশে, পিতামহের উদ্দেশে, প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে বাধ্য, এবং স্বীয় পুত্রের নিকটে, পৌত্রের নিকটে প্রপৌত্রের নিকটে পিণ্ডের প্রত্যাশী। অতএব দেখা যাইতেছে, পিতৃপুরুষের পূজার উপরেই হিন্দু-পরিবার প্রতিষ্ঠিত। যাহারা একই পিতৃপুরুষের উদ্দেশে, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারাই একগৃহে এক সঙ্গে বাস করে। পিতা, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া,

কখন কখন দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগণ—সকলেই এই হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত। পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি। উহাতে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। পিতা এই সম্পত্তির স্বামী কিংবা স্বত্বাধিকারী নহেন, পরন্ত ইহার পরিচালক কর্ম্মকর্ত্তা মাত্র। অতএব এইরূপ সম্পত্তি যৌথ-সম্পত্তি—অন্ততঃ ইহাকে অবিভক্ত সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। উহাতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। এইরূপ ব্যবস্থায়, উচ্চতর পারিবারিক স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিকে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। হিন্দু-পরিবার—ইহা ত একটি ক্ষুদ্র সমাজমণ্ডলী।

ভারতে, জাতিবর্গের ন্যায় পরিবারও সাধারণ হিতের জন্য ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে পরিবারকে, কুলকে বজায় রাখাই প্রধান কর্ত্তব্য। এইরূপ সমাজযজ্ঞের হুতাশনে প্রথম আহুতি—স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উচ্চতর সভ্যতার লক্ষণ। একজন মার্কিন আমাকে একবার বলিয়াছিলেন;—"কোন দেশের সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চতর, যে পরিমাণে তত্রত্য নারীজাতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও অধিকার মহত্তর।" সম্ভব; কিন্তু সমস্ত এসিয়ার লোক এরূপ মনে করে না। একথা সত্য, জাপানে কিংবা চীনে, লোকের দৈনন্দিন আচার ব্যবহার, তত্রত্য বিধিব্যবস্থাকে একটু সংশোধিত করিয়া লয়—একটু নরম করিয়া আনে। কিন্তু ভারতবর্ষে, লোকাচার শাস্ত্রের কঠোরতাকে আরও যেন বাড়াইয়া তোলে। ভারতে, নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সামাজিক সোপানের যে যত উচ্চধাপে অবস্থিত সেই পরিমাণে তাহার স্বাধীনতাও সঙ্কুচিত। অবগুণ্ঠন, অবরোধ, সহমরণ এই সমস্ত অমূল্য অধিকার অভিজাতবর্গেরই নিজস্ব। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই এই সমস্ত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল। এরূপ আত্মবলিদান সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাহারা পতিপ্রাণা পতিব্রতা পতির পদানত দাসী, যাহারা ধর্ম্মার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহারাই নিজের চিতা নিজে প্রজ্বলিত করে...ইহা একটু বেশী-রকমের হিন্দুয়ানী।

আজকাল স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে এখানে কিরূপ আন্দোলন চলিতেছে, সে কথা পরে বলিব। এখন সাধারণ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। প্রথমতঃ—এখানকার স্ত্রীলোকেরা কি সুশ্রী ?

সুশ্রী নিশ্চয়ই, তবে উহাদের রূপলাবণ্য প্রাচ্য ধরণের। উহাদের গায়ের রং জাফ্রানের মত—মনে হয় যেন খাঁটি পিতলে ঢালা। উহাদের মুখাবয়ব বেশ সুষম, চোখের পাতা দীর্ঘ—চোখ প্রেমদীপ্ত; উহাদের অঙ্গভঙ্গীতে মদালস ভাব; উহারা যে কাপড় পরে তাহা সরু ফিন্‌ফিনে। শুনিতে পাই, গুটাইয়া লইলে উহাকে একটা আংটীর মধ্যে প্রবেশ করান যায়;—২৫।২৬ গজ লম্বা মল্‌মলের থান। উহাদের বাহু, পায়ের গোড়ালী, পায়ের আঙ্গুল অলঙ্কারে ভরা;—দেখিলে মনে হয় যেন গায়ের উপর স্যাক্‌রার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে এই কথা বলিয়াছে—উত্তরদেশস্থ রমণীদের তুলনায় উহারা কুরূপা। সোনালী কিংবা খড়ের রঙের চুল, দুধের মত শাদা রং, নীল চোখ্, আমাদের সূর্য্যের মৃদু কিরণে যেরূপ টাট্‌কা সুকুমার-ধরণের ফর্সা রং হয় সেইরূপ রং—আসলে এই সমস্তই উহাদের পছন্দসই।

কোন হিন্দুপরিবারে, কন্যাসন্তানের জন্মদিন শোকের দিন বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহার বিবাহ-যৌতুকের জন্য অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে হয়। কোন কোন পরিবারে, কন্যাসন্তানের জন্ম একেবারে 'গাপ্' করিয়া ফেলা হয়। উত্তর-রাজস্থানের কোন দুর্গের উল্লেখ করিয়া একজন ইংরাজ রাজপুরুষ আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন:—"এই দুর্গের মধ্যে, দুর্গাধিপতির কোন পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিলে, দুর্গপ্রাকারস্থ পুরাতন কামান হইতে তোপধ্বনি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত লোককে জানাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু বহুশতাব্দী হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত একটি কন্যা-সন্তানের মিষ্ট হাসি দুর্গের মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই।" এমনও কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে কন্যাসন্তান একেবারেই দেখা যায় না। ইহাই সেই সব স্থানের চিরন্তন প্রথা। অবস্থা এরূপ গুরুতর, অনেকগুলি গ্রামের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য ইংরাজ সরকার বিশেষ-পুলিস বসাইয়াছেন।

বাকী স্ত্রীলোকদের অবস্থা ইহাদের অপেক্ষা কি স্পৃহনীয়? বলবান পুরুষজাতি,—স্ত্রীলোককে,—আপনার সঙ্গিনীকে

পরাধীন অবস্থায়—অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করে, তাহা যেমন কোন দেশের বিধিব্যবস্থায় আচার ব্যবহারে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এমন আর কিছুতে নহে। প্রাচ্য দেশ মাত্রেই বিশেষত ভারতবর্ষে এটা সকলেরই খুব নজরে পড়ে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার—এই উৎপীড়িত প্রবঞ্চিত রমণী নিজেই আপনার দাসত্বে দৃঢ়রূপে আসক্ত, নিজ দাসত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, স্বাধীনতার অনুকূল নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাতে বিশেষরূপে বাধা দেয়। স্ত্রীলোকের অবস্থা সম্বন্ধে মনুর বচনটি এই :—"পতি ধর্ম্মহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত, নির্গুণ হইলেও পতিব্রতা নারী পতিকে দেবতারূপে সতত পূজা করিবেন।" এই পতি সেবার ফল তিনি শতগুণ প্রাপ্ত হইবেন পরলোকে। "পতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, নারী স্বর্গে গমন করে"। অবশ্য এরূপ অঙ্গীকারে বেশী কিছু খরচ হয় না।

বহুবিবাহপ্রথা ও অবরোধপ্রথা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। প্রথমটি খাস হিন্দুপ্রথা; দ্বিতীয়টি—স্পষ্টই বোধ হয়, মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। বহুবিবাহের একটা কৌতূহলজনক বিকাশ—কৌলীন্য প্রথা। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা বহু পুরাতন ও পরমপূজ্য—যাহারা কুলীন নামে অভিহিত, তাহারা অর্থোপার্জ্জনের একটা বেশ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। এই বিবাহব্যবসায়ী কুলীনেরা, অল্পবয়স্কা বালিকা হইতে শতবর্ষের বৃদ্ধাকে পর্য্যন্ত নামতঃ বিবাহ করিয়া থাকে। ইহাতে দুইটি সুবিধা আছে। এক-ত ইহাতে প্রচুর অর্থ লাভ হয়; দ্বিতীয়ত—যে কুলে তাহারা প্রবেশ করে সে কুলও উজ্জ্বল হয়…ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এবিষয়ে হিন্দুরা আমাদিগের অপেক্ষাও অগ্রসর।

আমি বলিয়াছি, কুলীনেরা খুব অল্পবয়স্কা বালিকাকেও বিবাহ করে। অর্থলোভে কোন কুলীন—যুবা কিংবা বৃদ্ধ—মনে কর, একটি ছোট মেয়েকে বিবাহ করিল। সে মেয়েটির বয়স এত অল্প যে তার কথার জড়তাও হয়ত এখনও যায় নাই। সেই কুলীন তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল; এবং দশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্রই তাহার সহিত সহবাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৯১-র আদমসুমারীর বিবরণে প্রকাশ—২৬০০০০০০ বালিকা যাহাদের বয়স দশ বৎসরের কম—তন্মধ্যে ২০০০০০০ বিবাহিতা ও ৬২০০০ বিধবা। দশ বৎসরের বিধবা! এরূপ বিধবা পতির সহিত যাহাদের কখনও পরিচয় হয় নাই! অন্য বিধবাদিগের মত এই বালবিধবাকেও চির ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিতে হয়; গৃহে থাকিয়া দাসীর কাজ করিতে হয়; নাপিত আসিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া দেয়; এক বৎসর কাল সে কোথাও বাহির হইতে পায় না; তাহার মুখদর্শনে অমঙ্গল সূচিত হয়। যে সময়ে আমি চন্দননগরে ছিলাম, একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী গৃহস্থ—ফরাসী-কন্‌সলের খাজাঞ্চি—তাঁহার বাড়ীতে আমাদের লইয়া যান। তাঁহার সাতটী পুত্র—মুখে বেশ উজ্জ্বল বুদ্ধির ভাব—তাহাদিগকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। এবং আমাকে বলিলেন :—"আপনি ত দেখিতেই পাইতেছেন, আমি বেশ ভাল পদে প্রতিষ্ঠিত, আমি ধনবান্,—ফরাসী সরকারের প্রসাদেই আমি ধনসঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু গৃহে আমার সুখ নাই। আমার একটি কন্যা, আট মাস হইল, বিধবা হইয়াছে। বৈধব্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, সে হতভাগিনী সমস্ত দিন কৃষ্ণের পূজা অর্চ্চনায় ব্রত উপবাসে নিযুক্ত থাকে। একবেলা আহার করে। প্রতি মাসের চারিদিন, রজস্বলা অবস্থায়, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় একবারমাত্র আহার করে। এই বিষম গ্রীষ্মের দিনে, সে পিপাসায় মৃতকল্প হইয়া পড়ে; তাহার মার কাছে লুকাইয়া আমি তাকে জল আনিয়া দিই।"

ইহাও তত কঠোর নহে! এখন বিধবার অবস্থা তবু ত একটু প্রশমিত হইয়াছে বলিতে হইবে! কেননা, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুর ধর্ম্মমতের সহিত পাছে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই ভয়ে ইংরাজ সরকার প্রথমে ইহা রহিত করিতে সাহস পান নাই। পরে অনেক কষ্টে ইহা রহিত হয়। সহসা মনে হইতে পারে, এই প্রথা রহিত করিয়া ইংরাজ সরকার লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। কিন্তু তাহা আদপেই নহে। বেশী দিন নহে, যে সকল সতীদাহের ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে এই কথার উল্টাটাই সপ্রমাণ হয়। এবং আমি শুনিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যে, এই প্রথাটি এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কতকগুলি স্বার্থপর লোক, ইহ জীবনের পরেও সতীধর্ম্মের উচ্চ মহিমা স্থাপন করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাই তাহার সাক্ষী।

কোন পরিবারের দায়াদগণ স্ত্রীস্বত্বাধিকারের দায় হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করে, এবং "সতী"-আখ্যা প্রাপ্ত বিধবার পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ, চিতা-স্থানে গিয়া তাহার লোকান্তরিত আত্মার পূজা করে।

মহানুভব মোগলসম্রাট আক্‌বর এই প্রথা রহিত করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শেষে এই যশের ভাগী হইলেন, উদারনৈতিক লর্ড বেন্টিঙ্ক কিংবা স্ত্রী-স্বত্বাধিকারের প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় যাঁহার অবিশ্রান্ত বাদপ্রতিবাদে ও উত্তেজনাবাক্যে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজ সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। Ponce-Pilateর মত ভারতের ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই এইরূপ বলিয়া থাকেন, "এ হিন্দু ব্যাপার,—ইহাতে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, কড়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগটি পর্য্যন্ত যেন না দেওয়া হয়।" কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, উদার রাজনীতির প্রাদুর্ভাব হইল; ইহাই ভারতের পরম সৌভাগ্য। যে পরিবারে সতীদাহ হইবে সেই পরিবার এবং যাহারা ইহাতে সাহায্য করিবে সেই সব লোক দণ্ডিত হইবে, সেই সময়ে এইরূপ আইন জারী হইল। কিন্তু লোকে ইহার প্রতিরোধী হইল। বিশেষত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বলিদানের পাত্র, সে নিজেই ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল;—এই আইনের দ্বারা বীরত্বের দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া সে দুঃখিত হইল।

একজন ইংরাজ রাজপুরুষ যে একটি অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবে:—"মঙ্গলবার ২৪শে নবেম্বর ১৮২৯, এই প্রদেশের কোন সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে একটা দরখাস্ত পাইলাম। আজই প্রাতে উমেদ সিং উপাধ্যায় নর্ম্মদাতীরে মরিয়াছে; তাহার বৃদ্ধা পত্নী, তাহার সহিত চিতারোহণ করিবার অনুমতি চায়। * * * আমি ভয় দেখাইলাম, যে কেহ সতীদাহে সাহায্য করিবে সে দণ্ডিত হইবে * * * কিন্তু সেই রমণী অন্নজল স্পর্শ না করিয়া নদীতীরেই বসিয়া রহিল। তাহার পরদিন, তাহার মৃতদেহ ভস্মসাৎ হইল, সতীদাহ দেখিবার জন্য এই চিতার সম্মুখে অনেক লোক আসিয়া জমিয়াছে। তখন সেই বৃদ্ধা রমণী, নর্ম্মদা-নদী-গর্ভোত্থিত একটি নগ্ন শৈলের উপর বসিয়া আছে; পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছে; দিনমানে প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ, রাত্রিকালে উৎকট শীত—সমস্তই সহ্য করিতেছে। তাহার স্কন্ধে শুধু একখানি পাত্‌লা কাপড়। তাহার মনের সঙ্কল্প শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, মাথায় একটা লাল মোটা পাগ্‌ড়ী (ধাপা) বাঁধিল। এবং তাহার হাতের বলয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাতে করিয়া সে তাহার জাতিকুল হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইল—সংসারের সম্বন্ধে ইহা একপ্রকার মৃত্যু বলিলেই হয়। ইহার পরেও সে যদি বাঁচিতে ইচ্ছা করে, সে আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। সে বলিয়া উঠিল:—"আমার আত্মা উমেদ সিং উপাধ্যায়ের সহিত রহিয়াছে; এবং আমার ভস্ম উহাঁরই ভস্মের সহিত এই খানে মিশ্রিত হইবে। বিবাহ-বেদিকার নীচে আমাদের উভয়ের ভস্ম একসঙ্গে মিশিয়াছে,—আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।" এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিয়াছিল, এবং সেই সময়ে তাহার এরূপ একটা মুখের ভাব হইয়াছিল যে সেই দৃশ্যটি আমার মনে এখনও অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।" রাজপুরুষ মৈত্র ভয় দেখাইয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার নাড়ী অনেকক্ষণ হইল নিষ্পন্দ হইয়াছে, আমার আত্মা দেহ হইতে প্রস্থান করিয়াছে; এখন একটু ভূমিখণ্ড ছাড়া আর আমার কিছুই নাই;—সেই খানে আমার পতির ভস্মের সহিত আমার ভস্ম মিশাইব। অগ্নিদাহে আমার কোন কষ্ট হইবে না; তার যদি প্রমাণ চাও, তবে একটু আগুন জ্বালাও; ঐ আগুনে আমার হাত পুড়িবে, অথচ আমার একটুও কষ্ট হইবে না" * * * বাস্তবিকই তাহার নাড়ীর স্পন্দন আর জানা যাইতেছিল না। * * *

"অবশেষে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমি অনুমতি পাঠাইয়া দিলাম—সে সন্তুষ্ট হইল। তিন ঘটিকার পূর্ব্বেই স্নানের অনুষ্ঠান শেষ হইল। * * * স্নানের পর একটা পান চাহিল; পান চিবাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং এক-হস্ত তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্কন্ধে এবং অপর হস্ত তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, ধীরে ধীরে চিতাগ্নির দিকে অগ্রসর হইল। আমি শান্ত্রি পাহারা রাখিয়াছিলাম।

সে উঠিবামাত্র চিতায় আগুন দেওয়া হইল ; চিতা তথনই প্রজ্জলিত হইল। চিতা প্রায় দেড়-শ গজ দূরে ছিল। সে প্রশান্ত ভাবে, হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং একবার থামিয়া আকাশের দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিল, "নাথ! উহারা কেন আমাকে পাঁচ দিন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল ?" যেখানে শান্ত্রির পাহারা ছিল, সেই খানে আসিয়া পৌছিলে, যাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া চলিতেছিল সেই আত্মীয়েরা সেই খানে দাঁড়াইল। * * * বৃদ্ধা চিতাকে প্রদক্ষিণ করিল, তাহার পর একবার থামিল, এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, কতকগুলি ফুল আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, শান্ত-ভাবে ও দৃঢ়চিত্তে চিতারোহণ করিয়া অনলের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিল। এবং পিছনে ঠেসান দিয়া বসিয়া অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখ হইতে একটি হাহুতাশ-বাক্য বাহির হইল না—যন্ত্রণার কোন চিহ্নমাত্র প্রকাশ করিল না। * * * তার আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্যায় করা হইবে যদি এ কথা আমি না বলি যে তাহারা এ কাজ হইতে বিধবাকে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল।"

কিন্তু এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক, অন্য সকল পরিবারেরই যে এই পরিবারের মত ব্যবহার তাহা নহে। চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে কত সতী এই অনুষ্ঠান হইতে পরাঙ্মুখ হয়! কিন্তু তাহাদের আত্মীয় স্বজন ইচ্ছাপূর্ব্বক মাদক সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগকে চিতা স্থানে লইয়া যায় এবং অনলে নিক্ষেপ করিবার জন্য তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে।

সহমরণ প্রথা রহিত করা কাজটা ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা দয়ার কাজে ইংরাজ সরকারের অনুরাগ আকর্ষণ করা—সে কাজটা আরও ভাল। কিন্তু এইখানেই কি বিধবার সমস্ত কষ্টের অবসান হইল ? তাহার অন্য আনুসঙ্গিক কষ্ট নিবারণের উপায় কি ? সরকার হিন্দু-বিধবাকে সহমরণ হইতে রক্ষা করায় হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-পরিবার ইহার প্রতিশোধ লইল। অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া, অভিশপ্ত হইয়া, কলঙ্কিত হইয়া, অপর্য্যাপ্ত তিরস্কার ও উৎপীড়নে মর্ম্মাহত হইয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কিংবা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া হতভাগ্য বিধবার আর কোন উপায় রহিল না। পাঁচ বৎসরের বিধবাই হউক, ত্রিশ বৎসরের বিধবাই হউক, বাস্তবিক বিধবাই হউক, বা নামমাত্র বিধবাই হউক—তাহার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ। সে জন্মের মত বিধবা!

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহার গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর। উপদেশের সহিত দৃষ্টান্ত মিলিত করিবার জন্য, তিনি একটি বিধবার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দেন। এই পুস্তক প্রকাশ, সেই সময়কার একটা বিশেষ ঘটনা। প্রথম মুদ্রাঙ্কনের দুই হাজার খণ্ড এক সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। যে দেশে অণুপরিমাণ লোক পড়িতে পারে, সে দেশের পক্ষে ইহা কম কথা নহে! ইহার তুলনায় শান্তশিষ্ট ব্রাহ্মণ-দের উদ্যানে গরুর হাড় নিক্ষেপ করাও কম নিন্দার বিষয়। তাতে আবার বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবচনের দ্বারা তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিলেন, ইহা আরও ধৃষ্টতার কথা। তিনি দেখাইয়াছেন, পরাশর বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। উত্তরকালে যে সব নিষেধ বচন শঠতাপূর্ব্বক শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে, ইংরাজ সরকার, আইনের দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আইন-কানুন এ স্থলে নিষ্ফল ; কেন না, মহাপ্রভাবশালী বর্ণভেদপ্রথা, রাজবিধির আশ্রিত বিধবাকে জাতিচ্যুত করিল, সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকার হইতে সে বঞ্চিত এই রূপ ঘোষণা করিল। এক দিকে আইনের অনুমোদন, আর একদিকে হিন্দুসমাজের নামঞ্জুরি! হিন্দুসমাজের মতে ইহা বিবাহ নহে, ইহা নিছক বেশ্যাপরিগ্রহ।

বিদ্যাসাগরের হস্তস্খলিত পতাকাটি বোম্বায়ের সংবাদপত্র প্রকাশক পার্সি ম্যালাবারী আবার তুলিয়া লইলেন। সমিতির পর সমিতি, মন্ত্রণা সভার পর মন্ত্রণা সভার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাঁহার জ্বলন্ত বাণীকে,—পুরাতন হিন্দুস্থানের হৃদয়দেশে—এমন কি, প্রতিবাদীদিগের মধ্যেও লইয়া গেলেন। লোকমতকে আন্দোলিত করা—আইনের দ্বারা ইংরাজ সরকারকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগরের প্রার্থনায় ১৮৫৬

খৃষ্টাব্দে যে বিধবাবিবাহের আইন জারী হয়, সেই আইন এই ভাবে সংশোধন করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন, যাহাতে সেই আইনের বলে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক, যাহাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা জাতিচ্যুত হইতে না পারে। ম্যালাবারী জাতির বিরুদ্ধে, পরিবারের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় চাহিলেন। ইংরাজ সরকার মনে করিলেন, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে তাঁহাদের কোন গুরুতর আপত্তি নাই। কিন্তু কাজে তাঁহারা কিছুই করিলেন না,—তাঁহারা বলিলেন,—"যথেষ্ট সংখ্যক লোক যখন ইহার জন্য প্রার্থনা করিবে, তখনই আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।" ইঙ্গ-ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন কাজের পরিচালক বা প্রথম প্রবর্ত্তক হইবার অভিমান রাখেন না—তাঁহারা শুধু লোকমতের অনুসরণ করেন।

সংস্কার কার্য্যে ইংরাজ-সরকার নিশ্চয়ই বহুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। কেন না, এদেশে, লোকমত বড়ই মন্থরগামী। চিরপ্রথা ও চির সংস্কারের প্রভাবে এখানকার অধিকসংখ্যক লোকই বিধবাবিবাহের বিরোধী পক্ষ। পক্ষান্তরে যাহারা সংস্কারকার্য্যে সাহসপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর তাহারা সমাজবিপ্লবকারী। কংগ্রেসের সংস্কারক দল কি চাহেন? সামাজিক-মন্ত্রণা-পরিষৎ এখন কি চাহেন? পতিকে না জানিয়াও পতি-বিয়োগে যাহাদিগকে চিরজীবন শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে হয় কেবল সেই বাল-বিধবাদের বিবাহ যাহাতে অনুমোদিত হয়—তাঁহারা শুধু ইহাই চাহেন। পাতিব্রত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কি অপূর্ব্ব ধারণা! কিন্তু সব কথা এখানে বলা আবশ্যক এ স্থলে ধর্ম্মের সহিত মানব স্বার্থ জড়িত। বিধবারাও যদি বিবাহের প্রার্থী হয়, তাহা হইলে এ দেশে যত না গ্রাহক তাহা অপেক্ষা মালের আমদানী বেশী হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান অবস্থায়, বিবাহ-বাজারে কুমারীদের পুরাপূরী লাভ।

বাল্যবিবাহই যত অনিষ্টের মূল। কোন পরিবারের কোলের শিশুরও বিবাহ দেওয়া হয়—ইহাতে নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়া আর কাহারও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। এই স্থলে পারিবারিক স্বার্থই সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব করে। পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ আপনার ইচ্ছা অনুসারে, আপনার স্বার্থ অনুসারে যেমন একদিকে নবজাত কন্যা-সন্তানকে হত্যা করেন, বিধবাকে চিতানলে দগ্ধ করেন, সেইরূপ বালিকারও বিবাহ দিয়া থাকেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারির হিসাব-অঙ্ক, নীরব জ্বলন্ত ভাষায় সমস্ত গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছে। দশ বৎসরের কম বয়সের ২০ লক্ষ বিবাহিতা বালিকা; তন্মধ্যে ৬২,০০০ বালিকা বিধবা হয়। ৫ বৎসরের কম বয়সের ৫০১৯ পুং-শিশুর বিবাহ হয়। এইসব অপরিপক্ক বিবাহের পরিণাম অতীব বীভৎস। আমরা দেখিয়াছি কতক সংখ্যক ক্ষুদ্র বালিকা চিরবৈধব্য ভোগ করে এবং আর কতকগুলির জন্য আইনসঙ্গত বলাৎকার নির্দ্দিষ্ট! আক্‌বর অপরিপক্ক পাত্রের বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের বক্ষের মধ্যেই, সুসংস্কৃত ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল বাক্য ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার বিষময় পরিণামের কথা প্রচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং যেখানে রামমোহন রায়ের অন্তরগত মূল-ভাবটি বহুকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়, বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিম্নতম সীমা, পুরুষের জন্য ১৮ বৎসর ও স্ত্রীলোকের জন্য ১৪ বৎসর নির্দ্ধারিত হইল। এস্ মেন্ সাহেব এই আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। এই দুঃসাহসিক উন্নতি-সাধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রাচীন সম্প্রদায় হইতে তীব্র প্রতিবাদ সমুত্থিত হইল। এই প্রতিবাদে সরকার বাহাদুর আবার একটু পিছাইয়া গেলেন। এই আইন ব্রাহ্মদের মধ্যেই বদ্ধ রহিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নববিবাহিতা বালিকা, তাহার নির্লজ্জ পতির হস্তে অকালে সমর্পিত হওয়ায়, বলাৎকারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রীস্বত্বসমর্থক ম্যালাবারি, এই কলঙ্ককাহিনী চারিদিকে খুব ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় মন্ত্রণা-সভা, বালিকার বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিম্নতম সীমার বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন। সাধারণের ধর্ম্মজ্ঞান এইবার মর্ম্মাহত হওয়ায়, ইংরাজ সরকার বাধ্য হইয়া বিবাহের চরম-পরিণতির নিম্নতম সীমা বাড়াইয়া দ্বাদশবর্ষ নির্দ্ধারিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ সামাজিক মন্ত্রণাসভা—যাহার অধিবেশনে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে আমি উপস্থিত ছিলাম—সেই

দর্শা, সমাজসংস্কারের যে প্রথম আদর্শ প্রস্তুত করেন, তাহাতে "সামাজিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর" বলিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়। স্ত্রীলোককে যে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে হইবে একথা এযাবৎকাল কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আজও পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে অর্দ্ধ শতকরা মাত্র লেখাপড়া জানে। তাই, কোন হিন্দু গৃহের গৃহিণী, যিনি সকল বিষয়েই অজ্ঞ, এবং যাঁহার দীক্ষাগুরুও তাঁহারই মত অজ্ঞ, অনুন্নত, নিম্ন পদবীর একজন ব্রাহ্মণ,—সেই গৃহিণীর নিকট, যাহা কিছু একটু নূতন, তাহাই বিভীষিকাময়, সামান্য যে কোন পরিবর্ত্তন তাহাই নাস্তিকতার সামিল। মন্ত্রণা-সভায় সভাপতি, সেই সব লৌকিক ও পারমার্থিক সভা-সমিতির প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিয়াছেন যাঁহারা বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও বিধবাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথমেই খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা এই বিষয়ে পথ দেখান। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম-পাঠ্যের ও উচ্চ-পাঠ্যের বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষালয় স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলিকাতায় বেশ একটা বর্দ্ধিষ্ণু বিদ্যালয় আছে; ড্রিক্‌ওয়াটার বীটন (বেথুন) এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, পরে ইংরাজ সরকারও ইহার উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী, বি,এ,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বোম্বাই নগরে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে। পার্সিরাই সেখানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। মান্দ্রাজেও বড় বড় সহর মাত্রেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহ যদিও সকলের জন্যই অবারিত,—সেখানে ব্রাহ্মণ কন্যা ছাড়া অন্য বর্ণের বালিকাদের বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাধারণের সংস্কার এই—বিদ্যাশিক্ষা ব্রাহ্মণের—একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কার্য্য। ব্রাহ্মণই অন্যের হইয়া জ্ঞানানুশীলন করিবে, চিন্তা করিবে। আমি কলিকাতার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দুর্লভ অনুগ্রহ ও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বালিকারা সবাই উচ্চ বর্ণের। উঁহাদের অসমুজ্জ্বল রং, লম্বা কোঁকড়া চুল, সোজা নাক,—হঠাৎ দক্ষিণ য়ুরোপের বালিকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু উঁহাদের সেরূপ উজ্জ্বল দীর্ঘায়ত চক্ষু নহে, তবে উঁহাদেরই মত কালো চুল। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় বিস্তৃত; ইংরাজী; সংস্কৃত, অঙ্ক গণিত। একজন শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলিলেন;—"দুঃখের বিষয়, আমাদের কাজটাই পণ্ডশ্রম; শিক্ষার অর্দ্ধপথেই, বালিকারা আমাদিগকে ছাড়িয়া পতিগৃহে প্রবেশ করে। কেন না, উঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিতা।" শিক্ষয়িত্রী একটি ৮।৯ বৎসরের বালিকাকে দেখাইয়া বলিলেন; "এই দেখুন, এই বালিকাটি বেশ বুদ্ধিমতী কিন্তু উহার স্বামীর আদেশ আসিয়াছে আগামী বৎসরেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।" কলুর বলদের মত উহারা একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকের অবস্থার সংস্কার করিতে চাও,—উহাদিগকে শিক্ষা দেও, স্বাধীনতার ইচ্ছা উহাদের মনে উদ্রেক কর। কিন্তু ইহার প্রতিবন্ধক এই:—উহাদের এই দাসত্ব বিদ্যমানে শিক্ষা উঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুরা বালিকা-বিদ্যালয়কে সমাজের শত্রু বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, সে-কালের মেয়েরা পাক করিত, স্বামীর ঘর-সংসার দেখিত, গৃহের বিগ্রহকে সজ্জিত করিত, এবং অপদেবতাকে তাড়াইবার জন্য ঘরের মেজেতে গোবর লেপন করিত। আর অধিক কি চাও? ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারা, যাহাতে চিত্তবিনোদন হয় এরূপ ধরণের কথা বলা, স্বামীর জীবনের,—স্বামীর চিন্তাকল্পনার অংশভাগী হওয়া—এ সমস্ত গৃহিণীর কাজ নহে। ইহা নর্ত্তকীর কাজ; জাপানে এই সমস্ত কাজ "গেইশারা" করিয়া থাকে। আমি একজন জাপানীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম:—"তোমাদের পার্লেমেণ্টে ভাল ভাল বক্তা আছে কি?" তিনি বলিলেন:—"না, আমাদের গেইশা নর্ত্তকী আছে। ইহাদের কথাবার্ত্তা খুব সরস।" বড় বড় গেইশারা রসিকতার ভাণ্ডার খুলিয়া বসে। তাহাদের চোখাল-চোস্তাল সরস কথাগুলা সহরের সমস্ত লোকের মুখে-মুখে চলিতে থাকে, গেইশারা মন্ত্রি-ভবনে যাতায়াত করে, এবং গেইশাদের গৃহে সাদরে গৃহীত হওয়া একজন রাজ-সচিবের পক্ষেও পরম গৌরবের বিষয়। তা ছাড়া, এই শ্রেণীর রমণীরা বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয় বলিয়া, ইহারাই জাপানী সমাজে (Marquise) রাণী উপাধি প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখ, এসিয়ায় স্ত্রীলোকদিগকে



বিদ্যাশিক্ষা দিলে কিরূপ বিভ্রাট ঘটে। তাই এখানে শিক্ষার মর্য্যাদা কমিয়া গিয়াছে। এখানে অজ্ঞতাই "গেরস্ত" রমণীর বিশেষ লক্ষণ।

মনে হইতেছে, আমি একবার কোন গৃহস্থের বৈঠকখানায় একটি হিন্দু মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি নিজে কোন কথা না কহিয়া খুব সলজ্জভাবে তাঁহার স্বামীর কথা শুনিতেছিলেন। আমি লাহোরের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় বক্তার মঞ্চে অনেকগুলি মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে একটি মহিলা, পুরুষ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সাহসপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। যে সকল মহিলা অবরোধ হইতে বাহির হইয়াছে,—যাহারা ইংরেজীধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যাহারা নানাপ্রকারে আত্মবিনোদন করিয়া থাকে, যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া মিত্রগৃহে যাতায়াত করে, নিজের বৈঠকখানায় পুরুষ মিত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করে, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। গোঁড়া হিন্দুর ভাষায় বলিতে গেলে, অল্প মহিলাই এ রোগে আক্রান্ত। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুরা বলে—যাহাতে জঘন্য প্রেমের দৃশ্য সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত এইরূপ নাটক নভেল উহারা পাঠ করে। তবু ফরাসী নভেল এখনও ভারতে প্রবেশ লাভ করে নাই। জাতীয় ধর্ম্মজ্ঞান যাহার জন্য সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে, সেই নভেলগুলা কিরূপ ধরণের? উহাতে হাবভাবের বর্ণনা আছে এইরূপ দোষারোপ করা হয়। তাহাতে প্রসাধনকক্ষের বর্ণনা আছে। আমাদের নভেল লেখকেরা এরূপ কক্ষের বর্ণনা করিতে পারিলে ত খুবই খুসী হয়। চূড়ান্ত অপরাধ এই :—কতকগুলি মহিলা আপনাদের স্বামীর সহিত একত্র বসিয়া য়ুরোপীয় খাদ্য আহার করে। অবশ্য ইহার জন্য তাহারা জাতিচ্যুতি দণ্ডে দণ্ডনীয়।

আমি যখন ভারতের উত্তর প্রদেশে কপুরতলায় ছিলাম, সেখানকার কালেজের একজন অধ্যাপক প্রায়ই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি লাহোরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট আত্মীয়। এই জৈনধর্ম্মটা যে কি, কেহই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কোন য়ুরোপীয়ের সহিত এক সঙ্গে চুরটের ধূমপান করা নিষিদ্ধ নহে, তাই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে একটা চুরট গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে চা পান করিতে অনুরোধ করায় তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের নারীপূজায় যেরূপ বিস্মিত এমন আর কিছুতে নহে। তিনি বলিলেন—"তোমরা নারীকে কুলঙ্গির মধ্যে রাখিয়া দেবতার মত পূজা কর।" আমি বলিলাম—"না, আমরা এসিয়ার লোকের মত নারীকে দাসী জ্ঞান করি না; আমাদের সমকক্ষ, আমাদের সঙ্গিনী বলিয়া মনে করি। ইহাতে তোমাদের মাতার প্রতি—পত্নীর প্রতি সম্মানের অভাব প্রকাশ পায়—উহাদিগকে পায়ের নীচে রাখা নিছক স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে।" এই কথায় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আমার স্ত্রী ত কিছুতেই বঞ্চিত নহে; তবে কিনা আমার আহার হইয়া গেলে, তিনি আহার করিতে পান এই মাত্র। তিনি মনে করেন, স্বামীর আগে আহার করিলে, স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ করা হয়। আমার স্ত্রী আমার সহিত একত্র আহার করেন না, একত্র শয়ন করেন না। স্ত্রীর সহিত সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকাটা ভাল নহে। স্ত্রী একটা প্রলোভনের সামগ্রী"। তাহার পরেও এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—"এবিষয়ে আপনাদের কিরূপ রীতিনীতি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হয়। আমাদের রমণীরা ত সতীত্বের আদর্শস্থল, কিন্তু আপনাদের * * * সেরূপ খ্যাতি নাই বলিয়াই ত শোনা যায়। অন্ততঃ ইংরাজের মুখে শোনা যায়, আপনাদের রমণীদের সতীত্ব নাই—আবার ফরাসীর মুখে শোনা যায়, ইংরাজ রমণী আরও খারাপ * * *"। তাহার পর আরও একটা কথা বলিলেন;—"আমার মনে হয় স্ত্রীলোকেরা শিশুর মত। তারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; হয় ত একটা খাদের ধার দিয়া চলিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসে, আরও কত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করে—তাহাদিগকে এমন কঠিন ও সূক্ষ্ম লৌহজাল দিয়া বেষ্টন করা উচিত যে তাহার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে না পারে।"

সমাজবন্ধনের শুভফল সম্বন্ধে ভারতের কিছুই শিখিবার নাই। সমাজ যে উৎপীড়ন করে, তাহার বিনিময়ে সমাজ বর্ণভেদপ্রথার দ্বারা কতকগুলি উপকারও করিয়া থাকে। কেন না বর্ণভেদপ্রথা, কতকটা সমাজে নীতি রক্ষার দিকে প্রভাব প্রকটিত করে; দরিদ্র ও রোগীর সেবাভার গ্রহণ



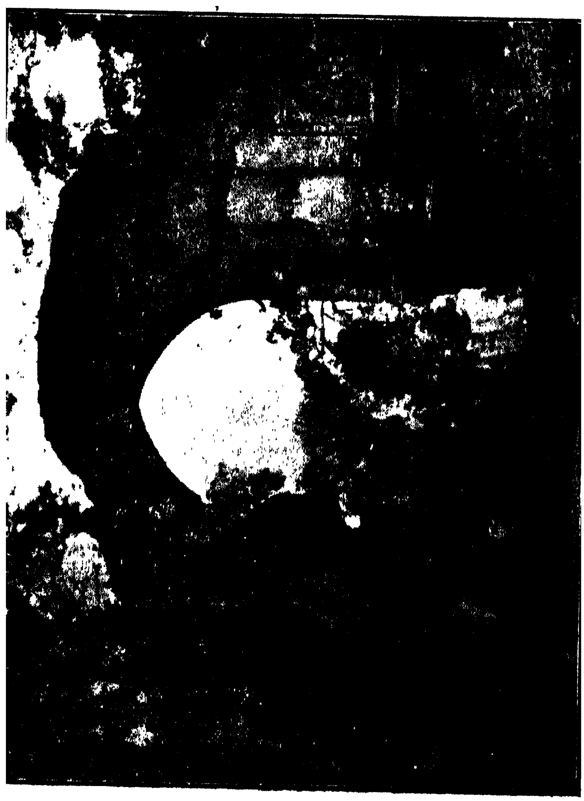
ফিরোজ মিনার।



চিত্রিত ও খোদিত ইষ্টক



বাব



পার্শ্বে যে পুরাতন পরিখা বর্ত্তমান ছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এখানে কোনও নগরতোরণ বর্ত্তমান নাই। আধুনিক রাজপথ এখানে আসিয়া প্রাচীর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানের নাম "কাটাগড়।" গড় কাটিয়া রাজপথ নির্ম্মাণ করিবার সময় হইতে এই নাম প্রচলিত হইয়াছে। এই স্থানে মৃৎপ্রাচীরে আরোহণ করিয়া গ্রাম্যপথ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে ভাগীরথী পর্য্যন্ত গমন করিলে, যেস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম,—"পাতাল-চণ্ডী"। অবস্থান দেখিলে মনে হয়,—এই পর্য্যন্তই লক্ষ্মণাবতীর দক্ষিণ সীমা। ইহার দক্ষিণে যে নগরোপকণ্ঠ বর্ত্তমান ছিল, পাঠানশাসন সময়ে তাহাই রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। "কাটাগড়" নূতন পুরাতন উভয় নগরের সন্ধিস্থল। ইহার অদূরে—পশ্চিমদিকে—"চাঁদদ্বার" নামক নগরতোরণ;—লোকে সেই নগরতোরণ দিয়া উভয়নগরে যাতায়াত করিত। এখন উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশে গমন করিতে হইলে, সকলেই প্রচলিত রাজপথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং "পাতালচণ্ডী" এবং "চাঁদদ্বার" পর্য্যটকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে না।

"কাটাগড়" ছাড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, আবার একটি পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ মৃৎপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে "কোতুয়ালীদ্বার" নামক নগরতোরণ বর্ত্তমান আছে। তাহার ভিতর দিয়া পুরাতন রাজপথ প্রচলিত ছিল। এখানে আসিয়া আধুনিক রাজপথ পুরাতন রাজপথের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণে নগরোপকণ্ঠ;—তাহার নাম ফিরোজপুর। উত্তরে "চাঁদদ্বার," দক্ষিণে কোতুয়ালীদ্বার, পূর্ব্বে মৃৎপ্রাচীর, পশ্চিমে ভাগীরথী,—এই চতুঃসীমার মধ্যে পাঠান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন "গৌড়" বলিতে মালদহের লোকে এই স্থানকেই দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ইহার সর্ব্বত্র ছোট বড় অসংখ্য জলাশয়। কচিৎ দুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নিকটে এবং দূরে বিজন বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে হলচালনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই অংশের উল্লেখযোগ্য দৃশ্য,—(১) পিয়াসবাড়ী, (২) রামকেলি, (৩) বারদুয়ারী (৪) গৌড়-দুর্গ (৫) ফিরোজ মিনার (৬) ছোট সাগরদীঘি (৭) তাঁতিপাড়া [illegible] এবং (৯) কোতুয়ালীদ্বার।

পিয়াসবাড়ী।

প্রচলিত রাজপথের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি উচ্চভূমির উপর এক "ডাক বাঙ্গলা" নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় বিশ্রামের সুব্যবস্থা আছে। সেই বিশ্রামাগারের পশ্চাদ্ভাগে একটি সুন্দর সরোবর। তাহারই নাম "পিয়াস বাড়ী।"

পিয়াসবাড়ীর নাম পিয়াসবাড়ী হইল কেন, আবুল্ ফজল্ তাহার এক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "এই সরোবরের জল এরূপ বিষাক্ত ছিল যে পান করিলেই মৃত্যু হইত। যাহারা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইত, তাহারা এখানে কারারুদ্ধ হইত। তাহাদের পক্ষে পিপাসার সময়ে এই সরোবরের জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয় লাভের ব্যবস্থা ছিল না। হতভাগারা যতক্ষণ পারিত, পিপাসা সহ্য করিত;—অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া জল পান করিত; এবং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। সম্রাট আক্‌বর এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

এই কাহিনী কতদূর সত্য, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মেজর ফ্রাঙ্কলিন্ গৌড় পরিদর্শন করিয়া যে সচিত্র গৌড় বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই সরোবরের জল "উপাদেয়" বলিয়া উল্লিখিত আছে। জল এখনও তক্ তক্ করিতেছে; লোকেও তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন এই সরোবরের জল বিষাক্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, লোকে এখনও বিষাক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিত;—সাহস করিয়া বিষাক্ত জল ব্যবহার করিত না। মহামারীতে অনেক সরোবরের জলই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এখনও অনেক সরোবরের জল অস্বাস্থ্যকর। পর্য্যটকগণ সেই ভয়ে কোন সরোবরের জলই স্পর্শ করেন না।

পিয়াসবাড়ীর অনতিদূরে আর একটি সরোবর আছে। সেখানে এক ফকিরের "আস্তানা" দেখিতে পাওয়া যায়। সরোবরটি কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। লোকে কুম্ভীরকে "সির্ন্নি" দিয়া কাম্যফল লাভ করে,—এইরূপ জনশ্রুতি ফকিরকে ও কুম্ভীরদলকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সরোবরতীরে অট্টালিকাদি বর্ত্তমান ছিল;—তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে;—কিন্তু সেকালে এখানে কি ছিল, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গৌড়ের সকল সরোবরেই কুম্ভীরের আতিশয্য। বৃহৎ কুম্ভীর—অসংখ্য কুম্ভীর—জলে এবং সরোবরতীরে (কথন কথন) কুম্ভীর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ফকিরের কুম্ভীর পোষ মানিয়া গিয়াছে। খাদ্য লাভের লোভে এই সকল কুম্ভীর ফকিরের আহ্বানে নিকটে অগ্রসর হইয়া থাকে। যাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না, তাহারাও কৌতুক দেখিবার জন্য খাদ্যদান করিয়া থাকে। এক সময়ে বনে বাঘ এবং সরোবরে কুম্ভীর গৌড়ের ধ্বংসাবশেষকে বিভীষিকাময় করিয়া রাখিয়াছিল। শিকারীদিগের চেষ্টায় ব্যাঘ্রভীতি ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে। কিন্তু কুম্ভীর এখনও সরোবরে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে আধিপত্য রক্ষা করিতেছে।

রামকেলী।

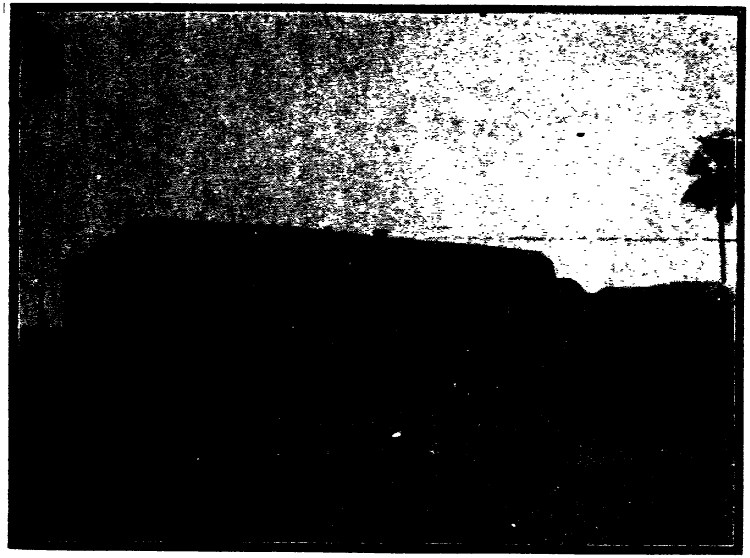
পিয়াসবাড়ীর নিকট একটি গ্রাম্যপথ পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া প্রচলিত রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গ্রাম্যপথ বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি সুপরিচিত পুণ্যপথ। এই পথের পার্শ্বে রামকেলি গ্রাম। তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইহা একটি পুরাতন মেলা। রামকেলি গ্রামে হোসেন শাহ বাদশাহের সুবিখ্যাত মন্ত্রী "দবির খাশ" এবং "সাকর মল্লিক" বাস করিতেন। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। উভয়েই হিন্দু,—সদ্বংশজাত, সুপণ্ডিত। শাসনকৌশলের জন্য বাদশাহের দরবারে তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত,—চিরস্মরণীয়। তাঁহাদের প্রকৃত নাম রূপ সনাতন;—"দবির খাশ" ও "সাকর মল্লিক" বাদশাহ প্রদত্ত উপাধিমাত্র। রামকেলি গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থলীর শেষ স্মৃতিচিহ্ন—একটি সুবৃহৎ সরোবর—এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার নাম—"রূপসাগর।" বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তসমাজ "রূপসাগরের" ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

রামকেলির সকল কথাই রূপসাগরের কথা। বাদশাহের বিচক্ষণ মন্ত্রিযুগল রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাহার নাম সংসার-সাগর। ঐশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা, রাজভক্তি মোহজাল বিস্তৃত করিয়া ভ্রাতৃযুগলকে রাজদরবারের রূপসাগরে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তখন গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে আর এক রূপসাগরের প্রবল তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার কথা প্রচার করিবার জন্য হরিনামামৃতরসে গ্রাম নগর প্লাবিত করিতে করিতে রামকেলিতে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া একটি কেলিকদম্বমূলে আসন গ্রহণ করেন। স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য বৃক্ষমূলে একটি ইষ্টকবেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহাও কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সেখানে বসিয়া, মহাপ্রভুর মুখে প্রকৃত রূপসাগরের কথা শুনিয়া, রূপসনাতন চিরজীবনের জন্য তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে চিরপ্রস্থান করিলে, তাঁহাদের পুণ্যাশ্রম বৈষ্ণবসমাজের প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁহাদের লেখনী বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনায় নূতন আবেগ উপস্থিত করে;—তাঁহাদের আদর্শ-জীবন ভক্তসমাজে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এখন তাহার কথা বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। যে স্রোত এইরূপে ভারতব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রামকেলি গ্রামই তাহার পুণ্য প্রস্রবণ। তাহার ধূলিধূসরিত গ্রাম্যপথে,—কেলি-কদম্বমূলে,—রূপসাগর তটে,—অদ্যাপি কত ভক্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, নামসংকীর্ত্তনে বনভূমি মুখরিত করিয়া থাকেন। এখনও রামকেলির "শ্রীপাট" রক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ এখানে বাস করিতেছেন। কিন্তু রামকেলির বাহ্যদৃশ্য শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে!

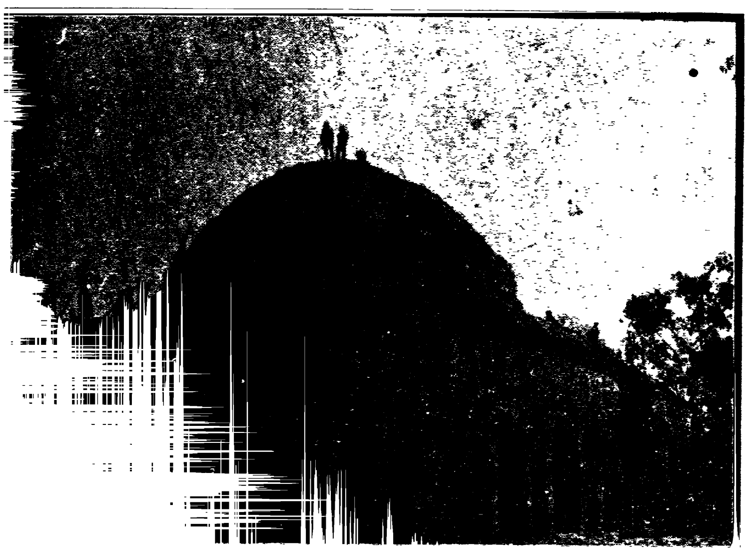
বারদুয়ারী।

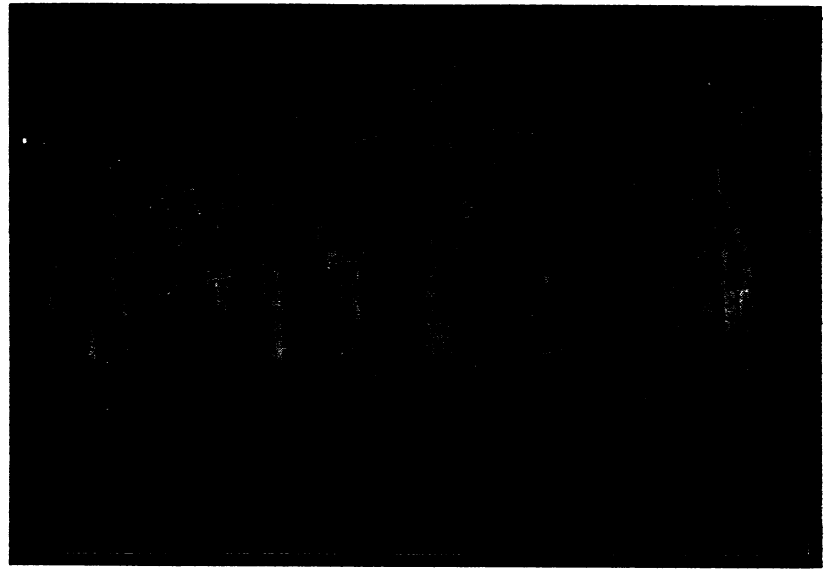
রামকেলির অনতিদূরে "বারদুয়ারী" নামক সুবিখ্যাত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। তাহার পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ,—উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিক হইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটি তোরণ দ্বার। পূর্ব্ব তোরণ দ্বারের সম্মুখে এক সুবৃহৎ সরোবর। তাহা এখন জলজ লতাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তোরণ দ্বারের ভগ্নদশা, বারদুয়ারীর ভগ্নদশা, তিন্তিড়ীবৃক্ষের অক্ষুণ্ণ প্রতাপে এই স্থানকে বিজনবনে পরিণত করিয়াছিল। কতকাল এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আবার জীর্ণ সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে।

বারদুয়ারী একটি "জুমা মস্‌জেদ"। তিন দিকের তিনটি তোরণ দ্বার দিয়া সহস্র সহস্র উপাসক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত হইত। প্রাঙ্গণের সম্মুখেই মস্‌জেদ,—১৮০' ফুট দীর্ঘ



তাঁতিপাড়ার মস্‌জেদ।





বার দুয়ারী—সম্মুখ দৃশ্য।



ফুট প্রস্থ, ৪০ ফুট উচ্চ,—উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত,—তাহার উপর ৪৪ গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছয়টি মিনার এই মসজেদের শোভা বর্দ্ধন করিত। সম্মুখের একাদশ প্রবেশ দ্বার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখন একটি কক্ষের, একাদশ গম্বুজের, এবং একাদশ প্রবেশ দ্বারের জীর্ণসংস্কার সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সম্মুখ হইতে দেখিলে, পূর্ব্বাবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণে আর বৃক্ষলতার প্রাদুর্ভাব নাই,—তোরণ দ্বারও পুনর্গঠিত হইতেছে,—দুই চারিটি তিন্তিড়ীবৃক্ষ ভিন্ন দৃষ্টিপথের অবরোধজনক বনজঙ্গল তিরোহিত হইয়াছে।

ইহাতে বাদশাহের নমাজের স্থান ছিল। তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রবেশ কক্ষও দেখিতে পাওয়া যাইত। মসজেদের ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই। মেজর ফ্রাঙ্কলিন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময়ে রাজমহল হইতে গৌড় পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া যে সচিত্র বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বিলাতে সুরক্ষিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পর্য্যন্তও এই মসজেদের ফলকলিপি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বাদশাহের পুত্র নসরিৎ শাহ বাদশাহের উদ্যোগে এই বিচিত্র উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হয়।

বারদুয়ারী বৃহৎ এবং সুন্দর। ইহা সেই জন্যই সুবিখ্যাত। সম্মুখের যে কক্ষটির জীর্ণসংস্কার সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রথম কক্ষ—বারান্দা মাত্র। তাহার উত্তর দক্ষিণে দুইটি দ্বার। সকল দ্বারই খিলানযুক্ত। উত্তর দিকের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে, গঠনগৌরবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। খিলানের পর খিলান,—ক্রমে দূর হইতে আরও দূরে প্রসারিত বলিয়া, এক অপূর্ব্ব দর্শনমোহে দর্শকচিত্ত অভিভূত করে;—মনে হয়, সম্মুখে এক অন্তহীন দৃশ্যপট সুবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে—সকল স্থানেই,—ইষ্টক প্রস্তরের কারুকার্য্য চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। যাহা আছে, তাহাতেই, যাহা নাই তাহার জন্য হৃদয় মন অব্যক্ত বেদনা ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে! সকলের শেষ কক্ষে সমাধি,—প্রস্তরময়—সুন্দর। মাথার উপর হইতে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সমাধিগুলি ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে।

এই সমুচ্চ উপাসনা মন্দির উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, বহুদূর হইতে লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিত। এখন চারিদিকে বিজন বন। নিকটে না আসিলে, বারদুয়ারী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন আর এক নূতন সৌন্দর্য্য পরিদর্শকগণকে আনন্দ দান করে। "বারদুয়ারী" কত সুবর্ণ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ ইহাকে "সোনা মসজেদ"* বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ফিরোজ-মিনার।

যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর "বারদুয়ারী" নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বে দুইটি পুরাতন রাজপথ বর্ত্তমান ছিল; যাহা উভয় তোরণ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইত। এখনও এই উভয় রাজপথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম পার্শ্বের রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতিদূরে রাজদুর্গের সুবিখ্যাত "দখলদরওয়াজা" দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পূর্ব্ব পার্শ্বের রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতিদূরে "ফিরোজ-মিনার" দেখিতে পাওয়া যায়। রাজদুর্গের পরিখার বাহিরে এই "মিনার" নির্ম্মিত হইয়াছিল,—ইহার পূর্ব্বদিকে রাজপথ, তাহার পূর্ব্বে সরোবর;—পশ্চিমে পরিখা, তাহার পশ্চিমে দুর্গপ্রাচীর।

আশাপীর নামক এক মুসলমান ফকির কিছুকাল এই "মিনারে" বাস করিয়াছিলেন। এ কালের লোকে তাঁহার নামেই মিনারের পরিচয় প্রদান করিত। কি উদ্দেশ্যে এই মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ বলেন,—উপাসকগণকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মিনার নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। যদি তাহাই হয়, তবে এখানে কেন? নিকটে ত কোন উপাসনালয় দেখিতে পাওয়া যায় না? নিকটে কেবল

* As the mosque bears no mark whatever of gold, its name "Sona musjid" must, in my opinion, have originated in the bulkiness of the materials and the expense of the erection, as both the stone and marble of which it is composed are of great solidity and durability, and were no doubt brought from a considerable distance.—Francklin's Report.

রাজদুর্গ,—মিনারে আরোহণ করিলে, তাহার অভ্যন্তর দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা বরং প্রহরিমন্দির বলিয়াই প্রতিভাত হয়। উচ্চে ৮০ ফুট, পরিধিতে ৩২ ফুট,—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর। ইহার একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, তাহা বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত কৃষ্ণমর্ম্মরে সুরচিত। শীর্ষদেশের গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, সোপানাবলী ঝড় বৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত হইতেছে. পর্য্যটকগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইষ্টকগাত্রে আপন নাম খোদিত করিয়া আসিতেছেন। এত দিনের পর ইহার আংশিক জীর্ণ সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। এই মিনারের নিম্নস্তর প্রস্তরময়, তাহার উপর ইষ্টকসজ্জা। প্রস্তরগুলি পূর্ব্বে কোনও দেবমন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিত; এখনও তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই।

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদশাহ মালিক ইন্দিল এই মিনার নির্ম্মিত করেন বলিয়া ষ্টুয়ার্টকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে। এখন কোনও ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই; তাহা এক সময়ে গুয়া মালতীর কুঠিতে রক্ষিত ছিল। রিয়াজ রচয়িতা গোলাম হোসেন বলেন,—এই মিনার হাব্‌শী নরপতি ফিরোজশাহার কীর্ত্তি,—তাহাই পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। নিরক্ষর কৃষকগণের নিকট ইহা একটি "চেরাগদানী" নামে পরিচিত। এখন ইহার নিকটে হলকর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে।

তাঁতিপাড়া।

মিনার ছাড়িয়া আরও কিয়দ্দূর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পুনরায় আধুনিক রাজপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পথের পার্শ্বে একটি পুরাতন মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ,—তাহা এখন তাঁতিপাড়া মস্‌জেদ বলিয়া সুপরিচিত। তাহাতে কোনও ফলকলিপি বর্ত্তমান নাই,—তাহা কোথায় গিয়াছে, তাহারও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা তর্কবিতর্কের পর অনেকে ইহাকে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ইহার নাম "তাঁতিপাড়া মস্‌জেদ" হইল কেন, তাহাও অল্প কৌতূহলের বিষয় নয়। স্থানের নামানুসারে নামকরণ করিতে হইলে, ইহাকে "মহাজনটোলার মস্‌জেদ" বলিতে হয়। নিকটে তাঁতিপাড়া বলিয়া কোনও স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারও জীর্ণসংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। ইহার ইষ্টকসজ্জা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাহিরে খোদিত ইষ্টকের রচনাপারিপাট্য, অভ্যন্তরে বিচিত্র প্রস্তরস্তম্ভের অপূর্ব্ব সমাবেশ। সম্মুখের প্রাঙ্গণে অনাবৃত স্থানে সমাধিপ্রস্তরের নিম্নে কাহার মৃতদেহ কবর-শায়িত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

লোট্টন মস্‌জেদ।

তাঁতিপাড়া ছাড়িয়া অল্পদূর দক্ষিণে অগ্রসর হইলেই ভারতবিখ্যাত লোট্টন মস্‌জেদ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহা বহুকাল বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন ছিল; সম্প্রতি জীর্ণসংস্কার আরব্ধ হইবার পর আবার ইহার শোভা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

ইহার রচনা-পারিপাট্যের বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব ইষ্টকসজ্জা। বাহিরের ইষ্টকগুলি নানাবর্ণে সুচিত্রিত মসৃণ—চাকচিক্যময়—বর্ণসামঞ্জস্যে চিত্তাকর্ষক। হরিৎ পীত এবং শ্বেতবর্ণের ইষ্টকগুলি এমন সুকৌশলে যথাবিন্যস্ত রহিয়াছে যে দেখিলে, বর্ণবাহুল্যে নেত্রজ্বালা উপস্থিত হয় না, দেখিয়া দেখিবার আশা পরিতৃপ্তি লাভ করে না। কোন্ পুরাকালে এ দেশের লোকে ইষ্টকগাত্র সুরঞ্জিত করিতে শিখিয়াছিল, এখন সে কলানৈপুণ্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে,—ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

গঠনকৌশলেরও বিশেষত্বের অভাব নাই। পূর্ব্বদিকে ৫৮০ ফুট পরিধিযুক্ত সরোবর। তাহার তীরে মস্‌জেদ,—তাহাতে আটটি মিনার,—সকলগুলি জোড়া মিনার। সম্মুখে একটি খিলানযুক্ত বারান্দা—৫০ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ, ৩৫ ফুট উচ্চ,—তাহা পার হইলেই মূল কক্ষ। তাহা ৩৬ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ,—উপরে একটি মাত্র প্রকাণ্ড গম্বুজ। পুরাতন কৃষ্ণমর্ম্মরস্তম্ভের উপর গম্বুজের ভারকেন্দ্র সুসংস্থাপিত। দেখিলে মনে হয়, এই মস্‌জেদ বুঝি ইষ্টক প্রস্তরের বিচিত্র স্বপ্নমন্দির!

ইহা কাহার কীর্ত্তি, জনশ্রুতি ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। লোকে বলে, ইহা বাদশাহের নর্ত্তকীর কীর্ত্তি,—তাহার নামানুসারেই ইহার নাম, "লোট্টন-মস্‌জেদ"। ফলকলিপি ছিল, তাহার শূন্যস্থান পড়িয়া রহিয়াছে।

ফ্রাঙ্কলিন যখন এই মসজেদ পরিদর্শন করেন, তখন ইহার ভগ্নদশা; সকল স্থান লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন! তথাপি তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি উত্তর ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্দির দর্শন করেন নাই।* তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে, দেখিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল প্রবল হইয়া থাকে। দেখিলে, সে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। যাহা আছে তাহাতে, যাহা নাই তাহার জন্য অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

কোতুয়ালী দ্বার।

লোট্টন-মসজেদের একক্রোশ দক্ষিণে কোতুয়ালী-দ্বার,—নগরের দক্ষিণসীমার প্রহরিমন্দির। দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরিসেনার বাসস্থান ছিল, তাহা এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে। খিলানটি ৪০ ফুট উচ্চ, তাহার নীচে রাজপথ।

কোতুয়ালী-দ্বার দূর হইতে দেখিতে বৃহৎ এবং সুন্দর। তাহার ভগ্নাবস্থার সহিত বনজঙ্গলের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়াছে। এই খানে দক্ষিণসীমার মৃৎপ্রাচীর। বাহিরে নগরোপকণ্ঠ,—ভিতরে অনতিদূরে উত্তরপূর্ব্ব কোণে "ছোট সাগরদীঘি"—৩০০০ ফুট দীর্ঘ, ১২০০ ফুট প্রস্থ। ইহার তীরে "মাদ্রাসার" ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহা হোসেন শাহার কীর্ত্তি বলিয়া সুপরিচিত।

মালদহের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার মিঃ কিং সাহেব এই নগরতোরণের অনতিদূরে এক প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি ৮৬০ হিজরী শকে কোতুয়ালী-দ্বার মাহমুদ শাহ বাদশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* I have not myself met with anything superior to it for elegance of style, lightness of construction, or tasteful decoration in any part of upper Hindoostan —Franklin's Report.

শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী।

উবায়ু-গন্ধ-তৈল।

আমাদের ভারত ফুলময়ী গন্ধরাণী; বনের তৃণ, গুল্ম, লতা; ফুল, ফল, বীজ, এমন কি কাষ্ঠ ও জন্তুতে পর্য্যন্ত তাঁহার সৌগন্ধসম্ভার সঞ্চিত রহিয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে অগুরু চন্দন, ধুপ, ধুনা, গুগ্গুল, মৃগনাভি, চুয়া প্রভৃতি স্বভাবজ সুগন্ধি সামগ্রী ব্যবহৃত হইত। প্রতি পুষ্পের সুগন্ধকণা চুনিয়া চুনিয়া পুঞ্জীভূত করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় বোধ হয় মোগল সম্রাটদিগের বিলাস বিভবের একটি শুভময় ফল। এক্ষণে আমরা বৈলাতিক মোহে হিতবোধশূন্য হইয়া ছুটিয়াছি; গাজিপুরের গোলাপজল, আতর তেল আমাদের আর রুচিরোচন নহে; আতরের মধ্যে আমরা মুসলমানী উগ্রগন্ধ অনুভব করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি; বেলা, চামেলি, হেনা সুরভিত গন্ধ তৈলে আমরা পাড়াগেঁয়ে জংলী জমিদারের গন্ধ পাই; গোলাপজলে আমরা মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যবস্থা দেখি, যদিও ইহা আমাদেরই প্রতি প্রযুজ্য ব্যবস্থা। আমরা বৈলাতিক মোহের আকর্ষণে গোলাপজল ফেলিয়া হোয়াইট রোজ, চেরি ভায়লেট ধরিয়াছিলাম; বেলা, চামেলি, হেনা ছাড়িয়া ল্যাভেণ্ডার রোজ মেরির উগ্রগন্ধে প্রাণ ঢালিয়াছিলাম। এখনো এই স্বদেশীপ্রচেষ্টার দিনেই কি আমাদের মতি ফিরিয়াছে—বিলাতী এসেন্স বিলাতী শিশিতে দেশী বলিয়া ব্যবসাদার চালাইয়া দিতেছে, আমরা দিনে ডাকাতি বুঝিয়াও ঘরের পানে ফিরিতে ত চাহিতেছি না; বৈলাতিক সুগন্ধে সুরভিত কেশতৈলে মস্তিষ্ক প্রতিদিন সিক্ত করিতেছি, মস্তিষ্ক বিকার ত' কই ঘুচিতেছে না। এইবার ঘরে পরে সতর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছি, যদি এখনো আমাদের চৈতন্য হয়।

ভারতীয় পুরাশালার শিল্পবিভাগের শ্রীযুক্ত ডেভিড হুপার আমাদের দেশের গন্ধ ভাণ্ডারের যে সন্ধান জানাইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে প্রবাসীর পাঠকদিগের গোচর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

উবায়ু-গন্ধ-তৈল (Essential Oils) ভারতের একটি মহা লাভজনক পণ্য হইতে পারে। উবায়ু-গন্ধ-তৈল উগ্র বিচিত্র গন্ধ বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে উবায়ু। অনেক উবায়ু গন্ধতৈল (যেমন তার্পিণ) শুধু অঙ্গার ও উদ্যানের মিশ্রণ, কোন কোন তৈলে অম্লজানও থাকে। অনেক তৈলে তরল উদঙ্গার (Hydrocarbon) সহ কঠিন অম্লজানিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে; এরূপ তেলের তলায় দানা বাঁধে। উবায়ু-গন্ধ-তৈল প্রায়ই উদ্ভিজ্জ এবং পুষ্প (যেমন গোলাপ) পত্র (তুলসী) ত্বক (কমলার খোসা) এবং ফলে (মৌরী ও যোয়ান প্রভৃতি) উদ্ভিদের সকল অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিত প্রকার ৫ রকম; কিন্তু ভারতে প্রথম প্রথাই অনুসৃত হয়।

(১) উদ্ভিজ্জ পদার্থ চোলাই করা অর্থাৎ গরম জলে ফুটাইয়া বাষ্প ঘনীভূত করিয়া লওয়া। উবায়ু-গন্ধ তৈল জল অপেক্ষা অধিক তাপে স্ফুটিত হইলেও জলবাষ্পের সহিত তৈলবাষ্প নিঃসৃত হয়, এবং ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। চোলাইকার্য্য আগুণের তাপে করিলে কঠিন পদার্থ সকল পুড়িয়া কয়লা হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়; এই অসুবিধা বাষ্পতাপ প্রয়োগে নিরাকৃত হইতে পারে।

(২) যে সকল ফলে তৈলকোষ বেশ বড় বড় তাহা চোলাই না করিয়া স্পঞ্জ ও দন্তগর্ভ বাটির সাহায্যে তৈল সংগৃহীত হইতে পারে।

(৩) কমলা বা অন্য জাতীয় লেবুর খোসায় যথেষ্ট তৈল থাকে; লেবু চাপ দিয়া পিষিয়া তৈল বাহির করা যায়।

(৪) স্নেহ প্রসেক অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে তপ্তজলে তরলীকৃত উদ্ভিজ্জ স্নেহে পুষ্প মজ্জিত করিয়া রাখিলে সেই স্নেহ পদার্থ পুষ্পবাসিত হইয়া উঠে; সেই পুষ্পবাসিত স্নেহ সুরাসার মিশ্রিত করিয়া নাড়িয়া লইলে পুষ্পসার পৃথক হইয়া পড়ে।

(৫) সুগন্ধ-শোষণ স্নেহপ্রসেকেরই মত অন্য উপায়। কাচের পাত্রে একস্তর বসা পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া দিতে হয়, এবং প্রত্যহ পুরাতন পুষ্প বদলাইয়া নূতন পুষ্প স্থাপন করিতে হয়, এইরূপে সেই পুষ্পাচ্ছাদিত হীন

বসান্তর পুষ্পসংসর্গে প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে পুষ্পপ্রেমে বিভোর হইয়া পুষ্পবাসিত হইয়া উঠে।

১৯০২-৩ সালে ভারত হইতে ৭,৭০,৮৭২ টাকার গন্ধতৈল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। মধ্যভারতই তৃণতৈলের খনি।

এ দেশের উবায়ু-গন্ধ-তৈলের মধ্যে রোজা তৈল সর্ব্ব প্রধান। ইহা রোজা নামক এক প্রকার তৃণ হইতে পাওয়া যায়; এই তৃণ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে জন্মে। খুব সম্ভব ১৮ শতাব্দীতে খান্দেশের অভ্যুদয়ের সময় এই তৈল সেই দেশে প্রথম চোলাই হয়। ১৮২৫ সালে ডাঃ ম্যাক্সবেল ও ১৮২৭ সালে জে, ফরসীথ সাহেব ইহা প্রথম য়ুরোপ-গোচর করেন। আগষ্ট মাসের শেষে ইহাতে ফুল আরম্ভ হয় এবং অক্টোবর, নভেম্বরের শেষে প্রচুর পুষ্প প্রসব করে; সেই সময়ে ইহা হইতে অধিক তৈল পাওয়া যায়। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপে চোলাই হইত এখনো সেই প্রথাই প্রচলিত। মৃৎচুল্লীর উপর লোহার হাঁড়িতে গাছ জ্বাল দেওয়া হয়। হাঁড়ির বদ্ধ মুখের উপর ৫।৬ ফুট লম্বা ২টা সোজা নল সংযুক্ত থাকে; সেই নল বহিয়া বাষ্প দুইটা জলনিমজ্জিত তাম্রপাত্রের মধ্যে যায়। ঠাণ্ডা পাত্রে গিয়া বাষ্প জমিয়া তরল হয়। ২৪ ঘণ্টায় ৪ বার চোলাই করিয়া /১ সের তেল পাওয়া যাইতে পারে। এক মরসুমে ১॥০ মণ তৈল পাওয়া যায়। খান্দেশ প্রদেশে এই তৈল প্রচুর চোলাই হয়। এই তৈল গুণের তারতম্যানুসারে ২্ হইতে ৪্ পাউণ্ড বিক্রয় হয়। এই তৃণ সর্ব্বত্রজ; অল্প মূলধনেই কার্য্য বেশ চলে। এই তৈল দ্বিবিধ; এক হরিদ্রাবর্ণ মৃদুগন্ধ, তাহাকে 'মতিয়া' বলে; অন্য কৃষ্ণাভ এবং উগ্র গন্ধী তাহাকে 'সোফিয়া' বলে। এই তৈলে কেরোসিন, তার্পিণ, রেড়ি প্রভৃতি তৈলের ভেজাল দেওয়া সহজ; কিন্তু কয়েক ফোঁটা সাদা ব্লটিং কাগজে রাখিয়া তাপ দিলেও যদি ব্লটিং কাগজে তেলের দাগ থাকিয়া যায়, তবেই বুঝা যায় যে তেলে ভেজাল আছে, কারণ বিশুদ্ধ রোজা তৈল উবায়ু, উত্তাপে সমস্তই উবিয়া যায় ও কাগজে দাগ থাকে না। অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষাতেও ধরা পড়ে। এই তৈল য়ুরোপে গোলাপের আতরের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। আরব ও তুর্কীরা ইহা দ্বারা কেশতৈল করে; এবং অন্যবিধ সুগন্ধী ও সাবান ব্যবসায়ে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যবসায় এ দেশে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯০৫-৬ সালে ২৩৪৩৬ গ্যালন (/৩॥৴০ ছটাকে এক গ্যালন) তৈল ৫,৫১,৪২৫্ টাকায় রপ্তানি হইয়াছে। ইহার উৎপন্ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য ক্রমশঃ কমিতেছে; কিন্তু অধিক বিক্রয় হইলে এক দিকের ক্ষতি অন্য দিকে পূরণ হইয়া যাইবে। সকল দেশের তৈলের মধ্যে স্পেন দেশের তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; তৎসম তৈল আর কোন দেশে এ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই। পরিমাণ সম্বন্ধে ভারতের সমকক্ষ আর কোন দেশ নহে।

তৈলোৎপাদক নেমু-তৃণ ভারতে জন্মে, ইহার স্বাদ ও গন্ধ নেমুর মত। ইহা হইতে লোহিতাভ পীতবর্ণ তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল দক্ষিণভারতে উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যবসায় আধুনিক। ১৮৩২ সালে ইহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, জানা যায়; তৎপূর্ব্বের কোন সংবাদ জানা যায় না। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে বৎসরে ছয়মাস ধরিয়া এই ঘাস কাঁচা তাজা প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা হইতেও তৈল চোলাই করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রত্যেক চোলাইয়ে এক কোয়ার্ট তৈল পাওয়া যায়; তৎপরিমাণ তৈলের মূল্য প্রায় তিন টাকা। ২৪ ঘণ্টার চোলাইয়ে এক পাঁইট তেল পাওয়া যায়। এই ব্যবসায় দক্ষিণভারতে ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। এক্ষণে বন্য স্বভাবজাত তৃণের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া তৃণ চাষের চেষ্টা চলিতেছে।

তেল ফিলটার করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৯০৫-৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে উবায়ু-গন্ধ-তৈল (প্রধানত নেমুতৃণ তৈল) ২৬৭৫ গ্যালন ১৫৪১৪১ টাকার রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে তৈল পরিমাণ তিনগুণ অধিক হইলেও মূল্যে অধিক তারতম্য ঘটে নাই। কেবল ১৯০২-৩ সালে পরিমাণ ৬২৫৮ গ্যালনের মূল্য ২৪২৩১৯ টাকা হইয়াছিল।

এই তৈল নানাবিধ এসেন্স প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। যবদ্বীপে এই ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। সিঙ্গাপুর, সিংহল, টঙ্কিন, আফ্রিকা, ব্রেজিল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানে অল্প অল্প করিয়া প্রচলিত হইতেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপে ইহার আবশ্যকতার বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং ভারতের ব্যবসায়ের ক্ষতি-সম্ভাবনা নাই।

সিংহলে একরূপ নেমুতৈল প্রচুর উৎপন্ন হয়। ইহাকে (Citronella Oil) বলে। প্রতি একর জমিতে শীতকালে ৫ হইতে ১০ কোয়ার্ট বোতল ও গ্রীষ্মকালে ১৬ হইতে ২০ বোতল তৈল উৎপন্ন হয়। ৪০০০০ হইতে ৫০০০০ একর জমিতে এই তৃণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা নেমুতৃণ তৈল অপেক্ষা অল্পমূল্য; এজন্য ইহা নেমুতৈলে ভেজাল দেওয়া হয়।

তৃণতৈল ব্যতীত চন্দনতৈল ভারতের প্রধান পণ্য। চন্দন কাষ্ঠের আদর প্রাচ্য প্রতীচ্যে সমান। মহীশূর রাজ্যে চন্দন প্রচুর জন্মে। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ইহার তৈল উৎপাদন করিয়া দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। কাঠ চোলাই করিয়া তৈল বাহির করা হয়। মূল হইতে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। একমণ কাঠ হইতে কয়েক দিন ধরিয়া চোলাই করিয়া ১০ আউন্স তেল মিলে। ইহার মূল্য ৮্ টাকায় ১ পাউণ্ড (১৬ আউন্স)। য়ুরোপীয় কারখানায় তৈলের পরিমাণ অধিক ও গুণের উৎকর্ষ হয়।

চন্দন তৈল আতরের আধার (base) রূপে ব্যবহৃত হয়। আতরের মধ্যে গোলাপী আতরই উৎকৃষ্ট। দুই শতাব্দী ধরিয়া গাজিপুর গোলাপী আতর ও জলের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ১ লক্ষ গোলাপের প্রাণের সৌরভটুকু ঘনীভূত হইয়া তিন ড্রাম আতর বা ১০০ বোতল জল তৈয়ারি হয়। পারস্য হইতে প্রতি বৎসর ২০০০০ হইতে ৩০০০০ গ্যালন গোলাপজল বোম্বাই বন্দরে আমদানি হয়। গোলাপজল দ্বিবিধ 'এক-আতিসি' বা একবারের চোলাইপ্রাপ্ত এবং 'দো-আতিসি' বা দুইবার চোলাই করা। মূল্য ২০ পাউণ্ড কার্বার ৪্ হইতে ৪॥০ টাকা।

তার্পিণ তৈল চিল পাইনের তৈলাক্ত আঠা হইতে চোলাই প্রাপ্ত উবায়ু-গন্ধ-তৈল। ডেরাডুন, নৈনিতাল, কাংড়া প্রভৃতি স্থানে কারখানা আছে। প্রতি বৎসর সেখানে ২০০০০ গ্যালন তৈল প্রস্তুত হয়, এবং সমস্তই দেশেই ঔষধার্থ, সমরবিভাগে, রেলবিভাগে, রং ও বার্ণিশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

য়ুক্যালিপ্টাস তৈল নীলগিরি পাহাড়ের প্রধান ব্যবসায় পণ্য। পূর্ব্বে নীলআঠা গাছ জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হইত। ২০ বৎসর পূর্ব্বে উহার পাতা উতকামন্দ উদ্ভিজ্জ-উদ্যানে প্রথম চোলাই করা হয়। এই তৈল সংক্রামক ব্যাধিবীজনাশসক্ষম বলিয়া মহামারির সময় রুমালে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

কর্পূরও ঘনীভূত তৈল পদার্থ—ইহা ভারতে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা চীন, জাপান হইতে এ দেশে আমদানী হয়। ইহার গাছ এদেশের জমির উপযোগী; কিন্তু কর্পূর প্রসবের উপযুক্ত হইতে গাছের ৫০ হইতে ১০০ বৎসর লাগে। এই জন্য কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। কিন্তু দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য ও উত্তরকালে পুত্রপৌত্রাদির অন্নোপায়ের জন্য আপাত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া উদ্যোগী পুরুষের এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। দশ বৎসর বয়সের গাছের পাতা হইতে অল্প অল্প কর্পূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

"যমানী তৈল" ও যমানী আরক ভারতে বহু পরিচিত ও সর্ব্বত্রজ। যোয়ানের তৈল অল্প তাপেও উড়িয়া যায় এবং তলায় দানা বাঁধে; সেই দানাকে "যোয়ানের ফুল" বলে। ইহা থাইমলের সমধর্ম্মী। মধ্যভারতে

থাইমল প্রস্তুত হয়। তাহার এক পাউণ্ডের দাম ৮৲ টাকা। যোয়ানের মত স্নেহময় বহু ফল আছে; অল্প চেষ্টায় যাহা হইতে তেল বাহির করিয়া লাভবান হওয়া যাইতে পারে।

Winter-green oil গন্ধ ও ওষধিগুণের জন্য আমেরিকায় বিশেষ আদৃত। ইহা খুব বলবান কীটাণুনাশক ও শোধক, আপিসের কালি বা আঠাতে দু এক ফোটা দিলে কালি বা আঠা জমিতে পারে না। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি ও অন্যান্য পাহাড়ে এই গাছ জন্মে। চোলাই করিয়া তেল সহজেই পাওয়া যায়।

"গর্জ্জন তেল বা কাঠতৈল" আসাম ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার ওষধিগুণ থাকায় এবং বহু দ্রব্য নির্ম্মাণের উপজীব্য বলিয়া ইহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

এক্ষণে কএকটি দেশীয় সুগন্ধির উল্লেখ করিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেই সকল সুগন্ধি ইউরোপে আকাঙ্ক্ষিত; প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করিতে পারিলে কাটতি নিশ্চিত। অল্প মূলধনেই ব্যবসায় আরম্ভ হইতে পারে। সেই সকল সুগন্ধি টাটকা উপাদানে প্রস্তুত করা দরকার।

"চম্পক-পুষ্পসার" য়ুরোপে বড় আদৃত এবং ইহার অভাব যথেষ্ট। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেই সংগ্রহ করিয়া চোলাই করিতে হয়; কিংবা সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প অধিক এক সঙ্গে না পাইলে স্নেহপ্রসেক বা সুগন্ধ শোষণ প্রণালীতে পুষ্পসার ক্রমে ক্রমে আহৃত হইতে পারে।

"কেয়া-সার" য়ুরোপসমাদৃত আর একটি সুগন্ধি। কেয়ার স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ বড় চিত্তপ্রসাদক। বাজারে সচরাচর যে তৈল পাওয়া যায় তাহা পুষ্প নিমজ্জিত রাখিয়া সুবাসিত তিলের তৈল। এই উপায়ে কেয়ার অতীন্দ্রিয়, অবর্ণনশক্য মধুময় সুক্ষ্মসুবাস টুকু ধরা পড়ে না। চোলাই করিয়া লইলে হয় ত সে টুকু ধরা দিতে পারে। কেওড়ার জলও বহু সমাদৃত। কেওড়ার গাছ ভারত, পারস্য ও আরব দেশে জন্মে।

"Cassie (?) ফুল" (Acacia জাতীয়) বাংলা ও পঞ্জাবে বন্য অবস্থায় জন্মে। ইহার পীত ফুল গুলি যখন ফুটিয়া উঠে তখন সমগ্র বায়ুমণ্ডল গন্ধময় হইয়া উঠে। গাছের চাষ করিলে প্রতিগাছে ২ পাউণ্ড ফুল পাওয়া যায়; প্রতি একর জমিতে ৫০০৲ ৬০০৲ টাকার ফুল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা হইতে অতি চমৎকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়, এবং য়ুরোপে ইহার অত্যন্ত অভাব।

ফ্রান্সে ক্যাসি-পোমেড্ প্রস্তুত হয়, চর্ব্বির মধ্যে ফুল রাখিয়া চর্ব্বি সুগন্ধি করিয়া লওয়া হয়। ২ পাউণ্ড ফুল ১ পাউণ্ড চর্ব্বিতে নিমজ্জিত করা হয়। উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত রাখিয়া ছাঁকিয়া গালিয়া লওয়া হয় এবং শিটিগুলিতে চাপ দিয়া বসা বাহির করা হয়। ভারতে জান্তব বসার পরিবর্ত্তে মোম জাতীয় পদার্থ (petroleum wax, concrete oil, kokam butter প্রভৃতি) ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতজাত ক্যাসি-পোমেড লণ্ডনে রপ্তানি হইয়াছিল এবং ফরাসী পোমেড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। এই ব্যবসায় প্রথম প্রবর্ত্তকের মৃত্যুতে বন্ধ হইয়াছে, এক্ষণে যে ইহা প্রথম উজ্জীবিত করিবে, তাহার লাভ নির্দ্ধারিত।

"Patchouli তৈল" সুগন্ধি প্রস্তুতের নিতান্ত আবশ্যকীয় উপাদান। মালয় ও চীনে pogostemon patchouli গাছ জন্মে। পশ্চিম ভারতে pogostemon জাতীয় নানা গাছ পাওয়া যায়; সেই সকল গাছ উগ্রগন্ধী; চোলাই করিলে নিঃসন্দেহ গন্ধতৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপরি বর্ণিত প্রধান উপাদানগুলির সঙ্গে নিম্নলিখিত গন্ধতৈলের উপাদানগুলি উল্লিখিত হইতে পারে:—

"নাগকেশর" (ফুল), লাল নাগকেশর (ফুল), সুদাব (গাছড়া), জম্বা (ফল), মিলুকরণই (? পাতা), হালিম (পাতা), নেবু (ফুল, ফল, পাতা), বেল (পাতা), wood apple (? পাতা), yenne (তৈলাক্ত আঠা), রুমানি (বীজ), আলুবোখরা (বীজ), নস্তারোক (?) myrtle (? ফল ও পাতা), সা-জিরা (ফল), fennel (ফল), জিরা (ফল), ginsing (মূল) spikenard (মূল), Ngai (গাছ), মুণ্ডি (ফুল), বীরণ যোষিদ (? গাছ), পিপুল (ফুল), worm wood (গাছড়া), pœhak (? মূল), মৌলসিরি (? ফুল); রজনীগন্ধা (ফুল) যুঁই (ফুল), খয়ের চাঁপা (ফুল) noyean plant (পাতা), নিসিন্দা (পাতা), Vitex tripolia (? পাতা), তুলসী (গাছড়া), মিঠা তুলসী (গাছড়া), রামতুলসী (গাছড়া), ল্যাভেণ্ডার (গাছড়া), wild mint (গাছড়া), marjoram (গাছড়া), wild thyme, masho (? গাছড়া), পান (পাতা), দারুচিনি (ত্বক ও পত্র), litsæa polyalthia (পাতা), অগর (কাঠ) বেদমুস্ক্ (ফুল) juniper berries (ফল), দেবদারু (আঠা), চন্দ্রমূলা (কন্দ), কপূর কচরি (কন্দ), গন্ধমাতৃ (মূল), sweet flag (?), কালজীরা (বীজ), ambrette (বীজ) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত জে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উবায়ু-গন্ধ-তৈল সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্যয়সাধ্য ধাতব বকযন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাটির হাড়ি দ্বারা বকযন্ত্র প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। যাঁহারা নেমুতৃণ বা পিপারমেণ্টতৃণ চাষ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নামমাত্র ব্যয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বীজ পাইতে পারেন।

শ্রীমঞ্জুপ্রিয় মালাকর।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

ভারতের চালের ব্যবসা।

১৯০৬-০৭ সালে যত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তন্মধ্যে শতকরা ৬৬·৯৫ মূল্যের চাল গিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর গিয়াছিল শতকরা ৬৩·১; এ বৎসর বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, তবুও রপ্তানি বাড়িয়াছে। ভারতীয় দ্রব্যজাতের রপ্তানি মোটের উপর কিছু কমিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর শতকরা ১১·৮ রপ্তানি হইয়াছিল, এ বৎসর হইয়াছে ১০·৭।

সরকারী ব্যবসায় পত্র ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জর্ন্যাল্ বলেন, যে যুক্ত বঙ্গে চালের দাম বাড়িলেও, পাটের ব্যবসায়ে চাষীর খুব লাভ হইতেছে। ৪০ কোটি টাকার পাট বেচিয়া সাড়ে পনর কোটি টাকা নেট আয় হইয়াছে; সেই টাকা হইতে গত বৎসর সাড়ে চারি কোটি টাকার চাল আমদানি করিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর পাট রপ্তানি করিয়াছে একা যুক্তবঙ্গ হইতে প্রায় ১০ কোটি টাকার। অতএব দুঃখটা কোথা হইতে হইল, বরং ত চাষীর অবস্থার উন্নতিই দেখা যাইতেছে!

জাপান ভারত হইতে চাল লইত; এখন জাপান কিছু কম লইতেছে। এখন ভারতের চালের প্রধান খরিদদার সিংহল। গত বৎসর সিংহল ৪ কোটি টাকার চাল লই-

রাছে। চীন, মিশর, জর্ম্মনী, ব্রিটিশ দ্বীপ, অষ্ট্রীয়া, হঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় চাল প্রভুত পরিমাণে যায়। জর্ম্মনী বিদেশী খরিদদারদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিতেছে।

আঁকাড়া চালের রপ্তানি কিছু কমিয়াছে। কেবল সিংহল কাঁড়া আঁকাড়ার কোন বাছবিচার করে না। য়ুরোপীয় রাজ্যে ভিক্ষার চালেও কাঁড়া আঁকাড়ার বিচার দেখিয়া হাসি পায়। আমাদের দরিদ্রের ঘরে কাঁড়া আঁকাড়া যাহা যত কটি থাকিয়া যায়, তাহাই লাভ।

ভারতে কাপড়ের আমদানি।

সমগ্র আমদানি পণ্যের তুলনায় ১৯০৫-০৬ সালে আমদানি কাপড়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৭'৯, আর এ বৎসর (১৯০৬-০৭ সালে) কমিয়া হইয়াছে ৩৪'৮। গত বৎসরের আমদানি কাপড়ের মূল্য ছিল, ৩৯ কোটি, ১ লক্ষ, ৭৭ হাজার; এ বৎসর হইয়াছে ৩৭ কোটি, ৬৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিদেশের কবল হইতে এ বৎসর ভারতের ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা রক্ষা পাইয়াছে শুধু এক কাপড়ের বাবতে।

কোরা কাপড় শতকরা ৩.৭ কমিয়াছে, ধোয়া ১৩'৫, এবং রঙিন ৩'১ কমিয়াছে। বাংলায় দুইটি মাত্র কাপড়ের কল আছে, বাংলায় এজন্য ৯০,০৫,৫২,০০০ গজ অর্থাৎ সমগ্র আমদানি কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৬৯ গজ কোরা বিদেশী কাপড় লওয়া হইয়াছে, ১৯০৫-০৬ সালে শতকরা ৭৪ গজ লওয়া হইয়াছিল।

কোরা কামিজের কাপড়, কোরা ও ধোয়া মলমল প্রভৃতি কয়েক প্রকারের কাপড় গত বৎসর অপেক্ষা অধিক আমদানি হইয়াছে। কোরা চাদর, ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির আমদানি হ্রাস বেশ হইয়াছে। সরকারী ব্যবসায়-পত্রিকায় এই সকল কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার এক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন-সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'All the others show a decline which in the case of grey chadars, dhuties, saris and scarves is very marked.' —The Indian Trade Journal, 13-6-07.

বিগত দুই বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ছিট, টুইল কেমব্রিক ও মসলিন কাপড় অত্যন্ত অধিক আমদানি হইয়াছে। এক কালে আমাদের ভারতের মসলিন ও ছিট আইন করিয়া বিলাতে আমদানি বন্ধ করিতে হইয়াছিল। তারপর কলে কৌশলে আমাদের সেই উন্নত শিল্প নষ্ট করিয়া এখন বিলাত ভারতে মসলিন ও ছিট রপ্তানি করিতেছে; অদৃষ্টের রূঢ় উপহাস! ভারত নিরাশ্রয় দুর্ব্বল, রাজশক্তি প্রজাশক্তির প্রতিকূল; প্রজাশক্তিকে বল সঞ্চয় করিয়া রাজশক্তিকে শিল্পপণ্য রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে। আমরা স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া এ বৎসর ভারতের প্রায় দেড়কোটি টাকা রক্ষা করিয়াছি; এই ব্রত আরো দৃঢ়রূপে সম্পূর্ণ করিতে হইবে; আত্ম বলি দিয়া, স্বার্থ ভুলিয়া আরব্ধ ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে। সরকার বলেন যে স্বদেশীব্রত পণ্ড হইয়াছে; কিন্তু সরকারী রিপোর্টেই সরকারের কথার অযাথার্থ্য দিব্য প্রমাণিত হইতেছে। আমরা জয়ী হইতেছি, কিন্তু আমাদের দেশমান্য গায়কবাড়ের উপদেশ স্মরণ রাখিতে হইবে; তিনি যথার্থই বলিয়াছেন 'আমাদের আনন্দে উৎফুল্ল হইবারও কোন কারণ নাই, নিরাশায় মুহ্যমান হইবারও কোন কারণ নাই।'

এ বৎসর ভারতের কলে কোরা ধুতি, কামিজের কাপড়, চাদর প্রভৃতি শতকরা ১'১৫ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। টুকরা ধোয়া কোরা কাপড় শতকরা ৫'৮১ অধিক হইয়াছে।

স্বয়ং ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্রাজ্য হইতে শতকরা ৯৯'৩ কোরা কাপড়, ৯৮'২৫ ধোয়া কাপড়, ৯৫'৪ রঙিন্ কাপড় আমদানি হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ইংলণ্ডের রপ্তানি অধিক হইয়াছে। সাধু সাবধান!

এ বৎসর ব্যবসায়ে পাকা ১'৪২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; গত বৎসর ২৪ লক্ষ টাকা সরকারের আয় হইয়াছিল।

মোজা ইংলণ্ড হইতে শতকরা ৪৬ জোড়া আসে; বাকি আসে জাপান, জর্ম্মনী, ইতালি, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম ও ফ্রান্স হইতে। জাপানই ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

এ বৎসর ভারতের কাঁচা মাল ও শস্য রপ্তানি গত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, শস্যরক্ষা না করিতে পারিলেই অনশন ও দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। আমরা কি ঠেকিয়াও শিখিব না; পোড়া দেশের চৈতন্য হইবে কবে; মোহনিদ্রা কবে ঘুচিবে? বাংলা হইতে ২২৪'৪২ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল ও শস্য রপ্তানি হইয়াছে। শস্যের

মধ্যে তিসি, সরিষা, তিল, তূলার বীজ, পোস্তদানা, এরণ্ড বীজ প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হইয়াছে। বিদেশে তূলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লয় ও তাহার খোল পশুখাদ্য হয়; ভারতের তূলার বীজ, তিসি সরিষা তিল অপেক্ষা সস্তা বলিয়া বিদেশে ইহার খুব কাটতি। কিন্তু আমাদের ঘরের গরু ছাগল খাদ্যাভাবে কঙ্কালসার; ঘরের ছেলে দুধ না পাইয়া শীর্ণ রুগ্ন, দেশ পরপদানত। যতদিন ভারতে খাদ্যের সংস্থান না হইবে, ততদিন স্বরাজের আশা ব্যর্থ হইবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; যার লাঠি তার মাটি—এসব প্রবাদের গূঢ়সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হইবে।

কাঁচা মালের শতকরা ৩২·৯২ অংশ পাট রপ্তানি হয়। এ বৎসর পাট যথেষ্ট রপ্তানি হইয়াছে। মহাশয় (!) আঁদ্রু ফ্রেজার আনন্দে নৃত্য করিতেছেন বোধ হয়। এবার ১৫ কোটি টাকা পাটের ব্যবসায়ে লভ্য হইয়াছে, কিন্তু চাষা রূপার চাকতি চিবাইয়া খাইবে কি? তা ছাড়া, এই ১৫ কোটির কতটুকু অংশ সে পাইয়াছে? শস্যক্ষেত্র পাটে গ্রাস করিতেছে, তাহার উপায় কি?

লোহা লক্কড়, কর্ত্তরী প্রভৃতি ভারতীয় সমগ্র আমদানির শতকরা ১১·৭৪ অংশ। এবৎসর উহার মূল্য ৩৯·৪৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বিভাগের জিনিষের মধ্যে ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি, চাষের যন্ত্রাদি, কল কব্জা ও অন্যান্য যন্ত্র হাতিয়ার, সেলাইয়ের কল, কলাইকরা লোহার বাসন প্রধান। কলাইকরা লোহার বাসনের আমদানি গত বৎসর অপেক্ষা ৯৩৬২৭ টাকার অধিক হইয়াছে। ছুরী কাঁচির আমদানি বাড়ে নাই বলিলেও হয়। চাষের যন্ত্রাদি অনেক আসিয়াছে, এবং এই সকল এখন অধিক আমদানি হওয়া শুভজনক। ল্যাম্প আলো ৬·৭ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে; এই একটা ব্যবসায় আমাদের দেশে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে; এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার খর আলোকের দিনে আমাদের সনাতন মৃৎপ্রদীপ আর কেহ জ্বালাইবে ইহা মনে করাই হাস্যোদ্দীপক; কিন্তু উন্নত প্রণালীর ল্যাম্প প্রদীপ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদের দেশে একেবারেই হইতেছে না।

এ বৎসর মদের আমদানি অনেক কমিয়াছে। কেন? স্বদেশীব্রতধারী মাতাল ধান্যেশ্বরীর সেবা করিতেছে, না লোকে মদের অপকারিতা বুঝিয়া মদ ছাড়িতেছে? বরিশাল ও সাহারানপুরে "ভাল" মদ তৈয়ারিও হইতেছে।

রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি গত বৎসর ছিল ৬৮·৯ লক্ষ টাকার, এ বৎসর হইয়াছে ৬৮·৭ লক্ষ টাকার। প্রায় সমানই আছে।

ভারতের সমগ্র রপ্তানি মালের শতকরা ৬·৩ অংশ চামড়া রপ্তানি হয়। এই চামড়া বিদেশে গিয়া কষ হইয়া আবার ভারতে ফিরিয়া আসে। আমাদের ঘরের চামড়া বহুমূল্যে আমরা বিদেশীর কাছে ক্রয় করিয়া ফিরাইয়া লই। চামড়া কষ করার ব্যবসায় অতি লাভজনক; কৃতবিদ্য যুবকগণ কেরাণীগিরি ও জাতির মমতা ত্যাগ করিয়া এ দিকে মনোযোগী হইলে দেশের অর্থরক্ষা ও তাঁহাদের অর্থাগম উভয়ই হয়। বড়লোক হইবার সহজ পন্থা এখনও খোলা আছে কষকরা চামড়ার ব্যবসায়ে। কাঁচা চামড়ার রপ্তানি প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে।

কল যন্ত্র এ বৎসর ৮৭·৩২ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে।

খাদ্য পেয় ১১২·৮৭ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৮৫ টাকার চিনি আসিয়াছে।

রেশম আমদানি অনেক কমিয়াছে। রপ্তানি খুব বাড়িয়াছে।

সমগ্র ভারতের আমদানি বিবরণ মোটামুটি জানা গেল। এক্ষণে ১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায়, ১৯০৬—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বিলাতী আমদানীর বিবরণ হইতে কয়েকটি প্রধান পণ্যের তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। এই তালিকা সংগ্রহে 'বসুমতী' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

	১৯০৫—১৯০৬ টাকা।	১৯০৬—১৯০৭ টাকা।
বস্ত্র	২১,৪৪,৫৬,৩৭৬	১৮,৬২,৭৯,৪৪২
চিনি	৪,০০,২০,৯২০	৪,৭১,১১,৫৭৩
ছুরি কাঁচি	৭৫,০৯,০৩১	৮৭,৬৩,৭৩০
লবণ	৫৩,৩০,৪৬৫	৫২,৮২,৪৪০
মদ্য	৫৪,৩৫,৯৬৭	৫০,৩৯,৭৩৬
পশমের জিনিস	৬৪,১৮,৬৪১	৪৪,৭১,২৯৭
তৈয়ারী পোষাক	৫১,২২,৫২৭	৪২,৮৪,০৮০
খাদ্য দ্রব্য	৩৯,১৫,১৩৮	৪১,৬৮,৮৮৮

	১৯০৫—১৯০৬	১৯০৬—১৯০৭
	টাকা।	টাকা।
কাচের দ্রব্য ও কাচ	৩৩,৫০,৫৪৪	৩৮,২৬,৩৭২
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	১৫,৪৭,৯৫৭	১৮,৫৫,৫৩৯
দিয়াশলাই	১৭,৪৮,৭৬২	২৭,৬৩,৭৮৭
চিঠির কাগজ, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি	১০,৩৩,২৮৫	১০,৯৩,৮৩০
রেশমের দ্রব্যাদি	১১,৩০,৭৫১	৯,৮৯,৭৯৭
স্বর্ণাদির অলঙ্কার	৬৩,২৯,৫৪৩	৯,৬৫,০৭৯
খেলানা	৮,২৯,২৯৩	৮,০৬,৪৯৫
সাবান	৬,৬৪,৪১২	৬,৯৪,৬৪৫
সিগারেট	২২,৯২,৬৪৬	১৯,৫৪,৫০১

বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কমিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ২১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা হইতে এ বৎসর ১৮ কোটী ৬২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস ছিল, বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় কমিতেছে বটে, কিন্তু সুতার আমদানী বাড়িতেছে। কিন্তু সরকারী বিবরণে প্রকাশ,—সুতার আমদানীও কমিয়া গিয়াছে। ১৯০৫—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে এক কোটী দুই লক্ষ টাকার সুতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯০৬—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ টাকার সুতা আসিয়াছে।

৩১ হইতে ৪০ নম্বর মোটা সুতার আমদানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ৩০ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত সুতা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐরূপ মোটা সুতা এ দেশের চরকায় অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশের কলে ও চরকায় এইরূপ সুতা প্রস্তুত হইতেছে। তাই মোটা সুতার আমদানী কমিয়াছে।

এ দেশে অনেক মোজার কল চলিতেছে। মোজার জন্য ১৬ নং হইতে ৩০ নং পর্য্যন্ত মোটা সুতার আমদানী অধিক হইয়াছে। চেষ্টা করিলে মোজার সুতাও এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। আজ কাল ঘরে ঘরে যেমন মোজার কল চলিতেছে সেই সঙ্গে চরকার প্রবর্ত্তন করিলে বিদেশী সুতার অপেক্ষা থাকে না।

স্বদেশী তাঁতীরা সাধারণতঃ ৫০ ও তদূর্দ্ধ নম্বরের সুতার বস্ত্র বুনিয়া থাকে। এইরূপ সুতার আমদানী বাড়িতেছে। বাঙ্গালী যদি 'মিহি'র মায়া ত্যাগ করিয়া মোটা কাপড়ের ভক্ত হন, তাহা হইলে সূক্ষ্ম সুতার আমদানী কমিতে পারে। নিরন্ন দেশে এখনো মিহি মোটার বিচার কেন? বিলাসিতা কি আমাদের অপরিহার্য্য? বিলাসী জাতির অভ্যুদয় কখন হয় নাই, হইবে না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া যতিব্রত আচরণ করিতে হইবে। যাঁহারা hopelessly বিলাসের দাস, তাঁহাদের বাবুয়ানা চরিতার্থ করিবার মত জিনিষ আমাদের দেশেও ত' যথেষ্ট আছে। বিলাতীর মায়া ছাড়িয়া স্বদেশী বাবুয়ানা মন্দের ভালো।

১৯০৫—৬ অব্দে এ দেশে বিলাত হইতে ১৩৩ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর ১১৬ কোটী গজ কাপড় আসিয়াছে। কোরা কাপড় ৯ কোটী ৭০ লক্ষ গজ, ধোয়া ৫ কোটী ১০ লক্ষ ও রঙ্গীন ছিট প্রভৃতি ২ কোটী ৮০ লক্ষ কম আমদানী হইয়াছে।

বিদেশী লবণের আমদানী কিছু কমিয়াছে; কিন্তু বিলাতী লবণের আমদানী গতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ১৯০০ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ২৮ লক্ষ টাকার বিলাতী নুন এ দেশে আসিয়াছে। ১৯০৫—৬ খৃষ্টাব্দে কমিয়া ২৪ লক্ষ টাকায় নামিয়াছিল। গত বৎসর আবার ২৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। মাদ্রাজী ও বোম্বাই লবণের আমদানী কমিয়াছে। সরকার বলেন, স্বদেশী ক্রমে পঞ্চত্বলাভ করিতেছে, তাই স্বদেশী নুনের আমদানী কমিতেছে। সত্য কি?

বাস্তবিক তাহা নহে। স্বদেশী মুমূর্ষু হইলে বিলাতী বস্ত্র ও সুতার আমদানী কমিত না। স্বদেশী লবণের আমদানীর সুযোগ ও সুবিধা অল্প। এদেশের লবণের খনি, হ্রদ, পর্ব্বত ইংরেজের হস্তগত। যে দেশ লবণাম্বু-মেখলায় পরিবেষ্টিত, সে দেশেও বিদেশ হইতে লবণের আমদানী হয়, ইহা রাজার পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে! রাজার পক্ষে বণিকের ধর্ম্ম অত্যন্ত অশোভন। বোধ করি, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বিলাতী মদের আমদানী ৪ লক্ষ টাকা কমিয়াছে।

সিগারেটের আমদানী কমিয়াছে; এ খাতে হ্রাসের পরিমাণ—সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। শুভসূচনা সন্দেহ নাই।

পশমের কাপড়ের আমদানী খাতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

১৯০৫—৬ অব্দে ১০ লক্ষ ৯৩ সহস্র টাকার জুতা এ দেশে আসিয়াছিল। গত বৎসর ৬ লক্ষ ৪১ টাকায় নামিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার বিলাতী জুতা লইতেছে। ইহা অপেক্ষা আত্মমর্য্যাদার অভাবের পরিচয় আর কি হইতে পারে? বিলাতী জুতা কি এতই ভাল! শ্রীচরণ-কমলে দেশী জুতা কি নিতান্তই অশোভন? বিলাতী জুতা যে ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইতেছে সে দিকে কি এখনো লক্ষ্য নাই? হায় মূঢ় অধঃপতিত জাতি? চৈতন্য কবে হইবে?

বিদেশী চিনির আমদানী খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু খাস ইংলণ্ডের চিনির আমদানী ১৪ লক্ষ ছিল, ১১ লক্ষ হইয়াছে। জর্ম্মানীর চিনির আমদানী ১৪ লক্ষ ছিল, ৭৩ লক্ষ হইয়াছে। আবার চিনি ৭৬ লক্ষ হইতে একবারে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

বিদেশী চিনি এ দেশে আসিয়া 'স্বদেশী' মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। চিনির ব্যবসায় বাঙ্গলা হইতে প্রায় লুপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালী সাবধান! জাবা হইতে গুড়ও আমদানি হইতে আরম্ভ হইতেছে। যাঁহারা বিদেশী চিনি চিনিবার গোলযোগে গুড় খান তাঁহারা সাবধান। জাবার চিনি এত সস্তা যে চিনি আনিয়া তাহা গলাইয়া গুড়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাদের দেশী গুড়ের দামে বিক্রয় করিলেও লাভ থাকে। এখন ত' চিনির সঙ্গে গুড়ও আসিতেছে, সোণায় সোহাগা! কিন্তু এখনো সময় আছে—গুড় ও চিনির কারবারে প্রবৃত্ত হও। বেহারে আখের চাষ ইংরেজ চাষীর হস্তগত হইয়াছে। বাংলা রক্ষা·কর। নতুবা সব যায়, তাই বলি এখনও সাবধান!

তামাকের চাষ।

চাষের সকল বিভাগেই পাশ্চাত্য জগতে এত নূতন উন্নত প্রণালী অনুসৃত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে যে পুরাতন যেমন তেমন উপায়ে চাষ করিলে সেই চাষোৎপন্ন দ্রব্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কখন আমল পাইতে পারে না। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ; আমাদের দেশের প্রধান-কর্ত্তব্য সকল হইলেও আধুনিক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-উপযোগী পদার্থ সমস্তই আমাদের দেশে পাওয়া যায় না বলিয়া পরদেশের সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রমুক্ত রাখিতে আমরা বাধ্য। শিল্পজাত ও সোণা রূপা লোহা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ কিছু কিছু আমাদের পরদেশ হইতে লইতেই হইবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে অস্মদ্দেশসুলভ কৃষিধন পরদেশকে দিতেই হইবে। কিন্তু যদি পরদেশ জাত কৃষি ধনের সমকক্ষ দ্রব্য আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমরা কখনই লাভবান হইতে পারিব না। পুরাতন যেমন তেমন চাষে কৃষিধন ত ভালো হয়ই না, অধিকন্তু উৎপন্ন পরিমাণের অনুপাতে অন্যদেশ অপেক্ষা খরচ বেশি পড়ে, খারাপ জিনিষ বেশি দাম দিয়া লইবার গরজ কাহারো নাই, অতএব সংশোধনের উপায় করিতে না পারিলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনিবার্য্য। এই জন্য চাল, গম, চা, পাট, তামাক, প্রভৃতি সকল কৃষিবিভাগে চাষপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি অত্যাবশ্যক হইয়াছে। যে পদার্থের চাষ করিতে হইবে তাহা কোন দেশে অধিক গৃহীত হয় তাহা জানিয়া সেই দেশের উপযোগী করিয়া কৃষিধন উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেই প্রকৃত লাভবান হওয়া যায়। সকল কৃষিধন অপেক্ষা তামাকের চাষ অন্যান্য দেশে এমন উন্নত হইয়াছে যে শীঘ্র ভারতে ইহার চাষের উন্নতি না করিলে এই ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অনুষ্ঠিত প্রণালী আমাদের দেশেও প্রবর্ত্তিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তামাকের পাতা এক প্রকারের হইলে আদৃত হয়; কিন্তু নানাপ্রকারের পাতা একত্র করিয়া কোন খরিদার লইতে চাহে না।

যুক্ত রাজ্যের চারাচাষ বিভাগ হইতে তামাক চাষ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোন কাজের জন্য কিরূপ তামাক প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপ চাষে উৎপন্ন হয় তাহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম যে বহিঃসঙ্গমে সন্তানোৎপত্তি হয়। কিন্তু ডারউইন দেখাইয়া গিয়াছেন যে তামাক প্রাকৃতিক ব্যাপক নিয়মের বহির্ভূত, তামাক আত্মরমণ। তামাকের আত্মপরাগনিষিক্তপুষ্প হইতে যেমন উত্তম সমগুণময়, সতেজ পাতা প্রচুর জন্মে, পরসঙ্গমোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে তেমন হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিশেষ দেশের উপযোগী করিয়া তামাক উৎপন্ন করিতে

হইলে দুইটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক—(১) সযত্ন পরীক্ষার দ্বারা ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন চারাগুলিকে নির্ব্বাচন করা এবং (২) সেই চারাগুলিকে বীজের জন্য রক্ষা করা। এবং অপছন্দ অকর্ম্মণ্য নিকৃষ্ট চারার পুষ্পপরাগ যাহাতে নির্ব্বাচিত চারাগুলির পুষ্পমধ্যে নিষিক্ত হইয়া সাঙ্কর্য্য উৎপাদন না করিতে পারে এজন্য হাল্কা অথচ দৃঢ় কাগজের ঠুঙ্গি তৈয়ার করিয়া নির্ব্বাচিত চারার ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া। ইহাতে বহিঃসঙ্গম নিবারিত হইলে আত্মরমণ দ্বারা তামাকের যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা সাঙ্কর্য্য-বিরহিত ও বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন হইবে।

আমেরিকার চাষবিভাগের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশের ভাবার্থ মাত্র এখানে লিখিত হইতেছে। কৌতূহলী পাঠক বা ইচ্ছুক চাষী সেই বিজ্ঞাপনের কপি পাইতে অভিলাষী হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে পাইবেন :—

B. T. Galoway Esq., Chief of the Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, Washington, U. S. A., for a copy of the Bulletin No. 96 on the subject of 'Tobacco Breeding.'

যে ক্ষেত্রে তামাক প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রের কোনো অংশ অনুর্ব্বর হইলে চাষা তাহা সহজেই ধরিতে পারে এবং সার দিয়া বা চাষের পাইট করিয়া জমির সে দোষ সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। জমি সর্ব্বত্র সমান উর্ব্বর হইলেও তামাকের চারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সর্ব্বত্র চারা ঠিক এক প্রকারেরই হয় না। তামাক পাতার সংখ্যা, আকার, পাকিবার সময়, ফুলের গঠন ও আকার প্রভৃতি সকল গাছে সমান দেখা যায় না। সমগুণসম্পন্ন তামাক পাতা উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই সকল ব্যাঘাত উপেক্ষণীয় নহে। তামাকপাতা বিভিন্ন প্রকারের উৎপন্ন হইলে, একত্র বিক্রয় করিলে দাম হয় না, বাছিয়া বিক্রয় করিতে গেলেও খরচ ও শ্রম পোষায় না। অতএব একই ক্ষেত্রে যাহাতে একইবিধ তামাকপাতা উৎপন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

তামাকপাতার অসমতার প্রধান কারণ, পারস্পারিক-সঙ্গম। উদ্ভিজ্জ জগতেও জীব জগতের মত পুং ও স্ত্রী জাতির সঙ্গম ব্যতিরিক্ত সন্তান উৎপন্ন হয় না। পুং পুষ্পের পরাগ স্ত্রী পুষ্পের গর্ভ কেশরে নিষিক্ত হইলে সন্তানভ্রূণ অর্থাৎ বীজ জন্মে। পারস্পরিকসঙ্গম মানে এক গাছের পুং পুষ্প হইতে পরাগ আসিয়া অন্যগাছের স্ত্রী পুষ্পে নিষিক্ত হওয়া। পারস্পরিকসঙ্গমোৎপন্ন উদ্ভিদ সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হয়, সন্তান পিতা বা মাতা কাহারো মতনই হয় না। এজন্য সঙ্করবীজ ফসলের সমতা পাইবার পক্ষে বিঘ্নকারী। ক্ষেত্রে পতঙ্গ বা বায়ু দ্বারা এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বাহিত হয়; যে সকল চারা অকর্ম্মণ্য তাহার সহিত ভালো গাছের সঙ্গম হইলে সঙ্কর সন্তান উদ্দেশ্য-উপযোগী ভালো হয় না। দুইটি ভালো গাছের সঙ্গমোৎপন্ন সন্তানও অনেক সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ভালো ভালো কয়কটি চারার ফুল রাখিয়া সকল গাছের ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই কুঁড়ি থাকিতেই ভাঙ্গিয়া দিয়াও নিস্তার পাওয়া যায় না। অন্য চারার হয় ত একটি অসময়ে ফুল ফুটিয়া সকল গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ পারস্পারিকসঙ্গম দ্বারা বহুবিধ চারা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

তামাকের অসমতার আর একটি কারণ অপোক্ত বীজ ব্যবহার। বীজ ভালো করিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই ফসল কাটিয়া ফেলা হয়। অপোক্ত বীজগুটিগুলি কুটিয়া খেঁতো করিয়া বা হাতে রগড়াইয়া বীজদানাগুলি বাহির করা হয়। পোক্ত বীজের সহিত অপোক্ত বীজ মিশিয়া যায়; সেই মিশ্রিত বীজ উপ্ত হইলে প্রথমে অপোক্ত বীজ হইতেই সতেজ চারা নির্গত হয়; এবং যে চারা প্রথমে নির্গত হয়, তাহাই উঠাইয়া ক্ষেত্রে পুনর্বপন করা হয়। এই চারার পাতা ছোট, কর্কশ, কুরকুট্টে ও অকর্ম্মণ্য হয়। অপোক্ত বীজের চারা নানাবিধ রোগ ও বিপত্তিদ্বারাও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগ করিলেই তামাকপাতার অসমতা ঘটে। সারালো জমির পাতা খুব বড় হয়, কিন্তু রং, গন্ধ ও তেজ ভালো হয় না। সার দিয়া প্রচুর ফসল পাইবার ইচ্ছা করিলে বীজনির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্ক না হইলে বাঞ্ছিত ফসল পাওয়া দুষ্কর।

জমি বা আবহ-অবস্থার পরিবর্ত্তনেও তামাকপাতার অসমতা ঘটে। গরম দেশ হইতে শীতের দেশে বীজ লইয়া গেলে ফসল সমান হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজগুলিকে আবহ-অভ্যস্ত করিয়া লইলে পর বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

জমিতে যে গুলি উৎকৃষ্ট চারা থাকে সেইগুলি রাখিয়া অপকৃষ্টগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। উৎকৃষ্ট চারার সন্ততি নিতান্ত অপকৃষ্ট হয় না। ক্রমাগত এইরূপ সযত্ন সংজনন দ্বারা উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা নানা প্রকারের তামাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। দুইটি উৎকৃষ্টজাতীয় চারার সাঙ্কর্য্য সাধন করিয়া দোষশূন্য উৎকৃষ্ট চারাও উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়টি অনুষ্ঠিত হইতে পারে—যে সকল ফুল ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে ফুটা সম্ভব সেইগুলি রাখিয়া আর সকল ফুলের বৃতি (বাটির মত অংশ যাহার উপর ফুলের পাপড়ি থাকে), প্রস্ফুটিত ফুল, কুঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। অবশিষ্ট ফুলগুলি সযত্নে প্রস্ফুটিত করিয়া খাসি করিয়া দিতে হয়, অর্থাৎ চিমটা দিয়া ধরিয়া কাঁচি দিয়া পুষ্পকেশরের শিরোভাগ কাটিয়া পরাগকোষ দূর করিয়া দিতে হয়। বৈকাল বেলা খাসিয়া করিতে হয়। খাসিয়া করিয়া কাগজের ঠুসি দ্বারা ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়, যেন পতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা অন্যপুষ্পের রেণু পুষ্প মধ্যে নিষিক্ত না হয়। পরদিন প্রাতঃকালে খাসিয়া করা ফুলগুলিতে পরাগ-নিষেকের সময় হয়; কিন্তু কেশরের ডগায় আঠালো রস সঞ্চিত হইয়াছে কি না দেখিয়া প্রতিপুষ্পে পরাগনিষেক করিতে হয়। পুং চারা হইতে নরুণের ডগায় করিয়া পরাগ লইয়া কেশরোদ্গত আঠালো রসে লাগাইয়া দিতে হয়। তুলি বা তুলা দ্বারা পরাগ দিলে সমস্ত পরাগ নিঃশেষ করিয়া দেওয়া যায় না কিছু না কিছু তুলিতে লাগিয়া থাকে; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পরাগ একত্র মিশ্রিত হইয়া অবাঞ্ছিত সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন করিতে পারে। নরুণ দ্বারা পরাগ দিলে প্রত্যেক বারেই নরুণ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। পরাগ নিষিক্ত হইলেই ফুলগুলিকে কাগজের ঠুলি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, এবং যত দিন না বীজ বাঁধে এবং পারস্পরিক সঙ্গমসম্ভাবনা তিরোহিত হয়, ততদিন ফুল ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

তামাকের একটা বীজগুটির মধ্যে বহু বীজদানা থাকে। নির্ব্বাচন দ্বারা বীজ সংগ্রহ করিলে যথাভিলষিত ফসল উৎপন্ন করা কঠিন হয় না। সাধারণ আকারের একটা বীজগুটির মধ্যে ৪০০০ হইতে ৮০০০ বীজ দানা থাকে; এবং একটা চারায় ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বীজ দানা পাওয়া যায়। এই অসংখ্য বীজের মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ বাছিয়া লইলে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে চারার পাতা বড় বা সংখ্যায় অধিক হয় তাহাতে বীজ অল্প হয়। কিন্তু তাহা হইলেও যে বীজ উৎপন্ন করে তাহা একটা ফসলের পক্ষে যথেষ্ট। ভাল গাছের বীজ লইয়া পারস্পরিক সঙ্গম রোধ করিয়া চাষ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যাইতে পারে।

ভারতের পেটেণ্ট।*

যদি পেটেণ্ট আফিসের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া কোন দেশের উদ্ভাবনী শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তবে ভারতের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। জন সংখ্যার অনুপাতে ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তুলনায় ৯০০ গুণ কম ও গ্রেট বিটেন অপেক্ষা ৭০০ গুণ কম। নিম্নের তালিকা হইতে এক বৎসরে অন্য দেশের তুলনায় ভারতের পেটেণ্ট গ্রহণের আবেদনের সংখ্যা পাওয়া যাইবে:—

দেশ	পেটেণ্টের জন্য আবেদন সংখ্যা	জনসংখ্যা	একটি আবেদন প্রতি
সমগ্র ভারত	২০৯	২৯, ৪০ লক্ষ	১৪ লক্ষ
কলিকাতা	৬৭	১১.২ ,,	১৬৭০০ শত
বাংলা	৭৬	৭৮.৪ ,,	১০ লক্ষ ৩২ হাজার
বোম্বাই	৪৫	২৫.৫ ,,	৫ লক্ষ ৬৬ হাজার
জর্ম্মণী	২০০০০	৬০ ,,	৩ হাজার
গ্রেট ব্রিটেন	২০০০০	৪০ ,,	২ হাজার
যুক্তরাজ্য (মার্কিন)	৪৮৫০০	৮০ ,,	১৬০০ শত

জগতের মধ্যে মার্কিন সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভাবনপটু। এবং ভারত নিকৃষ্টতম।

১৯০৬ সালে ৬২০টি আবেদন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতের বাহিরের ৪১১, ভারতের য়ুরোপীয় দ্বারা ১৪৪, এবং খাঁটি দেশীয় আবেদন মোটে ৬৫টি। ভারতের বাহির হইতে যে আবেদন আসিয়াছিল তাহার হিসাব এই,—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ১৯৪, মার্কিন ৭৭, ব্রিটিশ উপনিবেশ ৫৩, ফ্রান্স ২৬, জর্ম্মনী ২৫, অষ্ট্রিয়া ১৩, ইতালী ৯, বেলজিয়ম ৬, হলণ্ড ৩, রুষ ৩, ডেনমার্ক ১, ট্যুনিস ১ মোট ৪১১।

ভারতের মধ্যে কলিকাতা ও সহরতলি হইতে ৬৭ আবেদন

* The Indian Trade Journal হইতে।

হইয়াছিল; বাংলার অপরাপর অংশ হইতে কেবল মাত্র ৯টি আবেদন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে ঠিক ইহার উল্টা; সহর বোম্বাই হইতে ১৩ ও বাহিরের ৩২। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে দেশীয়ের আবেদন হইয়াছিল ১৯টি করিয়া ৩৮টি। বাংলায় বাকি ৫৭টি ও বোম্বাইয়ের বাকি ২৬টি অপর দেশীয়ের দ্বারা হইয়াছিল। মান্দ্রাজের মোট ২৬ ও পঞ্জাবের ১৬ আবেদনের মধ্যে দেশীয়ের ছিল ৬টি করিয়া ১২টি। যুক্ত প্রদেশে ১৩ টির মধ্যে ৫টি দেশী, পূর্ব্ব বঙ্গে ৭টির মধ্যে ৩টি, এবং ভারতের অপরাপর অংশ হইতে মোট ২৬টির মধ্যে ৭টি পেটেন্টের আবেদন দেশীয়ের দ্বারা হইয়াছিল।

দেশীয় লোকের দ্বারা উদ্ভাবনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে। পেটেন্ট গ্রহণের জন্য আবেদনের তালিকা হইতে ইহা বুঝা যায়। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৮৯৪	৩২	১৯০০	৪৫	১৯০৬	৬৫
১৮৯৫	৪২	১৯০১	৪৬		
১৮৯৬	৪৯	১৯০২	৫৩		
১৮৯৭	৪৩	১৯০৩	৪৭		
১৮৯৮	৪৫	১৯০৪	৬৭		
১৮৯৯	৩৪	১৯০৫	৭১		

উদ্ভাবন বিষয়ে উন্নতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নহে। কিন্তু বিগত শিল্প-সমিতিতে মহারাজ গায়কবাড়ের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমাদিগের যান্ত্রিক উন্নতি আধুনিক জাতিসমূহের যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সহিত সমতা রাখিতে সমর্থ নহে, ইহার কারণ আমাদের দেশের বুদ্ধিবিদ্যা-সম্পন্ন জাতিগণ সহস্রাধিক বৎসর শিল্পচর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছেন এবং শিল্পের ভার অপেক্ষাকৃত হীনবিদ্য অল্পবুদ্ধি জাতির মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। কারুশিল্পের প্রতিভা আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে এবং কারুকর শ্রেণীর দক্ষতা ও স্বতন্ত্রতার মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কারুশিল্প বিশেষ জাতির নিজস্ব সেই জাতিনিবদ্ধ ব্যবসাতে না থাকিয়া সমগ্র দেশের সকল জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর শিশুসন্তানগণ বাল্যকাল হইতে যদি যন্ত্র ব্যবহারে শিক্ষিত দীক্ষিত হয়, যদি প্রত্যেক কৃতবিদ্য যুবক (গ্রাজুয়েট) যাঁহাদিগের যন্ত্রবিদ্যা ও কারুশিল্পের প্রতি ঝোঁক ও অনুরাগ আছে তাঁহারা চুক্তা বেতনের কার্য্যের জন্য লালায়িত হইয়া না ফিরিয়া সেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জাতীয় প্রতিভা সাহিত্যে ও চিন্তায় এবং শিল্প ও উদ্ভাবনে তুল্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।'

স্বদেশী প্রচেষ্টার ফলে পেটেন্ট অফিসে শুধু তাঁতের শিল্পের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কুম্ভকারী (pottery), কাচ, দিয়াশলাই, পেন্সিল, চামড়া এবং সাবান প্রভৃতি ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সব শিল্পে অল্পশিক্ষিত লোকের উপর কোন উদ্ভাবন আশা করা যায় না, অন্য দেশের উদ্ভাবিত প্রণালীই এখন দেশে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

ভারতের খাঁটি দেশী লোকের মধ্যে বা স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যে উদ্ভাবনের অভাবের কারণ এ দেশের মূলধন ও শিল্প প্রস্তুত প্রণালীর অবস্থা হইতে বুঝা যায়। এ দেশের যত বড় কারবারের মূলধন অধিকাংশ বিদেশী; এবং কলাও কারখানার কলবল বিদেশের আমদানী। এদেশে যদি কখন উন্নত প্রণালীর কল উদ্ভাবনের কল্পনা জাগ্রত হয়, তাহা সুবিধার অভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কারণ বিদেশের পুরাতন ধরনের কলেই যখন কাজ চলিয়া যায় তখন আর নূতন সংশোধনের আবশ্যক বোধ হয় না। আরো ভারতের প্রধান পণ্যদ্রব্য কাঁচা মাল বা প্রায় কাঁচা মাল। আমাদের দেশে পূর্ব্বাপর বয়নশিল্পেরই প্রচলন ও উন্নতি হইয়াছিল, এখনো সেইজন্য সকলের ঝোঁক সেই দিকেই দেখা যায়। নবশিক্ষিত বা নবপ্রচলিত ব্যবসায় সমুদয়ে সকল শক্তি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও পুরাতন না হইলে সেই ব্যবসায়ের কারুকরগণ নব নব উদ্ভাবনের প্রতি অবহিত বা চেষ্টিত হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশে যন্ত্রবলের প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলধন ও জনশক্তি ক্রমশ অল্প আবদ্ধ হইতেছে, এক্ষণে সেই অনাবদ্ধ মূলধন ও জনশক্তি নিত্য নব নব উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণ করিবে আশা করা যায়।



রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর।



পরলোকগত বরেন্ দত্ত।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

৮ বরেন দত্ত।

২৪ পরগণা বারাসতের দত্ত বংশীয়েরা তথায় পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। ইঁহারা বালীর দত্ত ও "দত্ত চৌধুরী" নামে অভিহিত। এই বংশে ইংরাজী ১৮৭১ সালের ১৮ই জুন রবিবারে শ্রীযুত বরেন দত্ত বারাসতে জন্মগ্রহণ করেন। বরেন বাবুর পিতাকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কর্ম্ম করিতে হয়। ১৫ বৎসর বয়সে বরেন বাবু মুঙ্গের জিলাস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করেন। পরবৎসর তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে কিছুকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হয়।

এই বৎসর বরেন বাবু আগ্রা কলেজে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি এম, এ, দিয়াছিলেন বটে কিন্তু পাস হইতে পারেন নাই। আগ্রা কলেজের বাৎসরিক বিবরণীতে লিখিত আছে—

"For the M. A. degree we sent up 9 candidates and 8 were successful. This might be considered very satisfactory were it not that the only student, who failed, was by far the ablest of the class. It is clear that the examination in Philosophy was much harder than the examination in other subjects. All who took English, Physics and Chemistry satisfied the examiners while the one student who took Philosophy, though the ablest man in the class, was plucked. It is perhaps impossible to make the different subjects of equal difficulty, but such glaring inequality should be avoided." (Agra College Annual Report, dated 22nd July, 1896).

আগ্রা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এ, টম্‌সন্ সাহেব তাঁহার ১৮৯৬ সালের ১০ ই মার্চ তারিখের পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"* * * Mr. Dutt has greatly distinguished himself in all his classes but specially in English literature and Philosophy. * * * I have seldom seen a student with such aptitude for speculative studies."

ইংরাজী ১৮৯৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে টম্‌সন্ সাহেব পুনরায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"Babu Barendranath Dutt is one of the ablest students I have ever had and among native graduates, a fitter man to teach either English or philosophy cannot be got * * *."

এম্, এ, পরীক্ষার পর তিনি কয়েক মাস এলাহাবাদে Examiner, Public Works Accounts আফিসে কর্ম্ম করেন। কিন্তু আফিসের গোলামী ভাল না লাগায় ঐ কর্ম্মে ইস্তাফা দেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে দরবার হাই ইংরাজী স্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার হইয়া নেপালে যান ও ডিসেম্বর মাসে ফিরিয়া আসেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সালের মার্চ্চ মাসে নেপালের জঙ্গীলাটের পুত্রদের শিক্ষক হইয়া তিনি পুনরায় নেপালে যান। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনের Royal Asiatic Societyর মেম্বর হন। ইংরাজী ১৯০০ সালের এপ্রেল মাসে তাঁহার ছাত্রদের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি নেপাল পরিত্যাগ করেন।

কিছু দিন বসিয়া থাকিয়া ডিসেম্বর মাসে তিনি দারভাঙ্গা জিলার মধুবাণী হাই ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হন। ইংরাজী ১৯০১ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি বিলাতের Royal Society of Literatureএর ফেলো হ'ন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত রমেশদত্ত ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী এই সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীযুত এন্, ঘোষ ইঁহাদের পরে হইয়াছেন।

ঐ বৎসর মে মাসে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে মধুবাণীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মধুবাণী স্কুলের সেক্রেটারী মিঃ, এ, ডবলিউ, ওয়াট্‌সন্, আই, সি, এস্ মহোদয় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

* * * "He impressed me by his knowledge of English, which he both speaks and writes extremely well." * * *

অতঃপর তিনি বারাসতে ফিরিয়া আসেন কিন্তু জুলাই মাসে তাঁহার গুণবতী পত্নীর অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি এ গুরুতর শোক লাঘবের জন্য পুনরায় কর্ম্ম লইয়া নভেম্বর মাসে নেপালে যান। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি বিলাতের Society of Artsএর মেম্বর হয়েন। নেপালে পূর্ব্বস্মৃতির বৃশ্চিক জ্বালায় তাঁহাকে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন ও প্রশংসার সহিত ঠাকুর আইন পরীক্ষায়

(Tagore Law Examination) উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু বি, এল্, পরীক্ষা দেন নাই। ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে আইন পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দিত কিন্তু ওকালতী দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই—কেবলমাত্র এই সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্যই তিনি আইন পড়িয়াছিলেন।

মানবের কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার বরাবরই ডাক্তার হইবার বাসনা ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এ ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি ইদানীং নিজে নিজে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া প্রতিবাসিগণের উপকার সাধন করিতেন।

এই সময় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং বরেন বাবুও প্রাণপণে উহাতে যোগ দেন। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মই নীরবে সম্পন্ন হইত, কিন্তু বারাসতের অনেক অধিবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও স্বদেশিতার বিরুদ্ধাচরণ জন্য তাঁহাকে মর্ম্মাহত হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু কথায় বলে "স্বভাব না যায় ম'লে;" বারাসতের ঐ সকল অধিবাসী জাত্যভিমানে উচ্চ হইলেও প্রায়ই একরূপ নিরক্ষর। তাহারা স্বদেশিতার উচ্চ ভাব অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার স্বদেশী সভা করিবার চেষ্টায় সাধ্যমত বিপক্ষতা করিতে লাগিল। অবশেষে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বিখ্যাত স্বদেশসেবক সকল আসিয়া বারাসতের অসাড় প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্ষণেকের জন্য বারাসতের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, কিন্তু বলিতে গেলে দুঃখ হয়, বারাসত আবার নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এখন বিদেশী দ্রব্যে বারাসত প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক রাখি বন্ধনের সময় তিনি কতিপয় স্বদেশভক্ত ছাত্রের সাহায্যে জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাখিমন্ত্র পাঠ করিয়া স্বহস্তে সকলের মণিবন্ধে রাখি বাঁধিয়া দেন। বারাসতের অনেক ভদ্র ব্যক্তি চাকরী যাইবার ভয়ে ইহাতে যোগ দেন নাই। বরেন বাবু কথায় ও কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি "বয়কটের" পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরাজী ১৯০৫ সালের শেষে নেপালের নির্ব্বাসিত রাজভ্রাতার পুত্রদের শিক্ষক হইয়া তিনি মধ্য প্রদেশের সাগর নামক স্থানে যান, কিন্তু কয়েক মাস পরেই সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন পরে তিনি এলাহাবাদে চলিয়া যান ও সেখানে অবস্থিতি কালে ১৯০৭ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৯ই তারিখে প্রায় ৩৫ বৎসর ১০ মাস বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার সততা, অমায়িকতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বিপদে পড়িলে লোকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। তাঁহার জ্ঞান উপার্জ্জনের স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। এমন দিন প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না যে দিন তিনি কিছু না কিছু নূতন বিষয় শিক্ষা না করিয়াছেন।

শ্রীঃ—

প্রবাসী রাজপরিবার।

রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বালেশ্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তাম্বুলি, এবং যে সব দে হুগলি জেলাস্থিত মায়াপুরের অধিবাসী ছিলেন রাজা শ্যামানন্দ তাঁহারই বংশধর। তিনি যৌবনে কুৎসিৎ প্রলোভনে মত্ত না হইয়া কায়মনোবাক্যে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার দক্ষতাপূর্ণ সুবন্দোবস্ত, সততা ও সদ্ব্যয় দ্বারা তিনি পৈতৃক সম্পত্তির আরও আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ, উদারতা, বদান্যতা, অনাথ আতুর ও নিরাশ্রয়ের সেবা কার্য্যে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা এই উড়িষ্যা অঞ্চলে যশস্বী ও সর্ব্বজন সমাদৃত হন। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে পুরীস্থিত জগন্নাথের গুণ্ডিচা মন্দির সংস্কার করাইয়া দেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা প্রদেশের দুর্ভিক্ষে তিনি শত সহস্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোককে অকাতরে চাউল ও বস্ত্র প্রদান করেন। সুদ না লইয়া তাঁহার রাইয়তদের ধান্য ও টাকা ঋণ দিয়া ও বিপদাপন্ন প্রজাদের অনেক রাজস্ব মাপ করিয়া প্রজাদের শান্ত করেন। এই সমস্ত অর্থের সমষ্টি প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। তিনি উত্তর পশ্চিম ও মান্দ্রাজ প্রদেশের এবং আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে

যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়াছেন। দরিদ্র লোকের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক গুলি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করেন, আরও তিনি এই প্রদেশের অনেক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং অনেক গুলির আংশিক ব্যয়ভার বহন করেন। প্রিন্স অব ওয়েলসএর ভারতবর্ষে শুভাগমনের স্মরণার্থে তিনি ৮৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরের দুইটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যে সব ছাত্র বালেশ্বর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিবে ও গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইবে না তাহারা এই বৃত্তি পাইবে। এই টাকা বর্ত্তমানে ভদ্রক এণ্ট্রান্স স্কুলের জন্য ঐ ফণ্ডের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে তিনি বালেশ্বরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং চিকিৎসালয়ের জন্য একটী উপযুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা আয়ের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী উক্ত চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি কোনপ্রকার মূল্য না লইয়া এ প্রদেশ দিয়া যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী খাল যাইতেছে তাহার জন্য অনেক জমী গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন। তিনি এই জেলায় বিভিন্ন কমিটীর মেম্বর স্বরূপ থাকিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি যথাবিহিতরূপে মহারাণী ভারতেশ্বরীর জুবিলী মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। আরও এই নগর দিয়া যে সমস্ত তীর্থযাত্রী ও নিঃস্ব লোক যায় তাহাদিগকে দৈনিক অনেক পরিমাণে অর্থ বিতরণ করেন। এরূপ রাজভক্তিরও এই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী দান ও কার্য্যের জন্য ১৮৭৫ সালে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি ও ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে রাজা উপাধি ১৮৮৭ সালে মহোরাণীর জুবিলী উপলক্ষে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সম্মানজনক উপাধি অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে ৭১ বৎসর বয়সে স্ত্রী, দুই পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া ভবলীলা শেষ করিলেন। শোকবিহ্বলা রাণী পুণ্যশীল স্বামী বিচ্ছেদে দিনে দিনে দগ্ধহৃদয়া হইয়া ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে মর্ত্তভূমি ত্যাগ করিয়া পরলোকে স্বামিসঙ্গিনী হইলেন। কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর) স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার মত নির্ম্মল চরিত্র ও অমায়িক লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মহারাণীর জুবিলী স্মরণার্থে একটী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে ৪০ ও ৫০ টাকার দুইটী বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়াছেন, এবং গত বিশ বৎসর হইতে সমস্ত কমিটীর মেম্বর ও অবৈতনিক বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন, মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়াছেন, এবং বালেশ্বর জাতীয় সমাজের সভাপতি হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণদাস পাল হল, টাউনহল ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী এবং চাঁদবালী হাঁসপাতাল এবং তীর্থযাত্রী ফণ্ডের সম্পাদক। গবর্মেণ্ট ইঁহার সৎকার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া ইঁহাকে একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দেন ও ব্যবস্থাপক সভায় উড়িষ্যার মেম্বর নিযুক্ত করেন; ইনিই উড়িষ্যার প্রথম মেম্বর। ইঁহার একটী মুদ্রাযন্ত্র আছে। তাহাতে এই প্রদেশের শিক্ষার সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক ও মানচিত্র ছাপা হইয়া থাকে।

শ্রীরাখালদাস পালধি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমরা অনেকে চাহিয়াছিলাম যে যদি লালা লাজপৎরায় দোষী হন, তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার হউক। এখন দেখিতেছি, তাঁহার বিচার না হইয়া ভালই হইয়াছে। রাওয়লপিণ্ডির নেতাদের যেরূপ বিচার হইতেছে, ভগবান নিকৃষ্টতম অপরাধীকেও ওরূপ বিচার হইতে রক্ষা করুন। তাঁহাদিগকে, অন্যায় করিয়া, জামীনে খালাস দেওয়া হয় নাই। জেলে তাঁহাদের যেরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, তাহাতে বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও অন্তিমকাল উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

পঞ্জাবে যে সকল ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে সকলে, আমাদের আর একটা বিপদ বাড়িতেছে, বুঝিয়া লউন। ভারতে গবর্মেণ্ট ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া

চলেন। হিন্দু মুসলমানে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিতে, এক প্রদেশবাসী ও অন্য প্রদেশবাসীর মধ্যে, ঝগড়া বিদ্বেষ জন্মান বা বাড়ান, এই নীতির লক্ষ্য। এখন এই নীতির কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। এখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ঝগড়া ও বিদ্বেষ জন্মান, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও পরস্পরে বিশ্বাস নষ্ট করা বা বাড়িতে না দেওয়া, গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হইতেছে। পঞ্জাবে চাষীদের অসন্তোষ দূর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট খালের জলের খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত রাখিয়াছেন এবং পঞ্জাব উপনিবেশ-আইন না-মঞ্জুর করিয়াছেন। এদিকে কিন্তু শিক্ষিত নেতাগণ নির্ব্বাসিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন। পঞ্জাবের লায়ালপুর এবং অন্যত্র ইংরাজ রাজপুরুষগণ সাধারণ লোকদিগকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে শিক্ষিত লোকেরা তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সরকারই তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী ও 'মা-বাপ'।

মর্লী সাহেব পার্লেমেণ্টের বক্তৃতায় শিক্ষিত লোকদিগকে ইংলণ্ডের শত্রু এবং বাকী সমুদয় ভারতবাসীকে ইংলণ্ডের বন্ধু বলিয়াছেন। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকদিগকে তিনি চটাইতে ভয় পান নাই; কারণ কলমের খোঁচায় রক্ত বাহির হয় না, বক্তৃতাতেও হাড় ভাঙ্গে না;—শিক্ষিত লোকেরা ঠেঙ্গাইতে জানে না। অপরদিকে তিনি কোটি কোটি অশিক্ষিত লোককে নরমকথায় নিজের দলে টানিতে চেষ্টা করিতেছেন;—তাহারা গোঁয়ার লোক কি না; কি জানি কবে ক্ষেপিয়া উঠে।

কিন্তু বৃথা এ চেষ্টা। ভারতবাসী সবাই এক দলের লোক। আমি দুকলম লিখিতে জানি, কিন্তু আমারই জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে নিরক্ষর লোক আছে। যাহা হউক, আমাদের সময়ে সাবধান হওয়া এবং দলাদলি নষ্ট করা ভাল।

এখন প্রত্যেক শিক্ষিত লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের কিছু সময় নিয়মিতরূপে সাধারণ চাষী, মুটে মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এরূপ ভাবে যাপন করুন, যাহাতে সামাজিকতা ও পরস্পর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ইহা খুব দরকারী কাজ।

মর্লী সাহেব যে আমাদিগকে ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা ভয় পাই নাই। তিনি কিম্বা সমুদয় ইংরাজ জাতি আমাদের ভাগ্যবিধাতা নহেন। বিধাতা সর্ব্বোপরি আর একজন আছেন, যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহার পূর্ব্বেও অনেক সম্রাট, অনেক সাম্রাজ্য, অনেক মহাবল পরাক্রান্ত জাতি ধূলিসাৎ হইয়াছে। সেই বিধাতাপুরুষের নিকট অপরাধী হওয়াকেই আমরা ভয়ের কারণ মনে করি। তাঁহার নিকট অপরাধী বলিয়াই আমরা পতিত হইয়াছি ও রহিয়াছি। কিন্তু মর্লীসাহেব যে আমাদিগকে শত্রু বলিয়াছেন, সেটা মিথ্যা কথা। অবশ্য আমাদেরও মানুষের শরীর; অত্যাচার, অবিচার করিলে আমাদেরও রাগ হয়, দ্বেষ হয়। কিন্তু আমরা রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, ইংলণ্ডের অনিষ্ট করিবার জন্য দিনরাত চেষ্টিত নহি। আমরা অন্য জাতির মত স্বাধীন ও সুখী হইতে চাই। ইহাই আমাদের চেষ্টা। ইহাতে যদি ইংলণ্ডের হানি হয়, কষ্ট হয়, তাহা একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার; তাহা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া, ইংরাজের বড় অহঙ্কার বাড়িয়াছে; অর্থের, সাম্রাজ্যের, ক্ষমতার অহঙ্কার। যদি ইংলণ্ডের দর্প চূর্ণ হইয়া ইংরাজচরিত্রে একটু দীনতা, আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা আসে, তাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি না লাভ? আমাদের প্রাচ্য সেকেলে বুদ্ধিতে ত লাভ বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক সে চিন্তায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা নিজের হিত চিন্তা করি।

মর্লী সাহেব যে ভারতের সাধারণ লোকদিগকে ইংলণ্ডের বন্ধু মনে করিতেছেন, সেটাও ভুল। ইংরাজ রাজত্বে অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেশী, রোগে মৃত্যুও খুব ঘটে। অনশন, রোগেমৃত্যু ও কষ্টভোগ সাধারণ লোকদের মধ্যেই ঘটে। সুতরাং এইজন্য তাহারা ইংলণ্ডকে দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে বলিয়া ত মনে হয় না। তবে, তাহারা খবরের কাগজে লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সমর্থ নয় বটে। তাহারা হয়ত পরে অন্য প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে।

মর্লী সাহেব কতকগুলি বিষয়ে ভারতশাসন কার্য্যের সংস্কার করিবেন বলিয়াছেন। (১) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বাড়িবে, কিন্তু সরকারী সভ্যের সংখ্যা বেশীই থাকিবে। অর্থাৎ তোমরা যত ইচ্ছা চেঁচাইতে পার। কি ভয়ানক



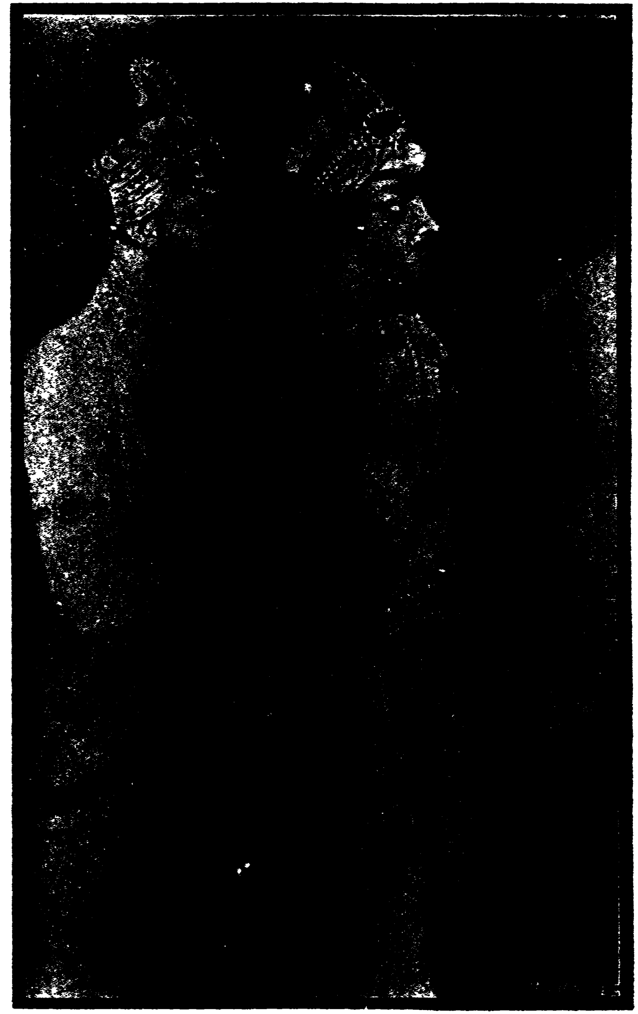
নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ।



সিরাজুদ্দৌলা।



ক্লাইব।



মীরজাফর ও মীরন।

উদারতা। (২) একটি "মোটেবল্" অর্থাৎ অভিজাতদের পরামর্শদাতৃ সভা হইবে। অর্থাৎ সরকারের ধামাধরা কতকগুলি আহাম্মক বা দেশের শত্রুর মুখ দিয়া গবর্মেণ্ট শিক্ষিত লোকদের মতের বিরুদ্ধ ও নিজের সুবিধাজনক মত কিছু বলাইয়া লইয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবেন। ইংরাজ নিজের দেশে লর্ড বা অভিজাতদিগের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর লোকদিগকেই "natural leaders of the people" অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা বলিতেছেন। তা, আমরা যেরূপ গাধা জাতি, তাহাতে আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা "গাধাতম" তাহাদিগকেই ত আমাদের স্বাভাবিক নেতা বলা উচিত। (৩) একজন বা দুজন ভারতবাসীকে বিলাতী ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য করা হইবে। এই ভারতবাসী এক বা দুই জন্য সভ্য যখন কর্ত্তা স্বয়ং নিযুক্ত করিবেন, তখন আমাদের হিতকারী লোক যে নিযুক্ত হইবেন, সে বিষয়ে স্থিরতা নাই। হইলেও তিনি বা তাঁহারা হংসমধ্যে বকো যথা হইবেন। (৪) ভারতগবর্মেণ্ট হইতে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলিকে কতকটা স্বাধীন করা হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আরও যথেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। (৫) সৈনিক-বিভাগের কিছু খরচ ভারতের স্কন্ধ হইতে ইংলণ্ডের স্কন্ধে চাপান যায় কিনা, তাহার বিচার করা যাইবে। অর্থাৎ ১৲ টাকা রেহাই দিয়া ১০৲ টাকা অন্য উপায়ে লইবার ব্যবস্থা হইবে। যেমন ওয়েল্‌বী কমিশন ভারতকে ৩৭॥০ লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াছিলেন। এদিকে ১৮৮৪-৮৫ সালে ভারতের সৈনিক ব্যয় ছিল, ১৭·৯ কোটি, ১৯০৬-০৭ সালে হইয়াছে ৩২·৮ কোটি। অর্থাৎ রেহাই দেওয়া হইল ৩৭॥০ লক্ষ, কিন্তু অন্য দিকে বাড়ান হইল ১৫ কোটি! "কর্ত্তার কি দয়া!"

মর্লী বলিয়াছেন তিনি যতদূর ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতে একপ্রভুত্ব-মূলক শাসন চলিবে, প্রজারা স্বায়ত্তশাসন পাইবে না; ইংরাজের ভারত-শাসন করা উচিত ও ইংরাজ ভারতশাসন করিবেন। মিঃ মর্লী একটু বিনয়ী হইলে মন্দ হইত না। ভবিষ্যতে কি আছে, তাহা হাজারটা মর্লী একত্র হইলেও বলিতে পারে না। তাঁহার মতে আমরা নিজের দেশ শাসন করিতে পারি না; এ বিষয়ে অল্প অধিকার পাইবারও অনুপযুক্ত। ভারতে স্বায়ত্তশাসন চলিতে পারে কিনা, তাহার বিচার স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পরে করা যাইবে।

মর্লী বলেন, ইংরাজ ভারতবাসীর উপকারার্থ ভারত-শাসন করিতেছেন। ইংরাজ চলিয়া গেলে ভয়ানক রক্তারক্তি হইবে; অর্থাৎ এই রক্তারক্তি নিবারণের জন্য ইংরাজ এ দেশে আছেন। আমরা বলি, ইংরাজ নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই ভারত শাসন করিতেছেন; তবে আনুষঙ্গিক ভাবে কিম্বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি ভারতের কিছু উপকার হইয়া যায় তাহাতে ইংরাজের আপত্তি নাই। যেমন মেষপালকের মেষের উপকার করা, অথবা গ্রাম্য কথায়, "তোমার যে ভালবাসা, যেমন মুসলমানের* মুরগী পোষা"। আর এই যে চোকরাঙ্গানি, যে, আমরা চলিয়া গেলে তোমরা কাটাকাটি করিবে; তা' মহাশয়েরা নিজ মহানুভবতাগুণে ভালয় ভালয় স্ব-ইচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন, এরূপ ত আমরা কখনও মনে করি নাই। সুতরাং রক্তারক্তির ভয়টা মনেই হয় নাই। যদি কখন ভারতবাসীর ঐক্যপ্রভাবে ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে হয়, ত, সেই ঐক্যই রক্তারক্তি হইতে দিবে না। আর, রক্তারক্তি ব্যতীত প্লেগেও ত মানুষ মরে। তা ছাড়া, আপনাদের আশ্রিত লোক গুণ্ডা লাগাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে, এই অভিযোগ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, কিন্তু আপনাদের উত্তর এখনও পড়ি নাই। আর যদি এতই দয়ার শরীর যে রক্তারক্তি নিবারণের জন্য এখানে আপনারা সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া আসিয়াছেন, তাহা হইলে, প্রভুগণ, একবার রুশিয়ায় রক্তারক্তির প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে হয় না? সেটা ত ইংলণ্ডের খুব কাছে।

ইংলণ্ডের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য আছে। সাহসও কতকটা আছে। কিন্তু সত্য কথা বলিবার সাহস নাই।

---

* মুসলমান বন্ধুগণ মাফ্ করিবেন। আমাদের সাত্ত্বিক হিন্দুগণের অনেকেও আজকাল "ঔষধার্থে" মুরগীর আদর করিতেছেন।

পলাশির যুদ্ধে ক্লাইব ভয়ানক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই ভারতসাম্রাজ্য জয় হইয়াছে, ইংরাজ নিজেকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এবার আবার গত ২৩শে জুন, যুদ্ধের দেড়শত বৎসর পরে বিলাতে স্কুলের ছাত্রদিগকে ছুটি দিয়া আমোদ করান হইয়াছে; (তোমরা হয় ত ভাবিতেছ এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, স্কুলের ছাত্রদের ইহার সঙ্গে যোগ কেন? "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়!") জালিয়াৎ ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তির জন্য সত্যবাদী কর্জ্জন টাকা তুলিতেছেন। আমাদের ইতিহাসজ্ঞান অন্য রকম। আমরা পড়িয়াছি যে, পলাশির যুদ্ধকে যুদ্ধ না বলিলেও চলে। ইংরাজের জিতের কারণ—ইংরাজের বিষদাঁত ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই আলীবর্দ্দীর মৃত্যু, সিরাজদ্দৌলার চরিত্রহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা, মীরজাফর ও কয়েকজন প্রধান হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় চরিত্রে দলাদলির আতিশয্য এবং ক্লাইবের জালিয়াতী। কোন পক্ষেরই গৌরব করিবার কিছু নাই। যদি কিছু থাকে ত, মীরমদন, মোহনলাল ও সিন্‌ফ্রের আছে।

পাঁজিতে দেখিতে পাই যে দেবীর আগমন ভিন্ন ভিন্ন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন যানে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এ বৎসর দেবীর পরিবর্ত্তে গজারোহণে উপদেবতার আবির্ভাব হইয়াছে;—বৃটিশ-হস্তী। ছবি দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা "কৃষ্ণ ও শিশুপাল" নামক রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মূল তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে হস্তিনাপুরে সমুদয় রাজা একত্র হইয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে মাল্য দিয়া সমুদয় নৃপতিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন যে কাহাকে সর্ব্বাগ্রে মাল্য দেওয়া উচিত? ভীষ্ম কৃষ্ণের নাম করেন। তাহাতে কৃষ্ণের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া, তরবারি হস্তে কৃষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে গালি দিতে আরম্ভ করেন। ভীম ও সহদেব বিপরীত দিক হইতে শিশুপালকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণ শান্তভাবে স্মিতমুখে সহদেবের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতেছেন। ইহাই চিত্রের বিষয়। রবিবর্ম্মা কোন চিত্রেই কৃষ্ণকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া অঙ্কিত করেন নাই।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত পুণ্যাত্মা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি চিত্র মুদ্রিত করিলাম। এবার স্থানাভাবে তাঁহার জীবন-চরিত দিতে পারিলাম না। আগামী মাসে দিব।

রাজপুরুষেরা হাতীর মত। হাতীর খাবার দাঁত এক রকম, দেখাবার দাঁত আর এক রকম। রাজপুরুষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এক রকম, প্রকাশ্য উদ্দেশ্য আর এক রকম। ইংরাজের স্বদেশীর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু বয়কট্ লোকটা ভারি বেয়াদব ও দুর্ব্বৃত্ত। যাহা হউক, আমরা সোজাসুজি এই বুঝিয়াছি যে গবর্মেণ্ট বঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গে, এবং আরও বিশেষ করিয়া বরিশালে, স্বদেশীর উচ্ছেদ সাধনে, অন্ততঃ, উহাকে honest অর্থাৎ ভাল মানুষ অর্থাৎ গোবেচারী অর্থাৎ নিরীহ অর্থাৎ ম্যাঞ্চেষ্টারের আয় কমাইতে অসমর্থ, করিতে, কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

অতএব সকলে স্বদেশীকে রাখিতে কোমর বাঁধুন।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, You can take a horse to the water, but you can not make him drink: ঘোড়াকে জলের কাছে লইয়া যাইতে পার, কিন্তু (তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) তাহাকে জল খাওয়াইতে পার না। আমাদেরও বাজার, দোকান, বিলাতী কাপড়ে, চিনিতে, নুনে বোঝাই হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি ঘোড়ার চেয়েও অধম না হই, তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে ঐ সব জিনিস কিনাইতে পারিবে না।

সম্মুখে পূজার বাজার। হয় লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ ছাড়া হইবে, নয় দেশে থাকিবে। এখন একবার সকলে জাগুন, এবং সকল স্থলে প্রকাশ্য সভা করা সম্ভব না হইলেও, শত প্রকার উপায়ে সকলকে জাগাইয়া তুলুন। কেবল বিদেশী জিনিষ না বলিলে হইবে না; স্বদেশী জিনিষ উৎপন্ন করাই প্রধান কাজ।

হে ভগবান্, আমাদের হৃদয়ে যদি কোন ধর্ম্মবিগর্হিত ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।



পূর্ব্ববঙ্গে গজারোহণ

অগ্নি-মন্ত্র।

(আর্য্যেরা প্রাচীনকালে অনার্য্যদিগকে কিপ্রকার তাড়না করিতেন, তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু গণ্ডশবরাদি জাতির মধ্যে এখনও যে প্রকার ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ, তাহাতে তাড়না অস্বীকার করা যায় না। গণ্ডাদি জাতির লোক কদাচ ব্রাহ্মণের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। অনার্য্যদিগের শরীরে কিছু কিছু আর্য্য চিহ্ন দেখিয়া ফরসাইথ সাহেব আর্য্যকৃত অনেক পাপ অনুমান করেন। নিম্বপুরম্ ও বুডিগুণ্ঠ (বেলেরি) প্রভৃতি স্থানের বিশাল ভষ্মস্তূপ হইতে অনার্য্য-নাশ অনুমিত হয়। (J. R. A. S., 1899)। অনার্য্যেরা ভস্মে বিষ বিকীর্ণ করিয়া আর্য্য সমাজ জর্জ্জরিত করিতেছে; এইরূপ কল্পনায় কবিতাটি লিখিত। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই বিরোধী কথা পড়িতে অরুচি হইবে কি ?)

(১)

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না ?
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়
দলিতেছে অরি চরণ তলায় ;
পোড়াতে অরিকে পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না ?
দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ?
লভগো মৃত্যু জিনিতে শত্রু
যে করে তোমারে ঘৃণা ;
তবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

(২)

ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ;
কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কি না ?
নাশিয়া অরির ঘৃণিত শরীর
মরিবি কি না ?
পাশব আচার নিষ্ঠুরতার
নিশ্চয় আছে সীমা।
কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

(৩)

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস,
শ্মশানের ধূমে বিলাইতে বিষ ,
মরণে আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না ?
স্বজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না ?
জাগে অপমান বিন্ধ্যসমান ;
ঘোচে কি মরণ বিনা ?
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্যাধি ও প্রতিকার।

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেণ্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেণ্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ ইতিপূর্ব্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনো দিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলি পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু শুধু কি তাই ? এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা ? রাজাই যেন আমাদের পর কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে ?

যখন দেখি—পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায় চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমরা বিচ্ছিন্ন,বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপোষ করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাহা স্পর্দ্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই "স্বদেশী" উদ্যোগ হঠাৎ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিষ কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব ঐখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিষ আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয় প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা' ছাড়া একমুহূর্ত্তেই যুদ্ধং দেহি বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পলিটিকাল বক্তৃতা-সভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম—বলিলাম, এবার আমাদের লড়াই সুরু হইল, তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে যতই ভালবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনো দিন জানি না।

চিরদিন আমাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন এ সমস্তই কন্‌গ্রেসী চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কন্‌গ্রেসের মলয়মারুত-হিল্লোল নয়, ছুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের পালা পূরাদমে আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুন না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ প্রকার বে-আইনী ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্প বয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে সব ইংরেজ এ দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায়—এবং অধীন দেশের কর্ত্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না—ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এই জন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরাজি দাপাদাপি সুরু করিয়াছিলেন, তাহা ভদ্র ইংরেজ পক্ষের দৃষ্টিতে বড়ই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ঐ একটা ভারি মুস্কিল আছে। তাহারা যখন ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাতচালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না—কারণ অল্পে অল্পে আমাদেরি শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জ্জন তাড়ন ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদক্ষেত্র আমাদের দেশের মত আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্র-পারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনো সেণ্টিমেণ্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান্ কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।

এই জন্য আমাদের মত অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিস্‌পিস্ ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়—তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য্যে তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েণ্টালদের সঙ্গে এ রকম চাল ঠিক নয়—যেমন অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্ব্বাক্ ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজেচাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত আধমরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না। বোয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্‌বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয় ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়ত ভুলাইতে পারে কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মত সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্ত্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম। এই স্পর্দ্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

অপরপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্য্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই একটা মাথা ফাটাফাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি কেন যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখদেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে আমরা বন্দে মাতরম্ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন আদালত হইতে সুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ কথা বলা চলিত যে রাগ দ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি—এ সমস্তই সদ্‌যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর

ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলে না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসঙ্গত, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এত বড় কোনো দাবী নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ার ভাঁটা রৌদ্র বৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে কোনো কারণেই এবং যে কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্ত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই ত দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না ইংরেজকে আমরা এত বড় নির্ব্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কি কারণ ঘটিয়াছে?

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি ত ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে ত কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে ত অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।

হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই সয়তান যখন উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড় যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় ত পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনো মতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন—তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল—অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল;—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যাকথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্য্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্ম্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি বাংলা দেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে

এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায় শাস্ত্র ত মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার ত কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্ম্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত; যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না; সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্ব্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য, অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোন দিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক "বয়কট্" যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্ম্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যতকিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, একথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে; কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র সুখ স্বাস্থ্য শিক্ষা দীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্ব্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকেই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজিপড়া সহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে "ভাই"—তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা "চাষা বেটা" বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দ্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত "স্বদেশী" প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহ সম্ভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যে প্রেমের

সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়—সে উদ্দেশ্য খুব বড় হইতে পারে, হউক্ তাহার নাম "বয়কট্" বা "স্বরাজ", দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভাল বাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত—তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসঙ্গত শুনিতে হইত না।

হিন্দু মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোন সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম্ম ভাল চলে কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্ত্তন হওয়াও আশ্চর্য্যকর নহে। আসল কথা, আমরা একদেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম্ম; আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্ম্মের বন্ধনবশত শুধু সুবিধা নহে অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্! আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চ্চা নহে, প্রেমের চর্চ্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চ্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পূরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

এইজন্য অদ্যকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে একথা বলিতে হইতেছে যে স্পর্দ্ধা করিবার লড়াই করিবার দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্দ্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে একটা বিলাসের স্বরূপ হইতে পারে কিন্তু অশক্তের পক্ষে তাহা দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল আমাদের আছে কি? শুধু তাই নয়, যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে হিসাবটা কি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে? যে নৌকায় কোনোমতে ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে সুরু করিলে যদি তাহার ফাটগুলা দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন? এই নৃত্য-ব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না কিন্তু ইহাই যদি আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত ঐ ফাটাগুলো সারাইয়া লইতে হইবে ত?—তাহাতে বিলম্ব হইবে। তা হইবে বটে কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা এমন পুণ্য করি নাই যে ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, দুর্লভ ধনলাভও করিব, অথচ বিলম্বও ঘটিবে না।"

তবে করিতে হইবে কি? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্ব্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কি সে ত বারম্বার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কি কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো প্রকার কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মসঙ্কল্প না থাকে তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ঔদ্ধত্য করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয়—সেই সতর্কতা ভীরুতা নহে, তাহা তাহার কর্ত্তব্য।

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্ম্মচেষ্টায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, একথা যখন

তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্ব্বল করিয়ো না। আর কিছু না পারো খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা কর। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাক। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি কেবলি নষ্ট করিতেছি সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া ছোট বলিয়া অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু একটা করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পঁচিশ করিয়া ফলাইয়া কেবলি সাগরপারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক একটি জায়গায় এক একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে কোনো একটি কর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্ম্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সঙ্কল্প শক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল—এবং আড়ম্বর কর্ম্ম নষ্ট করিবার সয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ এক দিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালীর সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্য্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফল ভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্ম্মকে তেজ না দিয়া কর্ম্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যে দিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেই দিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে

আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেষ্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কি? ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি এ যে মগের মুল্লুক্ হইল—মর্‌লির মুখে লিবারেল নীতির উল্টা কথা শুনিলেই আমরা বলি এ কি পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিল!

আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মত ধৈর্য্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে! আমরা কিছুই কি করিয়াছি! একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখ দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে! আমাদের "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলেত মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধ মাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে! ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুইবা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য! নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বল দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কি সুগভীর! ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্য্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! আমরা শিক্ষিত কয়েকজন্ এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দ্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক্। কিন্তু এখনি আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্ব্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্ব্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যে দিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্ম্মতাকে আড়ম্বর পূর্ব্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্য্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি আমরা কত বড় ভয়ঙ্কর সে আলোচনায় কাহারো কোনো লাভ নাই; কর্জ্জন আমাদিগকে কেমন্ করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্‌লি আমাদের কান্নার উপর কত বড় অন্যায় ধমকটা দিলেন সে কথা লইয়া অনবরত একসভা হইতে আর এক সভায় এক কাগজ হইতে আর এককাগজে মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বল কি কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও ত তাহার একটা সুরু আছে, সেটা একসময়ে ত ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ ত আকাশকুসুম নয়, একটা কার্য্যপরম্পরার মধ্য দিয়া ত তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন, তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান্ কি, তাঁহাদের আয়োজন কি? কর্ম্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও

অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম্ম—কেবলি মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্রদুর্ব্বলতার বিলাসমাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্ম্মের নিঃশব্দনিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুন্দর।

হে সুন্দর!

সচন্দন পুষ্পদলে পুণ্য-শ্লোক দল
উদ্দেশে করেন পূজা চরণ-কমল,
আনন্দে উঠেছে ভরি, হৃদয় কলস
স্পর্শ-রসনায় পান করি নব রস।
ঊষার কাননে ফোটা নীরদের ফুলে
অর্ঘ্য দান করিয়াছি শ্রীচরণ-মূলে,
সৌন্দর্য্য পেয়েছি যেথা, হে সুন্দরতম
আহরিয়া ওই পদে সঁপেছি মরম,
স্বর্গীয় কিরণে স্ফীত শিশু কলিকায়
আজি কবি ওই পদে সঁপিবারে চায়।
এ পুষ্প ভরিয়া যাবে, কল্যাণে তোমার
স্বার্থ-বিষে করিবে না হৃদয় আঁধার,
চির লাবণ্যের মাঝে হইয়া মগন
শিশু যেন দেখে নিতি তোমারি স্বপন।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

চেতনা।

বুঝিনি তোমারে; তাই, এত হাহাকার!
অতৃপ্তির দাবানলে হৃদয় আমার
তাই সদা দহিয়াছে,—চিতার সমান
জ্বলিয়াছে সে আগুন না লভি নির্ব্বাণ!
আগে যদি জানিতাম, আছে আজনম
ও বক্ষে লুকানো প্রেম সাগরের সম;
আগে যদি ভাবিতাম, ওই আঁখি-কোণে
নিত্য ঝরে কার লাগি মুকুতা নির্জ্জনে;
আগে যদি ক্ষণতরে ওই দৃষ্টি মাঝে
পারিতাম নেহারিতে—যে করুণা রাজে
এই হতভাগ্য তরে,—তা' হ'লে জীবন
নিরাশায় জ্বলে' পুড়ে' হ'ত না এমন!
বুঝিতাম তাহা হ'লে—বিশ্বে যাহা নাই,
লুকানো রয়েছে তব প্রাণে মোর তা'ই।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৭ম ভাগ।	আশ্বিন, ১৩১৪।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

নাগরিক ভারত।

বোম্বাই।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্য জাহাজের অক্লান্ত স্ক্রু-দাঁড়টা উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিতেছিল, পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় একটা উপকূলের নিকটে জাহাজ পৌছিবামাত্র স্ক্রুর বেগটা আস্তে আস্তে কমিয়া আসিল। সেই উপকূল ভূমির অস্ফুট রেখা,—যাহা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই বেশী জানা যাইতেছে—উহাই বোম্বাই নগর এবং সেখান হইতে আরও দূরে—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ··· যাত্রাপথের সমস্ত সুরম্য দৃশ্য এই সময়ে যাত্রী মাত্রেরই স্মরণপথে পতিত হইল; লোহিত সমুদ্র এই ঋতুকালে আদপে গরম নহে; উহার প্রসারিত নীল মসৃণ গালিচার উপর দিয়া আমাদের জাহাজ পিছলাইয়া কেমন বেমালুম চলিয়াছিল; ভারতসমুদ্র যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক তরঙ্গাকুল, তাহার ফেনময় উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ জাহাজের শাদা গলুয়ের উপর কেমন আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই, উষ্ণ বাষ্পমগ্ন শীর্ণকায় তটভূমি, দিগন্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িল; এবং আমাদের জাহাজ, বিচিত্র রঙ্গের বয়াগুলার অনুসরণ করিয়া, হরিৎশ্যামল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ধার দিয়া, মরাঠা গিরি-দুর্গ সমূহের নীচে দিয়া ধীরে ধীরে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যবনিকা উত্তোলিত হইল, ভারতের জনবিশ্রুত নাট্যদৃশ্য নেত্র সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। Prince's Dockএর ঘাট জনপূর্ণ;—য়ুরোপীয় ভারতযাত্রীর ও শিল্পমেলার দর্শকবৃন্দের ভৃত্য পরিচারকে সমাচ্ছন্ন; প্রথমেই দেখা গেল কতকগুলি বালিকা, কতক গুলি পার্সী রমণী;—উহাদের কালো কালো সুন্দর চোখ সোনার চসমায় ঢাকা; পরিধানে লাল সবুজ ও জর্দ্দা শাড়ী। পার্সী পুরুষদিগের মাথায় মোমজামা কাপড়ের ধুচনী টুপি; উহারা আমাদের জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িল। কতকগুলা কুলি, পাগড়ীর আকারে মাথায় নেঁকড়া জড়ান, নগ্ন গাত্র ও নগ্ন জঙ্ঘা, হলদে রং, শীর্ণকায়, কুষ্ঠক্ষতে গাত্র আচ্ছন্ন, দেখিতে জেলখানার কয়েদীর মত, উহারা যাত্রীদের বোজ্‌কা বুজ্‌কী হেপাজৎ করিতেছে;—এই সব মাল গরুর গাড়ীতে উঠিবে।

আমার পার্শ্বে এইরূপ বিস্ময়োচ্ছ্বাস শুনিতে পাইলামঃ—"কি চমৎকার বৃহৎ বন্দর! আমাদের দ্বারা এ কাজ কখনই হইয়া উঠিত না!" আমি সেদিকে না ফিরিয়াই বুঝিলাম, একজন ফরাসী এই কথা বলিতেছে। সুসমৃদ্ধ বন্দরের দৃশ্যটি অতি সুন্দর, দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। সুরম্য দ্বীপগুলি

মহাবলীর ন্যায় শান্তভাবে অবস্থিত। শাদা শাদা রণতরী, মাস্তুলের জটিল অরণ্য, কত জাতির রাষ্ট্রীয় পতাকা, ডকের ঘেরা-জল, ডকের সুদীর্ঘ বাঁধা ঘাট, বন্দরের অসীম উদ্যম-তৎপরতা এই সমস্ত আমাদের বিদ্বেষপূর্ণ প্রশংসা-বিমুখ কর্ণকুহরেও বিজয়ী ইংরাজের বিজয়সঙ্গীত উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছে।

বন্দরের কোণে একটি ক্ষুদ্র ফলক—যাহা কাহারও বড় একটা মনোযোগ আকর্ষন করে না—সেই ফলকে এই কথা গুলি লেখা আছে:—"একজন পার্সী বিশ্বকর্ম্মার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় ও তাঁহার মৎলব অনুসারে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই বন্দরটি নিখাত হয়।" যাঁহারা বোম্বাই নগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের স্বাক্ষর রহিয়াছে। জাহাজ হইতে সহসা নামিয়া ভারতভ্রমণকারীর চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাই এই ক্ষুদ্র ফলকটির প্রতি লক্ষ্য না করা তাঁহার সম্বন্ধে মার্জ্জনীয়।

বোম্বাই একটি আধুনিক নগর, বর্ত্তমান ভারতের লক্ষণগুলি ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যেখানে এখন এই বন্দর, এই নগর, এই সব ডক, ব্যাঙ্ক, কালেজ, বাজার অবস্থিত এবং যাহা দেখিয়া নব আগন্তুক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়—তিন শতাব্দি পূর্ব্বে সেইখানে, অস্বাস্থ্যকর সমুদ্রতীরের উপর, কেবল কতকগুলি ধীবর-কুটীর পুঞ্জীকৃত ছিল। ভগবানের রৌদ্রবৃষ্টিতে লালিত এই ক্ষুদ্র গ্রামটি প্রথমে ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ ছিল, পরে ইংরাজের হাতে আসিয়া উহা আজ জনাকীর্ণ নগর হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখন ৮ লক্ষ লোকের বসতি; শুধু হংকং শাংঘাই বলিয়া নহে—সমস্ত এসিয়ার মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। যে সকল নগর, ব্রিটানিকী শান্তির বিশাল ছায়াতলে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। এই নগরটি ক্রমাগত বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে; পক্ষান্তরে মহারাজাদিগের পুরাতন নগরসকল লোপ পাইয়াছে কিংবা এক ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। সেই সকল অমল-ধবল নগর যাহা পবিত্র নদীর ধারে কিংবা সুশ্যামল তালীবনের মধ্যে অবস্থিত,—সেই দিল্লি, যাহা শুভ্র-স্বচ্ছ প্রস্তর-বসনে আচ্ছাদিত; সেই আগ্রা যাহা গম্বুজ-কিরীটে বিভূষিত; সেই হাইদরাবাদ যাহা মলমল বস্ত্রে মণ্ডিত বলিলেও হয়; সেই বারানসী, যাহার সরু সরু মিনার স্তম্ভ, সোনার মন্দির, দীর্ঘ প্রসারিত প্রাসাদ ও ঘাট গঙ্গার উপর প্রতিবিম্বিত, ঐ সকল নগরে রাজকীয় মহোৎসবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ যদি না থাকিত তাহা হইলে উহাদিগকে শুধু রাজাদের বাসস্থান, গড়বদ্ধ ছাউনী কিংবা তীর্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হইত। যে সময় হইতে রাজদরবার উঠিয়াগিয়াছে, সেই সময় হইতেই, ঐ সকল নগরের অধিকাংশই অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে যে সকল নগর ইংরাজের আশ্রিত তাহারাই ইংরাজ লস্কর-ছাউনীর খরচে কোন প্রকারে ঠাট বজায় রাখিয়াছে। এক সময়ে যে সকল নগর ইন্দ্রপুরী তুল্য ছিল এখন তাহা মরুভূমিতে পরিণত; উহাদের জমকাল ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে উদ্দাম বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, ও বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন। ফতে-পুর-সিক্রী, আকবরের মহিমান্বিত রাজধানী; যে ফকীর সেখানে অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিল, তাহার নাতীরা সেখানে এখন আশ্রয় লইয়াছে; কেউটে গোখরো, বাঘ, হিন্দু—সকলে মিলিয়া একত্র বাস করিতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সুলতানদিগের কক্ষ, বাদশাহের গুপ্তগৃহ আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে।

ইংরাজের অধিকারে এই সকল নগরের কোন সুবিধা হয় নাই। কেবল যে সকল নগর, রেলপথের চৌমাথায় অবস্থিত এবং এই কারণে বণিকদিগের সুবিধাজনক বিপণি-রূপে পরিণত—তাহারাই এখন বাঁচিয়া রহিয়াছে। বিলাতের আমদানী-মাল ঐ থানে জমা হয় এবং ঐ থান হইতে অন্যান্য স্থানে বিতরিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ ঐ সকল নগরের তেমন অভিবৃদ্ধি হয় নাই। নাগরিক জনসংখ্যার অতিরেক-অংশ,—জনাকীর্ণ গ্রাম পল্লির অভিমুখেই পুনঃপ্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন নগরে, কারখানার ধূমধ্বজ, তূলার কল, পাটের কল দেখিয়া মনে করিও না ঐ নগরটি দ্বিতীয় মাঞ্চেষ্টার কিংবা শিকাগো। ইংরাজ তূলা-ওয়ালা যাহারা ভারতের ছোট ছোট ব্যবসায়ের বিলোপসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহারা ভারতের বৃহৎ শিল্পব্যবসায়ের প্রতিও বিন্দুমাত্র স্নেহমমতা প্রদর্শন করে নাই। ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী এই ইংরাজেরা ভারতে থাকিয়াই ভারতের বৃহৎশিল্প-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতী-শুল্ক বসাইয়াছে। সেই সব বিনষ্ট ছোট ছোট ব্যবসায়ের স্থান কলকারখানা

যে অধিকার করিয়াছে (যদিও সংখ্যায় খুব কম) সে দোষ কলকারখানার নহে। বোম্বাই নগরের সমৃদ্ধি একটু অনন্য সাধারণ। ভারতভ্রমণকারীরা সমুদ্র হইতে দেখিতে পান, ধূমধ্বজগুলা তাল-নারীকেলের স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা অনতিবিলম্বেই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহারা মনে করেন, বোম্বায়ে যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহা বুঝি ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কার্পাস-শিল্পব্যবসায়ের বোম্বাই—একমাত্র বোম্বাই-ই কেন্দ্রস্থান। বোম্বাই ত আর সমস্ত ভারত নহে। অন্যান্য যে সকল নগর আজকাল খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কলকারখানা তাহাদের সেই সমৃদ্ধির কারণ নহে; কারখানার কাজে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকই ব্যাপৃত। সে সমৃদ্ধির কারণ, ইংরাজের বাণিজ্য ব্যবসায়, ইংরাজের ব্যাঙ্ক। উপকূলের বড় বড় বন্দর, করাচি, কলিকাতা, মাদ্রাজ, আভ্যন্তরিক প্রদেশের বিপণি-স্থানসমূহ যাহা রেলপথের চৌমাথায় অবস্থিত —ইহারাই ইংরাজের আমলে উপকৃত হইয়াছে।

বিভিন্ন কারণে বোম্বাই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বোম্বাই একটা বৃহৎ বন্দর, বোম্বাই বাণিজ্যের নগর, বোম্বাই কলকারখানার নগর। উহার উপসাগরের এরূপ সুন্দর সংস্থান যে তাহাতেই সমস্ত ভারতের অনন্যসাধারণ স্বাভাবিক বন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল জাতি খুব উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান তাহারাই এই বিশ্বনাগরিক নগরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। যাহারা বোম্বাইকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পার্সীরাই প্রধান। এই দেখ, আমাদের বোম্বায়ের প্রখ্যাত কন্‌সল, তাঁহার ১৯০৪-১০ই জুনের বার্ষিক বিবরণীতে কি লিখিয়াছেন:—

"এই পাশ্চাত্য ভারতে, পর-পর দুইবার দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল—তা ছাড়া ১৮৯৬ হইতে মহামারী এখানে স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—এ সমস্ত সত্ত্বেও, এই বৃহৎ বন্দরের এরূপ সুন্দর সংস্থান, (য়ুরোপ হইতে ভারত-প্রবেশের পক্ষে এরূপ উপযোগী বন্দর আর দ্বিতীয় নাই) অত্রত্য বণিকদিগের এরূপ উদ্যমশীলতা, কার্পাস-শিল্পের এরূপ উন্নত অবস্থা, রপ্তানী মালের এরূপ প্রভাব যে, বোম্বায়ের বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়, মুহূর্ত্তের জন্য বিপন্ন হয় নাই।"

বন্দরের সৌন্দর্য্য, বৃহত্ব, ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানকার প্রতিকূল সাগর-তীরের উপর প্রকৃতির অনুকূল দৃষ্টি; মাদ্রাজ, পণ্ডিচারি, আরও অন্যান্য উপকূলবর্ত্তী নগরে এরূপ স্বভাবদত্ত আশ্রয় স্থান নাই; তাই যে কাজ প্রকৃতি সেখানে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ করা ভিন্ন মানুষের আর বেশী কিছু করিবার আবশ্যক হয় না। জলের ডক্, ডাঙ্গার ডক্, ঘাট, যন্ত্র-সরঞ্জাম প্রভৃতি কিছুরই বোম্বাই-বন্দরে অভাব নাই। এখানে জাহাজের বহুল গতিবিধি। বোম্বাই কন্‌সলের রিপোর্টে প্রকাশ;—

"১৯০২-১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ৯১১ জাহাজ (৫৬৪ বাষ্পীয় পোত ও ৩৪৭ পালের জাহাজ) ১২৯০২৬৫ টন ওজনের মাল লইয়া আসিয়াছে; এবং এখান হইতে ৭২৮ জাহাজ (৪৯২ বাষ্পীয় পোত ও ২৩৬ পালের জাহাজ) ১২০৪২৯৩ টন্ ওজনের মাল লইয়া বাহির হইয়াছে। সব সমেত ১৬৩৯ জাহাজ ও ২৪৯৪৫৫৮ টন্ ওজনের মাল; ইহার দ্বারা বোম্বায়ের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।" বড় বড় জাহাজের কোম্পানী—ফরাসী, ইটালীয়, জাপানী "পেনিন্‌সুলার," "মেসাজেয়ার ম্যারিটিম্" "নিপোঁ য়ুসেন কাইশা"—এই সকল কোম্পানীর জাহাজ বোম্বায়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। সমস্ত ভারতের যে বাণিজ্য তাহার এক-তৃতীয়াংশ একা বোম্বায়ের।

বোম্বাই এসিয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার। যে ছোট ছোট পাহাড়ে নগরটি বেষ্টিত, সেই পাহাড়ের উপর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাল নারিকেলের শ্যামল কুঞ্জ হইতে উচ্চ ধূমধ্বজ সকল বাহির হইয়াছে। সমস্ত ভারতে যে সূতা ও কাপড়ের কল আছে তাহার মূল ধন ৩ কোটি বিশ লক্ষ মুদ্রা এবং উহাতে ১৮০,০০০ মজুর (স্ত্রী ও পুরুষ) খাটিয়া থাকে। সমস্ত ভারতে ১৯২ কারখানা ও ৫০ লক্ষ টাকু (Spindle)। বোম্বায়ের ৮০টা কারখানা ও ২০ লক্ষ টাকু এবং উহাতে ৮৬০০০ মজুর খাটে। এই উজ্জ্বল চিত্রে ছায়ার ভাগও আছে। সূতা ও কাপড়ের শ্রেষ্ঠ খদ্দের—প্রায় একমাত্র খদ্দের—চীন। এক্ষণে, মুদ্রাবিনিময়ের অস্থিরতা ও রূপার চিরস্থায়ী ঘাট্‌তি—ইহাই ইহার গুরুতর প্রতিবন্ধক। কিন্তু একমাত্র প্রতিবন্ধক নহে। দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাতের উপর শতকরা ৩১।৩২ হারে শুল্ক চাপাইয়াএই ব্যবসায়টিকে ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে; কিন্তু আসলে এ শুল্কের চাপ

আরও অধিক; কেন না, ইহার দ্বারা রপ্তানি সংযত হইয়াছে এবং ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারেও বিক্রয়ের বাধা ঘটিয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, ম্যাঞ্চেষ্টারেরই প্ররোচনায় এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ শিল্পের উপর শুল্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দেশীয় তরুণ শিল্পের এমনি জীবনীশক্তি যে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিদ্বেষ দৃষ্টি সত্বেও, ইহা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অল্পে অল্পে এখানকার বাজার দখল করিয়া লইয়াছে। এখন ভারতের এই চেষ্টা—এবং এই চেষ্টায় ভারত কতকটা সফলও হইয়াছে—যাহাতে লম্বা আঁশের তূলা এ দেশে উৎপন্ন করিয়া এবং উহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে পারে।

বোম্বাই একটি বিশ্বজনিক নগর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের প্রধান প্রধান জাতিরা এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে। মস্‌জিদ্‌, গির্জ্জা, অগ্নি-মন্দির, দেবালয়, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সভ্যতা এখানে পাশাপাশি বাস করিতেছে—তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ নাই, বৈরভাব নাই। কেন না, বিদ্বেষপূর্ণ অন্ধ-ধর্ম্মমত্ততা, এই গৌরবোজ্জ্বল হর্ষোৎফুল্ল নগরের একান্ত রুচিবিরুদ্ধ।

নগরের য়ুরোপীয় অঞ্চলটি, বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া একান্তে অবস্থিত। চওড়া চওড়া রাস্তা, বিহারভূমি, ক্রীড়াভূমি—সমস্তই সৌরকরে পরিপ্লাবিত। গৃহ সকল এরূপ বৃহদায়তন ও উচ্চ যে তাহা দেখিয়া অপর কোন রাজধানীর ঈর্ষা জন্মিতে পারে। দেশীয় লোকদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ এবং রাজপুরুষদের বাসভবনও এরূপ জমকাল যে দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এস্থলে বিজেতাদিগের গুণগুলির ন্যায় দোষগুলিও উপযোগী। এই সব গুরুভার জমকাল ইমারৎ,—বিজেতাদিগের ইচ্ছা ও প্রভাব বিলক্ষণ ব্যক্ত করিতেছে। ইহাই "সিটি" নামে অভিহিত—এই সিটি রাজকার্য্যের ও সরকারী কাছারির মুখ্য স্থান। প্রধান রাজপথ দিয়া যদি চল ত দেখিবে রাস্তার দু-ধারে বড় বড় ব্যাঙ্কের নাম লেখা—"হংকং ব্যাঙ্ক" "শ্যাঙ্হাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশান," "চার্টাড্‌ এসিয়া" "অষ্ট্রেলিয়া ও চাইনা ব্যাঙ্ক" "য়োকোহামা স্পেশি ব্যাঙ্ক," "কোঁতোয়ার দেস্কঁৎ" ব্যাঙ্ক—তা ছাড়া বড় বড় জাহাজের কোম্পানি—"মেস্তাজেয়ার ম্যারিটীম্‌" "পেনিনসুলার"—বড় বড় সংবাদপত্রের আফিস্‌—বীমা-কোম্পানীর আফিস্‌, হোটেল, ক্লব্‌ এবং ছোট ছোট অনেকগুলি য়ুরোপীয় দোকান—যেখানে বাছা-বাছা ধরণের সৌখীন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীত হয়। এ অঞ্চলে কোন প্রকার জীবন-উদ্যমের ভাব দেখা যায় না। শ্বাসরোধী উত্তপ্ত রাস্তাগুলা জনশূন্য; এই অনলবর্ষী সূর্য্যের প্রখর কিরণে, পথে কেহ চলিতে সাহস করে না। বাড়ীর জানালাগুলা যেন নীরন্ধ্রভাবে অষ্টেপৃষ্ঠে রুদ্ধ। তবে কি লোকেরা নিদ্রা যাইতেছে?—না। মৌচাকের ভিতরে প্রবেশ কর—দেখিবে প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আছে—কেহ বা কাঠগড়ার মধ্যে, কেহ বা আফিস-ঘরে;—গায়ের ফতুয়া খুলিয়া, কামিজের আস্তিন গুটাইয়া, বিজলি-পাখার ঠাণ্ডা বাতাসের নীচে, এসীয়াবাসীর ধরণে ধীরেসুস্থে নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। উর্দ্দিপরা খানসামারা জরির পাগড়ী পরিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে।

সূর্য্য যখন দিগন্তে ঢলিয়া পড়ে তখনই য়ুরোপীয় সহরটা জাগিয়া উঠে। সমুদ্রের সম্মুখে, বেড়াইবার রাস্তায়, সেই সময়, মক্‌মলের পাড়ে বিভূষিত উজ্জ্বল শাড়ী পরিহিতা পার্সী-মহিলাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। লন্‌টেনিস্‌ ও ক্রিকেট্‌-ক্রীড়কদিগের দ্বারা তত্রত্য শাদ্বলভূমি আচ্ছন্ন। সম্মুখে সমুদ্র প্রসারিত—ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে;—পার্সি ও ইংরাজের মধ্যে ক্রিকেটের-প্রতিযোগিতা চলিতেছে—কি চমৎকার দৃশ্য!—এই মৌসমের ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। বোম্বায়ের একজন ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এইরূপ লিখিয়াছেন:—"হয় ত আমি এই বিষয়ে একটু বেশী পক্ষপাতী, কিন্তু আমার মনে হয় বম্বের প্যারেড্‌-ভূমিতে প্রেসিডেন্‌সির ১১ জন ও পার্সীদের মধ্যে যখন ক্রিকেট্‌ খেলা হয় তখন তাহা দেখিয়া ইংরাজের রাষ্ট্রপরিচালনশক্তির যতটা আমরা পরিচয় পাই এমন আর কিছুতে নহে। একটা ত্রিকোণের বাহুর উপর কতকগুলা জাঁকাল ইমারৎ রহিয়াছে। একদল ইংরেজ ও একদল দেশীয় লোকের মধ্যে বাজির খেলা চলিতেছে; ১০।২০ হাজার লোক খুব ঔৎসুক্যের সহিত খেলা দেখিতেছে—বেশ সদ্ভাবে, শিষ্টভাবে, ক্রীড়াশীলভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে।"

নমনীয়, মুক্ত-হৃদয়, বহিঃপ্রভাবের বশবর্ত্তী, পরকীয় সভ্যতার সমস্ত বিষয় (assimilation) সাত্মীকরণে সুপটু পাশ্চাত্য চিন্তা-কল্পনার প্রতি—পাশ্চাত্য ধরণধারণের প্রতি সজাগ-দৃষ্টি, কেজো লোক, সাহিত্যিক রচনায় সিদ্ধহস্ত, ক্রিকেট খেলায় শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বিষয়ে "আধুনিক"—এই পার্সীদের মত এমন আর কে আছে? তা ছাড়া, উহারা খুব পুরাতন জাতি—স্বকীয় অতীতের প্রতি যারপর নাই অনুরক্ত। উহাদের সমাজ ক্ষুদ্র—জনসংখ্যা নব্বই হাজারের অধিক নহে। কিন্তু যে বীর্য্য উত্তম, যে সামাজিক বন্ধন এই জাতিকে বজায় রাখিয়াছে, তাহা অসাধারণ। যে ঘটনা-সূত্রে বোম্বাই সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা এই:—পার্সীরা পারস্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। মুসলমানেরা তলোয়ারের বলে, উহাদিগকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা পলাইয়া প্রথমে সুরাটে, তাহার পর, বোম্বায়ে আগমন করে। আজ উহারা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু, বেশ ধনশালী; উহাদের ঘনিষ্ঠ সামাজিকতা (solidarity), উহাদের বিদ্যালয়, উহাদের অর্থসাহায্যজনিত বিবিধ অনুষ্ঠান—এই সকলের দরুণ, উহারা আজ সমস্ত ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত;—অনক্ষর লোকের অনুপাত শতকরা সাত হইতে পাঁচ মাত্র—এবং উহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুনীতিপরায়ণ, কেন না, বেশ্যা-শ্রেণীর মধ্যে একটিও পার্সী রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই বৃহৎ নগরীর প্রত্যেক রাস্তাতেই কতকগুলি কাজের লোক যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মাথায় সাদা ধুচ্‌নী টুপি কিংবা মোমজামা কাপড়ে মণ্ডিত ধুচ্‌নী-টুপি—তাহাতে মটরের মত সাদা সাদা ফুট্‌কি। ইহারাই পার্সী। আবার সন্ধ্যার সময়, দেখিতে পাই, উহারা "বোটানি-বে"র সমুদ্র-তীরে, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহসহকারে অস্তমান সূর্য্যদেবের স্তবস্তুতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন খুব আগ্রহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেছে। পরে, স্বকীয় যজ্ঞসূত্রের দুই প্রান্ত টানিয়া টঙ্কারধ্বনি করিয়া, প্রশান্ত তরঙ্গরাজির নিকটে আসিয়া কনকোজ্জ্বল তরল বালুকার মধ্যে হাত ডুবাইতেছে। এই সমুদ্রতীর, এই অস্তমান সূর্য্য, দিগন্তের উপর বেগনি রঙ্গের এই তালপত্রাবলী,—সমস্ত মিলিয়া পূজার্চ্চনার নিমিত্ত ইহাই তাহাদের বিশাল দেবমন্দির। বোম্বাই নগরের যে পাহাড়টি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, বাছিয়া বাছিয়া তাহারই উপর, তালকুঞ্জের মধ্যে—গুল্মপুষ্পের মধ্যে—৭টা স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই উহাদের শ্মশান। একদিন অপরাহ্নে, বাগ্‌দাদের প্রধান-পাদ্রির সহিত, আমি এই স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে শুভ্রবসনধারী পুরোহিতগণ, তাহার পর অনুযাত্রীবর্গ আসিল; শব-মন্দিরের চূড়াদেশে শব স্থাপিত হইল। ন্যাড়া-মাথা শকুনীর ঝাঁক, উদ্যান প্রাচীরের উপর কালো ফিতার আকারে, সারি সারি বসিয়াছিল, শব দেখিবামাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

পার্সীদের মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃবন্ধন, ইহা হইতেই উহাদের সাধারণ সম্মিলিত-স্বার্থের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। উহারা যেমন আপনাদের উন্নতির জন্য—সেইরূপ সমস্ত বোম্বায়ের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়াছে। উহাদের উদার-হৃদয় মানবহিতৈষী মহাত্মাগণ—পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। একটা কোন সার্ব্বজনিক স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে গিয়া তাহার উপরিস্থিত অৰ্দ্ধকায় মূর্ত্তিটি দেখ—তাহার নীচে দেখিতে পাইবে এই কথাগুলি লেখা রহিয়াছে:—"ইনি একজন পার্সী, ইনি এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।" এইরূপে উহারা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কালেজ ও মিউনিসিপাল পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছে। এইরূপে উহারা,—যিনি বদান্যতায় Rockfiller ও Carneggier সমকক্ষ সেই তাতার প্রভূত অর্থ-সাহায্যে গবেষণা-মন্দির স্থাপনে উদ্যত হইয়াছে। প্রত্যেক ইমারতের উপর, প্রত্যেক প্রস্তরের উপর লিখনাদি পাঠ করিয়া ভারত-পর্য্যটক, পার্সী-উদ্যম-তৎপরতার পরিচয় পান। যে দিন আমি পৌঁছিলাম সেই দিনেরই অপরাহ্নে, বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গলির ভিতরে, আমার হোটেলের নিকট ইহার আর একটা নিদর্শন পাইলাম:—"ফরাসী-সাহিত্য-সম্মিলনী।" একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। ধুচ্‌নী-টুপি-পরা একটি গম্ভীর প্রকৃতির লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। আমার বিস্ময়-রঞ্জিত মুখভাব দেখিয়া একটু হাসিলেন এবং আমাকে পঠন-শালায় ও পুস্তকাগারে লইয়া গেলেন। পুস্তকাগারটি বেশ প্রশস্ত, মনোরম, সুপরিচিত

গ্রন্থে পূর্ণ;—পুস্তকের নাম, লেখকের নাম—সব আমার পরিচিত। আমার দেশ হইতে বহু যোজন দূরে—এই খানেই, বিষণ্ণচিত্ত রাষ্ট্রপতি কার্ণোর আমলের, এবং শ্রান্তক্লান্ত রাষ্ট্রপতি ফোরের আমলের সংবাদপত্র ও সমালোচনী পত্রিকাদি দেখিলাম। মনে হইল যেন আমি হঠাৎ ফরাসী মফস্বল-প্রদেশের কোন একটি ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সম্মিলনীটি একটি পার্সী-প্রতিষ্ঠান। একজন পার্সী বণিক আভিজাত্যের উপাধি মনে করিয়া গর্ব্বের সহিত "পেতি" নাম ধারণ করেন; ইনিই এই সম্মিলনীটি স্থাপন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফরাসী নাবিকগণ তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষকে এই নামটি প্রদান করিয়াছিল।

য়ুরোপীয় অঞ্চলের সীমান্ত হইতে পার্সী-সহর আরম্ভ হইয়াছে; তাহার আরও দূরে হিন্দু-সহর, মুসলমান-সহর। এটা যেন আর এক জগৎ,—একবারেই অপরিচিত; যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে যোজন পথ দূরে—উহারই সংলগ্ন অথচ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ যেন আর এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এমন কি, একজন ইংরাজ আপনার ঘোড়াকেও এখানে আনিতে সাহস করে না। আমাদের প্যারিসের তরুবীথি-বিশিষ্ট সৌখীন লোকের অঞ্চলটির মত, তাহার পরপারে আর সমস্ত স্থান যেন ইংরাজের পক্ষে অপরিচিত পল্লী-প্রদেশ। ইহাই দেশীয়দের সহর। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে এই পার্সী রাস্তার বাড়ীগুলিতে একটা খামখেয়ালী ধরণের নিজত্ব আছে—উহার গবাক্ষ বারাণ্ডাদিতে বেশ একটু মৌলিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু বোম্বাই অপেক্ষাকৃত একটি নূতন সহর। ইহা অপেক্ষা সুরাট, কিংবা লাহোর, কিংবা কোন পারস্য-সহর, কিংবা পূতিগন্ধ আবর্জ্জনাময় বারাণসীও আমার ভাল লাগে! এখানে নগরটা বেশী তাড়াতাড়ী বাড়িয়া উঠিয়াছে,—সেই সঙ্গে কতকগুলা মসজিদ ও দেবালয়ও তাড়াতাড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দু-বাড়ীগুলাকে গোলাপী, হলদে কিংবা নীল পাথুরে রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া কারুকার্য্যের অভাব অতি সহজে পূরণ করা হইয়াছে। আমাদের বৃষ্টিবহুল দেশে, এইরূপ রং-চং করিলে রং-মাখানো সং-এর মুখের মত মনে হইত। কিন্তু এই সুশ্যামল তালীবনের দেশে, প্রাচ্য সূর্য্যপ্রভার এমনি মহিমা—(সূর্য্য একটা মস্ত যাদুকর)—য়ুরোপীয় অঞ্চলের এক ঘেয়ে, ধূসরতা দেখিয়া আসিয়া এই সমস্ত বিচিত্র বর্ণে নেত্র পরিতৃপ্ত হয়।

শ্যামল মূর্ত্তিতে রাস্তাগুলা পরিপূর্ণ;—লম্বোদর নগ্ন শিশু; স্ত্রীলোকেরা এমন সুন্দররূপে কাপড় পরিয়াছে যে উহাদের সুনম্য শ্যামল গায়ের গড়ন বেশ প্রকাশ পাইতেছে; মুণ্ডিত-মস্তক লোক,—তাহাদের দৃষ্টি অদ্ভুত; ক্ষতাচ্ছন্ন পাংশুবর্ণ কতকগুলা কঙ্কাল-সার লোক, করুণ-কোমল, হতাশ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এই সব অবসন্ন, কুঞ্চিত-গতি, মনুষ্য-ডিম্বের ঝাঁক, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, মহামারীর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—মহামারীতে প্রতিদিন ১৫০০ লোক মরিতেছে। ইহাই দেশীয় সহর। একটা দেবালয়ের দ্বারদেশে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কেন না, আমি দেখিতে পাইলাম—অভ্যন্তর-প্রদেশে একটা রজতময় প্রকাণ্ড বৃষ রহিয়াছে; হস্তের ঘর্ষণে, উহার গাত্র মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমি ম্লেচ্ছ, মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে আমার পা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে, ছিন্নবস্ত্র ক্ষুধিত লোক, তীর্থযাত্রীর দল, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকেরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, ভিক্ষা না দিলে আমাকে এক পাও নড়িতে দিবে না। পাছে আমার উপস্থিতিতে মন্দিরের উপর বজ্রপাত হয় এই আশঙ্কায় যেন উহারা বাহু উত্তোলন করিয়া আমার পথ আটকাইতে লাগিল!

একটা সরু ও নীচু দোকান-ঘরে, একজন দোকানদার, বুদ্ধের মত অচল ভাবে বসিয়া আছে;—গোল-গাল মুখ; চোখে অস্পষ্ট হাসির ভাব। আমি নিকট দিয়া যখন চলিয়া গেলাম, আমাকে তাকাইয়া দেখিল। গ্রাম-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে আমি এই ব্যক্তিদের কথা কিছুই বলি নাই। বলি নাই কেন?—অবশ্য, গ্রামপল্লিতে দোকান যে একেবারে নাই তাহা নহে। আজকাল সেখানেও দোকান দেখিতে পাওয়া যায়—বলি নাই এই জন্য, যেহেতু গ্রামপল্লীর যেরূপ সমাজগঠন, তাহাতে সেই আদিকালের ধরণে গঠিত গ্রামপল্লীতে দোকান জিনিসটা অনাবশ্যক। দোকান সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে—এবং উহা এই পল্লীসমাজের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র।

গ্রাম মাত্রই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত। উহার নিজের কারিগর লোক আছে—তাহারাই গ্রামের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী যোগাইয়া থাকে। মধ্যবর্ত্তী কোন লোক নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি স্বকীয় অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য, পরস্পরের সহিত বিনিময় করে। কোন একটা পছন্দসই নূতন জিনিস প্রস্তুত হইলে, প্রথমে সেই গ্রামে ফেরিওয়ালা, তাহার পর ব্যাপারী প্রবেশ করে। এই বেণিয়াদের যতই প্রতিপত্তি ধন ঐশ্বর্য্য হউক না কেন, পল্লীসমাজ তাহাদিগকে আমলে আনে না। পল্লীসমাজ উহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিন্তু নগরের মধ্যে ইহারা রাজা বলিলেই হয়। য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতায়, কারিগরশ্রেণী যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, দোকানদারেরা ততটা হয় নাই। বিলাসদ্রব্য ছাড়া, উহারা সমস্ত বিলাতী জিনিসই বিক্রয় করিয়া থাকে ;—কাপড়-চোপড়, পেরেক, লোহা, মোমবাতি, কেরোসিন, এমন কি ফোটোগ্রাফের উপকরণ পর্য্যন্ত। ইহারা বিদেশী বণিকদিগকেও বাজার হইতে বেদখল করিয়াছে। কিন্তু ইহারা খুব অল্প লাভেই সন্তুষ্ট। বিলাতী বণিকদের অনেক খরচ, সুতরাং উহারা অত্যন্ত মহার্ঘ্য মূল্যে জিনিস বিক্রয় করে। যদি হিন্দু দোকানদারদের ব্যবহার খাঁটি হইত—অর্থাৎ উহারা বাণিজ্য বিষয়ে খাঁটি ব্যবহারের মূল্য বুঝিত—তাহা হইলে য়ুরোপীয় প্রতিযোগীরা এখানে দোকানপাট বন্ধ করিয়া কোন্ কালে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। ইহা সত্ত্বেও, বর্ত্তমান ইংরাজের আমলে, যেমন কুশীদজীবীর তেমনি ব্যাপারী বেণিয়ারও বেশী কিছু আক্ষেপ করিবার বিষয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। বেণিয়া ধনশালী হইয়া উঠিলে, বাহিরে তাহার ধন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ; উহাদের বৈভব আড়ম্বরের সহিত লোকের সম্মুখে প্রদর্শিত হয় না। এখন কোন বিবাদের আশঙ্কা না থাকিলেও, সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বেণিয়ারা সাহস পায় না। সেকালে, বিলাস-বিভবের কোন প্রকার নিদর্শন দেখাইলেই আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনা হইত—আপনাকে অপরাধী বলিয়া যেন ঘোষণা করা হইত। ক্যান্টন নগরস্থ ধনাঢ্য বণিক, দোকানে পণ্যদ্রব্য যে ভাবে সাজাইয়া রাখে তাহা অতি জঘন্য ; সে ম্যাণ্ডারিনের কৌতুহলী দৃষ্টিকে সর্ব্বদাই ভয় করে ; তাহার দোকানে প্রবেশ কর—তাহার জিনিসের কিছুই অন্ধিসন্ধি পাইবে না। ভারতেও এইরূপ—এবং ইহার মূলে একই হেতু বিদ্যমান। কেন না, বিবাদের আশঙ্কা চলিয়া গেলেও, অবিশ্বাসের ভাব এখনও রহিয়াছে। বিলাস বিভবের সামগ্রী সমস্তই প্রচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, লুক্কায়িত। দোকানদার তোমার চক্ষের সম্মুখে ছোটখাট অল্পমূল্যের জিনিস ভিন্ন কোন মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে সাহস করিবে না—যদি বাহির করে তাও আবার অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে। এই জন্যই বোম্বাই নগরে—এমন কি ভারতের নগর মাত্রেই—হয় ত দোকানের জিনিসগুলা খুব কৌতূহল-জনক, বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের দ্বারা চিত্রবৎ সুশোভন, ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে, কিন্তু দোকানটি দেখিলে মনে হইবে অতীব দীন-ভাবাপন্ন। আসলে তাহা নহে।

কিন্তু সূর্য্য—প্রাচ্যদেশের সূর্য্য—একটি অপূর্ব্ব যাদুকর—কত চিত্তবিমোহন পরীদৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় ; দোকানের খেলো জিনিসের উপর—খেলো কাপড়ের উপর, সূর্য্য-রশ্মির একটা স্বর্ণময় অবগুণ্ঠন নিক্ষেপ করে। ভারতের আর সমস্ত নগরের মত বোম্বায়ের দেশী সহরটিও অপরিষ্কৃত, কিন্তু কলিকাতার মত অতটা অপরিষ্কৃত নহে। কলিকাতা নর্দ্দামা ; বারাণসী আবার তারও বাড়া—গোবরের ঢিবি। কিন্তু চীনে সহরের তুলনায় কলিকাতাও স্বর্গ। চীনের রাস্তাগুলাকে ময়লার নালা বলিলেও চলে। কোন ইংলণ্ডীয় সহর যেরূপ পরিষ্কৃত, বোম্বাই সেইরূপ পরিষ্কৃত। বোম্বায়ের নালা নর্দ্দামা যদি কুগঠিত হয়, যদি রাস্তাঘাট ভাল করিয়া ধৌত না হয়, মলরাশিতে ও পচা মাংসে সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকে—(অবশ্য অন্যান্য প্রাচ্য নগরের মত নহে) তবে সে দোষ, দেশী ম্যুনিসিপ্যালিটীর—তা ছাড়া নিশ্চয় জানিবে, সে দোষ সূর্য্যের—পর্য্যন্য দেবের—শকুনি গৃধিনী আদি শিকারী পক্ষীর—কেন না, সহর পরিষ্কৃত রাখিবার ভার ইহাদেরই উপর !

প্রাচ্য ভূখণ্ডে,—এমন কি, বোধ করি সমস্ত ভূমণ্ডলে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জাপানীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ;—ইহা জাপানীদের উদ্ভাবিত জিনিস। উহাদের বাড়ীগুলি দেখ,—ধূলার নাম গন্ধ নাই ; উহাদের নগরাদি এরূপ পরিষ্কৃত, এরূপ শোভনসুন্দর, এরূপ সযত্নে পরিধৌত, এরূপ নিখুঁৎভাবে পরিমার্জ্জিত, দেখিলে মনে হয় যেন সদ্য স্নান

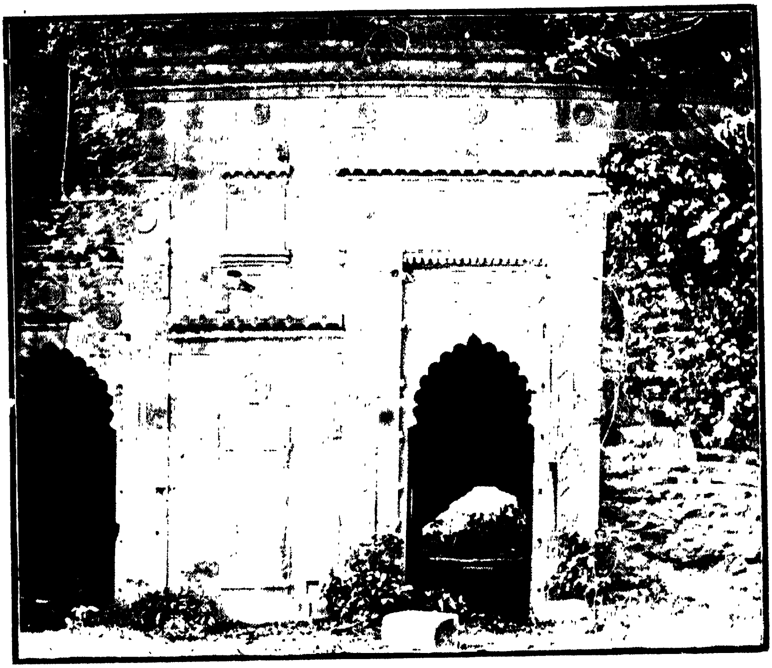
করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। ভারতে স্বাস্থ্যবিধানতত্ত্বের অস্তিত্বমাত্র নাই। প্রত্যেকেই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে বাস করিতেছে—কেহই আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করে না। এ কথা স্বীকার করি, বিষঘ্ন উপকরণাদি প্রয়োগ করিয়া বাজারের বায়ুকে বিশোধিত করা ইংরাজের পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। তাহা অপেক্ষা সহজ পন্থা—যেখানে মহামারীতে শত সহস্র লোক প্রতিদিন মরিতেছে—সেই বায়ুদুষ্ট স্থানের বাহিরে এবং যত দূর সম্ভব দূরে গিয়া বাস করা। স্বাস্থ্যকর কোন উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, জনসাধারণের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,—ইহাই একটা বিষম আশঙ্কার বিষয়। যখন নালার যোগে গঙ্গাজল কলিকাতায় প্রথম আনা হয়, তখন ভক্তেরা গঙ্গামাহাত্ম্যের হানি হইল বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। দিব্য নদীদিগকে এইরূপে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে কে সাহস করিবে? এই দৃষ্টান্তটিতে একটা শিক্ষা পাওয়া যায়। হিন্দুরা সহজেই অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করে। যাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা তাহারা গ্রহণ করে। দেশীয় মিউনিসিপালিটীকর্ত্তৃক বোম্বায়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লর্ড রিপনের আমল হইতে, ভারতের অধিকাংশ নগরের ন্যায়, বোম্বাই নগরেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকগুলি প্রখ্যাত লোক এই সমস্ত পৌরসভার সভাপতি হইয়াছেন। রমেশদত্ত বলেন,—"বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন-পৌরসভাও অনেক ভাল কাজ করিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতিসাধন করিয়াছে, নালানর্দ্দামার উন্নতির জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছে, পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিয়াছে।"

হরিৎ-শ্যামল তরুকুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত, সাগর-বায়ুর মধুর হিল্লোলে আন্দোলিত, সুস্নিগ্ধ, আবৃত, ধূলিময় শ্বাসরোধী সহর হইতে দূরে অবস্থিত যে-সকল বাগান-বাড়ী আছে —দরিদ্রা মহামারী উহাদের স্বর্ণপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না * * রাজকর্ম্মচারী, বণিক, কারখানা-ওয়ালা, য়ুরোপীয় উপনিবেশী, ধনাঢ্য দেশীয় লোক, অধিকারচ্যুত অধিপতি, ক্ষুদে রাজা, নির্ব্বাসিত রাজকুমার, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও পার্সী—ইহারাই বান্দোরায় বাস করেন। সেখানকার সমাজ, হিন্দু ও পার্সী—এই দুই সমাজ লইয়া গঠিত। এই সমাজটি মিশ্রগঠন, চিত্র-শোভন ও জ্যোনোজ্জ্বল, কিন্তু উহাতে রমণীর অস্তিত্ব নাই।

১৯০০ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে, বিচারপতি তয়াবজীর কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে যে সান্ধ্যসমাগম হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সমস্ত সমাজমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

বড় আদালতের বিচারপতি তয়াবজী বোরাসম্প্রদায়ের লোক। গোড়ায় বোরারা ধনাঢ্য হিন্দু বণিক ছিল, পরে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। লোকে বলে, বোরাদের কুবেরের ঐশ্বর্য্য। উহারা বিলাসবিভবে রাজাদিগকেও ম্লান করিয়া ফেলে। যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারে না,—নিমন্ত্রিতদিগের বিনোদনার্থ একজন প্রাচ্যদেশবাসী আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও কি আগ্রহের সহিত উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে!

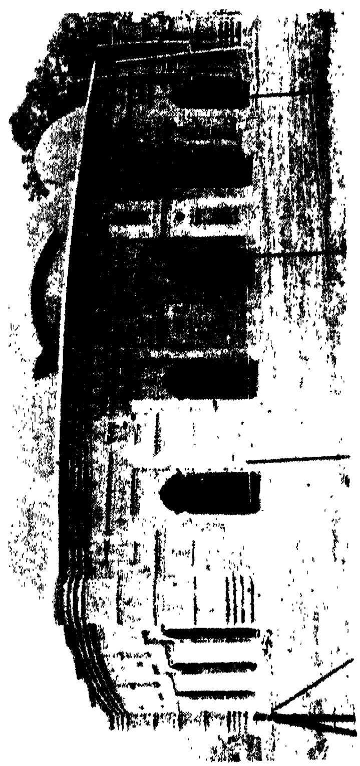
বিশাল উদ্যান। তালীকুঞ্জের ফাঁকের মধ্য দিয়া শান্ত সমুদ্র ঈষৎ দেখা যাইতেছে। গ্রীষ্মদেশসুলভ মধুর আলোকে সমুদ্র দুগ্ধ-ধবল আভা ধারণ করিয়াছে। উদ্যান আলোকে আলোকময়। গাছে গাছে আলোক-মালা—বিচিত্রবর্ণের ছোট ছোট কাচের ল্যাম্প,—যেন অগ্নিময় ফলের গুচ্ছ ঝুলিয়া রহিয়াছে। প্রাচীর, গড়ানে দেওয়াল, ফুলের কেয়ারী, কাঠের লঘু সেতু,—সমস্তই আলোকে উদ্ভাসিত; যেন রত্নমুকুট, হীরা-মুক্তার নদী ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আলোকের যে কত রকম খামখেয়ালী নক্‌সা তার আর ইয়ত্তা নাই। যেন আকাশের তারা শিল্পীর যাদুমন্ত্রে, ধরাতলে শ্যামল পল্লবের মধ্যে, নামিয়া আসিয়াছে। এই মায়া-কাননে, দুই দল বাদক পালায় পালায় সঙ্গীতের আলাপ করিতেছে। টেবিল খাদ্যভারে ভারাক্রান্ত;—আস্ত জীব-জন্তু, নানারঙ্গে রঞ্জিত পিষ্টকের সৌধাবলী; বরফের চাক্‌লা, সুরাপূর্ণ পাত্র;— প্রাচ্য দেশীয় লুকলসের (Lucullus) নৈশ প্রমোদোৎসব। পুত্র ও জামাতায় বেষ্টিত হইয়া বিচারপতি তয়াবজি মজলিস-ঘরের প্রবেশ-পথে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার মাথাটি গোল ও তল্‌তলে—মুখের চারিধারে সূক্ষ্ম শ্মশ্রুরাজী; ছোট-ছোট চোখ,—তার উপর স্থূল সোনার-চস্‌মা; হাসি-মুখ; 'ভাল-মানুসি' ও মার্জ্জিত রুচি সমস্ত মুখমণ্ডল হইতে যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তিনি ফরাসী ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন:—"ভাল আছেন?" এবং এই কথা



সোনা মসজেদের কারুকার্য



শিবরাজপুরের তোরণদ্বার।



কালো মসজিদ।

বলিয়া তাড়াতাড়ি অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির হস্ত কম্পন করিলেন; প্রত্যেকেরই হাতে এক একটি ছোট-ছোট ফুলের তোড়া দিয়া তাহার উপর একটু গোলাপজল ছিটাইয়া দেওয়া হইল। এই মায়াকানন—যেখানে প্রত্যেক বৃক্ষই যেন এক একটি ঝাড়-লণ্ঠন, প্রত্যেক তরুকুঞ্জই এক একটি আতস-বাজির নক্‌সা,—এইখানে সকল জাতীয় লোক, সকল শতাব্দির সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছদধারী লোক একত্র হইয়াছে—তাহাদের ঝকমকে বিচিত্র বেশভূষা হইতে বিদ্যুচ্ছটা,—কিরণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উদ্যানভূমির দীপ্ত আলোকে বিলীন হইতেছে। রাজপুরুষ ও কন্‌সলদের পরিচ্ছদ,—চুম্‌কি ও সম্মান-ভূষণে সমাচ্ছন্ন, পার্সি-পুরোহিতের শুভ্র বসন, শুভ্র উষ্ণীষ—পার্সি রমণীর জর্দ্দা রঙ্গের শাড়ী—কিন্তু হায়! এই রমণীর সংখ্যা বড়ই কম; রাণী ভিক্টোরিয়ার অভ্যর্থনা পাইয়া যাঁহারা সম্মানিত এইরূপ দুইটি প্রখ্যাত সুন্দরীকে দেখিলাম; আর দেখিলাম,—কতকগুলি রাজপুত রাজকুমার;—কিংখাপের পরিচ্ছদ—গলায় হীরা মুক্তার কণ্ঠমালা, মাথায় শোভন শ্রীপচ্‌কল্‌কাভূষিত শাদা, বেগ্‌নী, জর্দ্দা রঙ্গের পাগ্‌ড়ী। তাহাদের সূক্ষ্ম শ্মশ্রু মুখের দুইধারে তালবৃন্তের ন্যায় বিস্তারিত এবং তাহার দুই প্রান্ত বিকুঞ্চিত। উহাদের জ্বলন্ত চক্ষু, উহাদের পিত্তলবর্ণ উজ্জ্বল গাত্র,—বৃক্ষনিঃসৃত আলোকচ্ছটায় আরও যেন দীপ্তি পাইতেছে।

এই সমস্ত দৃশ্য খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু প্রমোদময় নহে; ইহাতে কি যেন একটা অভাব আছে। উপরে, আর একটা উৎসব চলিতেছে; উহা লোকলোচনের অদৃশ্য; কেবল অনুমানে বুঝা যাইতেছে, সেখানেও খুব আলোর ঘটা। সে সপ্তম স্বর্গ আমাদের অনধিগম্য—সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; উহা রমণীদের উৎসব; সেখানে রমণীরা পুত্তলিকার ন্যায় সজ্জিত হইয়া আছে; উহাদের মধ্যে, নববিবাহিতা বালিকা অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেছে। স্বীয় পতি ছাড়া আর কোন পুরুষই তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হীরক প্রস্তুত করা।

সকলেই জানেন হীরক একপ্রকার বহুমূল্য খনিজ বস্তু। হীরক দ্বারা কাচ কাটা যায় তাহাও অনেকে বিদিত আছেন। এই যে সে দিন বোয়ার যুদ্ধ হইয়া গেল, বলিতে গেলে তাহা কেবল মাত্র কিম্বার্লির হীরকের খনির জন্য।

শুধু কিম্বার্লিতে এত হীরক পাওয়া গিয়াছে যে যদি যত পাওয়া যায় সকল গুলিই বাজারে দেওয়া হইত তাহা হইলে হীরকের বহুমূল্যতা লোপ পাইত। সেই জন্য কিম্বার্লির খনির স্বত্বাধিকারিগণ অল্পে অল্পে হীরক বাজারে দিতেছেন। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ খনি হইতে এক অতি বৃহৎ হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। হীরকের উজ্জ্বলতা ও মনোহারিত্বের বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার যখন মনে হয় যে "কোহিনুর" ভারতবর্ষে বহুকাল ছিল, তখনই আমার হৃদয়ে এক অহঙ্কারের ভাব আসে। আট নয় বৎসর আগে সকলের বিশ্বাস ছিল হীরক কখনও মানুষে প্রস্তুত করিতে পারিবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নাই। হীরকও মানুষে তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি অদ্য হীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী পাঠকগণকে উপহার দিব। আমি বিজ্ঞানবিৎ নহি এবং আমার জ্ঞানও অতি সামান্য; অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিব। পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

জলে লবণ কিম্বা চিনি নিক্ষেপ করিলে তাহা গুলিয়া যায়। ছাঁকিলে আর তাহা বাহির করা যায় না। বোধ হয় লবণটা দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। যদি একটু জলে আস্তে আস্তে চিনি বা সোরা দিতে থাকি, খানিকক্ষণ পরে আর যত দিই না কেন আর গুলিবে না। কিন্তু যদি জলটা একটু গরম করি তাহা হইলে আর একটু সোরা দ্রবীভূত হইবে। তাহার পর তাহা ছাঁকিয়া যদি আবার ঠাণ্ডা করি, দেখা যাইবে আবার খানিকটা সোরা তলিয়ে পড়েছে। ইহাতে বোঝা গেল যে গরম জলে যতটা সোরা দ্রবীভূত হয়, ঠাণ্ডা জলে ততটা হয় না।

আর একটা কথা পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা

প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে অঙ্গার, গ্রাফাইট্ (যাহা হইতে লেড্ পেনসিল তৈয়ারি হয়) ও হীরক একই বস্তু। তফাৎ এই,—হীরক অন্যান্য প্রকার অঙ্গার হইতে কঠিনতর। কথাটা শুনিলে সহজে প্রত্যয় হয় না যে জাজ্বল্যমান বহুমূল্য হীরক অতি হেয় দগ্ধ কাষ্ঠের সহিত একই বস্তু। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রমাণ অকাট্য।

জলে যেমন সোরা গলিয়া যায়, গলিত লোহাতেও কয়লা সেইরূপ দ্রবীভূত হইয়া যায়। লোহা উত্তপ্ত করিলে প্রথমে লাল, পরে সাদা হয় এবং পরে দ্রবীভূত হয়, তখন খানিকটা কয়লা উহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহা অদৃশ্য হয়। কিন্তু বেশী উত্তপ্ত দ্রব লৌহে যতটা কয়লা গুলিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত শীতল করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম গোলে। কাজেই তখন খানিকটা কয়লা তলিয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে কোনও প্রকার অঙ্গারই দেওয়া হউক না কেন, পরিশেষে যে অঙ্গার তলিয়ে পড়ে সেটা গ্রাফাইট। অর্থাৎ খুব উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহে কিয়ৎ পরিমাণ ভূসোকালি বা কাঠের কয়লা বা হাড়ের কয়লা কি অন্য কোনও প্রকার অঙ্গার দাও তাহা দ্রব হইবে। তাহার পর তাহাকে ঠাণ্ডা কর, দেখিবে খানিকটা গ্রাফাইট তলিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এই প্রকারে অন্য প্রকার অঙ্গারও গ্রাফাইট অঙ্গারে পরিণত হয়।

ইহা দেখিয়া ফ্রান্সের রসায়নবিৎ আচার্য্য মোঁয়াসা (Moissau) স্থির করিলেন যে যদি এই প্রক্রিয়া বেশী চাপের তলে (under a very great pressure) করা যায় তাহা হইলে গ্রাফাইট অঙ্গার না হইয়া গ্রাফাইট অপেক্ষা কঠিনতর হীরক অঙ্গার প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি নিম্নলিখিত মতে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহাতে সফল মনোরথ হইয়াছেন।

তিনি কিয়ৎ পরিমাণ খাঁটি লৌহ ও অতি বিশুদ্ধ অঙ্গার (চিনি দাহ করিয়া প্রস্তুত) একটী চুণের মুচিতে (crucible) লইলেন। তাহার পর তাহা উপর হইতে উত্তপ্ত করা হয়। বৈদ্যুতিক এক প্রকার চুল্লী আছে তাহার উত্তাপ ৩৫০০° হইতে ৪০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তাহাতে পাথরের ইট পর্য্যন্ত গলিয়া যায়। কলিকাতার হারিসন রোডে পূর্ব্বে যে বৈদ্যুতিক আলো ছিল ইহা প্রায় তদ্রূপ। সেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে এই লৌহ ও অঙ্গার উত্তপ্ত করা হয়। লৌহ গলিয়া গেল এবং তাহাতে অঙ্গার দ্রবীভূত হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সেই উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ মুচিটিকে দ্রবীভূত সীসার মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। দ্রবীভূত সীসার উত্তাপ ৩০০° হইতে ৪০০°। যদিও ইহারও উত্তাপ বড় কম নয় কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লীর তুলনায় ইহা অতীব শীতল। সুতরাং হঠাৎ এরূপ ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ায় মুচির উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয় এবং উপরিস্থিত লৌহ কঠিন হইয়া যায়। অর্থাৎ এখন একটি ক্ষুদ্রকায় লৌহ গোলকের ভিতর কিয়ৎ পরিমাণ দ্রব লৌহ ও অঙ্গার রহিল। এই গোলকটীকে এখন ক্রমে ক্রমে শীতল করা হয়। জল যেমন জমিলে আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গার যুক্ত লৌহ (cast iron)ও সেইরূপ জমিয়া গেলে বর্দ্ধিতায়তন হয়। কাজেই যখন এই গোলকস্থিত লৌহ ও অঙ্গার জমিতে থাকে তখন ইহা খুব বাড়িতে চেষ্টা করে এবং গোলকের উপর খুব চাপ পড়ে। গোলকটীও লৌহের, কাজেই ইহাও খুব কঠিন, সুতরাং চাপ আরও বেশী হয়।

যখন সমস্তটা জুড়াইয়া গিয়াছে এবং জমিয়া কঠিন হইয়াছে তখন ইহার উপর নানাপ্রকার দ্রাবক (Aqua regia, hydrofluoric acid, mixture of nitric acid and potassium chlorate, etc.) প্রয়োগ করা হয়। বহুকাল ব্যাপিয়া এবং সতর্কতার সহিত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় আণুবীক্ষণিক ছাঁকনি পড়িয়া থাকে যাহা কিছুতেই দ্রবীভূত হয় না। অণুবীক্ষণ সাহায্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই বিন্দুগুলি হীরক বিন্দু।

অবশ্য একথা বলা আবশ্যক যে এই প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কখনই কোহিনূর প্রভৃতি উজ্জ্বল এবং বৃহদায়তন হীরক প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহা এতকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ক্ষমতাধীন ছিল, সেই প্রকার একটী কার্য্য যে মনুষ্যের দ্বারা সাধিত হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে কম অহঙ্কারের কথা নয়। 'আর' যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে এই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তিনিও যে বড় সামান্য লোক নহেন, ইহা তাহারও পরিচায়ক। দুঃখের

সহিত বলিতে হইতেছে যে সেই জগদ্বিখ্যাত অসামান্য পণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য মোঁয়াসা এক মাস হইল নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে হীরক প্রস্তুত হওয়ায় পৃথিবীতে হীরকসৃষ্টির এক অভিনব তথ্য বাহির হইয়াছে। পর সংখ্যায় সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু।

দলিত কুসুম।

৩

দলপতি আসি গৃহে করিল প্রবেশ
অতি বৃদ্ধ, কিন্তু তবু, সমুদ্রের বুকে
তরণী ক্ষেপণী যেন পড়িলে নুইয়া
ভাঙ্গে না কখন, সেই মত বৃদ্ধ সেই
নুইয়া পড়েছে তার বয়সের ভারে,
তবু দৃঢ় অতি, শুভ্র দীর্ঘ কেশরাশি
ছড়ায়েছে স্কন্ধ দেশে, উন্নত ললাটে।
আছিল তাঁহার প্রিয় বালক বালিকা,
তবুও গ্রামের শিশু তাঁহারে হেরিয়া
কোলেতে উঠিতে চায়। তাঁহারে পাইয়া
ক্ষুদ্র শিশু-হিয়াগুলি হরষে ভাসিত।
যদিও জ্ঞানেতে পূর্ণ, স্থির ন্যায়বান,
তবু তাঁর প্রাণ শুভ্র শিশুর সমান।
সকলে বাসিত ভাল, শিশুদের কাছে
তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়। শুনাতেন তিনি
দূর বনান্তর কথা, দানব রাক্ষস
আসিয়া বেড়াত যেথা। পরীর কাহিনী—
যাহারা নিশীথ কালে শিশুদের কক্ষে
আসি ভাসিয়া বেড়ায়। এইরূপে সব
তুষ্ট করিতেন তিনি বালক বালিকা।
দলপতি আসি গৃহে করিলে প্রবেশ
সুমন্ত কহিল তাঁরে "পিতা ধর্ম্মমন্ত
আপনি কি শুনেছেন গ্রাম্য সমাচার?
কেন যে এসেছে তরী পারেন বলিতে?"
ধীর ভাবে ধর্ম্মমন্ত কহিলা তখন
"শুনেছি অনেক বৎস, নাহি জ্ঞান মোর
কি হেতু এসেছে তারা। তবে মনে মোর
অনেকের মত হয় সন্দেহ সতত,
আমাদের সুখ শান্তি এসেছে নাশিতে
সুমন্ত আবেগভরা ব্যাকুলিত স্বরে
কহিল তখন "এই কি ধর্ম্মের বল,
দুর্ব্বলের পরাজয় সবলের কাছে?
মানবের এই ধর্ম্ম ন্যায়ের বিচার?"
ধর্ম্মমন্ত ধীরে ধীরে বলিলেন পুনঃ
"মানব অন্যায় করে, কিন্তু ন্যায়বান
জগদীশ, শেষে হয় জয় চির দিন
সত্য ও ন্যায়ের। শুন অতি পুরাতন
একটি কাহিনী যাহা চিরদিন তরে
গাঁথিয়া রেখেছি সদা অন্তরে আমার।
অতি পুরাতন দেশ (মনে নাই নাম)
বেদীর উপরে এক প্রস্তরের মূর্ত্তি
ছিল বিচারক, বাম হস্তে ছিল তার
পাত্র এক, দক্ষিণেতে তীক্ষ্ণ তরবার,
সেথা হত প্রত্যেকের দোষের বিচার।
ভুল ক্রমে নীড় ভ্রমে কোনও বিহঙ্গ
কখন বাঁধিলে বাসা, তীক্ষ্ণ তরবার
অমনি করিত শেষ সহসা তাহার।
ন্যায়ের বিচার স্থল, লৌহ হস্তে যেন
সেথায় হইত সর্ব্ব দোষের বিচার।
সহসা ঘটনা এক ঘটিল সেথায়
ধনী গৃহ হতে চুরি গেল মুক্তাহার
পড়িল সন্দেহ এক দাসীর উপর।
বিচার হইলে শেষ, লভি প্রাণদণ্ড
আজ্ঞা, প্রস্তরের মূর্ত্তি পানে অগ্রসরি
গেল বালা, যেথা আছে তীক্ষ্ণ তরবার।
স্বর্গীয় পিতার কাছে তার নির্দ্দোষিতা
গেল চলি। সহসা সে দেশ-ভূমি যেন
দুরন্ত ঝটিকা আসি নিল উড়াইয়া।
দেবতার রোষানল বজ্ররূপ ধরি

পড়িল মূর্ত্তির পরে, হস্ত হতে তার
তীক্ষ্ণ তরবার খসি পড়িল ভাঙ্গিয়া।
বাম হস্তে পাত্র সেই, ধূলি চূর্ণ সম
ধূলিতে মিলায়ে গেল। সেই খানে ক্ষুদ্র
এক বিহঙ্গের নীড়ে সেই মুক্তাহার।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হন ধর্ম্মমন্ত,
সুমন্ত আসন ছাড়ি কহিবারে কথা
উঠিল দাঁড়ায়ে, কিন্তু তবু বাক্যহীন
হৃদয়ের কথা তার ভাতিল আননে,
যেন বাতায়নে শুভ্র জমান তুষার।
পিতার পাইয়া আজ্ঞা নলিনী তখন
স্বহস্তে নির্ম্মিত সেই মিষ্টান্ন যতনে
দিয়ে গেল। ধর্ম্মমন্ত আনন্দেতে অতি
করিয়া আহার, নলিনী ও বিমলেরে
করিলেন আশীর্ব্বাদ ডাকিয়া যতনে।
সম্ভাষণ করি সেই বৃদ্ধ দুইজনে
লইলা বিদায়।
নলিনী তখন আসি
খেলিবার পাশা আনি রাখিল সম্মুখে।
হরষ উল্লাসে মাতি বৃদ্ধ দুই জনে
খেলিতে লাগিল। কেহ হাসে যবে তার
জয়লক্ষ্মী আসে, কভু বা নীরবে রয়।
সেইকালে বাতায়নে প্রণয়ী দুজন
গোপনে পুলকে কয় প্রণয়ের কথা
অতি মৃদু স্বরে। দেখিছে দুজনে চেয়ে
কেমন সুন্দর ওই চন্দ্রের কিরণ
পড়েছে সমুদ্র বক্ষে, যারে বক্ষে ধরি
চঞ্চল সাগরবারি স্থির অচঞ্চল।
রজত কিরণধারা পড়েছে কেমন
শ্যাম দূর্ব্বাদল বুকে। আকাশ প্রাঙ্গণে
শত শত তারা-ফুল ফুটেছে কেমন,
তারা যেন দেবতার "ভুলনা আমায়"*
হইল অতীত সন্ধ্যা, দূর ঘণ্টাধ্বনি
জানাল প্রহর গত। অতিথি দুজন
উঠিয়া বিদায় লয়। দুয়ারে দাঁড়ায়ে
নলিনী ও বিমলের প্রেম কথা যেন
হয় নাক শেষ। যায় আর ফিরে চায়।
শয়নে গেলেন পিতা, নিভায়ে প্রদীপ
নলিনী চলিলা ধীরে কক্ষে আপনার।
তাহারি মতন, তার শয়নের কক্ষ
মহামূল্য দ্রব্যভারে নহে সুরঞ্জিত
তবে তার গৃহ দ্রব্য সুসজ্জিত সব।
যতনে সিন্দুকে তার শিল্প কর্ম্ম গুলি
তোলা আছে, যবে যাবে পতির আলয়ে
দিবে তারে এই সব স্বহস্তে নির্ম্মিত
যতনের উপহার। নিভায়ে প্রদীপ
দাঁড়াইল এসে ধীরে বাতায়ন পাশে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া চাঁদের কিরণ
সহস্র ধারায় গৃহে পড়িছে তাহার।
যেন সমুদ্রের স্ফীত তরঙ্গের মত।
নলিনী সুন্দরী যেন সেই চন্দ্রালোকে
আরও সুন্দর। স্বপনেও জানিত না
অদূরেতে বৃক্ষতলে প্রণয়ী তাহার
তাহারি ছায়ার পানে অনিমেষ আঁখি
নেহারিছে, নলিনীর হৃদয়ের পটে
ভাসিছে যাহার ছবি। সহসা কেমন
বিষাদের ভাব বুকে জাগিল তাহার।
যেমন সহসা এক ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড
করে দিল অন্ধকার, নিভে গেল সেই
চন্দ্রমার দীপ্ত আলো। নলিনী তখন
ধীরে ধীরে গেল তার শয্যায় আপন।

৪

হইল প্রভাত অতি মধুর বিমল,
রাঙা রবি আলো দেয় ক্ষুদ্র গ্রাম পরে।
নিশির শিশির সিক্ত শ্যাম দূর্ব্বাদল,
ধীরে ধীরে বহে যায় সুরভি সমীর।
সিন্ধুতটে তরীগুলি, তরঙ্গ হিল্লোলে
দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, ছায়াগুলি ভাসে

* Forget-me-not এক প্রকার ফুল।

নির্ম্মল সলিল বুকে। সজীব হয়েছে
ক্ষুদ্র গ্রাম দিবসের লভি আলো রাশি।
গ্রামের উৎসবে আজি যাইতেছে সবে
আনন্দে করিয়া সাজ নব পরিচ্ছদে।
পথ ঘাট পরিপূর্ণ, নর নারী দল
যাইতেছে পরে পরে। সে দিনের তরে
কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, নাহি কোলাহল।
পথ শুধু জনস্রোতে গিয়াছে ভরিয়া।
প্রফুল্ল রবির করে সোনালী প্রভাতে,
গৃহ দ্বারে বসি সবে কহিতেছে কথা।
প্রতি গৃহ পূর্ণ আজি আনন্দ উৎসবে,
শান্তিভরা এই ক্ষুদ্র গ্রামটীতে যেন
সকলেই সকলের সহোদর ভাই।
বীরবল গৃহ আজি উৎসব তরঙ্গে
ভাসিতেছে। হাস্যমুখী প্রফুল্ল নলিনী
পিতার অতিথি দলে সাদরে যতনে
অভ্যর্থনা করিতেছে। স্বহস্তে প্রস্তুত
দিতেছে মিষ্টান্ন আনি। সকলে উল্লাসে
শত আশীর্ব্বাদ ধারা বরষে তাহায়।

উন্মুক্ত আকাশ তলে, ফলভারে নত
বৃক্ষতলে এক, বিস্তৃত আসন খানি
পড়েছে সেথায়। গ্রামবাসী লোক যত
আসিছে আনন্দে, নলিনী ও বিমলের
পরিণয় হ'ল স্থির, সেই সে কারণে
পিতা তার করেছেন এত আয়োজন।
বীরবল সুমন্তের হরষ অসীম।
অদূরেতে ক্ষুদ্র এক বৃক্ষের তলায়
বীণা বাজাইয়া ধীরে, গাহিতেছে গান
সঙ্গীত নিপুণ এক সেই গ্রামবাসী
মহিমা তাহার নাম। মহিমার সেই
মুক্ত শুভ্র কেশ উড়ে মৃদুল সমীরে।
কি আনন্দ প্রভাসিত সে বৃদ্ধ আননে।
হৃদয়ের ভাব রাশি সঙ্গীতে ঢালিয়া,
বীণা বাজাইয়া বৃদ্ধ গাহিতেছে গান।

অদূরে শ্যামল সেই প্রান্তরের পরে
আনন্দে হরষে নাচে বালক বালিকা।
সে দিনের সে উৎসবে সবাকার চেয়ে,
নলিনীর রূপরাশি সুন্দর অতুল।
শ্রেষ্ঠ যুবকের মাঝে সুন্দর বিমল।

এরূপে কাটিয়া গেল মধুর প্রভাত,
সহসা মন্দির হ'তে আসিল ভাসিয়া
বজ্র গরজন সম দূর ঘণ্টাধ্বনি।
মন্দির ভরিয়া গেল মনুষ্য তরঙ্গে,
রমণীর দল সব নীরব আতঙ্কে
দাঁড়াইয়া আছে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে।
কেহ বা অদূরে যেথা সমাধি মন্দির
দাঁড়াইয়া আছে তথা। যেথা হতে দূরে
দেখা যায় কাননের প্রফুল্ল আনন,
শ্যাম পল্লবের হার যে পরেছে গলে।
তারপর সেনাপতি তরণী হইতে
নামিয়া এলেন ধীরে মন্দিরে সেথায়।
সেনাদের সেই বাদ্য শত বজ্রসম
ধ্বনিত হইল যেন নির্জ্জন প্রদেশে
শুধু ক্ষণতরে। তারপর স্তব্ধ সব।
সশব্দে হইল রুদ্ধ মন্দির দুয়ার।
নিস্তব্ধ হইতে আজ্ঞা দিয়া সকলেরে,
সেনাপতি কহিলেন উর্দ্ধে তুলি বাহু
দেখাইয়া নামাঙ্কিত রাজার মোহর।
"অদ্য হতে বন্দী এই গ্রামবাসী সবে
রাজার অনুজ্ঞা ইহা। দয়াবান তিনি
কি হেতু তোমরা সবে সে দয়ার পরে
দিলে হেন প্রতিদান? তোমরাই জান!
এই ক্লেশকর কর্ম্মে কাতর হৃদয়
যদিও হয়েছে মোর, তবু রাজ-আজ্ঞা
অবশ্য পালিতে হবে। অভিলাষ তাঁর
করিলাম ব্যক্ত আমি, তোমাদের এই
গৃহ দ্বার, ধন, রত্ন পশুদের প্রতি,
আজ হতে তোমাদের নাহি অধিকার।

এ রাজ্য হইতে তোমাদের নির্ব্বাসন
হবে আজি হ'তে, তোমরা প্রস্তুত হও।
ঈশ্বরের কাছে করি আকুল প্রার্থনা,
যে রাজ্যেতে যাবে সবে, সেথা গিয়া যেন
বিশ্বাসী হইয়া থেক। শান্তি পেও সেথা।
বন্দী সব, রাজ আজ্ঞা, করিনু প্রচার
পালহ এখনি তাহা।" এই কথা বলি
স্তব্ধ হন সেনাপতি।
সহসা যেমন
বিমল বসন্তকালে, দুরন্ত ঝটিকা
উড়াইয়া ল'য়ে যায় গৃহ চালগুলি,
ঢেকে দেয় দীপ্ত রবি মেঘ অন্ধকার;
তেমনি এ কথা শুনি শ্রোতারাই সব
ক্ষণেক নীরবে রহি, একত্রে সহসা
আকুল কাতরকণ্ঠে করি কোলাহল,
অধীর আকুল হয়ে উন্মাদের মত
ছুটে গেল দ্বার পথে। হায় বৃথা আশা,
হয়েছে দুয়ার রুদ্ধ চিরজন্ম তরে।
বৃথা আশা পলাবার। আকুল কণ্ঠের
ধ্বনি হইল ধ্বনিত। সম্মুখে আসিয়া
তুলি উর্দ্ধে দুই হস্ত শিল্পী কর্ম্মকার
সুমন্ত আসিয়া, (সমুদ্রের ক্ষুব্ধ বুকে
ফেনোর্ম্মির মাঝে যেন শুভ্র কণা এক)
আবেশে আরক্ত মুখে, মুক্তকণ্ঠে কহে
"যাক্ রাজ্য রাজবংশ সমুদ্রের তলে,
আমাদের গৃহশূন্য যে করিল আজ"—
কথা না হইতে শেষ সেনা একজন
আসিয়া সবলে ধরি লইল তাহারে।

এইরূপ কোলাহল ক্রোধের মাঝার,
সহসা খুলিল দ্বার। বৃদ্ধ ধর্ম্মমন্ত
আসিলেন, পিতাসম তিনি সবাকার।
গম্ভীর আনন তাঁর দৃঢ়তায় ভরা।
আসিয়া সম্মুখে সেই ধর্ম্মবেদী পরে
দাঁড়াইলা, তুলি কর [illegible] করিলা

নিস্তব্ধ হইতে সবে। কহিলেন তিনি,
গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি পরদুঃখে ভরা।
"বৎসগণ কি করিছ উন্মাদের প্রায়,
আজীবন কত ক্লেশ করিয়া স্বীকার
শিখাইনু তোমাদের পরস্পরে প্রেম
করিবারে, এই ফল ফলিল তাহার?
কত ক্লেশে কথা মোর কার্য্যে পরিণত
করেছিনু, এরি মাঝে সব পাসরিলে?
এরি মাঝে ভুলে গেলে বিশ্বাসীর প্রাণে
চির প্রেম? সব চেয়ে ক্ষমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
ভুলে গেছ এই রাজ্য শান্তির আলয়?
এইরূপে অবহেলা করিছ তাহার?
উপরে চাহিয়া দেখ স্বর্গীয় পিতার
দুঃখে প্রাণ প্রেমময়, অশ্রুপূর্ণ আঁখি
চাহিয়া মোদের পানে। তিনি কি কাতরে
এই কথা আমাদের শিখাতে সতত
ব্যাকুল হইয়া নাই 'পিতা ক্ষমা কর'?
এস মোরা ক্ষমা ধর্ম্ম করিব পালন।
এস সবে কহি ভাই 'পিতা ক্ষমা কর'।"
কথা সাঙ্গ না হইতে অশান্ত হৃদয়
গ্রামবাসী লোক, দুঃখে উঠিল কাঁদিয়া।
জানু পাতি ভূমে বসি কাতর ক্রন্দনে
যুড়ি কর কহে সবে "পিতা ক্ষমা কর"
তারপর পুরোহিত প্রশান্ত মহান
প্রার্থনা করেন তিনি সকলের তরে।
সুগম্ভীর দুঃখ ভরা সুকণ্ঠ তাঁহার,
গ্রামবাসী ভাঙ্গা-কণ্ঠে আকুল আবেশে
গাহিতে লাগিল সঙ্গে সুর মিলাইয়া।
জানুপাতি যুড়ি কর, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
স্বর্গীয় পিতারে সবে জানায় বেদনা।
এই কথা ক্রমে ক্রমে, হইল প্রচার
গ্রামে, রমণী সকলে পাগলিনীসম
ছুটিতেছে প্রতি গৃহে। বালক বালিকা
নীরবে চাহিয়া মুখে। এমনি সময়ে
নলিনী ব্যথিত আঁখি চাহি পথ পানে,

দৃষ্টি দূরে নাহি যায়, অস্তগামী রবি
হয়েছে প্রখরতর। সুকোমল করে
কখনো আবরি আঁখি কভু চায় দূরে।
গৃহসজ্জা তার, অযতনে পড়ে আছে,
পিতার আসন শূন্য। আহার সামগ্রী
প্রস্তুত হয়েছে সব। ধীরে ধীরে যবে
সূর্য্য আলো ডুবে যায় ঘন তরুছায়
সুদূর প্রান্তর পরে। সহসা কেমন
অজানা দুঃখের ভারে অবসাদ হিয়া
হল নলিনীর। হৃদয়ের মাঝে তার
প্রেম আর ক্ষমাধর্ম্ম উঠিল জাগিয়া।
আপনা ভুলিয়া বালা, ছাড়ি গৃহ দ্বার
পল্লীপথে ছুটে গেল। শুনিল তখন
সে সংবাদ। তবু দৃঢ় হিয়া কহিতেছে
সকলেরে "ত্যজ ভয় অবোধ রমণী"
যারা গৃহ হারা হয়ে চলে যায় আজি
কোন দূর বনান্তরে। শ্রান্ত শিশুগুলি
চরণে শৃঙ্খল সম যেতেছে জড়ায়ে।
অস্ত গেল রবি, সেই আরক্ত আননে
পড়িল আসিয়া যেন রজনীর ছায়া।

দূর মন্দিরেতে হল মৃদু শঙ্খধ্বনি।
অদূরে মন্দির তলে সমাধির স্থান,
নলিনী পাষাণ মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সেথায়।
চাহিয়া রহেছে সেই রুদ্ধ দ্বার পানে,
কভু বাতায়নে, হৃদয়ের অন্তঃপুর
ছাড়ি, প্রাণ যেন তার আসিল ছুটিয়া,
আকুল আবেগে বালা 'বিমল' বলিয়া
ডাকিল কাতরে। সেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
বুকে জাগিয়া উঠিল, এল না উত্তর।
কেহ তারে দিল নাক সাড়া, অবশেষে
অবসাদ ভরা হিয়া, পিতার ভবনে
ফিরিল নলিনী পুনঃ। সেই শূন্য ঘর
সেই সুসজ্জিত দ্রব্য। হৃদয়ে তাহার
কি ঝটিকা বহিতে লাগিল। শূন্য ঘরে
যেন কত বিষাদের ছায়া ঘুরিতেছে।
নিজ পদ শব্দে বালা উঠিছে চমকি।
গভীর রজনী কালে বারিধারা ঝরি
পড়ে বৃক্ষ পরে। সেই শব্দে যেন হৃদি
উঠিছে কাঁপিয়া তার। মাঝে মাঝে জ্বলে
বিদ্যুতের আলো সেই বাতায়ন পরে।
গরজিছে বজ্র, যেন জানায় তাহারে
ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, তাঁরি রাজ্য তিনি
করেন শাসন। কবে কার কথা তার
মনে পড়ে গেল, কবে শুনেছিল সেই
স্বর্গের বিচার কথা। তাহাই স্মরিয়া
করি আকুল প্রার্থনা, ঘুমায়ে পড়িল
শান্ত হিয়া সুকুমারী নলিনী তখন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মল-মাস ও পাঁজী।

উত্তর।

গত জ্যৈষ্ঠ-মাসের 'প্রবাসী'র 'মল-মাস ও পাঁজী' নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। এখানে যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

কেহ বলিয়াছেন, 'প্রবন্ধ দ্বারা প্রচলিত পাঁজীর শুদ্ধতা-সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়িয়াছে, এবং কোন্ পাঁজী ভুল কোন্ পাঁজী ভুল নহে তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই।'

যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর করিবার উপায়ও হইবে। প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা যতক্ষণ জানা না যায়, ততক্ষণ কাজ হয় না। এই পাঁজী ভুল, ঐ পাঁজী নহে, এ কথা বলা সহজ নহে। প্রত্যেক পাঁজীতে নানা কথা থাকে। সে সব ভুল, বলিতে পারা যায় কি? তার পর ভুল আর ঠিক, সকলের পক্ষে সমান নহে। কেহ শাস্ত্রবাদী, কেহ প্রত্যক্ষবাদী। প্রাচীন শাস্ত্রমতে গণনা করিলে ভুল আসিতে পারে, এ কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না, কেহ বা মনে করিতে কষ্টবোধ করেন। তাঁহারা সকল কথা জানেন না, কিংবা শুনিতে পান না।

এই হেতু প্রাচীনের প্রতি অবজ্ঞা আশঙ্কা করিয়া কষ্টবোধ করেন।

কেবল যে পাঁজীতে সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহা নহে। আমাদের সমাজের প্রায় যাবতীয় অঙ্গেই তর্ক উঠিতেছে। নতুবা কু-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, ইত্যাদি কথা শোনা যাইত না। দেশে সময়োপযোগী ব্যবস্থার পক্ষপাতী কতজন আছেন? আমরা মুখে অনেক কথা মানি, কাজে মানি না।

পাঁজীর সংস্কার আবশ্যক হইতে পারে, এ কথা প্রত্যক্ষবাদী অবশ্য স্বীকার করিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, নতুবা তাঁহারা সেই আদি ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বারংবার সংস্কার করিতেন না, আমরাও নানা সিদ্ধান্তের নাম শুনিতাম না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পাঁজীর বিভিন্নতা দেখিতাম না। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ও তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতেরা এ সকল বিষয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

বোম্বাইর পঞ্চাঙ্গশোধন-সভার মন্তব্য পড়িলে মনে হয়, সভা সমুদয় গ্রহগণিতের সংস্কারের আবশ্যকতা অনুমোদন করেন না। অপর কথা কি, গ্রহরাজ সূর্যকেই ছাড়িয়াছেন, তাঁহার গতি দৃক্‌তুল্য করিবার সংকল্প করেন নাই! অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা বটে। যে গ্রহ আমাদের বৎসর ও মাস মাপিতেছেন, তাঁহার মাপা ঠিক হইতেছে কিনা, ইহা দেখায় সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ আছে। বুধগ্রহ মেষে থাকুন আর বৃষে থাকুন, তাহাতে সমাজ-কাজের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু আজ ১লা বৈশাখ কি কা'ল ১লা বৈশাখ, ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা বলেন, কোন তারা হইতে গিয়া সেই তারাতে ফিরিয়া আসিতে সূর্যের ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯।৷৹ সেকেণ্ড লাগে। আমাদের সূর্যসিদ্ধান্ত প্যাইয়াছিলেন, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৬।৷৹ সেকেণ্ড। ইহাই আমাদের বৎসরের পরিমাণ; অর্থাৎ প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ৩।৷৹ মিনিট বেশী। বোম্বাইর পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সভা এই প্রায় ৩।৷৹ মিনিট বেশী রাখিতে বলিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন, তাহা বলা দুষ্কর। সে সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। যে কারণই হউক, দেখা যাইতেছে সে সভা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষবাদী হইতে পারেন নাই।

যতদূর জানি, বোধহয় কেবল শ্রীযুক্ত বেঙ্কটেশ কেতকর তাঁহার পাঁজীতে সৌর বৎসরের প্রকৃত পরিমাণ স্বীকার করিয়াছেন। এই বৎসরের 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' একখানি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি, সূর্যসিদ্ধান্তের পরিমাণ স্বীকৃত হইয়াছে।* এই পাঁজীর ভূমিকা হইতে বাঙ্গলা পাঁজী সম্বন্ধে কএকটি কথা পাইতেছি। আরও দেখিতেছি, এই পাঁজীতে প্রাচীন দেশান্তর সংশোধিত হইয়াছে। অথচ সৌর বর্ষপরিমাণ হয় নাই। না হইবার বিশেষ কারণ থাকিবে। যে কারণই হউক, দেখা যাইতেছে এই পাঁজীও সম্পূর্ণ 'বিশুদ্ধ' নহে।

৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত কর্ম্মে বাঙ্গালাদেশের উপকার হইয়াছে। আশা করি, তাঁহার শিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঁজীর উন্নতিবিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। কলহে সমাজের মঙ্গল হয় না, এই কথা স্মরণ রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে ৺মাধব বাবুর যত্ন সফল হইবে। 'স্বদেশী সরল ফলিত পঞ্জিকার' 'স্বদেশী' বিশেষণের প্রয়োজন বুঝিলাম না। দেশের পাঁজী বিদেশের হইতে পারে কি? বোধ হয়, ফল গণনা এই পাঁজীর প্রধান বিষয়, নতুবা 'ফলিত' বিশেষণ কেন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ৺মাধব বাবুর পাঁজী থাকিতে এই পাঁজীর প্রয়োজন বুঝি না।

৺মাধব বাবুর পাঁজী দৃক্‌তুল্য গণিতের পক্ষপাতী। কাশীর ৺বাপূদেব শাস্ত্রীর পাঁজীও তাই। দেখিতেছি, উভয় পাঁজীর অয়নাংশ এক। অতএব বাঙ্গলা ও বিহারের অন্ততঃ দুইখানি পাঁজীর ঐক্য আছে। ওড়িশার পাঁজীও

---

* এই পাঁজীতে আছে, ১৩১৩ সালে ৩০ চৈত্রে বৈশাখ প্রবেশ দং ২৮।৩৯, এবং ১৩১৪ সালে ৩০ চৈত্রে দং ৪৪।১০।৩১। সুতরাং ৩৬৫।১৫।৩১।৩১ দিন দণ্ডাদি=৩৬৫।৬।১২।৩৬ দিন ঘণ্টাদি। এই বৎসরের 'ফলিত পঞ্জিকায়' বৈশাখ প্রবেশ দং ২৮।৩৯ লেখা আছে, কিন্তু আগামী বর্ষ প্রবেশ দং লেখা নাই। গত বৎসরের পাঁজীতে দেখিতেছি, ১৩১২ সালের ৩০ চৈত্রে বৈশাখ প্রবেশ দং ১৩।৩৩।৮। সুতরাং ১৩১৩ সালে বর্ষ পরিমাণ ৩৬৫।১৫।৫।৫২ দিন দণ্ডাদি=৩৬৫।৬।২।২১ দিন ঘণ্টাদি। বর্ষ পরিমাণ কম হইবার কারণ পাইলাম না।

দৃক্‌তুল্য গণিতের পক্ষপাতী। তবে, এই পাঁজীর আধার ভিন্ন হওয়াতে গণিতে অল্পস্বল্প প্রভেদ পড়ে। বিশেষ প্রভেদ অয়নাংশে, ৺ বাপূদেবের ও ৺ মাধব বাবুর অয়নাংশ অপেক্ষা প্রায় ১৫ কলা অধিক।

কোন্ অয়নাংশ ঠিক, একথা জ্যৈষ্ঠের প্রবন্ধে স্পষ্ট লেখা না থাকাতে কোন কোন পাঠক বিরক্ত হইয়াছেন। আমি মূল কথা আলোচনা করিয়াছি, ঠিক কত অংশ কলা বিকলা হইবে তাহা পাঁজীকার গণিয়া দেখিবেন। দেশের পাঁজীর বর্ত্তমান অবস্থায় সূর্যসিদ্ধান্তের বৎসর ত্যাগ করা সুবিধাজনক বোধ হয় না। বোম্বাইর সভায় দেশের প্রায় দেড়শত গণ্যমান্য জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যখন এই বর্ষপরিমাণের পক্ষপাতী, তখন উহার সংস্কারের চেষ্টা বৃথা।

৺ মাধব বাবুর পাঁজীতে বর্ষপরিমাণ শোধিত হয় নাই, কিন্তু মাস-পরিমাণ হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠের প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে যে, পূর্ব্বকালের মাসের পরিমাণ একালে ঠিক নাই। কোন কোন মাসের দিনদণ্ডাদি পরিমাণে অত্যন্ত প্রভেদ ঘটিয়াছে। ফলে ৺ মাধব বাবুর পাঁজীর তারিখ আর গুপ্তপ্রেশ ইত্যাদির পাঁজীর কোন কোন মাসের তারিখে এক দিনের তফাত ঘটিতেছে। এ বিষয়ে 'ফলিত পাঁজী'ও ৺ মাধব বাবুর পাঁজীর মত। সে যাহা হউক, এইখানে এমন এক কথা আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সর্ব্বসাধারণের আবশ্যক। পত্র লিখিতে, দলীল লিখিতে, অন্যান্য সাংসারিক কাজে কোন্ পাঁজীর তারিখ দেওয়া যাইবে? বাঙ্গলা ও ওড়িয়া পাঁজীর তারিখ মিলে না, বৎসর সংখ্যা—সালেও কোন কোন মাস মিলে না। ফলে, যেমন অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত পত্র বিনিময় করিতে ইংরাজী সন তারিখ দিতে হইতেছে, বাঙ্গালা দেশেও বাঙ্গলা সন তারিখের বদলে ইংরাজী সন তারিখ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। একটা স্থূল প্রতিকার এই যে, মাসের তারিখের সঙ্গে বারের নাম লেখা, কিম্বা পাঁজীর নাম লেখা। কিন্তু এই এক উপসর্গ টানিয়া আনা ভাল বোধ হয় না।

আসল কথা, আমাদের পাঁজী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ভাবে লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা লৌকিক কাজের পক্ষে উপযোগী নহে। অঙ্ক কষিলে কোন জিনিষের দামে এক পয়সার শত কিম্বা সহস্রভাগ ন্যূনাধিক হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া কোন দোকানী কিম্বা খরিদদার পয়সাকে শত কিম্বা সহস্র ভাগে কাটিতে বসে না। আধলা, কি বড় জোর পাইতেই দামের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। আমাদের পাঁজী বলে, আধলা কি পাই লইলে দোষ হইবে, পয়সা কাটিয়া ঠিক শত কি সহস্রভাগ লইতে হইবে। ইংরাজী বর্ষের পরিমাণ, মাসের পরিমাণ দিন ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদের সে সুবিধা নাই, পাঁজী না দেখিলে আজ মাসের কতদিন, তাহা বলিবার জো নাই। সূর্য-সিদ্ধান্তের বর্ষ পরিমাণ লইয়া যদি, মনে করুন, এমন এক নিয়ম করা যায় যে,

বৈশাখ মাসে	৩১ দিন	কার্ত্তিক মাসে	৩০ দিন
জ্যৈষ্ঠ "	৩১ "	অগ্রহায়ণ "	৩০ "
আষাঢ় "	৩১ "	পৌষ "	৩০ "
শ্রাবণ "	৩১ "	মাঘ "	৩০ "
ভাদ্র "	৩১ "	ফাল্গুন "	৩০ "
আশ্বিন "	৩০ "	চৈত্র "	৩০ "
	১৮৫		১৮০

এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে আশ্বিন মাসে একদিন বাড়িবে কিন্তু অষ্টাবিংশ বৎসরে বাড়িবে না, তাহা হইলে মাসের তারিখের তরে পাঁজী খুলিতে হয় না। অত অত দিনে ঐ ঐ মাস গণা ভাল কি মন্দ, সে কথা নহে। আসল কথা, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বৎসরের ও মাসের দিন গণা সহজ করা। পাঁজীকার দণ্ড পল বিপল অনুপল গণিয়া যান, কেহ নিষেধ করে না। তিনি মনে রাখুন, সূক্ষ্ম গণিতে সাধারণ লোকের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের পাঁজীতে ফলগণনা যতই থাকুক, ফলগণনার মূলে গণিত আছে। কিন্তু সকল পাঠকই যে ফলগণনা চান, কিংবা প্রচুর পরিমাণে চান, এমন নহে। অতএব পাঁজীর গণিত ও ফলিতভাগ যথাসাধ্য পৃথক্ রাখিলে ভাল। সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি, এ বৎসরের রাজা রবি কি বুধ, তাহা লইয়া কোন কোন পাঁজী কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষে কে রাজা সাব্যস্ত হইলেন, তাহা অবগত নহি। যিনিই হউন, পঞ্জিকাকার বলিতে পারেন কি, রাজ-ফল মন্ত্রীফল

ঠিক মিলিয়া থাকে? গত দশ পনর বৎসরের রাজার ফল কতদূর মিলিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া বিবাদী দল স্ব স্ব মত প্রমাণ করিলে সাধারণে কলহের গুরুত্ব বুঝিতে পারিত। আর একটা পথও ছিল। বৎসরের রাজা মন্ত্রী ইত্যাদি গণনার মূল কি, কে কবে এইরূপ গণনা আরম্ভ করেন, তৎসমুদয় দেখাইলে সত্য উদ্ধারের পথ সুগম হইত। যিনি পাঁজীকে ফল-প্রধান গ্রন্থ করিতে চান, তিনি ইংরাজী 'জেডকিএলের আল্‌মানাকের' (Zadkiel's Almanac) মতন গত বৎসরের গণিত ফল কতদূর মিলিয়াছে, তাহা দেখাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

সে যাহা হউক, পাঁজীর গণনার প্রমাণ বা আধার স্পষ্ট নির্দেশ করা আবশ্যক মনে করি; দুঃখের বিষয়, 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'তেও এই ত্রুটি দেখা যায়। এক পৃষ্ঠের মধ্যে প্রমাণ সকলের নাম দেওয়া যাইতে পারে। কোন্ স্থানের নিমিত্ত গ্রহ গণিত হইয়াছে, সে স্থানের অক্ষাংশ এবং দেশান্তর (উজ্জয়িনী হইতে এবং 'সাধারণ সময়ে'—রেলের সময়ে), গ্রহগণিতের আধার বা সারণী কি, ইত্যাদি প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের পাঁজী সম্বন্ধে আর এক কথা বলা যাইতেছে। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত' পাঁজীতে কলিকাতার সায়াহ্ণ ৫।৫৩।২৫ ঘণ্টাদি সময়ের স্ফুটগ্রহ লিখিত থাকে। কিন্তু ইহাতে গণনার অসুবিধা হয়। এমন ভাঙ্গাভাঙ্গি সময় না লইয়া বিলাতী ঘড়ীর ১২টা কি ৬টা,—এইরূপ কোন সময় লইলে ভাল হয়। আমাদের অন্যান্য পাঁজীতে সূর্যোদয় কালের স্ফুটগ্রহ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাও সুবিধা জনক নহে। কারণ প্রত্যহ সূর্যোদয় একই সময়ে হয় না, সকল স্থানেও কোনো দিন একই সময়ে হয় না। যখন বিলাতী ঘড়ীর ঘণ্টা মিনিট দণ্ড পলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, তখন প্রাতে ৬টার স্ফুটগ্রহ লিখিলে সকল স্থানের লোকের পক্ষে সুবিধা হয়।

বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক পাঁজী বাহির হয়। পাঁজীকারেরা এক সভায় মিলিত হইতে পারেন না কি? জানি, শাস্ত্রবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী, এই দুই দল আছেন। মতের এই প্রভেদ থাকিতেও পাঁজীকারদিগের এক সভা থাকিতে পারে না কি? পাঁজীর সাধারণ উন্নতি, দেশে দৃক্-জ্যোতিষ (practical astronomy) শিক্ষার ব্যবস্থা, অন্যান্য প্রদেশের পাঁজীর অবস্থা আলোচনা এই সভার চেষ্টা হইতে পারে। শুনিতেছি, বঙ্গদেশের প্রিয়নাথ স্বামী পুরীর সমুদ্র তটে বেদান্ত ও জ্যোতিষ শিখিবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তিনি নিজের অর্থে এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জ্যোতিষ শিক্ষার পক্ষে এই স্থান উপযুক্ত নহে। তথাপি দেখা যাইতেছে, এক জনের চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, বাঙ্গলার বহুজনের চেষ্টায় তাহা অক্লেশে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আমার সামান্য বিবেচনায় এইরূপ সভা এবং দৃক্ জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে পাঁজীর গোলমাল শীঘ্র মিটিবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বালিকা বিধবার বিবাহ।

ষোল বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। বৎসর বৎসর নানা স্থানে তাঁহার জন্য শোকসভা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সভায় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বালবিধবার বিবাহপ্রচলন চেষ্টার উল্লেখ পর্য্যন্ত হয় না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। বালিকা-বিধবাদের প্রতি এই অত্যাচার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের সামাজিক অধোগতির একটি প্রধান কারণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আমাদের দেশে, বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, একথা এখন আর কোন যথার্থ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু এখন শিক্ষিত হৃদয়হীন লোকেরা আর একটা তথাকথিত যুক্তির প্রয়োগ করেন। ১৩১০ সালের মাঘ মাসের "উদ্বোধন" কাগজে এই যুক্তিটি ছিল। তাহার উত্তরে আমরা ১৩১১ সালের বৈশাখমাসের কাগজে লিখিয়াছিলাম:—

প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন:—

বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী। ইত্যাদি।

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে "মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী" এই তথ্যটি লেখক কোথায় পাইলেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রীপুরুষের আপে-

ঠিক সংখ্যা একরূপ নহে।" বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের সেন্সস-রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায় হইতে নিম্নে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"With very few exceptions, the females outnumber the males in all European countries, *but in India the reverse is the case*, and in the whole country taken together there are only 963 females to 1,000 males. The general result is shared by all provinces and states except the Central Provinces and Madras, where there is a marked excess of females, and Bengal where the two sexes are on a par. In the last-mentioned provinces females are in marked defect in the greater part of Bengal Proper, and in excess throughout Bihar, Orissa and Chota Nagpur. The deficiency of females is extraordinarily great in Coorg, Baluchistan, the Punjab and Kashmir, where it exceeds 1 in 9, and is almost as marked in Ajmir and the Rajputana Agency. * * * Women are also in a clear minority in the extreme east—in North Bengal, Assam and Burma." (Vol. I, p. 107.)

ইউরোপে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী, ভারতবর্ষে কম। সুতরাং ইউরোপের সামাজিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়। ভারতবর্ষেরও সব প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা একরূপ নহে। বিহার, ওড়িষা, ছোট নাগপুর, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে স্ত্রীলোক বেশী, উত্তর-বঙ্গ, বঙ্গের অধিকাংশ স্থান, আসাম, কূর্গ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে স্ত্রীলোক কম। সুতরাং নরনারীর সংখ্যার ন্যূনাধিক্য অনুসারে যদি বৈবাহিক নিয়ম চালাইতে হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম চালান উচিত। কেবল তাহাই নয়। দেখা উচিত, কোন্ যায়গায় হিন্দু নরনারীর সংখ্যা কত। কারণ, হিন্দু মুসলমানে বিবাহ হয় না। শুধু তাহাতেও চলিবে না। দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদি জাতির যে শ্রেণীর, যে মেলের, যে প্রকার কুলীন বংশজাদির পরস্পর বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে নরনারীর সংখ্যা কিরূপ। নতুবা কেমন করিয়া নিয়ম চালান যাইবে?

যাহা হউক, ভারতবর্ষে নরনারীর মোট সংখ্যা অনুসারে প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে; কারণ, মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশী ত নয়ই, সমানও নয়;—বরং কম। সুতরাং সংখ্যা দেখিয়া তর্ক করিতে হইলে বরং বলিতে হয় যে, বিধবাবিবাহ হওয়াই উচিত। নতুবা অনেক পুরুষের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আমরা দেখিতেও পাই, বাঙ্গলাদেশে অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়, অনেকে প্রতারিত হইয়া অব্রাহ্মণী বিবাহ করে। কারণ, তাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা কন্যা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া জুয়াচোরেরা ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্যাকে অনেক সময় ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া চালাইয়া দেয়। গুজরাত প্রদেশেও এরূপ হয়। এই সে দিন বোম্বাইয়ের অনেক ভাটিয়া স্বদেশে পাত্রী না পাইয়া উত্তর-ভারতে নিজেদের মত এক জাতির কন্যা বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হয়, এবং তজ্জন্য আদালতে মানহানির মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের যুক্তি ভারতে খাটে না।

তাহার পর, যদি মেয়েদের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে কুমারীরা যাহাতে অন্ততঃ একবার বিবাহ করিতে পায়, তজ্জন্য না হয় বিধবাবিবাহ অপ্রচলিতই রহিল। কিন্তু যেখানে পুরুষদের সংখ্যা বেশী (যেমন ভারতবর্ষে), তথায় বিপত্নীকগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করে কি হিসাবে? প্রবন্ধ-লেখক তাহাদের পুনর্ব্বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবেন কি? শুধু সংখ্যা ধরিয়া সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তন বা রহিত করিতে হইলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বহুবিবাহ এবং অন্য অনেক প্রদেশে বহুপত্যাত্মক বিবাহ (polyandry) চালাইতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন,—"বিধবাদের একবারের *অধিক পতিলাভের অবসর দেওয়া হবে, তারা* [কুমারীরা] একবারও পাবে না।" কিন্তু যাহারা শৈশবে বা বাল্যে বিধবা হয়, কোন্ বুদ্ধিমান সত্যবাদী ব্যক্তি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তাহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে পতিলাভ ঘটিয়াছে? অথচ ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের এরূপ শিশু ও বালিকা-বিধবার সংখ্যা সামান্য নয়। কত তাহা নিম্নে দেখাইতেছি :—

বয়স।		সংখ্যা।
০— ১	...	৮৫৯
১— ২	...	১০৩৯
২— ৩	...	১৮৮৬
৩— ৪	...	৩৭৩২
৪— ৫	...	৮১৮০
৫—১০	...	৭৮৪০৭
১০—১৫	...	২২৭৩৬৭

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টও বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সকল বয়স ও অবস্থার নরনারীর সংখ্যার উপর নিজের যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। তিনি বলেন যে বিবাহযোগ্য বর অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা বেশী; কিন্তু তাঁহার মতে কোন্ বয়সের নরনারী বিবাহযোগ্য তাহা তিনি বলেন নাই। যাহা হউক, শ্রীমতী বেসাণ্টের যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষা বলবত্তর;—অবশ্য যদি ভিত্তিটা পাকা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা নয়। কারণ, সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ১ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :—

বয়স।	পুরুষ।	স্ত্রী।
০— ৫	১২৫৭৬৪৯৩	১২৮৮৩৫২১
৫—১০	১৩১৬১২১৯	১১৯৬০৯৬১
১০—১৫	১১১১১২৯১	৫৬৩৪৩২৭
১৫—২০	৫৬১১৮৫৪	১১৬৮০০৫
[মোট ...	৪২৪৬০৮৫৭	৩১৬৪৬৮১৪]

পাঁচ ও তন্নিম্ন বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে বালিকা কিছু বেশী; কিন্তু তেমনি তদূর্দ্ধ বয়সে [এবং মোটের উপর] অত্যন্তই কম। বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক, সর্ব্ববিধ অবস্থায় নরনারীর সংখ্যার অনুপাত, তালিকায় উল্লিখিত বয়সে ঠিক্ ঐরূপ দাঁড়ায়। কেবল বাঙ্গলা দেশ ধরিলেও সংখ্যার অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

তাহার পর আর এক কথা। প্রবন্ধ-লেখক এবং বিবি বেসাণ্টের যুক্তি সারবান্ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বালবিধবাদের বিবাহ কেন না হইবে? তাহাদের ত যথার্থ বিবাহ হয় নাই। তবে কোন্ ন্যায়ের বলে তাহাদিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্থলে পাপানলে দগ্ধ কর?

তদ্ভিন্ন, বিধবা ও কুমারীর অবস্থা কি এক, যে বলিতেছেন, যে, "বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে?" কুলীনের ঘরে কুমারীরা কি বিধবাদের মত সমুদয় শুভকার্য্য হইতে দূরীভূত হন, বা জীবনের সমুদয় সাধ আহ্লাদে বেশভূষায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন? তা'ছাড়া, কুমারীদের আশা আছে ও থাকিবে, বিধবাদের আশা কোথায়? আশা মানুষকে কেবল যে সুখে রাখে তাহা নয়, সৎপথেও রাখে। যাহারা নিরাশ ও হতাশ, তাহারা আশান্বিত অপেক্ষা সহজে কুপথগামী হয়।

আমরা বলি, বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুনর্ব্বিবাহিতা বালবিধবাকে বিবাহিতা কন্যা অপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে করা উচিত নয়। অন্য বিধবাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহিতা হইয়াছেন, যাঁহারা সন্তানবতী, এরূপ বিধবাদের বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে দিলে সকল বয়সের বিধবাই বিবাহ করিবে, সুতরাং সামাজিক আদর্শ হীন হইবে ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ মনে করা ভুল। ইউরোপে বিধবার বিবাহ সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে, ঐ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১০০০ বিপত্নীক আছে, তথায় ২৫০০ বিধবা আছে। ইহার অর্থ এই যে নারীপ্রকৃতিতে স্বভাবতই একনিষ্ঠতা অধিক। সুযোগ পাইলেও, যত বিপত্নীক পুনরায় বিবাহ করে, তত বিধবা কখনই বিবাহ করিবে না। অতএব, সামাজিক পবিত্রতার, করুণার, ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়া সকলকে বলি, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সকলে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

নিম্নে আমরা ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীতে হিন্দু বিধবার তালিকা দিতেছি :—

বয়স।		সংখ্যা।
০— ১	...	৪৩৩
১— ২	...	৫৭৬
২— ৩	...	৬৫১
৩— ৪	...	১৭৫৬
৪— ৫	...	৩৮৬১
৫—১০	...	৩৪৭০৫
১০—১৫	...	৭৫৫৯০
১৫—২০	...	১৪২৮৭১
২০—২৫	...	২১৯৪৯১
২৫—৩০	...	৩৪৭০২৬
৩০—৩৫	...	৪৮৩৪৯০
৩৫—৪০	...	৪৮১১০৯
৪০—৪৫	...	৭৩৭৩১৮
৪৫—৫০	...	৪৯৫৮১৩
৫০—৫৫	...	৭৪৭৪৪৮
৫৫—৬০	...	৩২৫৭৮৪
৬০ ও তদূর্দ্ধ	...	১৩৩৭১১৯
মোট	...	৫৪,৩৫,০৪১

ইহার মধ্যে ১৫ ও তন্নিম্নবয়স্কা বিধবারা বালবিধবা; তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের বিধবাদের মধ্যেও অনেকে বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই।

অনেকে বলেন, বৈধব্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল। উহা কে খণ্ডাইবে? আচ্ছা, তাহা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহা হইলে পুরুষের যে স্ত্রী মরে, তাহাও ত কর্ম্মফল। তবে বিপত্নীকদের বিবাহ দিয়া কর্ম্মফল খণ্ডান যায় কেমন করিয়া? যে অল্পসংখ্যক বালবিধবার হিন্দুসমাজে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কর্ম্মফল খণ্ডিল কেমন করিয়া? তা ছাড়া, কেবল বৈধব্যই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে ঘটে, এরূপ ত কেহ বিশ্বাস করে না; অন্যান্য যাহা কিছু বিপদ ঘটে, কর্ম্মফল-বাদীরা তৎসমুদয়কেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল মনে করেন। তাহাই যদি হইল, এবং কর্ম্মফল খণ্ডাইবার চেষ্টা যদি বৃথা হয়, তাহা হইলে, কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হয় কেন? যুক্তি অনুসারে চলিতে হইলে, হয় কোন বিপদেরই প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত নয়; নতুবা সকল বিপদেরই মানবের সাধ্যায়ত্ত প্রতীকার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলাদেশে বিধবাবিবাহের চেষ্টা একেবারেই হইতেছে না, এমন বলা যায় না। তবে, অত্যন্ত কম হইতেছে, বলিতে হইবে। একটি শুভ লক্ষণ এই যে আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মত মান্যগণ্য ব্যক্তি স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, এবং বিবাহস্থলে সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা চেষ্টা করিলে অনেক বালবিধবার দুঃখ মোচন হইতে পারে।

অবশ্য আমরা একথা বলি না যে বালিকা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আর তাঁহাদের দুঃখমোচনের ও সৎপথে রাখিবার অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া নিজের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম করা যাইতে পারে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সেবাব্রতধারিণী করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজে পুরুষেরা কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ খুঁজিলে নারীদিগকে কখনও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া যায় না। যাঁহারা নারীর অবস্থা ভাল করিতে চান, তাঁহারা নিজে ভাল হউন। নিজের জন্য সুখ আরাম, আমোদপ্রমোদ, এবং বিধবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপস্যা, এ ব্যবস্থা যেমন হাস্যকর ও অবজ্ঞেয়, তেমনই নিষ্ফল।

অনেকে বিবাহ অপেক্ষা কৌমার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যদি বিবাহ মানে ইন্দ্রিয়চর্চ্চাই হয়, তবে এই মত ঠিক্। কিন্তু বিবাহের উচ্চ উদ্দেশ্য ধরিলে ইহা ঠিক্ নয়। ইহা ঠিক্ হইলে, কাহারও মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তি থাকিতে পারে না।

—

পেকিন রাজপুরীর খোজাগণ।

রাজপুরীর মধ্যে পুরুষের যত কার্য্য তাহা খোজাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই খোজাগণমধ্যে নানা শ্রেণীর ও নানা অবস্থার লোক আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ-শিক্ষিত ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, কেহ কেহ উচ্চ মাণ্ডারিনের পদে উন্নীত, অনেকে অতি বুদ্ধিমান ও সুমার্জ্জিত লোক। আর কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক। তাহারা মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল খোজাগণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট গায়ক, বাদক ও অভিনয়কারী আছে। এই খোজাগণ রাজপুরীর দ্বাররক্ষক, মালি, ঝাড়ুদার, পাচক, ভাণ্ডারি, শরীররক্ষক, পরিচারক, আরদালী, কেরাণী এবং অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া থাকে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অন্দর মহলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খোজার দল আছে; সেই সেই দলের সর্ব্বোপরে এক প্রধান খোজা (chief eunuch) আছে। এই প্রধান খোজার অধীনে ছয় জন সরদার বা জমাদার খোজা আছে। ইহাদের প্রায় সকলেই বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। উদ্যানের মালির, পাচকগণের, দ্বাররক্ষক বা শরীর-রক্ষকগণের প্রত্যেক দলের উপর এক এক জন জমাদার খোজা আছে। সর্ব্বোপরি সেই প্রধান খোজা।

সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর আপন আপন অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান খোজার রাজপুরীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। সুধু রাজপুরীতেও নহে, রাজপুরীর বাহিরেও ইহাদের বিলক্ষণ আধিপত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নিকট যত মোকদ্দমা আইসে বা দরখাস্ত প্রেরিত হইয়া থাকে সে সমস্তই এই প্রধান খোজার হাত দিয়া পেশ হইয়া থাকে। এই সুযোগে ইহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পেকিনে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা রাণীর প্রধান খোজাকে নানা উৎকোচ ও ভেট দিয়া বাধ্য রাখিয়া থাকে।

সম্রাট প্রায় সর্ব্বদাই রাজপুরীতে অবরুদ্ধ থাকেন। তাই বাহিরের সংবাদ ও গুপ্তানুসন্ধান প্রভৃতির কার্য্য এই প্রধান খোজার সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের সাহায্যেও গোয়েন্দাগিরিতে সম্রাট অনেক গোপনীয় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্বর্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা (Ruler of the Celestial Empire) যদি রমণী হন, তখন তাঁহার এই প্রধান খোজার সাহায্য ভিন্ন শাসন কার্য্য চালাইবার সাধ্য নাই। কারণ এই রমণী শাসনকর্ত্রী এক দরবার গৃহ ভিন্ন অন্যত্র বা অন্য সময়ে অপর কোন রাজপুরুষগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না। এই জন্য সম্রাজ্ঞীর অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান খোজার এত আধিপত্য। বৃদ্ধা মহারাণীর সর্ব্বপ্রধান খোজা লি-লিয়েন-ইং একজন অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী লোক। ইহার বয়স এখন ষাট বৎসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ব্যক্তি রাজপুরীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খোজা। সর্ব্বপ্রধান খোজা লি-লিয়েন-ইং-র পরেই সু-ই নামক আর একজন খোজা আছে এই ব্যক্তিও বিলক্ষণ বুদ্ধিশালী লোক।

রাজপুরীর মধ্যস্থ এই সকল খোজাগণের অপরাধের শাস্তিবিধানের জন্য একজন স্বতন্ত্র খোজা আছে। উচ্চপদস্থ খোজা কর্ম্মচারিগণের কোন অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড করা হইয়া থাকে, নিম্নতর পদে অবনত করা হইয়া থাকে, কখন কখন তাহাদের পদমর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ শিরোভূষণের চূড়া বা গুটিকা (Buttom) হরণ করা হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর খোজাগণের অর্থদণ্ড বা শারীরদণ্ড বিধান করা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উচ্চপদস্থ খোজাগণের অধীনে কতকগুলি শিক্ষানবিশ খোজা থাকে। তাহাদিগকে রাজপুরীর আদব কায়দা, রীতিনীতি ও অন্যান্য কার্য্যগুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

রাজমাতা অহিফেন সেবনের বড় বিরোধী। তিনি তাঁহার খোজাগণের মধ্যে কাহারো অহিফেন সেবনের কথা টের পাইলে, তাহাকে বিশেষ ভাবে কঠিন শাস্তি দিয়া থাকেন। কাহাকেও উচ্চ পদ হইতে অবনত করিয়া থাকেন, কাহাকেও বা রাজপুরী হইতে কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন। তিনি গন্ধ দ্বারা অনেক সময় ধরিয়া ফেলেন।

কতকগুলি সামাজিক রীতি।

রাজপরিবারের কোন কুমারের বিবাহ দিতে হইলে উচ্চবংশীয় সম্রান্তকুলের কুমারীদিগকে রাজপুরীতে আনিয়া উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের বিবাহ প্রণালীও নাকি এই ধরণের। মাঞ্চু-কুমারীগণকে স্বর্ণখচিত, নানা শিল্প কার্য্য বিশিষ্ট পরিচ্ছদ

পরিধান করাইয়া লালবর্ণের পট্ট বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকায় আরোহণ করাইয়া রাজপুরী মধ্যে আনা হইয়া থাকে। এই কুমারীগণের সঙ্গে আত্মীয় সধবাগণ যাইয়া থাকেন। কুমারীগণের মধ্যে কেহ অল্পবয়স্কা কেহ বা পূর্ণবয়স্কাও থাকেন। কন্যা রাজপ্রাসাদে নীত হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে রাজমাতাকে প্রণাম করিতে হয় এবং পরে নব সম্রাজ্ঞীকে প্রণাম করা হইলে রাজপুরী হইতে যে উপঢৌকন প্রেরিত হইয়াছিল তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই রূপে সামাজিক শিষ্টাচারাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে আহারাদি সম্পন্ন করার পর কুমারীগণ রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

কন্যা জন্মিলে চীনারা উহা একটা দুর্ভাগ্য মনে করে। কন্যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিলেও, সেই কন্যা পিতৃপুরুষগণের অন্নজল দানে বঞ্চিত, ইহাই এই দুঃখের কারণ। সেই জন্য সকলেই পুত্রকামনা করিয়া থাকে। মাঞ্চুগণের কন্যা সকলও চীনাদিগের কন্যাগণের ন্যায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি হইতে বঞ্চিত। এবিষয়টী ঠিক হিন্দুগণের মত। কেন না হিন্দুরমণী বিবাহিত হইয়া গোত্রান্তর হইলেই পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তবে পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ তাঁহারা ত্রি-রাত্রিতে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। মাঞ্চুবালিকাগণ চীনাবালিকাগণ অপেক্ষা পিতৃগৃহে অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে। এবিষয়ে তাহারা আমেরিকার বালিকাগণের ন্যায় স্বাধীন। একদা ওয়াশিংটনে চীনগবর্ণমেণ্টের মাঞ্চুদূত নাকি মিশ্ কার্লকে বলিয়াছিলেন যে "আমেরিকার বালিকাগণের ন্যায় অবিবাহিতা মাঞ্চুবালিকাগণ পিতৃগৃহে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মাঞ্চু বালিকাগণের পিতৃগৃহে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বালিকাগণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই।" কুমারী কার্ল এবং মাঞ্চু রাজদূত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম দেশের খবর রাখেন না। ব্রহ্মদেশীয়া কুমারীগণের যে স্বাধীনতা, তাহা তাঁহারা জানিলে এমন দৃঢ়তার সহিত উক্ত কথা বলিতে পারিতেন না।

মাঞ্চু পরিবারের অবিবাহিতা বালিকা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পরিবার মধ্যে আধিপত্য করিতে পারে। একটী অবিবাহিতা ছোট বালিকা তাহার দ্বিগুণ বয়সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। এমন কি এই বালিকার পারিবারিক স্বত্ব ও দাবিতে নিজ মাতা হইতেও সে শ্রেষ্ঠা, কারণ তাহার মাতা "অন্য পরিবারের কন্যা" বইত নয়। পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার অসম্মতিতে তাঁহার সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। বিবাহিতা কন্যাগণও পিতৃগৃহে অবস্থান কালে পরিবারের ভৃত্যগণকে বাহাল বরখাস্ত করিতে পারেন এবং আপন ভ্রাতৃবধূগণের উপর ইহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কারণ ভ্রাতৃবধূগণ অপর বংশের কন্যা। এই কন্যাগণ আপন ভ্রাতৃতনয়গণের শিক্ষার ও লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার লইয়া থাকেন। এবিষয়ে সন্তানগণের মাতাগণ আপন আপন পুত্রগণের উপর তাদৃশ কর্তৃত্ব করিতে পারেন না যাদৃশ তাঁহাদের ননদগণ কর্তৃত্ব করিতে পারেন। তাহার কারণ ভ্রাতৃবধূগণের সম্বন্ধ ধার করা, তাহারা অন্য বংশের কন্যা, বংশজাত কন্যাগণের সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ। আমাদিগের দেশেও এক সময়ে ভ্রাতৃবধূগণ ননদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতেন, পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এখনও ননদের কর্তৃত্ব আছে। অনেক সময় শুনা যাইত যে অমুকের ঘরে শাশুড়ী-ননদের বড় জ্বালা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এইক্ষণ সহরে ও বড় বড় পল্লীতে "বাবু বধূগণ" ননদকে আর বড় আমল দেন না, বরং অনেক ননদকে ভ্রাতৃবধূগণের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

মাঞ্চু কুমারীগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। কোন কোন কুমারী আজীবন কুমারী অবস্থায়ই থাকে। অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে শেষ বয়সেও পতি গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সকল চিরকুমারীর মৃত্যু হয়, তাহাদিগের মৃত্যু উপলক্ষে মহা ধূমধামের সহিত উৎসব হইয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পেকিন রাজপুরীর মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকগণ, স্ত্রীলোকগণ ও খোজাগণ ভিন্ন অপর পুরুষ যাইতে পারেনা। বর্ত্তমান রাজমাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন বিধায় দরবারগৃহে মাত্র রাজপুরুষগণের সঙ্গে রাজ কার্য্য করিয়া থাকেন।

মাঞ্চুগণ দীর্ঘকায় ও সবল শরীর বিশিষ্ট লোক। তাঁহারা নানা পুরুষোচিত ক্রীড়া ভাল বাসেন, যেমন অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী, তরবারি ও বর্শা লইয়া ক্রীড়া ইত্যাদি। ইহাঁরা অশ্বারোহণে ও তীরন্দাজীতে বিলক্ষণ দক্ষ। চীনাগণ

অপেক্ষা ইহাঁরা সমর প্রিয় জাতি। কুমারী কার্ল লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমানে ইংরেজ জাতি যে পোলো (Polo) ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ধার করিয়াছেন এবং ভারতবাসী তাতারগণ হইতে ঠিক ঐ ক্রীড়া প্রণালী ধার করিয়াছিলেন। মাঞ্চু তাতারগণের মধ্যে এখনও ঐ পোলোক্রীড়ার চলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঞ্চু অভিজাতবর্গের বংশানুক্রমিক সামরিক মর্য্যাদা আছে। যাঁহারা অশ্বারোহণে ও তীরন্দাজীতে পটু তাঁহারা সত্বর উচ্চ পদে উন্নীত হইয়া থাকেন। মাঞ্চুগণ সামরিক শৌর্য্য বীর্য্যে এক সময়ে অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নু-চি তাতারগণ (Nu-chi Tartars) কেবল যে চীনদেশ জয় করিয়াছিলেন এমন নহে কিন্তু হুন্ (Hun) নামে এই জাতীয় লোক এক সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঞ্চুগণের আর আজকাল তাদৃশ সামরিক যশঃ নাই। তাঁহারা এখন চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়া শান্তিপ্রিয় জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে মাঞ্চুগণ চীনাদিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। এরূপ কথিত আছে যে মাঞ্চুগণ চীনরাজ্য জয় করিলে, দণ্ডস্বরূপ বা তাঁহাদের রাজত্বের বিশেষত্বের স্বরূপ সমস্ত চীনা পুরুষদিগকে শিরোমুণ্ডন করাইয়া একটী করিয়া টিকি রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে এরূপ টিকি না রাখিত তাহার শিরশ্ছেদদণ্ড বিধান করা হইত। এই প্রথা আজ আড়াইশত বৎসর যাবত প্রচলিত হইলেও এখন এই টিকিরাখা প্রণালী এমন ভাবে জাতীয় আচারে পরিণত হইয়াছে যে ইহা কোন চীনার মাথায় না থাকিলে সে সমাজে স্থান পায় না। যেমন আমাদের ব্রাহ্মণগণের উপবীত না থাকিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে, বেণী চীনাদের তাদৃশ। সম্রাট স্বয়ং শিরোমুণ্ডন করিয়া মাথায় বেণী রাখিয়া থাকেন। উচ্চ মাঞ্চু রাজকর্ম্মচারিগণ মাথায় তাদৃশ বেণী রাখেন। এখানে কাষ্টম আফিসে একজন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ মাঞ্চু কেরাণী আছেন। তাঁহারা বহুপুরুষ যাবত ক্যানটনে বাস করিয়া চীনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে টিকি রাখা মাঞ্চুগণের জাতীয় রীতি। মাঞ্চু অভিজাতবর্গ যখন রাজ দরবারে গমন করেন, বা রাজকীয় উৎসবে যোগদান করেন তখন তাঁহারা অতি মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। রত্নমণ্ডিত কোমর বন্ধ, জেডপ্রস্তর-খচিত চশমার খাপ, রত্ন-মণ্ডিত শিরোভূষণ প্রভৃতি নানা প্রকার আভরণ তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্রাট স্বয়ং এত জাঁক জমক ভাল বাসেন না।

মাঞ্চু রমণীগণ লম্বা ও ঢোলা গাউন পরিধান করেন, কোমরের চিহ্নও দেখিবার সাধ্য নাই। মাঞ্চু রমণীগণের শিরোভূষণ চীন রমণীগণের শিরোভূষণের সদৃশ নহে। মস্তকের পশ্চাতে খোঁপা কিছু উন্নত এবং দুই দিকে লম্বা পক্ষ বিশিষ্ট। এই খোঁপা দেখিতে বাদুড়ের পাখার সদৃশ দেখায়। ঐ খোঁপা কৃষ্ণ বর্ণ পট্ট বস্ত্র, নানা রত্ন-খচিত কৃত্রিম পুষ্প ও স্বাভাবিক পুষ্প দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। চীনাদিগের ন্যায় মাঞ্চুগণ মধ্যেও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে সাহেবগণ এই সকল একাধিক স্ত্রী কে উপপত্নী (Concubine) আখ্যা দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহারা উপপত্নী রূপে গৃহীত বা ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের সম্মান ও স্বত্ব আছে, তবে ইহারা প্রথমা পত্নীর সমকক্ষ নহে। চীনাদিগের বিবাহের নিয়ম আমাদিগের বিবাহের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরিত। বালকগণের যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু বালিকাগণ যুবতী হইয়া কএক বৎসর থাকিলেও কাহারো আপত্তি নাই। ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অনেকে কুমারী অবস্থায় থাকে। কিন্তু পুরুষগণের তত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকার নিয়ম নাই। আমাদিগের দেশে বালিকাগণ বার বৎসর অতিক্রম করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কি করিয়া কন্যাকে গৃহের বাহির করিতে হইবে সেই চিন্তায় কন্যার পিতা চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন। কন্যার বয়স তের চৌদ্দ বৎসর হইলে কন্যাকর্ত্তার নিন্দার শেষ থাকে না। কিন্তু আবার রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীনগণের পূর্ব্ব পুরুষগণের নরকগামী হইবার ভয় নাই। কেন না অনেকের ঘরেই বিশ পঁচিশ বৎসরের আইবড় কন্যা থাকে। কি বিপরীত ব্যবস্থা!

চীনাদিগের পত্নীগণ প্রায়ই স্বামীগণ হইতে দুই, তিন, চারি পাঁচ বা ছয় সাত বৎসরের বড় হইয়া থাকে। আমাদিগের বাসার নিকট এক চীনা মুসলমানের একটী মেয়ে এবং

একটী ছেলে আছে। মেয়েটী বয়সে বড়। মেয়ের বয়স এখন ২৮।২৯ বৎসর হইবে। তবুও তাহার বিবাহ হয় নাই কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভাইয়ের ১৮ বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছে।

কোন ব্যক্তির প্রথমা পত্নীকে অপর পত্নী সকল ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত সপত্নী কলহ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। সপত্নী ও সপত্নী-পুত্রগণের প্রতি হিংসা দ্বেষের ভাব এদেশে নাই। প্রথমা-পত্নী অপর সপত্নীগণের সন্তান দিগকে আদরে লালনপালন করিয়া থাকেন।

চীন সম্রাট যে অনেক সময়ে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা যে তাঁহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা নহে, অনেক সময়ে উচ্চ বংশীয় কন্যাদিগকে তাঁহাকে উপযাচক হইয়া উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে। রাজবংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের জন্য অনেকে লালায়িত হইয়া এই প্রকার বিবাহ দিয়া সম্রাটকে বাধ্য করিয়া থাকেন। কালে এই সকল কন্যা সম্রাটের মাতা হইবে, অনেকের এই উচ্চ আশাও থাকে।

ভূমি-কম্প।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের পৃথিবীকে নানা দৈব উপদ্রব সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে। অতি অল্পকাল মধ্যে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, চিলি, কিংষ্টন্ এবং সুমাত্রাদি স্থানে যে কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীর উপর দিয়া এক একটা খণ্ড প্রলয় চলিয়া গেছে।

ভূ-কম্পন পৃথিবীর চিরসঙ্গী। অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী অত্যন্ত উষ্ণাবস্থায় ছিল, বড় বড় ভূমিকম্প তখনকার একটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত। বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত ও সাগর মহাসাগর সেই সকল উৎপাতেরই এক একটা মহাকীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন পৃথিবীর আর সে অবস্থা নাই। প্রাচীনকালের অগ্নিময় পৃথিবী তাপ-বিকিরণ করিতে করিতে এখন অগ্নি-গর্ভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জঠরাগ্নির পরিচয় আমরা কেবল আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং মৃদু ভূ-কম্পনে দেখিয়া আসিতেছিলাম। কাজেই গত কয়েক বৎসরের বড় বড় ভূমিকম্পগুলি বৈজ্ঞানিকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক কথা বলিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান কালের দৈব উপদ্রবগুলির আলোচনা কালে লর্ড কেল্‌ভিন্ (Lord Kelvin) এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন, সে গুলি বড় সারগর্ভ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচনা করিব।

লর্ড কেল্‌ভিনের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এই জলস্থলময় পৃথিবীর গোড়ার খবর কিছু জানা আবশ্যক। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান্ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ইহাঁদের সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিতেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের পৃথিবীর গঠনোপাদান, অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর আকারে মহাকাশের কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং প্রত্যেক পরমাণু সমান্তরাল গতিতে (Parallel motion) ছুটাছুটি করিত। কিন্তু এই সমান্তরাল গতিবিশিষ্ট পরমাণুগুলি যে কি প্রকারে মিলিত হইয়া, এই পৃথিবীতে বিচিত্র পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহার মীমাংসা করেন নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিতেছেন, পৃথিবীর গঠনোপাদানগুলিকে সমান্তরাল-গতিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে জগৎ-রচনার মূল প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মহাকাশে পরিব্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলির প্রত্যেকেরই প্রথমে এক একটি কেন্দ্রাভিমুখী গতি ছিল, এবং ইহা দ্বারাই নানা জাতীয় পরমাণু কাছাকাছি হইয়া ও জোট্ বাঁধিয়া নানাপদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে।

জোট্ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেই, তদুৎপন্ন পদার্থের ঘনত্ব জল মৃত্তিকাদির অনুরূপ হয় নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ঐ অবস্থায় পদার্থের গুরুত্ব সম্ভবতঃ জল অপেক্ষাও প্রায় দশগুণ লঘু ছিল; এবং ইহার পর পরমাণুগুলি আরো কাছাকাছি হইয়া পড়িলে, আমাদের পরিচিত নানা যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল।



সিদ্ধগণ।

(কালিদাসের মেঘদূতবর্ণিত)

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

বহু যোজন স্থান ব্যাপী পরমাণুগুলির প্রত্যেকেই একটা কেন্দ্রের দিকে চালিত হইলে, দূরাগত অণুর ধাক্কায় কেন্দ্র-ই সঞ্চিত অণুগুলির উপর একটা প্রবল চাপ পড়িবার কথা। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এই চাপের পরিমাণ তাঁহার হিসাবে দেখাইয়াছেন। চলিষ্ণু পদার্থ কোন স্থানে আসিয়া প্রবলবেগে ধাক্কা দিলে, প্রথমে আহত স্থান একটি প্রবল চাপ পায়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে পদার্থটি প্রতিহত হইয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, তখন আহত স্থানে আর কোন চাপই থাকে না। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ বলিতেছেন, কেন্দ্রাভিমুখী পরমাণুগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে, কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানের চাপ কিছুকাল ধরিয়া ঠিক্‌ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তালে তালে বাড়িয়া কমিয়া চলিয়াছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই চঞ্চলতা কত দিন ছিল ঠিক্‌ বলা যায় না। সম্ভবতঃ পরমাণুগুলি কালক্রমে অণুতে পরিণত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর ঐ অস্থিরতার অবসান হইয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ বলেন, এই অবস্থায় পৃথিবী তরল পদার্থময় ছিল, এবং এই খানেই সৃষ্টির আরম্ভ। পৃথিবী সেই সময় সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, এবং তাপ বিকিরণ করিতে করিতে ইহার বহুকাল পরে ভূপৃষ্ঠের উপরটা এক কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কোন জিনিষকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহা দ্বারা জিনিষটিতে তাপের উৎপত্তি হয়। এজন্য পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তাহার ভিতরের তাপ সহসা কমে নাই। সঙ্কুচনের প্রভাবে ভিতরের উষ্ণতা বরং বহুকাল ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল; এবং পরে তাপের মাত্রা চরম হইয়া দাঁড়াইলে, উপরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরটাও শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তরল পদার্থের উপরের অংশ জমাট বাঁধিয়া ঘনতর ও ভারি হইয়া পড়িলে, উপরকার ভারি জিনিষগুলার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নীচে নামিবার সম্ভাবনা। কেলভিন্‌ অনুমান করিতেছেন, পৃথিবীর কঠিন আবরণের ঐ প্রকার ভাঙাচোরা এককালে পৃথিবীতে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ইহাতে পৃষ্ঠদেশ হইতে আগত বৃহৎ বৃহৎ কঠিন স্তূপ গুলি ভিতরকার উত্তপ্ত তরল পদার্থে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লর্ড কেলভিন্‌ এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান কালে ভূগর্ভ কখনই নিছক্‌ তরল পদার্থময় নয়। উপরকার গুরুভার অবশিষ্ট কঠিন আবরণ গুলি ভাঙিয়া চুরিয়া তাহাতে নিমজ্জিত থাকায় এখন ভূগর্ভ, কঠিন ও তরল উভয় পদার্থময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের জমাট অংশের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাঙাচোরাকে লর্ড কেলভিন্‌ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমন ও ভূ-কম্পনের কারণ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইনি বলেন, কালক্রমে পৃথিবীর কঠিন আবরণটি খুব গভীর হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভাঙাচোরার কাজ এখনো পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। কাজেই ভূপৃষ্ঠের গভীর অংশের মাটিপাথর যখন ভাঙিয়া ভূগর্ভস্থ দ্রবপদার্থে ডুবিতে আরম্ভ করে, তখন সেই দ্রবপদার্থ উছলিয়া বহির্গত হইবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করে। বড় বড় আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলি ভূগর্ভের খুব গভীর অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কাজেই ঐ সকল ছিদ্রপথে সেই উচ্ছলিত গলিত ধাতু যে, বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম। লর্ড কেলভিন্‌ ভূ-কম্পনকেও ঐ আভ্যন্তরীন আন্দোলনের কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ ভূপৃষ্ঠের গভীর স্থানের মৃত্তিকাপ্রস্তরাদি যখন ভাঙিয়া চুরিয়া ভূগর্ভে পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই আন্দোলনে পৃথিবী কম্পিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

পৃথিবী কালক্রমে শীতল হইয়া পড়িতেছে, কাজেই উহার ভিতরকার দ্রবপদার্থ যে শীতল হইয়া এককালে কঠিন হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দূর-ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্তটা জমাট বাঁধিয়া গেলে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূ-কম্পন কি বন্ধ হইয়া যাইবে?

লর্ড কেলভিন্‌ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভবিষ্যতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ নিশ্চয়ই লোপ পাইবে। অতি প্রাচীনকালে ভূপৃষ্ঠে অনেক বড় বড় আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু পৃথিবী শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিতে আর বড় অগ্নির চিহ্ন দেখা যায় না। সুতরাং বিসুভিয়স প্রভৃতি যে কয়েকটি সজীব আগ্নেয়গিরি আছে, তাহারাও যে কালক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভূমিকম্পের লোপ সম্বন্ধে কিন্তু লর্ড কেলভিন্‌ বিশেষ আশ্বাস-প্রদান করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, ভূগর্ভস্থ

সমগ্র গলিত পদার্থ শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলেও, ভূগর্ভের আকুঞ্চন রোধ পাইবে না। তথন পৃথিবীর ভিতরে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হইতে থাকিবে, এবং সময়ে সময়ে উপরকার মাটি পাথর ভাঙিয়া পড়িয়া সেই সকল গহ্বর পূর্ণ করিতে থাকিবে। কাজেই এই প্রকার ভাঙাচোরার দ্বারা পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্ণমাত্রাতেই চলিতে থাকিবে।

ভূপৃষ্ঠের মাটি ভাঙিয়া পড়িয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বর পূর্ণ করিতে থাকিলে যে, ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, কয়েকটি আধুনিক ভূমিকম্পের কার্য্য আলোচনা করিলে, আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। সম্প্রতি সুমাত্রা দ্বীপে যে বৃহৎ ভূমিকম্প হইয়া গেছে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠ অনেকটা নীচু হইয়া একটি সহরের কতক অংশকে প্রায় সমুদ্রতলশায়ী করিয়াছে। গত ১৮৯৭ সালের বাংলা দেশের বৃহৎ ভূমিকম্পের কথা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। ইহাতেও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানকে উচুনীচু হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি জাপানে যে এক ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহাতে তথাকার একটি স্থান প্রায় ২০ ফুট নীচু হইয়া গেছে। সুতরাং ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলভিনের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ।

সেকালে নগর রচনার একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। সকল নগরেই নগরপ্রাচীর, নগরদ্বার, নগরপরিখা দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার অভ্যন্তরে রাজদুর্গ;—রাজদুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ;—সকল স্থানেই এইরূপ রচনা-প্রণালী অনুসৃত হইত। গৌড়েও সেই চিরপ্রচলিত প্রথা বর্ত্তমান ছিল। নগরে সকল শ্রেণীর নাগরিকের স্থান সংকুলন হইত না। অনেকে নগরোপকণ্ঠে বাস করিতেন। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন পরিখা বা প্রাচীর না থাকিলেও, নগরের ন্যায় নগরোপকণ্ঠও বিবিধ অট্টালিকায় সুশোভিত থাকিত। কখন কখন বিবিধ রাজকার্য্যালয় পর্য্যন্ত উপকণ্ঠেই স্থান প্রাপ্ত হইত। এই জন্য প্রাচীন নগরের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে, নগরোপকণ্ঠেরও অনুসন্ধান করিতে হয়। গৌড়ের নগরোপকণ্ঠের নাম

ফিরোজপুর।

তাহা এখন "পিরোজপুর" নামেও কথিত হইয়া থাকে। এই উপকণ্ঠ নগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। "কোতোয়ালী দ্বারের" দক্ষিণে,—নগরপরিখার বাহিরে,—বহুদূর পর্য্যন্ত নগরোপকণ্ঠ বর্ত্তমান ছিল। এখনও তাহার নানা চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। "কোতোয়ালীদ্বারের" ভিতর দিয়া যে পুরাতন রাজপথ প্রচলিত ছিল, তাহার উপর পুরাতন সেতু বর্ত্তমান ছিল। সেতু পার হইয়া রাজপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে কত সরোবর অদ্যাপি সেকালের সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যেখানে এখন সরোবর ও ভগ্নাবশেষ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে—সেকালে—কত উদ্যান, কত অট্টালিকা, কত উপাসনালয়, কত রাজকার্য্যালয় নিয়ত জনকোলাহলে মুখরিত হইত, কে তাহার সম্যক্ সমাচার সংগৃহীত করিতে পারে? এখন অনেক স্থান বিজন বনে পরিণত হইয়াছে; তাহার মধ্যে এখানে সেখানে অনেক পুরাতন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়;—সকল গ্রামই বিচিত্র পুরাকাহিনীর রঙ্গভূমি। মারীভয়ের সময়ে নগর ত্যাগ করিয়া অনেকে নগরোপকণ্ঠে পলায়ন করিয়াছিলেন;—গৌড় পরিত্যক্ত হইলেও, এই কারণে, নগরোপকণ্ঠ সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। সেখানে থাকিয়া নাগরিক ও রাজপুরুষগণ পুনরায় নগর রক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। পরে রাজধানী অন্য স্থানে সংস্থাপিত হইলে, নগরের ন্যায় নগরোপকণ্ঠও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে নগরোকণ্ঠেও বিবিধ দৃশ্যাবলীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে (১) বালুয়াদীঘি (২) ফিরোজপুরের তোরণদ্বার (৩) শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি, (৪) সোনা-মসজেদ, এবং (৫) টাঁকশাল দীঘি অদ্যাপি পর্য্যটকগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে।

বালুয়া দীঘি।

আয়তনে সাগরদীঘির সমকক্ষ না হইলেও, সুবৃহৎ সরোবর বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। সরোবর কেন,—ইহাকে হ্রদ বলিলেই সুসঙ্গত হয়। প্রাকৃতিক শোভা এই

পুরাতন সরোবরকে উল্লেখযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। জল তক্ তক্ করিতেছে,—তাহাতে শৈবালদামের প্রাদুর্ভাব নাই। এক তীরে রাজপথ,—সে দিকের বনজঙ্গল তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অপর তীরে তালবন,—সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া জলেস্থলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য-সামঞ্জস্যের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে। দেখিবামাত্র বলিতে হয়,—বৃহৎ এবং সুন্দর! পশ্চিমতীরের রাজ পথের পশ্চিমে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি আধুনিক অট্টালিকা;—তাহা মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের বালুয়া দীঘির কাছারী বাড়ী। এই বাড়ী গৌড়-পর্য্যটকগণের চিরস্মরণীয়। পরিক্লান্ত পর্যাটক এখানে আসিয়া যে আতিথ্যলাভ করেন, তাহা মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকা-তাড়িত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের বারিপ্রপাতলাভের ন্যায়—অচিন্তিত-পূর্ব্ব, উপাদেয়। বালুয়াদীঘির আয়তন, ৫০০ গজ দীর্ঘ, ২০০ গজ প্রস্থ।

"কোতোয়ালীদ্বার" উত্তীর্ণ হইয়া বালুয়াদীঘি পর্য্যন্ত আসিতে, এবং বালুয়াদীঘি ছাড়িয়া আবার দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে পথপার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সরোবর ও ইষ্টক প্রস্তরের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এখন বন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইলেও, সেকালের সৌভাগ্যগর্ব্বের আভাস প্রদান করে। এক সময়ে এই নগরোপকণ্ঠ যে জননিবাসে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে সংশয় থাকে না।*

"বালুয়া দীঘির" নাম বালুয়াদীঘি হইল কেন, তাহাতে কৌতূহল প্রকাশ করিবামাত্র রাখালবালকেরা বলিয়া দেয়,—ইহার তলদেশ বালুকাময়। বোধ হয় সেই জন্যই ইহার জল এখনও উপাদেয়। জলে কুম্ভীরের আতিশয্য। এখান হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, একটি বিচিত্র তোরণ-দ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই অভ্যন্তরে

শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি।

এই তোরণদ্বার "পিরোজপুর দ্বার" নামে কথিত। রাভেন্শা ইহাকে সেই নামেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নগরদ্বার নহে;—নিয়ামতুল্যার সমাধি ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বার। এই দ্বার এখন ধ্বংসদশায় পতিত হইয়াছে;—মিনার ও গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—খিলান ধসিয়া গিয়াছে,—সম্মুখের দৃশ্য বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বিষাদের বিষণ্ণ বায়ু শন্ শন্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে পদার্পণ করিলে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে!

শাহ নিয়ামতুল্লা একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। নিয়ামতুল্লা গৌড়ের নগরোপকণ্ঠেই বাস করিতেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর সংঘটিত হয়। সুতরাং গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরেও নিয়ামতুল্লা জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমাধি মন্দির, মস্জেদ এবং তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে স্বীকার করিতে হয়,—গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরেও নগরোপকণ্ঠের সৌভাগ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। খান্‌জাহান্ নামক কোনও ভক্ত কর্ত্তৃক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ামতুল্লার তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল, ফলকলিপিতে তাহা লিখিত আছে। সম্মুখে বৃহৎ সরোবর, তাহার তীরে মস্জেদ এবং সমাধিমন্দির নিয়ামতুল্লার প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বার্ষিক ৬০০০ টাকা আয়ের ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া পড়িতেছে। সেকালে যাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ভক্তসমাজ এত আয়োজন করিয়াছিলেন, একালের লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন! এখন যাঁহারা এই অঞ্চলে পুরাকীর্ত্তির অনুসন্ধান করিতে শুভাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য..

সোনা মস্জেদ।

নিয়ামতুল্লার সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বে—প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে,—গৌড়ের বিখ্যাত কীর্ত্তিচিহ্ন—সোনা মস্জেদ। ইহার নাম 'সোনা মস্জেদ' হইল কেন, তাহার কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাকে গৌড়ীয় স্থাপত্য কীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কৃষ্ণ মর্ম্মর স্তম্ভের উপর বিচিত্র খিলান, তাহার উপর পঞ্চদশ গম্বুজ, এই মস্জেদের বাহ্য শোভার সহিত গঠন-কৌশলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহাকে পর্য্যটকগণের

* Prostrate domes, mingled with carved lintels, and innumerable bricks, are seen lying in confusion on all sides, and show how dense must have been the population of this suburb.—*Ravenshaw.*

বিস্ময়ের আধার করিয়া রাখিয়াছে। ইহা সত্য সত্যই—বৃহৎ এবং সুন্দর।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রস্তর শিল্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাপাত লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আশা পরিতৃপ্ত হয় না;—দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়,—আবার দেখিয়া—বহুবার দেখিয়া—দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না। সম্মুখে মসৃণ, চাক্‌চিক্যময়, কৃষ্ণমর্ম্মর ফলক; তাহাতে কত লতাপাতা, কত অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে খোদিত হইয়া রহিয়াছে!

সম্প্রতি যে জীর্ণসংস্কার আরব্ধ হইয়াছে, তাহার কল্যাণে প্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত হইয়াছে, খিলান সুসংস্কৃত হইতেছে, হর্ম্মতল সুবিন্যস্ত হইতেছে। যাহা ছিল, তাহা নাই। হর্ম্মতলে শ্বেত-কৃষ্ণ বর্ণসমাবেশযুক্ত চিত্রিত ইষ্টক সুবিন্যস্ত ছিল, দেখিতে বহুমূল্য গালিচার ন্যায় বোধ হইত। লোকে তাহা তুলিয়া লইয়া গিয়াছে,—এখন অনাবৃত হর্ম্ম্যতল মৃত্তিকাময়। তাহার সহিত ভিত্তিগাত্রের সুকুমার শিল্পকৌশল সামঞ্জস্য হারাইয়া গৌরবহীন হইয়াছে। একখানি খোদিত প্রস্তর প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্ব হইতে অপহৃত হইয়াছিল। আগ্রা, বারাণসী এবং পাটনার কারিগরগণ সেখানে ঠিক সেইরূপ আর একখানি খোদিত প্রস্তর সংযুক্ত করিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—এখনও ভারতবর্ষে প্রস্তরশিল্পীর অভাব উপস্থিত হয় নাই!

এই মস্‌জেদে বাদশাহের তখ্‌ত—অর্থাৎ পৃথক সমুচ্চ উপাসনা বেদী—বর্ত্তমান ছিল। এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। একটি স্বতন্ত্র প্রবেশকক্ষ দিয়া বাদশাহ তাহাতে আরোহণ করিতেন। ইহাতে বোধ হয় নগরোপকণ্ঠেও বাদশাহের শুভদৃষ্টি প্রীতিত হইত।

ফলকলিপির যে অংশে সন তারিখ খোদিত ছিল, সেই অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণমর্ম্মর খণ্ড অপহরণ করিবার প্রলোভনে পরিদর্শন ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাঁহারা শাণিত অস্ত্রাঘাতে অনেক শিল্পাদর্শ ক্ষত বিক্ষত করিয়া গিয়াছেন। যাহা আছে, তাহা—এই সকল অত্যাচারে—জর্জ্জরিত কলেবরে কালযাপন করিতেছে। তথাপি সোনা মস্‌জেদ একটি অতুলনীয় কীর্ত্তিচিহ্ন।

কাহার কীর্ত্তি? ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, হোসেন শাহার শাসন সময়ে আলি মহম্মদ কর্ত্তৃক এই বিচিত্র মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অলি মহম্মদের উপাধি—মজলিস্‌-উল্‌-মজালিস্‌-মন্‌সুর—তিনি একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী মাত্র। এই মস্‌জেদের বাদশাহী উপাসনাবেদী ইহাকে বাদশাহের কীর্ত্তি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহার আরও একটি প্রমাণ সোনামস্‌জেদের নির্ম্মাণ স্থান। তাহার সম্মুখে যে সুবৃহৎ সরোবর, তাহা রাজকীয় সরোবর, তাহার নাম

টাঁকশাল দীঘি।

এই দীঘি এখন অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহার তীরে যে টাঁকশালের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম রাজমুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া এক সময়ে স্বদেশে বিদেশে লোকসমাজে সুপরিচিত ছিল। টাঁকশালের নাম ছিল—"ফিরোজাবাদ।" হিজরী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সালের "ফিরোজাবাদী মুদ্রা" ইতিহাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত। "ফিরোজাবাদ" কোথায় ছিল, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের অভাব হয় নাই। টমাস্‌ সাহেব তাঁহার পাঠান-মুদ্রা-বিষয়ক প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যানের উপদেশে "ফিরোজাবাদকে" পাণ্ডুয়ার নগরোপকণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের নিকটে "ফিরোজাবাদ" আছে; গৌড়ের নগরোপকণ্ঠেও "ফিরোজপুর" আছে। এখানে দীঘিটি অদ্যাপি টাঁকশাল দীঘি নামে সুপরিচিত আছে; এবং তাহার তীরে বহুমূল্য প্রস্তর স্তম্ভাদির অসদ্ভাব নাই। হিজরী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত "ফিরোজাবাদী মুদ্রা" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পাণ্ডুয়া অপেক্ষা গৌড়ের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকায়, ইহাকেই সেই পুরাতন টাঁকশালের স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

সুসমাচার।

(১)

বোধিদ্রুম-তলে মুক্ত শুদ্ধ
দেব অমিতাভ অমৃত বুদ্ধ!
নরহিত তরে উদিল ধর্ম্ম;
লুকানো মন্ত্রে বেদ নাই।

বলি, হোম, যাগ্‌, দূরে পড়ে থাক্‌;
অনলে সমিধে মেধ নাই।

(২)

দ্বিজ বা শূদ্র সাধু বা পতিত,
কি পুরুষ নারী, এসগো ত্বরিত;
পরহিতে সাধ পরম কর্ম্ম;—
পুণ্য আনিবে বেদ নাই।
করি প্রাণদান পাবে নব প্রাণ;
প্রীতি-বন্ধনে ছেদ নাই।

(৩)

স্বর্গ-কামনা-হোমের অনল
স্বার্থের তাপে দহেরে কেবল;
শীল-তরু-ছায়ে নাহিরে ঘর্ম্ম;—
আনে মধুবায়ু সাধনাই;
শাখায় অতুল বিনয়ের ফুল
গন্ধে জাগায় চেতনাই।

(৪)

আকাশের মত অসীম উদার
নির্ব্বাণ পথে সম অধিকার!
শুনি সমাচার তৃপ্ত কর্ণ,—
নরে নরে আর ভেদ নাই।
ব্যাধি, জরা, দুখ, মরণ আসুক,—
খেদ নাই তাহে খেদ নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিদেশী কবিতা।

From Mrs. Browning.

তবে যাও তুমি। ওগো জানি তবু চিরদিন আমি
তোমারি ছায়ার পাশে আজি হতে রব দিনযামী।
মোর শূন্য গৃহ দ্বারে, কোন দিন নাহি হবে মনে
তোমা ছাড়া চলিয়াছি শূন্য এই বিজন ভুবনে
আপন হৃদয় ভার লয়ে! শুভ্র দিবালোকে যবে
নেহারিব আপনার করতল খানি, জেগে রবে
তোমারি পরশ তাহে এবে! যদিও করেছে বিধি
এতদূর ব্যবধান তোমায় আমায়; তব হৃদি
তবু আছে এ হৃদয়' পরে! আজি ধ্বনিছে সেথায়
দুটি হৃদয়ের তাল! সদা তুমি রয়েছ হেথায়
মিশাইয়া মোর সব কাজে সকল স্বপন সনে
দ্রাক্ষা যথা মিশে রহি মদিরার রসে সঙ্গোপনে
দেয় তারে আপনারি সরস আস্বাদ! ম্লান মুখে
ডাকি যবে মোর তরে সকাতরে বিধাতা-সমুখে
শোনেন তোমারি নাম মোর নাম অভ্যন্তর মাঝে,
হেরিছেন মম আঁখিজলে তোমারি নয়নজল রাজে!

ঐতিহাসিক বীর বালক

জালিম সিংহ।

(মুর্শিদাবাদের সুবিশাল গিরিয়া প্রান্তরে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লইয়া বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত তদীয় অনুচর আলিবর্দ্দী খাঁর যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটে, তাহার ফলাফল ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে। কিন্তু এই যুদ্ধে নবাবের একতম রাজপুত সেনাপতি বিজয় সিংহের নবমবর্ষীয় শিশু সন্তান জালিম সিংহ যে অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত। সে বাচি ত্র বীর-গাথা চিরকাল ভারতের গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত। আমার ক্ষুদ্র লেখনী আজ সে পুণ্য-কাহিনী সংস্পৃষ্ট হইয়া ধন্য হইল।)

প্রভাত তখন হয়ে এল
সূর্য্য উঠে-উঠে—
লক্ষ বীরের শিরার মাঝে—
তপ্ত শোণিত ছুটে!
ঘেরি 'গিরিয়ার' বিশাল ভূমি
বীরের কণ্ঠ আকাশ চুমি
ফুটে—
প্রভাত তখন হয়ে এল
সূর্য্য উঠে-উঠে!

উঠিল গর্জ্জি হাজার কামান
ছুটিল গুলি গোলা—
কাল-সমুদ্রে মুহূর্ত্তেকে
জাগিল ভীষণ দোলা!

আপনি নবাব করীর পরে
দীপ্ত অসি বজ্র-করে
খোলা—
উঠিল গর্জ্জি হাজার কামান
ছুটিল গুলি গোলা!

আলিবর্দ্দীর সৈন্য হতে
মারিল কেবা বাণ—
লুটান নবাব হাওদা মাঝে
গেলরে বুঝি প্রাণ!
বিদ্রোহী দল গরজে সুখে
নবাব-সৈন্য নহেরে দুখে
ম্লান—
গেছেন নবাব-আছে ত বীর্য্য
আছে ত দেহে প্রাণ!

সৈন্যাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ
হুঙ্কারে ঘোর স্বনে—
কাঁপিছে ঊর্দ্ধে তীক্ষ্ণ শৈল্য
শঙ্কর যেন রণে!
বিদ্রোহী-সেনা তৃণের প্রায়
আঘাতে তাহার ভাসিয়ে যায়
ক্ষণে—
সৈন্যাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ
হুঙ্কারে ঘোর স্বনে!

আলিবর্দ্দীর বিশাল বক্ষ
সম্মুখেতে হেরি—
আস্ফালিয়া দারুণ বর্ষা
শূন্যে দিলেন এড়ি!
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য-ফলে
বর্ষা গেল রসাতলে
পড়ি—
অরি দলে হরষ-ধ্বনি
জাগিল আকাশ ঘেরি!

সহসা এক জলন্ত গোলা
কাল-দণ্ড সম
বিজয় সিংহের শিরে আসি
ঘাতিল নিরমম!
ইষ্টদেবে স্মরিয়া বীর
নিলেন শয্যা বীরের চির
রম—
বিজয় সিংহে গোলা যখন
ঘাতিল নিরমম!

আশু-মুক্ত স্রোতের মত
আলিবর্দ্দীর দল
দলিতে সে বীর-বপুঃ
হইল চঞ্চল!
ক্ষুদ্র অসি ঘুরায়ে দ্রুত
গর্জ্জিল কেবা-"আছেরে কত
বল—
ছুবিরে আমার পিতার দেহ
ওরে অরির দল!"

বর্ষ নয়ের শিশু জালিম
শঙ্কা নাহিক বুকে—
নিমেষ তরে স্তব্ধ সবাই
বিস্ময়ে কৌতুকে।
তারপরেতে ছুটিল তেজে
আলিবর্দ্দী কহেন নিজে
ডেকে—
"ক্ষান্ত হও সৈন্য আমার
যুদ্ধ গেছে চুকে!"

ঊর্দ্ধে রৈল তোলা কৃপাণ
হাতে রইল তীর—
বিশাল চমূ মুহূর্ত্তেকে
সাগর হেন স্থির!

আলিবর্দ্দী কহেন সবে
"নোয়াও ওগো সগৌরবে
শির—
ক্ষুদ্র শিশু জালিম সিংহ
বীরের সেরা বীর!"

যোদ্ধা এক জালিম সিংহে
স্কন্ধে নিল তুলি'—
মহানন্দে জয়-ধ্বনি
সবাই দিল মিলি'!
বিজয় সিংহের মৃত-কায়
রাজপুত সেনা বহিয়ে হায়
শ্মশানে গেল চলি!
বীরেই বুঝে বীরের মর্ম্ম
বিবাদ বিরোধ ভুলি!

ধন্য জালিম সিংহ-শিশু
শত ধন্য তুমি—
ধন্য তোমার পিতামাতা
ধন্য জন্মভূমি!
তোমার ধ্যানে জাগুক্ তারা
আজিকে ভয়ে রয়েছে যারা
ঘুমি—
ধন্য জালিম সিংহ-শিশু
শত ধন্য তুমি!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

"উপনিষদের উপদেশ"।

(সমালোচনা ও প্রকৃত ব্যাখ্যা।)

সমালোচনার জন্য আমরা 'উপনিষদের উপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ পাইয়াছি। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্. এ। গ্রন্থখানি ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ইহা ব্যতীত ১৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুদীর্ঘ অবতরণিকা আছে। পুস্তকের কাগজ ভাল, ছাপা সুন্দর, বিষয় অতি উৎকৃষ্ট—ইহাতে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

বিদ্যারত্ন মহাশয় অবতরণিকাতে লিখিয়াছেন যে "এই বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা দুই বৃহৎ উপনিষদের (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক) সমস্ত আখ্যায়িকাই গ্রহণ করিয়াছি এবং শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদও সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন আমরা ভাষ্যানুবাদে কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের এই ভাষ্যানুবাদ অক্ষরানুক্রমে নহে; মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ এবং তাহার ভাষ্যের গূঢ় অভিসন্ধি কি প্রকার সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।"

আমরা মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি কিন্তু গ্রন্থকার অবতরণিকাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। উপনিষদ্ বস্তুটী কি এ গ্রন্থ পড়িয়া তাহা বুঝা যায় না; শঙ্কর ভাষ্যও যথাযথ অনূদিত হয় নাই। অনেক স্থলে ভাষ্যের ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রন্থকার এমন অনেক কথা গুঁজিয়া দিয়াছেন—যাহা উপনিষদ্ ও শঙ্কর ভাষ্য উভয়েরই বিরোধী। নিম্নে আমরা কেবল মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ঋষি একস্থলে বলিতেছেন যে পতির প্রতি প্রণয় বশতঃ পতি প্রিয় হয় না, স্ত্রীর প্রতি প্রণয় বশতঃ স্ত্রী প্রিয় হয় না, অপত্যের প্রতি প্রীতি বশতঃ অপত্য প্রিয় হয় না, বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বর্গাদি লোক, দেবগণ, বেদ ও ভূতাদির প্রতি প্রীতি বশতঃ এ সমুদয় প্রিয় হয় না,—একমাত্র নিজের প্রতি প্রীতি বশতঃই এ সমুদয় প্রিয় হয় সুতরাং আপনাকেই (আত্মাকেই) দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে জায়াপতিপুত্রাদির প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার জন্য এই সমুদয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে (স হোবাচ অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ, জায়াপতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগমুৎপাদয়তি তৎসন্ন্যাসায়)। কিন্তু উক্ত শ্রুতির ভাষ্যানুবাদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন—

"নিজের ছোট ছোট আত্ম-গণ্ডী হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রীতি ক্রমে বাড়াইতে হয়। আত্মনিষ্ঠ প্রীতিকে পরকীয় প্রীতিতে, পরকীয় প্রীতিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের প্রীতিতে ক্রমে সম্প্রসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানব সমাজের প্রীতিতে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই সম্প্রসারণ ক্রমে বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত করিয়া ব্রহ্ম-প্রেমে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়।" পৃঃ ১৮৯।

শঙ্কর বলিতেছেন এই অংশ বৈরাগ্যসূচক কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন ইহা অনুরাগসূচক। গ্রন্থকার শঙ্করভাষ্য অনুবাদ না করিয়া নিজের কতকগুলি মত গ্রন্থে ঢুকাইয়া দিয়াছেন অথচ বলিতেছেন "যাহা শ্রুতি ও ভাষ্যে উক্ত হয় নাই এমন কোন কথা আমরা এ গ্রন্থে বলি নাই।" পৃঃ ৩৮। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ কত স্থলে যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

আমাদের দেশের কোন একখানা শাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলেই তাহার একটী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। Kelvin, Crookes ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল যে সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ঋষিগণ অতি প্রাচীন কালেই সে তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাহার প্রমাণ—সমুদ্রমন্থন। কপিলের 'প্রকৃতি' ও বিজ্ঞানের 'ঈথর' যে একই বস্তু তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? জাতিভেদ যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে ঋষিগণ তড়িৎ ও চুম্বক-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। আর বিষ্ণুর দশ অবতার—সে ত 'ডারুইন'এর বিকাশবাদ। কোকিলেশ্বর বাবুও ইহার তিনটী প্রমাণ দিয়াছেন। প্রথম প্রমাণ এই যে ঐতরেয় উপনিষদে বলা হইয়াছে যে প্রথমে পঞ্চতন্মাত্র, তৎপর অগ্নি, সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবতা, তৎপর গো ও অশ্ব এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে বৃহদারণ্যকের মতে প্রথমে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,

তৎপর জল ও পৃথিবী, তৎপর অন্ন (অর্থাৎ জড়পদার্থ) এবং সর্ব্বশেষে শরীর (অর্থাৎ প্রাণিবর্গ) সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে জল ও পৃথিবী সৃষ্টির পর জড়পদার্থের সৃষ্টি। তবে ত দেখিতেছি জল এবং পৃথিবী জড়-পদার্থ নহে! আমাদের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল! তৃতীয় যুক্তি অকাট্য। শ্রুতি যখন বলিতেছেন মনুষ্যলোক অপেক্ষা গন্ধর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্বলোক অপেক্ষা পিতৃলোক শ্রেষ্ঠ, পিতৃলোক অপেক্ষা দেবলোক শ্রেষ্ঠ, তখন আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না যে ঋষিগণ ক্রমবিকাশ বাদ অবগত ছিলেন। পৃঃ ৩৭ এবং ৩৮।

ভারতবর্ষ অতি অদ্ভুত দেশ। এখানে সকলেই 'ডারুইন' হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একটা কচি খোকা সেও সেদিন বলিতেছিল- "ইঁদুল (ইন্দুর) চে (= চেয়ে) বেলাল (= বিড়াল) বল (বড়), বেলাল চে কুকুল বল, কুকুল চে গলু বল, গলু চে গোলা (= ঘোড়া) বল, গোলা চে আতি (= হাতী) বল" ঠিক ডারুইনেরই কথা। আশাকরি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে এই যুক্তিটী গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া দিবেন।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা ত ক্রমবিকাশের মতে সৃষ্টি। উপনিষদে অন্যপ্রকার সৃষ্টির বিবরণও আছে এবং তাহাও খাঁটি বিজ্ঞানের মত। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে বিশ্বে কতকগুলি শক্তিই এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া কোথাও বৃক্ষ, কোথাও লতা, কোথাও প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক জানেন সকল পদার্থই শক্তিরই রূপান্তর"। পৃঃ ২২।

এই অমূল্য সত্যটী যা আমরা শেষে ভুলিয়া যাই--এইজন্য গ্রন্থকার আমাদিগকে ইহা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন—ঋষিগণও এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাহার শ্রুতি-প্রমাণ এই যে "প্রাণ হইতে জগতের উৎপত্তি।" এই 'প্রাণ' অর্থ force অর্থাৎ জড় শক্তি। অন্য প্রমাণও আছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে এ জগৎ অগ্নি সোমাত্মক। সোম অর্থ অন্ন অর্থাৎ জড় পদার্থ এবং অগ্নি অর্থ শক্তি অর্থাৎ force. আর প্রাণ যে অন্নে প্রতিষ্ঠিত তাহাও উপনিষদের কথা। সুতরাং উপনিষদও বলিতেছেন যে জড়শক্তি হইতেই এ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পৃঃ ১০।

রবি বাবুর গৌড়ীয় পণ্ডিত এক স্থলে বলিয়াছেন "ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্"। কাজেও দেখিতেছি তাহাই।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নাকি প্রমাণ করিয়াছেন যে জড়শক্তিই ঘনীভূত হইয়া এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি "কোন্ বৈজ্ঞানিকের কারখানায় এই সত্যটা প্রমাণিত হইয়াছে?" বিদ্যারত্ন মহাশয় কি Conservation of Energy-এর কথাটা শুনেন নাই? এক শক্তি অপর শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে— কিন্তু শক্তির পরিমাণ ঠিকই থাকে। শুধু তাহাই নহে—Conservation of Matter নামক আরও একটী বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। জড় পদার্থের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু ইহার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সুতরাং বিজ্ঞান-মতে শক্তিও কখন জড়ে পরিণত হয় না এবং জড়ও কখন শক্তিতে পরিণত হয় না।

গ্রন্থকার নিজমত সমর্থন করিবার জন্য First Principles হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের মত সমর্থিত হয় না। শক্তি ঘনীভূত হইয়া জড়াকার প্রাপ্ত হয় ইহা Spencer কোন স্থলেই বলেন নাই—পরন্তু বলিয়াছেন যে জড় যে সৃষ্ট হইতে পারে তাহা ভাবা যায় না (the creation of matter is unthinkable পৃঃ ১৭৮)। Spencer স্পেন্সার বাহ্যজগৎকে মনোবিজ্ঞান দ্বারা বিশ্লেষণ (Psychological analysis পৃ ১৬৯) করিয়াছেন—বাহ্য জগৎ মানবাত্মার নিকট কি ভাবে প্রকাশিত হয় ইহা বিচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য (I have throughout thought matter under the form present to the consciousness পৃ: ৫৬৮)। তিনি বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন যে বাহ্য জগৎ আত্মার নিকট শক্তিরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে (Force is the ultimate component of thought into which our conception of external existences are resolvable পৃঃ ৫৭৮)। যেমন কোন কোন দার্শনিক বলেন এ জগৎ আমারই নিকট অনুভূতির (Idea) আকারেই প্রকাশিত হইয়া থাকে স্পেন্সারও তেমনি বলিয়াছেন—এ জগৎ আত্মাতে শক্তির আকারেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা দার্শনিকের কথা— বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ক্রিয়া নহে।

আর প্রাণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারেন নাই। আমরা জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা চৈতন্য বলিতে যাহা বুঝি, ঋষিগণ সেই অর্থেই এখানে প্রাণশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কৌষীতকী উপনিষদে বলা হইয়াছে---"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ ৩।৪। সমুদয়ই যে প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত তাহা উপনিষদের একটী প্রসিদ্ধ উপদেশ। বর্ত্তমান যুগেও অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এ জগৎ জ্ঞানেরই বিকার। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই মত অধ্যাত্মবাদ (Idealism) নামে খ্যাত। বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদেও এই মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দার্শনিক ব্যাখ্যা।

শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, আত্মা হইতে পৃথক। আত্মা অসঙ্গ, নির্ব্বিকার এবং নিষ্ক্রিয়। নির্ম্মল স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে যেমন স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়—তেমনি মনাদির সান্নিধ্য বশতঃই আত্মাকে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় অবতরণিকাতে মন ও আত্মাকে একই বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন স্থলে লেখা আছে মনেরই অনুভূতি (পৃঃ ২৮,) আবার অনুভূতি আত্মারই একথাও বলা হইয়াছে (পৃঃ ৩০,) কোন স্থলে বলা হইয়াছে— বিচার করেন আত্মা (পৃঃ ৩১) আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে মনই বিচার করিয়া থাকে (পৃঃ ২৯)।

বিদ্যারত্ন মহাশয় আত্মা ও জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে দেশ ও কাল মনেরই সূত্র এবং মন এই সূত্র দুইটী দ্বারা অনুভূতিগুলিকে সূত্রিত ও গ্রথিত করিয়া লয়। পৃঃ ২৮। "ঐ অনুভূতিগুলির কারণ আমার বাহিরেই অবস্থিত—আমা হইতে ভিন্ন দেশে অবস্থিত। (পৃঃ ৩০)।" আমরা জিজ্ঞাসা করি দেশ ও কাল যদি মনেরই ব্যাপার হইল তবে দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তু মনের বাহিরে হইবে কি প্রকারে? একটী বাক্স যদি ঘরের মধ্যে থাকে বাক্সের ভিতরের টাকা কি ঘরের বাহিরে থাকিতে পারে? আর একস্থলে লিখিত আছে "বাহিরের ঐ কারণটী হইতে অনুভূতিগুলি আত্মাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।" বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে অনুভূতি আত্মারই অবস্থা (States of consciousness পৃঃ ৩১)। অনুভূতি আত্মার বাহির হইতে আইসে—ইহার অর্থ এই যে আত্মার অবস্থা প্রথমতঃ আত্মার বাহিরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় তৎপর ইহা আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। আত্মার অবস্থা কি আত্মার বাহিরে থাকিতে পারে? গ্রন্থকার আরও বলেন "আত্মা অনুভূতিগুলি হইতে পৃথক।" (পৃ ৩০)। আত্মা আত্মার অবস্থা হইতে পৃথক—ইহা এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

সাংখ্য ও বেদান্ত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন সাংখ্য ও বেদান্তে প্রকৃত পক্ষে কোন মতবৈধ নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইহাদিগের পার্থক্য মৌলিক। বেদান্ত বলেন পরব্রহ্ম একসময়ে ভেদরহিত হইয়া অব্যক্ত রূপে বর্ত্তমান

ছিলেন, সেই অব্যক্তই ব্যক্ত হইয়া এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্য বলেন ভেদ রহিত অব্যক্ত কখনই আপনা আপনি ব্যক্ত হইতে পারে না। ইহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকা আবশ্যক। এই খানেই সাংখ্য বেদান্তে বিরোধ। এই সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য শঙ্কর মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করায় অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। আর মায়াকে যদি ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহাতেও নিস্তার নাই, কারণ অব্যক্ত স্বগতভেদ রহিত। অব্যক্তে শক্তি আরোপ করিলে অব্যক্তের অব্যক্তত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। সাংখ্যের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্কর নিজেই আত্মবিরোধে পড়িয়াছেন। প্রকৃত কথা এই বেদান্ত সাংখ্যের উত্তর দিতে পারেন নাই। নব্য বেদান্তের সহিত তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে যে বেদান্তের পরব্রহ্ম=সাংখ্যের প্রকৃতি; শঙ্করের মায়া= সাংখ্যের পুরুষ। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে প্রকৃতিকে মায়ার সহিত এবং পুরুষকে ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তবে এদোষ কেবল ইহাঁর নহে—এ প্রকার ভ্রম অনেকেই করিয়াছেন। বেদান্তে অনেক স্থলে পরব্রহ্ম পুরুষ (person) বলা হইয়াছে। এইজন্য অনেকের বিশ্বাস ব্রহ্ম ও সাংখ্যের পুরুষ একই।

বেদান্তের মুক্তি অর্থ পরব্রহ্মে নির্ব্বাণ, সাংখ্যমতে মুক্তি অর্থ কৈবল্য। বেদান্তে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়—সাংখ্যমতে জীব প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া যায়। একের লক্ষ্য অদ্বৈত, অপরের লক্ষ্য দ্বৈত। অথচ লোকে সাংখ্য বেদান্তে সমন্বয় করিতে সাহসী হয়।

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আর একটী মন্তব্য এই যে প্রকৃতি অর্থ জড় (পৃঃ ৪৯)। এমত অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম এই:—প্রকৃতি, বুদ্ধি বা প্রধান, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনাদি একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত। বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ১৮টী বস্তুই অজড়, সর্ব্বশেষে ৫টী জড়ভূত। বুদ্ধি অহঙ্কারাদি যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সে প্রকৃতি কখন জড় হইতে পারে না—জড়ের উৎপত্তি সর্ব্বশেষে। সাংখ্যকে জড়বাদ না বলিয়া অধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানবাদই (Idealism) বলা উচিত।

ব্রহ্ম।

শঙ্কর একজন ঘোর অদ্বৈতবাদী—তিনি ব্রহ্মে স্বগতভেদও স্বীকার করেন না। সমুদ্র একটী বস্তু—কিন্তু একটী বস্তু হইলেও ইহাতে স্বগতভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে কারণ জল তরঙ্গ, ফেন বুদ্‌বুদ ইত্যাদি ভিন্নতা সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম বস্তুতে এ প্রকার কোনও ভেদ বর্ত্তমান নাই (বৃহঃ ৫।১ ভাষ্য)। সুষুপ্তিতে যেমন জীবাত্মা একাকার ধারণ করে ব্রহ্মের অবস্থা নিত্যই তদ্রূপ। কোন কোন উপনিষদে লিখিত আছে—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সুষুপ্তি অবস্থা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। সুষুপ্তিতে আত্মা স্বরূপ ধারণ করে বটে কিন্তু তখনও ইহার মধ্যে পার্থক্যের বীজ লুক্কায়িত থাকে। সেই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা যাহাতে পার্থক্যের বীজ একবারেই থাকে না। এই অবস্থার নাম তুরীয় অবস্থা। সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থাই যদি আত্মার প্রকৃত অবস্থা হয় তখন বলিতে হইবে—আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভেদরহিত ও বাহ্যভেদরহিত। ইনি—অনন্তরং অবাহ্যং—অন্তর ভেদ রহিত ও বাহ্যভেদ রহিত (বৃহঃ ৪।৫।১৩)। সুতরাং দ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শঙ্কর এ মত উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

বৃহঃ ৪।৪।১৯।

"ইঁহাতে নানাত্ব নাই; যে ইঁহাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়"। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেও এই মত অতি বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় উপনিষদ্ ও শঙ্করের নামে বলিতেছেন "ব্রহ্মচৈতন্য এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক; যাহা বহু তাহা একেরই অভিব্যক্তি। সেই একেকে যেমন কেহ লোপ করিতে পারে না, তদ্রূপ এই বহুরও লোপ সম্ভব নহে" (পৃঃ ৫৯)।

বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং', বলা হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ২।২)। শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্ম সত্যং অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় তাহাতে কোন প্রকার বিকার নাই। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞান কর্তৃত্ব আরোপ করা যায় না (জ্ঞান শব্দো ব্রহ্ম বিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ, নহি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্তৃত্বে সত্যুপপদ্যতে। যেখানে জ্ঞানকর্তৃত্ব সেই খানেই কার্য্য সেই স্থলেই পরিবর্ত্তন সুতরাং জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে সত্য ও অনন্ত বলা যায় না (জ্ঞানকর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ অনন্তঞ্চ)। দ্বৈতবাদী কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিন্তু শঙ্কর ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিতে প্রস্তুত নহেন। বিদ্যারত্ন শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বের তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন:—ব্রহ্মচৈতন্যই জ্ঞাতা—দ্রষ্টা এবং এই শক্তি তাঁহার জ্ঞেয়—দৃশ্য। তিনি বিষয়ী ইহা বিষয় তিনি পুরুষ ইহা প্রকৃতি (পৃঃ ২৭২)। আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্কর যাহা বলেন—শিষ্য ঠিক তাহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। যদি বলা যায় ব্রহ্ম নিজশক্তি অর্থাৎ নিজেকেই জানেন—তাহা হইলেও ব্রহ্মে পরিবর্ত্তন স্বীকার করা হইল, ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করা হইল ব্রহ্মের অনন্তত্ব অস্বীকার করা হইল কারণ শঙ্কর বলেন ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিলে জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতাকে পৃথক করা হয়—তাহা হইলে অনন্তত্ব কোথায় রহিল?—(জ্ঞান কর্তৃত্বে চ জ্ঞেয়-জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যনন্ততা ন স্যাৎ)।

শঙ্কর ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করেন না, তিনি বিবর্ত্তবাদী—পরিণামবাদী নহেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য বলিতেছেন 'বিশ্ব সেই সত্বস্তরই রূপান্তরিত অবস্থা (পৃঃ ২১)। 'এজগৎ ব্রহ্মশক্তিরই বিকার' (পৃঃ ১৮)। 'এ জগৎ ব্রহ্মের প্রাণ শক্তির বিকার', 'ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির বিকার' (পৃঃ ২৫) ইত্যাদি। এ সমুদয় স্থলে নানা ভাষায় বিকারবাদের কথাই বলা হইতেছে।

গ্রন্থকার বলিতে চাহেন ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন নাই—পরিবর্ত্তন হয় কেবল তাঁহার শক্তির। ব্রহ্মশক্তি কি ব্রহ্মসত্বাছাড়া? শক্তি কি ব্রহ্মনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারে? ব্রহ্মশক্তি যখন ব্রহ্মের অন্তর্গত, শক্তির সহিত যখন শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ তখন শক্তির বিকার স্বীকার করিলেই বলা হইল যে শক্তিমানেরও বিকার হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন।

উপনিষদের প্রকৃত মত কি এবং শঙ্কর সেই মত প্রকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না এস্থলে তাহা আলোচনা করা সম্ভব নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে যেমন ব্রহ্মকে আন্তর ও বাহ্যভেদ রহিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনি ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইচ্ছা, আলোচনা, ভয়, তপস্যা ইত্যাদিও আরোপ করা হইয়াছে। শঙ্কর নানা প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা এই সমুদয় স্থলের প্রকৃত অর্থ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা শঙ্করের এ উদ্যমকে প্রশংসা করিতে পারি না। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে উপনিষদের সমুদয় স্থলেই যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে তাহা নহে। সমুদয় উপনিষদ্ একব্যক্তির রচনা নহে এবং এমন অনেক উপনিষদ্ আছে যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির রচনা। কোন কোন অংশ যাগযজ্ঞ বিষয়ক এবং কোন অংশ বা পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পূর্ণ। এ সমুদয় অংশের মতামত লইয়া উপনিষদের বিচার করা উচিত নহে। দেখিতে হইবে উপনিষদের গতি কোন দিকে। যদি সত্যানুরাগী হইয়া উপনিষদ্ অধ্যয়ন করা যায়—তাহা হইলে বুঝা যাইবে অদ্বৈতবাদই

ঋষিগণের লক্ষ্য এবং এই অদ্বৈতবাদ মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এবং জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সমুদয় স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন—শঙ্কর অনেক স্থলে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পরিণামবাদ ইত্যাদি মত নাই তাহা নহে।

জীবাত্মা।

আমরা ভাষায় 'জীবাত্মা' 'পরমাত্মা' উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু উপনিষদে কেবল আত্মা শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই ঋষিগণ কেবল একটী আত্মারই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তত্ত্বমসি (ছান্দোগ্য ৬), অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহঃ ১।৪।১০), অয়মাত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুঃ ১), সোঽহম্ (ঈশ ১৬) ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে। তবে সে একত্ব কি প্রকার সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কোন ঋষি বলেন জীব ব্রহ্মের অংশ (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২০); কাহারও মতে জীব ব্রহ্মের বিকার (১।৪।২১) এবং কাশকৃৎস্ন ঋষির মতে অবিকৃত পরব্রহ্মই জীব (১।৪।২২)। ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতই সমর্থন করিয়াছেন। উপনিষদের শঙ্কর ভাষ্যেও এই মত গৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদিগের মতে যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা এবং যিনি পরমাত্মা তিনিই জীবাত্মা। বৈদান্তিকদিগের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না কেন জীবাত্মা যে পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু শঙ্কর শিষ্য কোকিলেশ্বর বাবু দুই একটী স্থলে এই সৃষ্টিবাদই প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন 'জীব-চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত' (পৃঃ ২৬১)। এই জগৎ এবং জীব সেই সৎস্বরূপেরই শক্তি সম্ভূত (পৃঃ ২৪)। জীবাত্মার জ্ঞান বিষয়েও ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন।

"প্রাণ শক্তিই ঘনীভূত হইয়া দেহের অবয়ব ও ইন্দ্রিয়গোলকগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে; সেই আশ্রয়েই প্রাণশক্তি দর্শন শ্রবণাদি বিবিধ ক্রিয়া করিতেছে। অতএব জীবের জ্ঞানশক্তিকে প্রাণশক্তিরই শেষ অভিব্যক্তি বলা যায়"। (পৃঃ ১৭)। গ্রন্থকারের মতে প্রাণশক্তি = force = জড়শক্তি (পৃঃ ৯, ১০)। গ্রন্থের অন্যস্থলে বলা হইয়াছে যে 'জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানোপলব্ধির দ্বার' (পৃ ১১৭)। সিদ্ধান্ত অতি অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইল—জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ আবার এই জ্ঞানশক্তি জড়শক্তিরই রূপান্তর সুতরাং আত্মার স্বরূপ জড়শক্তিরই পরিণাম। বলা বাহুল্য এ মত উপনিষদ্ ও শঙ্কর-ভাষ্য উভয়েরই বিরোধী।

ইন্দ্রিয়।

গ্রন্থকার বলেন "সেই ব্রহ্মেরই জ্ঞান—এই বিশ্বে শব্দ স্পর্শাদির আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি এই অভিব্যক্তির দ্বার মাত্র—সেই বিকাশের উপায় মাত্র। এই প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াদির আকার ধারণ না করিলে—বিষয়াকারে দেখা না দিলে—আমরা ব্রহ্মের স্বরূপই জানিতাম না, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের কোন পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইতাম না" (পৃঃ ১৩২)।

গ্রন্থের অন্যস্থলে লিখিত আছে যে "অজ্ঞানতা বশতই আত্মার সংসার-দশা কল্পিত হইয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে আত্মা অসংসারী। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান এবং আকাশের মলিনতা যেমন ভ্রম মাত্র—সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়কল্পিত শব্দ-স্পর্শ-সুখদুঃখাদির অনুভূতিও অজ্ঞানতাবিজৃম্ভিত। ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাবই এই যে উহারা ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে।" (পৃঃ ১১৩)।

কি আত্মবিরোধ! একস্থলে বলা হইল ইন্দ্রিয় না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যাইত না অপর স্থলে উক্ত হইল যে ইন্দ্রিয়সমূহ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃত কথা এই শেষোক্ত মতটাই শঙ্করের এবং প্রথম মতটাকে শঙ্করের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে।

জগৎ।

আমরা যে এই জগৎ দেখিতেছি ইহা কি? শঙ্কর দর্শনে এ জগতের স্থান নাই।

প্রথমতঃ—ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সুতরাং জগৎনামে কোন বস্তু থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—এ জগৎকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে না কারণ এ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ও নানাত্বে পূর্ণ কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় এবং ভেদরহিত।

তৃতীয়তঃ—এ জগৎ ব্রহ্মের অংশও হইতে পারে না কারণ ব্রহ্ম অখণ্ড এবং অনন্ত। জগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মে ভেদও স্বীকার করা হয়।

চতুর্থতঃ—জগৎ ব্রহ্মশক্তির বিকাশ বা বিকার—একথাও বলা যায় না। যেখানে শক্তি সেই খানেই পরিবর্ত্তন। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি আরোপ করা যাইতে পারে না। আর যেখানে শক্তিই নাই সেখানে শক্তির বিকাশ হইবে কি প্রকারে?

পঞ্চমতঃ—এ জগৎ ব্রহ্মের বিকার ইহাও স্বীকার করা যায় না কারণ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় সত্বা।

তবে এ জগৎ কি? শঙ্কর এখানে বিবর্ত্তবাদী। তিনি বলেন এ জগৎ ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং এজগৎ দেখিয়া কখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও একস্থলে বলিয়াছেন সংসারদশা অজ্ঞানতাবিজৃম্ভিত; ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাবই এই যে উহারা ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। তিনি আরও বলেন রজ্জুর অবয়বে যেমন সর্পের আকার বলিয়া বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মে মনুষ্য বুদ্ধিকল্পিত বিশ্বের রূপ অনুভূত হয় (পৃঃ ১৬)। "সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞান স্বরূপ একমাত্র সৎ ব্রহ্ম বস্তু। তাহাই একমাত্র সত্য; আর সমুদয় বিকার বলিয়া মিথ্যা (পৃঃ ৫৭)।

কিন্তু গ্রন্থকার এখানেও শঙ্কর ও উপনিষদের নামে নিজের মত চালাইতে ভুলেন নাই। তিনি বলিতেছেন:—

"পদার্থ মাত্রই সেই ব্রহ্মশক্তির বিকাশ—ব্রহ্মেরই দ্যোতক, সুখ-দুঃখাদি ব্রহ্মানন্দেরই অভিব্যক্তি। এ বিশ্বসংসার তাহারই স্বরূপের পরিচয় দিয়া চলিতেছে।" (পৃঃ ৩১৬)। "যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা বুঝেন যে, সেই অনন্ত শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য এই স্থূল ব্রহ্মাকারে অভিব্যক্ত। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই রূপ তাঁহারই অভিব্যক্তি" (পৃঃ ১৫০)। "এই জগৎ ও জীব সেই ব্রহ্মশক্তিরই শক্তিসম্ভূত বলিয়া উহারাও সত্য পদার্থ—মিথ্যা বা অলীক নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বস্তুতঃ নামরূপগুলি সত্য ও নিত্য" (পৃঃ ২৪)।

এজগৎ ব্রহ্মের বিকার, ব্রহ্মচৈতন্যের বিকার, ব্রহ্মশক্তির বিকার নাম ও রূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপ ইত্যাদি অনেক কথাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য এ সমুদয় মতই শঙ্কর মত বিরোধী। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কারণে জগৎকে একস্থলে সত্য বলিয়াছেন ঠিক সেই কারণেই অন্য স্থলে মিথ্যা বলিয়াছেন। মূল কথা গ্রন্থকারের মনের ভাব এজগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ সুতরাং সত্য কিন্তু শঙ্করের মতে সায় দিতে গিয়া বলিতে হইয়াছে এজগৎ অজ্ঞানতাবিজৃম্ভিত সুতরাং মিথ্যা।

মুক্তি।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন পুরুষ মুক্তিলাভ করিলে যতদিন সংসারে থাকিবেন ততদিন কোন প্রকার আচরণ করিতে

হয় না এবং মৃত্যুর পরও তিনি লীন হইয়া যান। কিন্তু উপনিষদের এবং ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মত সেরূপ নহে।" (পৃঃ ১১৩,১১৪)।

নিজ মত সমর্থন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার শঙ্করভাষ্যের বিকৃত ও বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একস্থলে সাধক বলিতেছেন:—"আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্নাদ (অন্ন-ভোক্তা), আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ ইত্যাদি।" ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে এ প্রকার ভাব ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু ইহা পরমার্থ বস্তু নহে (ন পরমার্থ বস্তু)। শঙ্কর আরও বলেন, ইহা অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ (ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যং সর্বভাবস্তু স্তুত্যর্থ মুচ্যতে)। অর্থবাদের কথাটা গোপন রাখিয়া ইহার পূর্ব্ব ও পর হইতে গ্রন্থকার ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেটুকুরও প্রকৃত ব্যাখ্যা করা হয় নাই। 'আমি অন্ন'—'আমি অন্নাদ' ইত্যাদি প্রকৃত অদ্বৈতবাদের কথা নহে কারণ এ অবস্থায় 'আমি,' 'অন্ন,' 'অন্ন ভোজন' ইত্যাদি ভেদজ্ঞান রহিয়াছে। ইহাকে সবিকল্পক অবস্থা বলা যাইতে পারে কিন্তু শঙ্করের মতে নির্ব্বিকল্পক অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে মোক্ষ বিষয়ে আমরা যে আদর্শ পাইয়াছি বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "যতক্ষণ দ্বৈত এইরূপ ভ্রম থাকে, তখন এক অপরকে দেখে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে এবং অবগত হয় কিন্তু যখন 'সবই আত্মা' এই জ্ঞান হয় তখন কিরূপে কে কাহাকে দর্শন করিবে, আঘ্রাণ করিবে আস্বাদন করিবে, অভিবাদন করিবে, শ্রবণ করিবে মনন করিবে, স্পর্শ করিবে ও অবগত হইবে?" (বৃহঃ ২।৪)। মোক্ষ অবস্থা সমুদয় ভেদের অতীত। ইহার প্রমাণ সুষুপ্তি। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (ছান্দোঃ ৬।৮।১)। এই অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ কোন পার্থক্য থাকে না। "প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক সম্পরিষ্বক্ত হইলে পুরুষ অন্তর এবং বাহ্য কিছুই জানিতে পারেন না, এই অবস্থায় পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেবগণ অদেব, বেদসমূহ অবেদ হয়েন; ইত্যাদি (বৃহঃ ৪।৩।২১,২২)।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন মুক্তিলাভ করিলেও "জগতের মঙ্গলার্থ কর্ম্ম করা যাইতে পারে" (পৃঃ ২২৮)। অসম্ভব! যে অবস্থায় অন্তর ও বাহ্য কোন জ্ঞানই থকে না—সে সময়ে কে কাহার জন্য কিরূপে কোন কার্য্য করিবে? এ অবস্থা বিধিব্যবস্থার অবস্থা নহে, ইহা সম্ভব অসম্ভবের কথা। আর উপনিষদ্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি কেন সাধু কর্ম্ম করি নাই, আমি কেন পাপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা তাহাকে সন্তপ্ত করে না। (তৈত্তিঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী)।

মৃত্যুর পর আত্মা যে পরব্রহ্মে বিলীন হয় তাহাও উপনিষদের মত।

যেমন প্রবহমান নদী সমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃশ্য হয় সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষে প্রবেশ করেন। (মুণ্ডঃ ৩।২।৮)।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন "মৃত্যুর পর আত্মা বিলীন হয় এবং তাহার আর সংজ্ঞা থাকে না। বৃহঃ ৪।১৫।১৩।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিদ্যারত্ন মহাশয় মুক্তি বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন শঙ্করভাষ্যে এবং উপনিষদে তাহা সমর্থিত হয় নাই।

আমাদের সমালোচনা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল—এই খানেই উপসংহার করা কর্ত্তব্য। তবে একটী মন্তব্য প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। কোকিলেশ্বর বাবু ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ বিষয়ে নিজে যে সমুদয় মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার অধিকাংশ মতের সহিতই আমাদের সহানুভূতি আছে। এজগৎ ব্রহ্মেরই ইচ্ছা, ব্রহ্মেরই শক্তি—এজগতে তাঁহারই জ্ঞান প্রীতি ও সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্যক্রিয়াশীল আর আর মুক্তপুরুষ কর্ম্মের অতীত হইবে ইহা কি কাজের কথা? এ সমুদয় বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতভেদ নাই। তিনি যদি এই সমুদয় মতকে নিজের মত বলিয়া প্রচার করিতেন আমরা অত্যন্ত সুখী হইতাম। তিনি উপনিষদ্ ও শঙ্করের নামে এই সমুদয় প্রচার করিতেছেন বলিয়াই সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

ব্যাধি ও প্রতিকার।

শ্রাবণের প্রবাসীতে রবি বাবুর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া যে কয়টা কথা মনে হইল, তাহাই লিখিতেছি। বলা বাহুল্য যে প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে।

দুবৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবি বাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ কর।

আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যে টুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই রবি বাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন; এবং বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পুর্ব্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঐ কথা আমাদের কাণে প্রবেশ করাইতেছিল। অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক্কা পাইয়া বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ প্রায় একবাক্যে কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল, না আমরা আর ইংরেজের কাছে ঘেঁষিব না, উহাদের ছায়া স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিব না। আমরা এখন বুঝিলাম, যে ইংরেজ তোমাদের কেহ নয়; কেহ ভাবিলেন ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া বরং কিছু আদায় হইতে পারে; অন্যে বলিলেন, ভয় দেখানর প্রয়োজন নাই, যে টুকু পার, নিজে কর, ইংরেজের নিকট কাঙালের মত হাত পাতিও না। এইরূপে একরকমেরই কথা আমরা

পাঁচ জনে পাঁচ রকমে ঘোরাইয়া সাজাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল আস্ফালন বেশী, কাহার ছিল ডিপ্লোমাসি বেশী। আমরা দলবাঁধিয়া "স্বদেশী" হইয়া পড়িলাম। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে আমাদের সমুদয় চেষ্টা ছিল ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অভিমুখে, পরে চেষ্টা দাঁড়াইল পরাঙ্মুখে।

স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্র নাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিস্ফল ও অনাবশ্যক আস্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

উত্তেজনার বশে আমরা দুইবৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজরাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্য্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিস্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি লাফালাফির কর্ম্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।

কাজ করিতে হইবে—এই কথাটা নূতন নহে। আমাদের আস্ফালনের ও চীৎকারের মাত্রা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখনও এক দল—যাঁহারা বিজ্ঞের দল বলিয়া পরিচিত তাঁহারা কেবলই বলিতেছিলেন—চীৎকার ছাড়, কাজ কর। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারাও "কাজ কর" "কাজ কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া কেবল চীৎকারের পরিমাণই বাড়াইতেছিলেন; উপদেশের পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্বয়ং কিঞ্চিৎ কাজ করিলে আমরা একটা কর্ত্তব্যের আদর্শ দেখিতে পাইতাম, দেশও উপকৃত হইত।

এ পক্ষ হইতে বলা হইতেছিল, কেন আমরা কি কেবলই চেঁচাইতেছি? কাজ কি কিছুই করিতেছি না? শ্রাবণের প্রবাসীরই "কৃষি শিল্প বাণিজ্য" প্রবন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, আমরা এক বৎসরে ভারতে আমদানি কাপড়ের মূল্য ৩৯ কোটি টাকা হইতে ৩৭ কোটি টাকায় নামাইয়াছি, ইহা কি কাজ নহে? আর এই যে বঙ্গলক্ষ্মী মিল, শিক্ষা-পরিষৎ, টেক্নিকাল ইনষ্টিটুট্, ইত্যাদি, এ সকল কি কাজ নহে? দুই বৎসরের চেষ্টার পক্ষে ইহা কি একবারেই নগণ্য? রবীন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই এ সকলকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন না; বরং উহাদিগকে গণ্য করিয়াই আরও একটু ভিতরে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, কেবল বড় বড় কাজ কেন, আরও ছোট ছোট কাজ আমাদের অনেক আছে; যে যেমন ব্যক্তি, সে তেমনই ভাবে আপনার ক্ষমতার অনুযায়ী কাজ হাতে লইয়া লাগিয়া যাও; দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা, কৃষি, শিল্প, অন্নদান, বিচার, ইত্যাদি সহস্র ছোট বড় কাজ আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে, উহাতে যে যেমনে পার, লাগিয়া যাও। অর্থাৎ গতবৎসর পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য কেমন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, সেইরূপ কাজ—শিল্প-শিক্ষা-সভা যেমন চাঁদা তুলিয়া ছাত্রদিগকে বিদেশে পাঠাইতেছেন, তেমনি কাজ,—নিম্ন শিক্ষা ও মধ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেমন বঙ্গের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে সেইরূপ কাজ,—জেলায় জেলায় কন্ফারেন্স বসিয়া যে সকল কাজের জন্য রেজোলউশন করা হইতেছে, রেজোলিউশনের পরিবর্ত্তে সেই সকল কাজ,—স্বদেশী ভলন্টীয়ারেরা শান্তিরক্ষা ও স্বদেশীপ্রচারের জন্য যেমন হাটে মাঠে ঘুরিতেছেন, মাথার পাগড়ি ও হাতের লাঠি কতকটা সংবরণ করিয়া সেইরূপ কাজ—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজের জন্য সর্ব্বসাধারণকে ডাকিতেছেন কিন্তু সাড়া পাইতেছেন না, সেইরূপ কাজ—এই ধরণের এবং আরও নানান্ ধরণের কাজ আমাদিগকে হাতে লইতে হইবে। এবং এইরূপ কাজ হাতে লইয়া তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিলে গায়ের বল বাড়িবে, নিজের আভ্যন্তরিক শক্তির সহিত সবিশেষ পরিচয় ঘটিবে এবং দেশের লোকের সহিত কর্ম্মসূত্রের অথবা কর্ম্মরজ্জুর বন্ধনযোগে "স্বদেশ" নামক কাল্পনিক বস্তুটার কাল্পনিকত্ব ঘুচিবে এবং স্বদেশের সহিত মর্ম্মগত সম্বন্ধ ও তৎসহকারে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অনুরাগ স্থাপিত হইবে। দল পাকাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে, ভাল; দল পাকাইতে না পার, আপনার চেষ্টায় যে যা পার হাতে

লও; তাহাতেই স্বদেশের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, স্বদেশকে অন্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয় ভাবে চিনিতে পারিবে, স্বজাতি একটা জীবন্ত রক্তমাংসে গঠিত পদার্থ বলিয়া জানিতে পারিবে। রবিবাবুর উপদেশের তাৎপর্য্য আমি ইহাই বুঝিয়াছি।

আরও বুঝিয়াছি যে রবি বাবু কেবল 'কাজ কর' 'কাজ কর' বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন না, বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার দুই একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।

আজ রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিতেছেন, বহুবৎসর হইল মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঠিক সেইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি ও সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন, তিনি কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় এই উপদেশ স্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। ইংরেজকে তিনি বেশ করিয়া চিনিতেন—রবি বাবুও যেমন চেনেন তিনিও তেমনি চিনিতেন—তবে তাঁহার ভাষায় সেরূপ তীব্রতা, বা উত্তেজনা ছিল না, তিনি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া রোগীকে নাচাইতেন না—কিন্তু তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আমাদের কোন্ পথে চলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে বন্দনা করিতে বলিয়াছেন, ভূদেবও সেই মাকেই আমাদের আরাধ্যা স্বরূপে দেখিয়াছেন—এবং বলিয়াছেন—শক্তি সঞ্চয় ভিন্ন আমরা সেই জননীর পূজায় সফল হইব না। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে—"আমাদিগকে কূর্ম্মনীতি অবলম্বন করিতে হইবে"—যতদিন আমরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ততদিন আমাদের পিঠ কাছিমের খোলার মত শক্ত করিয়া সেই খোলার আড়ালে লুকাইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। শক্তি জন্মাইবার পূর্ব্বে গলা বাড়াইয়া দাঁত দেখাইলে মরণ ধ্রুব।

প্রবাসীর প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর উপদেশকে আমি ভূদেব বাবুর সেই পুরাতন উপদেশ হইতে অভিন্ন মনে করি; এবং অস্বাভাবিক আস্ফালনে বলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এই পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত নহি।

গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব বটে, কিন্তু সেই পথেও কাঁটা আছে, কি না ভাবিবার বিষয়। বাস্তবিকই আমরা সেই পথেও বিনা বাধায় চলিতে পাইব কি না, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

যাঁহারা বলেন, রাজনীতির চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যান্য উপায়ে স্বহস্তে স্বদেশের হিতকর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁহাদের উপদেশও বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ অনেকেই বলিতেছেন, 'স্বদেশীকে' রাজনীতির-সহিত জড়ান একবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের 'অনেষ্ট স্বদেশী' থাকাই কর্ত্তব্য। এই শেষ কথাটা আমি একেবারেই বুঝিতে পারি না। দেশের শিল্পের উন্নতিই 'অনেষ্ট স্বদেশীর' একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন আমাদের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, আমরা যে পরিমাণে নিজের তৈয়ারি জিনিস ব্যবহার করিব বিলাতের তৈয়ারি জিনিসের আমদানি ঠিক্ সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তখন এই 'অনেষ্ট স্বদেশীই' বা কিরূপে মাথা তুলিবে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পীর কোষে অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মজুরেরা অন্নাভাবে মনিবের জানালা ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের শাসননীতি নিদ্রামগ্ন হইয়া নাক ডাকাইবে, ইহা কি বিশ্বাস্য? যতদিন ইংরাজের বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে, ততদিন অনেষ্ট স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু? বলা বাহুল্য, বাইবেলের ইংলণ্ডীয় রাজসংস্করণমধ্যে বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে বেয়নেট ধরিতে কোথাও নিষেধ নাই।

শুধু শিল্পবাণিজ্য কেন, আজ যদি ইংরেজ বলেন, তোমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে রাজভক্তি শিখাইবার সম্যক ব্যবস্থা নাই, উহা উঠাইয়া দেওয়া হউক; তখন এক অর্ডিনান্সের ধাক্কায় কলিকাতার শিক্ষাপরিষৎ ও টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটুট্ হইতে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পর্য্যন্ত সমস্তই লীলাসংবরণে বাধ্য হইবে। আর যাঁহারা আজ কাল জাহাজে চাপিয়া জাপান মার্কিন প্রভৃতি মুলুকে শিল্প শিক্ষা করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা যে জাহাজে চাপেন, স্বদেশী কোম্পানি সে জাহাজের পরিচালক নহেন, তাহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য; বিদেশে যাইয়া এদেশের ছেলেরা নীতিভ্রষ্ট

হইতেছে, এই হেতুবাদে বিংশশতাব্দীর শাস্ত্রেও যে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা কে বলিবে? ফলে চীৎকার না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক্ কথা; কিন্তু কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি? এবং এখনও যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবে কি?

যাঁহারা বলেন, আমরা কেবল চীৎকারেই পটু, কাজ করিতে আমাদের কোন পুরুষেই জানে না, তাঁহাদের কথা বিচার্য্য। দেড়শত বৎসর আগে যখন উমিচাঁদের দলীলে ক্লাইবের শ্রীহস্ত পড়ে নাই, তখন এদেশের কাজ কে করিত? তখন কি এদেশে কোন কাজ হইত না? সকলেই যোগে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিত? হিন্দু মুসলমানের দেশ তখন ত হিন্দু মুসলমানেই চালাইয়াছে। এবং বলা বাহুল্য, রাজার কর্ত্তব্য তখন অতি অল্পই ছিল, দেশের প্রায় যাবতীয় কাজ দেশের লোকেই চালাইত। রাজা ও রাজপুরুষেরা অতি অল্প কাজই করিতেন; তাঁহারা পরের সহিত লড়াই করিতেন, বাহিরে শত্রু না থাকিলে পরস্পর ঝগড়া করিয়া সময় কাটাইতেন, ছোট বড় বিদ্রোহ দমন করিতেন, ফৌজদার ও কাজি রাখিয়া শান্তিরক্ষা ও বিচার আচার কিছু কিছু চালাইতেন; রাজার দরবারে যে অর্থী প্রবেশ লাভ করিত, তাহার প্রার্থনা শুনিতেন, এবং মাঝে মিশালে বড় বড় রাজপথ বাঁধিয়া দিতেন বা তাহার আশে পাশে সরাই খুলিয়া, পুকুর কাটাইয়া, গাছ লাগাইয়া পথিকের উপকার করিতেন। কখনও বা নিষ্কর জমি পুরস্কার দিয়া গুণীলোকের ও পণ্ডিতলোকের সম্মান করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের ও বিদ্যাচর্চ্চার ও গুণগরিমার সাহায্য করিতেন। আর দেশের বাকি সমুদয় কাজ ত দেশের লোকেই চালাইত। দেশের জমিদারেরা ছোট খাট রাজার মত শান্তিরক্ষা বিচার আচার, বিদ্যাচর্চ্চাদির ব্যবস্থা করিতেন; গৃহস্থ লোকে পুকুর কাটিয়া গাছ পুঁতিয়া সাধারণের উপকার করিত; ভট্টাচার্য্যেরা টোলে বসিয়া তাৎকালিক উচ্চশিক্ষার ও গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া নিম্নশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, কথকেরা ও যাত্রাওয়ালারা কাব্যামোদের সহিত নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিত। গাঁয়ের 'দশে' মিলিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিত, 'পঞ্চায়েত' মিলিয়া সামাজিক দুষ্কর্ম্মের দণ্ড দিয়া তাহার প্রতিবিধান করিত ইত্যাদি! আজ কাল যে সকল কাজ সরকারের হাতে অথবা সরকারের অধীন বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতির হাতে, সেকালে সেই সকল কাজ দেশের লোকেই সম্পাদন করিত। কেহ বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে, কেহ বা বাহবা লইবার জন্য করিত, কেহবা দায়ে পড়িয়া করিত। কিন্তু দেশের কাজ ত চলিয়া যাইত। আর আজ কাল যেমন সরকারের নিয়োজিত নানা দল আছে, তখনও এই সকল সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য নানা দল আপনা হতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া গ্রামের কাজ চালাইত, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের লোক আপন আপন সমাজ শাসন করিতেন, কামার, কুমার ছুতার প্রভৃতি শিল্পীর দলে আপন আপন 'জাতি' ব্যবসায়ের রক্ষার ব্যবস্থা করিত ও আপন আপন শিল্পী-সমাজের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করিত। এ সকল ত সর্ব্বজনপরিচিত কথা। হইতে পারে, এ কালের মত ঢাক ঢোল ছিল না, এত রিপোর্ট লেখালেখি হইত না, এত কালী কলম লালফিতার খরচ হইত না; হইতে পারে, এত শৃঙ্খলা ও এত শাসন ছিল না, এত বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত না; রেলওয়ে ছিল না, ডাকঘর ছিল না, এত আদালত ইস্কুল পুলিশ ইত্যাদি ছিল না। নাই বা থাকিল? একশ বৎসর আগে পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা রেলওয়ে ডাকঘর ছিল, কালী কলম লালফিতার এত খরচ ছিল? বরং লোকে কাণাকাণি করে, তখন এত দুর্ভিক্ষ ছিল না, ম্যালেরিয়া ছিল না, কলেরা ছিল না ইত্যাদি।

যাক্, এত বড় একটা বিশাল দেশের কাজকর্ম্ম স্তূপাকার করিলে বিশালই হয়, এবং সেই বিশাল কাজকর্ম্ম যত ছোট আকারেই হউক, সেকালে চলিয়া যাইত এবং রাজার সম্যক সাহায্য ব্যতীতও দেশটা বর্ত্তমান ছিল; দেশ জুড়িয়া এই জনসঙ্ঘও বর্ত্তমান ছিল। রাজশাসনের অভাবে বঙ্গদেশ বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায় নাই। বঙ্গদেশ ছিল বলিয়া ইংরেজ আজ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। পুরাতন চৌদ্দ পুরুষে কোন রকমে কায়ক্লেশে দেশটাকে এতদিন ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বলিয়াই ইংরেজ আজ এখানে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন।

যাহারা এতকাল ধরিয়া এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র

জনসঙ্ঘের যাবতীয় কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই অধস্তন পুরুষেরা এই কয়বৎসর মধ্যে কাজ করিবার শক্তি এক কালেই হারাইয়া বসিল, এ কিরূপ? এখন লোকে কাজ করিতে পারে না, কেবলই চীৎকার করে; যে কাজ করিতে বলে, সেও কেবল চীৎকারই বাড়ায়। ইংরেজ রাজত্বের আগে দেশের সমস্ত কাজ আমরাই চালাইতাম, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা আজ কাল কাজ করি না, ইংরেজ সরকারের হাতে কাজ করিবার অধিকার অর্পণ করিয়াছি, এবং তাঁহারা যে কাজটুকু আমাদের হাতে দিতেছেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধীন, অনুগত হইয়া সেই টুকুতেই তৃপ্ত থাকিতেছি। ভগবান্ আমাদিগকে কর্ম্মে অধিকার দিয়াছিলেন, ফলের অধিকার দেন নাই, আমরা কিন্তু কর্ম্মের অধিকারটা ইংরেজ রাজার হাতে দিয়াছি, এবং তাহার ফলে অধিকারী হইবার আশায় সন্তুষ্ট আছি। একালে যাহাকে Self Government বলে বা স্বায়ত্তশাসন বলে, তাহার অর্থ কি? আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অর্থ ইংরেজ রাজার আয়ত্ত শাসন। বড় জোর তাঁহার অনুমতি ও অনুগ্রহক্রমে তাহার অনুগত থাকিয়া যে শাসনক্ষমতাটুকু আমরা পাই, তাহাই আমাদের স্বায়ত্তশাসন। ইংরেজের স্থাপিত বা তাহার নিয়ন্ত্রিত ছোট বড় শাসন-যন্ত্র আমাদিগকে উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা দিতেছে, আমাদের শান্তিরক্ষা হইতে দুর্ভিক্ষে অন্নদান পর্য্যন্ত করিতেছে, আমাদের পথঘাট তৈয়ার করা হইতে নর্দ্দামা পরিষ্কার পর্য্যন্ত করিতেছে, আমাদের চিকিৎসা করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ আর কিছুদিন পরে আমাদের রন্ধনশালায় ও বাসরঘরে প্রবেশ লাভ করিবে। আমরা পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি, ও ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র হইয়া পড়িব। আমাদের সমুদয় কাজ রাজার হাতে দিয়া আমরা অতুল শান্তি ও চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছি, ইহা সত্য কথা; কিন্তু ইহা প্রতিরোধের উপায় কি?

ইহার উত্তর হইবে,—কেন তোমরা পরের হাতে এ সকল দিতেছ? ঐ সকল কাজ রাজার হাতে না দিয়া নিজের হাতে গ্রহণ কেন করিতেছ না? রবীন্দ্র বাবু বলিয়া আসিতেছেন, রাজার হাতে কাজের ভার দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কর্ম্মভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই রবীন্দ্র বাবুর উপদেশ এবং আজিকার স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত শিক্ষাই ইহাই। আমি এইখানে প্রশ্ন তুলিব, বাস্তবিকই আমরা কর্ম্মে অধিকার ইংরেজের হাতে আপনা হইতে তুলিয়া দিতেছি, না, ইংরেজ উহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়াই, আমাদের অনুমতির বা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই, আপনা হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন? আমি স্পষ্টই দেখিতেছি আমাদের 'মা বাপ' সরকার নিতান্তই আমাদের হিতচিকীর্ষা-প্রণোদিত হইয়া আমাদের হাত হইতে সকল কাজই ক্রমশঃ স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের ইচ্ছার বা অনুমতির কোন অপেক্ষাই করিতেছেন না। ইংরেজ শাসনের ইতিহাসই ইহাই। ইংরেজকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি সত্য, কিন্তু আমরা নিজে হইতে ইংরেজকে কোন কার্য্যভার দিই নাই, ইংরেজ নিজ হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা তাহাতে আপত্তি করি নাই, বা আপত্তি করিবার আমাদের কোন ক্ষমতাই দেখি নাই। যাঁহার হাতে এখন রাষ্ট্রশক্তি—বেয়নেট সমেত রাষ্ট্রশক্তি—নিহিত আছে তিনিই একে একে আমাদিগকে কর্ম্মে অব্যাহতি দিয়া স্বহস্তে সকল অধিকার গ্রাস করিতেছেন। আমরা কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিব? ইংরেজের এই হিতচিকীর্ষায় বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার আমাদের কোন শক্তি আছে কি?

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। সম্প্রতি একটা কথা উঠিয়াছে, গবর্মেণ্ট বিনা বেতনে দেশের মধ্যে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; এবং চাই কি দেশের যাবতীয় বালককে সেই শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবেন। গবর্মেণ্টের আজকাল আর্থিক অবস্থা সচ্ছল; বিনা বেতনে নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের পক্ষে অসাধ্য নহে; দেশশুদ্ধ বালককে শিক্ষা-গ্রহণে বাধ্য করা আপাততঃ সাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু কখনই যে হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। Free education ও compulsory educationএর প্রসঙ্গ শুনিয়াই আমাদের স্বদেশীদের মধ্যে অনেকে আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন; আমাদের মত ভুক্তভোগী, যাহারা সরকারি নিম্নশিক্ষার রস আস্বাদন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কিন্তু হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। যে শিশুদের স্কন্ধের উপর এই শিক্ষার ভার চাপিবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া

আমরা আকুল হইতেছি। সে কথা যাক্। গবর্মেণ্ট যদি আমাদের হিতার্থী হইয়া এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার শিশুকে সরকারের অধীন বা সরকারের অনুমোদিত পাঠশালায় প্রেরণে বাধ্য করেন, তাহা হইলে আমরা উহা ঠেকাইব কিরূপে? নিম্ন-শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট নূতন ট্যাক্স দেওয়া ব্যতীত আমাদের অন্য কার্য্য কি থাকিবে? সেদিনকার এক জেলা-কনফারেন্সে রেজেলিউশন হইয়াছে দেখিলাম, যে এই শিক্ষাবিধানে যেন দেশের লোকের কর্তৃত্ব থাকে। গবর্মেণ্ট দয়া করিয়া দেশের লোককে কিছু কর্তৃত্ব দিতে পারেন। কিন্তু এখনও উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার জন্য যাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্কুল কালেজ স্থাপনা ও পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদেরও আপনার স্থাপিত স্কুল কালেজের উপর কিছু কর্তৃত্ব না আছে এমন নহে। কিন্তু সে কর্তৃত্বের মূল্য কি? রিজলি সার্কুলারেই তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ। গবর্মেণ্টের বিনা অনুমতিতে বা অনুমোদনে যদি কেহ ছেলেদিগকে ক, খ, শিখাইবার জন্য পাঠশালা খুলিতে না পায়, তাহা হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি থাকিবে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য?

গবর্মেণ্টের সর্ব্বগ্রাসী শক্তি সহস্রবাহু প্রসারণ করিয়া নগরে গ্রামে গৃহকোণে সর্ব্বত্র যেখানে আমাদের যাহা কিছু স্বাধিকার ছিল, সমস্তই করতলগ্রস্ত করিতেছে ও করিতে থাকিবে, আমরা গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের অনুমোদিত প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের স্বাতন্ত্র্য পাইব মাত্র। ইহাই বর্ত্তমান কালের ভয়াবহ সত্য। কথা হইতেছে, এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বর্ত্তমান কালে আমাদের যে কোন কাজ নাই, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে; এখনও অনেক কাজ আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেখানে সরকারি হস্ত এখনও প্রসারিত হয় নাই। সে সকল কাজ আমরা এখনও কিছুদিন স্বাধীন ভাবে করিতে পারি। আর বাস্তবিকই আমরা কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়াও কিছুই যে করিতেছি না, এমনও নহে। দেশের বিদ্যালতায় দৃষ্টি করিলে এখনও বোধ হয় প্রতিপন্ন হইবে, যে গবর্মেণ্ট আমাদের বৃহৎ সমাজতন্ত্রের যতটুকু কাজ চালাইতেছেন, দেশের লোকের সমবেত শক্তি তার চেয়ে বহুগুণ কাজ চালাইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে যেরূপ ভাবে চৌকিদার, দফাদার ও পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্টের পাহারা বসিতে চলিল, তাহাতে এই কর্ম্মক্ষমতাটুকু আর কতদিন থাকিবে, তাহা চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস দারোগার সঙ্গে ইস্কুলের দারোগা যখন প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরের উপর প্রভুত্ব চালাইবে, তখন আমাদের কি গতি হইবে, তাহাই চিন্তনীয়। বলা বাহুল্য যে ভবিষ্যতের ভাবনায় আজি হইতে জড়ত্ব ও নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিতে আমি বলিতেছি না। কিন্তু যে প্রসঙ্গ আজ বিচারাধীন, তাহাতে ভবিষ্যতের ভাবনা একবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। আজ না হয়, আমাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে এবং আজিও আমরা তৎপর হইয়া কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া অনেক কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু দুই দিন পরে যখন গবর্মেণ্টের বৃত্তি ও প্রসাদের লোভে আমাদের স্বদেশীরাই প্রত্যেক কাজে আমাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবেন, ও তাঁহাদের পশ্চাতে পিউনিটিব পুলিস ও গুর্খা সৈন্য লাঠি ও সঙ্গীন উচাইয়া দাঁড়াইবে, তখন আমরা কি করিব? দয়াময় সরকার বাহাদুরের এই অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ আমরা থামাইব কিরূপে?

আমাদের ব্যাধি যাহা তাহা নির্ণীত হইয়াছে,—সকলে বুঝিতে না পারেন, অনেকেই বুঝিয়াছেন—কিন্তু প্রতিকারের উপায় এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বলিতে পারি না। এক এক সময় শেষ ভাবিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

আমার কিন্তু মনে হয়, যে সম্পূর্ণ হতাশ না হইলেও চলে। আমাদের নামে নানা অপবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের মধ্যে যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বজাতির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য কলম ধরেন, তিনিই স্বজাতির ভীরুতা, কাপুরুষতা, এবং চরিত্রহীনতার উল্লেখ করিয়া এক পশলা গালিবৃষ্টি করিয়া আরম্ভ করেন; যেন তাঁহারা স্বয়ং ঐ সকল দোষ হইতে একবারে বিমুক্ত। এই সকল নিষ্কলঙ্ক তারাপতির আলোক বিতরণ হইতে বিধাতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্য দেশের লোকের তুলনায় আমরা যে একবারেই হীন ও মনুষ্যত্বরহিত, ইহা স্বীকারে আমি কুণ্ঠিত। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, হিতকারিতা, এমন

কি স্বার্থত্যাগে, আমরা যে অন্য দেশের লোকের তুলনায় অধম, তাহারও নিঃসংশয় প্রমাণ আমি পাই নাই। পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, আত্মীয় বন্ধুর প্রতি, কুটুম্বের প্রতি, অতিথির প্রতি, মনুষ্যের প্রতি, কর্ত্তব্য সাধনে এদেশের লোক যে অন্যদেশের লোকের তুলনায় হীন, ইহা এখনও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মোটের উপর এদেশের লোকেরা ধর্ম্মবলে অন্য দেশের লোকের তুলনায় হীন, তাহাও স্বীকার করিতে পারিতেছি না। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তথাপি আমাদের এই দশা কেন ?

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি, আমাদের একটা গোঁড়ার জিনিসের অভাব আছে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, মনুষ্যসাধারণ এ সকলের প্রতিই আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে ও সেই কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা আছে ; কিন্তু আমাদের আপন আপন সঙ্কীর্ণ সমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ, সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া যে সমাজ বিস্তৃত, সেই সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। হুগলি জেলার লোক দিনাজপুরের লোককে কুটুম্ববোধে বা স্বজাতিবোধে (সবর্ণবোধে) বা স্বধর্ম্মীবোধে আদর সম্মান করিতে পারে, তাহার সহিত এরূপ কোন সম্পর্ক বা পরিচয় না থাকিলেও মনুষ্যবোধে তাহার সম্মান করিতে পারে ; কিন্তু স্বদেশীবোধে যে বিশেষ সম্মান ও বিশেষ সমবেদনা আবশ্যক, তাহা দেখাইতে জানে না। আমাদের সমাজের মধ্যে ছোট বড় নানা দল আছে ; প্রত্যেক দল আপন দলের স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে ; কিন্তু গোটা দেশব্যাপী জনসঙ্ঘের স্বার্থরক্ষার জন্য গোটা দেশব্যাপী কোন দল নাই। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেই এই কথা ; বৃহত্তর ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। রাজপুত রাজপুতের, শিখ শিখের, মরাঠা মরাঠার সহিত দল বাঁধিতে পারে ও অনেক সময় বাঁধিয়াছে। কিন্তু রাজপুত শিখ মরাঠা একীভূত হইয়া সাধারণ স্বার্থ মিলাইয়া ভারতব্যাপী দলের সৃষ্টি করে নাই, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া ভারতব্যাপী 'নেশন' উৎপন্ন হয় নাই। বাঙ্গালী গৃহস্থ পঞ্জাবী অতিথিকে সম্মান করিতে পারেন, পাঞ্জাবীর বিপদে সমবেদনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবীর প্রতিও যেমন পারেন, জর্ম্মান ফরাসী ইংরেজের প্রতিও সেইরূপই পারেন। পাঞ্জাবী মনুষ্য—এমন কি—তিনি হিন্দু—এই বলিয়া বাঙ্গালী মানুষ তাঁহার প্রতি সমবেদনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবী যে ভারতবাসী, অতএব বাঙ্গালীর নিকট আত্মীয়, এই জ্ঞানটুকু তাঁহার নাই। এইখানেই আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব রহিয়া গিয়াছে, এবং একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র রহিয়াছে ; এবং এই ছিদ্রেই প্রবেশ করিয়া পরে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে ও আমাদিগের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছে।

যে সকল ঐতিহাসিক কারণে আমাদের এই অভাবটুকু রহিয়া গিয়াছে, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম, এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই অভাব যে আছে, এবং উহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব, ইহা স্বীকার্য্য। ইংরেজ রাজপুরুষও ইহা জানেন ; তাঁহারাও কথায় কথায় বলেন, ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক নামমাত্র, ভারতবর্ষে নেশন নাই। এবং যত দিন ভারতবর্ষে নেশন না জন্মিবে, ততদিন তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে স্বেচ্ছাচার করিবেন ; তাহাতে আমরা বাধা দিতে পারিব না।

আমাদের বালকেরা আজ 'বন্দেমাতরম্' গাহিয়া রাজপুরুষের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণ এই মাতা কোন্ মাতা তাহা আদৌ জানে না। তাঁহাদের কর্ত্তব্য আপনার গৃহ, গ্রাম, গোত্র, কুল, জাতি (caste) ও ধর্ম্ম (religion) এই সকলের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ আছে, এবং এই সকল সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে আসিয়া একবারে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া অখণ্ড মানবের উপরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর একটা মাঝামাঝি ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের সীমা স্বদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সীমার সহিত অভিন্ন, সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসারিত ও বিশেষভাবে আবদ্ধ হয় নাই। ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের অধিকার, লোকই জানে না যে তাহারা ভারতবাসী।

আমাদের এই যে অভাব, ইহা চরিত্রগত অভাব নহে, ইহা জ্ঞানগত অভাব। আমাদের ঐ জ্ঞানটাই নাই। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই জ্ঞানটা বৈদেশিকের ইতিহাস ও বৈদেশিকের সাহিত্য হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এখনও জনসঙ্ঘ

মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই, জনসঙ্ঘ এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

শিক্ষিতসম্প্রদায় বিদেশ হইতে এই জ্ঞানটা সঞ্চয় করিয়া একটা ভারতব্যাপী নেশন তৈয়ারের জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের দেশব্যাপী শাসনের সহিত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও খবরের কাগজ এই বিষয়ে তাঁহাদের সহায় হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে দেশের মধ্যে কংগ্রেস প্রভৃতি নেশন নির্ম্মাণের যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যে কিছু চেষ্টা, তাঁহাদের আপনার সম্প্রদায়মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের প্রতি তাঁহারা করুণদৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রাণের বেদনা লইয়া প্রবেশ করেন নাই। বরং তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার উৎকট অভিমান তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতের স্পর্শ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে রাখিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাচাল শিক্ষিতসম্প্রদায় আপনাকে মূক অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের বিশ্বস্ত ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব কল্পনার কোন অধিকার তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত ছিল না। রাজপুরুষেরাও 'তাঁহাদিগকে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছেন। গাঁয়ের লোকেও সেই আপনি-মোড়লের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন খোঁজ খবর রাখিত না। অন্ততঃ সেই মোড়লদের ভাষা তাহাদের বোধগম্য ছিল না, তাঁহাদের ব্যবহার তাহাদের প্রীতিপ্রদ ছিল না, এবং তাঁহাদের সমবেদনার কোন সাক্ষাৎ পরিচয় এ পর্য্যন্ত তাহাদের বুদ্ধিগম্য ভাবে তাহারা পায় নাই। এক পুকুর জলের উপর এক ফোঁটা তেল যেমন ছড়াইয়া পড়িয়া ভাসিয়া বেড়ায় মাত্র, তাঁহারাও এই বিশাল জনসমুদ্রের উপরে নিঃসম্পর্কভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেন মাত্র।

বর্ত্তমান আন্দোলনের একটা শুভলক্ষণ এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মূক জনসঙ্ঘের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন, যে রাজদ্বারে মাথা না ভাঙিয়া এই জনসঙ্ঘের দুয়ারে গিয়া বসিতে হইবে। জনকতক শিক্ষিত লোকে বসিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারকে বয়কট করা চলিবে না, পাড়াগাঁয়ের চাষার হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাকে বিলাতী কাপড়ের অন্বেষণে নিষেধ করিতে হইবে। যাহা আমাদের বক্তব্য তাহা রাজাকে না জানাইয়া এই জনসঙ্ঘকে জানাইতে হইবে; যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা এই জনসঙ্ঘের প্রতি সম্পাদন করিতে হইবে। শিক্ষিতসম্প্রদায় এইটুকু বুঝিয়াছেন বলিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের যা একটু সফলতা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন ভাষায় কথা কহিতে হইয়াছে; যাহা জনসাধারণে বুঝিতে পারে; তাহাদিগকে এখন দুই একটা কাজ করিতে হইয়াছে, যাহাতে জনসাধারণ মনে করিতে পারে, ইঁহারা স্বর্গের দেবতা নহেন, আমাদেরই ঘরের লোক।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট যখন ঘোষণা করা হইল, আমরা গৃহস্থালীর জিনিষের জন্য ইংরেজ দোকানদারের দ্বারস্থ হইব না, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এই প্রতিজ্ঞা বুড়ামানুষের ছেলে খেলার মত উপহাস্য না হইয়া তাহার বেশী কিছু হইবে। কিন্তু দেশের প্রতি চাহিয়া দেশের লোককে ডাক দিবা মাত্র দেশের লোক এমন ভাবে সাড়া দিল, যাহা বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। দেশ হইতে তার পরে সাগরগর্জ্জনের মত যে জনকোলাহল উঠিয়াছিল, আজিকার অবসাদের দিনেও তাহা আমাদের কাণে বাজিতেছে এবং শীতল রক্তকে আবার একটু বেগে বহাইতেছে। আমাদের নেতৃবর্গ, তখন যাঁহারা জনমণ্ডলীকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পশ্চাতে হঠিয়াছেন; তাঁহাদের পরাঙ্মুখতা দেখিয়া জনসাধারণ খানিকটা কোলাহল করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে কিছু রাজনিগ্রহ সহ্য করিয়া এখন নীরব হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এই দুই বৎসরের ইতিহাসে সপ্রমাণ করিয়াছে, যে অনুরাগের সহিত ডাকিতে পারিলে দেশের জনমণ্ডলী সাড়া দিতে পারে। এবং যদিও বঙ্গমাতার কোলে বসিয়াও দেশের সন্তানমণ্ডলী মাকে কখনও দেখে নাই; তথাপি মায়ের নাম ধরিয়া ডাক দিলে তাহাদের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা বেগে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ অধ্যাপক সীলির ভাষায়, যদিও ভারতবর্ষে নেশন নাই, তথাপি এমন বীজ আছে যাহা হইতে নেশন জন্মিতে পারে। সেই বীজে যে প্রাণশক্তি নিহিত আছে, তাহা সুযোগ পাইলে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু অঙ্কুরিত করিতে হইলে সেই বীজে শ্রদ্ধার সহিত অবহিত হইয়া জলসেক করিতে হইবে। এই জলসেকের কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে। বীজ এখন আপনার অস্তিত্ব আপনি অবগত নহে। তাহার প্রাণ আছে, কিন্তু চেতনা নাই; যে চেতনা থাকিলে আপনার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, সে চেতনা নাই। বীজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ও বাড়াইতে হইবে; কালে সে চেতাইয়া উঠিবে ও জানিবে যে ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির আবাসভূমি; হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী পঞ্জাবী ধনী দরিদ্র সেই মহাজাতির অন্তর্গত; আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই বাঙ্গালী, আমিই পঞ্জাবী, আমিই সেই ভারতবাসী মহাজাতি।

বলা বাহুল্য সেই বীজটির প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে সহস্র বজ্র উদ্যত হইয়া আছে। সাবধানে সঙ্গোপনে সেই অল্পপ্রাণ বীজকে এখন রক্ষা করা আবশ্যক। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই বজ্র নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিষ্যতের ভরসা থাকিবে না। ইহারই নাম 'কূর্ম্মবৃত্তি' অবলম্বনে নীরবে বলসঞ্চয়—আস্থানিক ও অস্বাভাবিক আস্ফালনেও যেরূপ ইহার প্রাণহানির শঙ্কা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠার অভাব, অনুরাগের অভাব, যাহা বিজ্ঞের দল দেখাইতেছেন—সেই অভাবেও তাহা শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত নিরলস হইয়া সেই বীজে জলসেক করাই আমাদের প্রধান কাজ এবং যতদিন আমাদের কাজের পথ বন্ধ না হয়, ততদিন যে কাজটুকু আমাদের সাধ্য তাহার সম্পাদনেই সেই জলসেক হইবে, ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চাই কি, কাজের পথ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বীজ অঙ্কুরে পরিণত হইতে পারে, এবং অঙ্কুর একবার গজাইয়া উঠিলে তাহার ধ্বংস সাধন হয় ত প্রতিকূল শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্য হইবে না। কাজেই রবীন্দ্র বাবুর সহিত মানিয়া লইলাম, হাতের কাছে যাহার যে কাজ আছে, তাঁহাকে সেই কাজেই লাগিতে হইবে। ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে যাহা সাধ্য তাহা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

কিন্তু এই কাজ করিবে কে? দেশের লোক যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে ত উপদেশের কোন দরকারই হইত না। কিন্তু চোখের উপর দেখিতেছি দেশের লোক আপনার করায়ত্ত কাজ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত নহে। প্রস্তুত নহে বলিয়াই কাজ কর কাজ কর বলিয়া অবিরত চীৎকার করিতে হইতেছে, কিন্তু যে কাজে অলস, কাজের পরিশ্রম স্বীকারে যে অনিচ্ছুক, কাজে অনভ্যাসে যার কর্ম্মেন্দ্রিয় জড়ত্বগ্রস্ত, উপদেশের দ্বারা তাহাকে কাজে লাগান যায় না। ভবিষ্যতের অনিষ্টের আশঙ্কাও এরূপ অলসকে ও অক্ষমকে কর্ত্তব্যকাজে নিযুক্ত করিতে পারে না। এখানে উপদেশের বিশেষ কার্য্যকারিতা নাই। কর্ম্মে প্রেরক জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে, কর্ম্মে প্রেরণ করে ভাবে। ভাবের প্রবাহে মানুষ কর্ম্মে প্রেরিত হয়, ও অসাধ্য সাধনা করিয়া ফেলে। মনুষ্য জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৃহৎ জনসঙ্ঘে সময়ে অসময়ে যে ভাবের স্রোত বহিয়া যায়, তখন সেই স্রোতের বেগে বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া যায়, তখন মূক বাচাল হইয়া উঠে, পঙ্গু তখন গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়। যাহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, সহসা স্নায়বিক উত্তেজনা পাইয়া সেই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। জ্ঞানের অভাবে হয় ত কাজ পায় না, বুদ্ধির অভাবে হয় ত বিপথে প্রেরিত হয়, বিচার শক্তির অভাবে হয়ত উল্টা কাজ করিয়া বসে, কিন্তু ভাবের তাড়নায় কাজের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ভাবের তাড়নায় উত্তেজিত হইবার শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ থাকে না। যদি ভাবের উত্তেজনাও স্নায়ুযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে না পারে, যদি স্নায়বিক পক্ষাঘাতে শরীর অবশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিন্তু কোন আশাই থাকে না।

গত আন্দোলনে যে দেশের মধ্যে একটা ভাবের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। উহা হয় ত আন্দোলন মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অথবা কতকগুলা অকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে; নেতার অভাবে, বিচারশক্তির অভাবে, অভ্যাসের ও জ্ঞানের অভাবে, কি কাজ করিবে কোন্ কাজে হাত দিবে, তাহার ঠাহর পায় নাই। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর নির্জীব নহে। এবং ভাবের প্রবাহটা যখন বঙ্গদেশ হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত পরিধি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, ও ব্রিটিশসিংহও তাহার কেশ সামলাইতে না পারিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন ও দন্তবিকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন এই ভাবপ্রবাহকে কোন ভাবুকের ভাবুকামি বা বালচাপল্য

বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে ভারতবর্ষে 'নেশন' নাই বটে,—থাকিলে ভারতের প্রতি সাধু মলির ব্যবহার অন্যরূপ হইত—কিন্তু নেশনের বীজ আছে; যদি তাহা প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ রক্ষা করিয়া ভূমি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিবে।

কাজেই এই দুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্র বাবুও প্রস্তুত নহেন—কেন না এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে যে কয়জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘ মধ্যে ভাবের প্রবাহ পরিচালনার প্রধান অধিকার—সাহিত্যিকের। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নূতন নূতন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে,—সময় সময় তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে—বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তরণী ছাড়িয়া দিয়া আজ যদি তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিরপরাধ আরোহীদিগের উপর ষোল আনা না চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ করিবেন।

ফলে স্বদেশী আন্দোলনে আর কোন কাজ না হউক—কোন কাজই হয় নাই তাহা স্বীকার করিতেছি না—কোন বড় কাজ না হউক, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা আশা জাগাইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয় যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন প্রমাণ, কোন লক্ষণই ছিল না। এতদিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁহাদের শিক্ষালব্ধ জাতীয় ভাবের একটা অভিনয় করিতেন মাত্র; জনসঙ্ঘ কেবল অভিনয় দেখিত মাত্র, অথবা তাহাও দেখিত না। দেখিলেও এই অভিনয়ের সহিত তাহাদের যে কোন সম্পর্ক আছে, তাহা আদৌ জানিত না। এখন দেশব্যাপী জনসঙ্ঘ না হউক, সেই জনসঙ্ঘের কিয়দংশ সেই ভাবের প্রবাহে ডুব দিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা আঘাত অনুভব করিয়াছে, তাহাদের আত্মার মধ্যে একটা নবোদগত অপরিচিতপূর্ব্ব অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা পাইয়া আপনাতে নবমনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য বিহ্বলতার ও আত্মবিস্মৃতির আনন্দ আস্বাদন করিয়াছে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে আমরা একদিনের জন্য বিচার বিতর্ক পরিহার করিয়া যে উন্মাদনার জাহ্নবী প্রবাহে সাঁতার দিয়া লইয়াছি, তাহাতে আমাদের সারা জীবনের সঞ্চিত ক্লেদ অনেকটা ধুইয়া গিয়াছে; এবং ইহার ফল আমরা আজীবন ভোগ করিব। ভারতের ভাগ্যে বিধাতা যাহাই লিখুন, সেদিনকার, ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটা মাসের উপার্জ্জিত নূতন ভাবাবেগ আমাদের জীবনে একবারে নিষ্ফল হইবে না।

যাঁহারা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই মহাভাবের উচ্ছলিত প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিজ্ঞতার প্রশংসা করিব, কিন্তু তাঁহাদের আত্মপ্রবঞ্চনার ভাগ লইতে যাইব না।

মোটের উপর আমি বলিতে চাহি যে, পরের উপর কর্ম্মের ভার অর্পণ করায় অথবা পরে আমাদিগকে কর্ম্মভার হইতে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা যে কেবল কর্ম্মক্ষমতা ও কর্ম্মপটুতা হারাইয়াছি এমন নহে; আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক পেশীগুলিই যে কেবল জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন নহে, আমাদের স্নায়ুযন্ত্র পর্য্যন্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে ভাবের বৈদ্যুতী প্রয়োগে সেই পক্ষাঘাত দূর করা আবশ্যক; এবং ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, তখন আমরা একবারে ভরসা হারাই নাই। উত্তেজনাবলে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া থাকেন, আমরা বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে দল না বাঁধিলে ভারতব্যাপী নেশন গঠিত হইবে না, ইহা সকলেই বুঝেন; এবং ইংরেজও ইহা খুব ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়াই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ধূমাইতে দেখিয়া এতটা খুসী আছেন; মন্দ লোকে বলে, আগুনে কুলার বাতাস দিতেও তিনি ত্রুটী

করিতেছেন না। উভয়ের মিলনের পথে যে একটা স্বাভাবিক অন্তরায় আছে, তাহা বলাও বাহুল্যমাত্র। উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ও সাহজিক বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহাও অস্বীকার করি না। এবং যাহা বিদ্বেষ তাহা পাপ, ইহাও বলা বাহুল্য। হিন্দু বহু দেবতার পূজা করেন, এমন কি মাটির প্রতিমা পূজা করেন, ইহা মুসলমানের পক্ষে অসহ্য; এবং মুসলমান গোহত্যা করেন, ইহাও হিন্দুর পক্ষে অসহ্য। বিদ্বেষের মূল এই খানে; এবং এই মূল উৎপাটিত হইবার যখন কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না, তখন এই স্বাভাবিক বিদ্বেষ যে কোনও কালে যাইবে, তাহারও উপায় দেখি না।

"বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে এক আসনে হিন্দু মুসলমান বসে না, ঘরে মুসলমান আসিলে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, ইহার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়" ইত্যাদি যে কয়টি কারণের উল্লেখ রবিবাবুর প্রবন্ধ মধ্যে দেখিলাম, সে কারণ গুলিকে ততটা ভয়াবহ মনে করি না। হিন্দুর শাস্ত্রে এরূপ বিধান থাক আর নাই থাক, মুসলমানেরা ইহা জানেন যে, হিন্দু জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, উহা শাস্ত্রবিধানবৎই মানিয়া থাকেন। আজ কাল রাগের মাথায় হিন্দুর বিরুদ্ধে অছিলা খুজিতে গিয়া মুসলমানেরা যদি ঐ সকল কথার উল্লেখ করিয়াও থাকেন, তথাপি ইহা সত্য যে বহুকালের একত্র বাসে বাঙ্গলা দেশের মুসলমান হিন্দুর ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দুর ঐ ব্যবহার যে মুসলমানের প্রতি ঘৃণার ব্যঞ্জক নহে, কেবল হিন্দুর শাস্ত্রভক্তি বা লোকাচার ভক্তিরই ফল মাত্র, তাহাও মানিয়া লইয়াছেন। ঐ ব্যবহারের আমি কোনরূপ সমর্থন করিতেছি না, এবং ঐ ব্যবহারের মূলে যে ঘৃণা নাই, তাহাও বলিতেছি না। মূলে ঘৃণা থাকিলেও উহা এখন সামাজিক প্রথা বা convention মাত্রে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু যেমন পুঁতুল পূজা করে, সেইরূপ পান আহার উপবেশন প্রভৃতি বিষয়েও কতকগুলি অদ্ভুত নিয়মের বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করে,—মুসলমান সমাজ ইহা বহু বৎসরের একত্রবাসে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং একত্র সদ্ভাবে বাস করিতে হইলে এ বিষয়ে হিন্দুকে ক্ষমা করিয়া চলিতে হইবে, ইহাও মুসলমান সমাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমান সমাজ দেখিতেছেন ও জানেন, পানাহারাদি বিষয়ে এই সকল অদ্ভুত খুঁটিনাটি যে কেবল মুসলমানের প্রতি ব্যবহারেই আছে, তাহা নহে, হিন্দু সমাজের ভিতরে বিবিধ স্তরের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার মধ্যেও আছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে তিন টাকা বেতনের ব্রাহ্মণ দরোয়ান বা ব্রাহ্মণ পাচক তাহার শূদ্র মনিব লক্ষপতি হইলেও তাহার হস্তের অন্ন জল গ্রহণ করে না; এই ব্যবহারের মূলে লক্ষপতির পূর্ব্বপুরুষের প্রতি তাঁহার ভৃত্যের পূর্ব্বপুরুষের ঘৃণা বর্ত্তমান থাকিলেও এ কালে উহা আর ঘৃণার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় না; শূদ্র মনিব তাঁহার ব্রাহ্মণ চাকরের ঐ ব্যবহারকে কখনই বেয়াদবি বলিয়া গ্রহণ করেন না, উহা তিনি সহিয়া যাইতে শিখিয়াছেন। মুসলমান সমাজও সেইরূপ হিন্দুর এই ব্যবহার সহিয়া লইতে শিখিয়াছেন। শিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে এ পর্য্যন্ত হিন্দুর ঐ ব্যবহারে কোন মুসলমানকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায় নাই। হিন্দু মুসলমানে এককালে যতই কাটাকাটি মারামারি চলুক না; বহু শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা একগ্রামে পাশাপাশি বাস করিয়াছেন; হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব ও সামাজিক কুটম্বিতা যতদূর সম্ভব তাহাও চলিয়াছে; হিন্দুর ঘরে মুসলমান ও মুসলমানের ঘরে হিন্দু বিশ্বাসের সহিত চাকরি করিয়াছেন ও করিতেছেন; অথচ উভয়ের ধর্ম্মগত বা আচারগত ব্যবহার লইয়া উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদের কথা এত দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মের ও আচারের এরূপ পার্থক্য সত্বেও উভয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

অন্নপানাদিগত আচার দূরের কথা, হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষের যাহা মূলগত কারণ—একের পক্ষে প্রতিমা পূজা ও অন্যের পক্ষে গোহত্যা—এই মূলগত কারণ বর্ত্তমান থাকিতেও উভয় সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া একত্র সদ্ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে এই কারণে বিবাদ বিসংবাদ কি দাঙ্গা হাঙ্গামা না ঘটিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু এত বড় সমাজের মধ্যে উহা নগণ্য। ভারতবর্ষের হাওয়ার গুণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের এই মূলগত সাংঘাতিক কারণ সত্বেও পরস্পরকে ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের তপোবনে বাঘে হরিণে একত্র

সঞ্চরণ করিত। ভারতবর্ষের মাহাত্ম্যে হিন্দুর চোখে যিনি ম্লেচ্ছ, এবং মুসলমানের চোখে যিনি কাফের, তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া নির্ব্বিরোধে বাস করিতে শিখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই ইহাতে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সংযম হইতেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন।

মুসলমান যখন আরবের মরুভূমি হইতে অসিহস্তে ইসলাম প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ধরাতলে বিধর্মীর অস্তিত্ব অবশিষ্ট রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহাদের দুর্দ্দম প্রতাপে যে সকল রাজ্য ও সাম্রাজ্য তাঁহাদের করতলগত হইয়াছিল, তাহার কুত্রাপি তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের অবশেষ মাত্র রাখেন নাই। প্রবল প্রতাপ পারস্যসাম্রাজ্য সমস্ত এবং রোমসাম্রাজ্যের অধিকাংশই অচিরে তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল এবং আজি পর্য্যন্ত সেই বিশাল মহাদেশের মধ্যে ইসলামের সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য অব্যাহত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি বদলাইয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও তাঁহারা ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের কিয়দংশমাত্র অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন, সমুদয় ভারতবর্ষ ইসলামের অধিকৃত হইল না। ভারতবর্ষের বার আনার অধিকও হিন্দু থাকিয়া গেল। মুসলমান হিন্দুর পার্শ্বে বাস করিয়া ভারতবাসী হইলেন এবং ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে উৎকট বিদ্বেষের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও হিন্দুকে ক্ষমা করিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমান হিন্দুকে কেবল ক্ষমা করেন নাই, কেবল সহিয়া লন নাই, তিনি হিন্দুকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস বিশেষতঃ মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাস ইহার সাক্ষী। এই ক্ষমা ও শ্রদ্ধার বীজ তাঁহার ধর্ম্মের মূলমধ্যে বর্ত্তমান ছিল, নতুবা বাগদাদের খলিফাগণের রাজসভায় আমরা গ্রীক ও হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচিত হইতে দেখিতাম না। এইখানে গ্রীষ্টানে ও মুসলমানে আকাশ পাতাল ভেদ। গ্রীষ্টান রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব হাতে পাইবামাত্র গ্রীক জাতির অতুল্য প্রতিভার্জ্জিত বিদ্যাসম্পত্তিকে ধ্বংসমুখে প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিল; ক্ষুদ্র গ্রীস ও বৃহৎ গ্রীসের যেখানে যেখানে গ্রীক বিদ্যার আলোচনা হইত, সেই সমুদয় বিদ্যামন্দির ধ্বংস করিয়া ইউরোপ হইতে জ্ঞানের আলোক একবারে নিবাইয়া দিয়াছিল। আর মুসলমান তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের তিরোভাবের পর শত বৎসর যাইতে না যাইতে গ্রীষ্টানের নির্ম্মিত সমাধির অভ্যন্তর হইতে সেই প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া তাহাতে ইসলামের সোণার কাঠি ঠেকাইয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রীক বিদ্যাকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাই আজিকার গ্রীষ্টানেরা গ্রীক সভ্যতার ভিত্তির উপর আপন সভ্যতা গঠনের অবকাশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

ধর্ম্মগত ও আচারগত উৎকট পার্থক্য ও পরস্পর বিদ্বেষের হেতু বর্ত্তমান সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করিতে জানেন, এবং সেই জন্য ভারতবর্ষে উভয়ের প্রীতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে। ইংরেজ কথায় কথায় বড়াই করিয়া থাকেন, আমরা চলিয়া গেলেই ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাঁহাদের এ বড়াই আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না।

দক্ষিণদেশে হায়দ্রাবাদে নিজাম মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন আর উত্তরদেশে কাশ্মীরে জম্বুপতি মুখ্যতঃ মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন; কিন্তু কোথাও ত হিন্দু মুসলমানে ছুরি চালাচালি শুনিতে পাই না। ইংরেজের প্রভুশক্তি গ্রহণের পূর্ব্বে শত বৎসরের মধ্যে পঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোথাও হিন্দু মুসলমানের পরস্পর ছুরি চালাচালির কথা শুনি না; পঞ্জাবেও যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষ কারণে।

ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পরকে যেমন আপন করিতে জানে, তেমন পৃথিবীর আর কোন জাতি জানে না; অন্ততঃ কোন গ্রীষ্টান জাতি জানে না। হিন্দু মুসলমান ত এতকাল ধরিয়া একগ্রামে, এমন কি, এক ঘরের মধ্যে, এক ছাদের নীচে, বাস করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু গ্রীষ্টান কোথায় মুসলমানের সান্নিধ্য সহিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। হিস্পানি দেশে মুসলমান বিদ্যার এবং জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া গ্রীষ্টান ইউরোপের বর্ব্বরতার অন্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর গ্রীষ্টান সেই হিস্পানি দেশে লব্ধপ্রবেশ হইয়া কি অমানুষিক

অত্যাচার দ্বারা মুর জাতিকে আটলাণ্টিক পার করিয়া দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা বর্ণিত আছে। গ্রানাডা ও কর্ডোবার স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি হিস্পানি দেশ পাষাণ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু খ্রীষ্টানের রাজ্যমধ্যে মুরজাতির বংশধর কেহ বাস করে না—যাহারা আলহাম্ব্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যাহারা খ্রীষ্টানকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইয়াছিল, যাহারা রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, শিল্পকলা শিখাইয়াছিল, যাহারা অঙ্ক রাখিতে শিখাইয়াছিল, খ্রীষ্টানাধিকৃত ইউরোপের কোন অংশে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তুরুস্কের সুলতান আজিও রোমসাম্রাজ্যের রাজধানীতে সেণ্টসোফিয়ার গির্জার পাশে মসজিদ রক্ষা করিতেছেন বটে; কিন্তু তিনিও খ্রীষ্টান ইউরোপের দেহে কণ্টকমাত্র। খ্রীষ্টান ইউরোপে তাঁহার বসতি নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। তুরুস্ক সাম্রাজের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

মুসলমানের কথা দূরে যাক, যে ইহুদী জাতির নিকট খ্রীষ্টানেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রচারক পাইয়াছে, সেই ইহুদী জাতির প্রতিবেশিত্ব যাহারা সহ্য করিতে পারে নাই, তাহাদের মুখে ঐ সকল উদ্ধতবাক্য শোভা পায় না। খ্রীষ্টান-ইউরোপ স্বদেশচ্যুত ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত আশ্রয়-ভিখারি ইহুদীর উপর কিরূপ পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছে, ইহুদীর শোণিত-রঞ্জিত খ্রীষ্টান-ইউরোপের ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান রুশিয়ার রাজপথকে নিরীহ ইহুদীর রক্তস্রোতে কিরূপে কর্দ্দমাক্ত করিতেছে, তাহা আমরা দিনের পর দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া শিহরিতেছি; কিন্তু খ্রীষ্টান-ইউরোপের দয়াবৃত্তি তাহাতে উত্তেজিত হয় না। অলমতি বিস্তরেণ।

ফলে আজ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিদ্বেষের উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার তেমন কারণ দেখি না। মুসলমান যে কারণেই হউক ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া হিন্দুপ্রতিবাসী ও হিন্দুভ্রাতার মনে দারুণ ক্লেশ দিয়াছেন, কিন্তু কালে তাঁহারা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ করি না; এবং যে হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে এই বিপথে চালাইয়াছেন, সেই হৃষীকেশের চরণে প্রণিপাত করিয়া আপনার সাহজিক বুদ্ধির প্রেরণায় পুনরায় চলিবেন, ইহা স্বীকার করি। তিনি বুঝিবেন যে, হৃষীকেশ তাঁহারও নহেন, হিন্দুরও নহেন, হৃষীকেশ কেবল আপনারই। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে; বিশেষতঃ যে জাতি দুর্ব্বল দরিদ্র ও সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, তাহার বুদ্ধির উন্মেষ হইলেও তদনুসারে কর্ম্মসাধনে আরও বিলম্ব ঘটিতে পারে। কিন্তু "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী—" তন্মধ্যে মানবসমাজের জীবনেতিহাসের চক্র শত সহস্র বৎসর ধরিয়া আবর্ত্তন করিবে—হিন্দুর এই ক্ষণেকের জন্য অস্বাভাবিক আস্ফালন দেখিয়াও যেমন আমরা চিন্তিত নহি, মুসলমানের এই ক্ষণেকের জন্য মতিভ্রমেও আমরা চিন্তিত হইবার সম্যক্ হেতু দেখি না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

"ব্যাধি ও প্রতিকার।"

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে "ব্যাধি ও প্রতিকার" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য তাহা পাঠ করিয়া আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রে আমার "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে আমি হিন্দুমুসলমানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি শ্রীযুক্ত দেবকুমারের গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। অথচ সে সময়ে হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ উৎকট হইয়া উঠে নাই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন;—তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুখময়ের সুখস্বপ্ন—শ্রীমণিমোহন বসু প্রণীত। ক্ষুদ্র পুস্তিকা ৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য চারি আনা। এখানি একটি ব্যর্থ প্রেমিকের ১৬টি সন্দর্ভে পরিসমাপ্ত চিরপুরাতন একঘেয়ে দার্শনিক রকমের হা হুতাশ। ভাষার মধ্যেও 'মঙ্গলরূপী ঋপু' ও 'হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুত্ব মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে'।

অঞ্জলি—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত গীতিকাব্য, মূল্য ৷৷৹ আনা। ১০২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও সম্মিলনে চারি অংশে বিভক্ত। পুস্তিকাখানি কর্ণের মত কবি নবীনচন্দ্র দাসের প্রশংসা-কবচ আঁটিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের বাক্যবাণ ইহার বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকিয়া খান খান হইয়া ভূতলে পড়িলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, 'ভক্তি' পরিচ্ছেদের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়ার' কোন কোন কবিতার ক্ষীণ অনুবৃত্তি মাত্র। 'প্রীতি' অংশের ঈদ-সম্মিলন কবিতাটি মন্দ হয় নাই। 'প্রেম' অংশ নিতান্ত সাধারণ; 'সম্মিলনে'র মধ্যে কোন কোন কবিতা মন্দ হয় নাই। লেখকের কবিত্ব শক্তির

পরিচয় প্রত্যেক কবিতাতেই পাওয়া যায়, কেবল বিষয় নির্ব্বাচনের স্বতন্ত্রতা না থাকায় পুরাতন সুরের প্রতিধ্বনি মনে হয়।

বঙ্গসাহিত্যের একপৃষ্ঠা- শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা, ৬০ পৃষ্ঠা। এই পুস্তিকায় খ্যাত অখ্যাত বঙ্গকবির মধ্যে বলদেব পালিত, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমদাচরণ সেন, অধরলাল সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কাব্য-সমালোচনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার কোন কোন প্রবন্ধ পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে বিরল, অতএব সর্ব্বত্র সমাদৃত হওয়া উচিত। কবি দ্বারকানাথ গুপ্তের কবিতা সাধারণের অপরিচিত বলিলেও চলে; কিন্তু তাঁহার কবিতার যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অতিশয় সুন্দর। অল্প পরিসরে কবিদিগের যথার্থ যাহা কাব্যজীবন তাহার পরিচয় লেখক ভাল করিয়া দিতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইয়াছে শ্রেষ্ঠ কবি বিহারিলালের নিবন্ধটি। লেখক কবির পরিচয় অপেক্ষা মানুষের পরিচয়ই অধিক দিয়াছেন; অল্প পরিসরের মধ্যে কবিকে বুঝাইতে বংশ বর্ণনা ও জন্ম-তারিখে স্থান পূর্ণ না করিয়া কবির কবিত্ব বিশ্লেষণে সে স্থান পূর্ণ করিলে সদ্ব্যয় হইত।

ষোড়শী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ১৬টি গল্পের সমষ্টি। মূল্য ১॥০ টাকা, ৩০১ পৃষ্ঠা। সকল গল্পগুলিই প্রবাসী, ভারতী বা বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ইহার পুনঃ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু আমরা অনুরোধ না করিলেও যাহার হাতে পড়িবে, তাহাকে পুনর্ব্বার পাঠ করিতেই হইবে। প্রভাত বাবু ছোট গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত; প্রত্যেক গল্পের মধ্যে একটি সরস রসিকতা (যাহাকে ইংরাজিতে বলে humour) জাগাইয়া রাখার ক্ষমতা প্রভাত বাবুর নিতান্ত নিজস্ব। এই গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'প্রণয় পরিণাম,' 'বলবান জামাতা,' 'বাস্তু সাপ' প্রভৃতি গল্প কখন পুরাতন হইবার নহে।

অশোকা ও হাসি ও অশ্রু—শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত, মূল্য যথাক্রমে ১॥০ ও ১৲ টাকা। লেখিকা বঙ্গসাহিত্য সমাজে প্রখ্যাতা, তাঁহার এই দুই কবিতা পুস্তক বহুজন প্রশংসিত। এ পুস্তকদ্বয় নূতন করিয়া প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইঁহার কবিত্ব বহু পুরুষ কবিরও সাধনালভ্য। ইহা অনুকরণ নহে, হৃদয়ের ভাব ও উচ্ছ্বাস সকল সরস সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় বহু ইংরাজি কবিতার সরস সুন্দর অনুবাদে আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত বহু কবিতা পাঠ করিয়াছি।

ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী—তৃতীয় খণ্ড—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এই খণ্ডে ২৬টি নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং কোন প্রবন্ধ কোন স্থানে কবে রচিত ও কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি দীর্ঘ 'নির্ঘণ্ট' দেওয়া হইয়াছে। এবং 'বিশ্বপর্য্যটক শ্রীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের (যুবাকালে) অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার' আলোকচিত্রও এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও অপরিমার্জ্জিত ভাষার শিথিলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভাঁড়ামিই humour নহে, গালি দেওয়াই wit নহে এবং নিন্দাই সংশোধনের একমাত্র পন্থা নহে, ইহা যে আমরা মনে রাখি না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কোন কোন প্রবন্ধ অবান্তর কথার বাচালতা মাত্র, যথা এক পেয়ালা মদ, জুতা আর গুঁতা, রোঁয়া ছেঁড়া পণ্ডিত ইত্যাদি।

কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—শ্রীসরোজকুমারী দেবী বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা, ৩১৬ পৃষ্ঠা। গল্পগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথম পাঁচটি গল্প যাহার উপজীব্য অনুরাগ (post-nuptial love) এবং শেষের ছয়টি গল্প যাহার উপজীব্য পূর্ব্বরাগ (ante-nuptial love) অনুরাগের চিত্রগুলি যেমন ফুটিয়াছে পূর্ব্বরাগেরগুলি সেরূপ ফুটে নাই, এবং তাহা আমাদের দেশে ভাল করিয়া ফুটিতেও পারে না। গল্পগুলির আখ্যানবস্তু বিশেষ কিছু না হইলেও এবং ছোট গল্প লেখার art গল্পগুলিতে না থাকিলেও, শুধু নারীচরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণে গল্পগুলি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। নারীর মান অভিমান, ঈর্ষা সন্দেহ, সেবা যত্ন, আত্মহারা প্রেম ও ব্যাকুলতা, নারী যেমন চিত্রিত করিতে পারেন, এমন পুরুষে পারেন না। প্রতিভাবান পুরুষ লেখক যাহা কল্পনায় অঙ্কিত করিবেন, নারী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত প্রতিভার সংযোগ হইয়াছিল বলিয়াই জর্জ ইলিয়ট প্রভৃতি প্রতীচ্য স্ত্রীলেখিকার এত সফলতা লাভ হইয়াছিল। লেখিকাও এই ক্ষেত্রে অনুশীলন করিলে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিবেন আশা করা যায়। পুস্তকের মধ্যে 'আগত মেল' প্রভৃতি দু একটি শিথিল পদ প্রয়োগ থাকিলেও ভাষা প্রশংসাযোগ্য, রুচি মার্জ্জিত, অথচ কোথাও সরসতার অভাব হয় নাই।

শ্রীমুদ্রারাক্ষস।

সংস্কৃত ভাষার বিবর্ত্তন ও গাথা-সাহিত্য।

(কাশীস্থ বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের অন্তর্গত সুহৃৎ সমিতিতে আলোচিত)।

অধুনা সংস্কৃতভাষা বলিলে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে, তাহাকে এক ভাষা বলিয়া নির্ণয় করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য। বেদে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। পক্ষান্তরে যাঁহারা জয়দেবের ললিত পদলহরী বা শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর মণিরত্নমালা অনায়াসে বুঝেন, ভাষাগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও তাঁহারা মাঘ ভারবীর লিপিচাতুর্য্যে নিপুণতার সহিত পরিচিত হওয়া, তাদৃশ অল্পায়াসসাধ্য বিবেচনা করেন না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ অনুশীলন ব্যতিরেকে, কেহই আপনাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। আবার কেবল সংস্কৃতের স্তরগুলিতেই নৈপুণ্যলাভ করিলে যথেষ্ট হইল না, সংস্কৃত হইতে রূপান্তরিত হইয়া যে নানা জাতীয় প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলির সম্যক্ আলোচনাও নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ জগৎপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির সুধাস্বাদনে চিরকালই বঞ্চিত

থাকিতে হয়।* এতদ্ব্যতীত দর্শন সমূহের তুলনা দ্বারা অনুশীলন ও বৌদ্ধাদিধর্ম্মের ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, গাথা ও পালিনামক ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনও অপরিহার্য্য। তাই বলিতে হয়, 'সংস্কৃত' কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাষাবৈষম্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে, ইহাই অনুমিত হয় যে, যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সৌরমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থ সমূহ দিন দিন নূতন আকার ধারণ করিতেছে, ভাষাও বিশ্বনিয়ন্তার সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। ভাষাও জীবদেহের ন্যায় ক্রমপরিণমনশীলা; অর্থাৎ যেমন শরীরতত্ত্ব পাঠে অবগত হওয়া যায়, মনুষ্য-শরীরের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে সপ্ত বৎসরে নূতন দেহের সমাবেশ হয়, সেইরূপ পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভাষাও কালবশে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া নবীন উপাদান গ্রহণ করে। এক স্তরের ভাষা পরবর্ত্তী স্তরে অব্যবহার্য্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়া কিরূপে নূতন আকার ধারণ করিতে প্রয়াসিনী, অধুনা প্রচলিত ভাষার দৃষ্টান্ত সাহায্যেও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।†

সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আলোচনাপ্রসঙ্গে, প্রথমতঃ বৈদিক ভাষানুশীলন উপলক্ষে, ঋগ্বেদ সংহিতার নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উদাহরণ স্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারেঃ—

"সনঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা ন স্বস্তয়ে॥ ১।১।৯

ইহার সূপায়নো (শুভপ্রাপক) ও সচস্বা (সমবেত) এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ আমাদিগের সাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান হইতে সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। সূনু (পুত্র) স্বস্তি (মঙ্গল) নিতান্ত অপ্রচলিত না হইলেও, পরবর্ত্তী সংস্কৃতে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ রয়ি, চক্ষণ, বীতয়ে, রাধাংসি, শুংভস্তি, কৃনুহি, ঘৃণীত প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত বৈদিক প্রয়োগের ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে; এবং কবি, বিপ্র, অহি প্রভৃতি অধুনা প্রচলিত অনেক শব্দ বেদে ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু এই বৈদিকভাষাই ব্রাহ্মণ আরণ্যকের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া উপনিষদের সহজ বোধ্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে; যথা,—

"যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে
ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তর ইতি" (বৃহদারণ্যক, ৩ অঃ, ৫ ব্রাঃ)

নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বেদের ভাষা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে সংস্কার প্রাপ্ত হইলেও, বৈদিক ভাষার দুই একটি অপ্রচলিত শব্দ বিন্যাসে সর্ব্বথা 'সংস্কৃত' পদবাচ্য হইতে পায় নাই;— এই জন্য সরলতর হইলেও উপনিষদের রচনা বৈদিক ভাষায়ই অন্তর্নিবিষ্ট। তাহার পর সৌত্রিক যুগের সূত্র সমূহের রচনা ভাষালোচনার পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে বলিয়া, আমরা সহজেই তাহা অতিক্রম করিয়া, ইতিহাস পুরাণের অক্ষয়-ভাণ্ডার দ্বারে উপনীত হই। পৌরাণিক সাহিত্যে ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিলেও রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ বিশুদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থে ব্যাকরণবিরোধী বা আর্ষ্য প্রয়োগ নিতান্ত বিরল নহে দেখিয়া মনে হয়, ব্যাকরণের বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য ভাষার যুদ্ধ ঘোষণার অতিপ্রাচীন কাল হইতেই সূত্রপাত হইয়া অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতি ও ভাষাগত বিশুদ্ধির সময়েও, যেমন—

"যাত্যেকতোঽস্ত শিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥"

(অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৪ অঙ্ক)

প্রভৃতির বর্ণনা পারিপাট্যে বিমুগ্ধ হইতে হয়, আবার 'ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ' (কুমার সম্ভব ৩।৪৪) ইত্যাদি 'মহাকবি প্রয়োগ' পরিদর্শনে, ব্যাকরণের সুদৃঢ় নিগড়চ্ছেদন প্রয়াসে নির্জ্জীব ভাষারও স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া, ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ব্যাকরণ-নিরপেক্ষতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদিক ধাতু ও শব্দরূপাদির যেরূপ সরল পদ্ধতি ছিল, সাহিত্যিক যুগের ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধিতে ক্রমশঃ তাহারা যারপর নাই জটিল ভাব ধারণ করে। সংখ্যাবাহুল্যহেতু ক্রিয়াপদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে স্মরণ সীমার অতীত ভিন্ন ভিন্ন আকারে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার উপর কাব্যজগতে ছন্দের বন্ধনও নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের মুকুটমণি কালিদাসও যে পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে পারেন নাই, ছন্দ-ব্যাকরণের কঠোর বন্ধনই তাহার প্রধান কারণ। এরূপ অবস্থায়, অপেক্ষাকৃত অল্পধীশক্তিসম্পন্ন লেখকগণ যে অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রন্থাদি প্রণয়ন প্রয়াসী হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাঁহারা ভাবকে ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া সম্যক্ প্রস্ফুরিত হইতে না দেওয়া ন্যায্য বিবেচনা না করিয়া, পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষার এরূপ স্বাধীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যে বৈয়াকরণ-বন্ধনবিনির্মুক্ততা-হেতু সরলতর বলিয়া তাঁহাদিগের ভাষা জনসাধারণে অত্যধিক আদরণীয় হইয়া উঠিল।* তাঁহাদিগের রচনা কালে সংস্কৃত

* মহা কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকেই একাধিক প্রকার প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

† এ সম্বন্ধে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আলোচনা মাতৃভাষার গৌরবানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺ প্যারিচাঁদ মিত্র মহোদয় প্রবর্ত্তিত ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজকাল যাঁহারা সংস্কৃতনিরপেক্ষ বঙ্গভাষার একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ

হইতে, এরূপ বিসদৃশ হইয়া পড়িল যে অতঃপর প্রাচীন নামের যোগ্য বিবেচিত না হইয়া নূতন নূতন আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষণশীলদল হইতেও, ইহারা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, এই ভাষা-সংস্কারকদলের সহানুভূতি রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় অতিক্রম করিয়া নবীন ধর্ম্মসংস্কারকদিগের সহিত ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সুতরাং এই মীমাংসাই আমাদিগের নিকট স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়,—সংস্কৃত ভাষাই জনসাধারণের রুচির বশবর্ত্তিনী হইয়া অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া কালবশে অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া, ভারতে অধুনা প্রচলিত নানা প্রকার প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপাদানীভূত প্রাচীন সংস্কৃত মাতৃভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে এক প্রকার নূতন ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। তাহা বিশুদ্ধ সংস্কৃতও নহে,—কারণ তাহাতে সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মগুলি সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় নাই। অথচ পালি বা প্রাকৃত ভাষার কোন শাখা বিশেষ বলিয়াও পরিগৃহীত হইতে পারে না,—কারণ তাহাতে ভাষা যে পরিমাণে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়, উল্লিখিত ভাষায় আদৌ ততটা দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রের প্রাকৃত ভাষা বুঝিতে যেটুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, ইহা বুঝিতে তাহারও প্রয়োজন না হইয়া মাতৃভাষার ন্যায় সহজেই ইহার অর্থ বোধ হয়। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন—অভিহিত-পূর্ব্ব গ্রন্থগুলির কবিতোপনিবদ্ধ কাহিনীগুলি এই জাতীয় বিচিত্র ভাষার এবং গদ্যাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। এই জাতীয় কবিতা প্রায় অধ্যায় শেষে ও কখন কখন মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইত কিন্তু গ্রন্থ প্রারম্ভে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্গত মহাবৈপুল্য সূত্রগুলিতেই এই কাবিতিকভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর নামক সুপরিচিত বুদ্ধচরিত গ্রন্থে ইহার সুপরিস্ফুট আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়। গাথার প্রথম তত্ত্বনির্ণায়ক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ইউজিনবর্ণফ, ইহাকে সংস্কৃত পালিপ্রাকৃত সংমিশ্রিত অশিষ্টপ্রযুক্ত সংস্কৃতভাষারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দীকবিতার ন্যায় প্রয়োজনানুসারে হ্রস্বদীর্ঘ বর্ণের সংযোজন বিয়োজনের আকুঞ্চন সম্প্রসারণের স্বাধীনতার অপব্যবহার বশতই এই নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্থূলতঃ সংস্কৃতের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্যই পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসনের অনুবর্ত্তন ও সেই সঙ্গে ছন্দোভঙ্গের দোষাদি পরিহার পূর্ব্বক কবিতা রচনা করা অনেকের পক্ষে সুখসাধ্য বা প্রীতিপ্রদ হইত না বলিয়াই রচনার এই স্বাধীন পথ অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘবর্ণ স্থানে হ্রস্বাদেশ, হলন্তবর্ণের শেষবর্ণের ও অন্ত্য অনুস্বারের পরিহার প্রভৃতি ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপের জটিলত্ব একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া, সরলতর প্রয়োগে একই ক্রিয়া নানা বচনপুরুষলিঙ্গের সহিত অন্বিত হইয়াছে। বাক্যসমাবেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অনুসৃত হইলেও, সমাসবন্ধের নিয়মগুলি সুবিধামত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ছন্দোবন্ধের নিয়ম অব্যাহত করিবার জন্য ভাষার প্রাথমিক বিকৃতি সাধিত হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত গাথা কবিতাগুলি ছন্দঃপ্রকরণের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করিতেও সমর্থ হয় নাই—ক্রমে তাহাতেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য অবলম্বিত হইয়াছে।*

ইউজিনবর্ণফ (ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থে) গাথার উৎপত্তি বিষয়ে হেতুদ্বয়ের অন্যতর সম্ভব স্থির করিয়া, এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

জাতীয় সঙ্গীতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন গদ্য ও পদ্যাদি রচনায় সংস্কৃতবহুল ভাষার উপযোগিতা কিরূপ।—

"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি! অয়ি নির্ম্মলসূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণি!
জনকজননী-জননি!
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষার কিরীটিনি!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে, জ্ঞান, ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী,
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনি!"

কথোপকথনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষায় অল্পবিস্তর ব্যবধান জগতের প্রায় সমস্ত জাতির ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্ত্তনের যোগ্যাযোগ্যতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি' নামক পুস্তিকায় সুন্দর দেখাইয়াছেন।

* মিত্রমহোদয় গাথার বিশেষত্ব সম্বন্ধে (Indo-Aryans, Vol. II. pp. 279—86) নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন।—

ক—ছন্দঘটিত :—

(১) দীর্ঘীকরণ; যথা, রোদমান (সংস্কৃত-রুদমান) স্মিতামুখী (স্মিতমুখী), করোথ (কুরুথ)।

(২) হ্রস্বীকরণ; যথা, ধরেন্তি (ধারয়ন্তি), ক্ষিপ্ত (ক্ষিপ্তা), প্রভ (প্রভা), লভেন (লাভেন)।

(৩) অক্ষর বিশেষের অপসারণ; যথা, নিশ্চরো (নিশ্চচার), মনা (মনসঃ), সজগে (সর্ব্ব জগতে), ইম দৃষ্ট বস্থাং (ইমাংদৃষ্ট্বা বসুধাং)।

(৪) দীর্ঘস্বর বা যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবচ্ছেদ; যথা, কিলেশ (ক্লেশ), শিরী (শ্রী), পূজারাহম্ (পূজার্হম্), বজিরিকার (বজ্রকার), শক্কিতং (শক্তং)।

(৫) 'হ' দ্বারা উচ্চার্য্যবর্ণের পৃথক্ করণ।

খ—গাথার প্রাদেশিকত্ব :—

(১) লিঙ্গ বচন কারকবিষয়ক অনবধানতা।

(২) শব্দরূপের সংক্ষেপ বা বিভক্তির লোপ সাধন।

(৩) অপভ্রংশ বিধান;—যথা, অয়ু (সংভ্রমঃ), কহিং (কুত্র, কেন), মি (মহং, ময়া) তি (ত্বয়া), তসা (তস্য), অনন্তিঃ (এভিঃ)।

বুদ্ধের নবধর্ম্ম প্রচারের অব্যবহিত পরেই গাথা-সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হওয়ায় সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তিনী ভাষারূপে তৎকালে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল, স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ, অল্পশিক্ষিত জনগণ কবিতা রচনার কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, তাঁহাদিগের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন শাসনের বিদ্রোহাচরণ নিবন্ধন সংস্কৃতভাষা ক্রমশঃ এইরূপ বিকৃত আকার ধারণ করে।—নিশ্চিত প্রমাণাভাবে উক্ত ফরাসী পণ্ডিত কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলেও, দ্বিতীয় হেতুর প্রতি তাঁহার কতকটা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে, বৈপুল্য সূত্রগুলি সম্ভবতঃ সিন্ধুপারে বা কাশ্মীরে রচিত। তদ্দেশে সংস্কৃতভাষার তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায়, তাঁহাদিগের সংস্কৃত রচনায় প্রাদেশিক শব্দাদি অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় ভাষা ক্রমশঃ অবিশুদ্ধ হইয়া গাথা আকারে পরিণত হয়। অধ্যাপক লাসেনও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বর্ণফের দ্বিতীয় হেতুর প্রতিবাদাবসরে বলেন;—বৈপুল্য সূত্রগুলির গদ্যাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত ও তাহাতে ন্যায়শাস্ত্রের জটিল যুক্তি ও কূট দার্শনিক মীমাংসার সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের রচয়িতাগণ যে সংস্কৃতভাষায় অব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া যে এরূপ ভাষাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বুদ্ধ-নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর মধ্যেই তাঁহার যে বিশ্বস্ত জীবনী সংকলিত হয়, তাহার উপকরণ নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সংগৃহীত না হইয়া, যে সুদূর কাশ্মীর বা কান্দাহার হইতে আনীত হইয়াছিল, এ কথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং মিত্রমহোদয় বলেন—বুদ্ধের সমকালীন ও পরবর্ত্তী চারণ বা ভাটগণ জনসাধারণ প্রচলিত ভাষায় বুদ্ধের উপদেশ ও মাহাত্ম্য কবিতাগ্রথিত করিয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে গান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত।† মহাবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ মিত্র মহোদয়ের প্রতিজ্ঞারই সমর্থন করে। তাহাতে লিখিত আছে, বৌদ্ধ শাস্ত্র গীত হইত। কবিতোপনিবদ্ধ না হইলে শাস্ত্র গীত হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং সেই গানোপযোগিনী কবিতা গাথা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। বিশেষতঃ বৈপুল্য সূত্রগুলির গদ্যাংশের পর গাথা সন্নিবেশের পূর্ব্বে "তত্রেদমুচ্যতে (এ বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে)" এই বাক্যের সর্ব্বত্র প্রয়োগ দর্শনে, ইহাই প্রমাণিত হয়,—চারণগণ ইহার ভাষাগত পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধন করিয়া, ইহাকে ধর্ম্মোপদেশের প্রধান অঙ্গ করিয়া তুলেন।

মোক্ষমূলের, ওয়েবর প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ মিত্রমহোদয়ের সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করেন। জন মিউরের অনুমানও, মিত্রমহোদয়ের মতের অনুকূল। তিনি বলেন, প্রাচীনকাল হইতেই যে সংস্কৃত রূপান্তরিত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রদেশের কথোপকথনের ভাষাবিশেষে পরিণত হইতেছিল, গাথার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। কেবল তর্কের অনুরোধে যদি কেহ গাথাকে বুদ্ধের সমকালবর্ত্তী লোকপ্রচলিত ভাষা স্বীকার করিতে আপত্তি করেন, ইহা যে প্রাচীনকালের লিখিত ভাষা ছিল, তাহা স্বীকার করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই। অধ্যাপক বেন্‌ফী স্থূলতঃ মিত্রমহাশয়ের অনুবর্ত্তন করিলেও তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে একান্তবিশ্বাসী চারণগণ সমাজের নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত বলিয়াই, তাঁহাদিগের হস্তে সংস্কৃত ভাষার দুর্গতি উপস্থিত হওয়ায় গাথার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার এই অতিরিক্ত মতটুকু সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বৌদ্ধাচার্য্যগণের যে সমস্ত গাথাগ্রন্থাদি অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে অশিক্ষিত জনগণের লেখনী প্রসূত নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ বৌদ্ধধর্ম্মের অনভিমত হইলেও, বৌদ্ধসমাজ হইতে জাত্যভিমান একেবারে প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্যই বরং বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের জীবনকালে ব্রাহ্মণ মৌদ্‌গলায়ন ও সারিপুত্র বৌদ্ধ সংঘের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের পরও ব্রাহ্মণজাতীয় মহাকাশ্যপই বৌদ্ধগুরুর পদে অধিরূঢ় হন। ধর্ম্মপদ প্রমুখ প্রামাণিক বৌদ্ধশাস্ত্রাদিতেও ব্রাহ্মণবর্গের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।* এরূপ স্থলে হীন জাতীয়দিগের দ্বারা গাথাপ্রথিত বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এরূপ কল্পনার কোনই সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

টর্ণার বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার ও প্রসার পালিভাষা সাহায্যেই নিষ্পাদিত। অথচ তিনি স্বসম্পাদিত মহাবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন, অশোকপুত্র মহেন্দ্র তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গতি সংগৃহীত

(৪) ধাতুরূপের নবীনত্ব উদ্ভাবন;—যথা, ভোতি (ভবতি), অনুভবিষ্যাং (অনুভূয়), ওরুহিত্ব (অবিরুহ্য), উথি (উত্তিষ্ঠ), শুনিত্বা (শ্রুত্বা)।

গ—গাথার বর্ণবিন্যাস সংস্কৃতানুযায়ী।

জন মিউর (Sanskrit Texts pp. 119-122) আরও কতকগুলি বৈচিত্র্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সুবিধা হইলেই শব্দমাত্রকে অকারান্ত বা উকারান্তের ন্যায় সহজরূপে পরিণত করা হইত। তকারান্ত শব্দের স্থানে স্ত আদেশ করিয়া লওয়া হইত। (৩) শব্দ বিশেষের সহিত 'এভিঃ' বিভক্তি যোগ করিলেই তৃতীয়ার বহুবচন হইত। (৪) সপ্তমী বিভক্তি ই-দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। (৫) বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের সহিত প্রায়শঃ স্বার্থে ক-প্রত্যয় হইতে দেখা যায়। (৬) অপির গাথারূপান্তর পি। (৭) গাথার অধিকাংশক্রিয়াই পালির অনুরূপ, কিন্তু কতকগুলি বিচিত্র; যথা, বর্ষি (বর্ষিত্বা), স্মরি (স্মৃতং), অদির্শাস (পশ্যতি, অদ্রাক্ষাৎ) ইত্যাদি।

† পৃথ্বীরাজরাসো প্রভৃতি চারণ রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই অনুমানের পোষকতা করে।

* "ন ব্রাহ্মণস্‌স প্রহরেয্য নাস্ত মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো।"

বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহ সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেই অনুবাদ পালিভাষায় অনূদিত হয়। মূল বৌদ্ধশাস্ত্রপুঞ্জ পালিভাষায় রচিত হইয়া থাকিলে, তাহাতেই পুনরায় অনুবাদের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধের উপদেশ পালিভাষায় প্রদত্ত না হইয়া, পালির জননী স্বরূপা অপর কোন ভাষার দ্বারা নবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। 'গাথা সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা' বর্ণক প্রমুখ পণ্ডিত-ধুরন্ধরগণের স্বীকারোক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয়, শাক্যমুনির আবির্ভাবকালে গাথাই জনসাধারণ প্রচলিত ভাষা ছিল এবং

"ধি ব্রাহ্মণস্স হন্তারং ততোধি যস্ত মুঞ্চতি।"

ধম্মপদ ২৬।৭।

ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, তাঁহার প্রতি কোপ প্রদর্শন করিবে না। ব্রাহ্মণ হন্তাকে ধিক্, যে তাঁহার প্রতি অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে তাহাকে ধিক্।

ভগবান্ অমিতাভ প্রচার কার্য্যের সুগমতা সম্পাদন মানসে সংস্কৃতের পরিহার করিয়া লোকপ্রচলিত ভাষাতেই উপদেশ দানের নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, তাহাতে ও পূর্ব্বোদাহৃত প্রমাণ সাহায্যে অবধারিত হয়, পালির পূর্ব্বে সংস্কৃতাপভ্রষ্ট যে গাথা লৌকিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, বোধিসত্ত্বের রসনা সংশ্লেষরূপ সৌভাগ্যোদয় পালির জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাহারই পক্ষে সর্ব্বথা সম্ভব, এবং ক্রমে বহুযুগের আবর্ত্তনে পালি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃদায়ের অধিকারার্থিনী হইলে, তাহারও সেই ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়।* ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, অশোকের অনুশাসনাবলীতেই পালিভাষা লোকশিক্ষার্থ সর্ব্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়। এরূপ বলিলে মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবিত মতের সহিত কোনরূপ অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইতেছে না। কারণ তাঁহার সিদ্ধান্তেও সংস্কৃতের প্রথম বিকৃতি গাথা, গাথার রূপান্তর পালি †, পালির পরিণাম শৌরসেনী, দ্রাবিড়ী পাঞ্চালী প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাসমূহ, এবং এই বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাকৃত হইতেই উপস্থিত হিন্দী, বাঙ্গলা, মরাঠী প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় ভারতী নিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত বলিয়াই বোধ হয়।

পূর্ব্বোদাহৃত তাত্ত্বিকগণের মতসমন্বয়ে ইহাই প্রতীত হয় যে, বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ও ধর্ম্মে আস্থা বৃদ্ধি করিবার জন্যই সহজবোধ্য গাথা কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতবিদ্‌গণের বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গদ্যসন্দর্ভে এই জাতীয় কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ পণ্ডিত মূর্খ, ইতরভদ্র, সকলেরই সমান উপদেশ ও উপকার লাভের সরল উপায় উদ্ভাবন করেন। আমাদিগের দেশের পুরাণ-পাঠের দৃষ্টান্তটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাভারত রামায়ণ ভাগবতাদির মূল আবৃত্তির সময়ে যেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ ও অধ্যাপকসম্প্রদায় শ্রোতৃরূপে পরিদৃষ্ট হন, আবার কথকদিগের লৌকিক দৃষ্টান্তাদি সমন্বিত সরস ও শ্রুতিমধুর বৈকালিক ব্যাখ্যাকালে অপণ্ডিত ভদ্র, ইতর, স্ত্রী, বালক, যুবক সকলেই সমান আগ্রহসহকারে তাহা শ্রবণ করেন। এইরূপ একটি সম্পূর্ণ সমাজের সকল সম্প্রদায়ই একই অনুষ্ঠানে সমান ধর্ম্ম শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা হইতে বৌদ্ধদিগের বৈপুল্য সূত্রগুলিতে সংস্কৃত ও গাথা উভয় প্রকার ভাষাসমাবেশের সারবত্তা অবধারিত হয়। অতএব বলিতে হয়,—গদ্যাংশ পাঠে পণ্ডিতগণ আকৃষ্ট হইলে, গাথাংশ দ্বারা অশিক্ষিত জনসমূহও তাঁহাদিগের সাহায্যে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই গাথাবিমিশ্র সংস্কৃত গ্রন্থগুলির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহা ব্যতীত ভাষাদ্বয় গ্রথিত শাস্ত্রপ্রণয়নের অপর কোন লৌকিক প্রয়োজন নির্ণয় করা সুকঠিন।

গাথার স্বরূপ অবগতির জন্য কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিলে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কর্ত্তৃক তাহা উপেক্ষিত না হইয়া, বরং উল্লিখিত মতগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের সহায়করূপে সাদরে পরিগৃহীত হইতে পারে। অভিহিতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কেহই সাহসী হন নাই;—প্রত্যেকেই স্ব স্ব গবেষণা ও যুক্তির সাহায্যে এক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন মাত্র। হয়ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধানোদ্দীপিত আলোকসম্পাতে নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগতের গোচরীভূত হইতে পারে। ভারতেতিহাসের অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কুক্ষিতে কত যে অমূল্য রত্নরাজি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে এক এক করিয়া তাহাদিগকে মানবচক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিলে, স্বপ্রভায় তাহারা আধুনিক সভ্যজগতের চক্ষুও ঝলসিত করিতে সমর্থ। এক ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারাই সেই প্রচ্ছন্ন মণিনিচয়ের উদ্ধারসাধন সম্ভব।—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, স্বদেশপ্রেমী মনীষীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য, এই বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ভাষাটির ক্ষুদ্র আলোচনা বঙ্গীয় পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

* গাথার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের পালিভাষাবিষয়ক মত কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সে জন্য তিনি মিত্র মহাশয়ের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

† পালিভাষাবিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয়ের ন্যায়, আমরা পালির সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর বা তত্তুল্য প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

রচনা ও মাধুর্য্যগুণে বুদ্ধসংক্রান্ত নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলি স্মরণীয়:—

"আরোগ্যতা চ ভবতে যথা স্বপ্নক্রীড়া, ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং।
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং, ক্রীড়াবতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা?"

রোগরাহিত্য ত স্বপ্নক্রীড়ার স্থায়,—ব্যাধি ভয় কি ভয়ানকরূপ ধারণ করে? কোন বিজ্ঞ পুরুষ এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রীড়ামোদে আসক্ত হইতে পারে?

"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ণমৃত্যুঃ, তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জরব্যাধি মৃত্যুনিত্যানুবদ্ধাঃ, সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যেপ্রমোচং॥"

যদি জরাব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তথাপি পঞ্চস্কন্ধ ধারণই মহদ্দুঃখের আকর। জরাব্যাধিমৃত্যুর নিত্যানুসঙ্গী মনুষ্যের আর কথা কি? অতএব হে সাধু: প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।

"ইচ্ছামি দেব জরামহ্য নাক্রমেয়া, শুভবর্ণযৌবনস্থিতো ভবিব নিত্যকালং।
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবিনোচভবেত ব্যাধিরমিতায়ুষশ্চ ভবি নোচ ভবেত মৃত্যুঃ॥

হে দেব আমি ইচ্ছা করি, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, কান্তিময় যৌবনে যেন চিরকাল অবস্থিত থাকি। রোগনির্ম্মুক্তি প্রার্থনা করি—পীড়া যেন না হয়। অমিত আয়ু হয় ও মৃত্যু না হয়।

"কামঅলভমানা দহ্যন্তে তথাপি, লব্ধা চ তৃপ্তি ন বিন্দষন্তি।
যদাপুরে অবশসৎ তজ্জয়ন্তে, তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোরকামা।"

কামনার অলাভে দগ্ধ হইতে হয়, লাভেও তৃপ্তি হয় না। বশহীন শরীরে যখন তাহার উৎপত্তি হয়, ঘোরকামনায় সে সময়ে মহৎ দুঃখ উৎপাদন করে।

"অহমপি বিপুলান্ বিজহ্য কামান্, তথপি চ ইস্ত্রীসহস্রান্ দর্শনীয়ান্।
অনভিরণভবেষু নির্গতোহ্যহং, পরমশিবাষরবোধি প্রাপ্তু কামঃ॥"

আমিও সহস্র সহস্র সুরূপা স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া পরম মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপিপাসায় বিপুল কামনা পরিহার করিয়া নির্গত হইয়াছি।

"ইয়ং পুনর্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্মতেন অধিস্থ প্রবর্ত্তয়ি চক্রং।
এবঞ্চ অবুধর্ম্মগ্রাহ্য মে স্যাৎ স চ মম ব্রহ্মক্রমে নিপত্যাযাচেৎ।"

আমি ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব, আমার এই ধর্ম্ম সকলের গ্রাহ্য হউক।—তখন এই প্রসন্ন জনসমূহ নতি স্বীকার পুরঃসর আমার নিকট প্রার্থনা করিবে।

বারাণসীপ্রবাসী
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

গোরা।

৪

বিশুদ্ধ মত হিসাবে একটা কথা যেমনতর শুনিতে হয় মানুষের উপর প্রয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার সেই একান্ত নিশ্চিত ভাবটা থাকে না—অন্তত বিনয়ের কাছে থাকে না। বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশি না মানিয়া থাকিতে পারে না। এমন কি, গোরার প্রচারিত মতগুলি বিনয় যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতটা মতের খাতিরে আর কতটা গোরার প্রতি তাহার একান্ত ভালবাসার টানে তাহা বলা শক্ত।

গোরাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বাসায় ফিরিবার সময় বর্ষার সন্ধ্যায় যখন সে কাদা বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় চলিতেছিল তখন মত এবং মানুষে তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছিল।

এখনকার কালের নানাপ্রকার প্রকাশ্য এবং গোপন আঘাত হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে চায় তবে খাওয়া ছোঁওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মুখ হইতে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে; এ লইয়া বিরুদ্ধ লোকদের সঙ্গে সে তীক্ষ্ণভাবে তর্ক করিয়াছে; বলিয়াছে শত্রু যখন কেল্লাকে চারিদিকে আক্রমণ করিয়াছে তখন এই কেল্লার প্রত্যেক পথ গলি দরজা জানলা প্রত্যেক ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া যদি রক্ষা করিতে থাকি, তবে তাহাকে উদারতার অভাব বলে না।

কিন্তু আজ ঐ যে আনন্দময়ীর ঘরে গোরা তাহার খাওয়া নিষেধ করিয়া দিল ইহার আঘাত ভিতরে ভিতরে তাহাকে কেবলি বেদনা দিতে লাগিল।

বিনয়ের বাপ ছিল না, মাকেও সে অল্পবয়সে হারাইয়াছে; খুড়া থাকেন দেশে, এবং ছেলেবেলা হইতেই পড়াশুনা লইয়া বিনয় কলিকাতার বাসায় একলা মানুষ হইয়াছে। গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে বিনয় যে দিন হইতে আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেই দিন হইতেই তাঁহাকে মা বলিয়াই জানিয়াছে। কতদিন তাঁহার ঘরে গিয়া সে কাড়াকাড়ি করিয়া উৎপাত করিয়া খাইয়াছে; আহার্য্যের অংশ বিভাগ লইয়া আনন্দময়ী গোরার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন এই অপবাদ দিয়া কতদিন সে তাঁহার প্রতি কৃত্রিম ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছে! দুই চারিদিন বিনয় কাছে না আসিলেই আনন্দময়ী যে কতটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন; বিনয়কে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবেন এই প্রত্যাশায় কতদিন তিনি তাহাদের সভাভঙ্গের জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা বিনয় সমস্তই জানিত। সেই বিনয় আজ সামাজিক ঘৃণায় আনন্দময়ীর ঘরে গিয়া খাইবে না ইহা কি আনন্দময়ী সহিতে পারেন, না বিনয় সহিবে!

"ইহার পর হইতে ভাল বামুনের হাতে মা আমাকে খাওয়াইবেন। নিজের হাতে আর কখনো খাওয়াইবেন না—এ কথা মা হাসিমুখ করিয়া বলিলেন; কিন্তু এযে মর্ম্মান্তিক কথা!" এই কথাটাই বিনয় বারবার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

শূন্যঘর অন্ধকার হইয়া আছে; চারিদিকে কাগজ পত্র বই এলোমেলো ছড়ানো; দেয়াশেলাই ধরাইয়া বিনয় তেলের সেজ জ্বালাইল,—সেজের উপর বেহারার করকোষ্ঠী নানা চিহ্নে অঙ্কিত; লিখিবার টেবিলের উপর যে একটা শাদা কাপড়ের আবরণ আছে তাহার নানান্ জায়গায় কালী এবং তেলের

দাগ; এই ঘরে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। মানুষের সঙ্গ এবং স্নেহের অভাব আজ তাহার বুক যেন চাপিয়া ধরিল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা এই সমস্ত কর্ত্তব্যকে সে কোনোমতেই স্পষ্ট এবং সত্য করিয়া তুলিতে পারিল না— ইহার চেয়ে ঢের সত্য সেই 'অচিন পাখী' যে একদিন শ্রাবণের উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে খাঁচার কাছে আসিয়া আবার খাঁচার কাছ হইতে চলিয়া গেছে। কিন্তু সেই অচিন পাখীর কথা বিনয় কোনো মতেই মনে আমল দিবে না, কোনো মতেই না। সেই জন্য মনকে আশ্রয় দিবার জন্য যে আনন্দময়ীর ঘর হইতে গোরা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে সেই ঘরটির ছবি মনে আঁকিতে লাগিল।

পঙ্খের কাজকরা উজ্জ্বল মেঝে পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে; এক ধারে তক্তপোষের উপর শাদা রাজহাঁসের পাখার মত কোমল নির্ম্মল বিছানা পাতা রহিয়াছে; বিছানার পাশেই একটা ছোট টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি এতক্ষণে জ্বালানো হইয়াছে; মা নিশ্চয়ই নানা রঙের সুতা লইয়া সেই বাতির কাছে ঝুঁকিয়া কাঁথার উপর শিল্পকাজ করিতেছেন, লছমিয়া নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাহার বাঁকা উচ্চারণের বাংলায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, মা তাহার অধিকাংশই কাণে আনিতেছেন না। মা যখন মনে কোনো কষ্ট পান তখন শিল্পকাজ লইয়া পড়েন— তাঁহার সেই কর্ম্মনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবির প্রতি বিনয় তাহার মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল; সে মনে মনে কহিল, এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমা-স্বরূপ হউক, আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ় রাখুক। তাঁহাকে মনে মনে একবার মা বলিয়া ডাকিল এবং কহিল তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয় এ কথা কোন শাস্ত্রের প্রমাণেই স্বীকার করিব না।

নিস্তব্ধ ঘরে বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া চলিতে লাগিল; —ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। আলোর কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিক্‌টিকি পোকা ধরিতেছে— তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল এবং একটা ছাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কি করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। বোধ হয় আনন্দময়ীর কাছে ফিরিয়া যাইবে এই মতই তাহার মনের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন্ এক সময় তাহার মনে উঠিল আজ রবিবার, আজ ব্রাহ্ম সভায় কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাই।—এ কথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমস্ত দ্বিধা দূর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা শুনিবার সময় যে বড় বেশি নাই তাহা সে জানিত তবু তাহার সঙ্কল্প বিচলিত হইল না।

আসিতেছে। ছাতা মাথায় রাস্তার ধারে এক কোণে সে দাঁড়াইল—মন্দির হইতে সেই মুহূর্ত্তেই পরেশ বাবু শান্তপ্রসন্ন মুখে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিজন চার পাঁচটী ছিল—বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল এক জনের তরুণ মুখ রাস্তার গ্যাসের আলোকে ক্ষণকালের জন্য দেখিল—তাহার পরে গাড়ির চাকার শব্দ হইল এবং এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল।

বিনয় ইংরেজি নভেল যথেষ্ট পড়িয়াছে কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের সংস্কার তাহার যাইবে কোথায়? এমন করিয়া মনের মধ্যে আগ্রহ লইয়া কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে চেষ্টা করা যে সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর এবং নিজের পক্ষে গর্হিত এ কথা সে কোন তর্কের দ্বারা মন হইতে তাড়াইতে পারে না। তাই বিনয়ের মনের মধ্যে হর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত একটা গ্লানি জন্মিতে লাগিল। মনে হইল আমার একটা যেন পতন হইতেছে। গোরার সঙ্গে যদিচ সে তর্ক করিয়া আসিয়াছে তবু যেখানে সামাজিক অধিকার নাই সেখানে কোনো স্ত্রীলোককে প্রেমের চক্ষে দেখা তাহার চিরজীবনের সংস্কারে বাধিতে লাগিল।

অথচ এই যে একটি পুলকের টান ইহা একেবারে সম্পূর্ণ ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য তাহার মনের সমস্ত ইচ্ছাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিল না। সেই জন্যই একবার যখন মনে করিল গোরার কাছে যাই যাইতে পারিল না। গোরা যে কঠোর হস্তে তাহার মনের ভিতরকার মাধুর্য্যের অঙ্কুরগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। আজ থাক্, তাহার প্রাণের তার যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিতেছে আজ রাত্রে এমনি বাজিতে থাকুক্।

টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—রাত্রিও যথেষ্ট হইয়াছে তবু বিনয় ঘুরিয়া ৭৮ নম্বর বাড়ীর সামনে দিয়া নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭৮ নম্বরের ঘরের ভিতর হইতে আলোর আভা দেখা গেল কিন্তু পাছে তাহার অপরাধ ধরা পড়ে এই জন্য বিনয় ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিল না—তাহার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিতে লাগিল।

বাসায় আসিয়া বাক্স খুলিয়া সেই রুমালটি বাহির করিল। রুমাল খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সেই টাকা-ওয়ালা লেফাফা বাহির করিল। লেফাফার উপরে তাহার নিজের নামের অক্ষরগুলি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল—বাবু বিনয়ভূষণ চ্যাটার্জ্জি। মনে হইল, অক্ষরগুলি যেন কথা কহিতেছে, তাহার নাম যেন কে ডাকিল। অচিন্ পাখী অদৃশ্য হইতে কেন এমন করিয়া ডাকিতেছে!

৫

এই কি ইংরেজি ভাষায় "লভ্!" গোরা যাহাকে বলে

মায়া,—বিকার। ভারতবর্ষের ভারতীদেবী তাঁহার পবিত্র বীণায় মৃণালতন্তুর মত যে শুভ্র তারটি বাঁধিয়াছেন সেই তারে ইহার কোনো সুরই বাজে না! হায়রে ভারতবর্ষ! তবে তুমি আমার সমস্ত মনকে তোমার সত্যে ভরিয়া তোল, তাহা হইলে এ মায়া আপনিই সরিয়া যাইবে। তুমি আমার প্রাণকে কাড়িয়া লও, আমাকে মরিবার জন্য প্রস্তুত কর, আমাকে বাঁচিবার জন্য বল দাও, সমস্ত দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন আমার মধ্যে কোনো শূন্যতা না থাকে!

এই বলিয়া বিনয় প্রাণপণে তাহার মনে একটা জোর আনিবার চেষ্টা করিল। ভারতবর্ষকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে চাহিল। ইতিহাসের যে সকল বীর নিজের দেশকে অগৌরব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অসহ্য দুঃখ সহিয়াছেন, তাঁহারা নিজের দেশকে কতই একান্ত সত্য,—ধনের চেয়ে সত্য, প্রাণের চেয়ে সত্য,—বলিয়া জানিয়াছিলেন, বিনয় সেই আদর্শে নিজের দেশকে হৃদয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাইবার জন্য দুই মুঠা শক্ত করিয়া নিজের সমস্ত চেতনাকে জাগাইতে চাহিল। কিন্তু কতটুকু ফল হইল! ভারতবর্ষ, স্বদেশ, মাতৃভূমি অসংলগ্ন বাষ্পরাশির মত তাহার কল্পনাদৃষ্টিকে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করিয়া ভাসিতে লাগিল,—বাস্তব পদার্থের মত তাহার বক্ষকে ভরিয়া তুলিয়া ধরা দিল না। কিন্তু ঐ যে মায়াকে, যে ভালবাসাকে আমরা টানিতে চেষ্টা করি না, যে আমাদেরি মন প্রাণ সমস্তই টানিয়া লয় সে ত এমন ফাঁকা নয়!

বিনয় বাসায় না গিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে যখন গোরার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বর্ষার দীর্ঘদিন শেষ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার দেখা দিয়াছে। গোরা সেই সময়ে আলোটি জ্বালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে।

গোরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল—"কি গো, বিনয়, হাওয়া কোন্‌দিক থেকে বইচে?"

বিনয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—"গোরা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য? খুব স্পষ্ট? তুমি ত দিনরাত্রি তাকে মনে রাখ, কিন্তু কি রকম করে মনে রাখ?"

গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি লইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল—তাহার পরে কলমটা রাখিয়া চৌকির পিঠের দিকে ঠেস্ দিয়া কহিল—"জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্র পারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেম্‌নি করে মনে রেখেচি।"

বিনয়। কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ?

গোরা বুকে হাত দিয়া কহিল—"আমার এইখানকার কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে, তোমার মার্শম্যান্ সাহেবের হিষ্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়ার মধ্যে নয়।"

বিনয়। তোমার কাঁটা যেদিকে সেদিকে কিছু একটা আছে কি?

গোরা উত্তেজিত হইয়া কহিল—"আছে না ত কি? আমি পথ ভুল্‌তে পারি, ডুবে মর্‌তে পারি, কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ—ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্ম্মে পূর্ণ—সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই! আছে কেবল চারিদিকের এই মিথ্যেটা! এই তোমার কলকাতা সহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক ইটকাঠের বুদ্বুদ!—ছোঃ! এ সমস্ত কি ছোট, কি ফাঁকি, কি কদর্য্য!"

বলিয়া গোরা বিনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—বিনয় কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল। গোরা কহিল, "এই যেখানে আমরা পড়চি শুনচি, চাকরীর উমেদারি করে বেড়াচ্চি, দশটা পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কিযে করচি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই যাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেচি বলেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে মিথ্যে কর্ম্মকে কর্ম্ম বলে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্চি—এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনো রকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরচি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেই খানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলচি আর সমস্ত ভুলে—কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে—ডুবি ত ডুব্‌ব, মরি ত মরব। সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্ত্তি, পূর্ণ মূর্ত্তি কোনো দিন ভুল্‌তে পারিনে!"

বিনয়। এসব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি সত্যি বল্‌চ?

গোরা মেঘের মত গর্জ্জিয়া কহিল—"সত্যিই বল্‌চি!"

বিনয়। যারা তোমার মত দেখ্‌তে পাচ্চে না?

গোরা মুঠা বাঁধিয়া কহিল—"তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এই ত আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন্ উপছায়ার কাছে? ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মূর্ত্তিটা সবার কাছে তুলে ধর—লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে? প্রাণ দেবার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।

বিনয়। হয় আমাকে সংসারের দশজনের মত ভেসে চলে যেতে দাও নইলে আমাকে সেই মূর্ত্তি দেখাও!

গোরা। সাধনা কর। যদি বিশ্বাস মনে থাকে তাহলে কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে। আমাদের সৌখীন প্যাট-

রটদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। স্বয়ং কুবের যদি তাঁদের সেধে বর দিতে আসেন তাহলে তাঁরা বোধ হয় লাট সাহেবের চাপরাশির গিল্টিকরা তকমাটাব বেশি আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারেন না! তাঁদের বিশ্বাস নেই তাই ভরসা নেই।

বিনয়। গোরা, সকলের প্রকৃতি সমান নয়। তুমি নিজের বিশ্বাস নিজের ভিতরেই পেয়েছ, এবং নিজের আশ্রয় নিজের জোরেই খাড়া করে রাখ্‌তে পার তাই অন্যের অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পার না। আমি বলচি তুমি আমাকে যা হয় একটা কাজে লাগিয়ে দাও,—দিনরাত আমাকে খাটিয়ে নাও—নইলে তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি মনে হয় যেন একটা কি পেলুম—তার পরে দূরে গেলে এমন কিছু হাতের কাছে পাইনে যেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি।

গোরা। কাজের কথা বলচ? এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সঙ্কোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্ব্বল করে ফেলেচি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার করলে তার পরে আমরা কাজ করবার ঠিক ক্ষেত্রটি পাব। এখন যে কোনো কাজ করতে চাই সে কেবল ইতিহাসের ইস্কুলবইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে ওঠে। সেই ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনো সত্যভাবে আমাদের সমস্ত প্রাণ মন দিতে পারব? তাতে কেবল নিজেদের হীন করেই তুলব।

এমন সময় হাতে একটা হুঁকা লইয়া মৃদুমন্দ অলস ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং গোটাছয়েক পান বাটায় লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটি একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা আসিয়া জুটিবে, তখন সদর-দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার সভা বসিবে।

[ক্রমশঃ।

[ভাদ্র সংখ্যার ২৭৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে মুদ্রিত গানের শেষ ছত্রটি "দিতেম পাখীর পায়" হইবে।]

চিত্রের বিষয়।

এবারকার প্রবাসীতে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত "সিদ্ধদ্বন্দ্বে"র ছবির বিষয় কালিদাসের মেঘদূত হইতে গৃহীত। সিদ্ধগণ অতি পবিত্রচেতা দেবজাতীয় জীব। কথিত আছে যে ইহাঁরা অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা, এই আটটি সিদ্ধি নামক গুণবিশিষ্ট। সিদ্ধযুগল আকাশপথে যাইতে যাইতে মেঘদর্শনে, পাছে জল লাগিয়া বীণা নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় উৎসুক নেত্রে মেঘের দিকে তাকাইতেছেন। ইহাই ছবির বিষয়।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের চিত্রের বিষয় [illegible]টি হিন্দু তীর্থের ঘাট। প্রাতঃকালের চিত্র। যে তরুণী ঘাটে নামিতেছেন, তাঁহার মুখে রোদ লাগিতেছে। উভয় নারীরই মুখের ভাবে কেমন পবিত্রতা ও নারীচরিত্রের গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাঁরা মহারাষ্ট্রীয়া হিন্দুনারী। অবরোধের জড়সড় ভাব এখানে নাই।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।